ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
Vol. 8th Issue 18th, Sept., 2021

(অ)চর্চিত

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
Vol. 8th Issue 18th, Sept., 2021

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.16
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 8th Issue 18th, Sept. 2021, Rs. 650/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৮ম বর্ষ ও ১৮ তম সংখ্যা
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)
DOI : 10.5281/zenodo.5517966

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৬৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী

ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. মনোজ মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক

ড. আশিস রায়

সহ-সম্পাদক

ড. টুম্পা রায়

সহযোগী সহ-সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমন গুণ (আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সৌমিত্র শেখর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুব্রত জৈন নিয়োগ (তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজন্তা বিশ্বাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

ড. বিনায়ক রায় (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অনির্বাণ সাহু (ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. অজিত মন্ডল (পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. মৃন্ময় প্রামাণিক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. ইনতাজ আলী (নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102

Ph. No. : 9804923182

E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্য

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় ১৫

জসীম উদ্‌দীনের একাঙ্কিকা: জীবনবোধের স্বরূপ

ফারজানা আফরীন রূপা ২৪

যুদ্ধ ও শান্তির প্রেক্ষিতে মহাকবির মহাভারত ('মহাভারতম্') ও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' – মানবধর্মের অনন্য দিগ্‌বলয় : একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

অজয় কুমার দাস ৩৯

সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* : অন্তেবাসীর আত্মদর্শন

মাখন চন্দ্র রায় ৬৫

লোকায়ত জ্ঞাপন ও সংস্কৃতি: একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

সোনালী নস্কর ৮১

উত্তর-পূর্ব ভারতে অ-চর্চিত রবীন্দ্রচর্চার পুর্ণমূল্যায়ন

অনির্বাণ সাহু ৯০

'আমি মাধবী' : চর্চার অন্তরালে অচর্চিত কিছু কথা

সোমা দাস (চৌধুরী) ১০০

বিদ্যাসাগর ও ব্যাকরণকৌমুদী

দীপঙ্কর পাত্র ১১০

শবর উপজাতি : জীবন ও সংস্কৃতি

বিপ্লব কুমার মাহাত ১১৭

জন জাগরণে মুকুন্দ দাস

কেয়া মুস্তাফী ১৩৫

মানচিত্রের অসুখ ও কয়েকটি সিনেমা
আজিমুল হক ১৪২

নাস্তিকতা, মানবতা, সমাজ-সংস্কার: তিনটি বাহুর সম্মিলিত
ত্রিভুজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
উত্তম বিশ্বাস ১৫০

ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিকাশে ডাক্তার
রফিউদ্দিন আহমেদ: একটি অনুসন্ধান
দীপঙ্কর মন্ডল ১৬০

কেবল গড়া হয় নাই আপনার ঘর : প্রসঙ্গ 'ইমারত'
বিশ্বজিৎ পোদ্দার ১৭০

টুসু গান: জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও
সাংস্কৃতিক জীবনের এক সাহিত্যিক দলিল
অশ্রুকণা ঘোষ ১৭৮

বঙ্গদেশের বৈপ্লবিক আকাশে এক অ-চর্চিত নক্ষত্র: বিপ্লবাচার্য
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের জীবন ও আদর্শ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
আদিত্য চক্রবর্ত্তী ১৯৪

উনিশ শতকের নারী লেখিকাদের শিশুসাহিত্য
দেবাংকৃতা সরদার ২০৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পিপিলস রিলিফ কমিটির ভূমিকা :
একটি অনালোচিত অধ্যায়
সপ্তর্ষি মণ্ডল ২১৮

বঙ্গনারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে
প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা
শুভ্র সরকার ২২৬

আনিসুজ্জামানের জীবনী: একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ

আসরাফুননেসা বেগম ২৩৪

হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর অচর্চিত হাসির কাব্য

সুদীপ্ত সাধুখাঁ ২৪৪

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস 'স্তিমিত রণতূর্য'; শাঁখচির বা শাঁখারি জনগোষ্ঠীর 'অস্তিত্ব' বিপন্নতার আখ্যান

উৎপল ডোম ২৫০

নজরুল কাব্যে পুরাণ ভাবনা

অরুনাভ মুখার্জ্জী ২৬১

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ঔপনিবেশিক বাংলায় সংস্কৃতচর্চাঃ একটি স্বল্পচর্চিত অধ্যায়

প্রীতম গোস্বামী ২৭০

রহস্যময় গল্পলোক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোৎস্না দত্ত ২৮৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' নাটক : একটি পর্যালোচনা

অভিজিৎকুমার ঘোষ ২৯৪

সুন্দরবনে চিংড়িচাষ, সমাজ-অর্থনীতি ও পরিবেশ প্রসঙ্গ

উজ্জ্বল বিশ্বাস ৩০৩

চৈতন্যসমকালীন বৈষ্ণব মহিলা পদকর্ত্রী মাধবী দাস ও তাঁর পদাবলী

মনীষা পাল ৩১৩

অচর্চিত চারণ কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রতিবাদ

সুমন্ত মণ্ডল ৩২৩

মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যে অন্ত্যজ

দেবজ্যোতি শীট ৩৩৪

নভেল করোনা ভাইরাস: মানসিক ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

শুভঙ্কর ঘড়া ৩৪৭

কুমুদিনী মিত্র: আদি বিংশ শতাব্দীতেএক ব্রাহ্মিকার সাহিত্যচর্চা

পায়েল দেশমুখ ৩৫৮

বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা

রুবেল পাল ৩৭১

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সাময়িক পত্রপত্রিকার ইতিবৃত্তান্তঃ

প্রসঙ্গ মালদহ জেলা

সমিত সাহা ৩৮২

(অ) চর্চিত এক নারী : 'অনাম্নী অঙ্গনা'র আলোকে

রচনা রায় ৩৯২

ভারতীয় মননে রবীন্দ্রচর্চার পটভুমিতে শন্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা

পঞ্চানন দেওয়াশী ৪০৪

উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন ও সুকান্তি দত্তের ছোটোগল্প

সৈকত মিস্ত্রী ৪১১

ভূদেবের জাতীয়ভাবের ধারণায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

মিলন কিস্কু ৪২৮

সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণ --- এক অনালোকিত অধ্যায়

পুরঞ্জয় তন্তুবায় ৪৩৬

সুন্দরবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্যময় নারী (নির্বাচিত)

প্রিয়াংকা মন্ডল ৪৪২

রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রাতিক্রমী দুই সমনামি কবি: যতীন্দ্র ও যতীন্দ্র

সম্রাট কুমার পাল ৪৫২

ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তনে কালিদাস

দেবব্রত বৈদ্য ৪৬১

জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : 'শনিবারের ছড়া'
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ৪৭৩
কমলকুমার মজুমদারের 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাস : আদিবাসী জীবনের অভিনব রূপায়ণ
কুহেলী ঘোষ ৪৮৬
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গতিশীলতা: অধিকারী সম্প্রদায়
বিমল চন্দ্র বর্মন ৪৯৮
আধুনিক প্রহসনের গতিপ্রকৃতি ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ – চিপিটকচর্বণম্
কুন্দন রায় ৫০৯
ডোম: বাংলার এক প্রান্তিক দলিত সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস
প্রসেনজিৎ নস্কর
সৌম্যদীপ খাণ্ডা ৫২১
ঊষা গাঙ্গুলি : অনালোকিত অধ্যায়ের অবলোকন
রিয়া মুখার্জ্জী ৫৩১
কার্তিক লাহিড়ীর জীবন ও সাহিত্য : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
জয়দেব গরাই ৫৩৯
কোচ রাজবংশী সমাজের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ নজর কাটা
কৃষ্ণ কান্ত রায় ৫৫০
পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'
বাসব দাস ৫৬০
উনিশ শতকের চর্চিত বঙ্গনাট্যাভিনেত্রী অচর্চিত দর্শন
মৌ চক্রবর্তী ৫৬৯
প্রবাসী ও সমকালীন রাজনীতি ঃ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
নিতাই গায়েন ৫৮২

হিতোপদেশের আলোকে আধুনিককালে চর্চিত সামাজিক চিত্র
অরিন্দম মণ্ডল ৬০০
অশ্বঘোষের মহাকাব্যে চর্চিত প্রকৃতি ও পরিবেশ চিন্তন
জয়শ্রী দে ৬১০
নিমসাহিত্য ও দুটি অ-চর্চিত নিমগল্প
কৈলাশপতি সাহা ৬১৮
বিলুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত : এক অনালোচিত সাহিত্যধারা
সন্ধ্যা মন্ডল ৬২৬
লোকায়তিক চেতনায় অচর্চিত চার্বাক
সুকন্যা সরকার ৬৩৬
সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা হাস্যকৌতুকে নারীর উপর
নিপীড়ন এবং তাঁর প্রভাব : অখন্ড বঙ্গীয় সমাজ
সুজন মোদক ৬৪২
উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণসাহিত্য: ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে ভ্রমণসাহিত্যে বিবর্তন
মুকেশ হালদার ৬৫৩
মধ্যবিত্ত জীবন-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প
জয়দেব সিংহ ৬৬৬
অর্চচিত মানকুমারী বসু ও তাঁর সমকালীন ধারা
পীযুষ নন্দী ৬৭৪
ঊনিশ শতকের গদ্য সাহিত্য-চর্চার ধারায় আত্মজীবনী তথা
আত্মস্মৃতিকথার সাহিত্যরস
দেবাশিস ঘোষ ৬৮২
সমতাবিধান
অদিতি সিংহ ৭০৯

Unspeakable Truths: Stories of Gender-Based Violence in Conflict- Zones
Madhumita Basu ৭১৪

Peacock in Popular Beliefs with Special Reference to Tribal Medicinal Practices of India
Sayan Debnath ৭২১

The Muslim Women and the Vernacular Education System in Pre-British Bengal
Runa Shyamal ৭৩৫

Ancient Indian Drama and Dramaturgy as gleaned from Sanskrit literature
Rajesh Biswas ৭৫০

The Role of Grandparents on Child Education in Sundarban
Soumen Patra ৭৬০

Impact of Covid-19 on Sports and Games
Susanta Sarkar ৭৭০

Need of Changes in Traditional Plans of The Pedagogy of Sanskrit Language in The, Perspective of Globalization
Nivedita Chaudhuri ৭৭৯

Vikramasila Monastery: Its Historical Background
Samir Chattopadhyay ৭৯৪

সম্পাদকীয়

মনের কোনে বুঁদ হয়ে থাকে চেনা ছক। মুগ্ধতায়। স্বপ্নিল আবর্তে পাখা মেলে দূরান্তে। ঘষে মেজে আলোকোজ্জ্বল করে তুলি। বার বার। দেখা আর না দেখার মাঝখানে থাকে, না বোঝার পাহাড়। নতুনের আহ্বানে মন ছুটে যেতে চায়। পরিচিতি পেতে চায়। নিজের অজান্তেই চর্চিতের পাশে ভিড় করে নেয় অচর্চিতরা। এবারের সংখ্যা সেই চর্চিতের উজ্জ্বলতার পাশাপাশি অচর্চিতের উন্মোচন।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্য

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

'Univarsal Mind' বলতে যাকে আমরা বলি 'বিশ্বমন', রবীন্দ্র সাহিত্যে সেই বিশ্বমনের শুধু প্রতিফলনই ঘটে নি, রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বিশেষত তাঁর প্রবন্ধে এই 'বিশ্বমনে'র কথা বলেছেন। আমরা সাহিত্যে বাৎসল্য, মা বা যে বিষয় নিয়েই আলোচনা করি না কেন, এই বিশ্বমনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাহিত্য দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ যে হয় না, এই বিষয়ে কারুরই কোনো দ্বিমত নেই। সেই সঙ্গে মানবমন ও মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য নিশ্চয় 'যেমন দেখলাম' তেমন 'লিখলাম' নয়, তাতে অভিজ্ঞতা বা চোখে-দেখা বিষয়ের সঙ্গে কল্পনার সংযোগ ঘ'টে উপলব্ধির রসে জারিতরূপে যে নূতন শিল্প সৃষ্টি হয়, তা বিশ্বমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মন,মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি তেমন গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। মনস্তত্ত্বের ধারনাটিও তখন সচেতনভাবে বর্তমান ছিল, এমন বলা যায় না । কারণ সে যুগের সাহিত্য ধর্মাশ্রিত, ভক্তির আবেগে পূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রাবল্যে তখন দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনি রচিত হচ্ছে। কাজেই মানুষের মন-মনস্তত্ত্বের স্থান সেখানে সংকুচিত। তথাপি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিশু, জননী ও বাৎসল্য – এই বিষয়গুলির অনুসন্ধানের পাশাপাশি এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিশুর সঙ্গে জননীর স্নেহ-মধুর সম্পর্ক বৈষ্ণবপদাবলীতেই আমরা প্রথম স্পষ্টোজ্জ্বলভাবে পেলাম। শ্রদ্ধেয় জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন – "বাংলা পদাবলীর যশোদা মূর্তিমতী গীতিকবিতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়া নয়, কথায় তার আত্মপ্রকাশ। এ যশোমতি বাঙ্ময়ী, তাঁর বাৎসল্যও বাঙ্ময়। ...রবীন্দ্র-চিত্রিত 'আদি-জননী-সিন্ধুর' মত তাঁর আবেগস্পন্দিত বাৎসল্য-উতল, উজ্জ্বল, চঞ্চল ও মুখর।"[১] বৈষ্ণবপদাবলীতে বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার পদ তথা বাৎসল্য এবং সখ্যরসের পদ চৈতন্য-পরবর্তী যুগের সংযোজন, এই পর্যায়ের পদে কেন্দ্রমনি অবশ্যই গোপাল। তাঁর পায়ে মণিময় নূপুর, মুখে মৃদু হাসি। শুধু জননী যশোদা নন, ব্রজপুরীর অন্য গোপীরাও গোপালের নৃত্য দেখে খুশি হয়। সে আধো বোলে কথা বলে। আর তার মুক্তোর মতো দাঁতগুলি

বিকশিত হয়। পদকর্তা শ্যামদাস গোপালের নৃত্যের একটি ছন্দ-ধ্বনি যেন চিত্রময় করে তুলেছেন – "তীন্দ্র দ্রিমিকি ধ্বনি তাথৈ তাথৈ শুনি।"[২] গোপালের নৃত্যে মা যশোদার আনন্দ উপছে পড়ে। বলরামের জননী রোহিনীকে তিনি ডেকে বলেন – "দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।"[৩] শুধু রোহিনী নন, পিতা নন্দকেও এ দৃশ্য দেখতে হবে। কারণ, এমন মনোহরণকারী দৃশ্য তো দু-চোখ ভোরে দেখারই মতো। যশোদা জননী সাধ করে গোপালকে অলঙ্কারে সাজিয়েছেন। তার কোমল পায়ে নূপুর পরিয়েছেন সেই নৃত্যরত মূর্তিটি দেখবেন বলেই! তাই দধি-মন্থন কালে গোপাল কাছে এলেই যশোদা তাকে বলেন – "...তোরে দিব ক্ষীর ননী/ খাইয়া নাচহ মোর আগে।"[৪] গোপালের শিশু-মনে আনন্দের অবিরাম নির্ঝর। মায়ের সাধ পরিপূর্ণ করে সে "খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।"[৫] সন্তান ও মায়ের সম্পর্কের এই রূপচিত্রণ চিরন্তন। বিশ্বসাহিত্যে এর ব্যতিক্রম হয়তো খুব সামান্যই আছে। বৈষ্ণবের পঞ্চরসের সাধনায় বাৎসল্যরস চৈতন্যোত্তর কালে যে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিল, কৃষ্ণের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলার পদে তত্ত্বের সেই প্রভাব বড়ো বেশি লক্ষ করা যায় না। বলা ভালো, পাল্য-পালকের এই সম্পর্ক ভগবান ভক্তের 'রূপকে' আবৃত করা যায় না। গোপাল তো ব্রজপুর বা গোকুলের নন, তিনি আমাদের হৃদয়-পুরের চির-আকাঙ্ক্ষার ধন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'(১৯০৯) কাব্যগ্রন্থের 'খেলা' কবিতাটি লক্ষ করলে আমাদের এই মতের সমর্থন মেলে –

> কিসের সুখে সুহাস মুখে
> নাচিছ বাছনি,
> দুয়ার পাশে জননী হাসে
> হেরিয়া নাচনি।[৬]

শিশু কৃষ্ণ বা গোপাল যেন "ছেলের সঙ্গে আছো তুমি,/ নিত্য ছেলে মানুষ,..."তাই তাঁকে নিয়ে শুধু বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলার পদ নয়, মধ্যযুগেই বৈষ্ণব প্রভাব বা চৈতন্য প্রভাবাশ্রিত বৈষ্ণবেতর কাব্যে গোপাল তথা ব্রজশিশুর ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসামঙ্গল'কাব্যে রাখাল বালকদের মনসা পূজা করা প্রসঙ্গে ব্রজবালকদের কথা বলেছেন- "রাম শ্যাম দুই ভাই রাখে বহুপাল/...রঘুয়া রাঘব তারা রাখাল দুজন।/ ব্রজশিশু সঙ্গে যেন নন্দের নন্দন।"[৭] কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার মতো তারাও দলবদ্ধভাবে কাজ ও কাজের চেয়ে খেলাতেই বেশি খুশি হয় – "কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত।"[৮] বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে

কৃষ্ণের গোচারণ তার লীলার অন্তর্গত। তাই ‘গোষ্ঠলীলা’, কিন্তু এর উপস্থাপনে পদকর্তারা আধ্যাত্মিকতার তুলনায় মানবিক আবেদনকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাদের গোচারণে যাওয়া থেকে বিকেলে গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সর্বত্র বজায় রেখেছেন সাধারণ গোপ-বালকদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। এমন কি খেলা-শেষের ধ্বনি হিসেবে ‘আবা-আবা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। পদকর্তা বলরাম দাসের পদে পাই – “যতেক রাখলগণ আবা আবা ঘনে ঘন।”[৯] কোনো শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সঙ্গী বা খেলার সাথী সম্পর্কে পরবর্তীকালে শিশু মনস্তত্ত্বমূলক গবেষণায় বা Child Pshychology সম্পর্কিত নানা রচনায় বেশ তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে – “...Research confirms that peer relationships are vital to children's healthy development and that, in the course from childhood to adolescence children tend to spend more time with their peers than with their families(Rubin et al,2006)-childhood peer experiences influences children's self-assessment and well-being(Rudolph et al,2005)”. রবীন্দ্রনাথ ‘জন্মান্তর’ কবিতায় পরজন্মে ব্রজের রাখাল হতে চেয়েছেন। সেই পুরনো সভ্যতায় আর কিছু না থাক, আছে উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার আহ্বানের জাদুমন্ত্র। সেখানে অশোকের বন, গুঞ্জা ফুলের শুভ্র উচ্ছ্বাস, যমুনার কালো জল, ব্রজবধূদের দধি-মন্থন - সব মিলিয়ে যে প্রকৃতির কোল-ঘেঁষা স্বচ্ছন্দ জীবন, কবি তারই অংশীদার হতে চেয়েছেন, - “তারাই তো সব রাখাল ছেলে/ গরু চড়ায় মাঠে।/ নদীর ধারে বনে বনে/ তাদের বেলা কাটে।”[১০]

বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনার পাশাপাশি শাক্ত পদাবলীর উল্লেখও জরুরি বলে মনে হয়। তবে বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রে যেমন আছেন কৃষ্ণ, শাক্ত পদাবলীর কেন্দ্রে তেমনিই আছেন উমা। তৎকালীন সমাজে কন্যার বাল্যকালে বিবাহদান ছিল প্রচলিত রীতি। কিন্তু উমা কন্যা-সন্তান বলে তাঁর পিতা-মাতার কাছে কখনো অবহেলার পাত্রী হয়ে ওঠেন নি। বিবাহ দেওয়ার পরেও মেয়ের মূল্য তাঁদের কাছে বিন্দুমাত্র কমে নি। আমরা বাৎসল্যের চিত্রে বৈষ্ণব পদের মতো শাক্ত পদাবলীতেও দেখি পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিশু উমা চাঁদ ধরতে চায়– “উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান,/ নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।/ আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়,/ ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।”[১১] কন্যাকে শান্ত করার জন্য যে সমাধানে পৌঁছেছেন পিতা, তাতে পিতৃ-হৃদয়ের সবটুকু বাৎসল্য উজাড় হয়ে গেছে। গিরিরাজ

উমাকে কোলে করে তাঁর মুখের সামনে দর্পণ এনে ধরেছেন। এ আহ্লাদ, এ আনন্দে স্বর্গ নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। তাতে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা যেমন আছে, তেমনি আছে প্রকৃতির মায়া। ঘরের মেয়ে ও আকাশের চাঁদ যেন এখানে একাকার হয়ে গেছে। স্নেহ ভালোবাসা বা বাৎসল্যের মহিমায় চাঁদ ও উমার প্রভেদসীমা ঘুচে গেছে। কন্যা বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে চলে গেলে মেনকা ও গিরিরাজের বাৎসল্যের অন্য প্রকাশ দেখি। জননী মেনকা উমার পিতার কাছে আবদার রাখেন কন্যাকে তাঁর কাছে এনে দেওয়ার জন্য। না হয় শিব ঘর-জামাই হয়েই থাকবেন! কিন্তু এ বিচ্ছেদ যে অসহনীয়! – "ঘরজামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাস/ গিরিপুর করব দ্বিতীয় কৈলাস।"[১২] কিন্তু উমা মায়ের প্রস্তাবে সম্মত হন না। বিবাহ তাঁকে মনে-প্রাণে বড় করে দিয়েছে। স্বামী, সংসার – এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তাঁকে দায়িত্বশীল করে তুলেছে। তাঁর কন্যাসত্তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে গৃহিণী বা পত্নী সত্তা। মা হয়তো মেয়ের এই পরিবর্তনে খুশি হন নি। মায়ের প্রতি সন্তানের নির্ভরতা কমে যাওয়া কোনো মা-ই মনে হয় খুশি মনে মেনে নিতে পারেন না। কারণ এতে যে তাঁর গর্ভ-লালিত স্নেহের পুত্তলি অচেনা হয়ে যায়। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ে। তাই মেনকার কণ্ঠে এই ক্ষোভ বা আক্ষেপোক্তি শোনা যায় – "এখন বুঝি ঘর চিনেছিস তাই হয়েছি পর,/ কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস নিতে এলে হর।"[১৩] বাৎসল্যের চিরন্তন মূর্তি শাক্ত পদাবলীর পদকর্তারা বাস্তবসম্মতভাবে এভাবেই চিত্রিত করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী ছাড়াও মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনীগ্রন্থগুলিতেও শিশু ও পিতামাতার মধুর সম্পর্ক এবং বাৎসল্যের অনুপম চিত্র আছে। বাল্মীকির সংস্কৃত 'রামায়ণে'র বঙ্গানুবাদে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী' বাঙালির আহার-বিহার, পূজা-পার্বণ, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারকে ফুটিয়ে তুললো। ফুটে উঠলো গার্হস্থ্য জীবনচিত্র, পারিবারিক সম্পর্ক – পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের, সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র। শিশু চরিত্র হিসাবে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন শুধু আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেন না, তাঁদের জন্ম, অষ্টকলাই, ষষ্ঠীপুজো,অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে মল্লবিদ্যা, লাঠিখেলা, বাল্যক্রীড়ার নানা দৃষ্টান্তে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পূর্ণ। পুত্রদের প্রতি দশরথের স্নেহের অন্ত নেই। তাই তাঁদের কল্যাণে শুধু দান-ধ্যানই নয়,পঞ্চম বৎসর বয়সে হাতেখড়ি, কাব্যশাস্ত্র, স্মৃতি, চতুঃশ্রুতি ইত্যাদি অধ্যয়নে তাঁরা যাতে পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেন, সে বিষয়েও দশরথ মনোযোগী হলেন। এঁরা ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠলেন। দশরথ ও তাঁর পত্নীদের বাৎসল্যের

প্রচুর নমুনা আছে রামায়ণে, যেমন আছে অন্ধমুনি ও তাঁর পুত্রের প্রসঙ্গে; কিংবা আমরা সীতা এবং লব-কুশের কথাও মনে করতে পারি। আসলে রামকে নিয়ে দশরথের উদ্বেগের কেন্দ্রে ছিল অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধের ঘটনা এবং সে বিষয়ে মুনির অভিশাপ। সন্তানের কল্যাণ-চিন্তায় সদ্য-জাগ্রত পিতৃ-হৃদয় তাই রামের বনবাসকেও মেনে নিতে পারে নি। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই বাৎসল্যের প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন।

অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনায় মহাভারতের কথাও এসে পড়ে। রামায়ণের অনেক পরে অনূদিত মহাভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহই বড়ো হয়ে উঠেছে। 'শ্রীরামপাঁচালী'র মতো 'ঘরের কথা' মহাভারতে স্বাভাবিক কারণেই বড়ো হয়ে ওঠে নি। কিন্তু পুত্রদের ঘিরে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধস্নেহ, গান্ধারীর বাৎসল্য ও শঙ্কা-মিশ্রিত ভালোবাসা, পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য মাতা কুন্তীর আকুলতা, দ্রৌপদীর প্রতি স্নেহ ও কর্তব্য, এমন কি কৃষ্ণের জন্যও তাঁর স্নেহ-বাৎসল্যের মধুর চিত্র কাশীরাম দাস বাঙালি-মানসের উপযোগী রূপেই বর্ণনা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যে বাৎসল্যের চিত্রণে অনেকক্ষেত্রেই বৈষ্ণব পদের শিশু গোপাল বা কৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাব বর্তমান। সন্তানের প্রতি তাদের মাতা-পিতার আচরণের চিরসত্যই এখানে প্রকাশিত। সন্তানের ভালো-মন্দ সব কিছুই স্নেহের চক্ষে মা-বাবা দেখেছেন। দু-একটি সাধারণ বিষয় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। শিশু বয়সেই মঙ্গলকাব্যের ক্ষুদে চরিত্ররা অনেক বেশি পরিণত বা 'Matured', তারা বীরত্বে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও অতুলনীয়। তাদের স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র পিতা-মাতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অথচ তাদের নিজেদের মধ্যেই সংযমবোধ আছে। আছে জনক-জননী ও অন্যান্য গুরুজনদের মান্য করার তাগিদ। তারা নিজেদের তাগিদেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে চায়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুকে সাহায্য এবং পিতার প্রদর্শিত পথে চলার জন্যই বাবার সঙ্গে বনে শিকারে যাওয়া অভ্যাস করে – "ইচ্ছা জায় জেই দিন বন জায় বাপ সনে/ আগে ধান জিনিঞা পবনে।"[১৪] কালকেতুর বীরত্ব এত বড়ো করে দেখানো হয়েছে যে, সে নিজ হাতে পশু শিকার করে। তার অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না – "তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে।"[১৫] ধর্মকেতু ও নিদয়া সন্তানকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তার গলায় বাঘনখ ঝুলিয়ে দেয়।

হাতে পায়ে ধুলো মেখে বেড়ে ওঠা শক্তিশালী, কর্মঠ শিশু কালকেতুর পাশাপাশি 'চণ্ডীমঙ্গলে'র-ই বণিকখণ্ডে অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসাবে শ্রীমন্তকে এঁকেছেন

কবি। এই উপস্থাপনায় দুটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনপতি সদাগর এবং খুল্লনার পুত্র শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত যেন নবোদিত চন্দ্র। এমন ছেলের সুরক্ষার জন্য পিতা-মাতার বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তার বর্ণনায় লিখেছেন – “হরষিত দুয়া দাসী ধায় দ্রুতপদ।/ দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ।।/ ফেড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।/ গোমুণ্ড থুইআ দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ী। / হুলাহুলি দিআ কৈল নাড়ির ছেদন।/ তিন দিবসে দিল সুপথ্য পাচন।”[১৬] জননীর ঘুমে-জাগরণে সর্বদাই মিশে থাকে তার আত্মজের কল্যাণ-চিন্তা। এই কল্যাণ-চিন্তা আবার শঙ্কা-বাহিত। খুল্লনা তাই স্বপ্নে দেখেছে তার নয়নমনি শ্রীমন্ত হারিয়ে গেছে। দু’চোখ তার ভেসে গেছে জলে। তবে এ স্বপ্ন তার সত্য হয়েছে অন্যভাবে। পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই যখন তাকে ধমক দিয়ে বললেন – “পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম। নাহি জানো আপনার জাতের মরম।।”[১৭] তখন বয়সে ছোটো হলেও এ ভর্ৎসনার অর্থ বুঝতে দেরি হয় নি শ্রীমন্তর। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যেন হঠাৎ করে বড়ো হয়ে গেছে সে। জননীকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছে – “বাপের উদ্দিশ-আশে জাইব সিংহল দেশে/ সাত নৌকা করিআ সাজন।”[১৮] বণিকের সন্তান বণিকই হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীমন্তকে নদী-সাগর পাড়ি দিতে হচ্ছে সত্য জানার জন্য। এ দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। শ্রীমন্ত ঐ শৈশবেই এক স্বতন্ত্র সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন তার জীবনকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সে এক স্বতন্ত্র শিশু। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে এবং জননীকে অপবাদ থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তের এই যাত্রা খুল্লনাকে স্মৃতির দরজার কাছে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার মনে পড়ে পুত্রের করতালি দিয়ে গৃহাঙ্গণে নেচে বেড়ানো কথা, তার শ্রবণবেধ বা কর্ণবেধ অনুষ্ঠান, তাকে উদ্দেশ করে মায়ের ছড়া আওড়ানো, শ্রীমন্তের ‘ভাগবত খেলা’ – ইত্যাদি নানা ঘটনা। সন্তানকে নিয়ে তৈরি জননীর খেলাঘর মুহূর্তে ভেঙে যায়। নদীবক্ষে শ্রীমন্তের তরণী যখন ভেসে চলে, তখন খুল্লনারও হৃদয় সেই পুরনো ছড়ার ছন্দের দোলায় দুলতে থাকে – “আনিব তুলিয়া গগন-ফুল/ একেক ফুলের লক্ষেক মূল/ সে ফুল গাঁথিআ পরাব হার/ সোনার বাছা মোর না কাজ আর।”[১৯] সমুদ্রের জলের স্বাদ আর খুল্লনার চোখের জলের লোনা স্বাদের সঙ্গে তখন আর কোনো পার্থক্যই থাকে না!

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে লাউসেন চরিত্রটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এঁকেছেন। কৃষ্ণের আদলে গড়া লাউসেন ছিল অসামান্য বীর ও মল্লবিদ্যায় পারদর্শী।

শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় স্থির বুদ্ধির অধিকারী লাউসেন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর স্নেহ- বাৎসল্যে বেড়ে ওঠা এই শিশু কখনোই পিতা-মাতার কথার অবাধ্য হয় নি। গুরুজনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা যেমন তার ছিল, তেমনি ছিল সর্বশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান। তাকে কেন্দ্র করে এবং মামা মহামদের কথা চিন্তা করে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বাৎসল্য-মথিত উৎকণ্ঠাও কম ছিল না। শৈশব থেকে সেও কঠোর সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আবার এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে লখাই ডোমনীর কথা মনে পড়ে। সে বৃহৎ কর্তব্য রক্ষার জন্য তার দুই পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাতে দ্বিধা করে নি। যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে জেনেও সে বাৎসল্যের স্নেহপাশে পুত্রদের বন্দি করে রাখে নি। 'ধর্মমঙ্গল'ই মনে হয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কাব্য, যেখানে সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক তথা বাৎসল্যের চিত্রণে বৈচিত্র্য আছে। এ কাব্যে এই বৈচিত্র্য বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নয়ানী লাউসেনকে দেখে কামোত্তেজনায় তাকে পাওয়ার জন্য নিজের সন্তানকে কূপে ডুবিয়ে হত্যা করে – "নিশ্বাস ছাড়িয়া ধেয়ে যেয়ে ঐ রূপে।/পুত্রে এনে পাপিনী ডুবায়ে মেলে কূপে।।"[২০]

বর্তমান আলোচনায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনীসাহিত্য ও চৈতন্য পার্ষদগণের জীবনীসাহিত্যে বাৎসল্যের অনুসন্ধান সংক্ষেপে করা যেতে পারে। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাস সূতিকাগৃহে নিমাই–এর জন্মের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর নামকরণের বিবরণটিও সুন্দর। শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার পর্যায়ক্রমিক চিত্রণে সামাজিক রীতিনীতির পরিচয়ের পাশাপাশি গৌরাঙ্গের যে অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই, তাতে মনে হয়, তিনি 'বিস্ময়-বালক(Wonder child)'। বাস্তবিকই তিনি তাই। তবে গৌরাঙ্গদেবের অলোকসামান্য জীবন নিয়ে লেখা কাহিনিতে অলৌকিকতার স্পর্শ থাকলেও এর বাস্তবের দাবিটুকু অস্বীকার করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা জীবনীগ্রন্থগুলি ছাড়াও চৈতন্য-পার্ষদদের জীবনীগ্রন্থেও তাঁদের শৈশবকালের বর্ণনা আছে। যেমন হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতমঙ্গল'। তবে অনেক সময়ে তাঁদের বর্ণনায় অতিসাধারণ মানবশিশু নয়, অবতার পুরুষের পরিচয়ই যেন পরিস্ফুট হয়েছে।

একথা ঠিক যে, শিশুর জীবন নবীনের প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ। বড়োদের জগৎ থেকে তা একেবারেই আলাদা। তাদের কল্পনা-প্রবণ মনে জীবনের কোনো জটিলতাই স্বাভাবিকভাবে রেখাপাত করে না। পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে শিশুর এই মন-মানসিকতা বোঝা হয়তো অসম্ভব। কিন্তু বাৎসল্যের নিবিড় স্পর্শে, স্নেহের বাহুবন্ধনে তাঁরা শিশুর

জীবনকে আগলে রাখেন। এই বাৎসল্য যে কত দামি, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তা নিশ্চিতভাবে জানেন। এই বাৎসল্য বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ার মতো, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ছায়া ও আশ্রয়টুকু ক্রমশ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। 'শিশুর জীবন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন – "বাল্য দিয়ে যে জীবনের/ আরম্ভ হয় দিন/ বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।"[২১]

উল্লেখপঞ্জি:

১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে মা, সূত্রধর, কলকাতা, প্রকাশ: ২৩ জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা ৭৮

২. কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ, শ্যামদাস, পাঁচশত বৎসরের পদাবলি, বিমানবিহারী মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৮৯

৩. শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, যাদবেন্দ্র দাস, বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন), খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরি ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পঞ্চদশ সং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৩

৪. ঐ ঘনরাম দাস ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ১৪

৫. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ১৪

৬. 'খেলা', 'শিশু', রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ৬

৭. 'মনসামঙ্গল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, প্রথম সং ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ৮৬

৮. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃষ্ঠা ৯০

৯. উত্তরগোষ্ঠের পদ, বলরাম দাস, বৈষ্ণবপদাবলি, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সং, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৭৪২

১০. 'জন্মান্তর', ক্ষণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ৭৯৭

১১. 'শাক্তপদাবলী', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাল্যলীলার পদ, রত্নাবলী, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৩

১২. ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬২

১৩. ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ৬৬

১৪. ‘চণ্ডীমঙ্গল’, কবিকঙ্কণ বিরচিত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪২

১৫. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ৪২

১৬. ঐ (বণিকখন্ড) ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ২১৩

১৭. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ২২৪

১৮. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ২২৮

১৯. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ২১৮

২০. ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’, ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃষ্ঠা ২৬৬

২১. ‘শিশুরজীবন’, ’শিশুভোলানাথ’, দ্বিতীয়খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ৫৭৫

জসীম উদ্‌দীনের একাঙ্কিকা: জীবনবোধের স্বরূপ

ফারজানা আফরীন রূপা
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: *সাহিত্য জগতে জসীম উদ্‌দীনকে অভিহিত করা হয় 'পল্লীকবি' নামে। কাব্যের বিশাল ভুবন ছাড়াও গদ্য, লোক সাহিত্য সংগ্রহ- গবেষণা এমনকি নাট্যভুবনেও কবির স্বচ্ছন্দ পদচারণা পরিলক্ষিত হয়। নাট্যক্ষেত্রে কবির লেখনী থেকে এসেছে সাতটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়াও চারটি একাঙ্কিকা- 'বদল বাঁশী, 'করিমখাঁর বাড়ি', 'গাজন চরের কাইজা' এবং 'জীবনের পণ্য'। 'বদল বাঁশী' একাঙ্কিকার প্রধান চরিত্র বড়ু- বছিরের অচরিতার্থ প্রেম বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয় অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বেই। এই একাঙ্কিকায় নারী- পুরুষ বিশেষে প্রেম- ভালোবাসার অনুভূতির তীব্রতা ও স্থায়িত্বকাল যে ভিন্ন হয় মানব চরিত্রের সেই গহীন তলদেশে যেমন আলো ফেলেছেন নাট্যকার, তেমনি সমাজের বিধিনিষেধ মেনে প্রেমহীন দাম্পত্যের দীর্ঘস্থায়ী অভিনয় প্রসঙ্গও উত্থিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের বৃহত্তর পরিসরের পরিচয় প্রদানে হজ্জ ও মানবিকতাকে সমান রূপে তুলে ধরে নাট্যকার মানবিক ধর্মপ্রাণতা এবং ধর্মান্ধতাকে পরস্পরের মুখোমুখি করেছেন 'করিমখাঁর বাড়ি' একাঙ্কিকায়। 'জীবনের পণ্য' একাঙ্কিকায় মজুদদারদের বাণিজ্যের শিকার নিম্নবিত্ত আজিজের সন্তান অসুস্থ খোকার ঔষধ- পথ্য- চিকিৎসাহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণের মাধ্যমে মানবতার মৃত্যুকে দেখিয়েছেন। 'গাজন চরের কাইজা' একাঙ্কিকায় স্বপ্নবাজ রূপাই স্বপ্নভঙ্গের উপক্রমে টিকে থাকার শেষ চেষ্টায় রক্তপিপাসু যোদ্ধায় পরিণত হয়। কবির একাঙ্কিকাগুলোয় সরল ঘটনাবর্ত ও সাধারণ চরিত্রের একত্রাবস্থানেও জীবনবোধের এক সহজ কিন্তু বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হয়, জীবনবোধের সেই স্বরূপ অন্বেষণই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়।*

সূচক/ মূলশব্দ : *প্রেম- বিচ্ছেদ, সমাজ, নারীত্ব, ধর্ম, বাণিজ্য, স্বপ্নময়তা।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র ধারার সৃষ্টি আর নজরুলের কবিতার বিদ্রোহ উন্মাদনায় যখন বুঁদ কাব্য অনুরাগীরা, তখন সাহিত্যাকাশে এক দল প্রথাবিরোধীর আবির্ভাব ঘটল। এঁরা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধাচারণ করে যুগচেতনায়, নব জীবনান্বেষণে, বৈচিত্র্যে সর্বোপরি বাস্তবতায় এক ভিন্ন ধারার কাব্যের স্বাদ দিল পাঠককে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল একান্তই নগর কেন্দ্রিক। এভাবেই যখন গ্রামের বৃহৎ জনগোষ্ঠী

বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছিল কাব্যের প্রকৃতি, তখন জসীম উদ্‌দীন গ্রাম বাঙলার জীবন আর মানব- মানবীর জটিলতাহীন সরল আত্ম নিবেদিত প্রেমকে করলেন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রানুরাগী এই কবির প্রতিভা শুধু কাব্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রসারিত হয়েছে নাট্য ক্ষেত্রেও। সাতটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাপার', 'পল্লী বধূ', 'গ্রামের মায়া', 'মধুমালা', 'ওগো 'পুষ্পধনু', 'বেদের মেয়ে', 'আসমান সিংহ' ছাড়াও একাঙ্কিকা 'বদল বাঁশী', 'করিম খাঁর বাড়ি', 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজা' নিয়ে সমৃদ্ধ কবির পরিণত বয়সের নাট্য সাহিত্য সম্ভার। জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের বিচিত্র দিক অন্বেষণ পাঠক- গবেষকদের পাঠ ও গবেষণার বিষয় হিসেবে যতটা আগ্রহের কেন্দ্রভূমিতে, তাঁর নাটক নিয়ে উৎসাহের খামতি যেন ঠিক ততটাই। পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলো অবশ্য বেশ কিছুকাল যাবৎ লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানে পুনঃপুনঃ পঠিত ও বিশ্লেষিত হচ্ছে, কিন্তু প্রায় অচর্চিতই থেকে যাচ্ছে গ্রামের সরল মানব- মানবীর সহজ অথচ বিশেষভাবে জীবন দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ক্ষুদ্র একাঙ্কিকাগুলো। তাই জসীম উদ্‌দীনের সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চার একাঙ্কিকায় জীবনবোধের স্বরূপ অন্বেষণ এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। জসীম উদ্‌দীনের 'পল্লী বধূ' (প্রকাশ কাল- ১৯৫৬ সাল) নাট্যগ্রন্থে 'পল্লী বধূ' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সাথে সংযোজিত হয়েছে দুটি একাঙ্কিকা- 'বদল বাঁশী' এবং 'করিম খাঁর বাড়ি'। 'পল্লী বধূ' নাটকে নাট্যকার ছদন মোড়লের কোলকাতা ফেরত শিক্ষিত পুত্র আজিম এবং আলিম মাতব্বরের কন্যা হাসিনার প্রেম, বাধা ও পরিশেষে পরিণয়ের কাহিনি তুলে ধরেছেন গ্রামীণ আবহে। 'বদল বাঁশী' একাঙ্কিকায়ও প্রেমই প্রধান উপজীব্য কিন্তু এর পরিণতি মিলনান্তক নয় বরং বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয় ষোড়শী বড়ু আর যুবক বছিরের অচরিতার্থ প্রেম, পরিণত ভালোবাসা।

'বদল বাঁশী'র প্রধান চরিত্র বড়ু, পনেরো- ষোলো বছর বয়সী কিশোরী কন্যা। ক্ষেতে খামারে কাজ করা অল্প বয়সী, উদ্দাম, স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর মুখশ্রী বিশিষ্ট বছির, বেশ কিছুদিন থেকে বড়ুর প্রতি নিজের ভেতরে অন্য ধরনের এক অনুভূতি অনুভব করে । নানা আয়োজনে প্রেয়সী খুশি করতে সদা তৎপর বছির জনশূন্য নদীর ঘাটে শেষ পর্যন্ত নিজের মনের কথা প্রকাশ করে বড়ুর কাছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে বড়ু ভালোবাসা গ্রহণে নিজের অসামর্থ্যতা প্রকাশ করে। পরবর্তী দিন বড়ুর মা'র কাছ থেকে রাত পোহালেই বড়ুর বিয়ে এ সংবাদ জানতে পেরে বিচ্ছেদ কাতর হয়ে ওঠে বছির। সেই রাতেই বছিরের বিচ্ছেদী গান আর বাঁশির করুণ সুরের টানে বড়ু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হয় বছিরের। বড়ু বিহীন নিজের নিঃসঙ্গ জীবন কেমন করে

কাটবে এই কথা ভেবে দুঃখে অস্থির বছিরের সামনে সরল ভাষায় নিজের দুঃসহ ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরে বড়ু। যাবার কালে শেষবারের মত বছিরের কাছে আবার তার বাঁশীটি প্রার্থনা করে বড়ু, যাতে এই বাঁশী বুকের সাথে চেপে সে সকল দুঃখ সহ্য করতে পারে।

'বদল বাঁশী' একাঙ্কিকায় বড়ু- বছিরের প্রেমপর্ব প্রেমিকের অস্থিরতা, প্রেমিকার কৌতুক ও সই- বন্ধুদের স্বভাবসুলভ কথা- হাস্য চাঞ্চল্যে খানিকটা দীর্ঘায়িত। আশৈশব একে অপরের পরিচিত হওয়ায় চিরচেনা গণ্ডি, সামাজিক সম্পর্ক ও লজ্জা প্রাথমিক বাধা হয়ে দাঁড়ায় একে অপরের প্রতি লালন করা ভালোবাসা প্রকাশে । অবশ্য এই বাধা পেড়োনোর প্রয়াস ও বড়ুর সাক্ষাৎ লাভের লোভে প্রতিদিন একই কারণ দেখিয়ে বছির বড়ুর বাড়ি প্রবেশ করে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য বার বার অসম্পূর্ণই থেকে যায়। দেখা যায় প্রেম প্রকাশের মত গুরুগম্ভীর বিষয় মুহূর্তেই আড়াল হয়ে যায় সরল জীবনের হাস্যরস পূর্ণ সহজ ভাব দ্বারা। এমনকি 'বদল বাঁশী' একাঙ্কিকায় বছিরের প্রতিনিয়ত আসার প্রকৃত কারণ যে মানুষটা, সেই বড়ু বছিরকে কৌতুকের গলায় বলতে ছাড়ে না:

> 'বড়ু : বলি বছিরবাই? এই পথদ্যা যাইত রোজই যে তুমার উক্কার আগুন নিব্যা যায়?'[১]

আবার বছির যখন প্রেমিকের অন্তরঙ্গ আদর সম্ভাষণে কিছু বলতে উদ্দ্যত হয়, বড়ু বাড়িতে মায়ের উপস্থিতির মিথ্যা কথা চট করে জানিয়ে মুহূর্তেই অপ্রস্তুত করে দেয় বছিরকে। অবশ্য বছিরও এক্ষেত্রে কম যায় না। বড়ুর সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে পানি আনতে যাওয়া নিশ্চিত করতে নিমিষে শেষ করে ফেলে এক কলস পানি। আবার বিবাহিত বন্ধু ছদনের বছিরকে মনের কথা বলতে উৎসাহ দেয়া কিংবা শিখিয়ে দেয়া কথাতেও হাস্যরসের ছোঁয়া পাওয়া যেমন পাওয়া যায় তেমনি সই সকিনার ইঙ্গিতপূর্ণ কথার মাঝেও সরল রসিক মনের পরিচয় লভ্য।

'বদল বাঁশী' একাঙ্কিকায় বড়ু- বছিরের প্রেমকে নাট্যকার প্রকৃতির সমান্তরালে আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতির সন্তান এই দুই মানব- মানবী নিজেদের সুপ্ত মনের ভাব বিনিময় করে প্রকৃতির অবারিত দানের দ্বারাই। বড়ুর কথামতো বছিরের দুর্লভ জিনিস জোগাড় কিংবা বড়ুর প্রতি প্রেম প্রকাশের উপায় হিসেবে বছিরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সাজের সরঞ্জাম সংগ্রহ কিংবা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সাধারণ উপকরণে বড়ুর জন্য গহনা প্রস্তুতকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন দু'জনের প্রকৃতির মত সহজ প্রেমের মতই সারল্যের সাথে। প্রকৃতি যেমন মানুষের ভালোবাসার মূল্য দেয় নিজেকে উজাড়

করে তার ভালোবাসার সম্ভার সাজিয়ে, তেমনি ভালোবাসা মেশানো দুষ্প্রাপ্য উপহার প্রাপ্তির খুশিতে বড়ুর প্রবল উচ্ছ্বাসিত হওয়ার মাঝেই বছির তার আনন্দ খুঁজে পায়।

'বছির: তোর জন্যি গহন জঙ্গল ত্যা কাউয়ার ঠুঁটি আনছি, পাকা দেইখ্যা ডুমকুর আনছি।

বড়ু: ডুমকুর আনছাও বছিরবাই? দ্যাও আমার আঁচলে ডাইল্যা দাও। আইজকে ডুমকুরির মালা গাঁইথ্যা গলায় পরব।'[২]

আবার নদীর ঘাটের নির্জন বটের মূলের খোড়লে বছিরের লুকিয়ে রাখা প্রাকৃতিক অলঙ্কার উচ্ছ্বাসের সাথে বড়ু নিজ অঙ্গের আভরণ করে নিয়ে মুখোমুখি হয় বছিরের। এ পর্যায়ে আর মুগ্ধ বছির নিজেকে নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারে না, প্রকাশ করে বড়ুকে ঘিরে তার সমস্ত স্বপ্নের কথা। অপরপক্ষে এতদিন প্রেমে পড়ে অস্থির হয়ে বছিরের ঘটানো নানা ঘটনাকে কৌতুকের সাথে উড়িয়ে দেয়া ছিল ছিল কিশোরী বড়ুর নিত্যদিনের আমোদের অংশ। কিন্তু এই নির্জন প্রকৃতিতে বছিরের উপহারের প্রাকৃতিক নানারূপ গহনা পরিহিত অবস্থায়, তাকে নিজের করে পাবার আকুলতার কথা শুনে প্রেমের গভীরতা যেন প্রথমবারের মত উপলব্ধি করে কিশোরী বড়ু। বছিরের সত্য প্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় বড়ু তাই কান্নার সাথে নিজের অপারগতার বাস্তবতা তুলে ধরে ছুটে পালিয়ে যায়। বছিরের প্রেম নিবেদন আর বড়ুর প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি নাট্যকার নাটকে এরূপে ব্যক্ত করেছেন:

'বছির: জলের ঘাটে হইল দেখা তোমার সনে আমার সনে,
হলুদ বরণী মেয়ে তুমি হবে আমার বিয়ের কনে।
কলমী ফুলের নোলক দিব হিজল ফুলের দিব মালা,
মাঠের বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব গাঁয়ের বালা।...

বড়ু: আমি তো অবলা নারীরে বন্ধু পরের অধীন ঘর,
অভাগীরে কেন দিলা বন্ধু তোমার অন্তর।'[৩]

এখানে উল্লেখ্য বছিরের বড়ুকে নিজের করে পাবার বাসনার মাঝে উচ্চাভিলাসী কোন উপহারের প্রলোভন নেই। বরং আছে সহজলভ্য প্রাকৃতিক সরঞ্জামে বড়ুকে সাজানো আর বাঁশীর সুরে মাঠে শান্তি জাগানিয়া ঘুম এনে দেওয়ার প্রাকৃতিক উপহারের প্রতিশ্রুতি। বছির জটিল প্রেমের দুর্বার আকাঙ্খায় উচ্চাকাঙ্খী হয়ে বড়ুকে কামনা করে না বরং পূর্ণ বিপরীত ভাবে নিজের ঘরের মানুষটি হওয়ার সহজ বাস্তব প্রস্তাব দিয়ে প্রকৃতির মত প্রেমে একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে।

আবার বড়ুর সাথে বিচ্ছেদ যখন নিশ্চিত তখন বছির তার নিঃসঙ্গতার সমান্তরালে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের একাকিত্বকে এক করে তুলে ধরে বলে:

'বছির :আইজ যখন খ্যাতের কাম করতি দুধালী লতা পায়ে জড়ায়া যাবি, তহন তাই দিয়া বাঁকখাড়ু গড়ায়া কার গায়ে পরামু আমি? গহন জঙ্গলের ফলটি আইন্যা কার আতে দিব? কারে হুনাইবার জন্যি নিশীরাইত জাইগ্যা বাঁশী বাজাব? ... গাঙের গাটে চিরজনমের মত তুই আর আসপিন্যা।...'[৪]

অপরদিকে বছিরের ভালোবাসার গভীরতা অনুভব করা বড়ু, সমাজের বিধি নিষেধাবদ্ধ হয়ে যেন এক নিমিষেই কিছুর তোয়াক্কা না করা হাস্যরস সম্পন্ন কিশোরী থেকে যৌবনে পদার্পণ করা নারীতে পরিণত হয়। বছিরের ভালোবাসার আহ্বানে বড়ুর অসম্মতি সূচক প্রস্থানের পূর্বে, বছিরের ভালোবাসা তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে এমন কোন মনোভাবের প্রকাশ নাট্যকার দেখান নি। এর কারণ পূর্বের বড়ু আর নদীর ঘাটে বছিরের ভালোবাসা অনুভব করা বড়ু শারীরিক অবয়বে এক মানবী হলেও, দু'য়ের মাঝের মানসিক বয়সের পার্থক্য কৈশর আর যৌবনের। তাই কৈশরে যা ছিল একান্ত আমোদের বিষয় বড়ুর কাছে, যৌবনে সেই ঘটনারই স্পষ্ট প্রকাশ ও অনুভবে অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে সে। অপরপক্ষে বড়ুর স্পষ্ট অথচ আচমকা এই পরিবর্তনের মর্মোদ্ধার করা সরল বছিরের পক্ষে অসম্ভব বলেই প্রতিপন্ন হয়। বড়ুর মায়ের কথায় আগামীকাল বড়ুর বিয়ে এই তথ্য জানার মাধ্যমেই বড়ুর অপারগতার আসল কারণ স্পষ্ট হয় বছিরের কাছে। এ পর্যায়ে বড়ুকে বছিরের কষ্ট অনুভবে সমব্যথী হয়ে উঠতে দেখা যায়, বছিরের প্রস্থান লক্ষ্য করে তার পিপাসা মিটিয়ে যাবার জন্য মরিয়া হয়ে ডেকে উঠে সে। বড়ু- বছিরের বিচ্ছেদের মুখে প্রেম- অসহায়ত্বের কষ্টের বিপরীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে আসন্ন সুখের ইঙ্গিত সম্পন্ন গাঁয়ের মেয়েদের গীত যেন বছির- বড়ুর ভালোবাসা আর সংসারের বাস্তবতার ফারাকের এক সমান্তরাল রেখাচিত্র এঁকে দেয়। অপরদিকে প্রেমপর্বে বড়ুর নদীর ঘাটে যাওয়ার পিছনে বছিরের আহ্বান ছিল প্রধান কারণ কিন্তু বিবাহ পূর্ব রাতে সমাজের ভয় না করে বছিরের বিচ্ছেদের গান আর করুণ বাঁশীর সুরে ঘর থেকে বের হয়ে প্রেমিকের মুখোমুখি হওয়ার সাহস অর্জনের কৃতিত্ব বড়ুর নিজের। প্রথমত এই বড়ু নিজেকে ভুলে বছিরের ভবিষ্যৎ জীবন ভাবনায় বাস্তববাদী হয়ে উঠে- কিন্তু পরমুহূর্তেই পরিবার- সমাজের রীতিতে আবদ্ধ বড়ু নিজের অসহায়ত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ করে এরূপে:

'বড়ু: ... পরাধীনা নারী আমি। বুক ফাটেত মুখ ফোটে না। ...'[৫]

বড়ু- বছিরের বহু প্রার্থিত প্রেম অচরিতার্থই থেকে যায় বাস্তবতার কঠোরতায় কিন্তু নাট্যকার অসম্পূর্ণ প্রেমে শরবিদ্ধ নারী- পুরুষের বিচ্ছেদকে দুই ভিন্ন মানসিক বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন এই একাঙ্কিকায়। পুরুষ প্রেমে পড়ে- ভালোবাসে কিন্তু সময়ের প্রবাহে বাস্তবতার কঠোরতায় তার প্রেমের ফানুশ এক সময় ভূমিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়। অসম্পূর্ণ প্রেমের বেদনার ক্ষতও একসময় ভুলিয়ে দেয় ব্যস্ততার রূঢ় বাস্তবতা। কিন্তু নারীর প্রেম তার মুখে যেমন অস্ফুট থাকে, অন্তরে তেমনি থাকে অক্ষত। সামাজিক বাস্তবতা নারীকে বাধ্য করে বিয়ে নামক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষটির সাথে সুখের অভিনয়ের মাধ্যমে অন্তরকে গোপন রেখে জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু সামাজিকতার বন্ধন আর প্রেমে দ্বিধাবিভক্ত হয় না তার অন্তঃর্জগত, যাকে প্রথমবারের মত হৃদয় সমর্পণ করা হয়েছে নীরবে অন্তর তার জন্যই কাঁদে সারা জীবন। নারী তার এক জীবন দুই বিপরীত অনুভূতির সমান্তরাল প্রবাহে কাটিয়ে দেয়। শেষবারের মত প্রেমিকের মুখোমুখি বড়ু পুরুষের বাস্তবতার বিপরীতে নারীর অপূর্ণ প্রেম আর দুঃসহ দাম্পত্যের বাস্তব ছবি অবলীলায় বছিরের সামনে তুলে ধরে:

বড়ু : ...তোমরা পুরুষ মানুষ, কত দ্যাশে যাবা, কত লোকের সঙ্গে কথা কইবা। দিনে দিনে আমারে বুইল্যা যাবা। ...কিন্তু আমি অভাগিনীর দিন কি বাবে কাটব একবার ভাইব্যা দেখছ? একজনারে পরাণ দিয়া আরেক জনের সঙ্গে গর করতে ঐব। যে পরাণ তোমারে জনমের মত সইপ্যা দিছিলাম সেই পরান অন্যেরে দিতি ঐব। বুকের মদ্দি কান্না চাপায়া অন্যের সঙ্গে হাসি- রঙ্গ করতি ঐব।...’[৬]

‘বদল বাঁশী’ একাঙ্কিকায় নাট্যকার সামাজিকতার নামে সমাজের নির্দয়তার ছবিও এঁকেছেন। পরিবার- সমাজের নিশ্চিন্ততা কন্যার বিবাহে, তাই বিবাহের পূর্বকালে চলে কন্যার মঙ্গল উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানা আচার- মাঙ্গলিক আয়োজনের। কিন্তু যার মঙ্গল কামনায় এত আয়োজন, কেউ সেই মানুষটির ভাললাগা- মন্দলাগার ভ্রুক্ষেপ করে না। যেন বিবাহের মাধ্যমে কন্যাটির হৃদয় সমর্পণের ব্যাপারটি এখানে তুচ্ছ, মুখ্য বিবাহ নামক অন্ধ সামাজিক বন্ধন তথা নিশ্চয়তার ব্যাপারটি। সমাজের এহেন আচরণে ব্যথাতুর অন্তরে বড়ু তাই বছিরকে বলে:

‘বড়ু: ...আজকে আমাগো বাড়িতে যায়া দেখ গিয়া। কত আসি- তামাসা, কত আমোদ। কিন্তু যারে লয়া এতো, কেউ কি একবার নিরিখ কইরা দেখল কেমন কইরা তার অন্তর ঝুইরা ঝুইরা কানত্যাছে।...’[৭]

বিয়ে বাড়ির চাকচিক্য আর হাসি তামাসার বিপরীতে বিয়ের কন্যার মনের গহীন বিষাদও এই সংলাপে ফুটে উঠেছে। নিশিরাতের এই শেষ দেখাতেই প্রথমবার বছির জানে মনে মনে বড়ুও ভালোবাসত তাকে কিন্তু তা নিজের মনের মাঝেই সযত্নে গোপন করে রেখেছিল সে। কারণ, নারী জন্মের কারণে কৈশর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বড়ু জেনে গিয়েছিল, তার পছন্দ- অপছন্দের কোন মূল্য এই সমাজ সংসার দেবে না। তাই প্রেমিককে প্রথমবার ভালোবাসার কথা জানানোই শেষবার বলায় পরিণত হয়েছে কারণ- বড়ু জানে বিবাহ অন্তে এক নিষ্করুণ দাম্পত্য অভিনয় জীবন টেনে নিতে হবে তাকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠে বড়ু সবকিছুকে পিছনে ঠেলে। নশ্বর এই নিষ্ঠুর মানব জীবন কোনোক্রমে পার করে পরকালে নিজেদের মিলন হবে এই আশা প্রকাশ করে নিজেকে আর বছিরের মনকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করে বড়ু। কিন্তু পরক্ষণেই বছিরকে অস্বাভাবিক জীবন থেকে মুক্তিদান আর নিজের কষ্ট সওয়ার সাথী করার জন্য বছিরের বাঁশীটি ভালোবাসার দাবীতে প্রার্থনা করে।

এই একাঙ্কিকায় নাট্যকার হাস্যরসের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অন্তঃবেদনা, প্রেম- বিচ্ছেদ, মানব- মানবীর প্রেমের তীব্রতা- স্থায়িত্বের ভিন্নতার বাস্তবতা, সমাজের নিয়মের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি তুলে ধরে স্বল্প আয়োজনের মাধ্যমে পূর্ণ জীবনের এক গভীরতম ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বলা যায়, গ্রামের দুই মানব- মানবী বড়ু- বছিরের প্রেম বিচ্ছেদই ‘বদল বাঁশী’ নাটকের মূল বিষযবস্তু হলেও জীবনের সারল্যে আর ভাব প্রকাশের বিশেষ কিন্তু সহজ ভঙ্গিমায় সর্বোপরি জীবন ভাবনায় এই একাঙ্কিকা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

‘পল্লী বধূ’ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে আরো একটি অতি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা ‘করিম খাঁর বাড়ি’। সমালোচকদের কেউ কেউ একে নাটক না বলে ‘জীবনদৃশ্যের ক্ষুদ্র নাট্যরূপ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই একাঙ্কিকার কাহিনি তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গিয়েছে- মৌলবী, মাতবর এবং মেয়ে। পরহেজগার মাতবর সাহেব তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দ্বারা হজ্জ্ব পালন করতে রওনা হবেন, যাবার আগে তাঁর সাথে শেষ দেখা করতে এসেছেন মৌলবী সাহেব। একপর্যায়ে মাতবর সাহেবের প্রতিবেশী করিম খাঁ’র মেয়ে আসে হাতে পাঁচটি টাকা নিয়ে- জানা যায় গতকাল অগ্নিকাণ্ডে তাদের বাড়ি পুড়ে গেছে, বাবা করিম খাঁ মারা গেছেন, বেঁচে আছে মা আর শিশু ভাই সহ সে। এরমধ্যেও মেয়েটির মা তাঁর শেষ সম্বল এই পাঁচটি টাকা মাতবর সাহেবের কাছে

পাঠিয়েছে আল্লার ঘরে মোমবাতি জ্বালানোর জন্য আর অনুনয় করেছে রসুলের রওজায় মৃত স্বামীর জন্য যেন দোয়া করা হয়। মেয়েটি নিজ থেকে আরো একটি প্রশ্ন যোগ করে মাতবর সাহেবের কাছে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার জন্য- কোন অপরাধে তাদের এত দুঃখ দিচ্ছেন তিনি? মাতবর সাহেব শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন- মক্কায় তিনি যাবেন না। মৌলবী সাহেব মাতবর সাহেবের বয়স- অর্থ যোগাড়ের অসম্ভাব্যতা তুলে ধরে, করিম খাঁর পরিবারকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে হজ্বে যেতে বলেন। মাতবর সাহেব মেয়েটিকে প্রতিশ্রুতি দেন- হজ্বের জন্য সঞ্চিত টাকা দিয়ে তিনি গড়বেন করিম খাঁর বাড়ি আর মেয়েটিকে পিতার আদরে বড় করবেন। এবারের হজ্বের নামাজ করিম খাঁর বাড়িতেই পড়বেন তিনি! গবেষকের ভাষায়:

> '...এতে লোকজীবনে উত্থিত অনতিলক্ষ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গেরই যেন একটি ছবি ধরা পড়েছে। একটি মহৎ জীবন ভাবনার অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত বলেই এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ...ক্ষুদ্রপরিসরে স্বল্পাক্ষরে গ্রাম্য মাতব্বর, মৌলবী সাহেব ও করিম খাঁর মেয়ে এই তিনটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন জসীম উদ্‌দীন সহজ নৈপুণ্যে; মূর্ত করে তুলেছেন একটি গ্রাম্য আবহ।'[৮]

নাটকের ভাব বিচারে মাতবর সাহেব সত্যিকার ধর্মপ্রাণ মানব রূপে আবির্ভূত এই একাঙ্কিকায়- যিনি ধর্মের প্রকৃত অর্থ মানবতাকে অন্তরে ধারণ করেন। একাঙ্কিকায় মদীনার বাদশাহ খলিফা ওমরের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা অনুধাবন করে নিজেকে ইসলাম তথা প্রজার সেবকের ভূমিকায় রেখে জীর্ণ শীর্ণ বসন ভূষণের মাধ্যমে জীবন যাপনের কথা সগৌরবে তুলে ধরার মাধ্যমেই মাতবর চরিত্রের মূল ভাব সামনে এনেছেন নাট্যকার। মাতবর সাহেব শুধু কথার মাহাত্মেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, তিনি ধর্মের মূল বার্তার প্রয়োগ ঘটাতেও তৎপর। অপরদিকে মৌলবী সাহেব তথাকথিত পরহেজগার, ধর্মকে মানুষের সুখ- দুঃখের বাইরে রাখার পক্ষপাতী। তাঁর ধারণা ধর্মের নিয়ম বা শর্তের পূর্ণতার মাধ্যমেই মানবের স্ব স্ব পূণ্য অর্জিত হবে। দুঃখ ভারাক্রান্তকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহপাক তো রয়েছেনই। ধর্মে মানবতার প্রসঙ্গ- মানব জীবন পরিসরে তার চর্চা এবং ধর্মান্ধতা মাতবর ও মৌলবী চরিত্রের মাধ্যমে সরলভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার তাঁর এই একাঙ্কিকায়। অপরদিকে শোকার্ত মেয়েটি এবং তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে ধর্মপ্রাণ দুই মানবের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত মানবতার বাস্তব পরীক্ষা স্বরূপ সামনে এনেছেন নাট্যকার। পরিশেষে জয় হয় মানবতার ধর্মের, পরাভূত হয় ধর্মান্ধতা। অন্যদিক বিবেচনায়, বর্তমান বৈশ্বিক তথা

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মকে মানবতার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার যে অন্ধ অমানবিক প্রক্রিয়া চলমান তার বিপরীতেও এই একাঙ্কিকায় এক মূল্যবান বার্তা মিলে।

জসীম উদদীনের তৃতীয় একাঙ্কিকা 'জীবনের পণ্য' ও 'গাজন চরের কাইজা' 'ওগো পুষ্পধনু' (প্রকাশ কাল- ১৯৬৮ সাল) গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। 'জীবনের পণ্য' একাঙ্কিকার কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আজিজ, খোকা, মা, ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম এবং ডাক্তারকে কেন্দ্র করে। অসুস্থ খোকার চিকিৎসকের ভিজিট আর পথ্য বার্লি জোগাড়ের জন্য চিন্তিত আজিজ খোকার নানীর দেয়া শেষ চিহ্ন সোনার কবচটি নিয়ে বের হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত খোকা অস্থির হয়ে পড়ে ঔষধ আর খাবারের অভাবে। এদিকে ডাক্তারের চেম্বারে ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম আর ডাক্তারের কথোপকথনে বোঝা যায় সরকারের নিয়মের তোয়াক্কা না করেই তারা দুর্যোগের দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিশু খাদ্য আর ঔষধ গুদামজাত করে রেখেছে বেশী দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে। এরমাঝেই আজিজ এসে ঔষধ আর বার্লি চায় ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ডাক্তার উচ্চমূল্য ছাড়া কোনটাই আজিজকে দিতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত খাবারের অভাবে অসুস্থ খোকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। গবেষকের ভাষ্যমতে,

> '...তথাকথিত ভদ্র ও বিত্তবান সমাজের মানুষের হৃদয়হীনতার পটভূমিতে গ্রাম্য সরল, দরিদ্র মানুষের আর্ত অসহায়তার ছবিটিই ফুটে উঠেছে। রুগ্ণ ছেলের ঔষধ জোটাতে পারেনি দরিদ্র পিতা। তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ডাক্তারকে বাড়িতে আনার চেষ্টা পেয়েছে। তবু হৃদয়হীন ডাক্তার সময় মতো আসেনি। ফলে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি তার মারা গেল। এই মর্মান্তিক জীবনদৃশ্যের অভিনয় পল্লির ঘরে ঘরে কতই না চলেছে। জীবন এখানে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু অর্থমূল্যেই চলছে তার বেচাকেনা। এই নির্মম সমাজ সত্যটিই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।'[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের সমাজ বাস্তবতায় নাট্যকার ছোট অবসরে এই একাঙ্কিকার কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সমাজে স্পষ্ট শ্রেণি বিভাজন তৈরি করে, সৃষ্টি হয় উচ্চবিত্ত- নিম্নবিত্ত ছাড়াও আরেক শ্রেণির- মধ্যস্বত্ত্বভোগী। এই একাঙ্কিকায় মজুদদার ব্যবসায়ী শ্রেণিভুক্ত ডাক্তার এবং ঘনশ্যাম, নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি খোকা- মা- খোকার বাবা আজিজ। খাদ্য- পথ্য এবং ঔষধের অভাবে অসুস্থ খোকা মৃত্যু পথযাত্রী, বাবা আজিজ তাই শেষ স্মৃতিচিহ্ন খোকার

সোনার কবচ বিক্রি করে পথ্য এবং ডাক্তারের সন্ধানে বের হয়। ডাক্তার ব্যবসায়ী আর মজুদদার ঘনশ্যামের কথায় দেশের অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত মেলে:

'ঘনশ্যাম:

আরে- ফেইলে দেন ওসব আইন- টাইন। আইনও আছে- আবার লেকেন চোরা বাজারও আছে। পাঁচ হাজার মণ গম বাগেরহাটে মজুদ করে রেখেছিলুম, দেড় লাখ টাকা এসেছে- দিকে দেড়শ গাঁইট কাপড় গুদামজাত করে রেখেছি। দেখি কি হয়।...তা আপনার ওষুধের কারবার কেমন চলছে?

ডাক্তার:

তা এক প্রকার ভালই চলেছে- আমাদের চুনোপুটির কারবার- এবারে দশ হাজার টাকা এসেছে।'[১০]

এখানে ডাক্তার মজুদ করেছে রোগীর ঔষধ- পথ্য, আর ঘনশ্যাম মজুদ করেছে খাদ্যশস্য, কাপড়। এভাবে মজুদদাররা কম দামে পণ্য কিনে মজুদ করে দেশে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে। এই একাঙ্কিকায় দেখা যায় নিম্নবিত্ত উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য কিনতে অপারগ তাই মারা যাচ্ছে খাদ্যাভাবে আবার বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ঔষধের দাম বৃদ্ধি করায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, তাই নিম্নবিত্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একাঙ্কিকার অসুস্থ খোকা ও তার মা'র সাথের কথোপকথনে স্পষ্ট হয় সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা:

'খোকা:

আজিজ আর রহিম। আমারই মত বয়স তাদের। তারা না খেয়ে মরে গেছে। রমেশের কলেরা হল একটা ডাক্তারও দেখাতে পারল না। ওরা যে বড্ড গরীব মানুষ। তিন- চার দিন অসুখে ছটফট করে সে মারা গেছে।'[১১]

এই একাঙ্কিকায় খোকার বাবা আজিজ শেষ সম্বল বিক্রি করে ছয়টি টাকা জোগাড় করে মুখোমুখি হয় পথ্য আর ঔষধের মজুদদার ডাক্তারের। বাকী থাকা ফিস বাবদ দুই টাকা, পথ্য আর ঔষধ বাবদ আরো দু'টি করে টাকা দিয়ে খোকার জন্য এক টিন বার্লি প্রার্থনা করে। কিন্তু মুনাফা লোভী মজুদদার ডাক্তারের মনে আজিজের অসহায়ত্ব আর খোকার অসুস্থতার কথায় দয়ার উদ্রেক হয় না। বরং অমানবিক ডাক্তার আর ব্যবসায়ী দরিদ্রের অসহায়তার বিরক্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে স্থানত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে না:

'ডাক্তার:

দ্যাখো, তোমার ছেলের নিমোনিয়া হয়েছে, আমার কাছে একটা ভাল ঔষধ আছে, দাম ছ'টাকা।....

আজিজ:

ডাক্তার বাবু; আপনার পায়ে পড়ি। আমার জন্যে নয়, আমার ছেলেটার মুখ চেয়ে দয়া করুন। ...ডাক্তার বাবু- ছেলের হাতের একটি সোনার কবচ ছিল, তাই বেচে এই ছ'টি টাকা এনেছি। দু'টাকা আপনার ভিজিট দিলুম। আর দু'টাকা ওষুধের দাম- আর দু'টো টাকা দিচ্ছি- একটিন বার্লি আমাকে দিন। আজ ছেলেটিকে কোন পথ্য দিতে পারিনি।

ডাক্তার:

একটিন বার্লি দু'টাকার? হা- হা- হা- হা!...যাও! যাও! এখানে কিছু হবে না। এ কাকুতি মিনতির জায়গা নয়।

আজিজ:

ডাক্তার বাবু! আপনার ঘরেও তো কচি ছেলে- মেয়ে আছে। তাদের মুখ চেয়ে আমার খোকাকে দয়া করুন।

ডাক্তার:

আসুন ঘনশ্যাম বাবু। এখানে থাকলেই ও বকর বকর করবে। চলুন আপনার সঙ্গে যাই- ওপাড়ার জমিদার বাবুর মেয়েটাকে দেখে আসি। ...আসুন ঘনশ্যাম বাবু। তাড়াতাড়ি আসুন। এই বকর বকর আর ভাল লাগে না। বেটারা পয়সা দিতে পারে না, আর ওষুধ নিতে আসে।'[১২]

অর্থের লোভ যে মানুষকে কত নীচে নামিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঘনশ্যামের দয়া আর দানের প্রসঙ্গে। ঘনশ্যাম খাবার না খেয়ে মরা মানুষের তালিকা দীর্ঘ দেখেও দশ মন চাল অনায়াসে পুকুরে ফেলে দেয়, ঈশ্বর সৃষ্ট জীব আশীর্বাদ করবে বলে। কসাইদের হাত থেকেও গাভী কিনে তাদের জবাই হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে দয়া বলে অভিহিত করতে উদগ্রীব ঘনশ্যাম, যেখানে মানুষের কষ্ট কিংবা মৃত্যু তার মনে কোন অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয় না। উপরন্তু ঈশ্বরকে দেখানো দয়াকেও ব্যাবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে আদান প্রদানের হিসাবে যাচাই করে ঘনশ্যাম বলে উঠে: 'দয়া কি হামলোকের কম আছে? ভগবান বামজি যেমন দিবেন, হামলোক তেমন দয়া করবে।'[১৩] নাট্যকার সার্থকতার সাথেই এই দুই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে ব্যবসার নামে অমনুষত্বের বীজ স্থাপন করে জীবনকে তারা কিভাবে পণ্যে পরিণত করেছে তার

চিত্র তুলে ধরেছেন 'জীবনের পণ্য' একাঙ্কিকায়। সর্বোপরি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন চরিত্রগুলোর একটি বিশেষ দিক উন্মোচনের মাধ্যমে এই একাঙ্কিকায় জীবন সত্যের যে গভীর ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা নিশ্চিতভাবেই পাঠক- দর্শকের বোধকে নাড়া দিতে সক্ষম।

চতুর্থ একাঙ্কিকা 'গাজন চরের কাইজা' এর কাহিনি 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের চরের জমির ফসল কাটা সংক্রান্ত দাঙ্গার ঘটনাকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়েছে। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের নায়ক রূপাই 'গাজন চরের কাইজা' একাঙ্কিকারও প্রধান চরিত্র, এছাড়াও সাজু, বছির সহ বেশ কিছু চরিত্র এই নাটকে উপস্থিত। চার দৃশ্যের এই একাঙ্কিকায় প্রথম দৃশ্য একান্তই স্ফূর্তির- রূপাই এর ক্ষেত ভরা সোনার ফসল, সেই আনন্দে আত্মহারা রূপাইয়ের সাথে যোগ দেয় মামা বছির। প্রথম দৃশ্যের শেষ পর্যায়ে বছিরের কথায় জানা যায় বনগেয়োদের দৃষ্টি পড়েছে রূপাইয়ের ধান ভরা ক্ষেতের উপর। দ্বিতীয় দৃশ্যে বনগেঁয়োদের দেখা যায় রূপার ক্ষেতের ধান চুরি করে কাটতে। তৃতীয় দৃশ্য আবর্তিত হয়েছে রূপাই এর ক্ষেতের ফসল বনগেয়োরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে রূপাই সহ তার দলের চুরি ঠেকাতে প্রস্তুতি নেয়ার ঘটনাকে নিয়ে। চতুর্থ দৃশ্যে কাইজা শুরু হয় রূপাইয়ের দল আর বনগেয়োদের মাঝে, রূপাই বনগেয়োদের দলে ঢুকে পড়ে লড়াইয়ের মাধ্যমে অনেক কৃষককে আহত করে। পালিয়ে যায় বনগেয়োরা তাদের আহত সঙ্গীদের নিয়ে, রূপাই তখনও লাঠি ঘুরাচ্ছে যুদ্ধের বিধ্বংসী মনোভাব নিয়ে। পুলিশ আসার সংবাদ পেয়ে রূপাইয়ের দলের লোকজন তাকে টেনে নিয়ে যায়।

'গাজন চরের কাইজা' একাঙ্কিকা মূলত নাট্যকারের 'নকশি কাঁথার মাঠ' কাব্যের একাদশ অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার নাট্যাকারে বিস্তার। গবেষকের মতে এই একাঙ্কিকায়:
" 'গ্রাম্য কাইজ্যা' ঝগড়া- ফ্যাসাদের ভাষা দাঙ্গারত দুইপক্ষের মুখে অপূর্ব স্ফূর্তি লাভ করেছে। গ্রাম্য মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন, গ্রাম্য রসিকতা সব কিছু নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর একাঙ্কিকাটি লোকজীবনের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[১৪]

প্রকৃতত এই একাঙ্কিকায় কৃষকের ফসলকে ঘিরে স্বপ্নময়তা ও স্বপ্নভঙ্গের উপক্রমে বিধ্বংসী হয়ে ওঠার কাহিনি ক্ষুদ্র অবয়বে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাব্যের নায়ক রূপাইকে একাঙ্কিকায় পূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টান্বিত করার পরিসর ছিল না বিধায়, নাট্যকার অগ্রসর হয়েছেন এই চরিত্রের ভিন্ন দু'টি রূপ প্রকাশে। প্রথম রূপে আমরা রূপাই এর স্বপ্নময়তা, ভাবালুতা আর আমোদ প্রবণতার পরিচয় পাই। চরের

ক্ষেত ভরা সোনা রঙের ধান উচ্ছ্বাস জাগায় রূপাইয়ের মনে, তাই মামা বছিরকে সে আমোদের গলায় বলে:

'রূপাই:

...বদ্দর লোকগো কত বাকশ তোরঙ বরা সুনা রূপা। আমগো সুনা রূপা এই দান ক্ষ্যাত। চুপ কইরা হোন, মামু! দানের আগায় দানে ছড়া লাইগা ফিস ফিস কইরা কতা কইতাছে...।'[১৫]

ক্ষেত ভরা ফসলের আগাম সুখবার্তা প্রবল আনন্দ এনে দেয় রূপাইয়ের মনে, তাই মামা- ভাগ্নের চিরকালীন সম্পর্কের অম্ল মিষ্টি মধুরতাকে ঝালিয়ে নিতে অগ্রসর রূপাই খুশি গলায় বছিরকে বলে:

'রূপা:

আচ্ছা... আমার বা'জানের তুমি কি ঐতা?

বছির:

আরে তামাক-খোর, তা তুই জানস না?

রূপা:

মামু! আল্লার কসম মা'র কাছে শুনছি, তুমারে নাকি হে শালা বইলা ডাকত![১৬]

নানা আনন্দের পর যখন মামা বছিরের কাছে বনগাঁয়াদের দ্বারা ধান কেটে নেয়ার আশঙ্কার কথা শুনে, তখন বছির নিজ বীরত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে ভয়কে উড়িয়ে দেয়। তারপরও বছিরের মুখে পুনঃ পুনঃ একই কথা শুনে ধান কাটা উপলক্ষ্যে নানা আয়োজনের জন্য সময়ের প্রয়োজন এই কথা বলে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয় মামাকে। সত্যি যখন বনগাঁ'র লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় রূপাইয়ের ফসল ভর্তি ক্ষেত, তখন রূপাইয়ের দলনেতা সুলভ কথায় সবার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে:

'রূপাই:

থালা বাজাও- সরকি ঘোরাও সকলে মিলা। চল ভাইরা বনগাঁয়াগো খোঁজে। আইজ আমার দান কাইটা নিতি আইছে, কাইল তোমাগো দান কাইটা নিবি দান ঐল আমাগো বাঁইচা থাকনের পরমায়ু। এই দান কাটতি আইছে না আমাগো না খাওয়া মারতি আইছে।'[১৭]

এরপরের রূপাই স্বপ্নভঙ্গ তথা টিকে থাকার শেষ লড়াই এ মরিয়া যোদ্ধা রূপাই। কাইজায় যখন উভয়পক্ষের আক্রমণ- প্রত্যাক্রমন সমানে সমানে চলছিল, তখন বিরোধী দলের মাঝে কৌশলে ঢুকে গিয়ে রূপাই একাই পরাভূত করে প্রতিপক্ষের অনেককে।

রণকৌশলে অপরপক্ষকে হারিয়ে দিয়েও নিজের মধ্যের উত্তেজনা প্রশমিত করতে না পারা যোদ্ধা রূপাইকে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে টেনে নিয়ে যায় নিজপক্ষের লোকজন। সর্বোপরি এই একাঙ্কিকায়, এই আঙ্কিকের নাটকের মূল যে বৈশিষ্ট্য ' স্বল্প অবসরে নির্বাচিত ঘটনার নাটকীয় পরিণতি' তার শিথিলতায় একটিমাত্র চরিত্র রূপাইয়ের ফসলকে ঘিরে স্বপ্নময়তা, আমোদ প্রিয় মনোভাব, স্বপ্নভঙ্গের উপক্রমে শেষ রক্ষার চেষ্টা হিসেবে বিধ্বংসী হয়ে ওঠা যোদ্ধরূপই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও লোক সংস্কৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গ যেমন- নতুন ফসল ঘরে উঠার আনন্দে আগাম গান-নাচ, তালে তালে ফসল কাটার গান, কাইজা উপলক্ষ্যে শরীর বাঁধার গীত, কাইজার বোল প্রভৃতি তুলে ধরেছেন নাট্যকার গুরুত্বের সাথল

জসীম উদ্‌দীন মূলত কবি, তাঁর কাব্য প্রতিভার এমনই গুন যে মাতোয়ারা পাঠক আজও মুহূর্তেই শহুরে জীবনের বাস্তবতা ভুলে পল্লীর সারল্য পূর্ণ সহজ জীবনের স্পর্শ অনুভব করে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকে বিশেষ করে একাঙ্কিকার কাহিনি এবং চরিত্রায়ণেও নাট্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবলম্বন করেছেন ঘটনাময় আবহমান গ্রাম বাংলার চির পরিচিত ঘটনাগুলো ও পরিচিত পরিমণ্ডলের চরিত্রগুলোকেই। কিন্তু নাট্যকারের স্পর্শে তথা জীবনদর্শনে এই সাধারণ চরিত্রগুলোই বিশেষ হয়ে উঠেছে। তাঁর ‘বদল বাঁশী’ একাঙ্কিকায় যুবক বছির আর কিশোরী বড়ুর প্রেমের উদ্দামতা মুহূর্তেই বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয় সত্যি, কিন্তু তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়েও সামাজিকতার বেড়াজাল পার না হতে পারা দুই চরিত্র একে অপর থেকে আলাদা হয়েই যেন নিজেদের ভালোবাসাকে পূর্ণরূপে অর্জন করে। নাট্যকার মানুষের গোপন প্রদেশে আলো ফেলার দেখার প্রয়াস পেয়েছেন পুরুষ আর নারী হৃদয় বিশেষে প্রেমের অর্থ-স্থায়িত্বের ভিন্নতার রূপ, ভাবতে বাধ্য করেছেন সমাজিক নিয়ম মেনে করা বিবাহের দাম্পত্যে বিরাজমান অভিনয়ের দীর্ঘস্থায়ীত্ব সম্পর্কে। মানবতাকে হজ্জের সমতুল্য করে দেখিয়ে ধর্মের মহত্তর পরিসরকে যেমন ধর্মান্ধতার বিপরীতে তুলে ধরেছেন, তেমনি যুদ্ধোত্তর সমাজ বাস্তবতায় অমানবিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত শক্তি ও ক্ষমতার সাথে বিত্তহীনতা দ্বন্দ্বে পরাভূত নিম্নবিত্তকে তুলে ধরে বাণিজ্যের নামে মানবতার মৃত্যু দেখাতেও দ্বিধান্বিত হননি। আবার ক্ষুদ্র একটি ঘটনা ফসল চুরিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের কাজিয়া ও এক সাধারণ কৃষকের ফসলকে ঘিরে স্বপ্ন- স্বপ্নভঙ্গের উপক্রমে মরিয়া হয়ে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টাকে করেছেন একাঙ্কিকার বিষয়বস্তু। সর্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোর নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে চরিত্রগুলোকে বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়

করিয়ে, নাট্যকার একাঙ্কিকাগুলোকে এমন বিশেষ জীবনবোধে উদ্ভাসিত করেছেন, যা লেখনির সহজতায় সরল বলে পরিগণ্য হলেও বৃহৎতর জীবন ভাবনায় তা আকাশস্পর্শী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তথ্যসূত্র:

১. জসীম উদ্‌দীন, পল্লী বধূ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ আগস্ট ১৯৫৬, পৃ. ৫২
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৬৭
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ৬৭-৬৮
৭. তদেব, পৃ. ৬৮
৮. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্‌দীন, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৬
৯. তদেব, পৃ. ৪৬৮
১০. জসীম উদ্‌দীন, ওগো পুষ্পধনু , পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৫২
১১. তদেব, পৃ. ৬০
১২. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪
১৩. তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬
১৪. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, জসীম উদ্‌দীন, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৮
১৫. জসীম উদ্‌দীন, ওগো পুষ্পধনু , পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৭১
১৬. তদেব, পৃ. ৭২
১৭. তদেব, পৃ. ৮৪

যুদ্ধ ও শান্তির প্রেক্ষিতে মহাকবির মহাভারত (‘মহাভারতম্’) ও টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ – মানবধর্মের অনন্য দিগ্ বলয় : একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

অজয় কুমার দাস
বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর

।। এক।।

“.....that he would not make peace so long as a single armed Frenchman remained on Russian soil.” [১]

‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace, 1869) – উপন্যাসে যুদ্ধবাজ নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের এই খোলা চিঠি। টলস্টয় তাঁর উপন্যাসে বারবার প্রতিধ্বনিত করেছেন এই স্মরণীয় উক্তি – “...... the Emperor repeated to him the words that he would not make peace so long as a single armed enemy remained on Russian soil and told him the words to transmit those words to Napoleon.”[২] --- হ্যাঁ , সম্রাট আলেকজাণ্ডারের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা। নির্দেশ ছিল স্পষ্ট। যতদিন একটিও সশস্ত্র ফরাসী শত্রু-সৈন্য রাশিয়ার মাটিতে থাকবে, ততদিন সম্রাট কোনরকম সন্ধি করবে না। সম্রাটের কণ্ঠস্বর ছিল উত্তেজিত। উত্তেজিত এই কারণে, নেপোলিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা না করেই রাশিয়ার ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং সম্রাটের ঘোষণা একইভাবে ধ্বনিত হয়েছিল – “To enter Russia without declaring war! I will not make peace as long as a single armed enemy remains in my country”[৩]

আর মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারতে (মহাভারতম্) একনায়কের উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল অতীতের ভারতভূমিতে। পাণ্ডবদের যুদ্ধে হত্যা করে এই পৃথিবী শাসন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন দুর্যোধন। দুর্যোধনের সেই বহুখ্যাত উক্তি – তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগে যতটুকু স্থান বিদ্ধ করা যায়, ভূমির ততটুকু স্থানও আমি পাণ্ডবদের সমর্পণ করব না ---

"যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ!
তাবদপ্য পরিত্যাজ্যং ভূমেন পাণ্ডবান্ প্রতি।"(৪)

ব্যাসদেবের 'মহাভারতম্' এবং টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) - এই দুই গ্রন্থ শুধু যুদ্ধের বার্তাবাহক নয়, দুই গ্রন্থেই রয়েছে শান্তির উদ্যোগ। অবশেষে কৃষ্ণের সন্ধি ও শান্তি প্রচেষ্টার শেষ উদ্যোগ ও ব্যর্থ হয়েছে। সমস্ত উদ্যোগ দুর্যোধন প্রত্যাখান করেছেন। পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ তিনি ফিরিয়ে দেবেন না বলে জানিয়েছেন। পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি যা বলেছিলেন, কৃষ্ণকে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বলেছেন, তীক্ষ্ণসূচির অগ্রভাগে যতটা স্থান বিদ্ধ হয়, তাও তিনি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেবেন না।

"ন তদদ্য পুনর্লভ্যং পাণ্ডবৈর্বৃষ্ণিনন্দন।
ধ্রিয়মাণে মহাবাহৌ ময়ি সংপ্রতি কেশব।।
যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব !।
তাবদপ্যপরিত্যাজং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি" ।।(৫)

মহাভারতে 'উদ্‌যোগ পর্ব্বের' বিস্তৃত অংশ জুড়েই রয়েছে সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহতী উদ্যোগ। যুদ্ধ পিপাসু প্রতিহিংসা পরায়ণ দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র শান্তিস্থাপন করার উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, পুত্রদের শান্তিচিন্তায় তিনি নিদ্রাহীন ও সুখহীন হয়ে রয়েছেন। কৌরবদের ধ্বংস আসন্ন। সন্ধি ছাড়া কোনভাবেই কলহের পরিসমাপ্তি হবে না---

"অনিদ্রো নিঃসুখশ্চাস্মি কুরূণাং শমচিন্তয়া।
ক্ষয়োদয়োহয়ং সুমহান্ কুরূণাং প্রত্যুপস্থিতঃ।
অস্য চেৎ কলহস্যান্তঃ শমাদন্যো ন বিদ্যতে।।(৬)

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সন্ধি করতে বলেছিলেন। এবং বলেছেন, যুদ্ধে যুদ্ধরত দু'পক্ষের কেউই নিশ্চিতভাবে জয়ী হয় না—

"যুধ্যতোর্হি দ্বয়োর্যুদ্ধে নৈকান্তেন ভবেজ্জয়ঃ"(৭)

এমনকি ভীমও সন্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন, যে যে ভাবে কৌরবদের শান্তি হয়, তুমি সেভাবেই বলবে। যুদ্ধের ভয় দেখাতে না বলেছেন—

"যথা যথৈব শান্তিঃ স্যাৎ কুরূণাং মধুসূদন।
তথা তথৈব ভাষেথা মাস্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ।।"(৮)

অর্জুনও কৃষ্ণকে বলেছেন, যাতে উভয়পক্ষের মঙ্গল হয়, সেরকম কর্মে নিয়োজিত হতে। কেননা যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদন করলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়—

"সম্পাদ্যমানং সম্যক্ চ স্যাৎ কর্ম্ম সফলং প্রভো!
স তথা কৃষ্ণ! বর্ত্তস্ব যথা শর্ম্ম ভবেৎ পরৈঃ।।"(৯)

উদ্‌যোগপর্বে যুদ্ধের পক্ষে এবং যুদ্ধের বিপক্ষে উভয় মতই ছিল। সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদী যুদ্ধ করাকেই কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। অর্জুন উভয়পক্ষের মঙ্গল সম্পাদন এবং শান্তি স্থাপনকেই কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন।–

"পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং প্রতিপাদ্যমনাময়ম্
সমর্থঃ প্রশমঞ্চৈব কর্ত্তুমর্হসি কেশব!
ত্বমিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! দুর্যোধনমমর্ষণম্।
শান্ত্যর্থং ভ্রাতরং ব্রুয়া যুক্তবাক্যমমিত্রহন্।।"(১০)

মাতা-পিতা গুরুজন পরিজনের আদেশ-উপদেশ অনুরোধ প্রত্যাখান করে প্রস্থান করেছেন দুর্যোধন।

টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace)—সুবৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান বিষয় ১৮১২ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে রাশিয়ার সম্রাট জার আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধই এই উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নয়। পৃথিবীর মহৎ স্রষ্টাদের সৃষ্টির মতই এই উপন্যাসেও আছে সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব। আর পৃথিবীর সমস্ত একনায়কদের মতই নেপোলিয়নও শান্তি প্রস্তাবকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুগে যুগে কালে কালে সভ্যতার অভিশাপ হয়ে উঠেছেন একনায়কেরা। একনায়কেরা শান্তি প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেন। মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়ে ওঠে যুদ্ধ। সম্রাট নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারকে লিখেছেন তিনি যুদ্ধ চান না—তথাপি নেপোলিয়ন তার সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিতে যাত্রা করলেন। আর প্রতিটি ঘাঁটিতে আদেশ জারি করলেন, যাতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে সৈন্য চলাচল আরও বৃদ্ধি করা হয়। টলস্টয় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"Emperor Napoleon himself wrote a letter to Alexander, calling him monsieur mon frere, and sincerely assured him that he did not want war and would always love and honor him—yet he set off to join his army, and at every station gave fresh orders to accelerate the movement of his troops from west to east.

......At each of these towns thousands of people met him with excitement and enthusiasm. [১১]

পশ্চিম থেকে পুবে মানুষ এল অন্য মানুষদের হত্যা করতে। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় শুরু হল যুদ্ধ। যে যুদ্ধ মানুষের বুদ্ধি ও স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। টলস্টয় বলেছেন, নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রের দ্বারা সন্ধি স্থাপন—"The movement of troops into Prussia—undertaken (as it seemed to Napoleon) only for the purpose of securing an armed peace."[১২]

মহাভারতে দুর্যোধনের রাজলোভ, যুদ্ধোন্মত্ততা, প্রতিহিংসা এবং একনায়কসুলভ উদগ্রতা সন্ধির সমস্ত আবহকে নষ্ট করে ফেলেছিল। পরিণামে সংঘটিত হয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধ। অপরপক্ষে একের পর এক জয়ের স্বাদ পেতে পেতে নেপোলিয়ন হয়ে উঠেছিলেন স্বৈরাচারী একনায়ক। ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক শাসক, সাম্রাজ্যলোলুপ। রাশিয়ার ১৮১২ সালের যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব থাকে তাঁর। ইতিহাসের নিশ্চিত আত্মধ্বংস তাঁর অনিবার্য পরিণতি। টলস্টয় লিখেছেন, ফরাসী সম্রাটের যুদ্ধপ্রীতি ও যুদ্ধের অভ্যাসের মিল, যুদ্ধের জাঁকজমকের প্রলোভন, প্রভূত সম্মানের নেশা, অহংকার শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে তুলেছিল। টলস্টয় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"The French Emperor's love and habit of war coinciding with his people's inclinations, allurement by the grandeur of the preparations, ... the intoxicating honors he received in Dresden"[১৩]

দুর্যোধন এবং নেপোলিয়ন দু'জনেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, দু'জনেরই ছিল পররাজ্য বা পররাষ্ট্র দখলের লোভ। দু'জনেই ক্ষমতা পিপাসু, দু'জনেই বীর ও সাহসী। দু'জনেই তরবারি চিহ্নিত মুকুট পরতে ভালবাসেন। তাই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। টলস্টয় মনে করেন, যুদ্ধ মানব ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। বিশেষ ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনায় তথাকথিত মহাপুরুষ বা নায়করা ঘটনার নামকরণের প্রয়োজনীয় লেবেলমাত্র। আর লেবেলের মতোই ঘটনাটির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রটিও নামমাত্র। সুতরাং মহাভারতের যুদ্ধ একান্তই অলৌকিক বা নিয়তি নির্ধারিত নয়। ঘটনাক্রমের সঙ্গে যুক্ত সাম্রাজ্য অংশীকরণের প্রবণতা, ক্ষমতালিপ্সা ও লোভ। টলস্টয় লিখেছেন—'A king is history's slave.'[১৪] আর ১৮১২ সালের রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ মহাকালের অজস্র মানুষের কর্মধারার সঙ্গে মিলে মিশে ঐতিহাসিক তাৎপর্যলাভ করে। নেপোলিয়ন

ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদার যত উঁচু সিঁড়িতে অধিষ্ঠিত থাকে, যত বেশি মানুষের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকেন, অন্যের উপরে তার প্রভাব যত বেশি থাকে, ততই তার প্রতিটি কাজ হয়ে ওঠে অনিবার্য ও নির্দিষ্ট। ইতিহাসের যাত্রাপথে সম্রাট ঔরঙ্গজেব কিংবা নেপোলিয়ন উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হয়ে ওঠেন। পুরাণে আছে, গঙ্গার স্রোতধারাকে বাধা দিতে আসা ইন্দ্রের ঐরাবত গঙ্গার দুরন্ত জলধারার গতিতে ভেসে যায়। সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধ ইতিহাসের যাত্রাপথের সঙ্গে যুক্ত এবং পূর্বনির্দিষ্ট -

"Every act of theirs, which appears to them an act of their own will, is in an historical sense involuntary and is related to the whole course of history and predestined from eternity."[১৫] সুতরাং মহাকবি ব্যাসদেবের সৃষ্ট মহাভারত (মহাভারতম্) এবং টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) –এর যুদ্ধের মধ্যে দুই মহান স্রষ্টার মানবমনের ঐক্যই পরিলক্ষিত হয়। সব নদী যেমন এক মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনই মহান স্রষ্টার সৃষ্টিতে মানবমনস্তত্ত্ব ও মানবধর্মের সুমহান সুগভীর ঐক্য সূত্র প্রতিফলিত হয়।

।। দুই ।।

যুদ্ধ মানব ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ। মানবতার বিপরীতেই তার অবস্থান। আবহমান কাল থেকে মানুষ যুদ্ধের ভয়ানক রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ, ইলিয়াড-ওডিসির যুদ্ধ, স্পার্টাকাসের লড়াই, আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে দাসদের মুক্তির সংগ্রাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নেলসন মেণ্ডেলার নেতৃত্বে আফ্রিকার কালো মানুষদের লড়াই। এসব মানুষ দেখেছে। আবহমান মানবকেই বহন করতে হয়েছে যুদ্ধের ভার। আর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভীষিকা দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মানব জাতির ওপরে কখনো সখনো হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বাস। ইতিহাস দেখেছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একনায়কের উত্থানকে। ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উত্থান সমকালের ইউরোপীয় ইতিহাসের অনিবার্য ফলশ্রুতি। টলস্টয় তাঁর উপন্যাসে ১৮০৫-১৮১২ সালের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ পরাজয়ের বাস্তব চিত্রকে জায়গা দিয়েছেন। উপন্যাসে ঘটে যাওয়া ১৮০৫ সাল থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে প্রধান ঘটনাবলি যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

সময়কাল : ১৮০৫

ক) রাশিয়ার সেনাপতি কুতুজভ ১১ই অক্টোবর সেনাদল পরিদর্শন করলেন। খ) ২৩শে অক্টোবর এনস নদী অতিক্রম করল রুশ বাহিনী। গ) ২৪শে অক্টোবর আমস্তেতেনে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘ) ২৮শে অক্টোবর দানিয়ুব নদী অতিক্রম করল রুশ সেনাবাহিনী। ঙ) ৩০শে অক্টোবর যুদ্ধে দুরেন্স্তিন-এ মোতিয়ের পরাজিত হলেন। চ) সেনাপ্রধান মুরাৎকে ৪ঠা নভেম্বর নেপোলিয়ন চিঠি লিখলেন। ছ) অস্তারলিজের যুদ্ধ (Battle of Austerlitz) শুরু হল ২০শে অক্টোবর।

সময়কাল : ১৮০৭

ক) প্রুশিসক্র-আইলাউ - এর যুদ্ধ ২৭শে জানুয়ারী খ) ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধ শুরু হয়েছে ২রা জুন। গ) দুই সম্রাটের সাক্ষাৎকার হল ১৩ই জুন।

সময়কাল : ১৮১২

ক) নেপোলিয়ন যুদ্ধের জন্য ড্রেসডেন ত্যাগ করেছেন ২৯শে মে। খ) .২২শে জুন নিয়েমেন অতিক্রম করে রাশিয়ায় প্রবেশ করেছেন নেপোলিয়ন। গ) রাশিয়ার সম্রাট জার আলেকজাণ্ডার বলাশেভকে নেপোলিয়নের কাছে পাঠিয়েছেন ১৪ই জুন। ঘ) অস্ত্রভ্নাতে হুজারদের যুদ্ধ শুরু ১৩ জুলাই। ঙ) ৫ই আগস্ট স্মোলেনস্কের উপর গোলাগুলি বর্ষণ শুরু। চ) ৭ই আগষ্ট বল্ড হিলস ত্যাগ করে প্রিন্স নিকোলাস বলকন্স্কির বোগুচারভো যাত্রা। ছ) কুতুজভ রুশ বাহিনীর প্রধানও সেনাপতিপদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ৮ই আগস্ট। জ) ২৪শে আগস্ট শুরু হয়েছে শেভার্দিনো দুর্গের যুদ্ধ ঝ) ২৬শে আগস্ট বরদিনোর যুদ্ধ শুরু হল।

উপন্যাসে টলস্টয় কখনোই নেপোলিয়নের বিশেষ প্রতিভাকে স্বীকার করেন না। টলস্টয়ের কথায়, ইউরোপে সত্যিকারের কোন রাজনৈতিক সংকট নেই, সেই কোন সত্যিকারের যুদ্ধ, যা আছে তা এক রকমের পুতুল খেলা—"...... no political difficulties in Europe and no real war, but only a sort of puppet show at which the men of the day were playing, pretending to do somethings real."(১৬) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অলৌকিক কিছু করতে পারেন না, তিনি অতিমানব নন, আর সাধারণ পাঁচজন একনায়কের উত্থান যেভাবে ঘটে থাকে তিনিও তেমনি। উপন্যাসে কোন এক সাধারণ চরিত্রের মুখ থেকেই টলস্টয় পাঠককে শুনিয়েছেন—বোনাপার্ট মুখে রুপোর চামচ নিয়েই জন্মেছেন, চমৎকার সব সৈন্য সে হাতে পেয়েছে—Buonaparte was born with a silver spoon in his mouth. He has got splendid soldiers."(১৭) টলস্টয় নেপোলিয়নকে রাজ্যহরণকারী

মানবতার শত্রু নামেই চিহ্নিত করেছেন–'Usurper and Enemy of Mankind'[১৮] সেনা অভিযান এবং যুদ্ধজয়ের উল্লাসে একনায়ক নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক ভরপুর থাকত। ১৭৯৩ সালে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে বিজয় যাত্রার শুরু, তা শেষ হয়েছিল ১৮১২ সালে রাশিয়ার চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। একে একে অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়াকে ধ্বংস করেছিলেন নেপোলিয়ন। বিপন্ন নিরুপায় অস্ট্রিয়াকে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিলেন তিনি। অবশেষে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে কৌশলে সন্ধি প্রত্যাখ্যান করলেন। স্থির করলেন রাশিয়া আক্রমণ করবেন। রাশিয়া অভিযানে ছয় লক্ষ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল। একের পর এক জয়ের বিজয়গর্বে মসগুল নেপোলিয়ন দেশবাসীকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদে। যুদ্ধবাজ একনায়করা দেশপ্রেমকে হাতিয়ার করেছেন প্রাচীনকাল থেকে। বড় ভুল করেছিলেন নেপোলিয়ন। রাশিয়া আক্রমণ একনায়কের চুড়ান্ত ট্রাজেডির বড় কারণ। টলস্টয় ১৮১২ সালের এই অভিযানকে শিল্পীর তুলির টানে বিশ্বস্ত চিত্রকরের মত এঁকেছেন। পাতার পর পাতা 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) পড়তে পড়তে মনে হয়, লেখক প্রতিটি যুদ্ধের প্রতিদিন প্রতিক্ষণকে সচক্ষে দেখেছেন। যুদ্ধ লেখকের কাছে হয়ে উঠেছে বিশ্বস্ত চোখে দেখা মৃত্যু উপত্যকা। শিল্পীর শ্রেষ্ঠতার বিচারে এই ভুবনডাঙায় টলস্টয় অপরাজেয়। তিনি চিরহরিৎ বনস্পতি। সমাজচৈতন্যের এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ সন্ধানী তিনি। সমকালের বন্য হিংস্রতার সামনে তিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন মহিমান্বিত সাম্প্রতিক মানবপ্রেমিক। সৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরকালীন বটবৃক্ষ।

যুদ্ধে মৃত্যু স্তব্ধতার মধ্যে শুধু শোনা যায় অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। টলস্টয় লিখেছেন— "In the deathlike stillness only the tramp of horses was heard."[১৯] উপকথার মত সৈনিকের জীবন। প্রিন্স আন্দ্রু সৈনিক। সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্র কেমন? বাস্তব বর্ণনায় অন্তহীন টলস্টয় যুদ্ধক্ষেত্রের মর্মান্তিক দৃশ্য সংযোজন করেছেন উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। আহত সৈনিকের মাথা থেকে রক্ত পড়ছে; অন্য দুটি সৈনিক তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। তাঁর গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে, রক্ত বমি হচ্ছে তাঁর। গুলি লেগেছে গলায় ও মুখে। কোন সৈনিক চলেছে আর্তনাদ করতে করতে। সারা শরীরে রক্ত। মুখে ভয় আর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। পাহাড় বেয়ে উঠেছে অনেক কষ্টে শ্বাস নিতে নিতে। উপন্যাসে টলস্টয় লিখেছেন—'One with a bleeding head and no cap was being dragged along by two soldiers

who supported him under the arms. There was a gurgle in his throat and he was spitting blood. A bullet had evidently hit him in the throat or mouth. Another groaning aloud and swinging his arm which had just been hurt, while blood from it was streaming over his greatcoat as from a bottle." [২০] ফরাসী বাহিনীর একটার পর একটা গুলি, চারিদিকে ধোঁয়ার অন্ধকার, বন্দুকের আওয়াজ - এসব বর্ণনা উপন্যাসের পাতায় পাতায়। পাঠককে ডুবিয়ে দেয় গভীর বিষণ্ণতায়।

বর্ণনার পর বর্ণনা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য। টলস্টয় লিখেছেন, যুদ্ধরত সেনাদল ও শত্রুপক্ষের মাঝে আছে শুধু অনিশ্চয়তা ও ভয়ের এক ভয়ঙ্কর সীমারেখা—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমারেখার মতই দূরবর্তী। সেই সীমারেখা অদৃশ্য - 'Again, as at the Enns bridge, there was nothing between the squadron and the enemy, and again that terrible dividing line of uncertainly and fear—resembling the line separating the living from the dead-lay between them. All were conscious of this unseen line and the question whether they would cross it or not, and how they would cross it agitated them all."[২১] কখনো মৃত্যুভয়ে ভীত সৈন্যরা সব হুকুমকে উপেক্ষা করে ছুটেছে, কখনও আতঙ্কে পশ্চাদপসরণ করছে। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে মৃত্যুর পঙ্কিল নদী। আহতদের আর্তনাদ ও যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর। টলস্টয় লিখেছেন—"In the darkness, it seemed as though a gloomy unseen river was flowing always in one direction, humming with whispers and talk and the sound of boofs and wheels.[২২]

এক সৈনিকের মুখ থেকে শুনিয়েছেন টলস্টয়—কত মানুষ যে পঙ্গু হয়েছে, ভয়াবহ। বীভৎস আর্তনাদ—"What a lot of men have been crippled today—frightful."[২৩]

।। তিন ।।

মহাভারতের (মহাভারতম্) কৃষ্ণের সন্ধি প্রচেষ্টার মতই 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) গ্রন্থেও সন্ধির সহমত পোষণ করেছিলেন নেপোলিয়ন ও জার আলেকজাণ্ডার। কিন্তু তা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক এক নায়কের বক্র কৌশল। ১৮০৫ সালে ১৭ই নভেম্বর ভোরবেলা সন্ধির পতাকা নিয়ে একজন ফরাসী অফিসার রুশ সম্রাটের

সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। টলস্টয় লিখেছেন—“At daybreak on the seventeenth, a French officer who had come with a flag of truce, demanding an audience with the Russian Emperor, was brought into wischau from our outposts.”(২৪) কিন্তু সত্যসত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে নেপোলিয়ন ফরাসী অফিসারকে পাঠান নি। সামরিক শাসকের কুটিল চক্রান্তজাল মাকড়সার ফাঁদের মত স্বৈরশাসকের মস্তিষ্কে সুতোকাটা পোকার মত ঘুরঘুর করছিল। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি অস্তারলিজের স্মরণীয় যুদ্ধ। দেশে দেশে রাষ্ট্রনায়কেরা যুদ্ধকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার ঘুড়িতে মত লেজুড়ের যোগ করে দেন। সর্বকালের রাষ্ট্রনায়কদের এ হল চিরাচরিত পদ্ধতি। নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। জাতির সামনে এরা তুলে ধরেন দেশমাতৃকার সম্মান ও মর্যাদাবোধ। বিনিময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কি হতে পারে। রুশ সেনাপতি কুতুজভ বলেছেন, বেশি লোক তো বেঁচে নেই—‘There are not many left alive.’(২৫)

টলস্টয় লিখেছেন, সারা মাঠ জুড়ে প্রতি দু’একর জমিতে দশজন করে নিহত ও আহত সৈনিক পড়ে আছে। তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। একজন বোমা নিক্ষেপকারী মৃত রুশ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথা ও কালো ঘাড়টা মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace) উপন্যাস-এ উল্লিখিত আছে,--“All about the field, like heaps of manure on well-kept plowland, lay from ten to fifteen dead and wounded to each couple of acres. ..... ‘Fine men’! Remarked Napoleon, looking at a dead Russian grenadier, who, with his face buried in the ground and a blackened nape, lay on his stomach with an already stiffened arm flung wide. .....That’s a fine death! Said Napoleon.”(২৬) অস্তারলিজের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে গেলো। শুধু মৃত্যু নয়, মানুষের মানবিক সম্পর্ক-স্নেহ প্রীতি প্রেম ভালবাসা এগুলোও কেমন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। পরিবারের সদস্যদের শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠল। মৃত্যু সংবাদে পরিবারের পরিণতি মর্মান্তিক ও যন্ত্রণারিক্ত হয়ে উঠল। প্রিয়জনের এমন মৃত্যু-অপুরণীয়, সকল বোধের অতীত—“irreparable and incomprehensible—the death of one she loved.”(২৭) আন্দ্রুর মৃত্যুর খবর এল। বোন প্রার্থনা করে জীবিত দাদাকে ফিরে পাওয়ার জন্য। বৃদ্ধ পিতা পাগলের মতই পুত্রের মৃত্যুর খবর বলে বেড়াতে লাগলেন। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগলেন

তিনি —"He walked less, ate less, slept less, and became weaker every day."(২৮)

মনে পড়ে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের কথা। যুদ্ধে দুর্যোধনের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্টের আচরণ হয়ে ওঠে শিশুসুলভ। টলস্টয়ের লেখায়হ দেখা যাচ্ছে, আন্দ্রুর স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শিশুর কান্না শোনা যায়। সন্তানের জন্ম দিয়েই তিনি মারা গেছেন। চারদিকে মৃত্যু উপত্যকা-আর্তনাদ-অসহায়তা। জন্ম নিয়েছে মানবশিশু—যীশুর জন্ম হল। টলস্টয় শুনিয়েছেন পিতা আন্দ্রুর মুখ থেকে—কোন শিশু? ওখানে কোন শিশু? অথবা শিশুটি কি জন্ম নিল? "A baby? What baby? Why is there a baby there? Or is the baby born?"(২৯) ১৮০৫-এর যুদ্ধ শেষ, আবার সৈন্য সংগ্রহের অভিযান। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। মানবতার শত্রু নেপোলিয়নের প্রতি অভিশাপ। নেপোলিয়নের হাতে প্রাশিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে গেলো। ক্ষুধায় ও রোগে মারা গেল বেশিরভাগ সৈন্য। শুরু হল দুর্ভিক্ষ। মহামারী দেখা দিল, দেখা দিল Tyfus রোগ।

।। চার ।।

১৮১২ সাল। ২৯শে মে নেপোলিয়ন ড্রেসডেন ত্যাগ করলেন। সন্ধির প্রচেষ্টাকে ভেঙে দিলেন। সন্ধি আলোচক সম্রাট আলেকজান্ডারের দূত বলাশেভকে নেপোলিয়ন বললেন আপনারা যদি প্রাশিয়াকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন, তাহলে সে দেশকে আমি ইউরোপের মানচিত্র থেকে মুছে দেব—"know that if you stir up Prussia against me, I'll wipe it off the map of Europe!"(৩০) একনায়ক এবং যুদ্ধবাজ নেপোলিয়নের নখর এতদূর বিস্তৃত ছিল যে কোন অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সামান্য বিচলিত হতেন না। ১৮১২ সালের সেই ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল- "...and the war began..."[৩১] এরপরেই শুরু হল অভিযান- "The Campaign began." [৩২] সমস্ত রাশিয়া যুদ্ধভীতিতে বিপর্যস্ত। টলস্টয়ের বর্ণনা সময়োচিত। শত্রু এগিয়ে আসছে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে। রাশিয়ার জনগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিদেশী শত্রু পিতৃপুরুষদের সমাধিকে অপবিত্র করতে এগিয়ে আসছে। স্ত্রী সন্তানদের অপহরণ করতে আসছে। রাশিয়ার জনতার সংলাপে টলস্টয় লিখেছেন- আমরা রুশ। আমাদের ধর্ম আমাদের সিংহাসন। আমাদের পিতৃভূমি রক্ষায় রক্ত ঢেলে দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হব না। ইউরোপকে দেখতে হবে, রাশিয়া কেমন করে পিতৃভূমিকে রক্ষা করে। নরক দিয়ে নরককে প্রতিরোধ করতে হবে-

"We are Russians and will not grudge our blood in defense of our faith, the throne, and the Fatherland! We will show Europe how Russia rises to the defense of Russia! ...hell must be repulsed by hell". [৩৩]

যুদ্ধ হল। উভয়পক্ষের হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। ফরাসিরা স্মোলেন্‌স্ক শহর জ্বালিয়ে দিল। নেপোলিয়ন এগিয়ে আসছেন, আর রুশ বাহিনী পিছিয়ে যাচ্ছেন। বিস্ময়কর বীভৎস নিষ্ঠুরতায় একজন মানুষ আর একজনকে হত্যা করছেন। আর সেনাপতি কুতুজভের সামনে কেবলই যুদ্ধের প্রতিকূলতা। কামানের গোলা ফাটার শব্দ। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। রুশ সাধারণেরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আগুনের শিখা। পোড়া ফসলের গন্ধ। উঁচু গোলাবাড়ি জ্বলছে তো জ্বলছে। পোড়া ফসলের একটা পিঠে পিঠে গন্ধ-

-"At that moment the pitiful wailing of women was heard from different sides, the frightened baby began to cry, ...The town is being abandoned. ...Alpatych went up to a large crowd standing before a high barn which was blazing briskly. The walls were all on fire and the back wall had fallen in, the wooden root was collapsing, and the rafters were alight, ... the burning grain in which diffused a cakelike aroma all around". [৩৪] যুদ্ধের বিভীষিকা প্রবাদচিহ্নিত হয়েছে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace)- উপন্যাসে। মাংস, দেহ, কামানের খাদ্য- 'Flesh, bodies, cannon fodder!' [৩৫] মৃত্যুর নরকে মৃতদেহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। কুতুজভ বুঝেছিলেন, পশ্চাদপসারণ ছাড়া এই অসম যুদ্ধে কোনভাবেই স্থির থাকা যাবে না। জাতির অনিবার্য পরাজয়কে তাহলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং শুধু সৈন্যবাহিনী নয়, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ করেছিল রাশিয়ায় জনগণ। আর যুদ্ধ করেছিল প্রধান সেনাপতি কুতুজভের সূক্ষ্মদর্শিতা। গোটা উপন্যাসে টলস্টয়ের এটি একটি প্রধান বক্তব্য বিষয়। জনগণের হয়েই টলস্টয় কলম ধরলেন। উপন্যাসে লিখলেন- "If it has come to this - we must fight as long as Russia can and as long as there are men able to stand..." [৩৬] এসব সত্ত্বেও কুতুজভ প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, রাশিয়ার নিশ্চিত পরাজয়, বৃদ্ধ প্রিন্স বলেছে, রাশিয়ার

মৃত্যু হয়েছে, ওরা তাকে ধ্বংস করেছে – “Yes,” he said, softly and distinctly. Russia has perished. They’ve destroyed her”. [৩৭]

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ এবং যুদ্ধের নারকীয় পরিণতির কথা শুনে বুড়ো প্রিন্স স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে- “When she had left the room the prince again began speaking about his son, about the war, and about the Emperor, angrily twitching his brows and raising his hoarse voice, and then he had a second and final stroke”. [৩৮] যুদ্ধে এক এক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষের থেকে বেশি ক্ষতি হয় সাধারণ জনতার। দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়ে দেশবাসী।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক শ্রেষ্ঠ সেনাপতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। অনেকেই জয়ের গৌরবেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছেন। কিন্তু অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে দুর্বল সেনাবাহিনী নিয়ে রক্তপাতহীন যুদ্ধ জয়ের গৌরব খুব কমজনের কপালেই লেখা থাকে। রাশিয়ার সেনাপ্রধান কুতুজভ সেই বিরল নায়কের একজন। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একনায়কের পতন নিশ্চিত হয়েছিল তাঁর হাতেই। নেপোলিয়নের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পশ্চাদপসরণকেই তিনি সময়োচিত বিবেচনা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উদগ্র হিংসা এবং সৈন্যক্ষয়কে তিনি পরিহার করেছিলেন। যুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধ সেনাপতি কুতুজভের সহায়ক হয়েছিল। অসামরিক চাষী সৈনিকেরাই নেপোলিয়ানের যুদ্ধজয়ের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সৈনিক জীবনের অভিনবত্ব, উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের স্বাদ তারা পেয়েছিল। তারা আত্মত্যাগ করেছিল। জ্বালিয়ে দিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। টলস্টয় লিখেছেন, বাঁদিকে মাঠ সমতল অনেক বেশি, সেখানে আছে ফসলের ক্ষেত। ধূমায়মান অগ্নিদগ্ধ সেমেনভস্ক গ্রামটাও দেখা যাচ্ছে-

“On the left the ground was more level, there were fields of grain, and the smoking ruins of Semenovsk, which had been burned down, could be seen”. [৩৯]

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক মৃত্যুর আত্মদর্শন খোঁজে, খোঁজে নারীর প্রেম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রিন্স আন্দ্রু তাঁর প্রিয়তমা নারীকে খুঁজেছিল। -একটি নারীর ভালোবাসা, বাবার মৃত্যু, আর অর্ধেক রাশিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফরাসী আক্রমণ। ভালোবাসা! ...ছোট্ট মেয়েটি কি রহস্যময় শক্তিতে একেবারে কানায় কানায়

ভরে উঠেছিল! –"his love for a woman, his father's death, and the French invasion which had overrun half Russia. "Love...that little girl who seemed to me brimming over with mysti forces! Yes, indeed, I loved her." [৪০] যুদ্ধ জয়ের জন্য দরকার সুদীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতি ও দৃঢ় সংকল্প। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী টলস্টয় যুদ্ধের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধ কি? যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য কি দরকার? সামরিক লোকেদের কাজ কি? যুদ্ধের পথ হল গুপ্তচরবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা। একটা দেশের অধিবাসীদের ধ্বংস, সেনাদলের খাদ্য সংগ্রহের জন্য লুট এবং চুরি। জালিয়াতি এবং মিথ্যাচরণই সামরিক কৌশলের অপর নাম। ...যিনি যত বেশি মানুষ মারতে পারে, তিনিই লাভ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার- "But what is war? What is needed for success in warfare? What are the habits of the military? The aim of war is murder, the methods of war are spying, treachery, and their encouragement, the ruin of the counting's inhabitants, robbing them or stealing to provision the army, and fraud and falsehood termed military uniforms, and he who kills most people receives the highest rewards". [৪১] কোথাও কোন সৈনিকের পা উড়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের কোন প্রান্তে আহত সৈনিকদের স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথাও সৈন্যরা কামানে বারুদ ভরছে। কোন কর্ণেল যুদ্ধে মারা গেছে। কোথাও নিহত সৈনিকদের স্তুপ, কোথাও সবুজ পোড়া কাঠ, ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ, কোথাও আহত ঘোড়ার হৃদয় বিদারক আর্তনাদ, কোথাও রক্তের পুকুর, কোথাও ধোঁয়ার মধ্যে যুদ্ধবন্দিদের সারি, কোথাও সেতু উড়িয়ে দেওয়ার ছবি। কোথাও আবার রক্তের স্রোতে ভেসে যাওয়া ঘোড়া ও মানুষের স্তূপ। কোথাও যুদ্ধ তাবুতে রক্তমাখা সৈনিকদের আর্তনাদ। কোথাও আবার সৈনিকদের ড্রেসিং করার চিত্র। এসব আর কি? আর আহত প্রিন্স আন্দ্রুর আর্তনাদ, উরু পাকস্থলী ও পিঠের ভয়ানক দুঃসহ যন্ত্রণা। মানুষের মৃত্যু বড় অগৌরবে। রক্তাক্ত উলঙ্গ মানবদেহে ভর্তি তাবু।

এই যুদ্ধের পরিণতি আমরা সকলেই জানি। টলস্টয় লিখেছেন, আক্রমণকারী ফরাসি সৈনিকদের নৈতিক শক্তি তখন ফুরিয়ে গেছে। নেপোলিয়ন অর্থহীনভাবে মস্কো থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। কোনভাবে স্মোলেন্‌স্ক রোড ধরে পশ্চাদপসরণ করলেন, ধ্বংস হয়ে গেল তাঁর সুবিশাল প্রায় পাঁচ লক্ষ্য সৈন্য। নেপোলিয়ন শাসিত ফ্রান্সের পতন ঘটল। 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) গ্রন্থে টলস্টয় 'moral victory',

‘moral superiority’, ‘mortal force’- শব্দগুলি বিশেষভাবে উচ্চারণ করেছেন। যথার্থই নৈতিক শক্তি ছাড়া নৈতিক জয়লাভ সম্ভব হয় না। লেখক লিখেছেন – “...bleeding from the mortal wound it had received at Borodino. The moral force of the attacking French army was exhausted. ... Nepoleon’s senseless flight from Moscow, ...the destruction of the invading army of five hundred thousand men, and the downfall of Nepoleonic France”.[৪২]

।।পাঁচ।।

আঠারো পর্বে সম্পূর্ণ মহাভারতে (মহাভারতম্) অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে রয়েছে যুদ্ধের বর্ণনা। মহর্ষি ব্যাসদেব ভারত ইতিহাসের জাতীয় সংগ্রামকে একটা বৃহত্তর, মহত্তর পটভূমিকায় মণ্ডিত করেছেন তাঁর এই সুবিশাল সৃষ্টিতে। যুদ্ধের পটভূমি বাদ দিলে মহাকবির মহাভারত হয়ে ওঠে গৌণ, অকিঞ্চিৎকর। ব্যাসদেবের মহাভারত এবং টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace) দুই গ্রন্থের মিল যুদ্ধের ব্যাপ্তিতে। অমিল সময়। সময়ের ব্যবধান দুই সৃষ্টির যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ব্যবধানকে পৃথক করেছে মাত্র। মহাকবি ব্যাসদেবের মহাকাব্য কাব্য, মহাকাব্য। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস। টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace)–উপন্যাস। টলস্টয়ের মতে, উপন্যাস নয়, কাব্য তো নয়ই, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তও নয়। ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace) প্রথা বহির্ভূত শিল্প। Leo Tolstoy তাঁর ‘What is Art’? গ্রন্থে লিখেছেন- “What is art? Why even ask such a Question? Art is architecture, sculpture, painting, music, poetry in all its forms- that is the usual answer of the average man, of the art lover.” [৪৩] শিল্পের শ্রেণী নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- “It is exactly the same in sculpture, and in music, and in poetry. Art in all its forms borders, on the one hand, on the practically useful, and on the other, on unsuccessful attempts at art”. [৪৪] সর্বোপরি শিল্প কি? Leo Talstoy লিখেছেন- “Art is that activity which manifests beauty’, such an average man will reply”. [৪৫] শিল্পের সারাৎসার স্পষ্ট করে দিলেন তিনি।

একথা ঠিক, যুদ্ধের পটভূমি ছাড়াও মহাভারতের (মহাভারতম্) ব্যাপ্তি বিশালতা গাম্ভীর্য ও আনুভূমিক পটভূমি অনেক বেশি। ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace)

তুলনায় নিষ্প্রভ না হলেও সেই ব্যাপ্তি অর্জন করতে পারেনি। উপন্যাসের সেনাপতি কুতুজভ। কিন্তু সাধারণ প্রজা মানুষ-জনতা কৃষক অসামরিক কৃষক সৈনিক নারী সামরিক সৈন্য এবং মূলত রাশিয়ার ব্রাত্য নাগরিক এই যুদ্ধ জয়ের দাবীদার। মহাভারতের যুদ্ধ ছিল আঠারো দিন ব্যাপী। অবশ্য যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ পটভূমি বারো বছরের অধিক। মহাভারতের প্রকৃত যুদ্ধ সুনির্দিষ্টভাবে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরেই সংঘটিত হয়েছিল। ঐ যুদ্ধে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমগ্র রাজন্যবর্গ তাদের অধীনস্থ সেনাদল সহ যুদ্ধ করেছিল। অপরপক্ষে উপন্যাসে উল্লিখিত যুদ্ধের সময়কাল ১৮০৫খ্রীঃ -১৮১২খ্রীঃ। অনেকগুলি বড় যুদ্ধের সমষ্টি ‘War and Peace’-উপন্যাস। এর মধ্যে স্মরণীয় দুই যুদ্ধ হল অস্তারলিজ ও বরদিনোর যুদ্ধ। ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace) এর যুদ্ধ প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে। যুদ্ধস্থল সমগ্র রাশিয়া। কেন্দ্রস্থল মস্কো। যুদ্ধের পক্ষ প্রতিপক্ষ একনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, উল্টোদিকে রাশিয়ার সমগ্র জনসাধারণ। মহাভারতের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাকাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছেন, তাঁর ট্র্যাজিক আর্তনাদ কাহিনীর কোন কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace)-উপন্যাসে সৈনিক প্রিন্স আন্দ্রুর পিতা বুড়ো প্রিন্স পুত্রের মৃত্যু সংবাদ, যুদ্ধের ঘনঘটার আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু উপন্যাসে তার স্থান নেহাতই তুচ্ছ। মহাভারতে রয়েছে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী ধন্যা- অপমানিতা, লাঞ্ছিতা তেজোদীপ্ত রমণী, যিনি দুঃশাসনের বুকের রক্তে বেণীবন্ধন করেছিলেন আর বিপরীতে ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace)–এর নাতাশা মোমের পুতুলের মত নরম, সবুজ সকালে ভালবাসার প্রভাতী আলো ছড়ায়। ঠিক দ্রৌপদীর বিপরীতে তবুও টলস্টয় শিল্পীর তুলি বুলিয়ে দেন। আঙুলের ছোঁয়ায়, রঙে রেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠেন নাতাশা।

মহাভারতের যুদ্ধের প্রেক্ষিত ছিল সম্পদ ও সাম্রাজ্য। অংশীকরণের অধিকার লাভের দ্বন্দ্বে বিবদমান ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ। যুদ্ধের প্রেক্ষিত সাম্রাজ্য ও সম্পদের প্রতি লোভ এবং প্রতিহিংসা। এছাড়া দুর্যোধনের অহংকার, একনায়ক সুলভ আচরণ। পাণ্ডবদের ছিল বহু বছরের পুঞ্জীভূত জমা ক্ষোভ। অপরপক্ষে টলস্টয় ইতিহাসের নেপোলিয়নকেই ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ (War and Peace)–উপন্যাসে বিশ্বস্তভাবে স্থান দিয়েছেন, যিনি যুদ্ধবাজ একনায়ক, কৌশলী ও সম্মান পিপাসু। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক নেপোলিয়ন নন, রাশিয়ার সম্রাট নন, নায়ক রাশিয়ার প্রজাসাধারণ। আর যদি কাউকে নায়করূপে চিহ্নিত করতে হয়, তিনি এই উপন্যাসের অন্তরালবর্তী স্বল্পবাক বৃদ্ধ সেনাপতি কুতুজভ। যাকে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বয়ে বেড়াতে হয়েছে গভীর দীর্ঘশ্বাস।

সহ্য করতে হয়েছে নিন্দা ও বিদ্রুপ। আর আছেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৈনিক যোদ্ধারা ও তাদের পরিবারবর্গ। যুদ্ধক্ষত রাশিয়ার মর্মান্তিক পটভূমিতে গভীর দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাদের। আর আছে নিম্নবর্গীয় অসহায় চাষাভুষো। এই প্রান্তিক মানুষদের দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসের স্বল্পতম জায়গা অধিকার করে আছে। উপন্যাসের নায়ক এরাই। আর মহাকবির মহাভারত অসাধারণ যোদ্ধার জন্য, সম্রাটের জন্য, রাজার জন্য, সেনাপতির জন্য এবং সহৃদয় পাঠকের জন্য গভীর দীর্ঘশ্বাস রেখে গেছে। সেখানে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কর্ণ অর্জুন দুর্যোধনের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে নিম্নবর্গীয় মানুষ এবং তাদের অসহায়তা। মহাকবি ব্রাত্য মানুষকে বিশেষ কোন জায়গা দেন নি তাঁর মহাকাব্যে।

।।ছয়।।

"ন বধঃ পূজ্যতে বেদে হিতং নৈব কথঞ্চন"। [৪৬]

-বেদে হিংসার প্রশংসা করে না। কারণ হিংসা কোন প্রকারেই হিত করে না। এই উক্তি ব্যাসের। ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ নিবৃত্তির উপদেশ দিয়েছেন তিনি। মহাভারতের যুদ্ধকে শাসন করেছে ধর্ম। ধর্মই মহাভারতের আধার। পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য সংযত হয়ে 'পাণ্ডবদের জয় হোক' এই প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তারা দুর্যোধনের পক্ষেই যুদ্ধ করেছেন। সুউচ্চ ধর্মবোধ ছাড়া এমন দৃষ্টান্ত মেলে না। মহাভারতকার লিখেছেন-

"অহন্যহনি পার্থানাং বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ।
ভরদ্বাজাত্মজশ্চৈব প্রাতরুত্থথয় সংযতৌ।।
জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যূচতুররিন্দমৌ।
যুযুধাতে তবার্থায় যথা স সময়ঃ কৃতঃ"।। [৪৭]

অপরপক্ষে টলস্টয়ের উপন্যাসে লেখক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের কথা বলেছেন। কিন্তু উপন্যাসে লেখক বাস্তব ইতিহাসের প্রতি অনুগত থেকেছেন। টলস্টয় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরো বছর ইউরোপে লক্ষ লক্ষ মানুষের এক অসাধারণ আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। মানুষ পরস্পরকে লুঠ করেছে ও হত্যা করেছে। কখনো জয়লাভ করেছে, কখনো ডুবে গেছে গভীর হতাশায়। ইতিহাসবিদেরা এর নাম দিয়েছেন "বিপ্লব"। টলস্টয় লিখেছেন- "The first fifteen years of the nineteenth century in Europe present an extraordinary movement of millions of people. Men...plunder and slaughter one another, triumph and are plunged in despair...calling these sayings and

doings "The Revolution". [৪৮] সমূহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুতুজভ সেনাবাহিনী এবং মস্কো দুটিকে হারাবার ঝুঁকি নেন নি। নেপোলিয়নের বিপুল সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সাহস তিনি দেখান নি। মহাত্মা গান্ধী পড়েছিলেন টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) উপন্যাস। সম্ভবত এই গ্রন্থ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস আন্দোলনের বীজমন্ত্র। কুতুজভ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন- আমার সরকার আমার দেশ আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছে তার বলে আমি পশ্চাদপসরণের হুকুম দিলাম- "But I" he paused, "by the authority entrusted to me by my Sovereign and Country, order a retreat". [৪৯] এশিয়ার মহত্তম নগরী হয়ে উঠল মানহারা কুমারীর মত। পরিত্যক্ত মস্কো। মস্কো জনশূন্য। টলস্টয় লিখেছেন- "A town captured by the enemy is like a maid who has lost her honor". [৫০] আর মস্কো হল জনশূন্য, পরিত্যক্ত । নেপোলিয়ন জানালেন সেকথা- "Moscow was empty, ...Moscow deserted!" [৫১]

অপরপক্ষে মহাকবির মহাভারতের (মহাভারতম্) যুদ্ধের স্থান ছিল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর। যুদ্ধের স্থান নির্ণয়ে উভয়পক্ষের সম্মতি ছিল। যুদ্ধের নিয়মকানুন যুদ্ধের সাধারণ রীতির অনুকূল ছিল। পাণ্ডব এবং কৌরব উভয়পক্ষই যুদ্ধের সাধারণ শর্তাবলী মেনে হয়েছিল। প্রাজ্ঞজন এবং যোদ্ধাদের সুপরামর্শ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত রীতিনীতি উভয়পক্ষই সমানভাবে মান্যতা দিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাশঙ্খধ্বনি দিয়ে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষে ধর্ম বিরাজ করেছিল। ধর্মাশ্রিত ভারতবর্ষের প্রসন্নমূর্তি যুদ্ধক্ষেত্রে দীপ্তি দিয়েছিল। উভয়পক্ষের সেনাপতি এবং যোদ্ধারা শুধু বীর ছিলেন না, তারা ছিলেন ধর্মজ্ঞানী। যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপে সেনাপতি এবং যোদ্ধারা সুনীতি দুর্নীতি, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেছেন। যখন অন্যায় হয়েছে বা যুদ্ধস্থলের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে, তখন প্রাজ্ঞরা তাকে চিন্তাশীল দৃষ্টিতে দেখেছেন। বৃহত্তর তাৎপর্যে যুদ্ধের ঘটনাক্রমকে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি পরাজয় এবং মৃত্যুর সমূহ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও দুর্যোধন যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করেন নি। টলস্টয়ের উপন্যাসে এই যুদ্ধের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মানা হয় নি। নেপোলিয়ন যুদ্ধনীতি পালন কিংবা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেন নি। সময় চলেছে, সময়ের দূরত্ব মানুষকে ইতর করে ফেলেছে। একনায়ক নেপোলিয়নের যেন তেন প্রকারে পররাষ্ট্র দখলই উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম এবং নৈতিক অনুশাসন কি মানব সমাজে ক্রম ক্ষীয়মান?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পাশাপাশি অসম রেনেসাঁর বিকাশের কারণ কি মানুষের ধর্মচেতনার অভাব? টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) কাল থেকে মহাভারতের কাল যে অনেক দূরবর্তী। ইউরোপের একনায়কেরা পররাষ্ট্র দখলের ক্ষেত্রে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংহতিকে মর্যাদা দেন নি।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে আঠারো দিনের মহাযুদ্ধের মধ্যে অর্ধেকের বেশি দিন (১০ দিন) যুদ্ধ করেছিলেন ভীষ্ম। যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মই ছিল তাঁর প্রধান সহায়। ধর্ম-ন্যায়-নীতি এবং কর্তব্য থেকে তিনি সরে আসেন নি। প্রিয়তম অর্জুনের প্রতি ভীষ্মের অশেষ স্নেহ। তবুও তিনি যুদ্ধ করেছেন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। কর্তব্যে অবিচল তিনি। প্রথম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম শত শত বীরকে নিহত করলেন। বীরের মস্তক ছিন্ন হল। তারা বীরশয্যায় শয়ন করলেন-

"বদ্ধখড়্গনিষঙ্গাশ্চ বিধ্বস্তশিরসো হতাঃ।
শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরশয্যাসু শেরতে"।। [৫২]

ভীষ্ম এবং অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন মহাভারতকার। অর্জুন ভীষ্মের ওপর সুতীক্ষ্ণ বাণ প্রয়োগ করছেন, আর ভীষ্ম অর্জুনের সেই মহাস্ত্র আকাশেই বিনষ্ট করছেন-

"তমুওমং সর্ব্বধনুর্দ্ধরাণামশক্তকর্ম্মা কপিরাজকেতুঃ।
ভীষ্মং মহাত্মাভিববর্ষ তূর্ণং শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈর্বিমলৈশ্চ ভল্লৈঃ।।
তথৈব ভীষ্মাহতমন্তরীক্ষে মহাস্ত্রজালং কপিরাজকেতোঃ।
বিশীর্য্যমাণং দদৃশুস্ত্বদীয়া দিবাকরেণের তমোহভিভূতম্"।। [৫৩]

মহাভারতে ধর্ম এমনই জাগ্রত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আপন পরিণতি জেনেও ভীষ্ম শিখণ্ডীকে আঘাত করেন নি, বরং অস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন। মহাভারতকার লিখেছেন-

"স্ত্রীত্বং তস্য স্মরন্ রাজন্! সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
নাজঘান রণে ভীষ্মঃ স চ তন্নাববুদ্ধবান্" [৫৪]

ভীষ্মের মৃত্যুসজ্জায় অর্জুন শরসন্ধানে পৃথিবী বিদ্ধ করে নির্মল জল ভীষ্মকে পান করিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের এমন স্বর্গীয় মানবিক ছবি টলস্টয়ের উপন্যাসে নেই। মহাভারতকার লিখেছেন-

-"শীতস্যমৃতকল্পস্য দিব্যগন্ধরসস্য চ
অতর্পয়ত্ততঃ পার্থঃ শীতয়া জলধারয়াঃ
ভীষ্মং কুরূণামৃষভং দিব্যংপরাক্রমম্ [৫৫]

ব্যাসদেব মহাভারতের (মহাভারতম্) যুদ্ধবর্ণনায় ক্লান্তিহীন। যুদ্ধের আঠারো দিনের অস্ত্রবর্ষণ যেন শত শত বৎসরের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির প্লাবন। পৃথিবীর কোন সৃষ্টিতে যুদ্ধের এমন ভয়াবহতা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার কর্তব্য পালন করেছেন গুরুশিষ্য উভয়েই। দ্রোণ ও অর্জুন যুদ্ধ করেছেন। জয় পরাজয় অনিশ্চিত হয়েছে। মহাভারতকার লিখেছেন, -মাংসের জন্য আকাশে দু'টি শ্যেনপক্ষীর মহাযুদ্ধের ন্যায় ক্রমে দ্রোণ ও অর্জুনের মহাযুদ্ধ হতে লাগল-

"তথা দ্রোণার্জ্জুনৌ চিত্রমযুধ্যেতাং মহারথৌ।
আচার্য্যশিষ্যৌ রাজেন্দ্র! কৃতপ্রহরণৌ যুধি।।

....

তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং দ্রোণপাণ্ডবয়োর্মহৎ।
আমিষার্থে মহারাজ! গগনে শ্যেনয়োরিব"।। [৫৬]

আর মহাভারতের কর্ণ বীর, কর্তব্যে অবিচল এবং সত্যনিষ্ঠ। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বদিন কুন্তী কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। অভিমানী কর্ণ জন্মদাত্রী মাতাকে ফিরিয়েছেন। কিন্তু কথা দিয়েছেন অর্জুন ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আর কুন্তীর কোন পুত্রকে তিনি হত্যা করবেন না। মহাভারতকার লিখেছেন -

-"তাভ্যাং স সহিতস্তূর্ণং ব্রীড়ন্নিব নরেশ্বরঃ।
পাপ্য সেনানিবেশঞ্চ মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ।। [৫৭]

ধার্মিক না হলে কর্তব্যে অবিচল থেকেও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার এমন মহানুভবতা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরলই বটে। বরং মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যায় যুদ্ধ এসেছে বিজয়ীর কাছ থেকে। ভীষ্মের পতন, দ্রোণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচার, কর্ণের রথচক্র বসে যাওয়া, নিরস্ত্র কর্ণের হত্যা- এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধের নীতি লঙ্ঘন হয়েছে একথা সত্য। এমনকি দুর্যোধনের উরুভঙ্গও ন্যায় পথে ঘটে নি।

এসব ঘটনা যুদ্ধের আনুষঙ্গিক উপলক্ষ্য মাত্র। যুদ্ধের কারণ, কুরুবংশ ধ্বংস সবই একনায়ক রাজ্যলোভী দুর্যোধনের লোভ এবং হিংসার ফল। মহাভারতের যুদ্ধের উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে তারই দুষ্টবুদ্ধির ফলে। কাব্যে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছেন ভীম- "উরুভ্যাং প্রাহিণোদ্রাজন্! গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ" [৫৮] মহাভারতে ধর্ম ন্যায় ও নৈতিক অনুশাসন এমনই ক্রিয়াশীল যে যুধিষ্ঠির তিরস্কার করেছেন ভীমকে। আর ক্রুদ্ধ বলরাম ধিক্কার জানিয়েছেন। মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় এসেছে অন্যায়ভাবে। সুতরাং তা ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। বলরাম ভীমের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ভীম গদাযুদ্ধে

যা করেছে, তা যুদ্ধশাস্ত্র ও লোকসমাজে হয় না। অশাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্খ ভীম নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে।

-"নৈতদ্‌দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্‌ যদ্‌বৃকোদরঃ

....

অয়ং ত্বশাস্ত্রবিণ্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সংপ্রবর্ত্ততে"।

মহাভারত শেষ হয়েছে এক গভীর উপলব্ধির প্রজ্ঞায়।।[৫৯]

।।সাত।।

টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace)- সংগ্রাম ও শান্তি- পৃথিবীর মহৎ সৃষ্টির ছাঁচে কুঁদে কুঁদে গড়া শিল্পমূর্তি। দুই সৃষ্টির স্রষ্টাই যুদ্ধকে অবলম্বন করে শিল্পের সাদা শান্তিফুল ফুটিয়েছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা দুই গ্রন্থেই আছে। যুদ্ধের পরিণাম হত্যা এবং মৃত্যু এসেছে দুই মহাগ্রন্থে। যুদ্ধাবসানে এসেছে নৈঃশব্দ্য, গভীর বিষণ্ণতা। টলস্টয় ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। লিখেছেন – ঈশ্বরের মার দুনিয়ার বার - 'Against God's might our hands can't fight"[(৬০)] – কৃষক রমণীর আর্তনাদ শুনিয়েছেন লেখক – '...Sat a peasant woman uttering piercing and desperate Shrieks'[(৬১)] আর সৈন্যরা দোকানে ঢুকে পড়েছে – 'Soldiers were dispersing among the shops ...'[(৬২)] যুদ্ধের সময় সামাজিক শৃঙ্খলা, রীতি-নীতি, বিচারের বাণী একান্তই অর্থহীন। 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace)- উপন্যাসের নানা স্থানে টলস্টয় মানবতা লুণ্ঠনের এমন চিত্র অঙ্কন করেছেন। কোথাও যুবকের দুর্বল পায়ে ভারি শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, অবশেষে তাকে টাঙ্গি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। বিকৃত ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধূলি কলঙ্কিত, রক্তাক্ত মানুষটির চিত্র এঁকেছেন কবি – "Two dragoons took it by its distorted legs and dragged it along the ground. The gory, duststained, half . Shaven head with its long neck trailed twisting along the ground. The crowd Shrank back from it".[(৬৩)] **১৮১২** সালের বরদিনের যুদ্ধের সময় নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছিল লুঠেরা। অগ্নিসংযোগ এবং লুঠতরাজই তাদের একমাত্র কাজ। সৈন্যরা ছিল ছিন্নবাস, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত।

টলস্টয় বারবার তাঁর গ্রন্থে লুঠেরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন – 'Though tattered hungry, worn out, and reduced to a third of their original

number. (.....) neither citizens nor soldiers but what are known as marauders. .... They were a mob of marauders ..."(৬৪) একথা ঠিক, বেদব্যাসের মহাভারতে (মহাভারতম্) সৈনিক জীবনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণ নেই। আর প্রিন্স আন্দ্রু, সৈনিক আন্দ্রু সম্পর্কে –টলস্টয় লিখেছেন, জীবন মৃত্যুর সেই আত্মিক সংগ্রামে মৃত্যুই বিজয়ী হয়েছে – "It was the last spiritual struggle between life and death, in which death gained the Victory."(৬৫) প্রিন্স মারা গেলেন, আর তাঁর ভালবাসার নারী নাতাশা হয়ে উঠলেন নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন ও একাকী। সর্বত্রই আগুনে পোড়া ধ্বংসাবশেষ। মানুষের মৃতদেহ বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে, বন্দীদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা, শিবিরে আগুন, ব্যাগ্রেশনের মৃত্যু, শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে রাশিয়ার প্রতিরোধ - উপন্যাসের পাতায় পাতায় মৃত্যু। কোথায় এর শেষ? – তবুও টলস্টয় উপন্যাসে শান্তি খুঁজেছেন। মৃত্যু উপত্যকায় শান্তির সন্ধানী সেনাপতি কুতুজভের মৃত্যু হল। তিনি রেখে গেলেন অনেক প্রশ্ন। নেপোলিয়ন পলায়ন করলেন। সম্পত্তি ও মানব জীবনের মর্মান্তিক ধ্বংসসাধন ছাড়া যুদ্ধের কোন কাজ নেই। তবুও টলস্টয় উপন্যাসে শান্তি খুঁজেছেন।

।। আট ।।

"yes! All is vanity, all falsehood, except that infinite sky, There is nothing, nothing, but that. But even it does not exist, there is nothing but Quiet and Peace. Thank God! ...."(৬৬) – হ্যাঁ! ঐ অসীম আকাশ ছাড়া সবকিছু বৃথা, সব মিথ্যা। ও ছাড়া আর কিছু নেই। কিছু নেই। এমন কি ঐ আকাশও নেই। স্তব্ধতা ও শান্তি ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ..... যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক যোদ্ধার এমন স্বগতোক্তি। প্রিন্স আন্দ্রু আকাশের দিকে তাকিয়ে এভাবে শান্তি খুঁজেছেন। টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace)– উপন্যাসে যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে এভাবেই শান্তির স্বপ্ন সন্ধান করেছেন। পিয়েরের মুখ থেকে টলস্টয় শুনিয়েছেন, বিশ্ব মানবপ্রীতির মধ্যে রয়েছে শান্তি –"He had sought it in Philanthropy, in Freemasonry"(৬৭) টলস্টয় যুদ্ধকে জেনেছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়ে। বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে টলস্টয় খুঁজেছেন শান্তির ঈশ্বরকে। টলস্টয়ের কাছে জীবন ঈশ্বর। জীবনকে ভালবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা। সমস্ত কিছুর

মধ্যে জীবন। টলস্টয় লিখেছেন, সব কিছু বদলায়, এগিয়ে চলে। আর সেই এগিয়ে চলাই হল ঈশ্বর –

"Life is everything. Life is God. Everything changes and moves and that movement is God. And while there is life there is joy in Consciousness of the divine. To love life is to love God."(৬৮)

যুদ্ধ অপরাধীদের কাজ তো বিচারের আওতায় আসবেই। শুধু তাই নয়, মানুষের কোন কাজই বিচারের বাইরে থাকতে পারে না। টলস্টয় লিখেছেন, যেখানে সাধুতা সরলতা ও সত্য অনুপস্থিত, সেখানে কোন মহত্ত্ব থাকতে পারে না। খ্রীষ্ট শিখিয়েছেন একথা – "For us with the Standard of good and evil given us by Christ, no human actions are incommensurable. And there is no greatness where simplicity, goodness, and truth are absent."(৬৯) যুদ্ধ মানবজাতির অভিশাপ, যুদ্ধ মানুষকে যন্ত্রণা দিয়েছে। রিক্ত হতে হতে শাশ্বত জীবনের সন্ধান পেয়েছেন টলস্টয়। সর্বস্বান্ত হয়ে মানুষ লাভ করেন অমৃতের সন্ধান। আধ্যাত্মিক প্রশান্তিই জীবনের দুঃখকে ভুলিয়ে দিতে পারে। দেহ বন্ধনে আত্মার গোপন যন্ত্রণা অনুভব করেন টলস্টয়। সম্বিতের উপলব্ধি বুদ্ধির অতীত। রাশিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে শান্তি খুঁজেছেন টলস্টয়। খুঁজেছেন শাশ্বত, অপরিমেয় ও অনন্ত জীবনকে – "gladly regarded the everchanging, eternally great, unfathomable, and infinite life around him."(৭০)

জেগে আছে ভারতবর্ষ-যেমন জাগে রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র। যুদ্ধের মধ্যে শান্তি খুঁজেছে ভারতবর্ষ। যুদ্ধ অবসানে সমস্ত পাণ্ডবেরা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র এবং ভরতবংশীয় রমণীরা তাদের আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে শান্তি তর্পণ করলেন। মহাভারতের 'শান্তিপর্ব্ব' – এ ব্যাসদেব লিখেছেন –

"কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ।।"(৭১)

গীতা ও উপনিষদের গভীর আধ্যাত্মিক রসে নিষিক্ত ঋষি টলস্টয়। ভারতীয় দর্শনের ভক্ত পাঠক শুনেছেন দূর প্রাচ্য ঋষির বৈদিক মন্ত্র। দূর ভারতবর্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'দ', 'দ', 'দ' – 'দত্ত' (দান কর), 'দয়াধ্বম' (দয়া কর), 'দম্' (দমন কর) – "দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি।"(৭২)

মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারত (মহাভারতম্) ও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' (War and Peace) উপন্যাসে যুদ্ধ শেষ কথা বলেনি। শাশ্বত শান্তির জন্য যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যুদ্ধে মানব সভ্যতার কোন কল্যাণ হয় না। পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম সৃষ্টিতে শান্তির উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। ভারতীয় ঋষি কবি 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' শেষ করেছেন শান্তি মন্ত্র দিয়ে –

"ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"(৭৩)

তথ্যসূত্র :

১. Leo Tolstoy, War and Peace, Finger print ! classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, Book Nine : 1812 (3), P. 603
২. ibid, Book Nine : 1812 (4), P. 604
৩. ibid, P. 602
৪. মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্, উদ্‌যোগপর্ব্ব(১৪), সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২৩
৫. পূর্বোক্ত, উদ্‌যোগপর্ব্ব (১৫), পৃ. ১০৫৬
৬. পূর্বোক্ত, উদ্‌যোগপর্ব্ব (১৪), পৃ. ৬৩৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬১
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৯
১১. Leo Tolstoy, War and Peace, Finger print ! classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, Book Nine : 1812 (2), P. 598
১২. ibid, Book Nine : 1812 (1), P. 597
১৩. ibid
১৪. ibid, P. 596
১৫. ibid, P. 597

১৬. ibid, Book Nine : 1805 (1), P. 99
১৭. ibid, P. 99
১৮. ibid, P. 244
১৯. ibid, P. 238
২০. ibid, P. 177
২১. ibid, P. 182
২২. ibid, P. 190
২৩. ibid, P. 195
২৪. ibid, P. 250
২৫. ibid, P. 279
২৬. ibid, P. 279, P. 284
২৭. ibid, P. 312
২৮. ibid, P. 314
২৯. ibid, P. 318
৩০. ibid, P. 613
৩১. ibid, P. 617
৩২. ibid, P. 635
৩৩. ibid, P. 669
৩৪. ibid, PP. 687, 688, 689, 690
৩৫. ibid, P. 694
৩৬. ibid, P. 695
৩৭. ibid, P. 706
৩৮. ibid, P. 707
৩৯. ibid, P. 750
৪০. ibid, P. 759
৪১. ibid, PP. 764, 765
৪২. ibid, P. 808
৪৩. Leo Tolstoy, What is Art? Penguin Books, London, England, 1995, P. 10

৪৪. ibid

৪৫. ibid

৪৬. মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্, ভীষ্মপর্ব্ব (১৭), সম্পা. - শ্রীমদ্‌হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৩৩

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০, পৃ. ১৫১

৪৮. Leo Tolstoy, War and Peace, Finger print classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, Book Eleven : 1812 , P. 810

৪৯. ibid, P. 819

৫০. ibid, P. 860

৫১. ibid, PP. 863, 864

৫২. মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্, ভীষ্মপর্ব্ব (১৮), সম্পা.- শ্রীমদ্‌হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৭২৯

৫৩. পূর্বোক্ত, ভীষ্মপর্ব্ব (১৯), পৃ. ৮৯০

৫৪. পূর্বোক্ত, ভীষ্মপর্ব্ব (২০), পৃ. ১৪৪০

৫৫. পূর্বোক্ত, ভীষ্মপর্ব্ব (২০), পৃ. ১৫০৮

৫৬. পূর্বোক্ত, দ্রোণপর্ব্ব (২৫), পৃ. ১৬৭৪

৫৭. পূর্বোক্ত, কর্ণপর্ব্ব (২৭), পৃ. ৬৪১

৫৮. পূর্বোক্ত, শল্যপর্ব্ব (২৯), পৃ. ৬০১

৫৯. পূর্বোক্ত, শল্যপর্ব্ব (২৯), পৃ. ৬১২

৬০. Leo Tolstoy, War and Peace, Finger print classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, P. 865

৬১. ibid, P. 866

৬২. ibid

৬৩. ibid, P. 879

৬৪. ibid, P. 884

৬৫. ibid, P. 966

৬৬. ibid, P.274

৬৭. ibid, P.995

৬৮. ibid, P. 1049
৬৯. ibid, P. 1055
৭০. ibid, P. 1089
৭১. মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারতম্, শান্তিপর্ব্ব (৩২), সম্পা.- শ্রীমদ্‌হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ২
৭২. অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩০
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮২

সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* : অন্তেবাসীর আত্মদর্শন

মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ : *ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এক ক্রান্তিকালের কথাকার সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)। তাঁর প্রথম উপন্যাস জাগরীর (১৯৪৫) মতো ঢোঁড়াই চরিতমানস (১৯৪৯, ১৯৫১) উপন্যাসেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিক টানাপড়েনের চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতার সমন্বয়ে তিনি অন্ত্যজ ঢোঁড়াই চরিত্রের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রত্যন্ত বিহারের প্রান্তিক জনজীবনে রাজনীতির প্রভাবে বদলে যাওয়া জীবনদর্শন চিহ্নিত করেছেন। সমকালীন আর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ঢোঁড়াই চরিতমানসে যে সঙ্কট মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই আবর্তে চরিত্রগুলি মতাদর্শ ও মনুষ্যত্বের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ইতিহাসের এক অস্থির সময়কে ব্যক্ত করেছে। নিম্নবর্গের চেতনা ও ভাবাদর্শের জগৎকে এই উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে যথার্থভাবে উপস্থাপন করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিপুলভাবে প্রান্তবর্তী মানুষের চেতনাকে বিবর্তিত করেছে। বৃহত্তর বিহারের সেইসব অন্তেবাসী জনতার অস্তিত্বের সংগ্রামই পরিস্ফুট হয়েছে ঢোঁড়াই চরিতমানসে। ব্যক্তিক ও সামাজিক অধিকার সচেতনতা ও সমকালীন অনিবার্যতায় বদলে যাওয়া নিবর্গের জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের পরিবর্তমান আত্মদর্শনের স্বরূপ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।*

মূল শব্দ : *নিম্নবর্গ, রাজনীতি, অত্মদর্শন, মহাকাব্যিক, গান্ধীবাদ, বিহার, বিবর্তন।*

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বিশ শতকের চল্লিশ দশকের কালপর্ব নবতর মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। বিভাগ-পূর্ব এই সময়ের বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিভা। আজীবন বিহারের পূর্ণিয়াবাসী এই লেখকের সাহিত্যে বাণীরূপ পেয়েছে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও প্রান্তিক জনপদের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র রূপায়ণে তিনি ছিলেন ঐকান্তিক। সমাজ-সচেতন লেখকের প্রায় সব রচনাই তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার ফসল। রাজনীতিতে

সরাসরি অংশগ্রহণ তাঁর সৃষ্টির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যকর্মে সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থার চিত্র, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, মধ্যবিত্তের জটিল মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। শাণিত মনন ও আন্তরিকতার সমন্বয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর সৃষ্টিকর্ম শিল্পিত অবয়ব লাভ করেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাত্রায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *জাগরী* থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এই গ্রন্থ বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা ঢোঁড়াইদের জীবনকথা। উপন্যাসটিতে লেখকের সুগভীর জীবনবোধ ও অসামান্য সমাজ-নিরীক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে লেখক অন্ত্যজ সমাজের দীর্ঘ জীবন পরিক্রমাকে রাজনীতির বাতাবরণে নিয়ে এসেছেন। বিশেষ কোনো মতবাদের আরোপ নয়, জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* প্রতিপাদ্য। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাতিভেদ, গোষ্ঠীকলহ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণ, শ্রেণি স্বার্থের সংঘাত, ভূমিহীন কৃষকদের দুরাবস্থা ছাড়াও মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির সুনিপুণ প্রকাশ উপন্যাসটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণ মানুষের জীবনকে কেমনভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয়েও *ঢোঁড়াই চরিতমানস* ঋদ্ধ। সমসাময়িক রাজনৈতিক আবর্ত কিভাবে বদলে দিয়েছিল গোটা জনজাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রা এ উপন্যাসে তার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ রয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্ত্যজ জনজীবনকে আশ্রয় করে মধ্যযুগে রচিত তুলসীদাসের *রামচরিতমানসের* আদলে সতীনাথ ভাদুড়ী গড়ে তুলেছেন *ঢোঁড়াই চরিতমানস*। এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যসমৃদ্ধ 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে রামায়ণের কাঠামো ও রামচন্দ্রের চরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার কারণ জানা যায়। লেখক তাঁর নায়ককে 'এ যুগের রামচন্দ্র' করতে চেয়েছিলেন, কারণ 'শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না'[১]। এ ছাড়া তাঁর উপন্যাসের অন্বিষ্ট ছিল ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনকে রূপায়িত করা। 'আদি কবি'র আড়ালে আশ্রয় নিয়ে 'সর্বজন পরিচিত দৃঢ় কালজয়ী' এই মহাকাব্যিক কাঠামোকে অবলম্বন করে সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনশীলতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। সমালোচক স্বস্তি মণ্ডলের মতে : 'মহাকাব্যের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তির গভীরতায় ঢোঁড়াই-এর চরিত্রের বিবর্তন ও সমাজের পরিবর্তন ব্যাপ্তি লাভ করে সমগ্র

ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের যথার্থ রূপকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।'[২] কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের মনোলোকে পরিব্যপ্ত তুলসীদাসী রামায়ণের অনুকরণে এই উপন্যাসটি আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড, পঞ্চায়েতকাণ্ড, রামিয়াকাণ্ড, সাগিয়াকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও হতাশাকাণ্ড- মোট সাতকাণ্ডে বিস্তৃত। এই উপন্যাসে বিধৃত ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী সচেতনভাবে পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছেন রামায়ণের স্মৃতি। উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নাম যেমন: অগ্নিপরীক্ষা, শাপমুক্তি, নাগপাশে বন্ধন, কুক্কুরমেধ যজ্ঞ, স্ত্রীনিগ্রহ, অক্ষয়তুনীর লাভ, স্বর্ণসীতা প্রভৃতি রামায়ণের ভাবগত বা ধ্বনিগত সাযুজ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবত্বারোপিত মানুষের বদলে সাধারণ মানবজীবনের মহত্বকে রূপ দেওয়ার জন্য সতীনাথ ভাদুড়ী অনুসন্ধান করেছেন 'দেশজ চরিত্র, স্বাদেশিক মৃন্ময় আধার। ভারতীয় বাস্তবতা।'[৩] ভারতবর্ষের অন্ত্যজ মানুষেরা জীবনের নানা অনুষঙ্গে রামকথার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে। 'জীবন-যাপনে যুক্তি-তর্কে না জড়িয়ে আপন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করতে তারা তুলসীদাসের রামায়ণের সুভাষিত দোহা ও চৌপাইকে প্রবাদের মতো ব্যবহার করে।'[৪] সতীনাথের আখ্যানে বর্ণিত তাৎমাটুলি কিংবা ধাঙরটুলির অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জনতার জীবনের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়েই রয়েছে রামায়ণ। উত্তর বিহারের এমন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের তাৎমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ঢোঁড়াই। সামাজিক বৈষম্য ও বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে বন্দি এই সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এসে সারা ভারতবর্ষের নিচুতলার মানুষ হয়ে ওঠে সে। নানা অমোঘ ও হৃদয়হীন নিয়মের অগড় ভেঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের বেরিয়ে আসার কাহিনি *ঢোঁড়াই চরিতমানস*। উপন্যাসটির প্রথম চরণে ভিক্ষাজীবিকা পরিহার করে ঢোঁড়াই প্রথমবার ব্যক্তিক জীবনের সংকীর্ণতা ভাঙে। তাৎমাটুলির সমাজ ও মাটির সঙ্গে জড়িয়ে স্বাধীন ঢোঁড়াই যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবনবৃত্ত রচনা করে তা আবার ভেঙে যায় রামিয়া-সামুয়র ঘটনার আঘাতে। স্নেহবিড়ম্বিত জীবনের নিজস্ব নিয়মে বৌকা বাওয়া অযোধ্যা চলে গেলে পুরনো জীবনের সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বিসকান্ধার জীবনে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ভিতর দিয়ে ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রামী সত্তা বৃহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সন্ধিক্ষণে নিম্নবর্গীয় চৈতন্য স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ফলে সাধারণ জনতা নিজের হাতেই তুলে নেয় লড়াইকে। নিজেদের সমাজ ও জাতির পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে গিয়েই তাদের অনিবার্যভাবে রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বিসকান্ধায় এসে ঢোঁড়াই বাবুসাহেব ও তার পুত্রদের প্রতিপক্ষে চলে যায়, ফসলের দাবী নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, ছলেবলে জমি কুক্ষিগত করার

প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। হারানো ভূমি ও সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা রাজনীতিতে নামে। নিম্নবর্গের চেতনা সম্পর্কে পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর জগৎ সম্পর্কে নিজের ধ্যানধারণা থাকে, হয়তো তা ভ্রুণাকারে, এটাই প্রতিফলিত হয় কাজে, কখনও কখনও বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা অর্গ্যানিক সমগ্র হিসেবেও তারা কাজ করে। আবার এই গোষ্ঠীই আনুগত্য ও বুদ্ধিগত অধীনতার কারণে এমন ধ্যানধারণা গ্রহণ করে যা তাদের নিজের নয়, অন্য গোষ্ঠী থেকে ধার করা। স্বাভাবিক সময়ে এটাই তারা অনুসরণ করে, অর্থাৎ সে সময়ে তাদের আচরণ স্বাধীন ও স্বশাসিত নয়। এটাই কমনসেন্স, অস্পষ্ট, স্ববিরোধী ও খণ্ডিত।[৫]

সময় ও পরিবেশই ক্রমশ অন্ত্যজ ঢোঁড়াইদের রাজনীতিতে টেনে নিয়ে আসে। নীলগাই বনহরণার ঘটনা, ভূমিকম্পের পরে পুনর্গঠনে উদ্যোগী নেতৃত্ব গ্রহণ, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেসী জনসভা সংগঠন- লাডলিবাবুদের সুবিধাবাদী আচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রতিপক্ষের স্বরূপ নির্ণয়, আগস্ট আন্দোলনে রেশমকুঠি দাহন- নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ঢোঁড়াইয়ের আত্মপরিচয় ও দেশকে জানার একেকটি সোপান। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য পরিণামে ঢোঁড়াইয়ের চেনা জগতের পুরোনো কাঠামো ভেঙে পড়তে চায়। বদলে যায় বৃত্তি ও জীবনযাত্রা, বদলে যায় মানসিকতা ও চিন্তাধারা, বদলে যায় আদর্শ ও ভিত্তিভূমি। লেখকের বর্ণনায় :

> দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের নিচে শক্ত মাটি, তাতে দাঁড়িয়েও যেন নিশ্চিন্দি নেই; ঐ শুনতেই আলু সাড়ে ন টাকা মণ! রোজার রাজ্যে উড়ে এসে বসেছেন রাজা- সরকার বাহাদুর।[৬]

যতই ঢোঁড়াইয়ের চেতনার উন্মেষ হয়, যতই তার জগতের দিগন্ত প্রসারিত হয়, ততই সে অনুভব করে দ্রুত পরিবর্তনশীল সংসারের সঙ্গে সে তার চিরন্তন রামায়ণকে মেলাতে পারছে না। ঢোঁড়াই বোঝে যে সরকার বাহাদুরের জন্যই তার এতদিনের সকল অভিজ্ঞতা জট পাকিয়ে যায়। রামরাজ্য ও গান্ধীবাদকে সমার্থক হিসেবে দেখার ঢোঁড়াইয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বটিও সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যায়। শৈশব চেতনায় 'গানহী বাওয়া' এসে যে বৃহত্তর তরঙ্গের দোলা দিয়ে গিয়েছিল, বিসকান্ধার সামাজিক-রাজনৈতিক বিচিত্র অভিজ্ঞতার তটে ঘা খেতে খেতে সে চেতনা পৌঁছে যায় নতুন

উপলব্ধির উপকূলে। সমাজের নানা স্তরে গড়ে ওঠা সামন্ত প্রভুদের কথা রামায়ণে লেখা নেই :

> ‘পাক্কী’ আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার হাকিম দারোগা ফৌজের রাজা, আকাশে ‘হাওয়াই-জাহাজের’ রাজা, বাতাসে ফৌজী হাওয়াগাড়ির গন্ধর রাজা। রামায়ণে এ-রকম রাজার কথা লেখা নেই। ‘বিলাক’-এর কথা লেখা আছে?[৭]

লাডলীবাবু নিজের বৈঠকখানার অনোখী বাবু, ইনসান আলী আর গিধর মণ্ডলকে যে দোকান মঞ্জুর করে দিয়েছিল তার নাম ‘কন্ট্রোল’। এই ‘কন্ট্রোল’ কিংবা ‘বিলাক’-এর কথা রামায়ণ পণ্ডিতের অজানা। এখানেই ঢোঁড়াইয়ের কাছে ‘পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়’। ফলে সকলের কাছে রামায়ণ প্রীতির জন্য ‘রামায়ণজী’ খ্যাত আজাদ দস্তার সদস্য ঢোঁড়াইয়ের ঝুলিতে সযত্নে সঞ্চিত রামায়ণে পোকায় বাসা বাঁধে। পাতাগুলি আর উল্টানো হয় না। ঢোঁড়াইয়ের জীবনেও রামায়ণ আর জীবন্ত থাকে না; হয়ে যায় কীটদষ্ট ও পরিত্যক্ত। তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হয় তাৎমাটুলি থেকেই। এই নিষ্ক্রমণ কেবল জীবনের বৃত্ত থেকে নয়, প্রত্ন-প্রতীকের জগৎ থেকেও। দীর্ঘ এই উপন্যাসে একটির পর একটি বৃত্ত অতিক্রম করতে করতে রামের রূপকল্প ভেঙে ঢোঁড়াই ক্রমশ ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ে পরিণত হয়। অনিকেত ও ছিন্নমূল ঢোঁড়াই শেষ অবধি বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে হয়ে ওঠে ভারতীয় অগণিত জনসাধারণের একজন; আহত, পরাজিত, নিঃসঙ্গ মানুষ।

বিহারের আঞ্চলিক জীবনকে উপজীব্য করে সতীনাথ ভাদুড়ী নিম্নবর্গের মহাকাব্য *ঢোঁড়াই চরিতমানস* রচনা করেছেন। এখানে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রামের আঞ্চলিক সংস্করণ তাৎমাকুলের ঢোঁড়াই বা ঢোঁড়াই রাম। এই ঢোঁড়াই বীরত্বের প্রতীক নয়, ভারতবর্ষীয় নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক। লেখকের মন্তব্য:

> তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঁড়াই, উচ্চারণ ঢোঁড়হাই। বাঙালীরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাঙালা ভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম, ওই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।[৮]

অভিপ্রেত রামচন্দ্র আর তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বিষ সাপের অনুষঙ্গ- ভারতবর্ষের সার্বিক প্রান্তিকতাকে ধরতে এই উপযুক্ত পরিসর গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক। আর্য ভারতের

উপাখ্যান কেন্দ্র থেকে ক্রমে প্রান্তের দিকে আবর্তিত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা-সংহতির মধ্যে উপন্যাসটি গোটা ভারতবর্ষকে মূর্ত করে তুলেছে। অবিভক্ত বিহারের পূর্ণিয়াই *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* জিরানিয়া। ট্রেন জিরানিয়া স্টেশনে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে- 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া'। তবে তাৎমারা এই জিরানিয়াকে 'টৌন' বলে। আরো বেশি প্রান্তিক জনপদ তাৎমাটুলি টৌন থেকে মাইল চারেক দূরে। লেখকের বর্ণনায় নিম্নবর্গীয় এই জনপদে চরম দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট :

> তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতে মাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়- শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে- দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পড়া লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটা ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য।[৯]

কাহিনির অভ্যন্তরে অরণ্যের জীর্ণতা প্রকাশিত হয় তার নাম থেকেই- জিরানিয়া অর্থাৎ জীর্ণারণ্য। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। আর আছে মজা নদী কারিকোশী। ঢোঁড়াই যখন রামিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেমন লাগছে তাদের টোলা, তার উত্তরে রামিয়া বলেছিল- 'বেশ লাগছে, তোমার টোলা। বেশ কোনো মুসলমান নেই, ডোম নেই, মুসহর নেই। কিন্তু জমি বড় বালুবুর্জ।'[১০] এই বালুবুর্জ বা একেবারে বালুভরা মাটি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত। প্রান্তিকতম এই অঞ্চলে কৃষিকাজ বিশেষ হয় না বলে তাৎমারা কুয়োর বালি তোলা আর ঘরামির কাজ করে। উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণ অবশ্য আবর্তিত হয়েছে কৃষি-নির্ভর ভারতে। জমি ও জাতের রাজ্যে পৌঁছে ঢোঁড়াই উত্তরিত হয়েছে ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে। এভাবেই উপন্যাসটি অঞ্চলের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বভারতীয় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অন্তর্মুখী সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে নানাভাবে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'গান্ধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের আগেই পূর্ণিয়ার নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন।'[১১] কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরো

বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ প্রচার করতে গিয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন পূর্ণিয়ার অন্ত্যজ তাৎমা-ধাঙর প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষকে।

ঢোঁড়াই চরিতমানসে উঠে এসেছে ধাঙর-তাৎমা-সাঁওতাল-কোয়েরির মতো পূর্ণিয়া জেলার নিম্নবর্গীয় মানুষেরা। গান্ধী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর প্রেক্ষাপটে *রামচরিতমানসের* ফ্রেমে গাঁথা এই উপন্যাসে ঢোঁড়াই ও তার চারপাশের তাৎমা-কোয়েরিদের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি মহাকাব্যিক ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর মনে নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে, নবীন ভারতের নায়ক নিম্নবর্গ থেকেই আসবে। তিনি 'ঢোঁড়াই' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন- 'এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে।'[১২] *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* সাতটি কাণ্ডে প্রধানত ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রাম-উপলব্ধি-হতাশা বর্ণিত হয়েছে। তবে ঢোঁড়াই উত্তাল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা ব্যক্তিগত হয়েও সমষ্টির প্রতিনিধিত্বকারী। তাৎমাটুলির মন্ত্রবিহীন এই অন্ত্যজরা তাঁত বোনার দূর অতীতের স্মৃতি ভুলে হয়ে পড়েছে দিনমজুর। রোজা, রোজগার আর রামায়ণ- এই নিয়ে শহর থেকে দূরে শিক্ষাবঞ্চিত তাৎমাদের অপরিচ্ছন্ন অন্ত্যজ জীবন। বর্ণসমাজের অন্তেবাসী হলেও বর্ণসমাজের চিন্তা-ধারা তাদের ভাবনার জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তাৎমাদের জাত্যাভিমান প্রবল; 'বুড়বক কিরিস্তান' ধাঙরদের তারা ঘৃণা করে। ভারতের গড়পড়তা প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি তাৎমা-ধাঙরদের চিন্তা-বিশ্বাস-ভাবাদর্শের জগৎ নানা অলৌকিক অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ- যার মধ্যে যেমন আছে জিন-গুণী-গোঁসাইথানের মহিমা, তেমনি 'গানহী বাওয়া'র অতিকথা। তাৎমা ও ধাঙরটুলীর দিনযাত্রার ঢিমেতালে সন্তর্পণে সমকালীন রাজনীতি প্রবেশ করে তাকে তপ্ত করে তোলে। নিম্নবর্গের এই মানুষেরা সভ্যতাগর্বী সমাজের কাছে অবান্তর, আর সামাজিক শক্তির সমস্ত ক্রিয়াশীলতার বিপরীতে তারা নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্ধবাক। অনিকেত ঢোঁড়াই এমনই এক নিরুদ্ধবাক বৌকা বাওয়ারই শিষ্য। ঢোঁড়াইয়ের অবাধ্যতা নিয়ে তার সব সময়ই উৎকণ্ঠা। ঢোঁড়াই যে কিছুতেই মানতে চায় না। 'পাঁচ বছর তো বয়েস হবে, কিন্তু তখনই সে কারও কাছে ছোট হতে চায় না- বাওয়ার কাছে পর্যন্ত না।'[১৩] কাউকে মানতে না চাওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে অন্তেবাসী জীবনের প্রত্যাখ্যান; অবস্থান অতিক্রমণের স্বপ্ন-সম্ভাবনা ও আত্মপরিচয় অর্জনের অভীপ্সা। জীবনের প্রতিটি স্তরে মার খেতে খেতে নিম্নবর্গ সচেতন হয়ে ওঠে, যূথবদ্ধ সচেতনতায় তাদের ভেতর অঙ্কুরিত হয় রাজনীতির বীজ। ঢোঁড়াইয়ের বাল্যকালেই পাওয়া যায় 'গানহী বাওয়া'র বার্তা :

> গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?
> ‘বড়া গুণী আদমী। বৌকা বাওয়া আর রেবণগুণীর চাইতেও ‘নামী’। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে ‘পরহেজ’। সাদি বিয়া করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।[১৪]

গানহী বাওয়ার প্রসঙ্গে উপন্যাসে একাধিকবার আসে রামচন্দ্রজীর কথা। আবিষ্কৃত হয় গান্ধীর অলৌকিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। তাৎমাটুলিতে চালকুমড়ার সবুজ গায়ের মাঝে সাদা রঙের গানহী বাওয়ার ‘মূরত’ আঁকা হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং রেবণগুণী নতি স্বীকার করে গানহী বাওয়ার কাছে ‘লোহা মানে’। গণেশপুরের বেলগাছের মগডালের পাতায় দেখা যায় স্পষ্টাক্ষরে গানহী বাওয়ার নাম। গান্ধীকে নিয়ে নিম্নবর্গ সমাজে ক্রমশ অতিকথা ছড়িয়ে পড়ে। নিম্নবর্গের মানুষকে রাজনীতিতে ব্যবহার করার জন্য গান্ধীমিথ ছড়িয়ে দেয়া হয়। ‘গান্ধী যখন মহাত্মা’ শীর্ষক প্রবন্ধে শাহিদ আমিন সতথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ‘সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের এলিট নেতৃত্ব সচেতনভাবেই নিম্নবর্গের সামনে মহাত্মা গান্ধীর পরিত্রাতা ভাবমূর্তি প্রচার করে।’[১৫] তাৎমা জাতের বিধানের বেড়ি ভেঙে যে ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল, সময়ের পরিবর্তনে সে-ই হয়ে উঠেছিল নবযুগের নায়ক। ‘যে গান্ধী মিথ নিম্নবর্গীয় মানুষকে মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থসিদ্ধির আয়ুধ বানায়, সেই মিথই আবার পরোক্ষে ঢোঁড়াইদের চোখ খুলে দেয়।’[১৬] ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে উচ্চবর্গের আপত্তি ও নিজের জাতের ‘পঞ্চ’দের নিষেধ অগ্রাহ্য করে পৈতে ধারণের অধিকার আদায় করে নেয় তাৎমারা। তথাকথিত নিচু জাতের তকমা ছিড়ে ফেলে ঢোঁড়াইরা যেন বহুদিনের লুপ্ত আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। ঢোঁড়াইভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস- এই প্রতীকী উত্তরণের মধ্য দিয়ে তারা আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়। পাক্কীর কাজে যোগদান করে প্রান্তবাসী ঢোঁড়াই যুক্ত হয় বহির্বিশ্বের সঙ্গে। অতঃপর ব্যক্তিগত প্রণয়, বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান, প্রণয়িণীর বিশ্বাসভঙ্গ- ঢোঁড়াইকে চালিত করেছে অধিকারচেতনার উত্তরণের পথে। গ্রাম-সমাজের অন্তেবাসীবর্গের যে ইতিহাসকে লেখক অনুসরণ করতে চান তার একক ঢোঁড়াই। এই দ্বান্দ্বিক বিকাশকে তুলে ধরার প্রয়োজনেই ঢোঁড়াইকে উঠিয়ে আনতে হয় বিসকান্ধায়। কারণ গ্রাম ভারতবর্ষের সামাজিক শক্তিসমূহের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ ভূমিভিত্তিক আর্থিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ঢোঁড়াইয়ের মানসপটে যে রামরাজ্যের কল্পলোক, গান্ধী আন্দোলনের বৃত্তে প্রবেশ করে তা নতুন রামায়ণের সঙ্গে জট পাকিয়ে ফেলে

নতুন সমাজ-বাস্তবতায়। সমাজের নানা স্তরে গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক বাস্তবতায় ‘দিব্যদৃষ্টি লাভ’ করে ঢোঁড়াই তিক্ত অভিজ্ঞতার সূত্রে সর্বগ্রাসী অবসাদ ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়। ঢোঁড়াইয়ের এই হতাশা ও অবসাদ শেষ পর্যন্ত বর্গেরই- কারণ ঢোঁড়াই নিম্নবর্গের অগ্রণী ব্যক্তিত্বমাত্র। দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াই শ্রেণি প্রতিপক্ষের আভাস পায়। এর আগে ছড়িদার-বাবুলাল-মাহাতো যাদের সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের সংঘাত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ সামন্ততন্ত্রের নিম্নধাপের প্রতিভূ হলেও তারা শ্রেণি প্রতিপক্ষ ছিল না। ‘ভূস্বামীর যশোকীর্তন’ অধ্যায়ে সতীনাথ অনাবৃত করেছেন জমিদারের জমি বাড়ানোর কলাকৌশল। লাঠি ঠেকিয়ে রশিদ, আঙুলের ছাপ, ফৌজদারি আদালত, দারোগা হাকিম- সামন্ততান্ত্রিক একেকটি আয়ুধ ব্যবহার করে জমি বাড়ানোই তাদের ধর্ম। ঢোঁড়াই বিসকান্ধায় এসে শোনে নতুন ধরনের বিদেশিয়ার গান :

জমিদারের সেপাই এসেছে খাজনা নিতে, রে বিদেশিয়া,
সকাল বেলা ধরে নিয়ে গেছে ভাসুরকে, রে বিদেশিয়া,
বেঁধে রেখেছে তাকে কুঠির খুঁটিতে, রে বিদেশিয়া
থালা বাটি নিয়ে যা সেপাই, বাকি খাজনার দাবিতে,
তা নয়, সেপাই আসে, রাতের বেলায় জ্বালাতে।
রে বিদেশিয়া...[১৭]

নিম্নবর্গের ঢোঁড়াইরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাথমিক প্রেরণা পায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান থেকেই। ‘মহাৎমাজী’র পাশে সর্বস্ব নিয়ে দাঁড়ানোর উৎসাহ যতনা ‘রংরেজ’কে হটানোর জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা-সঞ্জাত, তার চাইতে বেশি বর্গীয় শোষণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার স্বপ্ন-সম্ভূত। বচ্চন সিংয়ের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও লাডলীবাবু গান্ধীজির চেলা হয়ে একাধিকবার জেলে গিয়ে হয়েছে নিম্নবর্গীয় মানুষের দেবতা, দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ। ১৯৩৪ সালে জিরানিয়ার প্রবল ভূমিকম্পের পর লাডলীবাবুদের দ্বারা ঢোঁড়াইরা প্রবঞ্চিত হয়। লাডলীবাবুর সহকর্মী বচ্চন সিংয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী হতদরিদ্র কোয়েরীদের বদলে সাহায্য পায় গিরিধারী মণ্ডল ও রাজপুতরা। কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র ও লাডলীবাবুর স্বরূপ বুঝে উঠতে আশা-নিরাশার টানাপড়েনে অস্থির কোয়েরীটোলার আরও কিছু সময় লেগে যায়। কৌশল করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ‘ডিস্টিবোর্ডে’ লাডলীবাবু নির্বাচিত হলে ভোটের আগেকার প্রতিশ্রুত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হয় না। ভূমিকম্প থেকে ভোট পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ জিরানিয়ার নিম্নবর্গীয় মানুষকে অস্থির, অসহায় ও সংশয়ী করে তুলেছিল। তবু গান্ধীবাদের মহিমা ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল অটুট।

বলন্টিয়ার বাবুদের মিষ্টি কথায়, মহাত্মাজীর সন্তুষ্টির মোহে ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা কংগ্রেসকে ভোট দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উর্বর দিনগুলোতে নিম্নবর্গের জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে মধ্যবিত্ত ভূস্বামীদের শ্রেণিসহযোগী কংগ্রেস ক্ষমতায় যায়। রামরাজ্যের পূজারি ঢোঁড়াই শ্রেণি প্রতিপক্ষের নির্মম পরিহাসে হয়ে যায় 'কিরতু কোয়েরীর বেটা ঢোঁড়াই কোয়েরী'। না জেনে জাল ভোট দিতে গিয়ে ঢোঁড়াই ভাবে 'কলির রামচন্দ্র মহাত্মাজী যে অদৃশ্য তন্তুতে বাঁধছেন সহস্র মন'। কিন্তু অচিরেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। লাডলীবাবু 'চেরমেন' হবার পর বচ্চন সিংয়ের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা হয়। কিন্তু আধিয়ারদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমিসংস্কার কানুনের বাস্তবায়ন হয় না। ঢোঁড়াইয়ের মতো সহজ-সরল মানুষকে বলন্টিয়াররা 'ঢোঁড়াইজী' সম্বোধন করেই ঠকিয়ে যেতে থাকে। চিরকালের উৎপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষেরা দুটো মিষ্টি কথাতে আবেগাপ্লুত হয়। ফাঁপা সম্মানের অস্ত্রেই নিম্নবর্গের স্বপ্ন বিচূর্ণ হয়ে যায়। ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধের ধাক্কা বিসকান্ধায় এসে লাগলে ঢোঁড়াইরা বোঝে না বিলাতের যুদ্ধে বিসকান্ধার কী! এই 'রংরেজ-জর্মন' লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের উজিররা ইস্তফা দিলেও জমিদারনন্দন লাডলী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা না দিয়ে যতদিন সম্ভব 'পাবলিসে'র উপকার করে যেতে চান। এরই মধ্যে শুরু হয় সত্যাগ্রহ, নিম্নবর্গের চোখে এটাও এক তামাসা- 'সাতগরিয়ার তামাসা'। কোয়েরি-সাঁওতালদের চোখের সামনেই লাডলী-ইনসানরা সম্মিলিত চোরাকারবারে ফুলে ওঠে। অন্যদিকে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ঘটায় 'তিতলি কুঠির দহনকাণ্ড'। বাবুসাহেব প্রকাশ্য বাজারে লাঞ্ছিত হন নিরুদ্ধবাক প্রান্তবাসী জনতার কাছে। দোদুল্যমান মধ্যবিত্তকে পিছনে ফেলে নিম্নবর্গের রাজনীতি স্বতন্ত্র গতিবেগ অর্জন করে। বিবদমান সাঁওতাল ও কোয়েরীরা প্রয়োজনের সময়ে প্রতিপক্ষের প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও শ্রেণি ঐক্য গড়ে তোলে। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে কংগ্রেসি রাজনীতির মিথ্যাচার ও শূন্যগর্ভতা। 'আজাদ দস্তা' বা ক্রান্তিদলেও দেখা যায় দলাদলি ও অন্তহীন ঈর্ষাবোধ। নিরক্ষর ঢোঁড়াই তার আত্মসন্ধানের দীর্ঘ পথের শেষে সক্রিয় রাজনীতির উত্তপ্ত আবর্তে পড়ে নানা অভিজ্ঞতায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে রামায়ণ কোনোদিন বদলায় না বলে বদ্ধমূল ধারণা ছিল তার, সে বিশ্বাসও বিচলিত হয়ে যায়। ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সমাপ্ত হয় ব্যক্তিগত স্বপ্নভঙ্গে। শেষ পর্যন্ত 'রামায়ণজী' ঢোঁড়াই সেই রামায়ণকে পরিত্যাগ করে রামিয়ার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। আদ্যপান্ত ঢোঁড়াইকে কেন্দ্রে রেখে ভারতীয়

নিম্নবর্গের চোখ দিয়ে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী। মধ্যবিত্ত ও ভূস্বামী শ্রেণির রাজনৈতিক মুখপাত্র দলটির রামরাজ্যের শ্লোগান যে কতবড় ঐতিহাসিক পরিহাস ছিল, নিম্নবর্গের দৃষ্টিদর্পণে কঠিন সত্যে তা বিম্বিত হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বিপুলভাবে প্রান্তিক মানুষের চেতনতার বিবর্তনকে লেখক নিপুণভাবে গ্রথিত করে গেছেন। তবে শেষ অবধি নিম্নবর্গ চেতনার বলিষ্ঠ, সংগ্রামশীল ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি অধরাই থেকে গেছে। বিহার অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষের অন্তরঙ্গ স্বরূপ উন্মোচনে *ঢোঁড়াই চরিতমানস* সার্থক। তবে বিশেষ অঞ্চলের জীবনধারার আলেখ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতির অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও *ঢোঁড়াই চরিতমানস* অঞ্চলকেন্দ্রিক নয়। অঞ্চল এখানে সব রকমের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে সার্বিক জীবনবোধের গাঢ়তায় সীমাহীন সামগ্রিকতার সত্যে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনের পরিধিকে স্পর্শ করেছে।

ঢোঁড়াই চরিতমানসে ঢোঁড়াই ব্যক্তির জীবনবৃত্তের সংকীর্ণতাকে ভেঙেছিল তার ভিক্ষাজীবিকা পরিহার করে। রামিয়া-সামুয়র ঘটনার আঘাত ও তৎপরবর্তী বউকা বাওয়ার অন্তর্ধানের হৃদয়হীন পরিস্থিতিতে ঢোঁড়াই তাৎমাটুলীর শিকড় বিচ্যুত হয়ে পৌঁছে গিয়েছিল বিসকান্ধায়। সেখানকার জীবনে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তার সংগ্রামী সত্তা পূর্ণবৃত্ত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। নীলগাই বনহরণার ঘটনা, ভূমিকম্প দুর্গতদের সাহায্যার্থে উদ্যোগী নেতৃত্ব গ্রহণ, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেসি জনসভা গঠন, আগস্ট আন্দোলনে রেশমকুঠি দহন প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ঢোঁড়াই তাদের শত্রু-মিত্র সম্পর্কে জেনেছে। বাবু সাহেবদের অন্তহীন লোভ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা প্রতিরোধের সক্রিয় প্রচেষ্টাও করেছে :

> সবাই মিলে রাজপুত আর ভূমিহার বামুনদের ঠাণ্ডা করতে হবে। নামেই মহাৎমাজীর কাংগ্রিস। রাজপুত ভূমিহাররাই মহাৎমাজীকে ঠকিয়ে এটাকে হাত করেছে।... আমাদের সাহায্যেই ভোটে কাংগ্রিস জিতেছিল আগেরবার। এবার তাই আমরা ঠিক করেছি কুর্মছত্রি, কুশবাহাছত্রি আর যদুবংশীছত্রি এই তিন জাত মিলে রাজপুত ভূমিহারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।[১৮]

চলমান ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য পরিণামে, সামাজিক রাজনৈতিক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঢোঁড়াইয়ের চেনা জগতের পুরনো ধারণা বিচূর্ণ হয়ে যায়। নতুন সামাজিক জটিল বাস্তবতায় সত্য রক্ষার্থে চিরায়ত রামায়ণ নিজেও ব্যয়িত ও নিঃশেষিত হয়। অপরের কাছে রাজনীতির পাঠ নেওয়া ঢোঁড়াইদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়

অবধারিতভাবেই। কারণ ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস হলো উচ্চবর্গের হাতে চিরন্তন বঞ্চনার ইতিহাস।’[১৯] সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াইয়ের মতো সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়ার* (১৯৭৭) রুহিতন কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকারের* (১৯৭৯) বীরসা মুণ্ডা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল। নিজস্ব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিরসাকে প্রাণ দিতে হলেও, বিশ্বাস হারিয়ে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু রুহিতন ও ঢোঁড়াই বৃহত্তর রাজনীতির কিছু না বুঝেই রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিধায় শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে রুহিতন আত্মহত্যা করেছে আর ঢোঁড়াই করেছে আত্মসমর্পণ। ঢোঁড়াইয়ের নতুন চেতনা-বলয়ে সত্য রক্ষার গৌরব অপেক্ষা সত্যের যন্ত্রণাই বেশি। সেই যন্ত্রণা অনেকটাই আধুনিক সময়ের নৈঃসঙ্গ্যজাত। এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে *হাঁসুলি বাঁকের উপকথার* (১৯৪৭) সঙ্গে ঢোঁড়াইচরিত মানসের পার্থক্য। তারাশঙ্করের করালী অন্ধকার কাহারপাড়ার বিজয়ী নায়ক; সেখানকার অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কালনির্দিষ্ট প্রতীক। উপকথার ফ্রেমকে ব্যবহার করে কাহারপাড়ার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে করালীকে আলগাভাবে গ্রথিত রেখেছিলেন লেখক। একলা বেড়ে ওঠা করালী কাহারপাড়ার পরিবর্তনের করুণ নায়ক নয়- বনোয়ারী। যদিও করালী কিংবা বনোয়ারী কারোরই শ্রেণি প্রতিপক্ষ চিহ্নিত নয়। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সময়ের ধাক্কায় করালীর জীবনে রূপান্তর আসে এবং কাহারপাড়ার জীবন-বিন্যাস ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে ঢোঁড়াই চরিত্রের বিবর্তনের মাধ্যমে সতীনাথ ভাদুড়ী ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের এক দীর্ঘ রূপরেখা সুচিহ্নিত করেছেন। পরিবর্তনশীল রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিহারের প্রান্তীয় জনজীবনের বিচিত্র ঘটনা, সমাজের অনুভূতি ও মূল্যবোধ আন্তরিক ও শৈল্পিক নিপুণতায় প্রকাশ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। তাই *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* শিকড় চলে গেছে গ্রামজীবন ও সমাজের গভীরে- ভারতবর্ষের মানসিকতার মর্মমূলে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :

> ঢোঁড়াই চরিতমানস সতীনাথের মহচ্চূড়া। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তাঁর সামাজিক পর্যবেক্ষণ, কারাকক্ষে রামচরিতমানস পাঠ, গ্রামে গ্রামে নীচের তলাসের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ, সর্বোপরি নিজেকে বিযুক্ত করে বস্তু ও সত্যকে এক ব্যক্তির জীবনব্যাপী অন্বেষা, নিজেকে চেনা ও খুঁজে ফেরাকে দেখা এই বিপুল গ্রন্থের উপাদান।[২০]

সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অফুরন্ত হৃদ্যতা ও গভীর সহমর্মিতার প্রেরণাতেই বিহারের লোকজীবনকে তিনি সাহিত্যে শিল্পিত রূপ দিতে পেরেছেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ, সহানুভূতিপূর্ণ মন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে বিহারের গ্রামাঞ্চলে লৌকিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও সংস্কারকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। তাৎমাদের রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের কথা ঢোঁড়াই চরিতমানসের পাতায় পাতায় বিকীর্ণ। উপন্যাসে বর্ণিত তাৎমাটুলি ও ধাঙরটুলির লোকউৎসবসমূহ সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গোঁসাই থান, কর্মধর্মার নাচ, চুমৌনা, ছটপূজা, গোপষ্টমী, দুলদুল ঘোড়ার মেলা, বাঙ্গা-বাঙ্গী উৎসব, দশহরা, বিষহরি মেলা, হোলি খেলা, কুশি স্নানের মেলা প্রভৃতি উৎসব মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) কথিত নিম্নবর্গের 'কার্নিভাল'-এর প্রতিস্রোতের প্রবাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সমাজজীবনের তলদেশে যুগ যুগ ধরে সুপ্ত থাকা নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা আধিপত্যবাদী সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে শ্রেণিস্বার্থ অতিক্রমী বহুস্বর হয়ে জেগে ওঠে। লোকায়তের প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে প্রতিবাদী ও অস্তিত্ববাদী বিনির্মিত নন্দন।'[২১] *ঢোঁড়াই চরিতমানসে* বর্ণিত রাজপুত্র সদাবিচের গল্প, বিজাসিংহের গল্প, রেবণগুণির উপর গোঁসাই বাবার ভর করার গল্প, জমি ও জাতির রাজ্যে শনির দৃষ্টি সম্পর্কিত গল্প, বিহারের ভূমিকম্পে হাতির শুড় দিয়ে পাতাল থেকে জল ফেলার গল্প, মর্লি সাহেবের গল্প- পূর্ণিয়ার মানুষের মানস-পটভূমিই কেবল নয়, সামাজিক-আঞ্চলিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও প্রতিবিম্বিত করে। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ ঢোঁড়াইয়ের জগৎ গড়ে তুলেছিল তার পরিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। ভিখারি- বোবা সন্ন্যাসীর চেলা- তামাক ক্ষেতের মজুর- ক্রান্তিদলের কর্মী ঢোঁড়াই বার বার জীবনের পথ বদলে নতুন পথের সন্ধান করেছে। পাক্কী আর রামায়ণ- এই দুয়ের মধ্যে আশ্রয় নিলেও কোনো আশ্রয়ই তাকে পরিপূর্ণতা দিতে পারেনি। পূর্ণতা লাভের আশায় এক জীবনপথ থেকে আরেক জীবনপথে ছুটে বেড়ানো ঢোঁড়াইদের অন্তহীন পরিক্রমা এবং অনিবার্য নিঃসঙ্গতাই ঢোঁড়াই চরিতমানসে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*আরণ্যক* (১৯৩৮) যেখানে ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে ভানুমতীদের ভারতবর্ষ সন্ধানের গল্প, ঢোঁড়াই চরিতমানস সেখানে নিম্নবর্গের ঢোঁড়াইদের চোখ দিয়ে ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ সন্ধানের আখ্যান।'[২২] অন্ত্যজ মানুষের বিবর্তন দেখাতে গিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু রাজনৈতিক পরিবেশকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন লেখক। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন পটভূমিতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ঢোঁড়াইকে গোষ্ঠীজীবন, ব্যক্তিজীবন, কৃষিনির্ভর জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় জারিত করে তিনি গণনায়ক করে তুলেছেন। ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে কোনো আরোপিত আপাত জগৎ

তৈরি না করে ব্যক্তির আত্মসচেতনতার ক্রমবিস্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর শিল্পপ্রয়াসকে অবয়ব দিয়েছেন।

ঢোঁড়াই চরিতমানস রাজনীতি ও সমাজসত্যে অন্বিত নিম্নবর্গীয় মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনি। ব্যক্তিজীবনে সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, বিধায় ঢোঁড়াইদের জীবনে জড়িয়ে যাওয়া সমকালীন রাজনৈতিক আবর্ত ও অভিঘাতকে তিনি সুচিহ্নিত করতে পেরেছেন। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে প্রত্যন্ত বিহারের দরিদ্র মানুষের জাগরণ, আন্দোলনকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, উচ্চবর্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রবঞ্চনা- সবই তাঁর জানা ছিল। জিরানিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহ যেমন এই উপন্যাসে তথ্যচিত্রের নিপুণতায় উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি সেই অঞ্চলের তাৎমা ও ধাঙরদের অনুভব, জীবনকল্পনা, বিশ্বাস-সংস্কার ও বস্তুসত্যকে ধারণ করেও তা হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। বিহারের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মন্থর সমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তনকে উপজীব্য করে ঢোঁড়াইয়ের আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে *ঢোঁড়াই চরিতমানস*। নগণ্য এক শহরের প্রত্যন্ত এক শহরতলী তাৎমাটুলিতে বেড়ে ওঠা ঢোঁড়াইদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। অর্থনৈতিক দৈন্য এবং সংস্কারাচ্ছন্ন দৈব-মাহাত্ম্যের প্রতি আনুগত্যে নিমজ্জিত এই প্রান্তিক সমাজেও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে- গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, সামন্ত শাসন, গান্ধীজির আবির্ভাব, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ কিংবা ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনকে তারা নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনেই তাদের রাজনীতির খেলায় যুক্ত হতে হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হলেও অন্ত্যজ মানুষগুলো অশিক্ষা, দারিদ্র্য কিংবা শোষণের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিহারের নিম্নবর্গীয় তাৎমা ও ধাঙররা বারবারই রাজনীতির শিকার হয়ে চিরকাল বঞ্চিত ও অবজ্ঞাত থেকে গেছে। অন্তেবাসী এইসব মানুষের জীবনচেতনার বিবর্তনের আবহে রচিত *ঢোঁড়াই চরিতমানস* হয়ে উঠেছে এক মহাকাব্যোপম সৃষ্টিকর্ম।

তথ্যসূত্র:

১. সতীনাথ ভাদুড়ী, ‘ঢোঁড়াই’, *পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য*, মনফকিরা, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৩

২. স্বস্তি মণ্ডল, *সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৫

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সতীনাথ ভাদুড়ী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪০

৪. অতুল সুর, *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৪

৫. পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রসঙ্গ : ঢোঁড়াই চরিতমানস,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৭

৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী* ২, (সম্পাদক : শঙ্খঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ২৩৮

৭. তদেব, পৃ. ২৩৮

৮. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'ঢোঁড়াই', *পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৯. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী* ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১০. তদেব, পৃ. ৮৫

১১. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, *সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ১৯

১২. সতীনাথ ভাদুড়ী, 'ঢোঁড়াই', *পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

১৩. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী* ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৪. তদেব, পৃ. ২৮

১৫. শাহিদ আমিন, 'গান্ধী যখন মহাত্মা', *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* (সম্পাদক : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়), আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৭

১৬. দেবাশিষ ভট্টাচার্য, *বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা,* অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২০৫

১৭. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী* ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

১৮. তদেব, পৃ. ২৩৮

১৯. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, *প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৫

২০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সতীনাথ ভাদুড়ী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২১. তপোধীর ভট্টাচার্য, *বাখতিন*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮৭

২২. অমিতাভ দাস, 'ভদ্রলোকের ভারতসন্ধান ও ঢোঁড়াই চরিতমানস-এর কথনরীতি', *দিবারাত্রির কাব্য* সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, (সম্পাদক : আফিফ ফুয়াদ), কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৯৬

লোকায়ত জ্ঞাপন ও সংস্কৃতি: একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

সোনালী নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সারসংক্ষেপ: *সংস্কৃতি হল সংস্কৃত মানুষের আচারণ। বাংলায় সংস্কৃতির আর একটি অর্থ হল সৃষ্টি বা কর্ষণ। সংস্কৃতি প্রত্যেক মানুষ যে সমাজে বসবাস করে তার থেকেই শেখে এবং এই শিক্ষা ব্যক্তিকে তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস আচারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে জ্ঞাপন পদ্ধতির। সমাজ পরিবর্তন ও চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞাপন তত্ত্বের মধ্যে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও জটিলতা, এর সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে সংযোগ মাধ্যমের। ফলে লোকায়ত জ্ঞাপন ও সংস্কৃতি কোন স্থবির ধারণা নয় যুগ যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ও উত্তর আধুনিকতাবাদ পরিস্থিতিতে কিভাবে জ্ঞাপন মাধ্যমগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটে এক সংকর সংস্কৃতির রূপ ধারণ করছে তা এই ছোট গবেষণামূলক নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।*

সূচক শব্দ: *পণ্যায়ন, সংস্কৃতি, লোকায়ত জ্ঞাপন, গণমাধ্যম, উত্তর আধুনিকতাবাদ, পরম্পরা।*

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কৃত মানুষের আচারণ। বাংলায় সংস্কৃতির আর একটি অর্থ সৃষ্টি বা কর্ষণ থেকে এসেছে। এর প্রাথমিক অর্থ চাষ করা বা চাষের ফসল, প্রসারিত অর্থে মানব জীবনভূমি চাষ আবাদ এবং সে চাষের মাধ্যমে জীবনের সংস্কার সাধন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে- "কৃষি কর্মের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে বীজের সংস্কার সাধন, তার গুণগত পরবর্তন ঘটানো। এই গুণগত পরিবর্তনই সংস্কৃতি। অর্থাৎ চাষের যে অন্যতম উদ্দেশ্য সংস্কার, সেই সংস্কার ক্রিয়ার ফল হচ্ছে সংস্কৃতি"। পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের সমস্ত জীবনচর্চাই সংস্কৃতি। Sir Edward Taylor এর মতে- "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."অর্থাৎ সংস্কৃতি প্রত্যেক মানুষ যে সমাজে বসবাস করে তার থেকেই শেখে এবং এই শিক্ষা ব্যক্তিকে তার পরিবেশ ও

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি তাই মানুষের বিশ্বাস আচারণেরসঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই একজনসমাজের সংস্কৃতি অন্য জনসমাজের তুলনায় পৃথক এবং জনসমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই সেই সমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। এক সমাজের সংস্কৃতি অন্য সমাজের মধ্যে প্রসারিত হতে পারে। এবং জন্ম নেয় উন্নত সংস্কৃতির।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে জ্ঞাপন পদ্ধতির। চিহ্ন, প্রতীক, ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে ধ্বনিতে। সমাজ পরিবর্তন ও চাহিদা অনুযায়ী এই জ্ঞাপনতত্ত্বের মধ্যেও এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও জটিলতা। এরই সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে সংযোগ মাধ্যমও। "এক সময়ে দেবতার কল্পনা করে তার উদ্দেশ্যে নিজেদের ভক্তি, ভয়, স্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করাটা ছিল এক ধরণের কম্যুনিকেশান। এর থেকেই এসেছে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, মন্ত্র, কাহিনি। কালের পাতা যত উল্টেছে, এদের ভিতর সূক্ষ্ম জটিল ব্যঞ্জনা আরোপ করে ভাবপ্রকাশের ক্রমান্বিত পরিশীলন করা হয়েছে। নাচের একটা ভঙ্গি বা মুদ্রাটিই একটা ভাবসঞ্চারের মাধ্যমে পরিণত হল। একটা বাস্তবানুগ চিত্ররেখা উত্তরকালে বিশেষ কোন তাৎপর্য দ্যোতক চিহ্নে বিবর্তিত হল; একটা বিশিষ্ট ধ্বনির ব্যঞ্জনা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। যা ছিল দেবতার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর প্রতিবেদন, তাই পরিবর্তিত হয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন সঞ্চারণ মাধ্যম হিসাবে গণ্য হতে লাগল। ধীরে ধীরে তার আদি অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতেও পারে, নতুনতম সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার তাৎপর্যও হয় নতুনতর"।[১] একই সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের সাংস্কৃতিক বিন্যাস একই রকম একথাও সর্বাংশে সত্যি নয়। কারণ একই সমাজে অঞ্চলভেদে লৌকিক সংস্কার (যেমন-'স্ত্রী আচার', বিবাহরীতি, লৌকিক, পরলৌকিক ক্রিয়া) যেমন ভিন্ন হয় তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে আচার বিধানের রীতিও ভিন্ন। একই স্থানে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই সংস্কৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমন কলিকাতায় বসবাসকারী পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মানুষগুলোর মধ্যে যেমন এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছে তেমনি এদের আচার আচরণে সংস্কৃতিগত কিছু পার্থক্য প্রকট। আবার এই সংস্কৃতিগত পার্থক্য আয়ের ভিন্নতা, বয়সের তারতম্য, রুচি ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপরও নির্ভরশীল।

বিষয়গুলিকে একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। একই সমাজে মূল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী বা অঙ্গীভূত জনগণকে যেমন একই গণসংস্কৃতির অংশ বলা হয় তেমনি একই গণসংস্কৃতির মধ্যে আলাদা আলাদা বিভাজনও দেখা যায়। সাংস্কৃতিক

ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যই বা ভিন্নতা এই বিভাজনের মূল কারণ। মূল সংস্কৃতির সঙ্গে এই সূক্ষ্ম ভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে উপসংস্কৃতি। (Sub-culture)। বঙ্গের বর্তমান সমাজ বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে তুলেছে গণসংস্কৃতি এবং এর মধ্যে বহু উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে এই গণসংস্কৃতি আরো উন্নততর হয়েছে। Jhon Benett and Melvin M. Tumin এর মতে- Mass culture is a set of shared and behaviour patterns that cross cut socio-economic lines and sub cultural groupings within a complex society. These commonly shared ideas and behaviour patterns serve as points of reference and identification for members of the society. By many, then mass culture is viewed as a kind of least common denominator, and as a kind of flim hiding diversity beneath. "গণসমাজের সাংস্কৃতিক প্রবণতা হচ্ছে গণসংস্কৃতি। একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ও শিক্ষার লোকেরা থাকেন। এরা প্রত্যেকেই নানান উপসংস্কৃতির অন্তর্গত। এখন গণসংস্কৃতি হল ব্যক্তির সেই সব ধ্যান ধারণা ও আচারণ যা এই সব উপসংস্কৃতিকে ছেদ করে চলে যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে এই সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন"।[২]

"লোক সংস্কৃতির সমস্ত প্রকারের মধ্যেই খানিকটা করে হলেও, সংযোগ-সঞ্চারমূলক মূল্য রয়েছে। সেটি প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মাচার কেন্দ্রিক হয়ে প্রকাশমান হলেও, পরবর্তী সময়ে তাদের ভিতর অন্যবিধ বক্তব্যের প্রতিবেদনটুকুই মুখ্যতর হয়ে উঠেছে সন্দেহাতীতভাবে। ধরুন আমাদের ভাদু, টুসু, গম্ভীরার প্রভৃতির কথা। প্রাথমিকভাবে এরা পূজা কেন্দ্রিক, আচার ভিত্তিক হলেও কালের অগ্রগমনে এদের প্রতিবেদনের উপজীব্যটা মূলত সংবাদভিত্তিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাবিবপুরের দারোগাবাবু কিভাবে ঘুষ নিয়েছিল, তার খবর মেলে গম্ভীরার গানের বয়ানে, মানবাজারের হাটে কিভাবে জমিদারের পাইকরা এসে উৎপাত করছে সেই সমাচার পাওয়া যাচ্ছে ভাদুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানের কলিতে, ইন্দাস অঞ্চলে খরা হয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট কতটা বেড়েছে, জানা যাবে টুসু গানের কথায়। এই সমস্ত লৌকিক প্রকরণ ধর্মসম্পৃক্ত নয়, তাদের মধ্যে তো এ জিনিসটি আরো ব্যাপক। কুচবিহার, জলপাইগুড়ির চটকা গানে, অথবা চোরচুরনির পালায়, মুর্শিদাবাদের আলকানে, নদীয়ার পঞ্জীর গানে- সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংবাদ প্রতিবেদন করাটাই প্রধান

বিষয়। লেটো গান, হাপু গান সর্বত্রই সেই একই প্রবণতা দেখি। কখনো কখনো এদের মধ্যে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধর্ম চিন্তার প্রতিবেদন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ সামাজিক অর্থনৈতিক সমাচার একত্রে সহাবস্থান করে, যেমন- পটের গান। ১৯৭৮ সালের বন্যার পর তৈরী এমন একাধিক পট দেখা যায়। যার মধ্যে বিধ্বংসী বন্যার ছবির সঙ্গে সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা ইত্যাদি রূপায়ণও করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাও সেখানে চিত্রিত। প্রাসঙ্গিকভাবে যে গান বাধা হয়েছে ঐপটগুলির উপলক্ষ্যে, সেখানেও সংবাদপত্রসুলভ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। পটের ছবিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও আঁকবার চেষ্টা করেছেন লোকশিল্পী: সঙ্গে গান বাঁধা হয়েছে, দোহাই বাবু জ্যোতি বাবু তুমি ভগবান অন্ন দিয়ে এ দুর্দিনে বাঁচাইলে প্রাণ, ইত্যাদি"।[৩]

গণসংস্কৃতি একান্তভাবেই গণসমাজের সাংস্কৃতিক প্রবণতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এবং তা সেই গণসমাজের রুচি ও মনোরঞ্জনের উপর নির্ভর করে। এই সংস্কৃতি সর্বদা অত্যন্ত রুচিপূর্ণ বা তথাকথিত মার্জিত সংস্কৃতির অঙ্গ নাও হতে পারে কারণ এই সংস্কৃতি সমাজের সর্বসাধারণ ও সর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠার ফলে এতে বহু লৌকিক ও বাস্তবের প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন- যাত্রা, পালাগান, গাজন, বা বটতলার সংস্কৃতি এই ধরণের গণসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতি নান্দনিক ও সৃষ্টিধর্মী। সমাজের মনোরঞ্জনের সাথে সাথে গণসংস্কৃতি গণজ্ঞাপনধর্মীও।সমাজের বহু উত্তেজনা, প্রবঞ্চনা ও নান্দনিক বিষয়সহ কৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক বিষয়ের সমরোহ দেখা যায় গণসংস্কৃতির মাধ্যে। যেহেতু গণসংস্কৃতি একটি সমাজের গণরুচি চরিতার্থ করে তাই সেই সমাজের দাবী, প্রত্যাশা, ভালোলাগা বা নৈতিকতা প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংস্কৃতি গঠিত হয়। গণসংস্কৃতি গণসমাজের অন্তর্নিহিত এক একান্ত নিজস্ব আঙ্গিক। এই সংস্কৃতি কোন জনসমাজ পরম্পরা অনুযায়ী বহন করে।

ধর্ম, সাহিত্য ও দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, চাহিদাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের যে জগত তার সবকিছুই প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির মধ্যে। গণসংস্কৃতি সৃষ্টি হয় সাধারণ মানুষের মনন ও বাস্তব জীবনের চাহিদা অনুযায়ী ও তার বিস্তার ঘটে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যেমন-মঙ্গল কাব্যে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। এখানে লৌকিক পৌরাণিক কাব্যের মধ্যে এসেছে সামাজিক বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা, ব্রজগীত, ছড়া গানে গণসমাজ পেয়েছে প্রাত্যহিকতার ছোয়া। দেবতারা যে আচারণ করেছেন তাতে লৌকিক ভাবনার গুরুত্ব পেয়েছে। চণ্ডী-মনসার কলহ, মনসার নেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র, বা কৃষ্ণ-রাধার রোমাঞ্চকর প্রেম-ইত্যাদি দেবতাদের লোক

সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে অবাধ বিচরণ লক্ষ্যণীয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও মানসিক আকাঙ্খা মুক্তি পেত এই সাহিত্যগুলির মধ্যে। বৈষ্ণব পদাবলীকে বৈঠকী কীর্তনে রূপান্তরিত করার আকাঙ্খাও দেখা যায়। স্বরূপ চৈতন্যকে কীর্তন শোনাতেন। চৈতন্য নিজেও কীর্তন করতেন। সকলকে নিয়ে সে সংকীর্তন কিন্তু সাধারণ মানুষ সে কীর্তনের রস বা মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারত না। ফলে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে লৌকিকতার জারক রস না দিলে সংযোগের প্রশস্ত পথটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কীর্তনীয়াদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এই সংযোগ স্থাপন। ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে কীর্তনের প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। বাংলা গানের সুরের সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের সুরকে মেলানোর এক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। "কীর্তনে এল নাটকীয়তা। জানি না এই নাটকীয়তার ফলে কীর্তনের আবেদন অতিরিক্ত কিছু মানুষের মন ছুঁতে পারল কিনা। যাইহোক কীর্তন যে ধীরে ধীরে লোকমুখী হয়ে উঠল তার প্রমাণ ঢপ কীর্তনের মধ্য দিয়েই গৌরাঙ্গলীলা ও কৃষ্ণলীলার রস নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই সঙ্গে কীর্তনের আশ্রয় (অর্থাৎ পদাবলী) এক ঢঙ (অর্থাৎ সুর) লোকসাধারণের পরিচিত নেবার চেষ্টা করেছে"।[৪]

এইভাবেই গণ সংস্কৃতি সমাজ, পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে জন সমাজের মধ্যে। গণ সংস্কৃতির এই ধারাবাহিকতা, নৈতিক সংযোগ পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক ও সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী। ভাষার ক্ষেত্রের পরিবর্তনটিও লক্ষ্যণীয়। মধ্যযুগে কবিরা বাংলা ভাষার চর্চা করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষাই ছিল সাহিত্য চর্চা ও উচ্চবর্ণের সমাজের ব্যবহৃত ভাষা। লৌকিক বা সাধারণের ভাষা ছিল 'দেশী', 'লৌকিক', 'প্রাকৃত' প্রভৃতি বা কথ্য ভাষা হলেও সাহিত্যিক ভাষা ছিল না। ফলে সাধারণের বোধগম্যও ছিল না। মাধব আচার্য লিখেছেন, 'ভগবত সংস্কৃতে না বুঝে সর্বজনে/লোকভাষা রূপে কহি সেই পরমানে'। ভরতচন্দ্রের কথায় 'না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'। দৌলত কাজী লিখেছেন 'দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ/সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ'। এ থেকে বোঝা যায় বাংলা বা কথ্য ভাষার চাহিদা সাধারণ লোক সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই চাহিদাই ভারতীয় সাহিত্যগুলিকে সাধারণের বোধগম্য লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত করেছিল। কবিরা বাংলায় ঘরোয়া পরিবেশে, ঘরোয়া কথা প্রচলন বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণমঙ্গল, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা ভাষাকে দৃঢ়

ভিত্তির উপর স্থাপিত করল। কৃষিজীবি মানুষের চিন্তায় কর্মে ভাবনার প্রকাশের যে বেদনা জেগেছিল তা বাংলা ভাষার রূপে প্রকাশিত হল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত কারণ এখানে শ্রোতা শুধু ভক্ত নয় বা আধ্যাত্মভাবনাতেই মগ্ন নয় সে তার সুখ-দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবিও দেখতে পায় এই সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্য, ধর্ম বাঙ্গালী সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা অবিরত প্রবাহিত এক ধারা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই 'লোকায়ত জ্ঞাপনও সংস্কৃতি' কোন স্থবির ধারণা নয়। সামাজিক চাহিদা, মূল্যবোধ, মানুষের রুচি ও মানবিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তর আধুনিকতাবাদী জীনব সংস্কৃতি একদিকে অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক বিশ্বায়নের যৌথ প্রভাবে মানুষ যেমন তার শিকড় সংস্কৃতি থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তেমনি এক মহাজাগতিক কর্পোরেট সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে উঠেছে। "তৃতীয় বিশ্বের কম বেশী প্রায় সর্বস্তরের মানুষ ক্রমাগত গণমাধ্যম বাহিত এক নয়া ভোগবাদের আশ্রিত হয়ে পড়ছে। জীবন সংস্কৃতির সম্ভাব্য প্রায় সবকটি উপাদানের আঙ্গিকের এবং দৃষ্টিভঙ্গী বদল হয়ে চলেছে গণমাধ্যমের অতি শক্তিশালী প্রভাবে। ফলে বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের চিরায়ত প্রগতিশীল সংস্কৃতির শিকড়, জীবন সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গীর ভালো মন্দ বিচার করার প্রয়োজনবোধটাই ক্রমাগত আলগা এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে"।[৫]

উত্তর আধুনিকতাবাদ সংস্কৃতিকে সমাজ ইতিহাস পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমকালীনতাকে তথা সমকালীন জীবনকে বহু উপ জীবন ধারায় ভাগ করেছে। মানবজীবনের সব উপাদানকে পণ্যায়িত করে মানুষকে তার শিকড় সংস্কৃতি থেকে সমূলে উৎপাটিত করছে। এটাই সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিচ্ছিন্নতার সামাজিক চিত্র। ভারতীয় জীবন সংস্কৃতিতে লক্ষ্যণীয়ভাবে বিদেশী সংস্কৃতি আধিপত্য বিস্তার করছে এবং তা নির্দ্বিধায় গৃহীত হচ্ছে। নব্বই এর দশকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞাপন মাধ্যমের যে বিশ্বায়ন ঘটেছে তা ভারতীয় জীবন সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। হাসি কান্না প্রেম-বিবাহ সবই সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুভূতিগুলি পণ্যায়িত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি এক সংকর সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে।

পশ্চিমি সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ দেশীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে ক্রমাগত গ্রাস করছে। সার্বিক পণ্যায়নের দিকে আমরা দ্রুত এগোচ্ছি। এই পণ্যায়ন প্রক্রিয়ায় মূলত ভাষা, পোষাক ও আন্ত:ব্যক্তি জ্ঞাপন উপাদানগুলির পণ্যায়ন ঘটে চলেছে। ফ্রাঙ্কফুট তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিশেষতহেবারমাস, অ্যাডোরনো মতে “একচেটিয়া পুঁজিবাদী সমাজে সংস্কৃতি অথা গণ সংস্কৃতি যথেষ্ট অত্যাচারী এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবোধকে ধোঁকা দিয়ে আসলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই হরণ করে। এরা উচ্চ আধুনিকতাবাদী আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির প্রকাশ হিসেবে পপ সংস্কৃতির বিরোধীতা করেছে। এবং অন্যদিকে সংস্কৃতি শিল্প তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে গণসংস্কৃতি এবং সংশ্লিষ্ট ভোগবাদের বিকাশের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে। তারা একথাও বলেন যে প্রভাবশালী কর্পোরেট আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই গণমাধ্যম বানিজ্যিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সংস্কৃতিক আদর্শের সম্প্রচার করছে। তারা একদিকে যেমন ‘সংস্কৃতি শিল্প’ বা ‘Culture industry’ তত্ত্বের উদগাতা, তেমনি তাঁরা মানব জীবনের যাবতীয় সংস্কৃতিক উপাদানসমূহের সামগ্রিক পণ্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতেও আলোকপাত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল পরিবর্তন যেমন জ্ঞাপন মাধ্যমে এসেছে তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্কৃতির এক বিশ্বায়ন ঘটেছে। কোন সংস্কৃতিই এখন লৌকিক বা স্থানিক সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। পশ্চিমী আধিপত্যবাদ ও উগ্র পণ্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সংস্কৃতি এখন সংকর রূপ ধারণ করেছে। পশ্চিমী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের মনোজগতে এবং তা ক্রিয়াশীল হয় আমাদের আচারণে। প্রতিটি দেশ প্রতিটি জাতির প্রতিটি সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি যেখানে স্বকীয়তা, সংস্কৃতিক স্বাধীনতা গণমাধ্যম সেখানে গণযোগাযোগের ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। কর্পোরেট গণমাধ্যম ফার্ম সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কে জড়িয়ে শ্রমভিত্তিক পুঁজিকে দুর্বল করে সংস্কৃতি ভিত্তিক পুঁজিকে শক্তিশালী করে তুলছে। বিশ্ব জ্ঞাপন মাধ্যম বা গণমাধ্যমেরব্যাপক প্রভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে দেশীয় বা তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট ঘরানার তত্ত্ব অনুযায়ীধনতান্ত্রিক শ্রেণীর স্বার্থে সংস্কৃতিকে পণ্যে রূপায়িত করা হয়। সংস্কৃতিকে তৈরী এবং বিপণন করা হয় একটি সাধারণ মানদন্ডের ভিতর দিয়ে জনপ্রিয় সংস্কৃতি হিসাবে। সংস্কৃতি হয়ে পড়ে ভোগ্যপণ্য।

হারবার্ট শিনা ১৯৬৯ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড আমেরিকান এম্পায়ার’ এ জ্ঞাপনের নিরিখে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের প্রনয়ণ করেন। তার মতে মার্কিনি প্রচার মাধ্যম শিল্পসংস্থাগুলির শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে বানিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব এহেন বৈদ্যুতিক আক্রমণের পূর্বে

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য বর্তমান ছিল, যা বহির্জগতীয় মূল্যবোধের আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। বৈদ্যুতিক আক্রমণ সেইসব অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সমাজগুলির সংস্কৃতিক পূর্ণতায় আঘাত করেছে যা তাদের জাতীয়, আঞ্চলিক, উপজাতি ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করেছে।[৬]যদিও জন থমসন সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেছেন তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশে চিরায়ত সংস্কৃতির মধ্যে প্রগতিশীল মৌলবাদএবং রক্ষণশীলতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। এবং সংস্কৃতিক অস্তিত্বের দ্বন্দ্বই তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিতর্ক যাই থাকুক না কেন ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও জ্ঞাপন মাধ্যমগুলিতে যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তা সর্বজনবিদিত ও চরম সত্য। ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্বতা যেমন হারাচ্ছে তেমনি সেই সঙ্গে প্রকট হচ্ছে পশ্চিমী সংস্কৃতির উগ্র অস্তিত্ব। গণজ্ঞাপন বা লোকায়ত জ্ঞাপন মাধ্যমগুলিতে ঘটেছে বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন। দেশীয় সাহিত্য, ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি পণ্যায়নের প্রভাবে পণ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার কৃষ্টি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরেই এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। পালাগান, যাত্রা, লৌকিক রীতি যা ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্য বহন করে চলেছিল পরম্পরা অনুযায়ী তার স্থলে পশ্চিমী গণমাধ্যমের প্রভাবে ভোগবাদী মূল্যবোধ প্রভাব বিস্তার করছে। লোকায়ত জ্ঞাপন পদ্ধতিগুলি আজ গণমাধ্যমবা গণজ্ঞাপনে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজ কেন্দ্রিকতার মূল্যবোধ আজ বিলীন তার স্থলাভিসিক্ত হয়েছে সার্বজনীনবাদ বা বিশ্বজনীন মতবাদ। উগ্র উপনিবেশিকতাবাদ আজ প্রচ্ছন্নভাবে সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতাবাদের জন্ম দিয়েছে। মার্কিন সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ এখন শিলারের ভাষায় বাস্তবিক ‘মহাজাগতিক কর্পোরেট সংস্কৃতিক প্রভুত্ব’ স্থাপন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সম্পা: ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলার সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা,* পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৩২-৩৩।

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *গণজ্ঞাপন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ: ২৫০।

৩. সম্পা: ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলার সংস্কৃতি ও সংযোগ সমস্যা,* পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৩৪-৩৫।

৪. ঐ, পৃ: ১১৯।

৫. আবীর চট্টোপাধ্যায়,*জ্ঞাপনতত্ত্ব ওসংস্কৃতি,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০০৭, পৃ: ২৪২।

৬. ঐ, পৃ: ২৭২।

উত্তর-পূর্ব ভারতে অ-চর্চিত রবীন্দ্রচর্চার পুর্ণমূল্যায়ন

অনির্বাণ সাহু
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড (ভারত)

বঙ্গভারতীর উপাসনায় বর্হিবঙ্গ শুধু সৃজনী সাহিত্যের অর্ঘ্যই নিবেদন করেনি, সমালোচনার অঞ্জলিও অর্পণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যদি বাংলা সমালোচনা সাহিত্য চর্চার রাজধানী হয় তাহলে বর্হিবঙ্গকে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য চর্চার প্রদেশ বলা যেতে পারে। সমালোচনা সাহিত্যে বাংলার স্থান উজ্জ্বলতম হলেও প্রদেশগুলির চেহারা বিবর্ণ নয়। এর ভৌগোলিক সীমানা যেমন বিস্তীর্ণ, সারস্বত মানচিত্রও তেমনি কালের গাত্রে শাশ্বতভাবে উৎকীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সমালোচনা সাহিত্যের অতল মহাসাগর হলে বর্হিবঙ্গ সাগরের পাশে প্রবহমান স্রোতস্বিনী। আবার মাঝে মধ্যে সাগরের কলেবর ধারণের সাধনাতেও সমর্থ।

শুধু মহাকাব্যের সুমেরু শিখরেই নয়, আমাদের ছোটো ছোটো পর্ণকুটিরেও যে মহাযুদ্ধের মহারথ আবির্ভূত হতে পারে বর্হিবঙ্গের সমালোচকেরা সেই মহৎ সম্ভাবনার দ্বারটি উদ্ঘাটন করেছেন। শস্যশ্যামলা সরস মৃত্তিকার দেশ বাংলাই নয়, রুক্ষ রুঢ় মালভূমি ঝাড়খণ্ড প্রতিবেশী বিহার অথবা কৃপণ বর্ষার দেশ যাই হোক না কেন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এরাও ফুলের সৌরভ ছড়িয়েছে। আত্মার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেইসব অনতি পরিচিত ও অপরিচিত অথচ উজ্জ্বল প্রতিভাবান সমালোচক ও সমালোচনা মহাকালের মহাফেজখানায় মূল্যবান সম্পদ।

বাংলার সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস আজ অলঙ্ঘ্য না হলেও, বর্হিবঙ্গের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস আজও অতল অন্ধকারের অপ্রকাশে আচ্ছন্ন। বর্হিবঙ্গের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে অন্ধকার থেকে আলোকে, অপ্রকাশ থেকে প্রকাশের জগতে আনার স্বপ্ন ও সাধকে বাস্তবে রূপায়িত করার দুর্মর ইচ্ছে ও দুঃসাহস নিয়ে গবেষণার মহাসমুদ্রে সন্তরণ।

বহির্বঙ্গ ভারতে রবীন্দ্রচর্চার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব উষারঞ্জন ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একজন স্মরণীয় সমালোচক। তাঁর সমালোচনার রূপ-রীতি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অভিনব। সেই সঙ্গে বিষয় নির্বাচনেও তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তিনি একদা

অসমের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত, তেমনি সুগভীর। প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করে তিনি একই সঙ্গে সারস্বত সমাজ ও সাধারণ পাঠকের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের জনপদে, শৈলাবাসে রবীন্দ্র মহাজীবনের সচল বর্ণময় উপস্থিতি-বিষয়ে অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য একাধিক রচনা লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি বিষয় গৌরবেই শুধু নয়, আস্বাদেও বিশিষ্ট। এককথায়, রাবীন্দ্রিক সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের প্রয়োগে তাঁর সমালোচনা গ্রন্থগুলি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুণান্বিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'উত্তর-পূর্ব ভারতে রবীন্দ্রচর্চা' (প্রকাশকাল - জানুয়ারী, ২০১৭) গ্রন্থটি আলোচনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রচর্চার এক উজ্জ্বল ও প্রামাণিক গবেষণা গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্নমাত্রায় আবিষ্কৃত হয়েছেন এই গ্রন্থে। সমালোচক ভট্টাচার্য গতানুগতিক পথে না চলে, নিজস্ব পথ নির্মাণ করেছেন। তাতে বাংলা সমালোচনাও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থে যে সব আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হলো ঃ

(ক) উত্তর-পূর্বে রক্তকরবী

(খ) রবীন্দ্র-পরিষদ ও সপ্তপর্ণ

(গ) উত্তর-পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ এবং

(ঘ) মেঘের কোলে রবীন্দ্রনাথ।

অর্থাৎ এখানে আছে চারটি বড়ো আকারের প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধ 'উত্তর-পূর্বে রক্তকরবী' প্রকাশিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা'র ডিসেম্বর ২০০৬-মে ২০০৭ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধটি পড়ে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ অসমে এসেছিলেন তিনবার এবং ত্রিপুরায় এসেছিলেন সাতবার। অসমে আরও দুবার আসার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ছিল তাঁর। অসমের সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব। কবির সাহিত্যসচিব অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও অনিলকুমার চন্দ অসম-ভূমিরই সন্তান ছিলেন বলে জানা যায় এই প্রবন্ধে। অপরদিকে ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য, রাধাকিশোরের অপর সন্তান ব্রজেন্দ্রকিশোর ও কর্ণেল মহিম ঠাকুরের সঙ্গে কবির হার্দিক সম্পর্ক ছিল বলে জানিয়েছেন সমালোচক উষারঞ্জন। এককথায় সমালোচকের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি — ত্রিপুরা ও অসম ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে দুই রানী-র মতো অর্থাৎ সুয়োরানী আর দুয়োরানী। এই

প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'অসম ও ত্রিপুরার মানুষ কবিকে 'হৃদয় দিয়ে আদর করে থাকে', এ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, মানুষের 'অভ্যর্থনা' আনন্দ দিয়েছিল তাঁকে। শুধু কি তা-ই? 'দুঃখদিনের দুর্ভাবনা'-য় শিলঙেরই সেই কবে দেখা ছোট্ট ফুল 'কণ্টিকারি'র স্মৃতি ও তার 'নীল-সোনালির বাণী' কবিকে অপার শান্তি দিয়েছিল, সে-কথা লেখা আছে তাঁর কবিতায়। মেঘের দেশে এসে কবি কত-না চিঠি লিখেছেন, লিখেছেন গীতি ও কবিতা, গল্পাণু লিখেছেন, হাত দিয়েছেন উপন্যাসে, জন্ম দিয়েছেন নাটকের।' এই অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক রক্তকরবী প্রসঙ্গে বলেছেন 'রক্তকরবী নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি জায়গা মনে ভাসে, এক গ্রহণ লাগা যক্ষপুরী, অন্যটি শৈলশহর শিলং। বিষমস্বভাব দুই পুরীর, অবস্থানের দিক থেকেও বিপরীত। একটি যদি 'পাতালে', অন্যটি 'পর্বতে'। উত্তর-পূর্ব ভারতে রক্তকরবী-র মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'বহুরূপী'-গোষ্ঠীর প্রথম রক্তকরবী-র মঞ্চায়ন ঘটে ১০ মে ১৯৫৪ তারিখে কলকাতার শিয়ালদহের রেলওয়ে ম্যানসন্স ইনস্টিটিউটের হলে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের মধ্যে ওই সময়ে বা তার আগে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের আদর ছিল খুব, রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চসফলতা ও জনপ্রিয়তার সম্ভাবনায় আস্থা ছিল না তেমন কারও। 'আসাম বেঙ্গল থিয়েটার পার্টি'র সদস্যদের নিয়ে দিনেন্দ্রনাথের চেষ্টা শিলঙে মঞ্চরূপ পেয়েছিল। এর পাশাপাশি প্রাবন্ধিক আরও জানিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে সর্বপ্রথম রক্তকরবী মঞ্চায়িত হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে। এর একদিন পরে অর্থাৎ ২৬ তারিখেও আবার মঞ্চায়িত হয় রক্তকরবী। এই প্রথম দুটি অনুষ্ঠানের প্রযোজক ছিল ত্রিপুরার 'লোকশিল্পী সংসদ'। শিলঙে রবীন্দ্রনাট্যচর্চা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন 'শিলঙের এ.জি. অফিস ও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী থেকে সেরা অভিনেতাদের নিয়ে শিলঙের নাট্যচর্চার অন্যতম অগ্রপুরুষ রাখাল ভট্টাচার্য ১৯৬৬-তে গড়ে তোলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ - নাট্যসংস্থা'। রাখাল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় মোট ন-বার রক্তকরবী মঞ্চস্থ হয় — এর একবার দিল্লীতে হয়, বাকি আটবার শিলঙে হওয়ার কথা বলেছেন লেখক। রবীন্দ্রচর্চার বিস্তৃত বিবরণীও দিয়েছেন প্রাবন্ধিক। রাখাল ভট্টাচার্য পরিচালিত রক্তকরবী-র মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তিনি নানা তথ্য তুলে ধরেছেন, 'রাখাল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় কিছু কিছু অভিনবত্ব ছিল। এ যেমন প্রশংসিত হয়েছিল, কোনও কোনও মহলে এর বিরুদ্ধ সমালোচনাও হল। আলো ও ধ্বনির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা, পোশাক-আশাকে পরিবর্তন, যেমন- সর্দার পরেছেন সাফারি স্যুট — এসবকে অনেকে অ-রাবীন্দ্রিক আখ্যা

দিয়েছিলেন।' এখানে সমালোচক ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র গবেষণার দৃষ্টি প্রখর ও সত্যসন্ধানী। অসমে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি গীতাঞ্জলি-বিষয়েও সর্বাদি আলোচনা গ্রন্থের দাবিদার অসম। লেখক দক্ষিণ অসমের শ্রীহট্টের উপেন্দ্রকুমার কর; ১৯১৪-তে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ- গীতাঞ্জলি, সমালোচনা ঃ প্রতিবাদ। বিশ্রুত কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষের মুখে শুনেছি, উপেন্দ্রকুমারের গ্রন্থটি গীতাঞ্জলি বিষয়ে সর্বাদি আলোচনা গ্রন্থ।' 'উত্তর-পূর্ব ভারতে রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থে সমালোচক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন মাত্রায় আবিষ্কৃত করেছেন। তিনি বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা-র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করেননি। স্থানে-স্থানে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত গুয়াহাটি শহরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক আগে মঞ্চস্থ হয়ে থাকলেও রক্তকরবী-র অভিনয় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সনের আগস্টের ১৪ এবং ১৫ তারিখ আর্য নাট্য-সমাজ রঙ্গমঞ্চে। আর্য নাট্য-সমাজ এবং ভাস্কর নাট্য-মন্দির যথাক্রমে পুরনো গুয়াহাটির বাঙালি ও অসমিয়া নাট্যমোদীদের তীর্থক্ষেত্র ছিল। এই দুই মঞ্চে বহু নাটকের স্মরণীয় অভিনয় ঘটেছে বলে জানিয়েছেন লেখক। এই গ্রন্থে আমরা জানতে পারি, আর্য নাট্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৬ সালে। তখন এর নাম ছিল আর্য নাট্য-রঙ্গালয়। প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয় ১৯২০ সালে। নতুন নামের প্রস্তাবক ছিলেন কটন কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী। এই মঞ্চে রক্তকরবী-র অভিনয় উত্তর-পূর্ব ভারতের নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন সমালোচক। শিলঙের নাট্যকর্মী ও আবৃত্তিকার সুকুমার বাগচি রক্তকরবী-কে শ্রুতিনাটক হিসাবে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে নিয়ে আসা প্রসঙ্গে সমালোচক তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কোনও স্থায়ী সংস্থা কিংবা নাট্যদল ছাড়া নাটকের মঞ্চায়ন প্রায় অসম্ভব। সমস্যা নানারকম— মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, পোশাক, আলো ইত্যাদি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারগুলো যেমন রয়েছে তেমনই যে-কোনও নাটক মঞ্চস্থ করার আগে নিয়মিত তিন-চার মাস মহড়ার প্রয়োজন, মুখস্থ করতে হয় সংলাপ, শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে এত সমস্যা নেই। মাসখানেকের চেষ্টায় একটা পূর্ণাঙ্গ নাটকের শ্রুতিনাট্যরূপ পরিবেশন সম্ভব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রুতিনাটকরূপে রক্তকরবী-র প্রথম পরিবেশন বিষয়ে তেজপুরের স্থানীয় দৈনিক সময়প্রবাহ-তে যে তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি লেখা স্বয়ং এই গ্রন্থের লেখক উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের। তাঁর লেখাটি হল 'পৌষের ডাকঃ স্বাদু স্বাদু পদে পদে' (১৪ই জানুয়ারি, ১৯৯৫)। বাকি দুটি লেখা হল— সুকুমার বাগচির

'প্রসঙ্গ শ্রুতিনাটকঃ কানের ভেতর দিয়ে যা মরমে পশে' (২৫ শে জানুয়ারি, ১৯৯৫) এবং মানস বটব্যাল-এর 'একটি শ্রুতিনাটকের মহড়া ও তার পরিণতি' (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫)।

শিলচর শহরের দ্য শিলচর রিডিং অ্যান্ড ড্রামাটিক ইনস্টিটিউশনে রক্তকরবী-র প্রথম অভিনয় হয় বলে জানা গেছে এই প্রবন্ধে। এর সন, তারিখ সম্পর্কে প্রাপ্ত স্মৃতিনির্ভর তথ্যগুলো বড়ই বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক। তবে নাট্যাভিনয়ের নির্দেশক রুনু দেবরায় ছিলেন বলে জানা গেছে। শিলচরের প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস এই তথ্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন লেখক। শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এই নাট্যাভিনয় হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে শিলচরের 'কোরাস'-এর নাট্য উৎসবে এসে কলকাতার তৃতীয় ধারার প্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থা 'পথসেনা' মুক্তাঙ্গনে রক্তকরবী পরিবেশিত হয়। পরিবেশিত তিনটি অনুষ্ঠানের প্রথমটি হয়েছিল ২০ মার্চ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা মাঠে, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ওই সন্ধ্যায় দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। ২১ মার্চ অধরচাঁদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তৃতীয় অভিনয় পরিবেশন করে 'পথসেনা'। এর তথ্যদাতা শিলচরের বিশ্বজিৎ দাস ছিলেন বলে জানিয়েছেন সমালোচক ভট্টাচার্য। তিনি আরও জানিয়েছেন শিলচরের প্রসিদ্ধ নাট্যগোষ্ঠী 'দশরূপক' আয়োজিত নাট্যোৎসবে রক্তকরবী মঞ্চস্থ করে ত্রিপুরার খোয়াইয়ের নাট্যগোষ্ঠী 'কালচারাল ক্যাম্পেন'। তরুণ নাট্যশিল্পী সঞ্জয় কর ছিলেন এর পরিচালক। ওই অভিনয় সম্পর্কে সে সময়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল শিলচরের দৈনিক সোনার কাছাড় এবং দৈনিক প্রান্তজ্যোতি পত্রিকায়। নাট্য-পরিচালক অনুপ দাসের নির্দেশনায় ১৯৭৬-এর ৮ আগস্ট শিলচরের নাট্যসংস্থা 'নাটুকেরা' রক্তকরবী প্রযোজনা করেছিলেন। এর ঠিক ত্রিশ বছর পর ৮ জুলাই ২০০৬ শিলচরের 'রূপম' নাট্যগোষ্ঠী দাসেরই নির্দেশনায় রক্তকরবী পরিবেশন করেন শিলচরের জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তন মঞ্চে। এর পুনরাভিনয় হয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ একই মঞ্চে। দীর্ঘদিন পর রক্তকরবীর অভিনয় শিলচরের দর্শকদের মনে প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল বলে জানিয়েছেন উষারঞ্জনবাবু। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন 'নাটকটি দেখেছেন, শিলচরের এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরও সাক্ষাৎকার সাময়িক প্রসঙ্গ-তে প্রকাশিত হয়েছিল। ফণী দাশগুপ্ত, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দেবরায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, দীপেন্দু দাস অভিনয়ের গুণাগুণ আলোচনা করে তাঁদের বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।' যাইহোক, এই অধ্যায়ের পরিশেষে সমালোচক ভট্টাচার্য

আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই আলোচনা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত ও রবীন্দ্রনাথের প্রেক্ষিতে যেসব সূত্র উঠে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

১. শিলং রক্তকরবী-র আঁতুড়ঘর।

২. শিলঙে রক্তকরবী-র প্রথম পাঠ অনুষ্ঠান।

৩. নন্দিনী চরিত্রে অসমের রেবা রায় ঃ কবির প্রস্তাব।

৪. ১৯৫৪ সালের ৫ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর শিলঙে রক্তকরবী-র অভিনয়। যাঁর পৃষ্ঠপোষক তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুপ্রসাদ মেধি।

৫. ডিব্রুগড় শহরে শ্রীমতী গৌরী সেনের নাট্য-পরিচালনা।

৬. করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজে রক্তকরবী-র অভিনয়। রাজা ছাড়া সব চরিত্রে মেয়েদের অবতরণ।

৭. অসমিয়া অনুবাদে রক্তকরবী-র কয়েকটি অভিনয়। অসমিয়া ভাষায় রক্তকরবী-র দু-দুটি অনুবাদ।

৮. ১৯৬০-৬১তে অসম ছিল অশান্ত। জ্বলছিল ভাষাদাঙ্গার আগুন। সেই সংকট-সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখার উদ্যোগে রক্তকরবী-র মঞ্চায়ন।

৯. ২০০৪ সালে গুয়াহাটিতে চলচ্চিত্র ও নাট্যকর্মী অসমিয়া যুবক জ্যোতিনারায়ণ নাথের রবীন্দ্র ভাবনায় আস্থা ও তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে রক্তকরবী-র নাট্য-নিবেদন।

১০. ৫৫ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পনেরো শহরে-আধাশহরে রক্তকরবী-র অন্তত ৬০ টি অভিনয়।

এর পাশাপাশি তিনি একটি উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রও তুলে ধরেছেন যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রক্তকরবী-রমঞ্চায়নের প্রতিরূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা মন এবং হৃদয়কে করে পরিতৃপ্ত।

গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধ 'রবীন্দ্র-পরিষদ ও সপ্তপর্ণ' প্রকাশিত হয় কান্তারভূষণ নন্দী ও প্রশান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ফিনিক্স অবিরত যাত্রা' পত্রিকার পরপর দুটি সংখ্যায় অর্থাৎ অক্টোবর ২০০৬ ও জানুয়ারী ২০০৭-এ। প্রবন্ধটি যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও তথ্যসম্পন্ন। এখানে রবীন্দ্র পরিষদের ও সপ্তপর্ণের আলোচনা সভা, গঠন প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক ১৯৬২ থেকে রবীন্দ্র পরিষদের কাজের ধারায় মুগ্ধ হয়েছেন বারে বারে। সেই সঙ্গে তার বিবরণও দিয়েছেন, 'রবীন্দ্র পরিষদ-এর সদস্য

ছিলাম না বটে, কিন্তু আমাকে স্নেহ করতেন, এমন অনেকেই ছিলেন পরিষদে। তাঁরা ডাকতেন, দেখতে যেতাম, শুনতে যেতাম। পানবাজারে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শচীন সেন, অশোক সেনের বক্তৃতা শুনেছি, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি হল-এ শুনেছি অমলেন্দু বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৈত্রেয়ী দেবীর বক্তৃতা। বক্তৃতারত ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু ও সৌম্যেন্দ্রনাথের ছবি চিরজীবী আমার কাছে। এমনই আর এক সজীব চরিত্র পরিষদের সভাপতি সত্যকিঙ্কর সেন। 'রবীন্দ্র পরিষদ'-এর-বার্ষিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও প্রসারতা ছিল ভিন্ন মাত্রার। স্নিগ্ধতা ও গাম্ভীর্য ছিল বিস্ময়কর। ..... 'সপ্তপর্ণ'-তে লেখার সুযোগ হয়নি, বয়স ছিল অল্প। এখন অধিক বয়সে সুদে-আসলে মিলিয়ে লিখতে হচ্ছে পরিষদ-সপ্তপর্ণ -কথা। এর দায় ও দায়িত্ব অধিক।

এ-লেখা আমার সুখের লেখা, অ-সুখের লেখা।'

রবীন্দ্র পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক লিখেছেন, '...... স্বনামধন্য হুমায়ুন কবীর গুয়াহাটি এলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ছিল সেদিন। দীর্ঘক্ষণ ধরে হুমায়ুন কবীর রবীন্দ্রনাথ সনপর্কে যা বললেন তা গল্প-উপন্যাস-নির্ভর আলোচনামাত্র ছিল না। ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, বৈজ্ঞানিক ভাবনা এবং এর ভবিষ্যৎ সুস্থির পদক্ষেপের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তার উপযোগ নিয়ে তাঁর ভাষণটি ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।'

রবীন্দ্র পরিষদের পত্রিকা 'সপ্তপর্ণ' সম্পর্কেও উষারঞ্জন বাবু প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন, সপ্তপর্ণ 'রবীন্দ্র পরিষদ' -এর গৌরববাহী পতাকা। বর্ণময়, সৌষ্ঠবময়। ..... এর মধ্যে অনুবাদের ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সপ্তপর্ণ' -তে ইংরেজি থেকে অসমিয়া ও বাংলায় , হিন্দি থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে অসমিয়ায় ও অসমিয়া থেকে বাংলায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের অনুবাদ রয়েছে। অসমিয়া ও বাংলার পারস্পরিক অনুবাদ 'সপ্তপর্ণ' পত্রিকার ঐশ্বর্য। এ-কাজে অনুবাদকের দলে আছেন নবকান্ত বরুয়া, নলিনীবালা দেবী, নীলিমা দত্ত, প্রীতি বরুয়া, মঞ্জুমালা দাস, রতন শর্মা, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, অশোক সেনগুপ্ত, সত্যকিঙ্কর সেন, সরযূ দাস ও সুনীতি সেন (সুরজিৎ চৌধুরী ছদ্মনামে)। বাংলা ও অসমিয়া ভিন্ন অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন দীপক সেন, প্রফুল্ল শইকীয়া, সত্যকিঙ্কর সেন ও সূর্যকুমার ভূঞা।'

গ্রন্থের তৃতীয় নিবন্ধ অর্থাৎ 'উত্তর-পূর্বে রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ' প্রকাশ পায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকার জুন-নভেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে সমালোচক ভট্টাচার্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গ

উত্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন, 'অঞ্চলটিকে ভাষাতাত্ত্বিকের স্বর্গ বলার কারণ এখানে বহু সংখ্যক ভাষাগোষ্ঠী তথা জনগোষ্ঠীর বহুকালব্যাপী সহাবস্থান। আর্যভাষাগোষ্ঠীর অসমিয়া ও বাঙালিরা আছেন, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর খাসিরা আছেন, আছেন কিরাত বা ভোট-চিনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত সূক্ষ্ম বিভাজনে বড়ো, ডিমাসা, মিচিং, আদি, নাগা, মণিপুরি, মিজো, চাক্‌মা, গারো, ককবরক এবং আরও নানা গোষ্ঠী— নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। এঁরা ছড়িয়ে আছেন উত্তর-পূর্বের পর্বতে, সমতলে- কোথাও যূথবদ্ধ, কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে। বর্তমানে চারটে লিপি এসব ভাষার বাহন— অসমিয়া, বাংলা, রোমান ও দেবনাগরি। মণিপুরের একটি নিজস্ব লিপি ছিল, কেউ কেউ এর পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী।' বস্তুতঃ উত্তর-পূর্বে রবীন্দ্র সন্ধান করতে গিয়ে নানা ভাষায় বিচিত্র অনুবাদের সম্ভার সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওই সম্ভারের কিছু পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই নিবন্ধে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় পনেরোটি জনগোষ্ঠীর ভাষায় রবীন্দ্ররচনা কীরূপে ধরা দিয়েছে তার বিবরণও এখানে রয়েছে। এই ভাষাগুলি হলো ঃ অসমিয়া, খাসি, ডিমাসা, গারো, মিসিং, আও, মিজো, আদি, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরি, বড়ো, ককবরক, চাক্‌মা ও হিন্দি। এইসব ভাষায় রবীন্দ্ররচনার বিচিত্র অনুবাদ —সংবাদ পরিবেশন প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন, 'অসমের কয়েকজন সংস্কৃত পন্ডিত ও লেখক বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ করে কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমরা পাঁচজন সংস্কৃত অনুবাদকের নাম উল্লেখ করি, এঁদের মধ্যে তিনজন দক্ষিণ অসমের বা বলতে পারি বরাক উপত্যকার, দু'জন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার।' উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং এর ফলে মণিপুরি সমাজের এবং বিশ্বভারতীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটেছিল, সে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ধারাটি এখনও অব্যাহত বলে জানিয়েছেন উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।

এই গ্রন্থের চতুর্থ তথা শেষ নিবন্ধ 'মেঘের কোলে রবীন্দ্রনাথ'। এর প্রকাশ বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়, অক্টোবর ২০০৩-এ (নবপর্যায়- ৬৪)। এরই প্রশস্ততর রূপ প্রকাশিত হয় এপ্রিল-জুন ২০০৪-এর 'রবীন্দ্রভাবনা'য়। এই প্রবন্ধে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে নাম পরিবর্তিত হয়ে কীভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এ রূপায়িত হল সেই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক জানিয়েছেন, 'খ্রিস্টাব্দ ১৮৬৬। 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে সরে এসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। সেই সময় থেকেই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে'র নতুন নাম

হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। কিছুকাল পর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নবীন ব্রাহ্মদলের মতাদর্শগত বিরোধের ফলে ব্রাহ্মসমাজে আবার ভাঙ্গন দেখা দিল। বিরোধের অন্যতম কারণ— কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের নাবালক রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ। নবীনদের নতুন সমাজের নাম হল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা ১৫ মে ১৮৭৮।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' সংগঠনকে মজবুত আর জোরদার করার জন্য প্রথম পর্য়ায়ে চারজন ধর্মপ্রচারক নির্বাচন করে। এঁরা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬-১৯০১) ও গনেশচন্দ্র ঘোষ।

'খাসি'র ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'খাসি তো বাংলা ভাষার সমগোত্রীয় নয়, সে ভিন্নবর্গীয় ভাষা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভাষাতাত্ত্বিকের স্বর্গ বলা হয়। ভারতীয় আর্য ও আর্যেতর ভাষার কী যে বিচিত্র সমারোহ এ-অঞ্চল জুড়ে। কত না ভোট-চীনীয় ভাষা — মেইতেই বা মণিপুরি, বড়ো, গারো, ডি-মাসা, মিজো, নাগা, মিচিং আদি ভাষায় ছয়লাপ। ভোট-চীনীয় ভাষার বেষ্টনের মধ্যে একক দ্বীপের মতো জেগে আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর একমাত্র নিদর্শন খাসি ভাষা।'

'মেঘের কোলে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিলং ভ্রমণ প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সেইসূত্রে নানা বিদগ্ধ মানুষের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসূত্রে কীভাবে এসেছিল তাও তিনি বর্ণনা করেছেন।

যাইহোক, উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'উত্তর-পূর্ব ভারতে রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থটি প্রধানত বর্ণনামূলক। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্পর্কই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্র সৃষ্টি ও জীবনের সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যোগসূত্রকে সমালোচক নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করে এক অ-চর্চিত অনালোচিত অধ্যায় তুলে ধরেছেন। যা আজকের যুগের গতানুগতিক গবেষণার বাইরে এমন অভিনব গবেষণা সত্যই বিরল। তাই বহির্বঙ্গ ভারতে রবীন্দ্র সমালোচনা চর্চায় এই গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের দাবিদার।

শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিনের অ-চর্চিত গ্রন্থখানির পুর্নমূল্যায়ন জনমানসে উত্তর-পূর্ব ভারতে রবীন্দ্রচর্চার দিকটি প্রগতিশীল ভাবনায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

তথ্যসূত্র:

১. ‘উত্তর-পূর্ব ভারতে রবীন্দ্রচর্চা, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. দাশ শ্রীশচন্দ্র, সাহিত্য-সন্দর্শন চক্রবর্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ এবং দাশগুপ্ত এণ্ড কোং.লিঃ ১৯৫৭- ৩য় সংস্করণ
২. বসু সুদীপ, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭- ১ম সংস্করণ
৩. বসু শুদ্ধসত্ত্ব, বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, ১৩৮৫- ১ম সংস্করণ
৪. ভট্টাচার্য সাধনকুমার, শিল্পদর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪ - ১ম সংস্করণ
৫. ভট্টাচার্য ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, সাহিত্য ও পাঠক, বামা পুস্তকালয় ও পুস্তক বিপণি —
৬. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৬৫- ১ম সংস্করণ
৭. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩- ১ম সংস্করণ
৮. মুখোপাধ্যায় বিমলকুমার, সাহিত্যে বিবেক, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৭৬- ১ম সংস্করণ
৯. মিশ্র অশোককুমার, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, ১৪০৪- ১ম সংস্করণ
১০. চট্টোপাধ্যায় হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ বামা পুস্তকালয়, ১৪০২- ১ম সংস্করণ
১১. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ১৯৯৫- ১ম সংস্করণ
১২. রায় নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৪৮- ১ম সংস্করণ

‘আমি মাধবী’ : চর্চার অন্তরালে অচর্চিত কিছু কথা

সোমা দাস (চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *গাম্ভীর্যময় বিশালতায় মহাভারত এক সমষ্টিবদ্ধ জনজাতির সামগ্রিক নীতি ও ঐতিহ্যপূর্ণ জীবন অতিবাহনের ইতিহাস; রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ‘একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত’। সেই ইতিবৃত্তান্তে সমাবেশিত নারী-পুরুষই মহাভারতীয় চরিত্র। তবে সেই চরিত্র উপস্থাপনায় স্রষ্টা আপন প্রজ্ঞা ও নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষ-সাধারণ স্তর বিভাজন করেছেন। এমনই নির্বাচনের নিরিখে মহাভারতে পরোক্ষ কাহিনি অনুষঙ্গে মাধবীর উপস্থিতি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। এমনকি সমগ্র কাহিনি পরিবেশনে তাঁর নীরব শরীরী উপস্থিতি ছাড়া তাঁর আত্মোন্মোচনের পরিসর প্রদানেও স্রষ্টা বড়ই সংযমী। ফলত পুরুষ-চরিত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নারী রূপে তাঁর উপস্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই চর্চার অন্তরালে থেকে গেছে বেশ কিছু কথা। যে কথা নারীসত্তার সার্বিক মুক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যয়ী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিল অপরিহার্য। সেই অনিবার্যতায়েই, বিংশ শতকের সাতের দশকের নারী-কলমে ঘটল মাধবীর অন্তর্লোকের অচর্চিত অধ্যায়ের স্পর্ধিত উদ্ঘাটন। যে উদ্ঘাটন নারীসত্তার প্রতি পুরুষতন্ত্রের যুগাতিক্রান্ত অপরিবর্তিত ধারণা ও ভাবনাগত অবনমনের প্রতি সংযত অথচ তীব্র প্রতিবাদ। যার প্রাসঙ্গিকতা হয়তো অস্বীকার করা যায় না।*

সূচক শব্দ : *মাধবী, নারীসত্তা, ব্যক্তি-পরিসর, আত্মপ্রত্যয়, প্রতিবাদ।*

মূল আলোচনা :

> “আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিলো তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চরিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ... ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।”[১]

সত্যিই, এক বৃহৎ ইতিবৃত্তান্ত তো বটেই। কী নেই এতে? রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পরিবারনীতি, ব্যক্তিনীতি— সবকিছুই বিধৃত রয়েছে মহাভারতের সমৃদ্ধ-আয়তনে। এই সমস্ত নীতির উপস্থাপন ক্ষেত্র যদি হয় সমাজ, তবে তার প্রধান উপস্থাপক নিঃসন্দেহে গোষ্ঠীবদ্ধ জনজাতির অন্তর্গত বহু নর-নারী। যাঁরা আমাদের কাছে মহাভারতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এই বিপুল চরিত্র সমাবেশে স্রষ্টার অভিনিবেশগত আলোকসম্পাত যে সমমাত্রিক নয় তা মানতেই হয়। হতে পারে স্রষ্টা আপন প্রজ্ঞা ও অভিপ্রায় অনুসারে আপন নির্বাচনকে প্রাধান্য দিতেই এই বিশেষ-সাধারণ স্তরভেদ করেছেন। সেই স্তরভেদ যেমন নারী পুরুষের মধ্যে, তেমনই পুরুষ-পুরুষ কিম্বা নারী-নারীতে একইভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের সামাজিক নিরিখে পুরুষের প্রাধান্য ঘোষিত হলেও মহাভারতীরাও আপন প্রাধান্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন মহাভারতের পাতায়। বিশেষত সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, হিড়িম্বা, উলুপী, সুভদ্রা, সুদেষ্ণা, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা— প্রমুখরা আপন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বে মহাভারতের প্রাচীন পৃষ্ঠা অতিক্রম করে আধুনিক সাহিত্যে বিবিধ চর্চায় বহুচর্চিতও হয়েছেন। তবে কিছু চরিত্রের কথা মহাভারতকার এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের ব্যক্তিসত্তার উন্মেষণ প্রয়োজনাতিরিক্তবোধের নিরিখে তেমনভাবে প্রকাশ-পরিসর পায়নি। ফলত পারিপার্শ্বিক পুরুষ চরিত্রের নিয়ন্ত্রাধীন নারী রূপেই তাঁরা উপস্থাপিত হয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে আত্মসত্তা প্রকাশের পরিসরগত সংকীর্নতা সত্ত্বেও তাদের সহিষ্ণুতাপূর্ণ নীরব গম্ভীর উপস্থিতি আত্মপ্রকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনায় অনেক বেশি বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। এই কারণেই আধুনিক সাহিত্য-চর্চার নবপ্রবাহে তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। ঘটেছে নারীসত্তার অন্তরতম উদ্ঘাটন। যে উদ্ঘাটনে নারী তার শরীর ও মন সমস্তটা নিয়ে মহাভারতের নিয়ন্ত্রিত গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। খণ্ডিত-চর্চার অন্তরাল থেকে পূর্ণচর্চার আলোয় এসে দাঁড়ানো এমনই এক নারী 'মাধবী'।

'মাধবী' নামটা হয়তো পাঠকের ক্ষণিকের শ্রুতিগ্রাহ্য স্মৃতিতে ঝলক দিয়ে যাবে। তবে ঝলক দিয়ে মিলিয়ে যেতে পারবে না। কারণ তাঁর পরিচয় এমন এক মহাভারতীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত যিনি আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং অবশ্যই বহুচর্চিত। অথচ মাধবী তেমনভাবে চর্চিত হলেন না। এমনকি তাঁর প্রকাশ-পরিসরও নামমাত্র। বলাই বাহুল্য মহাভারতে মাধবীর উপস্থিতি পরোক্ষ ঘটনা অনুষঙ্গে। মাধবীকে, নারীসত্তার প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুভূতিহীন অতিশীতল মনোভাবের চূড়ান্ত উদাহরণ বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। আর এই কারণেই নারীসত্তার সার্বিক মুক্তি

ও মর্যাদাপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে আধুনিক সাহিত্য প্রাঙ্গনে আরও একবার শোনা যায় মাধবীর পদধ্বনি। পাঠকসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় তাঁর নির্বিরোধ আত্মসমর্পণের অন্তরালে যন্ত্রণার নিভৃত লালন। সেই মহাভারতের কাল অতিক্রম করে আর একবার তাঁর নীরব প্রতিবাদ ভাষা পায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে, 'আমি মাধবী' গল্পে। গল্পের শিরোনামই বলে দেয় এবার আর মহাভারতকারের জবানিতে নয়, মাধবী নিজেই নিজের কথা বলতে বদ্ধপরিকর। কারণ নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে নিজের কথা নিজেকেই বলতে হয়। প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করতে হয় নিজেকেই। বুঝে নিতে হয় আত্মপরিসর। তবেই অস্তিত্বের লড়াইয়ে সে হয় জয়ী।

পাণ্ডবরা চেয়েছিলেন স্বার্থ ও ধর্ম দুই-ই রক্ষা হোক। এক্ষেত্রে ধর্মসংগত ও হিতকর উপায় নিরূপণ করা একমাত্র কৃষ্ণের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং মহাভারতের 'উদ্ যোগপর্ব্বে'-র ঘটনাক্রম অনুসারে ধর্ম-অধর্ম, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বহু আলোচনার পরে কৃষ্ণ মধ্যস্থতাকারী দূত হিসেবে হস্তিনাপুর এলেন এবং যথাসময়ে রাজসভায় স্বর্ণভূষিত 'সর্বতোভদ্র' আসনে উপবিষ্ট হলেন; জানালেন তাঁর আগমন-হেতু,—

> "যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না
> হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।"[২]

তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন যুদ্ধ শুধু ধ্বংসেরই নামান্তর। সুতরাং শান্তি, ধর্মরক্ষা, প্রজাপালন ইত্যাদি সামগ্রিক অর্থে সর্বজনহিতসাধনে পাণ্ডবদের অভীষ্টপূরণ করে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণের যুক্তি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য হলেও এবং সভাস্থিত প্রায় সকলের তাতে মৌনসম্মতি থাকলেও ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি পাওয়া গেল না। সেইসঙ্গে দুর্যোধনও তার ব্যক্তি-আস্ফালন প্রদর্শণ ও পাণ্ডবদের প্রতি তীব্র বৈরীভাব অপরিবর্তিতই রাখলেন। এই পরিস্থিতিতে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবদের সম্বিৎ ফেরাতে সভায় তিনটি কাহিনি পরিবেশিত হয়—

প্রথমঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ব্যক্তি-আস্ফালনই ব্যক্তির পরাজয়ের কারণ। এই বক্তব্যের সপক্ষে জমদগ্ন্য পরশুরাম দ্বারা পরিবেশিত 'রাজা দম্ভোদ্ভব এবং নর ও নারায়ণে'-এর কাহিনি।

দ্বিতীয়ঃ নিজেকে বলবান ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে হীনবল বোধকরা ব্যক্তি-অজ্ঞতাকে যেমন প্রকট করে, তেমনই উচিত শিক্ষায় তার গর্ব চূর্ণ হয়। এরই প্রেক্ষিতে মহর্ষি কণ্ব পরিবেশিত 'সুমুখ ও গরুড়' কাহিনি।

তৃতীয়ঃ জেদের ফল ভয়ঙ্কর হয়, এই বক্তব্যের সমর্থন স্বরূপ নারদ কর্তৃক পরিবেশিত 'বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী' কাহিনি।

এই তৃতীয় কাহিনি-সূত্রেই মহাভারতে 'মাধবী' প্রসঙ্গ উত্থাপন। আগেই বলা হয়েছে মাধবীর পরিচয় সামান্য নয়। তিনি ভরত বংশীয় রাজা যযাতি-কন্যা। হ্যাঁ ইনিই সেই যযাতি যিনি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন এবং শুক্রাচার্যের নিষেধ সত্ত্বেও দানবরাজ বৃষপর্বের কন্যা শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণে তাকেও আপন ঔরসে তিনবার পুত্রবতী হওয়ার গৌরবদান করেছিলেন। হ্যাঁ ইনিই সেই যযাতি যিনি অতৃপ্ত যৌবনভোগ তৃপ্ত করতে আপন জরার বিনিময়ে পুত্রের যৌবন যাচনা করেছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করে সহস্র বৎসর অভীষ্ট সুখভোগ করেছিলেন। তবে হ্যাঁ সুখের বিষয় এই যে, সহস্র বছর সুখভোগের পরে তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।।[৩]

অর্থাৎ ঘৃত সংযোগে যেমন অগ্নি বৃদ্ধি পায় ঠিক তেমনই কাম্যবস্তুর উপভোগ কামনাকে শান্ত নয় বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়েই দেয়। ফলে পৃথিবীর সমস্তপ্রকার সম্পদ যা মানুষ কামনা করে তা তার কামনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং ঔচিত্যের বিচারে বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগই বাঞ্ছনীয়। আশ্চর্য রাজা যযাতির এই ঔচিত্যজ্ঞান জন্মাতে সহস্র বৎসর লেগে গেল। তিনি নিশ্চয় চোখের সামনে পুত্রের জরাগ্রস্থ সহস্র বৎসর যাপন দেখেছিলেন। অথচ তাঁর মধ্যে পিতৃহৃদয়ের উষ্ণ প্রশ্রয়ের এতটুকু ইঙ্গিতও আমরা পেলাম না। এমনকি তিনি যখন আত্ম-অহমিকার পাপে স্বর্গচ্যুত হলেন তখনও স্বর্গে প্রত্যাবর্তনে বসুমনা, প্রতর্দন, শিবি ও অষ্টক—এই চার দৌহিত্র, গালব ও মাধবীর সাধিত ধর্ম ও অর্জিত পূণ্য ফলের ভাগ গ্রহণে তাঁকে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্থ হতেও দেখা গেল না। সুতরাং এহেন যযাতির কন্যা হয়ে মাধবী যে খুব উপভোগ্য জীবন অতিবাহিত করবেন না তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই গালব যখন তার গুরু বিশ্বামিত্রের জন্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আটশো ঘোড়ার প্রার্থনা নিয়ে যযাতির কাছে আসেন তখন যযাতি বিনা দ্বিধায় ভাবি দৌহিত্র-প্রাপ্তিজনিত ব্যক্তিসুখ লালসায় কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে তুলে দেন।

স ভবান্ প্রতিগৃহ্ণাতু মমৈতাং মাধবীং সুতাম্।
অহং দৌহিত্রবান্ স্যাং বৈ বর এষ মম প্রভো।।[৪]

অর্থাৎ প্রভাবশালী গালবের নিকট যযাতির আগ্রহ যে তিনি তাঁর মাধবী নামক কন্যাটিকে গ্রহণ করুন। তিনি দৌহিত্রশালী হবেন ,এটাই তাঁর প্রার্থিত বিষয়। যাই হোক বোঝা গেল যযাতি ব্যক্তিসুখ ও অভীষ্টলাভ ছাড়া কিছুই বোঝেন নি কোনোদিনও। কিন্তু গালব!!

এবার আসা যাক গালবের কথায়। খুব সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক যযাতির কাছে ঘোড়া চাওয়ার নেপথ্য কারণ। "কিমাহরামি গুর্ব্বর্থং ব্রবীতু ভগবানিতি"[৫]— অর্থাৎ গুরুদক্ষিণার জন্য কী আনব বলুন ভগবান, বলে গালব যখন বিশ্বামিত্রকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন; তখন প্রায় বিরক্তিবশতই বিশ্বামিত্র বলেন—

"একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চেসাম্।
অষ্টৌ শতানি মে দেহি গচ্ছ গালব! মা চিরম্।।[৬]

গালবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। বিশুদ্ধ বংশে উৎপন্ন চন্দ্রশুভ্র আটশত ঘোড়া, যাদের একটি কান কালো বর্ণের— এমন ঘোড়া তিনি পাবেন কোথায় ? অবশেষে বন্ধু গরুড়ের পরামর্শমতো রাজা যযাতির কাছে গিয়ে গালব তাঁর প্রয়োজন ও প্রত্যাশার কথা জানান। কিন্তু যযাতির কাছে এমন অশ্ব নেই। তাই ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূরণে অশ্বের পরিবর্তে আপন কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে সম্প্রদান নয়, একরকম তুলেই দিলেন। ঘোড়ার পরিবর্তে নারী নিয়ে চললেন গালব। এরপর শুরু হয় মাধবীর অপ্রত্যাশিত জীবন অতিবাহন। জানা যায় অযোধ্যার রাজা হর্যশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস, ভোজরাজ উশীনর— এদের প্রত্যেকের কাছেই গালব-কাঙ্ক্ষিত দু'শোটি করে ঘোড়া আছে। সুলক্ষণা রাজনন্দিনী মাধবী রাজচক্রবর্তী পুত্র উৎপাদনে সক্ষম। সুতরাং প্রতি দুইশত ঘোড়ার বিনিময়ে যদি মাধবী প্রতি রাজার ঔরসে একটি করে পুত্র উৎপাদন করেন তাহলে তার 'শুল্ক' বাবদ গালবের অভীষ্ট অশ্বপ্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে। হলও তাই। তিন রাজার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে মাধবী জন্ম দিলেন যথাক্রমে তিন পুত্র— বসুমনা, প্রতর্দন, শিবি। কার্যসম্পন্ন হলে তিন রাজা ও গালবের কার্যোদ্ধারকারিনী মাধবী আবার গালবের কাছে প্রত্যর্পিত হলেন। কিন্তু আরও দুইশত অশ্ব কীভাবে পাবেন গালব ? এবারও বন্ধু গরুড়ের পরামর্শে ছয়শত ঘোড়া ও মাধবীকে গুরু বিশ্বামিত্রের হাতে তুলে দিয়ে গালব বললেন, তিনিও মাধবী দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে পারেন। বিশ্বামিত্রও মাধবীকে পেয়ে আপ্লুত। সেইসঙ্গে খানিকটা আফসোসও প্রকাশ করলেন—

" কিমিয়ং পূর্বমেবেহ ন দত্তা মম গালব!।
পুত্রা মমৈব চত্বারো ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ।।[৭]

এবারও পুত্র অষ্টকের জন্ম দিলে মাধবীকে বিশ্বামিত্র গালবের হাতে, গালব আবার যযাতির কাছে ফিরিয়ে দিলেন। পিতা যযাতি গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থল প্রয়াগে মাধবীর জন্য এক সয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী, পর্ব্বতবাসী, বনবাসী ঋষি, রাজা সকলেই এলেন সভায়। মালা হাতে মাধবী একে একে সবাইকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন এবং শেষপর্যন্ত বনভূমিকে ও তপশ্চর্যার পথকেই বরণ করে নিলেন বাকি জীবনটার জন্য।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে মাধবীর এই কাহিনিতে মাধবীকে একবার মাত্র কথা বলতে শোনা গেছে—

" স ত্বং দদস্ব মাং রাজ্ঞে প্রতিগৃহ্য হয়োত্তমান্।।
নৃপেভ্যো হি চতুর্ভ্যস্তে পূর্ণান্যষ্টৌ শতানি চ।
ভবিষ্যন্তি তথা পুত্রা মম চত্বার এব চ।।[৮]

অর্থাৎ, " অতএব আপনি সেই দুইশত অশ্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়াই আমাকে রাজার হস্তে দান করুন। এইভাবে চারি জন রাজার নিকট হইতে আপনার অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হইবে এবং আমারও চারিটী পুত্র হইবে"[৯]। প্রশ্ন এখানেই। সত্যি-ই কি এক কুমারী কন্যা বারবার হাতবদলের মধ্যে দিয়ে নিজের মাতৃত্বকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন? নকি পুরুষতন্ত্রের বাধ্যবাধকতা, নারীসত্তার অবমাননার যন্ত্রণা ও অভিমানই ছিল এই বক্তব্যের নেপথ্যে। উল্লেখ আছে প্রতিবার যথাযথ নিয়মবিধি মেনেই রাজারা মাধবীকে গ্রহণ করেছিলেন ভার্যারূপে। কিন্তু এই বিধি কি শুধুই লোক দেখানো নয় ? কারণ মাধবীকে গ্রহণের পূর্বে তাকে নিরীক্ষণের যে বর্ণনা অথবা তাকে গ্রহণপূর্বক সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যের অধিক যে কামনা সর্বস্বতার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, সর্বোপরি প্রতিক্ষেত্রে তাকে রমণের যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধার্মিক-দাতা-জ্ঞানী-তপস্বী প্রতিটি পুরুষ তাঁর শরীরকে যথেচ্ছভাবে কর্ষণ করেছেন। কারণ প্রতিবার তাকে প্রত্যর্পণে প্রতিটি পুরুষ ছিলেন দ্বিধাহীন নির্বিকার। যে নারী নির্দিষ্ট পুরুষের ঔরসে সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত তাদের সঙ্গিনীর মতো সহ-বাস করেছেন তাঁর প্রতি তাঁদের শরীরী টান ছাড়া যে কোনো মানসিক টানের উদ্রেক ঘটেছে এমন প্রমাণও মেলে নি। তাছাড়া সন্তানকে রেখে মা-কে গালবের হাতে প্রত্যর্পণ করার সময়ও মা-সন্তানের বিচ্ছেদ বেদনাকেও অনালোচিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মাধবী

এখানে একটি নারী শরীর মাত্র। যে শরীর পুরুষের প্রয়োজনে কুমারী হয়, আবার পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধিতে গর্ভিণী হয়। আবার পুরুষের ইচ্ছাতেই সয়ম্বরা হতে হয় অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের হাতে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অথচ মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে মাধবীর মতো নারীর অন্তর উদ্ঘাটনের এতটুকু পরিসর দেওয়া হয় নি। চর্চার এই কার্পণ্যই বহু প্রশ্নকে উসকে দেয়। যা বহুচর্চার প্রশস্তক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যে পরিসর মহাভারতে মাধবী পাননি, সেই পরিসর পেলেন গল্পায়তনে। মহাভারতে যে মাধবী প্রায় নির্বিরোধী, পরোকার্যোদ্ধারে উৎসর্গীকৃতা এক নারী শরীর মাত্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের আধুনিক বয়ানে পেলাম এক অন্য মাধবীকে; যে নিজের কথা ভাবে। আর সেই ভাবনার পথ ধরেই পাঠক পৌঁছে যায় তাঁর অন্তরমহলে। গল্পের কয়েকটি বাক্যবন্ধ এখানে আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত হলো যেখানে মাধবীর স্বগতভাবনায় তাঁর অনুভূতিগুলি ভাষিক রূপ পেয়েছে—

- ঘোড়ার বদলে আমি? বাবার কথার মাথামুন্ডু কিছুই মাথায় ঢুকছিল না, প্রশ্ন করাও যাবে না কিছু, সে অধিকারও আমার নেই।[১০]
- আমি গালবের প্রেমে পড়েছি, মেয়েরা কাঙ্খিত পুরুষকে পেলে তার জন্য সব করতে পারে।[১১]
- আমি স্তম্ভিত। বাকরুদ্ধ। এ কী বলেছেন গালব? মেয়ে হতে পারি কিন্তু মানুষ তো বটে। ইনি আমাকে ভাড়া খাটাতে চান?...[১২]
- ধন্য পুরুষ। ভাড়া খাটার মেয়েছেলেও চাই, টাটকা কুমারীও চাই! একই অঙ্গে![১৩]
- শরীর তো দূরের কথা, হৃদয়ে একজনের জন্য প্রণয় জাগলেই নারী আর কুমারী থাকে না![১৪]
- আমার বুকের দুধ যন্ত্রণার পুঁজ হয়ে জমে গেল। শুকিয়ে মরে গেল। তিন তিন বার।[১৫]
- শুনেছিলাম সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে সঙ্গী নাকি বন্ধু হয়। সে যদি জঙ্গলের পশু হয়, তবুও। ঋষি গালবের সঙ্গে এই ক'দিনে লক্ষ পা হেঁটেছি আমি, এক কণা দুর্বলতাও কি আমার জন্য জমে নি তাঁর মনে?[১৬]
- বড় ক্লান্ত বোধ করি, বড় অবসন্ন। নাঃ, গালবকে দেখে হৃদয়ে এখন আর এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে না। প্রণয়ের ক্ষুধা মরে গেছে, প্রথম প্রেম এখন দূরের স্মৃতি।[১৭]

- এত লোক আমাকে পেতে আগ্রহী? কেন? রাজার মেয়ে বলে? নাকি পুত্রদায়িনী সুলক্ষণা মেয়েমানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি তাই?[১৮]

পুরুষের প্রতি প্রেম, প্রেমের জন্য ত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রার্থিত স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষার লালন, পুরুষের স্বার্থমগ্নতা ও ছলনায় স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, তারই অনুষঙ্গে খন্ডিত মাতৃত্ব ও সন্তানের বিচ্ছেদ-বেদনা, পুরুষ সমাজের প্রতি ঘৃণা, নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননায় অন্তরাত্মার হাহাকার— সমস্ত অনুভূতিময় অন্তর উদ্ঘাটনে মাধবী শুধু শরীর নয় শরীর ও মন নিয়ে রক্তমাংসের মানবী হয়ে উঠেছে। আধুনিক গল্পচর্চায় মাধবী চরিত্রে স্বাধীকার ও স্বাধীন নারী ভাবনার বিস্তার ঘটেছে। গল্পের শুরুতেই তাই মাধবী প্রশ্ন তুলেছেন— '... আমার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি?'[১৯] গল্পের পরতে-পরতে মাধবী নিজের মনের স্তরগুলি উন্মোচিত করেছেন। যযাতির ঘৃণ্য বিবেচনায় চোখে জল এসেছে, গালবের নিকৃষ্ট অভিপ্রায়ে স্তম্ভিত হয়েছেন, প্রতিটি পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে ধ্বস্ত-অপমানিত হয়েছেন। সন্তানের সান্নিধ্য থেকে দূরীকৃত হয়ে অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। পিতৃ-ইচ্ছায় প্রয়াগতীর্থে আনিত চার পুত্রের জননী সয়ম্বরা মাধবীর সমাগত প্রতিটি পুরুষের আগ্রহ দেখে ঘৃণায় বিবমিষা জেগেছে এবং একই সঙ্গে তিনি শিহরিতও হয়েছেন এই ভেবে তাঁর সন্তানরাও তো একদিন হয়ে উঠবে 'এক একটা আস্ত পুরুষ মানুষ'।

মহাভারতকার শুধু উল্লেখ করেছিলেন— "নির্দ্দিশ্যমানেষু তু সা বরেষু বরবর্ণিনী। বরানুৎক্রম্য সর্বাংস্তান্ বরং বৃতবতী বনম্।।"[২০] সুতরাং শেষপর্যন্ত মাধবী কারোর প্রতি দৃক্পাত না করে সমাগত সকল বরকে একপ্রকার প্রত্যাখ্যান করে তপোবনকেই বর রূপে বরণ করলেন। অর্থাৎ কোনো পুরুষকে বরণ না করে স্বাধীন যাপনের পথেই পা বাড়ালেন মাধবী। যদিও এই দৃক্পাত না করা কিংবা 'পরিত্যাগ'[২১] বা 'প্রত্যাখ্যান'[২২] করার মধ্যে, ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রাধান্যদান ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ— এই দু'য়েরই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এক ঝলক চোখে পড়ে বটে; কিন্তু তার পরেই ধর্মীয় ঔচিত্যের অনুষঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল কেন তিনি তপোবনকে বরণ করলেন? বনোচারিণী হয়ে ব্রতপালন ও ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে কি শুধুই ধর্মসঞ্চয় বাসনাই প্রধান ছিল? নাকি এই সমাজ পরিসরের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন? যদিও গল্পে মাধবীর অন্তর্গত স্বগত ভাবনায় এমনই ইঙ্গিত পাই—

"কোনও পথ নেই? কোনও পথ নেই?

জঙ্গলে চলে যাব? বাঘ ভাল্লুক শিয়াল কুকুরদের জগত কি মানুষের সমাজের চেয়ে হীন কিছু হবে?"[২৩]

অথবা হয়তো তিনি অবমাননার যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চেয়েছেন, যা তিনি বলতে পারেন নি বা মহাভারতীয় পুরুষতন্ত্র তাকে বলতে দেয়নি। সেই অভিমানেই কি তাঁর তপশ্চারণ ? এই আচরণবিধি পালন-দ্বারা কি ধীরে ধীরে তাঁর নারীসত্তাকেই জাগরিত করেছিলেন মাধবী ? আত্মপরিচয় ও নিজস্ব পরিসরের অন্বেষণেই কি এই নিভৃত বিপ্লব সাধনা ? হয়তো তা-ই। হয়তো এই কারণেই বহুযুগ আগের সংযত নীরব প্রতিবাদ বিশ শতকের সাতের দশকের নারী কলমে এ'ভাবেই বিস্ফোরণে দ্বিধাহীন। আধুনিক সমাজে প্রতিমুহূর্তে নারীসত্তার প্রতি পুরুষতন্ত্রের ভাবনাগত যে অবনমন প্রত্যক্ষত হয়, তার প্রেক্ষিতে নারীর ব্যক্তি অস্তিত্বের প্রশ্নে আজ তাই মাধবী-কথার বহুচর্চার অবকাশ থেকেই যায় এবং যা আজ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিচয়, ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, মুদ্রণ ১৪১৫, পৃষ্ঠা-৫৮৫।
২.	রাজশেখর বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, উদ্যোগ পর্ব, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮ ত্রয়োদশ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৩৩৫।
৩.	কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতম্, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু), আদিপর্ব/৭৩/১২,১৩, বিশ্ববাণী, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা-৮৯৭।
৪.	তদেব, উদ্যোগপর্ব/১০৬/৩৫, পৃষ্ঠা-৯৮৭।
৫.	তদেব, উদ্যোগপর্ব/৯৯/২৩, পৃষ্ঠা-৯৪২।
৬.	তদেব, উদ্যোগপর্ব/৯৯/২৭, পৃষ্ঠা-৯৪৩।
৭.	তদেব, উদ্যোগপর্ব/১১০/১৬, পৃষ্ঠা-১০০৬।
৮.	তদেব, উদ্যোগপর্ব/১০৭/১৬,১৭, পৃষ্ঠা-৯৯২
৯.	তদেব, উদ্যোগপর্ব, পৃষ্ঠা-৯৯২।
১০.	সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম পর্ব), পুষ্প, ২০১২, ষষ্ঠ প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৫০।
১১.	তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০
১২.	তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১
১৩.	তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯
২০. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতম্, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু), বিশ্ববাণী, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা-১০০৯।
২১. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতম্ এর উদ্যোগপর্বে উল্লিখিত শ্লোক "নির্দ্দিশ্যমানেষু তু সা বরেষু বরবর্ণিনী। বরানুৎক্রম্য সর্বাংস্তান্ বরং বৃতবতী বনম্।।" (১১০/৫) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ -এর 'ভারতকৌমুদী' গ্রন্থে শ্লোকটি টীকা "তখন লোকেরা বরদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিলে, বরবর্ণিনী মাধবী সেই সকল বরকে **পরিত্যাগ** করিয়া তপোবনকেই বররূপে বরণ করিলেন।।" হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু), বিশ্ববাণী,১৩৩৮, পৃষ্ঠা-১০০৯।
২২. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতম্ এর উদ্যোগপর্বে উল্লিখিত শ্লোক "নির্দ্দিশ্যমানেষু তু সা বরেষু বরবর্ণিনী। বরানুৎক্রম্য সর্বাংস্তান্ বরং বৃতবতী বনম্।।৫।।" রাজশেখর বসু কৃত মহাভারতের সারানুবাদে শ্লোকটির ব্যাখ্যা " কিন্তু মাধবী সকলকে **প্রত্যাখ্যান** ক'রে তপোবনকেই বরণ করিলেন।", রাজশেখর বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, উদ্যোগ পর্ব, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮ ত্রয়োদশ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৩৪১।
২৩. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম পর্ব), পুষ্প, ২০১২, ষষ্ঠ প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৫৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, মুদ্রণ ১৪১৫,
২. রাজশেখর বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮ ত্রয়োদশ মুদ্রণ।
৩. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতম্, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনু), ভারতকৌমু, বিশ্ববাণী, ১৩৩৮।
৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম পর্ব), পুষ্প, ২০১২, ষষ্ঠ প্রকাশ,

বিদ্যাসাগর ও ব্যাকরণকৌমুদী

দীপঙ্কর পাত্র
সংস্কৃত বিভাগ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ,
নববারাকপুর, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : *সর্বজনীন জনশিক্ষা-প্রয়াস ব্যতীত সমাজের শ্রীবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা সীমিত। শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন আবার সবরকমের কুসংস্কারে মুক্ত হবেন না, তবে সেই শিক্ষা পিছু হটতে বাধ্য। আর তাই ভাষাশিক্ষাকে অধিকতর যুক্তিসম্মত ও সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করার অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছিল। সেকালের বিবেচনায় আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান সংস্কারমূলক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী মূল্যায়নে যুক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণকারগণের মনন-স্বাতন্ত্র্যে প্রবেশ করে বিদ্যাকে চন্দ্রের গুণে রঞ্জিত করে সকলের জ্ঞানচক্ষু স্বরূপ আনন্দানুভূতির মেরুদণ্ডে পরিণত করা শ্রেয় ।*

মূলশব্দ: *প্রেক্ষাপট, নামকরণ, ব্যাকরণকৌমুদীর অসাধারণত্ব।*

মূল আলোচনা:

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রশর্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়) বা বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিস্মরণীয় বহুবিধ কীর্তির দ্বারা কীর্তিত। সাধারণত সমাজ সংস্কারক রূপেই তিনি অধিক বিখ্যাত। বিধবা -বিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষা বিস্তার, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ, দুর্গতদের সেবা, আদিবাসী কল্যাণ, দানকর্ম, বিপদগ্রস্ত প্রতিভাবানগণের (মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি) সাহায্য করা ইত্যাদি কর্মের জন্যই অধিকাধিক ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করেন। এছাড়াও 'বর্ণপরিচয়' ও আধুনিক বাংলার প্রচলনের সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর রচিত বিবিধ কৃতি (ভ্রান্তিবিলাস, সীতার বনবাস, রামের রাজ্যাভিষেক, বেতালপঞ্চবিংশতি, নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস, শকুন্তলা প্রভৃতি) উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি বহুল উচ্চারিত হলেও 'বিদ্যাসাগর' শব্দটি শ্রবণমাত্রই অগাধ পাণ্ডিত্যের যে অর্থ দ্যোতিত হয়ে থাকে, সেই পাণ্ডিত্যের নিরীক্ষে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ণ খুব কমই হয়েছে। তিনি যথার্থ অর্থেই বিদ্যাসাগর ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলংকারশ্রাস্ত্র ও দর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁর সত্যসত্যই অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সংক্রান্ত কিছু রচনাও রয়েছে। তথাপি সংস্কৃতপ্রেমী, সংস্কৃতপাঠী বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ঈশ্বরচন্দ্রশর্মা কোন উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য বা শ্রাস্ত্রগ্রন্থের জন্য আসন লাভ করেননি, তিনি 'ব্যাকরণকৌমুদী' গ্রন্থের রচনার মধ্য দিয়ে তাদের মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে আছেন।

প্রেক্ষাপট

সংস্কৃতভাষায় ব্যাকরণ পরম্পরাটি বিশাল ও দুরবগাহ। ভাষাটি যেমন পুরাতন তেমনি এই ভাষার ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের ইতিহাসটিও অতি প্রাচীন। মোটামুটি এই ব্যাকরণ পরম্পরাকে দ্বিধা বিভক্ত করা যায় পাণিনীয় ব্যাকরণকে মধ্যস্থরূপে অবধি করে। অর্থাৎ পাণিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণ (মাহেশ, ঐন্দ্র, ভাগুরীয়, কর্ম্মন্দিবিবরণ বা কর্ম্মন্দবিবরণ,কাশকৃৎস্ন, সেনকীয়, কাশ্যপি, স্ফোটায়ণ, চক্রবর্ম্মণীয়, আপিশল, শাকল্য, ভারদ্বাজীয়, গালব ব্যাকরণ) সম্প্রদায়, পাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায় ও পাণিনি উত্তরবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ব্যাকরণ (কলাপ বা কাতন্ত্র, চান্দ্র, জৈনেন্দ্র, শাকটায়ন, সিদ্ধেহেম, সারস্বত, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ, প্রয়োগরত্নমালা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ) সম্প্রদায়। এর মধ্যে পাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম অধিক প্রোজ্জ্বল। পাণিনীয় 'অষ্টাধ্যায়ী' (যা খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে রচিত) গ্রন্থে চার হাজার সূত্র রয়েছে। বিদ্বান্‌গণের মতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমবিভাগে অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় গভীর ও বিস্তৃত ব্যাকরণ বিশ্বে কোন ভাষায় রচিত হয়নি। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে কাত্যায়ন বররুচি অষ্টাধ্যায়ীর উপর 'বার্ত্তিক', পতঞ্জলি বার্ত্তিকের উপর 'মহাভাষ্য', কৈয়ট মহাভাষ্যের টীকা 'ভাষ্য-প্রদীপ' রচনা করেন এবং প্রদীপেরও কয়েকটি টীকা রচিত হয়। তার মধ্যে নাগেশ ভট্টের 'উদ্যোত' প্রসিদ্ধ। আবার বামন ও জয়াদিত্য (ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর) 'কাশিকা' নামক এক বৃত্তি রচনা করেন। এরপর পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করে ভট্টোজী দীক্ষিত রচনা করেন 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' যা প্রায় সর্বত্র পঠিত হয়ে থাকে। এই মহত্মপূর্ণ পাণীনিয় ব্যাকরণ সূক্ষ্মযুক্তির উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায় তা শুধু লৌকিক সংস্কৃত ভাষার নয়, বৈদিক ভাষারও ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে। এই কারণে পাণিনীয় ব্যাকরণ অতি বিশাল ও অতি কঠিন। তা সাধারণের নাগালের বাইরে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই ব্যাকরণে অধিক প্রচলন থাকলেও অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে অর্থাৎ আসাম, অবিভক্ত বাংলায় ও উৎকলে (উড়িষ্যায়) - পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রচলন ছিলনা। সেহেতু বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নের প্রচার-প্রসার উত্তর ও দক্ষিণ ভারতেই অধিক ছিল। বিশেষতঃ আসাম ও বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে এই সকল স্থান আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল। রাজা আদিসূরের উদ্যোগে কনৌজের ব্রাহ্মণগণ এই সকল স্থানে বসবাস করে আর্যসংস্কৃতি ও সংস্কৃতে প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। এখানে তাঁরা বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করলেও বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রসার ঘটাননি বা ঘটাতে পারেননি। পরিবর্তে সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতি ও মুখ্যতঃ ন্যায় শাস্ত্র অবলম্বনে সংস্কৃতের প্রচার - প্রসার ঘটে ছিল। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণবদর্শন অবলম্বনেও সংস্কৃতের চর্চা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণির উক্তিটি প্রামাণ্য-

"কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে।
শব্দেষু সূক্তিতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।"

এখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বেদকেন্দ্রিক সংস্কৃত চর্চা হতো বলেই লৌকিক ও বৈদিক - এই উভয় ভাষায় ব্যুৎপাদক পাণিনীয় ব্যাকরণে উপযোগ অনিবার্য, কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে তা ততোটা জরুরী নয়। কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শনের চর্চায় পাণিনীয় ব্যাকরণের ততোটা গুরুত্ব নেই। সুতরাং পাণিনীয় ব্যাকরণের সূক্ষ্মযুক্তির ধারণা করা ও আয়ত্ব করার জন্য যে শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হবে তা যদি কাব্যাদি চর্চায় নিয়োগ করা যায় তবে কাব্যপ্রভৃতিতে অধিক উৎকর্ষক লাভ করা সম্ভব। ব্যাকরণ শুধু ভাষার শুদ্ধি রক্ষা করার জন্যই প্রয়োজন। তাই ভাষা সুদ্ধির জন্য যেটুকুই অনুশীলনের প্রয়োজন সেটুকুই ব্যাকরণের দরকার। এই কারণে কাতন্ত্র বা কলাপ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী), মুগ্ধবোধ (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী), সারস্বত (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী), হরিনামামৃত (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) প্রভৃতি ব্যাকরণগুলি রচিত হয়। তারপর ব্যাকরণগুলি চর্চা যখন শুরু হলো তখন এগুলির উপর টীকা - ভাষ্যাদিও রচিত হলো। বঙ্গদেশে এইভাবে কাব্যাদির সঙ্গে সঙ্গে অপাণিনীয় পাণিনি পরবর্ত্তীকালে ব্যাকরণ চর্চাও শুরু হতে লাগল। বঙ্গে মহম্মদীয় প্রবর্ত্তীত হয়েছে, তবুও সংস্কৃত চর্চার স্রোতে কোন ভাটা পড়েনি। কিন্তু ইংরেজ শাসন কায়েম হতে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বঙ্গ দেশে প্রবেশ করল তখন সংস্কৃত চর্চাতেও শৈথিল্য দেখা দিল। মেধাবী ও উচ্চবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানগণ সংস্কৃত থেকে বিদেশী ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ইত্যাদি, পাশ্চাত্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাঠে মনোযোগী হলো। তখন সহজ করে লেখা কলাপ, মুগ্ধবোধ ইত্যাদি ব্যাকরণও তাদের কাছে কঠিন বোধ হতে লাগল ফলে ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চার সঙ্গে যে টুকু সংস্কৃত পড়তে হতো তাতেও এই ব্যাকরণের ভীতি সংস্কৃত পাঠে অনিহার সৃষ্টি করলো। সুতরাং বঙ্গীয় সমাজের অধিকাংশই সংস্কৃত চর্চায় অনিচ্ছুক হতে শুরু করলেন। তখন সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণকে আরো সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত অধ্যাপনায় রত হয়ে এই তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রাথমিক স্তরে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে একটি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলাভাষায় রচনার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে কম সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীগণ সংস্কৃতভাষাকে আয়ত্ব করতে ও সংস্কৃতভাষাতে লিখতে-বুঝতে পারে। এরই ফলস্বরূপ আমরা বংলাভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ লাভ করলাম ১৮৫৩ সালে, যার নাম হল 'ব্যাকরণকৌমুদী'।

নামকরণ

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নামকরণ করেন 'ব্যাকরণকৌমুদী'। 'কৌমুদী' অর্থ হল চন্দ্রের কিরণ। ব্যাকরণের কৌমুদী - 'ব্যাকরণকৌমুদী'। অর্থাৎ ব্যাকরণের চন্দ্র কিরণ। এর তাৎপর্য হল ব্যাকরণের প্রকাশক চন্দ্রকিরণ। এই নামকরণের সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বোঝাতে চাইলেন যে তাঁর ব্যাকরণ পুস্তকটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণের কাছে অত্যন্ত অনায়াসবোধ্য। এখন প্রশ্ন হল কি করে এটা বোঝা গেল? এমন বলাই বাহুল্য ব্যাকরণ বলতে সংস্কৃত ব্যাকরণকে বোঝান হয়েছে। চন্দ্রের কিরণ যেমন রাত্রিতে অন্ধকার দূর করে গৃহাদিকে প্রকাশ করে তেমন এই পুস্তকটিও অজ্ঞানতা দূর করে ব্যাকরণের মর্মার্থ প্রকাশ করে। পুস্তকটিকে কৌমুদী বলা হয়েছে বা কৌমুদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন কেন কৌমুদী বলা হল? সূর্যকিরণও অন্ধকার দূর করে গৃহাদিকে প্রকাশ করে। উত্তরে বলা যায় তা ঠিক, কিন্তু সূর্যকিরণ বস্তুকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় তাপ প্রদান করে। সেই তাপে চক্ষু উন্মীলিত রাখা কঠিন হয়, অর্থাৎ সকলে সেই তাপ সহ্য করতে পারে না। আর কৌমুদীর গুণ হল তা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, তা বস্তুকে প্রকাশ করার সঙ্গে শীতলা প্রদান করে। এই ভাবেই স্বরচিত পুস্তককে কৌমুদী বলাব মাধ্যমে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতে চাইলেন যে তাঁর পুস্তকটি শুধু ব্যাকরণের মর্মকেই প্রকাশ করেনা, ব্যাকরণকে হৃদয়গ্রন্থী করে তোলে বা তুলবে।

ব্যাকরণকৌমুদীর অসাধারণত্ব

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা সংস্কৃত বর্ণমালাকে গ্রন্থে যেভাবে প্রকাশ হতে দেখি, সেই প্রকাশ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখন আলোচনার প্রয়োজন—

পাণিনীয় ব্যাকরণে সূত্রগুলিকে সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুগম্ভীর অর্থের প্রকাশ করতে গিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলিকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তাতে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও ব্যাকরণটি সাধারণের কাছে বিশেষতঃ প্রথম পাঠার্থীর কাছে দুরধীগম্য হয়ে পড়েছে। যেমন পাণিনীয় ব্যাকরণের বর্ণমালাকে চোদ্দটি মাহেশ্বর সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে আ, ঈ ইত্যাদি দীর্ঘবর্ণগুলির আক্ষরিক উল্লেখ নেই। এছাড়াও আগে বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি, তারপর চতুর্থ বর্ণগুলি-এই ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এতে অসুবিধা হল যে প্রথম পাঠার্থী দীর্ঘবর্ণগুলির পরিচয় আক্ষরিকভাবে পায় না। এতে বোঝাতে হবে — 'অ' বলতে আ-কে বুঝতে হবে, এছাড়াও এক একটি বর্গের সমস্ত বর্ণগুলিকে আলাদা করে বোঝালে বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু মাহেশ্বর সূত্রে তা মেশান রয়েছে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পথে না হেঁটে অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি ক্রমে

স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণগুলির পরিচয় দেন। সেই সঙ্গে বর্ণযোজনা অ-কার, আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার, এ-কার, ঐ-কার, ও-কার, ঔ-কার সংযোগ। অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু যোগ। সংযোগবর্ণ — য-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, র-ফলা, ত্র-ফলা, ম-ফলা, এবং তিন অক্ষরের মিশ্রসংযোগ — ক্ষ্ণ- ক্‌+ ষ্‌ + ণ, ষ্ট্র-ষ্‌ + ট্‌ + র প্রভৃতি এবং বর্গীয় বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও প্রথমে ক-বর্গীয়, চ-বর্গীয় প্রভৃতিব ক্রম নির্দেশ করেছেন। এতে শিক্ষার্থীগণ অনায়াসে বর্ণের পরিচয় লাভ করতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবদান অনস্বীকার্য।

সন্ধির ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনন্য পরিপাটী দৃষ্ট হয়— পাণিনীয় সূত্র হল - 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬/১/১০১)। পাণিনি এই একটি সূত্রেই অনেক কথা বলেছেন, অর্থাৎ অ, ই, উ, ঋ - এই সকল স্বরবর্ণের সবর্ণদীর্ঘসন্ধি - এই একটি সূত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাতে সংক্ষেপে অনেক কথা বলার বিচক্ষণতা প্রকাশ পেল বটে, কিন্তু তাতে প্রথম পাঠার্থী সুকুমারমতি শিক্ষার্থীগণ অথৈজলে পতিত হলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদীতে এই সবর্ণদীর্ঘসন্ধিটি অনেক স্থান জুড়ে ব্যাখ্যাত হলেও উক্ত বিদ্যার্থীগণ অতি সহজেই তা হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হন। তিনি অ,ই ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্বরবর্ণের জন্য সহজ বাংলায় আলাদা আলাদা নিয়ম করে দিলেন—

(১) অ বা আ - এরপর অ বা আ থাকলে উভয় মিলিয়া আ-কার হয়—

অদ্য + অবধিঃ = অদ্যাবধিঃ (অ+ অ = আ)

বিদ্যা + অর্ণবঃ = বিদ্যার্ণবঃ (আ+ অ = আ)

গদা + আঘাতঃ = গদাঘাতঃ (আ+ আ = আ)

(২) ই বা ঈ - এরপর ই বা ঈ থাকলে উভয় মিলিয়া ঈ-কার হয়—

অতি + ইব = অতীব (ই+ ই = ঈ)

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা (ই+ ঈ = ঈ)

লক্ষ্মী+ ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ (ঈ+ ঈ = ঈ)

এইরূপে অন্যান্য সবর্ণদীর্ঘসন্ধি ব্যাখ্যায় শিক্ষার্থীগণের সুখপাঠ্য করে তোলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়।

কারক - বিভক্তি আলোচনার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ বোঝানোর অনন্য সাধারণ নৈপুন্য প্রকটিত হয়েছে। তিনি বিভক্তির লক্ষণে বলেছেন— 'সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ' । পাণিনীয় ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'সুঔজস্‌' প্রত্যয়গুলি বিভক্তি। কিন্তু সাধারণভাবে সেই বিভক্তিগুলির কি অর্থ প্রকাশ করে তা অব্যক্ত। শুধু

বিশেষ বিশেষ বিভক্তির আলোচনার প্রসঙ্গে সেই বিভক্তিগুলি কি কি অর্থ প্রকাশ করে তা বলা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিভক্তির লক্ষণের মাধ্যমে সাধারণভাবে বিভক্তি যে সংখ্যা, কারক ইত্যাদি প্রকাশ করে তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন। তবে 'সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ' এই বললে একটি সমস্যা থেকে যায়। সংখ্যা, কারক ইত্যাদি কেবল বিভক্তিরই অর্থ নয়, অন্য প্রত্যয় বা প্রাতিপদিক হতেও এই সকল অর্থ বোঝা যায়। তা হলে সেগুলিতে বিভক্তি লক্ষণে অতিব্যপ্তি দোষ হয়। উত্তরে আমাদের মনে হয় যে 'সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ'-এটি বিভক্তির লক্ষণ, একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতে চাননি। তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে এটি বিভক্তির স্বরূপ। ফলে অতিব্যপ্তি দোষের প্রশ্ন আসে না। এরপর বিশেষ বিশেষ বিভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে বিবাদেন অলম্, ধর্মেন হীনাঃ, জলেন প্রয়োজনম্— ইত্যাদির ছলে তৃতীয়া বিভক্তির হেতু কী, সেই বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণে কোন আলাদা সূত্র নেই। পাণিনীয় ব্যাকরণ মতে গম্যমান সাধনাদি ক্রিয়াকে অবলম্বন করে 'সাধকতমং করণম্' (১/৪/৪২) -এই করণ কারকত্বের বিধায়ক সূত্রের দ্বারাই এই সকল স্থলে বিবাদাদির করণ সংজ্ঞা হয়। তারপর 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' (২/৩/১৮)-এই সূত্রে এখানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এখন এখানেও আমরা প্রতক্ষ্য করি যে পাণিনীয় মতে উক্ত বিবাদাদিকে করণ-কারকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে লঘু উপায়ে অনেক কথা ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ধীশক্তি সম্পন্নগণের কছে তা রুচিকর হলেও সাধারণ বিদ্যার্থীগণের কাছে তা বোধগম্য হয়না। গম্যমান ক্রিয়া কী? -এই সকল বিচার করতে করতেই তাঁদের নাভিশ্বাস ওঠে। এখানে পরিত্রাতারূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদিত হলেন। তিনি বললেন 'ঊণবারণপ্রয়োজনার্থৈশ্চ' অর্থাৎ ঊণার্থক (ঊন, হীন, শূন্য, রহিত), বারণার্থক (অলম্, কিম্, কৃতম্) ও প্রয়োজনার্থক (প্রয়োজন, অর্থ, কার্য, গুণ) শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এতে খুব সহজেই বোঝা গেল এবং গম্যমানক্রিয়াদির স্বরূপ না বুঝেও অনায়াসে অতি সাধারণ বিদ্যার্থীগণও প্রয়োগগুলি করতে পারেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের জটিলতার বিভীষিকা থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদী মুক্ত।

সমাসের আলোচনাতেও আমরা দেখতে পাই যে পাণিনীয় ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। পাণিনীয় ব্যাকরণে অতিসূক্ষ্ম বিচার করে সমাসকে চার রকমের বলা হয়েছে- দ্বিগু ও কর্মধারয়কে তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত করে আবার অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব- এই চার রকম বিভাগ করেও পাণিনীয় বৈয়াকরণগণ ক্ষান্ত হননি। এতেও নানাবিধ সূক্ষ্মদোষ আশঙ্কা করে সমাসকে ছয় ভাগে বিভিক্ত করেছেন—

'সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্‌বিধো বুধৈঃ।।'

অর্থাৎ (১) সুবন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের — রাজপুত্রঃ
(২) সুবন্ত পদের সঙ্গে তিঙন্ত পদের — পর্য্যভূষয়ৎ
(৩) সুবন্ত পদের সঙ্গে নাম পদের — বনেচরঃ
(৪) সুবন্ত পদের সঙ্গে ধাতুর — অজস্রম্
(৫) তিঙন্ত পদের সঙ্গে তিঙন্ত পদের — খাদতমোদতা
(৬) তিঙন্ত পদের সঙ্গে সুবন্ত পদের — কৃন্তবিচক্ষণা

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পথে না হেঁটে তিনি সাধারণের সহজবোধ্য করে প্রচলিত নিয়মে সমাসের বিভক্তিকরণ করেন। দ্বিগু ও কর্মধারয়-কে পৃথক্ সমাস বলেই উল্লেখ করেছেন । এছাড়াও 'সিংহাসনম্' ইত্যাদিস্থলে পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাসের নাম হল- 'শাকপার্থিবাস্যোপসংখ্যানম্' (বা) অর্থাৎ শাকপার্থিবাদিবৎ বা উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। সিংহচিহ্নিতম্ আসনম্-এই বিগ্রহবাক্যে 'চিহ্নিতম্' পদটি হল উত্তরপদ। কিন্তু সাধারণ বিদ্যার্থীগণের কাছে তা বোঝা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে পরে। তারা দেখে যে সিংহ-চিহ্নিত-আসন তিনটি পদ রয়েছে এবং চিহ্নিত পদটি মধ্যবর্তী থাকায় তা মধ্যপদ, ফলে উত্তরপদলোপী সমাস কিভাবে হয় তা বোধগম্য হয়না। সুতরাং উক্ত সকল মধ্যমেধা বিদ্যার্থীগণের কথা মাথায় রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় নামকরণ করেন- মধ্যপদলোপীকর্মধারয়সমাস।

এইভাবে আমরা উপরিলিখিত বিবিধ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভীষিকা ও জটিলতা মুক্ত করে সহজবোধ্য হিসেবে সকলের উপাদেয় করে প্রকাশ করেছেন। এতে সুকুমারমতি বিদ্যার্থীগণের সংস্কৃত অধ্যয়নে ও সংস্কৃত শিক্ষণে আগ্রহবোধ জন্মায়। সংস্কৃত ভাষা কেবল মুষ্টিমেয় মেধাবীগণের কুক্ষিগত না থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে তা প্রসার লাভ করে। ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হয়, 'ব্যাকরণকৌমুদী' নামটিও সার্থক হয়। সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে দেদীপ্যমান থাকবে।

তথ্যসূচী ঃ

১. ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র; সম্পাদিত, সমগ্রব্যাকরণকৌমুদী, চলন্তিকা প্রকাশক, কলকাতা, ১৪১২ (বা)
২. লাহিড়ী, প্রবোধচন্দ্র ; শাস্ত্রী, হৃষীকেশ ; সংকলয়িতা, পাণিনীয়ম্, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৬
৩. সরজিনী নাইডু উইমেন্স কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশতবর্ষ উদ্যাপনের প্রেক্ষিতে বক্তৃতা, অধ্যাপক ড. অয়ন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।

শবর উপজাতি : জীবন ও সংস্কৃতি

বিপ্লব কুমার মাহাত
অধ্যাপক, আড়ষা কলেজ

সারসংক্ষেপ: *শবর নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আদীম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি অন্যতম। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানব গোষ্ঠীজীবন রহিত আঞ্চলিক উপেক্ষিত উপজাতি হিসেবেই বেশি পরিচিত। শবর সমাজের জীবনবৈচিত্র্য মূলত প্রচলিত সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। গোষ্ঠীজীবনের আদল আঁকড়ে থাকলেও সুষ্ঠু জীবনের সংস্কৃতিকে তারা আজও আত্মস্থ করতে পারেনি। কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের বেড়ে ওঠা ওএগিয়ে চলা। উন্নত সভ্য সমাজের স্বাভাবিক জীবন আজও তাদের বিশেষ আকৃষ্ট করেনি। এর পিছনে হয়তো বা তাদের অনেকখানি অশিক্ষা ও কুসংস্কার দায়ী। মানুষগুলি আসলে ভ্রাম্যমান জীবনকেই আপন করে নিয়েছে। দুঃখ হলেও সত্য বর্তমান সভ্যমানুষের কাছে তাদের একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। এক্ষেত্রে শবর সম্প্রদায় তাদের অতীত আদর্শকেই অনুসরণ করেছে।যদিও দীর্ঘ অবহেলার পাত্র এই উপজাতির উন্নতির জন্য সরকার এগিয়ে এসেছে। তাদের জীবন ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য গঠিত হয়েছে –" পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি"। এছাড়াএইঅনালোচিত মানুষগুলির জীবন ও জীবন সংগ্রাম তুলে ধরেছেন লেখিকা মহাশ্বতা দেবী। তাদের উন্নতির প্রচেষ্টাকল্পে লেখিকার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। যাই হোক শবর উপজাতি সম্প্রদায়ের এই অনালোচিত জীবনবৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সংগ্রাম মুক্তমন সংশ্লিষ্ট সুষ্টু সমাজকে সত্যি অবাক করে !*

মূলশব্দ: *অশিক্ষা, কুসংস্কার ,ভ্রাম্যমানজীবন, গোষ্ঠীজীবন, খেড়িয়া, জীবনবৈচিত্র্য, জীবনসংগ্রাম।*

মূল আলোচনা:

হিন্দি সাহিত্যের পন্ডিতগন লিখে গেছেন "শবরীকে গুটে বৈর ঘাটে মিটে ফারে"অর্থাৎ শ্রীরাম অবতারে শবরীর উচ্ছিষ্ট তিক্ত, মিষ্ট, কষায়, শুষ্ক ফল খেয়ে তিনি মহিমা কীর্তন করে গেছেন। এই রামায়নের যুগ থেকে শবরগন পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। পুরুলিয়ার কেও বলে এদের শবর কেউ বলে খেড়্যা। সেদিনকার বনভূমি আর বন্যপ্রাণীর দোসর হয়ে এই মানব গোষ্ঠী আজও বিরাজমান এবং বনভূমি আর বন্যপ্রাণীর মতোই এ জেলার আদিমতার আবিষ্কার । শবর গোষ্ঠীর মানুষ যারা সাময়িক

খেড়্যা নামে প্রসিদ্ধ-আজও আকৃতিতে জংলী প্রকৃতিতে বুনো যাদের গায়ে এখনোও বুনো গন্ধ যায়নি। এমন কি এরা আজও নিকটতম প্রতিবেশী বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণীর সঙ্গছাড়া হয়নি। বনভূমির মায়া কাটাতেও পারেনি। আজও এরা সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি সভ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েনি। সভ্য মানুষের তৈরী বুদ্ধিগ্রাহ্য আইন কৌশলে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। তবে সেদিনকার বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব আজ যেমন বিপন্ন, তেমনি বন্যপ্রাণীর নিকটতম প্রতিবেশী আদিম মানব গোষ্ঠী, শবর গোষ্ঠীর অস্তিত্বও আজ বিনন্ন। আজকের শবর গোষ্ঠির মানুষ, শুধু যে তরা মাতৃভূমিকে হারিয়েছে তা নয়, বনজঙ্গল থেকে সহজলভ্য খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

বন্য পরিবেশে খেড়্যারা লালিত পালিত বলেই প্রকৃতি যেন এদেরকে নিজের সন্তানের ন্যায় আপন করে নিয়েছে। এবং এরাও প্রকৃতির সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শবররা অনাবৃত দেহে রোদ শীত বর্ষাকে সাদরে বরন করে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। পুরুলিয়ার নিজস্ব প্রকৃতি দেবী যে রঙ দিয়ে কালো, কালো তৈরী করেছে। সে রঙের তুলি দিয়ে শবরদের গায়ে রঙ চড়িয়েছে। কোন দিনই এদের গায়ে তেল পড়েনি, বুনো হাতির মতো ধূলি ধূসর শরীর। তাই এদের শরীর থেকে উৎকট একটা গন্ধ বার হয়। মানব দিক থেকে এই সমস্ত মানুষগুলো খুবই সরল হয়। অথচ ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ১৮৭১ সালে এরা ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে অপরাধপ্রবন বলে ঘোষিত হয়, সেই ধরা আজও প্রবাহমান। খেড়িয়ারা নাকি জন্মসূত্রই "অপরাধ প্রবন জাতি"। চুরি ডাকাতির মতো কিছু অসামাজিক কাজ নাকি একমাত্র শবরাই করে। জেলার মানুষের উক্ত ধারনা না থাকলেও, জেলার পুলিশ প্রশাসন আজও তাই মনে করে। তবে পরবর্ত্তীকালে ১৯৫২ সালে এই জন্ম অপরাধীর দাগ মুছে যায় আইন পাশ করে। এই খেড়িয়া জন গোষ্ঠিরা নৃতাত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে আদি কোল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ও ভাষাগত দিক থেকে দেখতে গেলে এরা অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এই খেড়িয়া গোষ্ঠীর কিছু উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত (১) দুধ খেড়িয়া (২) ভেলকি খেড়িয়া (৩) পাহাড়ী খেড়িয়া।

এরা আবার কয়েকটি গোত্রেও বিভক্ত, প্রত্যেকটি গোত্রের আবার নিজস্ব ধর্মীয় প্রতীক আছে। নীচে এদের গোত্র ও প্রতীকগুলি দেওয়া হল-

গোত্রের নাম		ধর্মীয় প্রতীক
১) বাদ্য	-	ওল
২) হেমব্রম	-	সুপারি

৩) জারু	-	ইঁদুর
৪) ভূঁইয়া	-	এক রকম গাছ
৫) মেল	-	গোবর
৬) মুরু	-	কচ্ছপ
৭) সরেন	-	পাথর
৮) সামাদ	-	হরিন
৯) বা	-	ধান
১০) হাঁসদা	-	পাঁকাল মাছ

শবর বা খেড়িয়া জনগোষ্ঠীরা সাধারনত একটি পল্লীতে যেখানে ২০,২৫ টি বাড়ী বা কুঁড়েঘর থাকে সেখানেই বসবাস করে, এদের ঘরবাড়ী করার ধারনাটি দেখলে বোঝাই যায় স্থায়ী বসবাসের পরিকল্পনা নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বাড়ী তৈরী করে না। বাড়ীগুলি সাত, আট হাত উঁচু। পাঁচ ছয় হাত লম্বা চওড়া মাটির আশক্ত দেওয়ালের সামান্য টুকু খড় দিয়ে ঘর, দেড় হাতের দরজা যা দিয়ে কোনমতে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। ঘরের ভিতর গর্তকুঁড়ে তাতে খড় দেওয়া থাকে যা শীতকালে শীতের হাত থেকে রক্ষার উপায় বলে তারা মনে করে । দু-একটি মাটির ভাঁড় ছাড়া ঘরের মধ্যে তেমন কিছু জিনিষই থাকে না। কারন এই জনগোষ্ঠী সঞ্চয় মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়নি আবার যাযাবর বৃত্তিও ছারতে পারেনি। পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার কাছে বালকড়ি গ্রামে একটি শবর বস্তি আছে। এটি পূর্বে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বর্তমানে তা পাথুরে ডুংরির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নেই। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কংসাবতী নদী ও অপর পাড়ে রাকাব বনাঞ্চল। এখানে আগে অনেক রকম পশুই ছিল বর্তমানে বন ও বন্যপ্রাণী অদৃশ্য হলেও শবররা আজও এখানেই থেকে গেছে ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাচ্ছে।

বন ও বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব যেমন আজ বিপন্ন, তেমনি তাদের নিকটতম প্রতিবেশী আদিম মানব গোষ্ঠী শবর ও খেড়িয়াদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এরা যে নিজের মাতৃভূমিকেই হারিয়েছে তা নয় বনজঙ্গল থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য খাদ্য থেকেও তার বঞ্চিত। আজ বনজঙ্গল থেকে তবুও এরা ফল মূল, শিকড়, ব্যাঙ, শামুক, সাপ, পাখীর ছানা, মাছ, কাঁকড়া, মধু , ইঁদুর, শিয়াল, হুড়াল, খোরগোস, মৌচাক খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করে। এদের নিজস্ব জমি জমা নেই, কৃষি কাজও তেমন করে না, কোথাও আবার

শ্রমিক হিসাবে কম মজুরীতে কাজ করে অর্থাৎ জীবিকাতে তেমনভাবে অভ্যস্ত হয়নি। এরা নির্জন লোকালয় থেকে অনেক দুরে থাকতেই বেশী পছন্দ করে। তথাকথিত সমাজে আজও আবদ্ধ হয়নি, যা আজও সম্ভব হয়নি।

এদের শরীর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বলা যায় অনাবৃত দেহে রোদ, শীত, বর্ষাকে সুন্দরভাবে মেনে নেয়। সারা দেহের মধ্যে কোমরের নীচে একখানি শতচ্ছিন্ন কাপড়টুকু দিয়ে ঢাকা থাকে। বন্যপ্রাণীরা যেমন ভাবে দিন কাটায়, এরাও ঠিক তেমনি ভাবেই দিন কাটায়। মেয়েদের মধ্যে শাঁখা, সিন্দুঁর, চুড়ির তেমন চল নেই তবে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত শবর নারীদের সামনের দিকটা ঢাকা। স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকতেই পছন্দ করে। তারা একসাথে সারা বছরই খাদ্য সংগ্রহ করার কাজে অংশ গ্রহন করে। তাই দেখা যায় এদের অনেকেই লোহার ফলা লাগানো লাঠি নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে মা-বাবার সঙ্গ ত্যাগ করে।

শবর বা খেড়িয়াদের গায়ের রঙ ধূসর কালো, পাঁচ থেকে ছয় ফুট লম্বা, মাথা গোল, নাক ছোট ও চ্যাপটা, চোখ ছোট ও উজ্জ্বল ধরনের। দৃষ্টি চঞ্চল ধরনের, এদের দৃষ্টি শক্তি বেশী। ঠোঁটের পাতা মোটা ধরনের। কাঁধ মাংসপেশী বহুল , হাত লম্বা, বলিষ্ট লোহার মতো শক্ত, হাতের তালু শক্ত, আঙুলগুলি মোটা মোটা, বুক ভীষন চওড়া, মাংস পেশীতে ভরাট। পেট শরীরের সাথে সাঁটানো, পায়ের পাতা শক্ত। শবরদের দেখলেই মনে হয় তাদের মধ্যে প্রচুর শক্তি আছে।

শবরদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা খুবই ভীত প্রকৃতির, সাধারন সভ্য সমাজ যেন এদের ক্ষতি করার জন্যই পশ্চাদ ধাবন করেছে। শ্রী গোপী বল্লভ সিংহদেও মহাশয় বলেন অহরহ ভয়ের ভাবই এদের সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এদের ভয়ের কারন ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। মানসিক সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই ভয় ভাব দূর হওয়া খুবই প্রয়োজন। আসলে পরাধীন ও স্বাধীন ভারতেও মানুষের ভালো ব্যবহার পাওয়া থেকে এরা বঞ্চিত। ভদ্র মানুষ বলতে শবররা জানেন খাঁকি জামা কাপড় পরা মানুষ যারা পুলিশ। একমাত্র পুলিশিই এদের আশেপাশে আসে। এরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে কারোও ধানখেতের থেকে অথবা পাশাপাশি গ্রাম গুলি থেকে জিনিষ কুড়িয়ে আনে, পরবর্ত্তীতে পুলিশ গ্রামে চোর খুঁজতে শবর পল্লী গুলিতে এসে পৌঁছায়। এদের প্রতি আশে পাশের মানুষ খুবই বাজে ব্যবহার করে, তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়, অপবাদ দেয়। যা শবরদের মনে আঘাত হানে।

এই সুন্দর দেহ মনের মানুষ গুলোকে আজকাল আর চেনাই দায় বনজঙ্গল এদের ত্যাগ করেছে। সভ্য মানুষ এদের অবাঞ্ছিত বলে ত্যাগ করেছে।এই উপেক্ষাও অবহেলায় তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়া এই সব মানুষ আর বেশীদিন টিকে থাকবে না। এমনিতেই এদের শরীরের অবক্ষয় শুরু হয়েছে। তারপর রয়েছে সামাজিক শাসন পীড়ন, তারপর রয়েছে পুলিশি অত্যাচার। তাতে এরা এমন একস্তরেএসে দাঁড়িয়েছে যে এক্ষুনি এদের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা না হলে পুরুলিয়ার এই বন্য মানবগোষ্ঠী একবারে শেষ হয়ে যাবে। শবরদের পিছিয়ে পড়ার জন্য বিভিন্ন বিষয় আছে। শবররা অতীতকাল থেকেই একেবারে সভ্য সমাজ থেকে দরে থেকেছে , যা এদের থেকে সভ্য সমাজের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে তারা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের প্রচুর অবজ্ঞার চোখে দেখে। গ্রামে ঢুকলে চোর সন্দেহ করে, তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। শিক্ষাকে ফলে তারা নিজেদের জীবনে তেমন ভাবে প্রবেশ করাতে পারে নি। যা তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা সভ্য মানুষের কাছাকাছি আজও আসতে পারেনি। ফলে তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে জীবনপাত করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সরকারী তরফেও এদের উন্নয়নের জন্য তেমন হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

জীবিকা বলতে তেমন কিছুর সাথেই শবররা ওতপ্রোতো ভাবে জড়িত নয়। শুধু মাত্র যাযাবর বৃত্তি করে, সংগ্রহ করেও এর ওর জমিতে কম মজুরীতে কাজ করেই এদের দিন পাত করতে হয়। সুতরাং আত্ম-নির্ভরশীলতা ছাপই সুস্পষ্ট ভাবে তাদের জীবিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়াদের মধ্যেই পড়ে। সিংভূম জেলা সংলগ্ন পুরুলিয়ার সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় বসবাসকারী খেড়িয়া শবরদের ওপর বিহার পুলিশের অত্যাচার ও অবিচার জেলার জন্ম লগ্ন থেকেই চলে আসছে। পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানা, বান্দোয়ান থানা সংলগ্ন সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় শবর গোষ্ঠীর বাস। বিহার পুলিশ রাত্রে এই গ্রাম গুলোতে অভিযান চালায় ও সরাইকেল্লা কোর্টে চালান করে। পরে এদের কোন খোঁজও পাওয়া যায় নি ও এখনো ফিরেও আসেনি।

তবে ধীরে ধীরে এদের অবস্থা পাল্টাচ্ছে। আর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই শবর উপজাতিদের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেনতার ছাপ ফুটে উঠেছে। বংশ পরম্পরায় পিছিয়ে পড়া এই জাতি এক দিকে যেমন নিজেদের লড়াই চালিয়ে

সচেতনতা বাড়াচ্ছে তেমন ভাবই আশে পাশের মানুষ ও সরকারী সাহায্যও সহযোগিতায় আজ তারা নিজেদেরকে অনেকটা উন্নত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মানবাজার থানার কুদা গ্রামে শবর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধইগন এক সভায় মিলিত হয়ে এক আলোচনা করেন-যেখানে শবর সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কি রূপ করা যাবে তা আলোচিত হয়। পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র যাতে শবর সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন তৈরী হয় তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক থানাতে – থানা শবর সমিতি- প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ সহ ছয়জন সদস্য থাকবে। এই সমিতিতে ঠিক হয় উন্নয়ন মূলক কার্যে সাহায্য করবে। সরকারের সাথে উন্নয়ন মূলক কর্মে সহায়তা করার ক্ষমতা থানা শবর সমিতি পায়। জেলা শবর সমিতির নির্দেশ ও আদেশে থানা শবর সমিতি পরিচালিত হয়। থানা সমিতির বিভিন্ন প্রতিনিধি হলো-(১) সুরেন্দ্র শবর (২) মোহন শবর (৩) দুর্যোধন শবর (৪) মহাদেব শবর (৫) বীরু শবর। এভাবে মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান, পুঞ্চা প্রভৃতি স্থানে, সভাপতি সম্পাদক ও বহু প্রতিনিধি যেমন – নন্দ শবর, বাবু শবর, বানু শবর, কানাই শবর, শুরাই শবর, নকুল শবর, বেজ শবর, পীতম শবরের নাম করা যায়।

বর্তমানে শবর সম্প্রদায় তাদের অতীতের আদর্শ, তাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরন করতে প্রস্তুত। তারা ভাবছে যে অতীতের সেই আদর্শবান ঐতিহ্যের প্রতীক শবর জাতির বংশধর তারা। বর্তমান সভ্য মানুষের নিকট, তাদের নিজস্ব পরিচয় আছে। এত বড় স্বীকৃতি তাদের ভবিষ্যতের পথ চলার, পাথেয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সভ্য মানুষের কাছে এই শবর উপজাতিরা অপরিচিত নন। তাদের সভ্য মানুষ কোন অংশেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন নি। এক্ষেত্রে বলা যায় বড় হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই বড় হওয়া যায়। আমাদের আশে পাশে যারা সমগ্র জাতি হিসেবে বড় হয়েছে তা তাদের সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চেষ্টার ফলে। এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে মনোবলই হল সব থেকে বড়, যা একটি জাতিকে বড় করে। জাতির মনোবল গঠন করার আগে দরকার হয় একতার। ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলেই মনোবল সঞ্চয় হয়। আজকের শবর সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারই ঐক্য নাই। তাই দিনের পর দিন, যত অভিশাপ এই শবর সম্প্রদায়কে সহ্য করে যেতে হচ্ছে। তাদের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার চলছে। যা তারা শুধু চুপ করে সহ্যই করে চলেছে। আর পরবর্তী অত্যাচারের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু শবর

সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাড়াই করতে হবে।

এক্ষেত্রে শ্রী গোপীবল্লভ সিংহদেও-এর অবদান অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ শবর উপজাতিকে আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত করে তুলেছে। তাঁর মতে বর্তমান সভ্যতার আশীর্বাদে মানুষের প্রকৃত রূপ আর স্বরূপটা দেখা যায় না। এই সভ্যতাকে যে বিনিময় দিয়ে পাওয়া গেছে তার মূল্য অনেক বেশী। মানুষ আজ এই কৃত্রিম সভ্যতার মাঝ পথে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে বলছে – ফিরিয়ে দাও আমাদের বন্য সভ্যতা। যেখানে মানুষ স্বাভাবিক হয়ে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বস, ভালোবাসা, স্নেহ, মাধুর্যকে উপভোগ করবে। মানুষ যে লড়াই করছে তা বুদ্ধিস্বর্বস্ব কৃত্রিমতার লড়াই, সেখানে কোন স্বাভাবিকতা নেই আছে শুধু এক ধরনের মেকি সভ্যতা। অনেক আশা নিয়ে এই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে কাটানো স্বাস্থ্যবান সতেজ প্রাণগুলোকে দেখা হল, সত্যিই যা প্রকৃতির নিজের হাতে পালন করা সন্তান। যারা আপন পথে, আপন খেয়ালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকাল বাস করে।

দীর্ঘকাল অবহেলার পাত্র এই শবর উপজাতির মানুষেরা খরা প্রবন জেলাগুলিতেই বিশেষভাবে বসবাস করে। যারা বৃষ্টিপাত ও সেচের কাজের অভাবে ঠিক করে চাষবাস করতে পারে না। কৃষিশ্রমিক হিসেবে ও কাজ করে দিনপাত করে। তাই দেখা যায় ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছে। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে তুলতে তথা সভ্য সমাজের সাথে দূর দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দরুন, এরা যেভাবে সমাজের কাছে সন্দেহভাজন ও লাঞ্ছিত হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই শবর সমিতি তৈরী হয়েছে। ১৯৬৮ সালে। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে, সরকারীভাবে রেজিস্ট্রীকৃত হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ সালে "পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যান সমিতি"

শবর সম্প্রদায় যে সমস্ত গ্রামগুলিতে থাকে, তার আশে পাশের গ্রামগুলিতে বর্তমানে তারা আর ঘৃণা বা অবজ্ঞার মুখে ততচা পড়ে না। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতো শবররাও বর্তমান একসাথে মেলা মেশা করতে পারে। এমনকি বিভিন্ন বাড়িতে তারা শ্রমিক হিসেবেও কাজ পায়। এবং এক্ষেত্রে উপার্জিত অর্থ তারা সঞ্চয় ও জীবনযাপনে ব্যয় করে। বলা যেতেই পারে যে পাশাপাশি মানুষের সান্নিধ্য লাভ থেকে আজ তারা বঞ্চিত নন।

পুরুলিয়ার যে সমস্ত গ্রামের আশে পাশে শবররা থাকে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, মেলা হয়, যেখানে তারা যায় এবং নাচ, গান, যাত্রাপালা দেখে। বিভিন্ন রকম ভাবে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাপ এ সমস্ত ক্ষেত্রে চোখে পড়ে তা তারা অনুভব করে। অর্থাৎ তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোতে নিজেদের নিয়ে আসছে, সেখানে অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথই আজ তারা বেছে নিয়েছে। যা শবরদের আত্মসচেনতাবোধ বাড়ায় ও নিজেদের ফেলে আসা দিনগুলোর সাথে প্রযুক্তির ও বিজ্ঞানের স্পর্শ জাগায় । যা শবরদের বর্তমান সমাজের সাথে অনেকটাই দূরত্ব কম করতে সাহায্য করেছে। সবথেকে বড় কথা মানুষ যে সামাজিক জীব, তাদের মধ্যে এই সমস্ত যাত্রাপালা, সংগঠন, সভা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ঐক্যবদ্ধবোধ জাগাতে সহায়তা করেছে। ফলে তারা সভ্যতার নতুন সিঁড়িতে আজ সহজেই পা ফেলেছে।

সভ্যতার আলোকে আলোকিত হওয়ার পর থেকেই দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আজ লক্ষণীয়। তা তাদের স্বভাব চরিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবেই দেখা যায়।অতীতে দেখা যায় যে, তারা শুধু পোষাক পরতো বলতে কেবলমাত্র এক টুকরো কাপড় যা দিয়ে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করা যেতো। যা পুরো শরীর ঢাকার ক্ষেত্রে ছিল অনুপযুক্ত। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকলেই এই ব্যবস্থাই নিতো কিন্তু বর্তমানের দেখা গ্রাম গুলোতে আজ পাষাক- পরিচ্ছদের ধরণটা অনেকটাই পাল্টে গেছে। তাই এখন পুরো শরীর ঢাকা কাপড়ও বা পরে যা তা যথেষ্ট সুন্দরভাবেই তাদের মানয়। স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে এই পোষাক-পরিচ্ছদ খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করেছে। আজ আর তারা অতীতের মতো প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে না। বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার জন্য, আরোও বিশেষভাবেই তাদের মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সচেনতা বেড়েছে। এক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নের ব্যাপারটি সহজেই আমদের চোখে পড়ে।

অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা গভীর ভাবে পড়াশোনার মধ্যে যুক্ত হতে না পারলেও, পূর্বের থেকে অনেকটাই এবিষয়ে এগিয়ে। শবর সন্তানদের অনেকেই আজ বিদ্যালয়ের গান্ডীর মধ্যে। তারা যথেষ্ট সংযত ও মার্জিত ভাবে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে। বরাবাজার থানার সুকুরুটু হাইস্কুলে বর্তমানে অনেক শবর ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাদের সাথে কথা বলে সহজেই মনে হয় তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে ইচ্ছা ছিল তার যেন সার্থক প্রকাশ হয়েছে এসব স্কুলে এসে। আজ তারা শিক্ষিত হতে পেরছে এসব বিদ্যালয় গুলিতে পড়াশোনা করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান। আন্তরিকভাবে এই সমস্ত অঞ্চলের মাননীয় শিক্ষকবৃন্দরাযথেষ্ট ভাবেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। যার সব থেকে বড় পাওনাই হল পরবর্ত্তীতে এই সমস্ত শবর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে অনেকেই বিদ্যালয়ের গোন্ডী ছাড়িয়ে কলেজে প্রবেশ করে চলেছে। সেক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে আজ শিক্ষার আলো তাদেরকে নতুন ভাবে আমাদের সমাজকে চেনাবে তাদের অবস্থান। শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আজ তাঁরা অনেকটাই সচেতন। এই সমস্ত শবর ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে আজ প্রায় ৩% কলেজে পড়াশোনা করেছে এবং সার্বিক শিক্ষার হার হলো ১০% I এখন অনেক বিদ্যালয় শুধুমাত্র শবরদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। যেমন-রাজনোয়াগড়ে ও বান্দোয়ানে-২টি । অন্যদিকে আবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্বে তারা ব্যাপকভাবে ওঝা, তন্ত্রবিদ্যা সাধক ও কবিরাজদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই সমস্ত মানুষ গুলি, শবরদের পূর্বে ঝাড়ফুঁক বিদ্যা, মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, সরষে বেঁধেই রোগ দূর করার চেষ্টা করতো। এক্ষেত্রে আরও এক ধরণের রোগ নিরাময় এর উপায় ছিল জড়িবুটি, ডালপালা, পাতা দিয়ে ঔষধ করার প্রথা। যা সত্যিই তাদের কাজ হয় বলে, গ্রামের অনেকে আজও মনে করেন প্রথমদিকে সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তেমন সুযোগ এখানে পৌছায়নি তবে পরবর্তীকালে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ এখানে পৌছে যায়। এরফলে প্রথমদিকে শবররা তেমনভাবে ইমুয়েনেশান, টীকাকরণ, গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ ঔষধ গ্রহণে যাননি । তবে পরবর্তীতে এসব এর উপকারিতাসম্পর্কে সচেতন হওয়ার দরুন, নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে শবররা যোগাযোগ রেখেছে। তারা বিশেষ করে ডাক্তারদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভয় পেতো বলে গ্রামের অনেক মানুষই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে চাইতো না বলে জানা গেছে। তবে আজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপকারিতা সম্পর্কে তারা অনেক বেশী অবগত। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারটি আজ অনেকেই প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করে। শবররা তাই আজ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারী সুবিধা গ্রহণে অনেকাংশেই এগিয়ে।

অতীতে দেখা যেত শবররা বনে বনে ঘুরে পশু পাখী শিকার করে নিজের পেট চালাতো বা জীবিকা নির্ধারণ করতো। ধীরে ধীরে এ প্রথা আজ অনেকটাই পাল্টে গেছে। এক্ষেত্রে আজ আর তারা পশুপাখী শিকার করে দিনযাপন করে না। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে তারা শিকার বৃত্তি ত্যাগ করে বর্তমানে অন্য কাজের ভাবনা করছে। এমনকী কেউ কেউ আশে পাশের গ্রামে গিয়ে বসবাস পরিচালনা, ক্ষেতমজুর তথা কৃষকের দায়িত্ব পালন করছে। অনেকে আবার গুজরাট, রাজস্থানে বিভিন্ন ঠিকাদারের

অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কাজ করছে। আবার শবরদের অনেকটাই ইঁটভাটা শ্রমিক হিসেবে বাইরে বাইরে যেমন রাণীগঞ্জ, আরামবাগ, হুগলীতে কাজের তাগিদে চলে আসছে। অর্থাৎ এক কথায় বলাই যায় শবররা আজ বর্তমানে সভ্যতার কাছাকাছি চলে এসেছে। তার আর ভয় পায় না, লজ্জা করে না। এক্ষেত্রে তারা কাজের বিনিময়ে যে সামান্যই অর্থ পায় তা দিয়ে তারা নতুন ভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাই তাদের এক নতুনরূপ দিচ্ছে, বর্তমান সভ্য সমাজের কাছে।

এছাড়াও বছরের বাকী সময় যখন তারা বাড়ীতে কাটায় প্রায় ৪ মাস নিজেদের জীবনযাপনের জন্য নতুন প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ ৮ মাস বাড়ীর বাইরে গিয়ে কাজ ও বাকী ৪ মাস ঘরের মধ্যে থাকে, নিজেদের অঞ্চলে নিজেদের হস্তজাত শিল্প তৈরী করে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শবররাই একমাত্র উপজাতি যারা নিজস্ব হস্তনির্মিত শিল্প তৈরী করে। তাদের তৈরী করা বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যগুলি হল – চাল রাখার ধামা, খেজুর পাতার ঝুড়ি, খেজুর পাতার ঝাটা, চাটাই, যা পূর্বে কোন রকম ভাবেই বাজারে পাওয়া যেত না তবে বর্তমানে এসব দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায়। এর থেকে যে অর্থনৈতিক সংস্থান হয়, তা তাদের জীবনে ছাপ রাখে। সরকার থেকে উদ্দ্যোগ নিয়ে এই সমস্ত শবর গ্রামগুলিতে ব্যপকভাবে সহযোগীতা করা হয়। গ্রামের বিভিন্ন শবর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাতে তারা শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সঠিকভাবে তৈরী করে তার জন্য মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে শবর মহিলারা যাতে নিজের দ্রব্যের মূল্য নিজেই কষতে পারে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী করে যেমন- প্রচুর বাসকেট, ২ কোণা বাক্স, ৩ কোণা বাক্স(Box), ৫ কোণা বাক্স, কপি বক্স, ফাইল ট্রে, টেলিফোন ট্রে, সব মিলিয়ে মোট ৬২ ধরণের ডিজাইনের দ্রব্য তৈরী হয় এবং সমস্ত তৈরী করা দ্রব্যের দাম, তারা নিজেরাই ঠিক করে দেয়।

যে সমস্ত এলাকায় খেজুর পাতা ও কাশি ঘাস সহজেই পাওয়া যায়, সে সমস্ত এলাকাতেই শবর শিল্প জাত দ্রব্য তৈরী হয়। বছরের সব সময় উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল না পাওয়ার জন্য, এ সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য সারা বছরের মধ্যে প্রায় চার মাসই তৈরী হয়। কাঁচামাল (কাশি ঘাস ও খেজুর পাতা) পাওয়া যায় যে সব এলাকায়, সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছাতার শিপ থেকে সূঁচ তৈরী করা হয়, যা সেলাই-এর কাজে লাগে। খেজুর পাতা শুকিয়ে, তারপর বাছাই করে, তা ভেঙে যাবে কিনা দেখে তা থেকে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করা হয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রায় এক মাস করে দেওয়া হয় যা প্রত্যেক গ্রামের শবর মহিলাদের কাছে গিয়েই তাদের শেখানো হয়।

এক্ষেত্রে শবর মহিলারা প্রায় ৪৫০ জন এই প্রশিক্ষণ পায় এবং যা থেকে তারা প্রভূত উপকৃত হয়।

এই শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার ঠিক করা হয়। এর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল দ্রব্যের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য। এক্ষেত্রে মূলধন তৈরী করা হয় এবং ব্যাঙ্ক থেকে জয়েন্ট পাশ বই খোলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের সময়েই সঠিকভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণের বিষয়টি শবরদের শিখিয়ে দেওয়া হয়। তারা নিজেরা দাম ঠিক করে। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, পরিশ্রম অনুযায়ী উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না দ্রব্যর।

বছরের মধ্যে যে সময়টুকুতে কোনরকম কাজ থাকে না তা হল শীতকাল। শীতকালই শবররা এ সমস্ত কাজ করে। এই শিল্পের কাঁচামাল শুধুমাত্র শীতকালে পাওয়া যায়। তাই শীতকালই এসব শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী হয়। শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক দোকান আছে। এছাড়া পুরুলিয়াতে ও যেমন দিশা, পূর্বাশা নামের দোকানে, বাঁকুড়ার মুকুটমনিপুরে ও দীঘার সমুদ্র সৈকতে এসমস্ত দ্রব্য বিক্রি হয়। এদের তৈরী টুপির বিশেষ চাহিদা আছে। এক্ষেত্রে বিক্রির সময় চেষ্টা হয় সরাসরি আসল ক্রেতার হাতে পণ্য তুলে দেওয়ার। তৃতীয় ব্যক্তি বা দালালকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দিল্লীতে সুরজকুন্ডে একটি স্থায়ী দোকান আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এভ ভালো বাজার আছে। তবে এই বাজারে ক্রেতা ও শিল্পীদের মাঝে দালালের অনুপ্রবেশ এড়ানো যায় না এবং লাভের বেশীরভাগ অংশই এই মধ্যসত্বভোগী দালালরা শোষণ করে নেয়।এছাড়া সরকারী উদ্দ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন মেলাতে এসব শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়। আমাদের রাজ্য সরকারও এ জাতীয় অনেক মেলার আয়োজন করে। যা আরো বেশী হলে এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ও বাজার আরোও বাড়বে। এই শিল্পজাত দ্রব্যের সুবিধা হল –

১) সারা বছর কাঁচামাল পাওয়া যায় না, তাই বাজারে চাহিদা যথেষ্ট থাকে।

২) মাটিতে মিশে যায় পুরোটা।

৩) এই দ্রব্যগুলি একেবারই পরিবেশ দূষণ করে না।

'পশ্চিমবঙ্গ খেড়ায়া শবর কল্যাণ সমিতি' পুরুলিয়া জেলার গড়ে ওঠে। প্রথম থেকেই এর কাজ ছিল গ্রাম ভিত্তিক সার্ভে পরিচালনা করা। কোন ব্লকে, থানায়, অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। উক্ত গ্রামে নিরক্ষর, সাক্ষরের সংখ্যা, পানীয় জলের ব্যবস্থা কেমন, সেচ ব্যবস্থা কেমন তা দেখা। কত সংখ্যক বালক বালিকা এই সমস্ত

স্থানে থাকে। মুকগী, হাঁস, গরুর সংখ্যা কত তা দেখা। তাদের বাৎসরিক আয় কেমন। প্রাথমিক স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দূরত্ব কত ?কি কি আছে বা কি কি নেই তা নিয়ে এখনোও সার্ভে চলছে তা সম্পূর্ণ হয়নি।

সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য সমিতি চারটি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে যথা স্বাস্থ্য, আর্থিক বিকাশ, শিক্ষা ও সচেতনতা। যা সমিতিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছে প্রকৃতই একটি সাহায্যকারী সংস্থা রূপে। যা পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের শবরদের সম্পর্কে, অনেকবেশী বিষয় জানাতে আমাদের সাহায্য করে। এখন সমিতির চারটি লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক-

শবর বা খেড়্যা গোষ্ঠীর মানুষরা দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানের যে আশীর্বাদ তা থেকে অবশ্যই বঞ্চিত। এবিষয়ে কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ এই বিজ্ঞানের থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ থেকেও এরা যথেষ্ট পরিমাণে দূরে আছে। তাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সার্ভে করতে গিয়ে দেখা যায় একেবারই প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিশুর নাড়িচ্ছেদন করা হয়। যা মা এবং শিশুর দুজনেরই ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে যারা ধাত্রী বিদ্যার কাজ করছেন তাদের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে তারা এই কাজে আরোও অনেকবেশী পারদর্শী হয়ে উঠেছেন, এদের সাহায্য করেছেন কিছু অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং নার্স। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং মেডিক্যাল বাক্স, বিভিন্ন ধরণের দরকারী ঔষধ তাদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফলে পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়। শিশু ও মায়ের মৃত্যুর হার অনেকাংশই কমেছে। প্রতি মঙ্গলবার গ্রামের সমিতিতে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বসেন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন। জরুরী প্রয়োজনের ভিত্তিতে অ্যালাহপ্যাথি চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা গেছে। এসমস্ত ঔষধ কিছু শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারবাবু ও ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ে থাকে শবররা। তার প্রতি সমিতি চিরকৃতজ্ঞ।

শবর জনগোষ্ঠীর বনবাসী মানুষদের নিজস্ব কিছুই জমিজমা নেই বললেই চলে। গ্রামের কৃষি শ্রমিক হয়ে মাত্র তিন মাসের মতো তারা কাজ পায়। বছরের বাকী সময়টুকু তারা যা রোজগার করে তার ভিত্তিতেই পার করে। নচেত তারা পূর্বে (বর্ধমানের ক্ষেতমজুর) খাটতে যায়। কিন্তু সকলের পক্ষে এই খাটতে যাওয়া সম্ভব হয় না, নিজের পরিবার ছেড়ে। অর্থাৎদায়বদ্ধতাই এক্ষেত্রে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমিতির সদস্যগণ পুঁজিবিহীন হয়েও একধরণের নিজস্ব চেষ্টায় হস্তশিল্পের সৃষ্টি করেছে। যার উপাদানগুলো বা কাঁচামালগুলো স্থানীয় ভাবে বা ঋতুভিত্তিক একটি পর্বেই

সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা সহজলভ্য। খেজুর পাতা ও কাশিঘাস দিয়ে তৈরী নিজস্ব শিল্প যার নাম হয়েছে “শবর শিল্প”। এটি জেলার নতুন হস্তশিল্প ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আদিবাসী হস্তশিল্প রূপে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।সমিতি হস্তশিল্পর প্রশিক্ষণ দিয়েই যে নিরব থাকে তা বলাটা ঠিক নয়। কারণ হস্তশিল্প গুলিকে সঠিকভাবে বাজারজাত করা ও নায্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। দৈনন্দিন হস্তশিল্পের উৎকর্ষতা বাড়িয়ে, চাহিদা অনুযায়ী হস্তশিল্প তৈরীতে নজর রেখেছে। এই কারণে সমিতি নিজস্ব হস্তশিল্প কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। যারা এ সমস্ত কাজ করছে তাদের নাম লিখে, তাদের গ্রুপ ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করেছে। যা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এমনকি প্রতিটি শিল্পীর নামে স্থানীয় মানভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় পাশবই খোলা হয়েছে।

সমিতি মনে করে যে এই শবর গোষ্ঠীর সভ্যাগণ যতদিন না তাদের কু-অভ্যাস গুলো পরিবর্তম করে ততদিন বিশেষভাবে মহিলাদের এই শিল্পে প্রাধান্য দেওয়া ও আগ্রহশীল করে তোলা উচিত। অনেক অসহায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ, স্বামী পরিত্যাক্তা নারী, এমনকি অনাথদেরও এই শিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা চলছে, যাতে তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০টি গ্রামের পরিবার এই শিল্পের সাথে যুক্ত। তাদের মাসিক আয় গড়ে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা ।

যেখানে শাল জঙ্গল আছে সেখানে বনদপ্তরের সাথে গাছ রক্ষার শর্তে সমিতির সভ্যরা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে এবং সেই বছরের তিনটির পরিবর্তে এখনও দুবার করে তসর গুঁটি চাষ করে চলেছে। আবার বিভিন্ন জায়গায় পলাশ, কুল, কুসুম গাছ আছে সেখানে লাক্ষা চাষ করে তারা যথেষ্ট উপার্জন করে চলেছে। শবর জনগোষ্ঠীর মানুষরা যে সমস্ত স্থানে বসবাস করে চলেছে তা হল জঙ্গল বা নদীর পাড় জাতীয় অঞ্চল। ফলে প্রতি বছরেই বর্ষার সময় নদীতে প্রচুর মাছ ড্যাম থেকে উঠে আসে যা শবররা দলবদ্ধ ভাবে ধরে, কিন্তু ঐ মাছের যা বাজার দর তা তারা পায় না। খুবই কম দামে প্রায় ২০ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দালালদের। যা দেখে সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই সমস্ত নদীর ধারের গ্রামগুলোতে শবরদের জায়গাতে গভীর পুকুর খনন করা হবে। এরফলে তাতে ঐসব মাছগুলি প্রায় ৪০-৫০ টাকা দরে কিনে ছেড়ে রেখে দেওয়া হয়।সমিতির এসব উদ্যোগ ছাড়াও যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল পাঁচজন আইনজীবিকে নিয়ে কমিটি তৈরী করে নিজস্ব সেল তৈরী করা। যার ফলে শবররা কিছুটা নিরাপত্তা পাচ্ছে জমি, ভূমি ও সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রথম পাতাতেই আর্যদের নামের পাশেই অনার্যদের নাম লেখা হয়। এই অনার্যদের মধ্যেই পড়ে শবর সম্প্রদায়। প্রাচীনকালের সংস্কৃতির এক ক্ষুদ্রতম উপশাখা হিসাবে বোধ হয় এই পুরুলিয়া জেলার শবর সম্প্রদায়। তাদের মধ্যেও আজ নতুন ভারতের রক্তিম প্রেরণা নতুন প্রানের সঞ্চার ঘটিয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুবিশাল ছত্রতলে তারাও একটু আসন সংগ্রহ করতে চায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৫০ সালের SHEDULE TRIBE ORDER (AMENDMENT)এ খেড়িয়া জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। ১৯৫৬ সালে THE SHEDULE CASTES AND TRIBES ORDER AMENDMENT এদের আদিবাসী তালিকাভূক্ত করা হয়। ১৯৫১ ও ১৯৭১ সালের লোক গণনায় এদেরকে লোধা জনজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথচ এদের নিজস্ব সংস্কৃতি কিন্তু বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎএকথা বলতেই হয় যে পরাধীন ভারতে এই জাতিটি ব্রিটিশদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে ও স্বাধীন ভারতে এই জাতিটি ঠিকাদার ও জোতদারদের দ্বারা বর্তমানেও শোষিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে আলোকিত শহর, শহরে সংস্কৃতি, কলকারখানা গড়ে উঠলেও তা পুরোপুরি স্পর্শ করতে পারেনি পুরুলিয়ার এই আদিম শবর গোষ্ঠীকে| সভ্যতা ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রগতিশীল হয়ে উঠলেও সেই প্রগতিশীলতার সাথে সমান তালে পা ফেলে এই শবর গোষ্ঠীর মানুষ চলতে পারে না। এর জন্য খানিকটা দায়ী তাদের মানসিকতা, অপরদিকে সরকারী তরফ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব, তাদেরকে অন্যান্য উপজাতির মানুষের সমতুল্য করে তুলতে পারে নি। সরকারী আইন অনুযায়ী বনজসম্পদের ব্যবহারে নিষেধ আরোপ করা হলেও তাদের জীবিকার মূল ভিত্তি ‘বনজ সম্পদ’ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা হয়ে ওঠেছে আজ দিশাহারা। এই গোষ্ঠীর মানুষ উচ্চস্বরে কেঁদে বলেছে “ফিরিয়ে দাও আমাদের বন্য সভ্যতা”

ভারতবর্ষ একটি গনতান্ত্রিক দেশ| গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের সমস্ত জনসাধারনের মঙ্গল সাধনেই একমাত্র লক্ষ্য । ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হলেও এবং বিভিন্ন উপজাতির উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তালিকা তৈরী হলেও, শবর গোষ্ঠীর মানুষদের সেই তালিকায় স্থান দেওয়া হয় নি। পরবর্ত্তী সময় ১৯৫৬ সালে আদিবাসী হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হলেও তাদের উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নি। বেসরকারী তরফ থেকে পরবর্ত্তীকালে অনেক বুদ্ধিজীবি, সমাজসেবী মানুষ শবরদের সমর্থনে এগিয়ে এলে, সরকারী তরফ

থেকেও শবরদের উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। সরকারী তরফ থেকে জমি পাট্টা পেলেও পুলিশ প্রশাসনের অসহযোগীতার কারনে তারা সেই জমি ধরে রাখতে পারে নি। গ্রামের ওপাশ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মাতব্বররাজোর পূর্ব্বক সেই জমি দখল করে নেয়। ইন্দিরা আবাস যোজনায় যে বাড়ী নির্মানের টাকা প্রদান করা হয়, তার সুফল শবরদের ভাগ্যে জোটে নি। সরকারী তরফ থেকে শিক্ষা সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে গ্রামীন বৈদ্যুতিকরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত পদক্ষেপ গুলি প্রয়োগের জন্য নূন্যতম জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হয়েছে। শবররা যেহেতু একসাথে অনেকগুলি বসবাস করে না, সর্বাধিক ২০-২৫ টি পরিবার নিয়ে শবর বসতি গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী আইনের যাঁতাকলে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। হয়তো অনেকে এখন বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে, গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সহযোগীতা পাচ্ছে, তাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু পরিবর্থন কতটা তা অন্যান্য আদিম উপজাতির সাথে তুলনামূলক প্রেক্ষিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় এখানকার উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যথা শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরকারী অধিকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত। অনেক সাঁওতাল আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে তা তাদের ঘরবাড়ি আসবার পত্র আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত জিনিষপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ শবরদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উত্তীর্ন ছাত্রের সংখার হাতে গোনা এবং তারা এখনো পর্যন্ত কোন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নি।

তবুও মহাশ্বেতাদেবী যিনি ‘শবর জননী’ নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্য স্থানীয় সমানজসেবী মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, শবর গোষ্ঠীর মানুষ অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে, নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে|

মহাশ্বেতাদেবী সন্তান স্নেহে পুরুলিয়ার আদিম এই মানব গোষ্ঠীর পাশে যে ভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই বিষ্ময়কর। সরকারী তরফ থেকে উদ্যাগ ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহন করা হলে শবরদের সচেতনতা এসেছে, পোশাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন এসেছে, কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করে অর্থ রোজগার করতে শিখেছে, কিন্তু এখও তাদের জীবিকা নির্বাদের জন্য পূর্বে খাটতে যেতে হচ্ছে, অর্থনৈতিক অভাবে দুবেলা খাবার জোটানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছেন না। বাড়ীঘরে খড়ের ছাউনি। অর্থাৎ মাটির ঘর যেমন ছিল তেমনেই থেকে গেছে।

তথাকথিত ‘অপরাধ প্রবন জাতির’ বোধা এখনো তাদের বয়ে বাড়াতে হচ্ছে, উচ্চ ও সভ্য শ্রেণীর মানুষের কাছে এখনো তারা বর্ব্বর, নিম্ন শ্রেণীর মানুষ হিসাবেই থেকে গেছেষ। ভারতবর্ষ একটু উন্নয়নশীল দেশ এবং ক্রমশ উন্নত দেশে পরিনত হওয়ার মুখে। উন্নয়নের মাপকাঠি কি শুধু মাত্র ভারতের কতকগুলি শহর ও সেখানকার বাসিন্দাদের কেন্দ্র করে গঠিত ? আবার একথা উল্লেখ করতে হবে পুরুলিয়ার এই আদিম শবর গোষ্ঠীর মানুষ উন্নয়নের কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে !

তথ্য সূত্র :

১. আমাদের পুরুলিয়া, অমিয় সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯, লুব্ধক প্রকাশণী-১২০ পাতা।

২. রাঢ়ের জনজাতি ও লোক সংস্কৃতি, মিহির চৌধূরি কমিল্যা, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০০৬, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র – ১১৬ পাতা।

৩. লোকায়েত মানভূম, শক্তি সেনগুপ্ত ও শ্রমিক সেন, লক্ষ্মীনারায়ন প্রিন্টিং প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৪০৯, দ্বীতিয় খন্ড – ১২৯ পাতা।

৪. অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, দেবপ্রসাদ জানা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৪, দ্বিতীয় খন্ড – ৬০ পাতা।

৫. পুরুলিয়ার শবর ও গোপীবল্লভ সিংদেও, অনৃজু প্রকাশণী, প্রথম প্রকাশ বসন্ত ২০০৫, পাতা – ৪২, ৫০

৬. পুরুলিয়া, তরুনদেব ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, ইউনাইটেড প্রিন্টার্স – ২২২ পাতা।

৭. পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

৮. পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাগার থেকে তথ্য পাওয়া যায়।

৯. পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের গ্রন্থাগারিক গৌর বিশ্বাস যথেষ্ট ভাবে সাহায্য করেছেন শবরদের বিষয়ে জানতে।

১০. সীতারাম মাহালি, তরুন মাহালি ও ঠাকুরদাস পরামানিক সহ গ্রন্থগারিক বিভিন্ন বই দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং শবরদের সম্পর্কে অনেক নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

১১. ‘পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া আদিবাসী কল্যণ সমিতির’ সদস্য মাননীয় শ্রী প্রশান্ত রক্ষিত মহাশয়ের কাছ থেকে শবর জনগোষ্ঠীর সম্প্রর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি।

১২. ‘পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া আদিবাসী কল্যাণ সমিতির’দপ্তর থেকে শবরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, জীবিকা সম্পর্কে নানা তথ্যের সাহায্য পাওয়া গেছে ও কিছু বিশেষ চিত্র পাই।

১৩. বরাবাজার থানার সুকুরুটু হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক মাননীয় শ্রী বিশ্বরঞ্জন মাঝি মহাশয় শবরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহনের বিষয়টি নিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যা উল্লেখযোগ্য তথ্য।

১৪. ডুমুরডি গ্রামের শবর জনগোষ্ঠীর মানুষের সাথে কথোপোকথনের ফলে নানা তথ্য উঠে এসেছে।

১৫. রাজনোয়াগড়, বরাবাজার থানার বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামের শবর উপজাতির মানুষদের সাথে সাক্ষাৎকার ও তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ছবি তোলা হয়েছে।

১৬. শবর শিল্পীদের সাথে আলাপ, যারা বর্তমানে কিভাবে স্বনির্ভরশীল তা সম্পর্কে অবগত করেন|

১৭. শবর গ্রামগুলির চিত্র যা থেকে কিছু ধারনা হয়, তৈরী যা আলোচ্য বিষয়ে সাহায্য করছে|

পত্র-পত্রিকা :

- কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৪
- শারদীয়পৌরাণিকী, দীপক চন্দ্র, সম্পাদিত, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪
- মধ্যযুগেরবাংলাসাহিত্যগবেষণাপত্রিকা, সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর, সম্পাদিত, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র ১৪১০, মাঘ ১৪১০
- বাংলাসাহিত্যপত্রিকা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮
- রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ ও ১৮ এপ্রিল সংখ্যা, ২০১০

ওয়েবপঞ্জি:

- http://archive.org/
- http://bdebooks.com/books

- http://content.inflibnet.ac.in/
- http://doabooks.org/
- http://dspace.wbpublinet.gov.in:8080/jspui/
- http://fossee.in/
- http://kavishala.in
- http://libguides.humboldt.edu/openedu
- http://literariness.org/
- http://manybooks.net/
- http://m.poemhunter.com
- http://ndl.iitkgp.ac.in/
- http://nltr.org/
- http://pds.inflibnet.ac.in/
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/
- http://www.extension.harvard.edu/courses

জন জাগরণে মুকুন্দ দাস

কেয়া মুস্তাফী
সহকারী অধ্যাপক, ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ

সারসংক্ষেপ : *যে কোন দেশের মুক্তিসংগ্রামে চারণ কবিদের বড়ো ভূমিকা থাকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণে নয়, সামাজিক তথা জনজাগরনেও চারণদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেভাবে কোন চারণকবির নাম খুব বেশি প্রচলিত না হলেও, পরাধীন ভারতবর্ষে যে চারণ কবি জনজীবনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তিনি চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তাঁর গানে, নাটকে তিনি শুনিয়েছেন বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার বাণী। সমকালে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁলেও, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা তথা ভারত তাঁর কথা সেভাবে ভাবে মনেও রাখেনি, চর্চা তো অনেক দূরের কথা। এই বিস্মৃত চারণকে স্মরণেই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।*

সূচক শব্দ : *চারণ কবি, পরিচয়, উজ্জীবনের গান, কর্মবীর, অসাম্প্রদায়িক,দেশমাতার বীর সন্তান।*

" জাগতে হবে উঠতে হবে লাগতে হবে কাজে।/ জগৎ মাঝে কেউ বসে নেই, মোদের কি ঘুম সাজে/ যেতে হবে সাগরের পার, ছাড়তে হবে জাতের বিচার/ শুনতে হবে জগৎ বীণা, কোন্ সুরেতে বাজে।"

পরাধীনতার অমানিশায় বাঙালি যখন কোনরকমে 'বাঁচা'-কেই তার অভ্যাসে পরিনত করেছে,-ঠিক তখনই এক ঝোড়ো হাওয়া যেন বয়ে গেল তাদের গতিহীন, গতানুগতিক জীবনে। নতুন ভাবে তারা ভাবতে চাইল,বাঁচতে চাইল।

জগৎ বীণার সুর শুনিয়ে পরাধীন ভারত মায়ের নিদ্রিত সন্তানদের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করানোর পুণ্য সংকল্পে, যিনি এই উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন,- তিনি কর্মযোগী কবি মুকুন্দ দাস। যাঁর পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি 'চারণ কবি' নামে। বাঙালি জাতির লুপ্ত গরিমা,ঐতিহ্য,সাহস ফিরিয়ে আনার সংকল্প যাঁর স্বপ্নে।

কবি মাত্রই প্রতিভাধর।যাঁদের সৃষ্টিতে ধন্য সাহিত্য ভাণ্ডার। তবে সব কবি চারণ কবি নন। 'চারণ' বলতে আমরা বুঝি,-আনন্দলোকের যাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়ী পথিক এবং যাঁরা ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান। চারণকবি প্রতিভাবান, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রতিভার 'পাগলামি' লক্ষ্য করা যায়।চারণেরা লোককথার ঐতিহ্যবাহী শিল্পী। এঁরা মুক্তপুরুষ,

খামখেয়ালী,প্রচলিত অর্থে কিছুটা বেহিসেবিও। এ জগতের মানুষ হয়েও, যেন অন্য জগতে বাস করেন। আপন খেয়ালে স্বভাব মাধুর্যে ও উদাত্ত কণ্ঠে এঁরা যে গান গেয়ে বেড়ান তা কাজের মানুষের প্রয়োজনে না আসলেও, মনের মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায়। তবে সব কবি চারণ কবি হতে পারেন না। মানুষের গান, মুক্তির গান দিনবদলের গান সাম্যের গান , পরাধীনতার শিকল ভাঙার গান, যাঁরা গ্রামে-গঞ্জে,শহরে-বন্দরে সকল মানুষের মাঝে গিয়ে মনের তালে তালে মেতে-গেয়ে ওঠেন,মানুষের সাথে মিলেমিশে মাটির গান শোনান, তাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার সংকল্প নেন, নিজের বিশ্বাসে সংকল্পে অটল থাকেন,- তিনি-ই যথার্থ চারণ কবি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে চারণ কবির নাম স্মরণীয়,- তিনি মুকুন্দ দাস। তিনি একাধারে ভক্ত, সংগ্রামী, গীতিকার, প্রচারক, গায়ক, নাট্যকার,কবি,সুরকার। কাজী নজরুল ইসলামের কথায়,-" যাঁরা গান বা বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন তাঁরা সকলেই চারণ। আপনি, আমি, আমরা সবাই চারণ, তবে আপনি আমাদের সম্রাট। অর্থাৎ চারণ সম্রাট। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ কবি মুকুন্দ দাস।"[1] যিনি বলতে পেরেছেন- "দিতাম একটা এমন অট্টহাস,/ জগতটার কেটে যেত পাশ।/... এ মুকুন্দ একাই পারিত,/ জগত ধরে দিত একটা টান।"

মুকুন্দ দাসের জন্ম ১৮৭৮সালে,

ঢাকা বিক্রমপুরের বানরী গ্রামে। প্রকৃত নাম যজ্ঞেশ্বর দে। পিতা গুরুদয়াল দে, মাতা শ্যামা সুন্দরী দেবী। পড়াশোনায় নিতান্ত অমনোযোগী যজ্ঞেশ্বর শ্মশানের রাত কাটিয়েছেন প্রায়শই। অসীম সাহস তাঁর রক্তে। জলপাইগুড়ির মামা বাড়ি থেকে তিনি চলে আসেন বরিশালে। সান্নিধ্য পান অশ্বিনী কুমার দত্তের। কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। পরবর্তীতে তিনি মুদির দোকানে বসার ফাঁকে কীর্তন গানের চর্চা শুরু করেন, বৈষ্ণব ভক্ত গায়ক বীরেশ্বর গুপ্তের কাছে। পরে রামানন্দ গোঁসাই -এর কাছে দীক্ষিত হন বৈষ্ণব মন্ত্রে। গুরু তাঁর নতুন নামকরণ করেন মুকুন্দ দাস। ১৯০১ সালে কীর্তন গান দিয়ে তাঁর কবি জীবন শুরু। মুকুন্দের গানের সংখ্যা ১০০ ছুঁয়ে যায় মাত্র ১৯বছর বয়সেই। 'সাধন সংগীত' নামে একটি বইও ছাপা হয়। মূলত ভক্তিমূলক গান ছিল বইটিতে এবং তাতে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ভাবধারার গানই দেখতে পাওয়া গেছিল। ১৯০৫ সাল মুকুন্দ দাসের হৃদয়তন্ত্রে ঝংকৃত হয়ে উঠলো স্বদেশীয় বিজয় ডঙ্কা। অশ্বিনী কুমার দত্তের সংস্পর্শে তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেন। তিনি বলেছিলেন-" যজ্ঞা তোর এই কন্ঠ আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নূতন যুগের চারণ, যাদের

আজও ঘুম ভাঙেনি, তুই জাগিয়ে দিবি তাদের।"[2] রাজনৈতিক গুরুর আশীর্বাদ মিথ্যে হতে দেননি যজ্ঞেশ্বর। তাঁর অবিস্মরনীয় কিছু গান এবং ৮টি দেশাত্মবোধক নাটক(মাতৃপূজা,সমাজ,পথ, মিলন, সাথী, পল্লী সেবা, ব্রহ্মতারিণী, কর্মক্ষেত্র) এইসব রচনা তাঁকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি কারাবরণও করেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য, ইংরেজবিরোধী উচ্চারণের জন্য। তাঁর নামে ৩৬ টি ইনজাংশনও জারি হয়।

মুকুন্দরাম গান লিখেছিলেন মানুষের জন্য। মানুষকে কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের যে ডাক তিনি দেন, তাতে আছে শক্তি, আছে দেশ মায়ের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি। এ যুগের চারণ তাই বলেছেন- "এ মহা কর্মের যুগে, শান্তি নাই কর্ম ত্যাগে,/ মুকুন্দ করেছে কর্ম, শান্তিবারি পিপাসায়।" তাঁর গানে মাটি ও মানুষ মিশে গেছে।মিলেছে হিন্দু-মুসলিম। বাঙালির মনের ছন্দ, ভাষা, সুর,ভঙ্গি তাঁর আয়ত্তে ছিল,আর সঙ্গে ছিল নিজস্ব জীবনবোধ ও বাঙালি সংস্কৃতির সাথে আন্তরিক যোগ। যার টানেই ছুটে আসত সাধারণ মানুষেরা। মুকুন্দের গান সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায় যাত্রার আসরে তিনি মাভৈঃ মাভৈঃ বলে গান শুরু করে দিতেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেতে উঠতেন তাঁর গানে। বহু জায়গাতেই সম্মানিত হয়েছেন মুকুন্দ দাস, পেয়েছেন ৭০০র ও বেশি পুরস্কার। বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারের ছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রিয়ংবদা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা মুকুন্দ দাস কে পুরস্কৃত করেছেন। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তাঁর দেহাবসান হয়।

মুকুন্দ দাসের গান এবং তাঁর নাটকে ব্যবহৃত সংগীত গুলি অনুশীলন করলে তার মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। মুকুন্দ দাসের গান কর্মপ্রেরণা সঞ্চারী। বাঙালি জাতির অন্তরের শক্তিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে গান বেঁধেছেন। অলস নিদ্রিত বাঙালিকে কর্মমুখী করে তুলতে তিনি সংকল্পবদ্ধ। এই কর্মযজ্ঞে তিনি কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ ও দরিদ্র উচ্চ নিচের ভেদ করেননি। তাঁর ডাক ছিল, সংঘবদ্ধভাবের। আর এই সংঘবদ্ধ লড়াই স্বাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী এই মানব জীবনে মৃত্যু অনিবার্য সত্য। তাই দেরি না করে সকলকে দেশোদ্ধারে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর গান। কবি অভয় মন্ত্র দিয়েছেন যে এই দেশরূপী নৌকার মাঝি স্বয়ং ভগবান। তাই দেশবাসী যেন নির্ভয়ে এগিয়ে আসে। মুকুন্দ দাসের বহু গানে এই কর্ম সাফল্যে তিনি ভগবানকে পাশে নিয়ে পথ চলেছেন। যেমন-

১) করমের যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,/ মোরাই শুধু রব কি শয়ান,/.. নিজেরে ভেবোনা হীন, ধনী মানী দুঃখী দীন-/ রাজা প্রজা সকলি সমান।

২) জাগরে ভাই সবে স্মরিয়ে কেশবে,/ জয় জয় রবে কাঁপারে মেদিনী/ দুঃখ নিশা মোদের হল অবসান,/ উদিত পুরবে সুখ দিনমণি।

৩) নির্ভয় এগিয়ে চল পাবি রে বিজয়লক্ষ্মী,/ ভারতের কর্মরথের সারথী শ্রী ভগবান।

এই রকম অসংখ্য গানে কবি কর্ম সংকল্পের সাহসী বাণীচয়ন করেছেন। বাঙালির প্রাণের শক্তিকে তিনি নাড়া দিয়েছেন। ভেতো বাঙালি কে বীর সমাজে অনুপ্রবেশের জন্যে তিনি নিজের হাতে যেন সাজ পড়িয়েছেন।

মুকুন্দ দাসের গান ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্দ্ধে। তাঁর গানে শাক্ত-বৈষ্ণব যেমন এক হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি হিন্দু-মুসলমান আন্তরিকভাবে মিলিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে মুকুন্দ দাস মুসলিম ঈদ উৎসবে যোগ দিতেন নির্দ্বিধায়। তিনি বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন কালি ও রাধাগোবিন্দের এক সাথে মন্দির। নিষ্ঠাবান এক মুসলিমের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।- "মুকুন্দের গান শুনিলে গুনাহ হয়না।"[3] মুকুন্দের গানেই এর সাক্ষ্য মেলে। যেখানে তিনি দশহাজার প্রাণ চেয়ে ছিলেন সেখানে আরো বেশি , লক্ষ লক্ষ বাঙালি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর গানগুলির উল্লেখ করতেই হয়।-

১) আত্মপর যাওরে ভুলি,কর সবে কোলাকুলি,/ওরে ভাই হিন্দু মুসলমান/ বাজারে দামামা কঁড়া, জগতে পড়ুক সাড়া।

২) দেখলেম ভাই জাতি কুল বিচারে।/ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিন্দু মুসলমান,/ কালেতে ছাড়ে না কারে।/ যতক্ষণ রাস্তার উপরে, ততক্ষণ জাত বিচারে/, খেয়া ঘাটে গেলে পরে, এক নৌকায় সব চড়ে।

৩) রাম রহিম না জুদা কর ভাই,/ মনটা খাঁটি রাখো জী,/ দেশের কথা ভাব ভাইরে/ দেশ আমাদের মাতাজী/ হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে/ তফাত কেন কর জী!

জনজাতির উন্নয়নে, দেশমাতার কল্যাণে যে কোনো রকম শ্রমকেই অমর্যাদা করলে চলবেনা, তা তিনি অন্তর দিয়ে মানতেন। তাইতো তার গানে চাষী, নাপিত,তাঁতী,জোলা,কামার,কুমোর কেউ বাদ নেই। তিনি জানতেন,কোনো পেশাই ছোট নয়। এ যেন এক সার্বিক উন্নয়ন,দেশের উন্নতি।এই শ্রেণি বঞ্চনা মুক্ত, শ্রেণি সাম্যের কথায় সমৃদ্ধ তাঁর গানের ভান্ডার।

১) স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন/ চাষার লাগি কাঁদিবে প্রাণ।

২) মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ,/ কষে লাঙ্গল ধর।/ ডেকে নে তাঁতী জোলা,/ছাড়িয়ে নেংটী তিলক ঝোলা।/ খুলে দে তাঁতের মেলা প্রতির ঘর/ কামার কুমোর চামার মুচি,/ তারাই কাজের তারাই শুচি,/ ধর জড়িয়ে গলা তাদের, ভুলে আপন পর।

৩) ভাইরে, ধন্য দেশের চাষা।/ এদের চরণ ধুলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা।

চরকা কাটা বা বিদেশী পণ্য বয়কটের ডাকে তিনি গান বেঁধেছেন। সারাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিল বাংলার বুকে তা আছড়ে পড়েছিল অচিরেই। এই আন্দোলনকে আরও বিস্তার দানে ব্রতী হলেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তিনি চরকার প্রসারের জন্য গান বাঁধলেন। বঙ্গ ললনাদের মধ্যে জাগিয়ে দিলেন বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা।

১) ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী,/ কভু হাতে আর পরো না/ জাগ গো জননী, ও ভগিনী,/ মোহের ঘুমে আর থেকো না,/ কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,/ কলঙ্কও হাতে পরো না।

২) দেশের জিনিস থাকতে কেন,/ বিদেশীতে মন মজাই;/ মোটা ভাত মোটা কাপড়ে,/চলে নাকি মোটামুটি/ বীটের চিনি কলের ময়দা,/কাজ কি রে আর খেয়ে তারে/ আখের গুড় আর যাঁতার আটা/ খাব খানা পরিপাটী।

৩) মুকুন্দ দাসে বলে ভালো সুযোগ পেলে,/ তোমরা সবে ধর চরকা হবে সুখ কপালে।

তিনি তাঁর গানে বাংলার ছোটলাট ফুলার কে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ ভরে প্রতিবাদ করেছিলেন

১) ফুলার-আর কি দেখাও ভয়?/দেহ তোমার অধীন বটে!/ মন তো তোমার নয়।

মুকুন্দ দাস মাত্র ৭দিনেই কলকাতার বুকে সাইক্লোন তুলে দিয়েছিলেন। অন্য এক গানে তিনি ইংরেজ সরকারের শোষণকে প্রতিবাদ করেছেন, প্রকাশ্যে ব্যঙ্গের ছলে লেখেন-" বাবু বুজবে কি আর ম'লে/ কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে।/ ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইন্দুরে করল সারা-"।

এই গান লেখার জন্য তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

কবি একাধারে সমাজ সংস্কারকও ছিলেন বটে। সারহীন 'বাবু' তন্ত্রকে তিনি মানতে পারেননি। মেকি ইংরেজ সেজে, নিজের ঐতিহ্য ভুলে বাবুরা যে জীবন যাপন করছে তা তিনি স্পষ্টতই পরিহাসের ছলে উল্লেখ করেছেন। গেয়েছেন 'এর' অন্তঃসারশূন্যতার

কথা।-" বাবুদের পায় নমস্কার-/ দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে/ ভালো-মন্দের নাই বিচার/ বাবু বিদ্যার নামে নবডঙ্কা-/ গুড নাইট গুড মর্নিং সার।"

প্রশিক্ষিত মায়ের কোলেই ভবিষ্যতের সুনাগরিক জন্ম লাভ করে। সু-সন্তান তখনই গঠিত হবে, যখন মার অন্তরাত্মা জাগ্রত হবে। জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারিণী নারীর দ্বারাই সু-সন্তান জন্ম লাভ সম্ভব,- এই সত্য বিশ্বাস মুকুন্দরাম পোষণ করতেন। তাঁর গানেও সেই বার্তাই-" মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল/ সকল কাজের এই তো গোড়া/.. মায়ের জাতি উঠলে গড়ে/ ছেলে মিলবে ঘরে ঘরে।"

সামাজিক সত্য, দেশ জাতি মানস গঠনের, জনমঙ্গল প্রচারের তিনি ঋত্বিক। নিরলস কর্মযোগী মুকুন্দরাম গান বেঁধেছেন, গান গেয়েছেন সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য। ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের জন্য।একজন প্রকৃত দেশসেবক মুকুন্দ দাস। কোনরকম যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য ছাড়াই সারা বাংলার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর গান।তা ছুঁয়েছিলে জনপ্রিয়তার শিখর। সার্থকতা এখানেই যে তিনি বিশিষ্ট নেতার মতো বা বড় মাপের কোন দেশ বিপ্লবীর মতো সভা-সমিতি করে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় নিজেকে সীমায়িত করেননি। দেশ হিতসাধনের সংকল্প তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে। একজন প্রকৃত চারণের পক্ষেই এ সম্ভবপর। মুকুন্দ দাসের গান আলোড়িত করেছিল তৎকালীন সমাজকে তাঁর ডাকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলার লাখ লাখ মানুষ। এ ভূমিকা তো একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের। সরল স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল তাঁর গানের। ওই সময়ের বাংলার নিরক্ষর জনতাকে তিনি জানতেন। তিনি মন থেকে চিনতেন ।তাইতো সে গান পৌঁছে গেছিল তাদের অন্তরে। এটাই একজন বিপ্লবী ভাব প্রচারকের সফলতা। কোনো ভাবস্বপ্নের বিহ্বলতা নয়, তিনি নির্ভীকতার সাথে তাঁর স্বপ্নকে প্রত্যক্ষতায় রূপ দিতে পেরেছিলেন। বলা যায় তাঁর কাজ শুধু মহতই নয়, তা অনুপম। তিনি বোধহয় ওই সময়ের একমাত্র চারণ কবি যিনি তাঁর কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই স্বাধীনতা যজ্ঞের এক ঋত্বিক।তাঁর নাটক ও নাট্য সংগীতের মাধ্যমে তিনি পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন গৃহস্থের ঘরে ঘরে। এ তখনই সম্ভব হয় যখন তাঁর বক্তব্য দুরূহতা মুক্ত দুর্বোধ্যতা মুক্ত। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভেদাভেদের সংকীর্ণ পথ ছিল তাঁর অজানা। তাইতো উভয় সম্প্রদায়ই মেতে উঠেছিল তাঁর গানে। এইতো একজন প্রকৃত চারণের কাজ। যিনি কেবল নিজ এলাকা

বরিশালের চারণ হয়ে থাকেন নি তাঁর প্রতিভা তাকে বাংলা তথা ভারতের চারণকবি করে তুলেছিল।

মুকুন্দ দাসের জীবনাদর্শ বর্তমানের নেতা বা অভিনেতাদের বা স্বকথিত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অভিনয় সর্বস্ব বর্তমানের কাছে তাই তিনি অচর্চিততো বটেই কিছুটা যেন ব্রাত্যও।বর্তমান প্রজন্মের বিস্মরণের সীমায় পৌঁছে গেছেন এই নির্ভীক বিপ্লবী চারণ কবি।এ আমাদের লজ্জা।পরিশেষে কবির স্বপ্ন আমরাও স্মরণ করব, নতুন ভাবে ভাবার জন্য, শপথের জন্য, নতুন দেশ গঠনের জন্য- "এমন দিন কি আসবে মোদের,/আমরা আবার মানুষ হব।/ ভুলে যাব দলাদলি,/ প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিব।

তথ্যসূত্র :

১. চারণ কবি মুকুন্দ দাস: সঙ্গীত চয়ন। পৃষ্ঠা-ঞ (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)
২. চারণ কবি মুকুন্দ দাস: সঙ্গীত চয়ন। পৃষ্ঠা-ঙ
৩. চারণ কবি মুকুন্দ দাস: সঙ্গীত চয়ন। পৃষ্ঠা-ঝ

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চারণ কবি মুকুন্দ দাস: সঙ্গীত চয়ন (বসুমতি সাহিত্য মন্দির)
২. হীরালাল দাশগুপ্ত : স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭)

মানচিত্রের অসুখ ও কয়েকটি সিনেমা

আজিমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

এখন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সিনেমা এবং সেই সূত্রে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল কিংবা এখন কেমন আছে সে-সবের আলোচনা করব বিক্ষিপ্তভাবে। কিছু পরিচালকের বাছাই করা কয়েকটি সিনেমা নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের সীমানা নির্ধারণ করব। প্রতিষ্ঠিত হোক বা না-হোক, শিল্পী আসলে প্রায়শই চেষ্টা করেন শিল্পের তথাকথিত অনুমোদিত সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে, নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যেতে। এখানে যাঁদের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে তাঁরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে এই সীমারেখা ভেঙেছেন। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজেদের শিল্পকে বিশ্বদরবারে হাজির করেছেন। কেউ কেউ রাজনীতিকে তাঁদের ছবির মূল বিষয়বস্তু করেছেন। যেমন জাফর পানাহি, ইরাকের পরিচালক। পানাহির 'The circle' মুক্তি পাওয়ার পরপরই ফ্যাসিস্টরা সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁর উপর কীভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। ইরানের অধিকাংশ দর্শকই ছবিগুলো দেখতে পায়নি এখনও পর্যন্ত। নিজের দেশের দর্শকদের তাঁরা সিনেমা না দেখাতে পাওয়ার ক্ষোভ তাঁর এখনও গেল না। সরাসরি রাজনীতি প্রসঙ্গ তাঁর সিনেমায় এমনভাবে ঢুকেছে যে, যে কোনও অবরুদ্ধ দেশের বাসিন্দা তাঁর সিনেমার বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানকে মেলাতে পারবেন। জাফর পানাহি নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> "এটা আমার দেশ, আমি কেন অন্য দেশে পালাব? আমার ছবির গল্প জন্ম নেয় আমার দেশের মানুষের মধ্যে থেকে। এটা দুঃখজনক যে তারা নিজেরা সেটা দেখতে পায় না।"

পানাহি জানতেন— যা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে তাই-ই রাজনৈতিক বিষয়। যুগে যুগে এরকম রাজনীতি সচেতন শিল্পীর কপালে সেনসরের কোপ পড়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্মলগ্ন থেকে এটা আমরা দেখে আসছি। নাৎসিরা, যারা ক্লাসিক্যাল গ্রিক শিল্পকে শিল্পের মানদণ্ড হিসেবে ধার্য করতে চেয়েছিলেন, তারা আধুনিক চিত্রকলাকে অবক্ষয়ী ব্যাখ্যা করেছিল। নিষিদ্ধ শিল্পীর তালিকায় কে না ছিলেন? পিকাসো, ভান গখ, গগাঁ, মাতিস প্রমুখ। **১৯৩৯** সালে প্রায় সাড়ে চার হাজার শিল্পবস্তুকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই

অর্থে জাফর পানাহি এবং তাঁর সঙ্গে মোহাম্মদ শিরওয়ানি, কিয়ানুস আয়রি, খসরু সিনাই, মোর্তাজা ফরসবাফ— সকলেই এই নিষিদ্ধ শিল্পীদের তালিকায় ছিল। আব্বাস কিয়ারোস্তামির মতো আর একদল পরিচালক অবশ্য মনে করতেন শিল্পীকে এভাবে প্রকাশ্যে রাজনীতির কথা বলার প্রয়োজন নেই। তিনিও আদ্যোপান্ত রাজনীতিকে তাঁর সিনেমায় ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু জাফর পানাহির মতো এতটা ক্রোধ নেই সেখানে। কিয়ারোস্তামির সব ছবিই আসলে আলঙ্কারিক এবং তার মধ্যে থেকেই ফুটে উঠেছে জাতি রাষ্ট্রের সমালোচনা। কিয়ারোস্তামি ভাবতেন সিনেমায় রূঢ়ভাবে রাজনীতি এলে সেখানে শিল্প ক্ষুন্ন হয়। আব্বাসের Where is my friends home. Taste of cherry-তেও রাজনীতি এভাবে এসেছে। তিনি জানতেন শিল্পীকে distant observer হয়ে কাজ করতে হয়। কিয়ারোস্তামির Where is my friends home সিনেমায় দেখি আহমেদ নামের একটি ছোট ছেলে ভুল করে বন্ধুর ক্লাস নোটের খাতা নিজের বাড়ি নিয়ে চলে আসে। কিন্তু বন্ধুকে যদি সেই খাতা ফেরৎ না দেয় তাহলে পরের দিন স্কুল থেকে সেই বন্ধুকে বহিস্কার করে দিতে পারে এই ভেবে সে বন্ধুর বাড়ি খুঁজে না পাওয়ার অসহায়তায় কাতর হয়েছে। আমাদের চোখে 'সামান্য' একটা নোটবুক ফেরৎ দেওয়ার এই জার্নিকে আদিখ্যেতা মনে হলেও মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতার এক অনন্য ফুটপ্রিন্ট রেখে যায় আব্বাস কিয়ারোস্তামি। আহমেদের নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, অদ্ভুত চোখের মায়া আমাদের জাগিয়ে রাখে, আমাদের ভাবায়। যা আমাকে চিন্তিত করে তোলে তাই-ই তো রাজনৈতিক! কিয়ারোস্তামির সিনেমায় ভাষায় অপচয় কম। সবাই যেন কেমন একটা আনমনা। কিয়ারোস্তামি নিজেও বিশ্বাস করতেন ভাষার সীমাবদ্ধতা। যে ব্যাপারটাকে ভাষা দিয়ে সবসময় বিশ্লেষণ করা যায় না সেখানেই বাস্তব লুকিয়ে থাকে! Taste of cherry সিনেমার বিষয়বস্তু অভিনব। এক মধ্যবয়স্ক লোক আত্মহত্যা করতে চায় এবং একজনকে খুঁজছে যে তার দেহটাকে কবর দেবে। এরকম অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে তিনি সিনেমা করেছেন। আব্বাসের সিনেমা দেখতে দেখতে আমাদের মনে হয়—আমরা একাকীত্ব চাই না, নিরিবিলি থাকতে চাই! দুঃখময় পৃথিবীতে মানুষের এই গল্প কত পুরনো হয়ে গেল, তবুও মানুষের জন্ম, তার পরিচয় এখনও কী মারাত্মক রোমাঞ্চকর। আব্বাস কিয়ারোস্তামি বারবার বলতে চান যেন— ‘জীবন যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না।’

ঘরছাড়া, বাস্তুচ্যুত পরিচালকদের ছবিতে বারবার ঘরে ফিরতে চাওয়ার আকুলতা, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আমরা এরকম দু-একজন পরিচালকের

ছবির কথা আলোচনা করব। যেমন Salt of the seas (২০০৮) সিনেমা। প্যালেস্টাইনের ছবি। এই ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুহের হামাদ। যিনি প্যালেস্টাইন-আমেরিকান কবি। সিনেমাতে তাঁর নাম সোরাইয়া। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে তার পরিবার ঘরছাড়া হয়। আমেরিকার রিফিউজি ক্যাম্পে তার জন্ম। প্যালেস্টাইনের মুসলিম অরিজিন সে। বড় হয়ে সে তার পূর্বপুরুষের জন্মভিটা দেখতে 'দেশে' ফেরে এবং খুঁজতে থাকে তাদের অতীত বাড়ি, পেয়েও যায়। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি— কিছুদিন আগেই Wall ম্যাগাজিন একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে ১৯৪৮ সালে যারা বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়েছিল তাদের মধ্যে দু-একজন পরে নিজেদের বাস্তুভিটেয় ফিরে এলে দেখতে পায় ইজরায়েলি কোনও এক পরিবার সেটা দখল করে দিব্যি বেঁচে আছে। তারা একবার শুধু ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল নিজেদের ব্যবহৃত সবকিছু দেখে 'স্মরণ' করবে বলে। কিন্তু ইজরায়েলি পরিবারটি তাদের মুখের উপর বলে দেয়—'You are not allowed to get in, this is no longer your home'. কোথায় যেন পড়েছিলাম—বাড়ি হল এমন একটা জায়গা যেটা আমরা আসলে ফেলে এসেছি। তো এই ছবিতেও সোরাইয়া তার বাপ-ঠাকুরদার বাড়ির সামনে ফিরে আসে এবং তাদের ব্যবহৃত বাড়ি-ঘর খুঁজে পায়। কেমন একটা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাপ-ঠাকুরদার বাড়ির সামনে। বাড়ির মেঝে, দেওয়াল সব খুঁটিয়ে স্পর্শ করে সে যেন ফিরে পেতে চাইছিল তার অরিজিন। কিন্তু ইজরায়েলি আগ্রাসনে সে বাড়ির দেওয়ালে আজ বুলেটের দাগ। জীর্ণ, ফাটা বাড়িতে বন্ধুকে নিয়ে রাত কাটাতে চাইছে সে এবং বুঝতে চেষ্টা করে পূর্বপুরুষের রক্ত-ঘামের দাগ। তার বন্ধু সেই বাড়ির উঠোনে একটা গাছ পুতে দেয়। গাছ লাগাতে লাগাতে আপন-মনে গান গায়— 'To separate us a wall and another wall.' প্যালেস্টাইন রিফিউজি চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি সেই সুহের হামাদ নিজেই একজন পলিটিকাল অ্যাক্টিভিস্ট। হামাদও সারাজীবন তাঁর 'দেশের বাড়ি'র ক্ষতচিহ্ন খুঁজে বেড়িয়েছেন। কারণ তিনি নিজেই রিফিউজি ক্যাম্পে বড় হয়েছেন। ব্রেক নামের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—'...I left my body somewhere / I remember rooms / But I don't remember walls.'

প্যালেস্টাইনের এই রাজনৈতিক সমস্যা আজকের নয়। এর সুদীর্ঘ এক ইতিহাস আছে। ১৯২২ সালে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা ছিল চুরাশি লাখের কাছাকাছি। এর বারো বছরের মধ্যে এই সংখ্যা পৌঁছায় তিন লাখের কাছাকাছি। প্রথম দিকে প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এগারো শতাংশ মাত্র ইহুদি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে

প্যালেস্টাইনে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় তারা আলাদা জাতিরাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জও ধীরে ধীরে ইহুদিদের দিকে ঝুঁকতে থাকে। প্যালেস্টাইনের ২৭ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার বর্গমাইল ইহুদিদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইজরায়েল ৬৭ সালে গাজা দখল করে সমস্ত মানবাধিকার ছিন্ন করে। এভাবেই নিজের দেশে পরবাসী, বহিরাগত হয়ে যায় তারা। রাষ্ট্রপুঞ্জ ইহুদিদের যতটুকু জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তার থেকেও বেশি জমি তারা দখল করে রাখে। ক্রমে ইজরায়েলি সেনার গা জোয়ারি বাড়তে থাকে এবং তার ফলে অসংখ্য প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা শরণার্থী হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়। প্রায় ২২ শতাংশ প্যালেস্তানীয় মনে করে এটা তাঁদের জন্মভূমি। প্যালেস্তানীয়রা মনে করে স্বদেশ আর রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। প্যালেস্তানীয় কবি নাহিদার মতে-

“ইজরায়েল এই শব্দটা আমি উচ্চারণ করতেই ঘৃণা বোধ করি এবং সাধারণত এই শব্দটা আমি এড়িয়ে চলি । ইজরায়েল এমন একটি সত্ত্বা যার কোনও তাত্ত্বিক অস্তিস্ব নেই, আবার শূন্যতাও কাজ করে না। দখলদারিত্বই এর মূল ভিত্তি। ইজরায়েল কোনও বিমূর্ত ধারণা বা অনুমানমূলক শূন্যতা নয়, এটি জনগণ দ্বারা পরিচালিত একটি সত্ত্বা বা অস্তিত্ব।

ইজরায়েল হল এমন একদল জনগণ দ্বারা চালিত একটি অস্তিত্ব যে জনগণ নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। যে জনগণ রাজনীতিবিদদের নির্বাচন করে। যে জনগণ তার হিংস্র-উন্মাদগ্রস্ত সেনাবাহিনীর সেবায় নিয়োজিত। যে জনগণ স্বজাতিবাদে বিশ্বাস ও মনোভাবকে প্রতিপালন করে এবং উৎসাহিত করে। যে জনগণ অন্যের ভূখণ্ড আক্রমণ করে, সেখানকার ভূমিপুত্রদের অধিকার কেড়ে নেয় এবং বলপূর্বক তাঁদের দখল করে। যে জনগণ শিশুদের বন্দি করে রাখে এবং নির্দ্বিধায় গুলি করে। যে জনগণ পৃথিবীর ঐতিহ্য ধ্বংস করে। যে জনগণ জল, জমি, সমুদ্র, এবং আকাশ অপহরণ করে। যে জনগণ আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ প্রতিদিন খুন করে। যে জনগণ প্যালেস্তানীয়দের রক্ত এবং ধ্বংসের উপর নিজেদের বসতি স্থাপন করে।

ইজরায়েল হল এমন একদল জনগণ দ্বারা চালিত একটি অস্তিস্ত্ব যাদের ৯৪ শতাংশ গাজাকে আক্রমণ করার পক্ষে ভোট দেয়। যাদের ৭১ শতাংশ চায় আমেরিকা ইরানকে আক্রমণ করুক। যারা সমস্ত আইন লঙ্ঘন করে প্রতিবেশী সমস্ত দেশের ওপর ইতিমধ্যেই প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে।

ইজরায়েল হল এমন একদল জনগন দ্বারা চালিত একটি অস্তিস্ত্ব যারা গত ৬ দশক ধরে চুরি করা একটা ভূখণ্ডে বাস করছে। যার জন্য লজ্জা, অনুশোচনা, বিবেকদংশন বা সেই কৃতকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করার নূন্যতম কোনও চিহ্ন তাঁদের মধ্যে নেই”। দারীন তাতুর আর একজন প্যালেস্টাইনের কবি। তাঁর লেখা ‘জনগণের প্রতিরোধ, প্রতিরোধ-ই স্বাধীনতা’ নামক কবিতাটি এখানে স্মরণ করা জরুরি-

“জাগো প্যালেস্তাইন
মিউ মিউ করে কোনও সুরাহা হয় না
চিৎকার করতে শেখো, চিৎকার...
জামার হাতায় রক্ত মুছে উঠে দাঁড়াও
ভেড়ার মতো মরে যাওয়াতে কোনও বীরত্ব নেই
পতাকাকে মাটিতে গড়াতে দিও না
যতক্ষণ না কুকুরগুলোকে তাড়াতে পারো

আমাদেরও সময় আসবে
জেরুজালেম ভেঙে পড়ছে
শহিদের সওয়ারি চলেছে
রুখে দাঁড়াও
পঙ্গু, অভিশপ্ত সংবিধানকে টুকরো টুকরো করো
আস্তাকুড়ে ফেলো
অধিকার ছিনিয়ে নিতে গেলে
তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে

কাফেরদের কথা ভাবা বাদ দাও
ওরা ভাড়াটে খুনি
তোমাকে এবার প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে আসতে হবে
এই তো সময় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার

যারা এজেন্ট পাঠিয়ে আমাদের শান্ত করতে চাইছে
মিথ্যে আশ্বাসের ঘেরাটোপে পুরতে চাইছে

ত্রিসীমানায় ভিড়তে দিও না তাদের

এতদিনকার বদলা নিতে
জন্মভূমি ফেরত নিতে
কোথায় তোমার সেই ঝাঁঝ

হুংকার ছাড়ো
নেমে আসো রাস্তায়
যদি কিছু না থাকে বিশ্বাস তুলে নাও হাতে
বিশ্বাসই তোমার হাতিয়ার

আল্লা ডাকছে তাঁর বান্দাদের
চলো, চোখরাঙানির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানোর এক অমর গাঁথা লিখি"।

এলিয়া সুলেমান প্যালেস্টাইনের একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক। Chronicle of a disappearance, Divine Intervention, The time that Remains তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর জন্মভূমির ভবিষ্যৎ কী এই নিয়ে তাঁর ছবির যাত্রা। নিজের যন্ত্রণা, অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ছবি নির্মাণ করেছেন। ইজরায়েলের প্যালেস্টাইন অভিবাসীদের জীবন, নিজেদের পরিচয় হয়রানি তাঁর ছবির মূল বিষয়। 'It must be heaven' তাঁর সেলফ-রিফ্লেক্সিভ কাজ। বিস্মরণ আক্রান্ত মানুষ, ট্রমাটাইজড মানুষ, বিচ্ছেদের অস্বীকৃতি, জান্তব চিৎকার তাঁর ছবির বিষয়। গভীর প্রশান্ত স্নিগ্ধ ট্র্যাডিশনের তিনি কেউ নন! নন লিনিয়ার ন্যারেটিভে তিনি বলে চলেন— 'The world become has Palestine'. তাঁর ছবিতে বেশি কথা বলে না কেউ কারণ তিনি বিশ্বাস করেন ভাষাকে কেন Abuse করব অকারণে আমরা? 'It must be heaven'- ছবির মূল চরিত্রে নিজে অভিনয় করেছেন। একজন মানুষ যিনি প্যালেস্টাইন ছেড়েছেন নতুন জীবনের শুরুর জন্য কিন্তু ততদিনে গোটা পৃথিবীর মানুষই উৎখাত ও ঘরে ফেরার যন্ত্রণায় কাতর। খন্ডিত আত্মপরিচয়ে মানুষ বুঝে গেছে এ জীবন স্যাভেজের। হে প্রিয় পাঠক আপনারা নিশ্চয় বুঝবেন বাস্তুচ্যুত মানুষের স্মৃতি-লালিত পশ্চাদভূমি। উন্মাদ কল্পনার হিস্টিরিয়া যাদের মজ্জাগত। আপনাদের মনে পড়তে পারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'একটি জীবন' ছবির কথা। একজন অভিধান নির্মাতার চরিত্রে অভিনয়

করেছেন তিনি। আমরা অনুমান করতে পারি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী। দেশভাগের পর ক্যাম্পে ঠাঁই হয়েছিল এই লেখকের। তখন তিনি বলেন— এতদিনে বুঝতে পেরেছি উদ্বাস্তু শব্দের মানে। এর আগে কোনওদিন বুঝিনি। যাপিত জীবনের যন্ত্রনা আখ্যানের গায়ে এভাবে কামড়ে থাকে। কোনওভাবেই পাশ ফিরে শুতে দেয় না। এলিয়া সুলেমানও তাঁর ছবিতে এরকম কষ্টের কথা বলেছেন। এ ছবিতে সুলেমান এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন যে কারো ভাষা বুঝতে পারে না, সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে। সিসিটিভি, মিলিটারির রক্ষচক্ষু, মেট্রোতে অচেনা মাচো পুরুষের সন্দেহের দৃষ্টি প্যান অপটিকানের মতো ঘিরে থাকে তাকে। সুলেমান বুঝতে পারেন—'The whole generation is more anxious, more fragile, more depressed. সেজন্য দেখি বারের মধ্যেও সবাই যেন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। এসব দেখে সুলেমান ভাবেন—'The whole world are drinks to forget.

কিছুদিন আগে নেটফ্লিক্সে The social Dilemma নামের একটি তথ্যচিত্র অনেকেই দেখেছেন আশা করি। সেখানে দেখানো হয়েছে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সবকিছু তথ্য কীভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রের হস্তগত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওপর কীভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আমাদের রান্নাঘরের আনাজ থেকে শুরু করে বেডরুমের সংলাপ রাষ্ট্র কীভাবে কুক্ষিগত করছে প্রতিনিয়ত। স্মার্ট টেকনোলজি আমাদের ফোনে আড়ি পাতছে কীভাবে এবং সেখান থেকে সে যে-সব তথ্য পাচ্ছে সেটি তার Artificial intellegancy ও মেশিন লার্নিং প্রোগ্রামে ফেলে আমাদের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করছে রোজ। একটু লক্ষ করলেই টের পাবেন আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ আলোচনার বিষয়ও আমাদের ফেসবুকের টাইমলাইনে বিজ্ঞাপন আকারে চলে আসে। আমরা নিজেরাই জানতে পারি না আমাদের ফোনের বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের সময় কীভাবে লোকেশন, ফোনের মাইক, ফোনের ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে রাখি। আমাদের চাহিদার ডাটাভাণ্ডার বিশ্ব পুঁজির কুক্ষিগত হয়ে উঠছে এভাবে, যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইউরোপের কয়েকটি দেশ মাত্র। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ উপভোক্তা মাত্র। এই উপভোক্তা মানুষ শুধু সংযোজিত (Communicated) হতে পারে— নিজের স্বাধীন মতামত অন্যদের জানাতে পারে না। এই গণমাধ্যম আমাদের দেখতে বলে কিন্তু দেখাতে বলে না, শুনতে বলে কিন্তু শোনাতে বলে না। উপভোক্তা হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে বলে কিন্তু স্বাধীন

নাগরিক হিসাবে নিজের মতামত বা বক্তব্য প্রকাশ করতে দেয় না। এই সমাজকেই তাত্ত্বিক প গি্য দ্যবোর 'The society of spectacle' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সুলেমানের 'It must be heaven' ছবিতেও এরকম এক আতঙ্কের কথা বলা হয়েছে। ছবিটি শেষ হচ্ছে একটি বারের মধ্যে কিছু 'হেডলেস' যুবকের উদ্যম নাচের মধ্য দিয়ে, ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন প্যালেস্টাইনের একটি গান বাজছে। রাষ্ট্রের নজরদারি অস্তিত্বের হাড়গোড়ে মিশে কীভাবে ক্ষমতা পাহারা দেয় ও সিঁদকাটে তাই-ই শ্রম ও নিষ্ঠার সাথে দেখিয়েছেন সুলেমান। সুলেমান বিশ্বাস করেন—'Everything is political. Nothing is innocent. Anything you do or say will be interpreted.'

তথ্যসূত্র:

১. জাফর পানাহি, দ্যা সার্কেল, ২০০০

২. আব্বাস কিয়েরোস্তমি, where is the friends Home, 1987
Taste of Cherry, 1997
The wind will carry us, 1999

৩. Suheir Hamad, Born Palestineian Born Black and The Gaza Suite, October 2010, Upset Press

৪. Suheir Hamad, breaking poems, 1st December 2008, Cypher Books

৫. Samad Josef Alavi, The poetics of commitment in Modern Persian A case of Three Revolutionary Poets in Iran, University of California, Barkley, 2013

৬. ফ্রিডম, গদ্য, অনুবাদ ও সম্পাদনা- সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, মানস চক্রবর্তী, সোহেল ইসলাম, নাটমন্দির, জানুয়ারি ২০২১

৭. এলিয়া সুলেমান, ইট মাস্ট বি হেভেন, ২০১৯

৮. এলিয়া সুলেমান, chronicle of a Disappearance , ১৯৯৬

৯. The social Dilemma, Jeff Orlowski, 26th January 2020

১০. https://youtu.be/9CVkkpJMDa

১১. https://youtu.be/FVQC5B350Fg

১২. https://youtu.be/hjLVCiAtvls

নাস্তিকতা, মানবতা, সমাজ-সংস্কার: তিনটি বাহুর সম্মিলিত ত্রিভুজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উত্তম বিশ্বাস
সহশিক্ষক, মালোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: *ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলি নিরসনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। শাস্ত্রবিধিরক্ষিত হিন্দুসমাজের বুকে তিনি বৈপ্লবিক আঘাত হেনেছিলেন। সমকালীন লোকাচারের সঙ্গে তাঁর মৌলিক বিরোধিতা ঘটে। বহুমুখী প্রতিভার আকর বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল তিনটি কাঠামো – নাস্তিকতা, মানবতা, সমাজসংস্কার। মুক্তমনা ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন মনুষত্বের অভিমুখে জীবনকে চালিত করেছেন। তিনি বস্তুবাদী যুক্তিবাদী মানুষ। প্রচলিত ধর্মাচারণে তাঁর আসক্তি ছিল না। ফলে কারো মতে তিনি আস্তিক, কারো মতে সংশয়বাদী, আবার কারো মতে আস্তিক। অনমনীয় দৃঢ়তা, প্রবল আত্মবিশ্বাস, অসীম ধৈর্যকে নিত্যসঙ্গী করে তিনি সমাজসংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবিকবোধে প্রাণীত হয়ে কর্মসাধনা করেছিল। তাঁর চৈতন্যলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে সমগ্র জাতি আগামী দিনের পথ চলার পাথেয় খুঁজে নিয়েছে।*

মূলশব্দ: *বিশ্বাস, দেশাচার, ভাবধারা, উপাসক, নাস্তিক, করুণা, সংযোগ, মানবতা, ব্যভিচার, কুসংস্কার, উৎকর্ষতা, বিধবাবিবাহ, উদারতা, জীবননিষ্ঠ।*

মূল আলোচনা:

প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রায় অবিশ্বাস্য গতিশীল ও পূর্ণতাভিলাষী একটি জীবনের অসামান্য উত্তরণের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বর্তমানের হাত ধরে আমরা যে ক্রমশ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভবনার পথকে প্রশস্থ করতে পারছি তার নেপথ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রতিবাদীর সাবলীলতা, বিরোধিতার বিপন্নতাকে সাঙ্গ করে তিনি চিরাচরিত দৃঢ়তায় দন্ডায়মান। তাঁর হৃদয়-মস্তিষ্কের বিপুলতা-ব্যাপকতায় আমরা বিস্মিত হই। তাঁর সুগঠিত নাস্তিক্যবোধ, প্রচন্ড কর্মশীলতা, সংবেদনশীলতা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, সমাজ সংস্কার, আবেগী বলয় – সবকিছুর সংযোগ-সহযোগে বাঙালি জাতি স্তরীভূত অন্ধকূপ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছে।

চারিত্রিক গুণের বলিষ্ঠতায় সম্পাদিত তাঁর কৃতকর্মকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবাক্যে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

> “বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—”[১]

১.

আত্মশক্তিতে, সাহসে, অজেও পৌরুষে দীপ্যমান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আস্তিক্যবোধ ও নাস্তিকতাবোধের স্বরূপ কেমন ছিল তা আমরা জেনে নেবো। মানুষের বাস্তব জীবন ও তৎসন্নিহিত ক্রিয়াকর্মকে তিনি জীবন-সত্য বলে জেনেছেন। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব কোনোদিনই তাঁর মনের সিংহাসন অধিকার করতে পারেনি। সমাজে প্রচলিত সংকীর্ণ হিন্দুত্বের আদর্শকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। সেইসময় হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট চিন্তকদের দ্বারা প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান, নিয়মকানুনের প্রতি তিনি আঙুল তুলেছেন। তিনি ‘দেশাচার’ প্রবন্ধে লিখেছেন—

“ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা!................সর্বধর্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া , কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।।..............হা ধর্ম! তোমার মর্ম বোঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।”[২]

তিনি বিশ্বাস করতেন এইসব ধর্মীয় আচার পালন করে আর যাই হোক সৎপথের পথিক হওয়া যায় না, কায়ক্লেশনির্ভর জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাতে সংসার-বৃক্ষে প্রতিনিয়ত বিষময় ফলের সংখ্যা বেড়ে চলে। এই ধারণার সপক্ষে শ্রুতি থেকে শ্লোক উল্লেখ করে তিনি ‘দেশাচার’ প্রবন্ধে লিখেছেন—

“ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।

দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্ত তৃতীয়াং লোকসংগ্রহঃ।। (১১৬)

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

এ স্থলে দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ও স্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ; সুতরাং দেশাচার অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা, বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।”[৩]

সমাজের ধার্মিকগণ প্রচলিত আচার-আচরণ, দেশাচারকে ধর্মের নিগড় মনে করতেন। দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে এই ছিল তাদের অভিমত। এভাবে যে মানুষের হিতাহিতবোধ, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তা বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ জানতেন। তারা দেশাচারকেই ধর্ম বিবেচনা করেছিলেন বলেই তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। এভাবে ধর্মপালনকে তিনি কখনোই মানতে পারেননি। সেজন্য তাঁকে ‘অধার্মিক’, ‘নাস্তিক’ এসব কথা শুনতে হয়েছে। দেশাচারের দাসত্ব পালন, লৌকিকরক্ষাব্রত উদ্‌যাপন এসবের অভ্যাসদোষে যথার্থ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি কলুষিত হয়। তা কখনোই চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত করতে, দুর্নিবার রিপুসমূহকে বশীভূত করতে পারে না। হিন্দুধর্ম পালন করা ধার্মিকদের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেছেন—

“এ দেশের হিন্দুসমাজে, আজ কাল, যেরূপ ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহাতে, যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, শাস্ত্রের বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে, বিচার করিয়া বলিতে গেলে তাহাদিগকেও যথেচ্ছচারী বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, এবং তাদৃশ অন্যায় বা অবিবেচনার কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না।”[৪]

তিনি ধর্মকে যুক্তিপারম্পর্যের ভিত্তিতে পরখ করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অগাধ পান্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাশ্চাত্য ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন। একদিকে তিনি ফরাসী দার্শনিক অগুয়েস্ত কোঁৎ প্রবর্তিত ‘দৃষ্টবাদে’র(Positivism) প্রতি আস্থাশীল ছিলেন অন্যদিকে বেন্থাম প্রচারিত ‘উপযোগবাদে’র(Utilitarianism) প্রতিও আকর্ষিত হয়েছেন। আবার গ্রিক ঐহিক ‘সুখবাদে’র(Hedonism) প্রতিও তাঁর বিশেষ আনুগত্য ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি বিশেষ আনুগত্যই তাঁকে ধর্মাভিমুখী হতে বাধা দান করেছে।

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরকে ধর্মাদ্রোহী বলে বিবেচনা করে 'Story of his Life and Works' গ্রন্থে লিখেছেন—

"Vidyasagar was a man of the age, he followed the course indicated by it. No douth this course has brought on a greater mischief to the real Hindu, has materially injured Hindu Religion, has propelled the Hindu Society with great force in the direction of disorganization, but Vidyasagar ought not to be blassed for it. God alone, who made him such materials, knows why he did so,"[৫]

ধর্ম বলতে তিনি ঈশ্বরকে বোঝেননি। দারিদ্রে ডুবে থেকে জীবন-নিপাতী মানুষের প্রাণান্তকর জীবন নির্বাহের মধ্যে তিনি ধর্মকে খুঁজেছেন। তিনি জানতেন সমস্যাসঙ্কুল জীবন থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর এগিয়ে আসবেন না। যা করার মানুষকেই করতে হবে। তাই ব্যক্তিগত জীবনেও নানাবিধ সমস্যা, হতাশা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কখনোই ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হননি। যাথার্থ ধার্মিক কেমন হবেন তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন—

"দেশের ধর্মরক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিয়া, অভিপ্রেত সাধনার জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণ যথার্থ ধার্মিকের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

যাহার নাম ধর্ম, তিনি, পৃথিবীর সর্ব প্রদেশেই, স্বীয় উপাসকদিগের আচরণদোষে, নিতম্ভ হতমান ও ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া, অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন।"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারস্পারিক সাক্ষাৎ আলাপনে ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নাস্তিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ঈশ্বরানুভূতির ভাবাবেগে আবিষ্ট অন্যজন সমাজ সংস্কারে মগ্ন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সেকথা মাষ্টারমশাই বিদ্যাসাগরের কাছে উত্থাপন করলে তিনি বলেন—

"কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়া-টেরুয়া পরে নাকি?"[৭]

শ্রীম রচয়িতা অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পর্ব বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

"বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'

'আমি সিদ্ধ?' থমকে গেলেন বিদ্যাসাগর। 'কৈ, আমি তো সাধন ভোজন করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, ঘুরি না তীর্থে-ঘাটে, আমি—আমি সিদ্ধ হলাম কি করে?"[৮]
সেই আলাপনপর্বে ঈশ্বরের শক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন হতেই বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন—
"তাহলে আপনি বলছেন ঈশ্বর কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?"[৯]
ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন তা এই আলাপন পর্ব থেকে অনুমান করা যায়।

তাঁর নাস্তিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। পুত্রপ্রতীম শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধুস্থানীয়দের সঙ্গে তিনি একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে আলাপচারিতায় রত ছিলেন। অদূরে এক বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যীশুখ্রীষ্ট ভজনা করে কীভাবে ইহজীবন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তা শিশুদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। জোরপূর্বক এই ধর্মপোদেশ দেওয়া থেকে শিশুদের মুক্ত করে বিদ্যাসাগর নিজেই ধর্মপোদেশ শোনার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আরো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা যাবে এই আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্মপ্রচারক যীশুর মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগরের নাস্তিক মনোভাব অনুধাবন করে তিনি অভিশাপ বর্ষণ করলেন।

লৌকিক ধর্ম পালন, ধর্মপাসনা, দেব-দেবীর উপাসনা এসব নিয়ে তিনি কখনোই আগ্রহ দেখাননি। তাঁর সব আরাধনা মানুষকে নিয়ে। ঈশ্বরকে নিয়ে তিনি সর্বদা উদাসীন থেকেছেন। শুধু তাই-ই নয় ঈশ্বরের চিন্তা করে কালাতিপাত করাকে তিনি শ্রম ও সময়ের অপচয় মনে করতেন। কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে উন্নত করায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপে আশাহত হয়ে তিনি কখনোই ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেননি। মানুষের জন্য নিজের হৃদয়দ্বারটিকে তিনি সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছেন। বিপন্ন মানুষকে তিনি আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু কখনোই কোন দেবালয় বা ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্তে অর্থ দান করেননি। একদিন তিনি মাকে প্রশ্ন করেছিলেন—

"বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি, গ্রামের নিরূপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?[১০]
তিনি কখনোই দেবালয়ে ঈশ্বরকে খুঁজতে যাননি। তাছারা তিনি মূর্তীপূজাতে বিশ্বাস রাখতেন না। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।ভাই শম্ভুচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর

জীবনচরিতে' কাশীর দলপতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক সাক্ষাৎ পর্বের উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণগন বিদ্যাসাগরের নিকট অর্থপ্রার্থনা করলে তিনি বলেছেন—

"আমি যদি আপনাদের মতো ব্রাহ্মণকে কাশীতে দান করিয়া যাই, তাহা হইলে কলকাতায় ভদ্রলোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। আপনারা যতপ্রকার দুষ্কর্ম করিতে হয়, তাহা করিয়া দেশ পরিত্যাগপূর্বক কাশীবাস করিতেছেন। এখানে আছেন বলিয়া, আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।"[১১]

তাহলে তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন কিনা এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি সজোরে তাদেরকে কাশী ও বিশ্বেশ্বর না মানার কথা বলেছেন।

সবকিছুর পরেও একথা বলতে হয় মহাজগতের চালকশক্তি বলে যে কিছু আছে তা তিনি প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন। দেশাচার, কুসংস্কার, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যাজাল – এসব দেখে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি নিজের সমস্ত চিন্তাশক্তিকে মানুষের হিতসাধনে ব্যয় করেছেন। বিপুল কর্মকান্ডের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবার সুযোগই পান নি। আসলে তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর মানবতন্ত্র প্রতীষ্ঠা করেছেন- যা জাতির নবজাগরণের পথকে প্রশস্থ করেছে।

২.

ধনুর্ভাঙ্গা পন নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতির আত্মনির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন। মানবতার উপর ভিত্তি করে তার ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ ঘটেছিল। দীপ্তময় এক চিন্তাস্রোত নিয়ে তিনি কর্মাদর্শের প্রতি বেগবান হয়েছিলেন। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, দারিদ্র্যে জর্জরিত বেদনা, বিধবা কন্যার ক্রন্দন – এসব তাঁকে সুখাসনে স্থির হতে দেয়নি। আত্মশক্তিতে বজ্রের কঠোরতা আর সহানুভূতিতে কুসুমের কোমলতা – এই দুইয়ের সংযোগ-সহযোগে তিনি অন্তঃরাজ্যে এক মানবতার সমুদ্র নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মানবতায় এক ঋজু পৌরুষ ছিল। যার সাহায্যে তিনি একের পর এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিত্ত-আলোড়নে যে মানবতা জাগ্রত হয়েছিল তা তাঁর কর্মবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশলাভ করেছে। তাঁর এই বোধ বিদ্যুতের চমকের মতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে না। বরং তাঁর মহত্বের আদর্শে আমাদের চরিত্র-মহত্বের গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। নিজ জীবনের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মানবতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি সদা সচেতন ছিলেন। সে জন্য তাঁকে পদে পদে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন

হতে হয়েছে। আত্মশক্তির মহান সাধনায় ভর করে তিনি প্রতিক্ষেত্রেই দুরূহ বাধাসমূহকে উৎখাত করতে পেরেছেন। তিনি ইস্পাতসম খাঁটি পৌরুষত্বের প্রতীক। তাঁর খাঁটিত্ব বা অনন্যতন্ত্রতার স্বরূপ চিনতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' লিখেছেন—

"বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যপরতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন বাংলার ইতিহাসে তা অতিশয় বিরল।"[১২]

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ গতানুগতিক সংস্কারাধীন হয়ে জীবন নির্বাহ করেন। কৃত্রিমতার বন্ধনে জড়িয়ে তারা নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেন। অন্তরের আসল মানুষটিকে তাদের জানা হয়ে অঠে না। ভোগস্পৃহা আর সন্তান প্রতিপালনে তারা জীবনের অপচয় ঘটান। জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য তাদের অধরা থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অন্তরস্থ আসল মানুষটির স্বাধীন সত্তাকে 'নিজস্ব' বলেছেন যা আসলে মনুষ্যত্বের সমার্থক। বিপরীত দিক থেকে বলা যায় মানুষের নিজত্বের বিকাশ ঘটানোই হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে কানায় কানায় পূর্ণ।

এই দৃঢ়চেতা মানুষটি রোগার্তের সেবা করার জন্য সদা আগ্রহী ছিলেন। শোকাতুর দুঃখে শোকপ্রকাশ, ক্ষুদার্তকে অন্নদান, বিপন্নতা থেকে মানুষকে রক্ষা করা এসব ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। উদারতার প্রসারতায়, স্নেহবর্ষণের ব্যাপকতায়, দয়াপরায়নতার প্রাবল্যে তিনি দয়া-সূর্যে পরিণত হয়েছিলেন। যেখান থেকে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সর্বদা দয়ারশ্মি নির্গত হয়।

যদি তাঁর জীবনাদর্শের সামান্যতম অংশ নিজ জীবনে অঙ্গীভূত করতে পারি তাহলে সমস্ত অহংকার আত্মাভিমানকে দূরে সরিয়ে আমরা মহত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। মানবজাতির সমস্ত গৌরব ও আদর্শের শিখরে অবস্থান করে তিনি অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে মানুষের আরো নিকটবর্তী হয়েছেন। তাঁর সঞ্জীবনস্পর্শে সহস্র মানুষের জীবন পূণ্যধারার অংশ হতে পেরেছে, আগামীতেও হবে। জীবনের সূচনাপর্বে মানুষের হিতসাধনে তিনি যে কল্যাণধারার সূচনা করেছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা বেগবতী রূপ ধারণ করেছিল। বহির্জীবনের মূলগ্রন্থী – খাওয়া-পরা-শোওয়া যা আসলে সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ তার দিকে সবাই ধাবিত হন। সেই গতানুগতিকতায় বিদ্যাসাগর জীবন নির্বাহ করেননি। মনন স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও

অন্তর্জীবনের সজীবতায় তিনি সৃষ্টি কার্যের ধারা সচল রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিদ্যাসাগরচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন—

"বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল।"[১৩]

তাঁর সেই মননজাত মানবিক-চুম্বকে আমরা সর্বদা আকৃষ্ট হই।

৩.

সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ব্যাভিচার, হিংসাপরায়নতা দেখে বিদ্যাসাগর উদ্‌বেল হয়ে পড়েছিলেন। একসময় তিনি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন মনে করে বিবিধ কর্মকান্ড শুরু করলেন। বিধবাদের যৌবন-যন্ত্রণা, উপবাসের কাঠিন্য, বিধবাদশায় গর্ভবতী হয়ে লোকলজ্জার ভয়ে বাধ্য হয়ে সদ্যজাত সন্তানকে হত্যা করা এসব তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। অকালবৈধব্য শুধু মর্মান্তিক নয় তা সমাজের পক্ষেও যথেষ্ট পীড়াদায়কও বটে। সহানুভূতিতায়, নিগূঢ় মানবধর্মের ঔচিত্যে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হলেন। এজন্য তিনি 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। যুক্তিপরম্পরার নিরিখে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা তিনি প্রমান করলেন। গ্রন্থটি তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিধবাবিবাহকে আইনে রূপান্তরিত করতে না পারলে তা সমাজে প্রচলিত হবে না। তাই নানা বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তাকে আইনি রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইনিভাবে বিধিবদ্ধ হয়।

সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের ফলে সৃষ্ট নারীজীবনের দুর্দশাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বহুবিবাহ রদ করার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তদুপলক্ষ্যে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। শুধু তাই নয় বহুবিবাহকে তিনি আইনি রূপ দেওয়ার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

জাতীয়জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। নারীশিক্ষা দেবার জন্য তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ সমাজে অবহেলিত স্ত্রী জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ, প্রাপ্য মর্যাদা, নবজাগৃতির ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে তিনি আলাদা করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে আয়োজিত সমস্ত কৃতকর্মে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতেন। শুধু স্ত্রীশিক্ষা নয়

শিশুশিক্ষার প্রসারেও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। 'বর্ণপরিচয়' পুস্তকটি রচনা সেই উদ্দেশ্যেরই পরিচয়বাহী। চাষীদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি নৈশ বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করলেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে তিনি গণশিক্ষার প্রবর্তক। ধীরে ধীরে তাঁর শিক্ষাচিন্তা বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে তাঁর দূরদর্শিতার আসাধারণত্বে আমরা পুষ্ট হই। প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বিদ্যালয় পরিদর্শন-পরিচালনা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এভাবে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বাঙ্গীন প্রয়াসী হয়েছেন। গোপাল হালদার 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"এই চাদরধারী পন্ডিত মানসিক ক্ষেত্রে (মাইকেলের উক্তি স্মরণীয়) ইংরেজের অপেক্ষাও বড় ইংরেজ ছিলেন এজন্য যে, তিনি ইংরেজ জাতির প্রথম সংলব্ধ বুর্জোয়া (নবযুগের) যুগধর্মকে মনেপ্রাণে বরণ করেছিলেন; এবং ভারতীয় মধ্যযুগের সমাজকে জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে প্রাণপণে সংস্কার করে সেই জীবননিষ্ঠ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।"[১৪]

৪.

চিন্তা-ভাবনা, দূরদর্শিতা, মানসিকতা প্রভৃতির দিক থেকে তিনি সমকালের মানসিকতা থেকে কয়েক আলোকবর্ষ এগিয়ে ছিলেন। সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে বিদ্যাসাগর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। বিস্ময়কর মনন শক্তির সহায়তায় তিনি সুদৃঢ় সমাজ গঠনের বীজ বপন করেছিলেন। লোকহিতৈষণাকে তিনি পবিত্র ব্রত পালনের স্বরূপে বিবেচনা করতেন। কর্তব্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আত্মনির্ভরতা, কোমলতা, সরলতা, গুরুভক্তি, দায়িত্ববোধ, প্রেম – সবকিছুর সহযোগে তিনি অনন্য বিশিষ্টতার অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতেও বিপুলাবিস্তীর্ণ বিদ্যাসাগরের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেও পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।" [১৫]

বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানে, দুরবগাহ মননের সঙ্গে আপন মনের সংযোগে, ত্যাগের বুনিয়াদে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে, চিন্তা-ভাবনার যৌক্তিকতায় তিনি এক আদর্শ মানুষ। নাস্তিকতা, মানবতা, সমাজ-সংস্কারের ত্রিবিধ সূচকে তিনি

এক প্রগতিবাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু সমকালের আলোর দিশারী নন, ভাবীকালেরও অগ্রদূত।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ ১০১৫
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৮৩
৩. তদেব, পৃঃ ৬৭৯
৪. তদেব, পৃঃ ৯৪৪
৫. সুবলচন্দ্র মিত্র, Story of his Life and Works, P. 275
৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৪৭
৭. অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর, দ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা-পীতম ভট্টাচার্য, সাহিত্যম্‌, ২০১৯, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃঃ ৮৬
৮. তদেব, পৃঃ ৮৭
৯. তদেব, পৃঃ ৮৯
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ ১০২০
১১. শম্ভুচন্দ্র, পাঁচুগোপাল বক্সি, দ্বিশত জন্মবর্ষে বিদ্যাসাগর, পারুল, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৯, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃঃ ২০৯
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ ১০১৬
১৩. তদেব, পৃঃ ১০৩২
১৪. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা-দ্বিতীয় খন্ড, অরুণা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কল্কাতা-৬, পৃঃ ১৬০
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কামিনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ ১০৩১

ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিকাশে ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ: একটি অনুসন্ধান

দীপঙ্কর মন্ডল
এম. ফিল গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় অতিসম্প্রতি ঔপনিবেশিক আমলে চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই সূত্র ধরে ভারতের দন্তচিকিৎসার উন্নতি ও প্রসার গবেষণার একটি অন্যতম দিক নির্দেশিত করেছে। প্রাক্ ঔপনিবেশিকপর্বে দন্তচিকিৎসার তেমন প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্তুত এই সময়কালে দন্তচিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা, উন্নতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার এই অনালোচিত শাখাটি এখনো পর্যন্ত গবেষণার বা ইতিহাস পিপাসুদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। বস্তুত দাঁত হল শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই এই চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আমদানির জন্য এই আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শাখা কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার প্রেক্ষাপট পুঙখানুপুঙখ আলোচনার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে প্রবন্ধে। এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম চিকিৎসক ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ যাকে ভারতের 'দন্ত চিকিৎসার জনক' বলা হয় তাঁর কর্মকাণ্ড এবং দন্ত চিকিৎসার জগতে তাঁর অবদানও তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।*

সূচকশব্দ : *ঔপনিবেশিক, দন্তচিকিৎসা, সচেতনতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।*

মূল আলোচনা:

ভারত বিশ্বের প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে একটি, যা আটাশ'টি রাজ্য এবং নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তৃত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত দিকগুলির পাশাপাশি তাদের জাতি, ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন এবং শহর ও গ্রামীণ উভয় কাঠামোতে বিপরীত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ভারতে ডেন্টাল এডুকেশন ব্যবস্থা একটি

বিশাল, বৈচিত্র্যময় এবং জটিল নেটওয়ার্কের মধ্যে কাজ করে। এই শিক্ষার বিস্তার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন কলেজগুলি প্রতি বছর হাজার হাজার স্নাতক কোর্সে যোগ দিচ্ছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যে ক্রমাগত বিভিন্ন সময়ে দাঁতের শিক্ষার বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন কিন্তু আসন্ন অন্তর্দৃষ্টিকে উন্নত করতে কখনো এগিয়ে আসেনি। এই শিক্ষার উন্নতির জন্য ১৯৪৮ সালে পার্লামেন্টে পাশ হয়েছিল ঐতিহাসিক ডেন্টাল অ্যাক্ট এবং তখন থেকে দন্তচিকিৎসা শিক্ষার সকল প্রান্ত থেকে প্রশংসা ও অনুমোদন পেয়েছিল। ফলে চিকিৎসা শিক্ষার অন্যান্য শাখার মতো দন্তচিকিৎসা বর্তমান সুযোগ ও মৌখিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন বা সুযোগটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ-এর কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। যাকে ভারতে 'দন্ত চিকিৎসার জনক' বলা হয়।[১] এটি ছিল তাঁর নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল, যা আজ মৌখিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় দন্তচিকিৎসা বিজ্ঞান ও ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে দন্তচিকিৎসার প্রেক্ষাপট জানা আবশ্যক। দন্তচিকিৎসা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মুখগহ্বর, বিশেষত দন্ত বিন্যাস, মুখ ও চোয়াল সম্পর্কিত বিভিন্ন গঠন বা কলা নিয়ে অধ্যায়ন, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার দন্তচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।[২] যদিও সাধারণ মানুষের কাছে কেবল দাঁত সম্পর্কিত, কিন্তু দন্তচিকিৎসার পরিসর শুধু দাঁতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং করোটি ও মুখের অন্যান্য গঠন এবং চোয়াল ও ললাটের সংলগ্ন গঠনে অন্তর্ভুক্ত। দন্তচিকিৎসা শব্দটি এসেছে 'দন্তলোজি' থেকে। প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Odous' থেকে এর উৎপত্তি যার অর্থ দাঁত। দাঁতের গঠন, ক্রমবিকাশ ও অস্বাভাবিকতার শিক্ষাই হল দন্তলোজি।[৩] বিষয়বস্তু সাদৃশ্যের কারণে কোন কোন জায়গায় দন্তচিকিৎসা এবং মৌখিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই দুই নামই ব্যবহার করা হয়।

সাত হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতা থেকে দন্ত চিকিৎসার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল।[৪] মেহেরগড়ের এক জায়গায় দাঁত সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে ধনুকের ন্যায় যন্ত্রের ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।[৫] প্রাচীন দন্তচিকিৎসা পর্যালোচনা করে দেখা যায় তা নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী ছিল। সুশ্রুত ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান ও দক্ষ শল্যচিকিৎসক। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাশীতে প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে দন্তচিকিৎসা শেখানো হয়েছিল। সেই সময়কালে দন্তচিকিৎসা

বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বত্র সমৃদ্ধও হয়েছিল। যাইহোক এরপরে যুগ যুগ ধরে দন্তচিকিৎসা অন্ধকারে রয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণরা মাংশ, রক্ত ও পুঁজ স্পর্শ করতে ঘৃনা করত। মধ্যযুগেও দন্তচিকিৎসাকে আলাদা পেশা হিসাবে বিবেচিত করা হত না। ফলে মুঘল আমলেও এক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তবে উনিশ শতকে ব্রিটিশরা ভারতে বৈজ্ঞানিক দন্তচিকিৎসা পুনরায় চালু করেছিল।[৬]

ভারতের দন্তচিকিৎসা সম্পর্কিত দুটি প্রচলিত গল্পকথা বা মিথ সম্পর্কে জানা যায়। একটি হল ঝাড়খন্ডের বাস্টার জেলায় অবস্থিত দন্তেসরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে। কথিত আছে যে সতীর দাঁত বা দন্ত পরে ছিল, আজ যেখানে মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি সতেরো শতকে ওরাঙ্গালের কাকতীয় রাজাদের দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল।[৭] এখানে দাঁত সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিরাময় ও প্রার্থনার জন্য মানুষ এই মন্দিরে আজও ভিড় জমায়। অপরটি হল মহাভারত কাব্যে দেখা গিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে কর্ণের দানশীলতা ও উদারতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে ভিক্ষা চাইলে রোগশয্যাগ্রস্ত কর্ণ বলেছিলেন যে এই মুহূর্তে তার কাছে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। তখন ভিক্ষুকবেশী কৃষ্ণ তাঁর কাছে সোনা বাঁধানো দাঁত চেয়েছিলেন। এই কথা শুনে তৎক্ষনাৎ কর্ণ একটি প্রস্তরখন্ড দিয়ে তার সোনা বাঁধানো দাঁতটি ভেঙে ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেন।[৮] মহাকাব্যের এই অংশটি খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অবধি দন্ত চিকিৎসার অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ত্রুটিযুক্ত দাঁত সোনার সাথে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।[৯]

প্রাচীন গ্রিক পন্ডিত হিপোক্রেটিস ও এরিস্টটল দাঁত ওঠার আদর্শ নমুনা, ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, মাড়ির অসুখ, সাড়াঁশির যন্ত্রবিশেষের ব্যবহারে দাঁত উত্তোলন, তারের ব্যবহারে আলগা দাঁত ও চোয়াল স্তিতিশীল করার মতো দন্তচিকিৎসা নিয়ে অনেক লিখেছিলেন।[১০] এছাড়া রোমান বিজ্ঞানের লেখক কর্ণেলিয়াস সেলসাস বিস্তারিত ভাবে দাঁতের রোগ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে লেখেন।[১১] ৬৫৯ সালে চীনা চিকিৎসক সু কুং প্রথম দন্তমিশ্রনের (Dental amalgams) উল্লেখ করেন তাং রাজবংশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেখনিতে, যা জার্মানিতে ১৫২৮ সালে প্রকাশিত হয়।[১২] শুধুমাত্র দন্তচিকিৎসা নিয়ে রচিত প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৩০ সালে। প্রথম দন্ত চিকিৎসা নিয়ে রচিত পাঠ্যপুস্তকটির নাম ছিল 'অপারেশন ফর দ্য টিথ' যার লেখক ছিলেন চালর্স অ্যালেন এবং এটি ১৬৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩] বস্তুত ১৬৫০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ফরাসি শল্য চিকিৎসক প্রেরি ফকার্ডকে বলা

হত 'আধুনিক দন্ত চিকিৎসার জনক'।[১৪] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে অস্ত্রপচারের যন্ত্রের স্বল্পতার সত্ত্বেও ফকার্ড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শল্য চিকিৎসা করেছিলেন। ফকার্ড কৃত্রিম দাঁত স্থাপনের অগ্রদূত এবং তিনি হারানো দাঁত প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন উপায়ও আবিস্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারগুলি ১৭২৮ সালে 'Le Chirurgien Dentiste or the Surgeon Dentist' নামক প্রকাশনার মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে আসে।[১৫]

ভারতের দন্তচিকিৎসার জনক ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ ভারতীয় দন্তচিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী ও পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথা ভারতের প্রথম ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের (ডাঃ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ এন্ড হসপিটাল) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১৬] রফিউদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৮৯০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার বর্ধনপাড়া গ্রামে।[১৭] মৌলভী সৈফুদ্দিন আহমেদ ও ফৈজুন্নেসার চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন রফিউদ্দিন । ছোটবেলা থেকেই তিনি অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। নবাবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর আলিগড় মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ যা বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এসসি পাশ করেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।[১৮] চরম অর্থকষ্টে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাঁর উচ্চশিক্ষা। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি সওদাগরি জাহাজের কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে প্রথমে লন্ডন এবং পরে আমেরিকা যান। সেখানে নিজের চেষ্টায় ভর্তি হন আমেরিকায় আইওয়া ডেন্টাল কলেজে এবং আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে এক আইসক্রিম পার্লারে কাজ করতে থাকেন ।তাঁর পড়াশোনায় মুগ্ধ হন কলেজের অধ্যাপকরা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক হন তিনি। কাজের সুযোগ আসে ফোরসিথ ডেন্টাল ইনফারমারী ফর চিলড্রেন ইন বোস্টন, ম্যাসাচুসেটসে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর সেখানেই প্রাকটিস করেন এবং পারদর্শী হন।[১৯]

প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদিক সাহিত্যের অনেকগুলি রচনাতে দাঁতের রোগ ও তাঁর চিকিৎসা সম্পর্কে আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ রয়েছে। ভারতে দন্তচিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে। ১৯২০ সাল ভারতের দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে মাইল ফলক হিসাবে ধরা হয়। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রফিউদ্দিন আহমেদ ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি ভারতের তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ডেন্টাল কলেজ ও হসপিটাল স্থাপন করেন

মাত্র এগারোজন ছাত্র নিয়ে এবং নিজে দন্তচিকিৎসার উন্নতিসাধনে ব্রতী হন।[২০] আমেরিকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনিই কলকাতায় আইসক্রিম পার্লার স্থাপন করেছিলেন এবং এখান থেকে যে অর্থাগম হত তা তাঁর ডেন্টাল কলেজের কাজে লাগাতেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে ছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'হ্যান্ডবুক অব অপারেটিভ ডেন্টিস্ট্রি' । এটি আজও দন্তচিকিৎসার বাইবেল হিসাবে পরিচিত ।[২১] কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই ডেন্টাল কলেজ এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স দিয়ে শুরু হয় এবং ১৯২২ সালে এই কোর্সকে দু'বছরের কোর্সে উন্নীত করা হয়। ১৯৩৬-৩৭ সময়পর্বে কলেজ তারপর আরো LDSc ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য চার বছরের প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিল যা বাংলার সরকার ও চিকিৎসা অনুষদ অনুমোদিত করে।[২২] এই কলেজটি ডাঃ আর. আহমেদ মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং বর্তমানে ডাঃ আহমেদের মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে ''ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল''।[২৩]

১৯২৩ সালে আর একটি ডেন্টাল ইনস্টিটিউটশন যা পাঞ্জাব ডেন্টাল কলেজ নামে লাহোরে ডাঃ সত্যপাল দ্বারা শুরু হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনের কারণে সত্যপালকে অধিকাংশ সময় কারাগারে থাকার ফলে এই কলেজটি চল্লিশের দশকের শেষদিক পর্যন্ত তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই কলেজ কোন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার ডিপ্লোমা যোগ্যতা যুক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র ১৯৬০ সালে ভারতের ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল।[২৪] এছাড়া ১৯২৬ সালে ডাঃ এম. কে প্যাটেল কর্তৃক করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আমেরিকান ডেন্টাল কলেজ' যা ১৯৩১ সালে এবং পরে ১৯৩৬ সালে পুর্নবিন্যাস করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সাম্প্রদায়িক ব্যাঘাতের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ডাঃ প্যাটেল ভারতে চলে আসে।[২৫] ১৯২৮ সালে 'অন্ধ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল' নামে একটি ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান ডাঃ এইচ. এম রাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল হিসাবে পুনরায় নামকরণ করা হয়েছিল, যেটি মাদ্রাজের ৫৬, থাম্বু স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেলেও কোনো রকম স্বীকৃতি পায়নি।[২৬]

১৯৩২ সালে আরও একটি কলেজ যেটি 'সিটি কলেজ ও হাসপাতাল' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়কালে ১১৪

জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান থেকে।[২৭] এছাড়া ১৯৩৩ সালে নায়ার ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল বোম্বে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং ১৯৩৮ সালে বোম্বে সরকারী ডেন্টাল কলেজের যাত্রা শুরু করেছিল।[২৮] এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ আমরা কাল্পনিক যুগ থেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রমাণ ভিত্তিক দন্তচিকিৎসার যুগে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।[২৯]

দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে দুটি ডেন্টাল জার্নাল যথা- ডাঃ আর. আহমেদ কর্তৃক ১৯২৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয় 'দ্য ইন্ডিয়ান ডেন্টাল জার্নাল'[৩০] এবং ডাঃ এম. কে প্যাটেল কর্তৃক ১৯২৭ সাল থেকে প্রকাশিত হয় 'দ্য ইন্ডিয়ান ডেন্টাল রিভিউ' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই দুটি পত্রিকা বৈজ্ঞানিক দন্তচিকিৎসা এবং নৈতিক অনুশীলন প্রয়োজনের আলোচনার জন্য একটি ভালো ফোরাম প্রদান করেছিল এবং একই সঙ্গে দন্ত শল্যবিদদের যৌথভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।[৩১]

ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ১৯৪৮ সালে ডেন্টিস্ট অ্যাক্টের ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল দন্তচিকিৎসার উন্নয়ন করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রচার করা। বস্তুত ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া হল ভারতের দন্তচিকিৎসা ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এর দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে ডেন্টাল শিক্ষা, পেশা ও নীতিশাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ডেন্টাল কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা কোর্সের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।[৩২]

১৯২৫ সালে রফিউদ্দিন আহমেদ বেঙ্গল ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে রূপলাভ করে। এই ভ্রুনীয় ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানটি দেশে ডেন্টাল চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাকে ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, পরবর্তীকালে সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের জন্য সমর্থন করেছিল,[৩৩] জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং জনগণের সেবা করার জন্য দেশে দন্তচিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে। ভারত সরকার দেশে বেসরকারি ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমতি দিয়ে ডেন্টিস্ট এবং জেনারেল জনসংখ্যার ব্যবধান দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। ইন্টারনেট ডেটা সার্চের উপর ভিত্তি করে, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা শুরু করে এবং আজ অবধি তা অব্যাহত রয়েছে।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ-এর কাছেই দাঁতের চিকিৎসা করাতেন। একে অপরকে চিঠি লিখতেন। সেখান থেকে জানা যায়, কবিগুরুর জন্য

নকল দাঁত বানিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ রফিউদ্দিন। রবি ঠাকুর সেই দাঁত নিয়ে স্বচ্ছন্দেই ছিলেন।[৩৫] বস্তুত বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের সাথে ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে চার বৎসর তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্য ও ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ হতে দু-বৎসর অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে তাঁর মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন।[৩৬] ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দেগঙ্গা থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারের পূর্ণমন্ত্রী পদে ছিলেন ।১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি ।[৩৭]

সারাজীবন অক্লান্তভাবে দেশের মানুষের সেবা করেছেন রফিউদ্দিন আহমেদ। কখনও চিকিৎসা করে, আবার কখনও রাজনৈতিক পদাধিকার বলে। বেশ কিছু পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে। ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারন্যাশনল কলেজ অব ডেন্টিস্টস-এর ফেলো এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের রয়াল কলেজ অফ সার্জেন-এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিল।[৩৮] ১৯৭৭ সালে 'ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন' তাদের বাৎসরিক 'ইন্ডিয়ান ডেন্টাল কনফারেন্সে' রফিউদ্দিনের নামে পদক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় দন্তচিকিৎসায় তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেন। আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডেন্টিস্ট্রি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন' তাঁদের বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে রফিউদ্দিনকে সম্মানিত করে।[৩৯] ভারতবর্ষে আধুনিক দন্তচিকিৎসার জনক ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদকে তাঁর পেশাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন।[৪০] ১৯৬৫ সালে কর্মবীর এই মানুষটির মৃত্যু হয়। ভারতীয় দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণে রেখে কয়েক বছর আগে থেকে তাঁর জন্মদিন ২৪ শে ডিসেম্বর তারিখটিকে 'ন্যাশানাল ডেন্টিস্ট ডে' হিসেবে পালন করা হয়।[৪১]

তথ্যসূত্র:

১. Mazumder, D.(2011).Guest Editorial: Current Scenario of dental education in India, Contemp clin Dent., Vol. 2, pp.272-273.

২. https://www.ada.org/en/publications/cdt/glossary-of-dental-clinical-and-administrative-term

৩. Dental Treatment Wikipedia https://bn.m.wikipedia.org/wiki/

৪. Coppa, A., Bondioli, L. and Macchiarelli, R.(2006).Early Neolithic tradition of dentistry, Nature, Vol. 440, p.775

৫. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4882968.stm

৬. Ahuja, NK. and Parmar, R.(2011).Demographics & current scenario with respect to dentists, dental institutions & dental practices in India, Indian Journal of Dental science, Vol. 3, Issue 2, p.9

৭. *Ibid.*, p.10

৮. Kakkar, M., Pandya, P., Kawalekar A., and Sohi M.(2015).Evidence and Existence of Dental Education system in India, International Journal of Scientific Study, Vol. 3, Issue 1, p.186

৯. *Ibid.*, p.186

১০. https://web.archive.org/web/20160729163800/http://completedentalguide.co.uk/history-of-dentistry/ ২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে Complete Dental Guide. Retrieved 29 June 2016.

১১. https://web.archive.org/web/20091201213847/http://www.dentaltreatment.org.uk/history.html Dentaltreatment.org.uk. Archived from the original on 1 December 2009. Retrieved 18 April 2010.

১২. Czarnetzki, A. and Ehrhardt, S.(2014).Re-dating the Chinese amalgam-filling of teeth in Europe. International Journal of Anthropology. 5 (4): 325–332

১৩. https://web.archive.org/web/20160729163800/http://completedentalguide.co.uk/history-of-dentistry/ ২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে Complete Dental Guide. Retrieved 29 June 2016.

১৪. https://books.google.com.bd/books?id=2RRqAAAAMAAJ&redir_esc=yPierre Fauchard Academy.

১৫. *Ibid.*

১৬. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র ও বসু অঞ্জলি (সম্পা.).(২০১৬).সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৬২৩

১৭. মন্ডল, অভীক.(২০১৯).বিস্মৃত বঙ্গসন্তান ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসার জনক রফিউদ্দিন আহমেদ, বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা https://www.literacyparadise.com/2019/06/blogpost_33.html?m=1

১৮. দে, জয়দীপ.(২০২০).ভারতবর্ষে প্রথম ডেন্টাল কলেজ খুলেছিলেন ঢাকার ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ, সারাবাংলাhttps://sarabangla.net/post/sb-434553/

১৯. *তদেব*

২০. Babu, Arvind. and Santosh, Rajendra.(2015).Future of Dentistry in India: A raise or fall?, Journal of contemporary orofacial Health & Research, Vol.-1, Issue 2, p.41

২১. মন্ডল, অভীক.(২০১৯).বিস্মৃত বঙ্গসন্তান ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসার জনক রফিউদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

২২. https://dciindia.gov.in/History_DCI.aspx (Dental Council of India)

২৩. মন্ডল, অভীক.(২০১৯).বিস্মৃত বঙ্গসন্তান ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসার জনক রফিউদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

২৪. https://dciindia.gov.in/History_DCI.aspx (Dental Council of India)

২৫. *Ibid.*

২৬. *Ibid.*

২৭. *Ibid.*

২৮. Kakkar, M., Pandya, P., Kawalekar A., and Sohi M.(2015).Evidence and Existence of Dental Education system in India, *Op.Cit.*

২৯. Ahuja, NK. and Parmar, R.(2011).Demographics & current scenario with respect to dentists, dental institutions & dental practices in India, *Op.Cit.*

৩০. Fatima, Zareen.(2020).Dr. Rafiuddin Ahmed: "Father of modern dentistry" of India, Heritage Times https://heritagetimes.in/dr-rafiuddin-ahmed-father-of-modern-dentistry-of-india/

৩১. https://dciindia.gov.in/History_DCI.aspx Dental Council of India

৩২. Kakkar, M., Pandya, P., Kawalekar A., and Sohi M.(2015).Evidence and Existence of Dental Education system in India, *Op.Cit.*

৩৩. Babu, Arvind. and Santosh, Rajendra.(2015).Future of Dentistry in India: A raise or fall?, *Op.Cit.*

৩৪. *Ibid.*

৩৫. দে, জয়দীপ.(২০২০).ভারতবর্ষে প্রথম ডেন্টাল কলেজ খুলেছিলেন ঢাকার ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

৩৬. বন্দোপাধ্যায়, পারিজাত.(২০শে ডিসেম্বর ২০১৭).দন্ত চিকিৎসার পথিকৃৎকে মনে রাখেনি কেউ, আনন্দবাজার পত্রিকা https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/no-one-has-remember-the-pathfinders-of-dental-care-1.726726

৩৭. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র ও বসু অঞ্জলি (সম্পা.).(২০১৬).সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, *পূর্বোক্ত*

৩৮. Fatima, Zareen.(2020).Dr. Rafiuddin Ahmed: "Father of modern dentistry" of India, *Op.Cit.*

৩৯. মন্ডল, অভীক.(২০১৯).বিস্মৃত বঙ্গসন্তান ভারতবর্ষে দন্তচিকিৎসার জনক রফিউদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

৪০. *তদেব*

৪১. বন্দোপাধ্যায়, পারিজাত.(২০শে ডিসেম্বর ২০১৭).দন্ত চিকিৎসার পথিকৃৎকে মনে রাখেনি কেউ, *পূর্বোক্ত*

কেবল গড়া হয় নাই আপনার ঘর : প্রসঙ্গ 'ইমারত'

বিশ্বজিৎ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ
আসাননগর, নদীয়া, প:ব

সার-সংক্ষেপ: *তারাশঙ্করের 'ইমারত' নামক চরিত্র প্রধান গল্পখানি জনৈক শিল্পীর শিল্প-সাধনার শিখরে উন্নীত হবার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কঠোর কসরতের গল্প। শিল্পী জনাবের এই শিল্পসত্তার সমান্তরালে চলতে থাকে তার অপূর্ণ যৌনবাসনার পাপাচার। এই রীরংসাবৃত্তি যে অন্যায়, পাপ – সে বোধ তার থাকলেও তাকে অবজ্ঞা করার শক্তি যেন তার নেই। তাই খোদাতায়লার কাছে তার মিনতি কেবল এই 'গুনাহ' যেন তিনি মাপ করেন। তার আর গুনাহ নেই। কেবল এইটুকু। এই ক্ষিধে তার দেহের। তবে মনের ক্ষিধে তার শিল্প সাধনায় সার্থকতা লাভ। এখানে সে কারো সঙ্গে বা কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করেনি। ওস্তাদের হাতে নিজের ভালোবাসাকে (রঙ্গু) উৎসর্গ করতেও তার বাধেনি। হয়তো শিল্পের সাধনায় সার্থক হতে গিয়ে নিজের জন্য ঘর বাঁধা তার হয়নি। এত ইমারত গড়েও গল্পের ক্রোড়াংশে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে খোদাতায়লার গড়া ইমারতের নিচে। এইখানে গল্প আমাদের চিরাচরিত ভারতীয় আস্তিক্যবোধের বার্তা ঘোষণা করেছে।*

শব্দবন্ধন: *রীরংসা, আস্তিক্যবোধ, পাপাচার, গুনাহ, প্যালেস্তারা, ইমারত, পঙ্কের কাজ, খিলানের কাজ, টৈলধর্মিতা, action, emotion, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, নীতি-দুর্নীতি, ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ।*

প্রতিপাদ্য বিষয়:

বঙ্কিমের সাহিত্য রাজপুত-নবাবদের ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনের সাধারণ মানুষের সুখ-দু:খে ভাষা দিলেও তাঁর অধিষ্ঠান সেই প্রাসাদমালায়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজের অভদ্র- ইতরজনের আনাগোনা দেখা যায়। রবীন্দ্র কল্পনায় যেখানে সুন্দরের লীলা আর রসিক মানুষের কথা সেখানে শরৎচন্দ্রের কল্পনায় প্রেমিক মানুষের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। আর লক্ষ্য করা যায় জৈবিক মানুষ ও অর্থনৈতিক মানুষদের। জীবনের রসতীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী বলে বাৎসল্য ও মধুর রস মুখ্য তাঁর

সাহিত্য। তারাশঙ্কর তাঁর কল্পনার শিবচেতনায় নীতি-দুর্নীতির মাপকাঠিতে জীবনের মূল্যকে প্রকাশ করেছেন। পল্লীজীবনের দু:খ-দুর্দশা, ব্যধিগ্রস্থ জীবনের চিত্র তাঁর সাহিত্যেও এনেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় সভ্যতা যখন পন্যশালার ঐশ্বর্য গর্বে ধরাশায়ী তখন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। চিত্তবৃত্তি নয় ধাতুপ্রবৃত্তির অভাবনীয় প্রভাব তাঁর মানসপটে। তাই মধুর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস রসের সম্ভার তারাশঙ্করের সাহিত্য।

তারাশঙ্করের সমকালীন সময়ে বিভূতিভূষণ এবং মানিকেরও আবির্ভাব। বিভূতিভূষণের মনোগহনে যে প্রবল আস্তিক্যবোধ ছিল তার উৎস মানুষ আর প্রকৃতি। বিদ্রোহের বদলে বর্ণনাগুণে তিনি দারিদ্র্যকে করে তুলেছেন উপভোগ্য। নদীমার্তৃক দক্ষিণ বাংলার গ্রাম্য সরল চিত্রে ঈশ্বরবিশ্বাস, মানবপ্রীতি, প্রকৃতি-তন্ময়তা মিশিয়ে আত্মনিমগ্নতার সুরে রূঢ় বাস্তবকে আমাদের থেকে আড়ালে ঢেকে রেখেছেন। মানিক অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বাস্তবভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনের জটিলতার সন্ধান করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের উপর অদৃষ্টের প্রভাব দুর্মর। হতাশা, সংশয়, গ্লানিতে ধুঁকতে থাকা মানুষকে, জীবনের বিকারকে পরাজয়ের পথ থেকে উদ্ধারে তিনি যেন মন্ত্রও দিয়ে গেছেন। তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মহামন্দার কালে সংশয়াকীর্ণ নেতিবাদী নাগরিকতা থেকে সরে এসে বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয়ে উপনীত হতে চেয়েছেন। তথ্যসন্ধিৎসু শিল্পির দৃষ্টিতে নিয়তিলীলাকে রূপদান করেছেন তিনি। আর অবশ্যই তা দেশকালের চেতনায় এবং বিস্তৃত জীবনবোধে। তারাশঙ্কর নিজেকে একদিকে ‘কল্পনাপ্রিয় কবি’ অন্যদিকে ‘নানা তথ্যসন্ধানী সামাজিক’ বলেছেন। ‘বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মন্ডল প্রজা’ (অতুলগুপ্ত মহাশয়ের মতে) তারাশঙ্কর সম্পর্কে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিশ্লেষণটিও প্রণিধানযোগ্য- তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য- মাটির প্রতি মমত্ব আর মানুষের প্রতি মহিমা। এই বিশেষণগুলির যথার্থ প্রমাণ তাঁর কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়।

তুচ্ছ সাধারণ জীবনকথার মধ্যে ভারত-কথার উদ্ভাসনের এক অসামান্য ছোটগল্প ‘ইমারত’ (আনন্দবাজার, শারদীয়া, ১৩৫২)। গল্পনায়ক জনাব সেখের শ্রমজীবী জীবনের জীবনকথায় তার পেশাগত দক্ষতা ত্যাগ ও নিষ্ঠার মূল্যে আয়ত্ত বিদ্যার ফল, যার এক প্রেরণা বিশ্বদেবতার অপার সৃষ্টি রহস্য লীলার প্রতি তার মুগ্ধতা আর আকর্ষণ। তার একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি-

'খোদাতায়লা দুনিয়া তৈরী করলেন- কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন; সমান মেঝের মত দুনিয়ায় ক্ষেত গড়লেন, কিনারায় কিনারায় সমুন্দুর'।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রথীন্দ্রনাথ রায় তারাশঙ্করের গল্পে 'টেলধর্মিতা' লক্ষ্য করেছেন। সেই অর্থে তাঁর গল্পে সাংকেতিকধর্মিতা নেই বলেই তাঁদের বিশ্বাস। একথা আলোচ্য গল্প সম্পর্কে কিছুটা সত্য বটে। টেলধর্মিতা এখানে বর্তমান তবে সংকেতধর্মিতাও কিছুটা আবিষ্কার করা সম্ভব। স্টিভেনসন ছোটগল্পের তিনটি শ্রেণী নির্ণয় করেছেন- প্লটের গল্প, চরিত্রের গল্প, ইমপ্রেশনের গল্প। আলোচ্য গল্পখানি রচনাগত দিক থেকে চরিত্রের গল্প। অবশ্য তারাশঙ্কর চরিত্রের গল্প রচনার দিকে অধিক ঝুঁকেছেন। তারশঙ্করের গল্পের প্লট কখনো দৃঢ় সংহত যেমন (নারী ও নাগিনী), কখনো শিথিল (পৌষলক্ষ্মী , বোবাকান্না), কখনো সরল (তারিনী মাঝি), কখনো যৌগিক (জটায়ু), কখনো বৃত্তাকার (আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি কাহিনী/ যেমন পুত্রেষ্টি), কখনো পন্থাকার (শিথিল গঠন, জীবনের টুকরো টুকরো ছবি একটি ভাবদৃষ্টি ও কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে আবদ্ধ/ যেমন যাদুকরী, মেলা), কখনো হর্ম্যাকার (বিস্তৃত পটভূমি, বিচিত্র চরিত্রের আসা যাওয়া) বটে।এই সূত্রে আলোচ্য গল্পের প্লটকে আমরা বৃত্তাকার প্লট হিসাবে বিবেচনা করতে পারি।[২]

বিস্ময়বোধের মৃত্যু হলেই অনেকের মতো শিল্পীও তার সৃষ্টির আকর্ষণ ও সত্ত্বা হারাবে। মানত-পুরনে পাথর চাপড়ীর পীরসাহেবের দরগায় গিয়ে পথে রাজনগরের নবাবী আমলের তিনখিলানী ফটক দেখে জনাবের যে বিস্ময়ের জন্ম হয়েছিল তা থেকেই নবাবী ধাঁচের ইমারত গড়ার আকর্ষণ সে অন্তরে অনুভব করতে থাকে। এই বিস্ময়বোধ পূর্ণতা পায় প্রথমে সাহেবডাঙার কুঠির কাজে, পরে বর্ধমানের জমিদার বাড়ীর কাজে।কাদার গাঁথনির কাজ করে করে সে তার শিল্পী সত্ত্বার বিসর্জন দেবেনা। তার ঘর ছাড়ার একমাত্র কারণ রঙ্গু নয়। দুর্লভ বিদ্যা অর্জনের নেশাও। সাহেবডাঙার কাজে ওস্তাদ খুরসেদ আলীর কাছে সে শিখেছে পোস্তার গাঁথনি, বিলাইতী মাটি আর কাশীর চিনির মতো মিহি বালি মিশিয়ে তৈরী মশলার কাজ, পলেস্তারার কাজ আর ছাদ খিলানের দক্ষতা। সেই সঙ্গে সাহেবদের ইঞ্জিনীয়র আর তাদের নকশা থেকে সে শিখেছিল ইমারত তৈরীর হাল আমলের বিদ্যা। মুর্শিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগরের (নবাবী আমলের) থেকে অর্জন করা এই দুর্লভ বিদ্যা খুরসেদ জনাবকে দান করলেও

কেড়ে নিয়েছিল তার প্রেমিকার ভালোবাসা। তাদের এই প্রেম কখনোই ভাব-আবেগকে ছাপিয়ে যেতে চায়নি। দেহই সেখানে মূল কথা। তাই হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গুকে ঘর ভেঙে নিয়ে গিয়েও তাকে রক্ষা করতে খুব বেশী চেষ্টা করতে দেখা যায় না জনাবকে। জাত-কুল-ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ তাদের প্রেমে অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলাদা কোন বার্তা কিন্তু লেখক দেননি । দেহের খিদেকে মিটাতে মিটাতে শিল্পীর সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে চলা যেন তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। ওস্তাদ তার রঙ্গুকে কেড়ে নিয়েছে আর সেও ওস্তাদের হামিদনকে নিয়ে পালিয়েছে। আজ ষাটের কাছে তার বয়স অথচ কাহারদের মেয়ে মতিবালা বা হাড়ীদের মেয়ে দাসীকে নিয়ে তার লাতবউ, লাতিন সম্বোধন এবং কামগন্ধমিশ্রিত খুনসুটি আজও ঘুচলো না। শ্যামদাসবাবুর 'মন্দিল' গড়ার কাজে জনাবের মজুরনীর দলের মেয়ে এরা। পুরনো কালের আদর করা মজুরনীদের দু-একজন এখনো আছে তার দলের কামিন হয়ে।নিকে করা তার হয়ে ওঠেনি কারণ রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রানী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী – এদের নিয়েই বেশ দিন কেটেছে তার। প্রেমে বেইমানীও তাদের একপাক্ষিক নয়, তাই কারো প্রতি বিশেষ সমবেদনা জাগার সুযোগ নেই পাঠকের। মন যেমন সহজে ভাঙে তাদের তেমনি আবার সহজেই তা গড়ে ওঠে নতুন ফাঁদে পড়ার লোভে।

চরিত্রমুখ্য গল্প সাধারণত Narrative-ধর্মী হয়। আলোচ্য গল্পের Mode of representation-ও তারাশঙ্করের স্বভাবধর্মী প্রথম পুরুষে রচিত। রাঢ়ী উপভাষায় মান্য চলিত গদ্যে (বীরভূমের বিভাষায়) Dramatic ও Lyrical ঢঙে রচিত। তারাশঙ্কর বাক্যিক ও আধিবাচনিক স্তরে কখনো সাধু থেকে চলিত গদ্যের রাজ্যেও বিচরণ করেছেন। তাঁর ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ' বাংলা গল্প বিচিত্রা' গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন-

> 'তারাশঙ্করের ভাষায় একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমের প্রকৃতির মতো রুদ্র-রৌদ্রোজ্বল । স্বভাবতই এই ভাষায় ইঙ্গিতের চাইতে বিবৃতির সার্থকতা এবং তারাশঙ্করের দীর্ঘচ্ছন্দ বিস্তৃত কাহিনী এই ভাষার মাধ্যমেই স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেছে।[৩]

'ইমারত' গল্পের ভিত্তি খুব পোক্ত। সজ্ঞানে গল্পশেষে লেখক ভারতীয় আস্তিক্যবোধের জয় ঘোষণা করেছেন সত্য তবে জীবনের নিরিখে এটা বিশ্বাস ভঙ্গের গল্পও বটে। রঙ্গুর লোভে তিনকড়ির সঙ্গে কাজের জোট ভেঙেছে জনাব। প্রেমে রঙ্গু প্রতারণা করেছে জনাবের সঙ্গে এবং উঠেছে ওস্তাদ খুরসেদের ঘরে। জনাবও প্রায় বিনা বাধায় ওস্তাদ খুরসেদকে দিয়ে দিয়েছে রঙ্গুকে। নিজে আবার ওস্তাদের স্ত্রী হামিদনকে নিয়ে পালিয়েছে। বর্ধমানে জমিদারের বাড়ীর ইমারতের কাজের সময় নিজের ব্যভিচারের নমুনা হিসাবে হামিদনকে দিয়েছে দুরারোগ্য যৌন ব্যাধি। নিজের ব্যাধি ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে নিলেও খানিকটা অসাবধানতা ও তাচ্ছিল্যের কারণে অকালে মরতে হল হামিদনকে। তার নিজের দলের বিশ্বস্ত নারী কামিন মতি (জনাবের আদরের লাতবউ) রসিদের দিকে ঝুঁকেছে । ভোগের ব্যাপারে তারা বেইমানী করতে পিছুপা হয়না , এ-ঘটনা তারও প্রমাণ। মতির দেহে যৌনরোগ দিয়েছে রসিদই। প্রথমে রসিদকে ওস্তাদ জনাব চড় কষালেও শেষে রসিদকেই অনুরোধ করেছে মেয়েটাকে দেখতে আর চিকিৎসা করাতে। গল্প শেষে সাঁওতাল পরগণা থেকে যে কেরেস্তান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জনাব দেশে ফিরেছিল তাকেও আগলে রাখতে সে পারেনি। রসিদের সঙ্গে কলেমা পড়ে একদিন তার নিকা হবে। এই বয়সে পৌঁছে নতুন নারীসঙ্গ লাভের বাসনা কতখানি বাস্তবসম্মত না তা সেই প্রাক্তন জীবনের দুর্মর ছায়া তা বোঝা যায় না। যাই-ই হোক না কেন আসলে তা-ও এক বিশ্বাস ভঙ্গেরই গল্প। গল্পে তার একমাত্র বিশ্বাসের জায়গা কেবল আব্দুল। তাই শেষ দৃশ্যে সর্বশান্ত জনাবকে সে আশ্রয় দিতে চেয়েছে। বস্তুমূল্যের সঙ্গে সৃষ্টিগুণের উৎকর্ষতায় জনাবের শিল্পনৈপুন্য প্রশংসনীয়। সাধনার সহজাত শক্তিতে তার পেশা হয়ে উঠেছিল তার নেশা – ধর্ম সব। ষোল বছর বয়সে তার বাপ তাকে দিয়েছিল কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর সততার শিক্ষা। তবে প্রেম যেখানে তাদের জীবনে রীরংসাবৃত্তি চরিতার্থের নামান্তর সেখানে প্রচলিত প্রথাকে ভাঙতে তাদের বাধে না। তাদের প্রচলিত ধারনা এই- গোপন প্রেম যতই প্রবল হোক তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া করে নিজের ঘরে আনে না। কারণ তাতে বদনামী হয় , ব্যবসার ক্ষতি হয়। এখানেও দেখলাম প্রচলিত এথিক্সের ধার ধারেনি জনাব। ঘর ভেঙে রঙ্গুকে নিয়ে পালিয়েছিল সে। গল্পে সে স্বীকার করছে – ঐ একটা পাপ ছাড়া তার আর পাপ নেই। তবে আরো যে অন্যায়ের কথা বলা হল সেগুলি চলার জীবনের সাথে এত ক্ষুদ্র পাপ যে পাঠক সেগুলিকে পাপ হিসাবে ধরবে কিনা তার ভার পাঠকের উপর ছেড়ে

দেওয়াই সমীচীন। আলোচ্য গল্পের সমালোচনা কালে শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর ‘ বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’ গ্রন্থে চমৎকার বলেছেন-

> ‘--------- ঐ ‘ইমারত’ গল্পের মধ্যেই দেখি, - একদিকে রয়েছে রাজমিস্ত্রির রীরংসাবৃত্তি, বংশানুক্রমে যা অনতিক্রম্য হয়ে আছে,- আর একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পি- আত্মার বিশুদ্ধ সত্য- স্বপ্ন। অর্থাৎ, জনাব শেখের পক্ষে এই দুইই যথার্থ,- চরিত্র হিশেবে জনাব স্বাভাবিক, বাস্তব, জীবন্ত- কি কর্মে, কি স্বপ্নে। কিন্তু প্রয়োগ-বিধির দিক থেকে,- জনাবের কাজ এবং জনাবের স্বপ্ন একসূত্রে বাঁধা পড়েনি; রুগ্ন জনাবকে থামিয়ে দিয়ে জ্বরের ঘোরে তার কণ্ঠে স্বপ্নের বাণী রচনা করতে হয় শিল্পিকে, - সত্যের কাব্য-দেউল নির্মাণের জন্য গল্প শেষ করেও বৃদ্ধ অথর্ব জনাবকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় নৈষ্ক্রর্ম্যময় অপারগ ভাবনার কল্পলোকে। জনাবের জীবনে action আর emotion অভিন্ন সামগ্রিকরূপে বাঁধা পড়ল না। কেবল এই কারণেই মনে হবে যে , কবির স্বপ্ন গল্পের বস্তু-শরীরে যেন প্রক্ষেপিত ,- এসব ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের জীবন-মন্ত্র একটু অতিমাত্রায় উচ্চারিত’।[৪]

শ্রদ্ধেয় ভূদেববাবু এখানে কবির স্বপ্ন গল্পের বস্তুশরীরে প্রক্ষেপিত বলে ভেবেছেন। তাঁর দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো তা সত্য। আবার এমন তো হতে পারে কবির স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত এমনই। তিনি হয়তো ভারতীয় আস্তিক্যবোধের জয় ঘোষণায় জনাবকে শেষে খোদাতায়লার ইমারতের নিচে দাঁড় করাবেনই। বিচার একটা পাওনা, তাকে ক্রোড়াংশে এসে নতুন ভাবনার বশে সংযোজিত করেছেন গল্পকার।তাই সেঘটনাকে নৈষ্ক্রর্ম্যময় অপারগ ভাবনার কল্পলোক বলাটা কতটা সমীচীন তা বিচারের ভার পাঠকের উপর থাকুক।জমিদারের বাকী খাজনার নালিশের নিলামে রসিদের বাপ কিনে নিয়েছে সাঁওতাল পরগণায় চলে যাওয়া জনাবের এখানকার ভিটেমাটি। তুলেছে নতুন ঘর। সাঁওতাল পরগণা থেকে ফেরার পর অসহায় জনাবের একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে তার একসময়ের সহকারী কামিন আব্দুল। এত ‘মন্দিল’ মসজিদ ইমারত গড়লেও নিজের ঠিকানা জনাবের গড়া হয়ে ওঠেনি। সে পায়নি ঘর , পায়নি স্ত্রী, পায়নি

সন্তান। শেষ দৃশ্যের প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ঠিকানা জুটলো সেই খোদাতায়লার নির্মিত বিরাট ইমারতের নিচে-

> ‘জনাব তাকালে মাথার উপরে। বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত। সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে- এইটুকু ছাড়া’।[৫]

এইখানে গল্পকার যে জীবনসত্যের উপলব্ধি পাঠককে করাতে চান তার বিশ্লেষণে শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটি তুলে ধরে এই আলোচনা এখানে সমাপ্ত করবো-

> ‘মানুষের গড়া সমাজের আশ্রয়চ্যুত হয়ে যে মুহূর্তে এই হতভাগ্য মানুষটি বটগাছের তলায় নেমে এল, সেই মুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ কাহিনী সমস্ত ভারতের সনাতন পটভূমিতে বিন্যস্ত হয়ে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল। অতিনগন্য ব্যক্তিজীবনের রহস্যের মধ্যে বিরাটতম জীবনসত্যের উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় গল্পটি অসাধারণ। তাছাড়া গল্পের উপসংহারে ভারতীয় আস্তিক্যবুদ্ধিই জয়যুক্ত হয়েছে’।[৬]

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও গল্পটির আলোচনা করা যেতে পারে এবং দেখানো যেতে পারে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শ কোন পথে তার বিচার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তথ্যসূত্র:

১. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খন্ড) , অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৭৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৫৫৬

২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত ‘তারাশঙ্করঃ দেশ কাল সাহিত্য’ গ্রন্থের অন্তর্গত রবিন পাল লিখিত ‘তারাশঙ্কর ও তাঁর ছোটগল্প’ প্রবন্ধ থেকে বিষয়গুলি নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্যে সংসদ থেকে প্রকাশিত। ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট , কলকাতা-০৯ , পৃ. ৩২৫

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় , ‘বাংলা গল্প বিচিত্রা’, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা-৭৩, পঞ্চম মুদ্রণঃ আশ্বিন , ১৪১০, পৃ. ৮৬-৮৭

৪. শ্রীভূদেব চৌধুরী, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার’, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, চতুর্থ প্রকাশ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)-১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৯, পৃ. ৪২৮-৪২৯

৫. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খন্ড) , অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৭৬, ত্রয়োদশ মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৫৬৬

৬. জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী’, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ , পৃ. ২৯

টুসু গান: জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক সাহিত্যিক দলিল

অশ্রুকণা ঘোষ
গবেষক (এম.ফিল), ইতিহাস বিভাগ, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সারসংক্ষেপ: *পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের ধলভূম-সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের কুর্মি, মাহাত, বাউরি, মাঝি, ভুঁইয়া, মাঝি, বাগদি, লোধা, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হল টুসু পরব বা টুসু উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত টুসু পূজা করা হয়। টুসু আসলে শস্যদেবী, ক্ষেত্রকন্যা। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে পাকা ধানে ঘর ভরে যায় এবং ঘরে ঘরে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ পায়। এই আনন্দ-উল্লাসের পরিমণ্ডলে টুসু ব্রত পালিত হয়। টুসু অবশ্য নিখুঁত বিচারে দেবী নন। কিন্তু মেয়েরা টুসুকে দেবীর মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে পুজো করে এবং গান গায়। টুসু গান গীত হওয়ার সময় শুধু শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার প্রার্থনাই প্রকাশ পায় নি, তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান, দৈনন্দিন সমস্যা হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। টুসু কখনো গৃহস্থের ছোট কন্যা রূপে, কখনো সখী পতিব্রতা কিশোরী রূপে, কখনো বিবাহিতা কন্যা বা কখনো পুরুষ রূপে গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। আবার কখনো ঐ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা টুসু গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমি এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের ছোট পরিসরে টুসু গানকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলের লোকসমাজের মানসপটে লুকিয়ে থাকা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিত্রটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।*

শব্দসূচক: *বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, বিশ্বায়ন, জাতীয় সাক্ষরতা মিশন, নীলচাষ।*

টুসু পরব প্রকৃতপক্ষে এক আঞ্চলিক লোক-উৎসব। এই পরব মূলত জঙ্গলমহল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষভাবে ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া, বাকুঁড়া, বীরভূম এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের ধলভূম-সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পরবের অনুষ্ঠানে মাহাতো, ভূমিজ, মুণ্ডা, কড়া, বাগাল,

লোধা, এমনকি সাঁওতালরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এই উৎসবে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে কুমারী মহিলারা- তবে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-শিশু-কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী সকলেই সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করে।অন্য প্রতিবেশী হিন্দুরাও এই পরবে নানাভাবে উৎসাহিত হয়।ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন ভূমিকা এতে নেই। সাধারণত অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত টুসু পূজা করা হয়। প্রকৃতিগত ও কালগত বিচারে এই টুসু উৎসব আদি জনজাতিগুলির অতি প্রিয় শস্য উৎসব। যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান পেকে উঠে ও প্রতি গৃহ নূতন শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন টুসুর প্রতিষ্ঠা হয়। কেউ ঘরের কুলুঙ্গীতে মাটির সরায় আলপনা মাখিয়ে একটি গাঁদা ফুল দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে টুসু'র, কেউ বা তুলসি তলায় গর্ত খুঁড়ে গোবর লেপে আলপনা এঁকে গাঁদা ফুল দিয়ে টুসু'র প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিদিন ঐ সরা বা গর্তে মেয়েরা একটি করে গাঁদা ফুল দেয়, সন্ধ্যেবেলা সমবেত হয়ে টুসুগান গায়। সারা পৌষ মাস জুড়ে এই রকম চলতে থাকে।[১]কোথাও কোথাও টুসু'র মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমের দিকে টুসু পূজায় মূর্তি ব্যবহার ছিল না। আদিম জনগোষ্ঠীর চেতনায় যে সকল লোকদেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে কোনটারইমূর্তি নেই। আদিম জনমানসে মূর্তি কল্পনা ছিল না। তারা নানাবিধ প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে এক অনির্দেশ্য শক্তির হাত কল্পনা করে তা থেকে মুক্তি লাভের আশায় বিভিন্ন রকমের দেবদেবীর কল্পনা করে সাদা বা কালো পাথরের পূজো করতো এবং বিভিন্ন রকমের জাদুক্রিয়া করতো। পৌত্তলিকতা আদিম জনগোষ্ঠীর চেতনা বিরোধী। পৌত্তলিকতা হিন্দু ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত বর্ণ হিন্দুদের মূর্তি পূজার প্রভাবে জনজাতি সমাজে মূর্তি গড়ে টুসু পূজা করা হয়।[২]পৌষসংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে টুসুকে নিয়ে আসা হয় লোক সমাজে। ঐ রাত্রিতে বিনিদ্র থেকে গ্রাম থেকে গ্রামে প্রতিটি গৃহে টুসুকে পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয় স্থানীয় নদী, পুকুর বা অন্য কোন জলাশয়ে।[৩]

টুসু লৌকিক দেবী হলেও তাঁর দৈবী রূপটির পরিবর্তে মানবী রূপটিই অনেক বেশি উজ্জ্বল।তাই নারী মনের আয়নায় তিনি অনায়াসেই হয়ে ওঠেন কখনো ছোট কন্যা, কখনো ভগ্নী, কখনো সখী পরিব্রতা কিশোরী বা কখনো বিবাহিতা কন্যা। আবার টুসু কখনো পুরুষের প্রতিনিধিত্বও করেন। টুসুকে অবলম্বন করেই এই অঞ্চলের বৃদ্ধ-

বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা তাদের মনের সুপ্ত বাসনাগুলি গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। আর তাই সেগুলি ধর্মীয় সঙ্গীত না হয়ে, হয়ে ওঠে একান্তভাবেই জঙ্গলমহলবাসীর মানস দর্পণ।[৪]টুসু ব্রতচারী, ব্রতচারিণীরা টুসু প্রতিষ্ঠার দিন থেকে মকর সংক্রান্তির দিনে টুসু মূর্তিগুলি বিসর্জন পর্যন্ত যে গান গাওয়া হয় তাতে শুধু মাত্র শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশঘটেনি, তাদের নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতির আলাপ-বিলাপ, কামনা-বাসনা, দৈনন্দিন সমস্যা, মান-অভিমানের অকৃত্রিম অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে। অথচ টুসুগানের পান্ডুলিপি বা পুঁথিপত্র বিশেষ নেই যতটুকু আছে তা খুবই নগণ্য,এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা মুখে মুখে প্রচলিত। আর এই গানগুলিই জঙ্গলমহলের মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসামান্য সাহিত্যিক দলিল।

টুসুগানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে জঙ্গলমহলবাসীর গার্হস্থ্য-সামাজিক জীবনের নানান দিক। বিশেষ করে, টুসু'কেযখন কন্যারূপে কল্পনা করে গান গাওয়া হয় তখন সেই গানগুলি অত্যন্ত মানবিক হয়ে ওঠে। নাবালিকা মেয়ে টুসু। অথচ বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বামী-সংসার-শ্বশুরবাড়ি এসব সাংসারিক রীতি নিয়ম মেনে চলার বয়স তার হয়নি। তার ওপর সতীনের জ্বালা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকায়ত সমাজের এসবের সাহিত্যিক দলিল হল টুসুগান।

বাল্য বিবাহ সমাজের এক বহুপ্রাচীন কুপ্রথা। জঙ্গলমহলের নারীদের জীবনেও বাল্য বিবাহ যে একটি অতি প্রচলিত ঘটনা এবং সামাজিক অভিশাপ তা টুসু গানের মাধ্যমে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জঙ্গলমহলের কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব পিতা অল্প বয়সেই মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। যখন তাদের খেলার বয়স, আনন্দ করে বেড়ানোর কথা তখন তাকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতে হয়, সন্তান প্রসব করতে হয়। বিবাহের পর স্বামীর গৃহে আসার পর থেকেই নারীর মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। তাইএই কুপ্রথার বিরুদ্ধে টুসু গানের মাধ্যমে বালিকা কন্যার কণ্ঠে গর্জে উঠেছে তীব্র অভিযোগ আর অভিমান-

> "ছোট ছিলম ভাল ছিলম।
> ছিলম মায়ের দুলালি।।
> ছোট বিঁহা দিলে দিলে মা কেনে।
> আমি ঝাঁপ দিব দই্রার মাঝে।।
> ছোট বিঁহা দিলে মা কেনে"।[৫]

বাল্য বিবাহ নিয়ে আরো মজার টুসুগান প্রচলিত আছে, যেখানে জঙ্গলমহলের বালিকা কন্যার তীব্রআত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাই। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে খুঁজে পাই জনজাতি সমাজের মহিলাদের চরম অসহায় অবস্থা। দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানে অপারগ পিতা কন্যা দায়মুক্ত হবার জন্য নাবালিকা কন্যাকে বৃদ্ধ পাত্রের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন তার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে।

"বুড়ার সঙ্গে চইলতে নারি
কইলকাতা শহরে
কইলকাতার লোকে বলে
ইটি তুমার কেবটে?
লাজ শরমে বইলতে হয়
ইটি ঠাকুরদাদার ভাই বটে"।।[৬]

একশত টাকার বিনিময়ে অল্প বয়স্কা কন্যার পিতৃব্য এক বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে কন্যাটির বিবাহ দেওয়ায় কন্যাটির হৃদয়ে যে করুণ আর্তি ফুটে উঠেছে টুসুগানের মাধ্যমে-

"একশ টাকা লিলি কাকা, দিলি বুঢ়া বরে।
হরকে হোজুক ছেনোহ হরকোপ কো কুলিঙ্গা
ন্যুইদো পেরা মোকু তোকয় কান
লাজাওতে লোই দেকা গোরম বাবা"।[৭]

আবার অনেক সময় অল্প বয়স্কা কন্যাটি বৃদ্ধ পাত্রকে বিবাহও করতে চায় না, তাই সে আত্মহনন করতেও প্রস্তুত। এখানে তার স্বাধীনচেতা মনোভাব ফুটে উঠেছে-

"বরং তালগাছে টাঙ্গাই হব
বুঢ়ার সঁগে সাঁগা নাই হব"।[৮]

লোকায়ত সমাজের গৌরীদান প্রথার সুপ্রচলন ধরা পড়ে টুসুগানের মাধ্যমে। গৃহস্থের কন্যা তথা টুসুমনি জাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার বিবাহের প্রস্তাব আসে; কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই এত অল্প বয়সে শিশু কন্যাকে শ্বশুর বাড়ির দায়িত্বে বাঁধতে চায় না। তাই তিনি পাণিপ্রার্থীদের ব্যাকুল হয়ে বলেন,-

"আম্‌দের টুসু একমাসের মতন।
তোখে কী দিয়ে বুঝাব ধন।।
আমাদের টুসু একমাসের মতন।
ও খে বইল না শ্বশুর ঘর যাতে।।

ও যে পাবেক নাই ডাইল খাতে।
আম্‌দের টুসু একমাসের মতন।।
উকি পাবেক আর এমন যতন।
আম্‌দের টুসু একমাসের মতন"।।[৯]

এখনও আমাদের সমাজে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ হল পণপ্রথা। জঙ্গলমহলের লোকায়ত সমাজেও বর্ণ হিন্দুদের প্রভাবে পণ প্রথার মতো কুপ্রথা প্রবেশ করেছে। এই অঞ্চলের দীন দরিদ্র পিতা মাতার পক্ষে কন্যার বিয়ের জন্য পণ জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই বিবাহের টাকা জোগাড়ের পিতার দুশ্চিন্তা টুসুগানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে-

"বিটির বিঁহা দিব কেমনে।
আমার ঘুম ধরেনা নয়নে।।
এমনি যুগের রীতিনীতি।
পণ ছাড়া বিকায় না।।
বিটির বিঁহা দিব কেমনে"।[১০]

উল্লেখ্য বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে জনজাতি সমাজে এই পণপ্রথার প্রচলন জনজাতি মহিলাদের জীবনে চরম বিপদ ডেকে এনেছে। দুবেলা অন্নসংস্থান করাটাই যেখানে কঠিন ব্যাপার সেখানে পণ দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে বহু পিতা ঘটি বাটি জমি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন।শুধু তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে এই কারণে জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজের মহিলারা নিষিদ্ধ সংগঠনে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।এইরকম একটি ঘটনার উদাহরণ পাই ঝাড়গ্রাম মহকুমার জামবনি গ্রামে। সেখানে ফুল্লরা সিং নামে একটি মেয়ে পণপ্রথার বলি হয়েছিলেন। যৌতুকের জন্য তাঁর শ্বাশুড়ি, স্বামী ও ননদ বিয়ের পর থেকেই তিনজনে মিলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। সেই অত্যাচার চরমে উঠলে তিনি বাড়ী ছেড়ে আসেন এবং অন্ধকার জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন।[১১]

জঙ্গলমহলের লোকায়ত সমাজে বহু-বিবাহ তথা একাধিক পত্নী গ্রহণ যে এক স্বীকৃত তা বিভিন্ন টুসুগানে সতীনের প্রতি বিষোদাগারের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। এই সমাজ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের কথা ভাল জানেও না, তার আশ্রয়ও গ্রহণ করে না, তারা একমাত্র নিজের এবং সমাজের দাস। তাই এই সমাজে পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে। এই ঘটনার সাহিত্যিক প্রমাণ পত্র নিম্নে তুলে ধরলাম-

১। "মেদিনীপুরে দেই্‌খে এই্‌লম টাকায় জড়া জামবাটি।

কলি যুগের এমনি রীতি
এক জামাইকে দু বিটি।।
সিতের সিঁদুর ভাগ কই্‌রে লিব।
আমরা দু বহিন সতীন হব।।
সিতের সিঁদুর ভাগ কই্‌রে লিব"।

২। "উপর পাড়ার টুসু তুমি
নাম পাড়া যেও না,
নাম পাড়ায় সতীন আছে
পান দিলে পান খেও না"।।[১২]

৩। "একটি শিকায় দুটি হাঁড়ি
সে কি ঠকাইব লাগে নাই,
একটা লোকের দুইটা বহু
সে কি ঝগড়া করেক নাই"।।[১৩]

পতিগৃহে সপত্নীর সঙ্গে সহবাস সর্বদা সুখের হয় না- এই চিরন্তন সত্যটি টুসুগানের মধ্যে দিয়ে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। তাই বহুপত্নীক স্বামীর উদ্দেশ্যে টুসু বলতে বাধ্য হয়-

"গড় করি ধন স্বামীর ঘর করা।
যেমন খলা পিঠায় জল ভরা লো।।
জল ভরা।
তোর সনে মিছাই ভাব করা।
ও তোর ছানাপনায় ঘর ভরা লো
ঘর ভরা।
তোর সনে মিছাই ভাব করা"।।[১৪]

কখনো সতীনের সঙ্গে তার পতির বিবাদ লাগানোর অভিপ্রায়ে টুসু বলে-

"একটা গাড়ায় দুটি খাঁকড়ি
লেলো সতীন তরকারী,
ঘরকে গেলে ঝগড়া লাগাইব
আইল সতীন বিরালি"।[১৫]

কখনো সতীনের প্রতি আক্রোশপ্রকাশ করে বলে-

"ধর সতীনকেকুটতি চিঁড়া কর।
তাখে আলু-পিয়াঁজ মেশা কর।।
ধর মাগীকে পস্তু পড়া কর"।[১৬]

টুসু গানের মধ্য দিয়ে জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজের খাদ্য তালিকাও জানতে পারি- গিমা শাক, ফুলকপি, লাউয়ের ঝাল ইত্যাদি। এথেকে আমরা তাদের আর্থিক অসঙ্গতির চিত্রটি সহজেই অনুমান করতে পারি।

১। "সব সাধ খাইলে টুসু
না খাইলে গিমা গো
ছেড়ে যেতে মন করে না
বাপের ঘরের সীমা গো"।[১৭]

২। "যেমন আলু কফির তরকারি
গো তরকারি।
লাই্তনা আমার এত সুন্দরী।।
যেমন চিংড়ি মাছে ফুল বড়ি
গো ফুল বড়ি।
লাই্তনা আমার এত সুন্দরী"।।[১৮]

জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজে মোরগ লড়াই একটি অতি প্রিয় উৎসব। এখানে দেখা যাচ্ছে টুসু কেবল মোরগ লড়াইয়ে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কেবল পুরুষেরও প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ মোরগ লড়াই-এ কেবলমাত্র পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে। এখানে টুসু দৈবী স্তর অতিক্রম করে জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজের মানব-মানবী হয়ে উঠেছে।

"আমার টুসু লড়াই যাবে।
দেউলকুণ্ডা কাশিজোড়া।।
বাঈ্ছে বাঈ্ছে পাহুড় মাই্রবেক গো।
ঠিক যেমন খৈড়া সাঁড়া"।।[১৯]

টুসু কেবল নারী হিসেবেই সংসারের দায়িত্ব পালন করে না কখনও পুরুষের দায়িত্ব পালন করে।

১। "আমার টুসু হাল জুড়েছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু,
বেছে বেছে কামিন করেছে

দাঁত কাল কাঁকাল সরু।
কামিন করলি ভান করলি
খাটাবি তুই রগড়ে
সন্ধ্যাবেলা লিয়ে যাবেরে
বড় বাবুর গাড়ী এ”।।[২০]

২। “জুনবাজারে শিলাই ধারে
নানা রঙের হাট পড়ে
আমার টুসু বসে আছে
গোলদারী দোকান করে”।।[২১]

উপরোক্ত টুসুগানগুলি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় জঙ্গলমহলে জনজাতি সমাজে মহিলারা সর্বাধিক অত্যাচারিত ও অবহেলিত। জনজাতি সমাজে মেয়েদের ক্ষমতায়নের মাত্রাটা বেশি এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়াস করা হচ্ছে তা আদৌ সত্য নয়। এই গানগুলি থেকেই স্পষ্ট হয়- জনজাতি পরিবার ও সমাজে নীতি নির্ধারণে মহিলাদের কোন ভূমিকা নেই। পিতৃতন্ত্রের থাবা থেকে তারাও মুক্ত নন। এখানে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, রোজগার করে, পরিবার চালায়। এসত্ত্বেও তারা পিতৃতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পঞ্চাশোর্ধ পুরুষকে বিবাহ করতে হয়। বহুবিবাহ ও সতীনের অত্যাচারে তারা জর্জরিত।

জঙ্গলমহলের জনজাতি সমাজে অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এছাড়াও যোগাযোগ ব্যাবস্থার অপ্রতুলতার কারণে তারা এখনও শিক্ষারআলোক থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কয়েকটি টুসু গানের মাধ্যমে অল্প পরিমাণে হলেও নারী সমাজে যে শিক্ষার আলোক পৌঁছেছে, এমনকি তারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা বোঝা যায়-

১। “আমাদের টুসু পুঁথি পড়ে
তপোবনের আড়ালে,
কি যাবসইপুঁথি শুনতে গো
সরোবরে ঢেউউঠে”।[২২]

২। “আমার টুসু সোনার মেয়ে
বি.এ.-তে পাশ করেছে

ওদের টুসু হুতোম প্যাঁচা
টুকে ধরা পড়েছে”।[২৩]

বিশ্বায়নের প্রভাবে বর্তমানের আধুনিক সুযোগসুবিধা জনজাতি সমাজে প্রবেশ করেছে। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল, টুসু গানেও সেই উপযোগীতা ফুটে উঠেছে,-

“আমার টুসু মান করেছে
কিনবে সে আজ মোবাইল ফোন
শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেও
খোঁজ মিলবে গো সারাক্ষণ”।[২৪]

শহরের বিলাস-বৈভব, উগ্র ফ্যাশন গ্রামের জনজাতীয় সমাজে প্রবেশ করলেও তা যে ঐ সমাজে একেবারে বেমানান তা টুসু গানগুলির মাধ্যমে ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে শহুরে সাজে সজ্জিত গ্রাম্য যুবক গ্রাম্য যুবতীকে আকর্ষিত করতে পারে না। বরং তার ঐ উগ্র সাজ-সজ্জা দেখে গ্রাম্য যুবতীর প্রতিক্রিয়া-

১। “হিপি কাটিন চুল রাই্খেচে।
চোখেতে চশমা পর।।
হিপি রাই্খে যতই শঁক দেখাও।
ও তোর হিপির ভিতর ছারপকা।।
হিপি রাই্খে যতই শঁক দেখাও”।

২। “শুধুই পরে বুট জুতা।
খাই্তে নাই ঘরে দানা।।
চশমা ঘড়ি দেই্খে ভুই্লনা।
উয়ার পকেটে নাই দুয়ানা।।
সুট বুট জুতা দেই্খে ভুই্লনা।
যেমন লবীন মেঘে বিজুলী
গো বিজুলী।।
চশমা চোখে কে সন্ সাজালি”।[২৫]

আবার কখনো কখনো বিপরীত চিত্রও চোখে পড়ে, যেখানে দেখি গ্রামের প্রাচীন পন্থী বৃদ্ধ স্বামী যুবতী স্ত্রী’র শহুরে ফ্যাশনেব্ল্ সাজ-সজ্জার ঘোর বিরোধী; কিন্তু যুবতী স্ত্রী’র রঙীন যৌবন সে নিষেধ শুনবে কেন? তাই যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীকে বলে-

“পই্রব বুড়া বিলাতি শাড়ি।

ও তোর কী ধারি গো কী ধারি।।
বিকে দিব গো ঘর বাড়ি।
ওগো ঘর বাড়ি।।
প'রব বুড়া বিলিতি শাড়ি"।[২৬]

টুসুগানগুলি জঙ্গলমহলের জনজাতির কেবল গার্হস্থ জীবন কিংবা তাদের কামনা-বাসনার দলিল নয়- এগুলি সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি এবং রাজনীতিরও এক জীবন্ত দলিল। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে যে নীলচাষের সূত্রপাত হয় তা ভারতীয় সমাজ অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এমনকি তা জনজাতি সমাজকেও এড়িয়ে যায় নি। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে জনজাতিরাও ধুতিতে নীল রঙ ব্যবহার করতে শুরু করে। এখনও মুখে মুখে প্রচলিত টুসুগানের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাই-

"বাড়িরনাময়লীল বুইনেছি
লীলের সুঁটি ধরে না।।
ঘরে আছে ছোট দেওর
লীল ধুতি বই পরে না।।
গুণের দেওর কথা শুনে না"।[২৭]

১৮৮৭-৯৭/৯৮ খ্রি: বি.এন.আর. কোম্পানি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ স্থাপনের সময় জঙ্গলমহলের এক বিস্তৃত অঞ্চলের বন-জঙ্গল ছেদন করে রেলপথ নির্মাণ এবং ট্রেন চলাচল শুরু করলে এখানকার আদি অধিবাসীরা জঙ্গলের উপর তাদের অধিকার হারায়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ দেখা দেয়। বিদেশী শাসকগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা সম্যকভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।এই উপলব্ধির চিত্র আমরা নিম্নলখিত টুসুগানের মাধ্যমে লক্ষ্য করি-

"কোন দিগের লে আইল সাহেব।
আইল রে দালান ভাই্ঙে।।
বন-জঙ্গল কাই্টে কুই্টে রেলগাড়ি বুজাই করে।
রেলে ধুঙ্গা উড়ে।।
ইষ্টিশানে সংসারে টাকা লুটে"।[২৮]

অর্থাৎ বিদেশী শাসককুল আমাদের বাহ্যিক চমকে ভুলিয়ে রেখে আমাদের সমস্ত পুঁজি-অর্থ-সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন কঠোর সত্যি উপলব্ধির কথা সেকালের আর কোন সাহিত্যে বলা হয়েছিল?

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সুবিধা যে কেবল শহুরে শিক্ষিত লোকেরাই ভোগ করবে এবং যেখানে এই তাপবিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে, সেখানে চির অন্ধকারই বিরাজ করবে-এই বৈষম্যমূলক সরকারি সিদ্ধান্তকে শ্লেষাত্মক ভাষায় বিদ্রূপ করে তরুণ কবি সুনীল মাহাতো টুসু গানে লিখলেন-

"সাঁওতালডি বিজলী কারখানা
কত বাবুদের আনা গোনা
কলকাতাতে বিজলী যাবেক
পুরুল্যার ট্যাঁড়ে ট্যাঁড়ে
বাতি জ্বলবেক কলকাতাই
আর হামারা রইব আঁধার
এই তো বাবুদের বিচার"।[২৯]

১৯১৯ খ্রি: টাটা নগরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সিংভূম অঞ্চল কেমন ছিল তার বর্ণনা পাই টুসু গানে-

"যখন টাটা ছোট ছিল।
খালে বিলে জল ছিল।।
ইবার টাটা বড় হই্ল।
পিচ দিয়া সড়প হই্ল।।
সাদের টাটা সাদের কারখানা।
ওগো তোরা করিস নাগো আনাগনা"।।[৩০]

আবার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হয়, যেমন-গ্রামাঞ্চলে নলকূপ স্থাপন এবং রাস্তা-ঘাট নির্মাণ প্রভৃতির স্তূতি ধরা পড়েছে টুসু গানের মাধ্যমে-

"কুয়া বাঁধে জলটি খাঁইয়ে
রঙটি হইল গেরামে।
ধই্ন্য সরকার ধই্ন্য বিবরণ।।
গাঁয়ে কলটি দিল গণ্ডা ছয় গো, গণ্ডা ছয়।
ধইন্য সরকার ধইন্য বিবরণ"।।[৩১]

১৯৮৮ সালে ৫ ই মে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন প্রতিষ্ঠা করে। এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের ৩ কোটি এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যে

৫ কোটি মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলা। কিন্তু এই প্রকল্প জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের কাছে প্রহসন আর কিছুই ছিল না। তাই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত টুসু গানের মাধ্যমে-

"ওরে দাদা নিরক্ষর পই্‌ড়তে যাব
লক্ষ্মীদাদার ঘর।
আমি রইব না আর নিরক্ষর
পই্‌ড়তে যাব লক্ষ্মীদাদার ঘর।।
ভাইবে ছিলি ভোট আই্‌লে
ভোটের খাতায় সই দিব।
সই বই্‌তক টিপ দিব না।।
মনরে আমার চাল ভাজা বালি।
আমায় ল্যাখা পড়া কই শিঁকালিরে
কই শিঁকালি।।
চিরটাকাল নিরক্ষর রইলি।
তারা কেবল লোক হাঁসালিরে
লোক হাঁসালি"।।[৩২]

রাজনৈতিক দলগুলির দেশে নিত্য বন্‌ধ ডাকার উৎসব গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলির রোজকার উপার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের যে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে, তার চিত্র ধরা পড়েছে টুসু গানের মাধ্যমে-

"বলে মাসে মাসে বাংলা বন্‌ধ ডাকে।
গরীব পই্‌ড়ে পই্‌ড়ে মার খাছে গো
মার খাছে।।
মাসে মাসে বাংলা বন্‌ধ ডাকে"।[৩৩]

রাজনৈতিক হানাহানির খবরও টুসু গানে ধরা পড়েছে। কেশপুর-গড়বেতা কাণ্ডের সময় সেখানকার সাধারণ মানুষ যে কতটা বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, সে খবর তো আমরাও জেনেছি। কোন আতঙ্কিত মা তাঁর বাস্তবের কন্যাটির কথা ভেবেই গেয়ে উঠেছেন-

"মেয়ের বিয়ে দুবোনি গো
কেশপুর আর গড়বেতায়
ওখানে বিয়ে দিলে পরে

প্রাণ করবে হাঁইপাঁই"।।[৩৪]

সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, টুসুগান নদীর ধারার মতো বহমান। টুসুগানের ঐতিহ্যের আশ্রয়ে সমকালীন ঘটনা, বাস্তব সমাজ, প্রকৃতির অফুরন্ত খোরাক, পরিবেশ ও সমাজে নারীর অবস্থানের কথা, টুসু-কন্যার প্রতি মায়েদের স্নেহ-মায়া-উৎকণ্ঠা, বাস্তব জীবন-যাপনের প্রতিচ্ছবি, বিশেষ অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসএবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি দেশের রাজনৈতিক চিত্রাবলীও নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে এই গানগুলিতে। কখনও তা প্রতিবাদের ভাষায় গানগুলিতে মুখরিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গলমহলের অধিবাসীরা তাদের উন্নয়নের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যকে টুসু গানের মাধ্যমে প্রচার নিজ অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছেন। এক কথায় টুসুর গানের বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা পাব একদা সমাজের মর্মবাণী, সামাজের অলিখিত এক মূল্যবোধের কথা-অপরিশীলিত সমাজের ভাব ও ভাষা যা এককালের ইতিহাসের কোন কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। টুসুগানের রচয়িতা যেহেতু মহিলারা, তাই রচনাশৈলীতে নারীর দখলদারির দিকটিও ফুটে ওঠে। টুসুগান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মৌখিক ভাবে রচিত হয়ে চলেছে। ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছেন মা, মায়ের কাছ থেকে তাঁর বউমা, তাঁর কাছ থেকে শুনছে মেয়ে-নাতনিরা। এর মধ্যেই নিত্যনতুন গান চটজলদি তৈরি হচ্ছে-এটা তাদের চলমান অভ্যাসের ফল। সন্ধ্যেবেলায় টুসুখলার সামনে ঠাকুমা-দিদিমা থেকে বালিকারা বা পাড়ার মেয়েরা জড়ো হয়ে টুসুগান গায়, তার মধ্যে উঠে আসে নতুন কলি-মূলত যা চার কলির বেশি হয় না।যেহেতু টুসুগান একান্তভাবে মহিলাদের, তাই বহু গানে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের ছবিটা ধরা পড়ে। কিন্তু সেই গানকে যদি আমরা বলি মনের বেদনা ও হাহাকারের প্রকাশ, তাহলে একটু ভুল হয়ে যাবে। কারণ স্বাভাবিক এক প্রাণপ্রাচুর্যে এই গানগুলি গাওয়া হয়। যেন দুঃখ বিভেদ-অশান্তির পরিসমাপ্তি ও সবশেষে মিলন ঘটে এই টুসুগানের মাধ্যমে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে-মূলত রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে পুরুষরাও টুসুগান রচনা করে থাকেন।

বর্তমানে টুসুগানগুলি অস্তিত্ব রক্ষার সংকটের সম্মুখীন।এই গানগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে লোক-সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে এবং গানগুলির আদি রূপটি হারিয়ে গিয়ে লোক-সমাজ কৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার টুসুগানের সুরের ক্ষেত্রেও কৃত্রিমতার বেনো জল ঢুকে পড়েছে। টুসুগানের লোক-গীতি মূলক মূল যে করুণ সুর সেখানে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াসে শহুরে আধুনিক বাংলা কিংবা হিন্দী গানের সুরের

অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি আর একটি দৃশ্য চোখে পড়ে- জঙ্গলমহলের মেয়েরা যারা এই টুসু গানের মূল ধারক বাহক তারা স্কুল-কলেজে যাওয়ার ফলে এবং শহরের আধুনিক জীবন যাত্রার সংস্পর্শে আসার ফলে একদিকে যেমন টুসুগান চর্চায় বিমুখ, তেমনি অন্যদিকে বাড়ির প্রাচীনদেরও এর চর্চা করতে দিতে নারাজ কিংবা অপ্রসন্ন। আমি সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, বর্তমান প্রজন্মের মেয়ে বউদের কাছে টুসুগান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা না জানার অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে বা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। এথেকে বোঝা যায় এই গানগুলি এখন তাদের সমাজেই সমাদর হারিয়েছে। এছাড়াও লোকসংস্কৃতির প্রতি সরকারী আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় পরিশীলিত নাগরিক সমাজের বহু শিক্ষিত-উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কবি খ্যাতি প্রাপ্তি এবং ব্যাবসায়িক বাজার প্রাপ্তির আকাঙ্খায় শিক্ষিত মননের অভিঘাত ফেলেছে টুসু গানের ধারায়। ফলে টুসুগানের মূল ধারাটি আজ বিলুপ্তির পথে। স্বাভাবিক কারণেই গানগুলির প্রকৃত রূপটি রক্ষা করার যে কিছু মাত্র প্রয়োজন আছে তা কারো কখনো মনে হয় নি। তাই এই ক্ষুদ্র পরিসরে টুসুগানের মূল ধারাটি তুলে ধরার প্রয়াস করলাম।

তথ্যসূত্র:

১. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, *মানভূম সংস্কৃতি,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.৮৪।

২. তদেব, পৃ.৮৫।

৩. তদেব, পৃ.৮৫।

৪. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৫।

৫. তদেব, পৃ.৪৪।

৬. লীনা চাকী, *মৃত্তিকার গান,* মনফকিরা, ২০১৭, পৃ.১০৮।

৭. সাক্ষাৎকার: ক্ষ্যান্তমণি মাহাত, বয়স-৪৮, গ্রাম-ভূরষা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, তারিখ: ১৪/০৪/২১ ।

৮. তদেব।

৯. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৪।

১০. তদেব, পৃ.৪৪।

১১. সম্পা.ইয়াসিন খান, *জঙ্গলমহল: সমাজ- সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* মল্লিকা ভট্টাচার্য্য, *জঙ্গলমহলে মহিলাদের জীবন ও জীবিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯, পৃ.১১৫।

১২. সাক্ষাৎকার: লক্ষ্মী চালক, বয়স-৫০, গ্রাম-ভূরষা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, তারিখ: ১৪/০৪/২১ ।

১৩. সম্পা.প্রণব রায়, *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন;* প্রবোধ কুমার ভৌমিক, *টুসু পরব,* সাহিত্যলোক, কলকাতা,২০০২, পৃ.৪০৬।

১৪. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৯।

১৫. সম্পা.প্রণব রায়, *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন;* প্রবোধ কুমার ভৌমিক, *টুসু পরব,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪২০।

১৬. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫০।

১৭. সাক্ষাৎকার: কমলা রায়, বয়স-৮৬, গ্রাম-ভূরষা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, তারিখ: ২০/০৪/২১ ।

১৮. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫৫।

১৯. সাক্ষাৎকার: কমলা রায়, বয়স-৮৬, গ্রাম-ভূরষা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, তারিখ: ২০/০৪/২১ ।

২০. সম্পা.প্রণব রায়, *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন;* প্রবোধ কুমার ভৌমিক, *টুসু পরব,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪০৮।

২১. লীনা চাকী, *মৃত্তিকার গান,* মনফকিরা, ২০১৭, পৃ.১০৬।

২২. সম্পা.প্রণব রায়, *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবর্তন;* প্রবোধ কুমার ভৌমিক, *টুসু পরব,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪১২।

২৩. লীনা চাকী, *মৃত্তিকার গান,* মনফকিরা, ২০১৭, পৃ.১১০।

২৪. তদেব, পৃ.১১০।

২৫. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৬।

২৬. তদেব, পৃ.৩৬।

২৭. তদেব, পৃ.৫৬।

২৮. তদেব, পৃ.৫৬ ।

২৯. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* পূর্বালোক পাব্লিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ.১৬২।

৩০. ছন্দা ঘোষাল, *টুসুর কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫৭।

৩১. তদেব, পৃ.৬৫৯।

৩২. তদেব, পৃ.৬০।

৩৩. তদেব, পৃ.৬১।

৩৪. লীনা চাকী, *মৃত্তিকার গান,* মনফকিরা, ২০১৭, পৃ.১১০।

বঙ্গদেশের বৈপ্লবিক আকাশে এক অ-চর্চিত নক্ষত্র: বিপ্লবাচার্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের জীবন ও আদর্শ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

স্বাধীন গবেষক, এম.এ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *বাংলায় বিপ্লববাদী কার্যকলাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে,নরমপন্থী-চরমপন্থী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লববাদের বিস্তার ঘটে। এই সময় একদল যুবক তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে।তাঁরা ছিলেন মাতৃমুক্তিযজ্ঞে নিবেদিত প্রাণ মহান দেশপ্রেমিক। সশস্ত্র সংগ্রামের রক্তরাঙা পথে আত্মবলিদান ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন। এইরকমই একজন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে নিবেদিত প্রাণ মহান বিপ্লবী ছিলেন বিপ্লবাচার্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। যিনি মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ পাশ করে প্রথমে বাঁকিপুর কলেজে,পরে হুগলী মহসিন কলেজে,সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের "রিসলে সার্কুলারের" বিরোধিতা করেন এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অধিকার অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। এরফলে সরকারের রোষানলে পড়েন। তিনি শ্রী অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় এবং বিভিন্ন দফায় প্রায় কুড়িবছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চুচুঁড়া দেশবন্ধু স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। ঐ বছরই তিনি চট্টগ্রাম যুব সম্মেলনের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করার আমন্ত্রণ পান। এরপর ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।পরবর্তীকালে প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি হন। ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে রাজ্য বিধানসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে। এইরকম একজন মহান দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নায়ক যিনি*

কিনা দেশ মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য নিজের জীবনকে বাজী রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বিপ্লববাদী আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন।কিন্তু এরকম একজন মহান বিপ্লবী দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গিয়েছে।কোনো গবেষণা,আলোচনা বা পাঠক্রমে স্থান পাননি।তাই আমার এই ছোট্ট প্রবন্ধপটে অ-চর্চিত বিপ্লবাচার্যের জীবন ও আদর্শকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: *বিপ্লবী, হুগলী জেলা, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, চুঁচুড়া, বৈপ্লবিক আন্দোলন, মাস্টারমশাই, বাংলাদেশ।*

মূল আলোচনা:

কবিগুরু শিখ জাতির ইতিহাস থেকে একটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেটিকে তিনি ছন্দের জাদুতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর 'কথা' কাব্যগ্রন্থে। কবির ভাষায়ঃ

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,চিত্ত ভাবনাহীন।"[১]

কবিরই জীবনকালে, তাঁরাই স্বদেশে এই কথাটি সার্থক হল, ছন্দঃ মূর্ত হয়ে উঠল। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ"- সে সত্য যে কেমন ধারার, বিপ্লববাদীদের জীবণ-মরণ খেলায় দেশবাসী তাহাই প্রত্যক্ষ করলেন।

এমন আপন-ভোলা, হিসাব-নিকাশে অনভিজ্ঞ মানুষ- যারা দেশকে পেয়ে আপনকে ভুলে গেছিলো,দেশের হিসাব নিকাশ বুঝতে গিয়ে আর সব হিসাব নিকাশ ছেড়ে দিয়েছিল,- গুণে গুণে পা না ফেলে যাঁরা একেবারে মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে অমৃত সন্ধানের পাঁয়তারা অভ্যাস করেছিল, যাঁরা নামের ব্যাধিকে মন্ত্রগুপ্তিতে নিঃশেষ করেছিল, প্রকাশকে লুকিয়ে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছিল, তাঁদের এই মৃত্যু-রঙ্গের জীবন-খেলা কেওই লিপিবদ্ধ করে রাখেনি। সেই অজ্ঞাত অথচ কর্মবহুল জীবন-ভঙ্গীর একটু ছায়াচিত্রও কেউ রাখেনি! দেশবাসী দূর থেকে তাঁদের শুধু লক্ষ্য করে গেছে, কিন্তু পরিচয় করতে সাহসী হননি। যাঁদের আপন জনেরাই অস্বীকার করেছেন অথচ যাঁরা সেই আপন জনেরই মুক্তি ক্রয় করতে আপনজনের অস্বীকারকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আপনজন হইতে দূরে,দূর হইতে আরো দূরে, তাদের জ্ঞানের বাইরে গিয়েই মুক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিল, তাঁহাদের ইতিহাস কেওই লেখেনি; তাঁহারা অ-চর্চিত ই থেকে গিয়েছে। যাঁরা ঘরে বাইরে সব জায়গায় লাঞ্ছিত হয়েও সেই লাঞ্ছনাকেই তাঁদের সান্ত্বনার বস্তু করে তুলেছিলেন, যাঁদের লাঞ্ছনাকে দেশবাসী উৎসাহিত করে, সম্মান করে

সহ্য করবার মত গৌরবের সামগ্রী করে তোলেনি, যাঁদের অগ্রপশ্চাতে cheering crowd জয়ধ্বনী করেনি, যাঁরা জেলে বা নির্বাসনে যাওয়ার সময় বা সেখান থেকে ফিরে এসে দেশবাসীর বাহবা পায়নি, -হয়তো খুব বেশি হলে খবরের কাগজে শুষ্ক একটু খবর মাত্রই বেরিয়েছে, ফাঁসি-কাঠে ঝুললেও যাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলার সামর্থ্যও দেশবাসীর ছিল না, বুদ্ধিমান অভিজ্ঞদের কথায়, যাঁহারা কেবল ভুলই করেছে, -সেই ভ্রান্তপথের পথিক,মৃত্যু-যাত্রী এমন অদ্ভুত মানুষগুলির কথা চিরকালই অ-চর্চিত থেকে গিয়েছে।

বঙ্গ বিপ্লবীদের দেশবাসী সাধারণভাবে 'টেরোরিস্ট' অ্যাখা দিয়েছিলেন,কিন্তু ইংরেজ রাজ-কর্মচারীরা তাঁদের কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে জানতে পেরে বলেছিলেন - " ইহারা কেবল টেরোরিস্ট নহে, ইহারা ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসকামী স্বাধীনতা-প্রয়াসী বিপ্লবী দল।" [২] বিপ্লবীরা হয়ত ভুল করেছিল, ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু এ-যুগে স্বাধীনতার মূর্তি তাঁরা যে অন্ততঃ কল্পনা করতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁরা যা চেয়েছিল, সেজন্য তারা কতখানি দিতে পেরেছিল, কতখানি দিতে পারেনি, কতখানি ব্যর্থ হয়েছিল, কতখানি সফল হয়েছিল, তা জানতে হলে তাঁদের ভিতরকার সত্যটির অনুসন্ধান করা অত্যন্ত জরুরী। একেবারে লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে জানতে না দিয়ে মৃত্যুর দ্বারে গিয়েও যাঁরা আত্মগোপন করতে পারে, তাঁদের ঐ গোপন ব্যাপারটির মধ্যে কেবল কি সৎসাহসের অভাবজনিত ভীরুতার গ্লানিই রয়েছে, না আরো কিছু আছে সেটাও আমাদেরই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এমন ঘটনাও জানা গিয়েছে, মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লবী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। অপরে যা-ই জানুক, সে নিজে জানে দেশহিত-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়েই সে আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। এমনকি মৃত্যুর সময়ও ইচ্ছে নেই যে কেও তাঁদের জানুক, কেও তাঁদের মূল্য বুঝুক। তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লবীদের ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর বেরোতে দেখা যায়, " Don't disturb, let me die peacefully - বিরক্ত কোরো না, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" এই বিপ্লবীরা তারুণ্যের উচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। তাঁরা ছিলেন মাতৃমুক্তিযজ্ঞে নিবেদিত প্রাণ মহান দেশপ্রেমিক। সশস্ত্র সংগ্রামের রক্তরাঙা পথে আত্মবলিদান ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন। এইরকমই একজন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে নিবেদিত প্রাণ "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" চরিত্রের মহান বিপ্লবী ছিলেন বিপ্লবাচার্য শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

তিনি ছিলেন সমস্ত মানুষের মাস্টারমশাই। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছে ; লাভ করেছে দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা,দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের চেতনা। তাঁরই শিক্ষার মন্ত্রে হাসতে হাসতে দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার দামাল ছাত্র। তাঁর মতো বিপ্লবী নেতা বঙ্গদেশে বিরল।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার দেবীপুরের দত্তপাড়ার কুলীন গ্রামে জ্যোতিষচন্দ্র জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী প্রমথনাথ ঘোষ। শৈশবের দিনগুলি তাঁর মাতুলালয় বাঁকুড়ায় অতিবাহিত হয়। কৈশোর ও যৌবনের সময়গুলি অতিবাহিত হয় কলকাতায়। ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিষচন্দ্র লেখাপড়ায় প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাস করার পর কলকাতার এলবার্ট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েটেও স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেন তিনি। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৯০৫ সালে জ্যোতিষচন্দ্র যখন এম.এ ক্লাসের ছাত্র, তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় তিনি কলেজ ত্যাগ করে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। জাতীয় নেতাদের আহ্বানে তিনি "জাতীয় শিক্ষা সংসদে"- যোগদান করেন। এরপরের বছরই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমে ইংরেজি এবং পরে ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর শুরু হয়,অধ্যাপকের জীবন। হুগলী মহসিন কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের এক অদ্ভূত অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল কিন্তু সকলকে তিনি নাম ধরে ডাকতেন, কখনও কোনো নাম ভুলে যেতেন না। ছাত্ররা তাঁর অদ্ভূত ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেত। তাঁর ছাত্রদের তিনি এক নতুন চেতনা ও আদর্শের সন্ধান দিতে থাকেন। তথাকথিত পুঁথিসর্বস্ব লেখাপড়ার বাইরেও যে একটি অমৃতময় জগৎ আছে, এবং তা হল "দেশপ্রেম"- তা মাস্টারমশাই তাঁর ছাত্রদের উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট হন।[৩] তিনি ছাত্রদের দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য বৈপ্লবিক আদর্শে দিক্ষিত করতে থাকেন, দেশকে ভালোবাসার চেতনা তাদের কাছে তুলে ধরেন।

জ্যোতিষচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র লেখাপড়ার মধ্যেই নিমগ্ন থাকলে চলবে না। গ্রামের সাধারণ,অত্যাচারিত,শোষিত,নিপীড়িত মানুষদের সাথে মিশে যেতে হবে, তাদের সেবা করতে হবে, গ্রামে গ্রামে সংগঠনমূলক কাজ করে অবহেলিত মানুষদের জাগরণ ঘটাতে হবে। কেননা গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র

মানুষদের মনের অন্ধকার দূর করতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা কোনওদিন ই আসবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরাধীন ভারতবর্ষের অপমান জ্যোতিষচন্দ্রকে মানসিক যন্ত্রণা দিত। তাঁর মধ্যে এই স্বদেশপ্রেমের আগুন তাঁকে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণে বাধ্য করে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের সূচনা হয় হুগলী জেলার "চুঁচুড়া"তে। আর এই সময়ই ঘটল জ্যোতিষচন্দ্রের জীবনে এক সুবর্ণ সুযোগ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার, দেশের জন্য কাজ করার। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ চরমপন্থী দলের মুখপাত্র হিসাবে চুঁচুড়ার প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। আর এই সুযোগে জ্যোতিষচন্দ্র অরবিন্দের ভাবধারা ও দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। অরবিন্দকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসাবে মেনে নিয়ে প্রাণমন সঁপে দেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে। পরবর্তীকালে তিনি অরবিন্দের জীবন ও আদর্শ নিয়ে লেখেন " Lifework of Sree Aurobindo." এই সময় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন রিজলী সাহেব। তিনি আদেশ দেন যে, কোনও সরকারি স্কুল বা কলেজের শিক্ষক স্বদেশি আন্দোলন করতে পারবে না। এবং আইন অমান্য করে যদি আন্দোলনে যোগদান করেন তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র ছিলেন নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি রিজলী সাহেবের কথায় কর্ণপাত না করে রিজলী আইন অমান্য করেন। তাঁর দুচোখে তখন দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন ; দেশভক্তির বন্যধারায় উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়। অরবিন্দের শিষ্য হয়ে কিভাবে তিনি দেশসেবার মন্ত্র থেকে দূরে সরে থাকবেন। তিনি সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে একনিষ্ঠভাবে দেশের কাজ করতে থাকেন। এর ফলে হুগলী মহসিন কলেজের চাকরি তাঁকে ছাড়তে হয়। এরপর "মাস্টারমশাই" হুগলী কলেজের চাকরি ছেড়ে সোম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি গ্রহন করেন।[৪]

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে চুঁচুড়ায় বিপ্লবী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবীদের শত্রু কুখ্যাত অফিসার শ্রীশ চক্রবর্তীকে গুলি করে হত্যা করেন। এরপর গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহ্যাম সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন ননীগোপাল। তবে দুঃখের বিষয় সেদিন ডেনহ্যাম সাহেবের পরিবর্তে মিঃ কাউলি নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ননীগোপালের ছোঁড়া বোমাটি না ফাটায় শেষপর্যন্ত কাউলি রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু ননীগোপালকে পুলিশ ধরে ফেলে এবং বিচারে চোদ্দ বছরের জন্য আন্দামান জেলে নির্বাসনের আদেশ হয়। এই ঘটনায় মাস্টারমশাই যুক্ত আছেন এই সন্দেহে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ৫ ই মার্চ তাঁকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। কেননা ননীগোপাল

মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র ছিলেন। অনুমান করা হয় জ্যোতিষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ননীগোপাল এই কাজ করতে উদ্যত হয়েছেন। এরফলে মাস্টারমশাইকে গ্রেপ্তার করে কয়েকমাস আলিপুর জেলে বন্দি করে রাখা হয়। কয়েকমাস পরে তিনি মুক্তি পেয়ে বাঁকুড়া "ওয়েসলি মিশন কলেজের" অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এখানেও ইংরেজ সরকারের তাড়নায় তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। এরপর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁকে রিপন কলেজের অধ্যাপক হবার জন্য অনুরোধ করেন। জ্যোতিষবাবু সেই অনুরোধ সম্মানের সাথে গ্রহন করে রিপন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।[৫] তবে ইংরেজ সরকারের রোষানল জ্যোতিষচন্দ্রের পিছু ছাড়েনি ফলে এখানেও তিনি ইংরেজের আক্রমনের মুখে পড়েন। কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয় জ্যোতিষচন্দ্রকে বরখাস্ত না করা হলে কলেজের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। মাস্টারমশাই এ সংবাদ পেয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং পাটনায় বিহারি জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি চন্দননগরের গড়বাটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন।

মাস্টারমশাই ছিলেন সর্বত্যাগি,একনিষ্ঠ দেশসেবক,এবং মানুষের প্রয়োজনে নিবেদিত প্রাণ একজন বিপ্লবী। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কেঁদে উঠত। তাঁর বেতনের সামান্য অংশ নিজের জন্য ব্যায় করে বাকি সমস্ত অর্থ গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। একদিকে শিক্ষকতা এবং অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন ছিল জ্যোতিষচন্দ্রের প্রধান কর্ম। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে থাকেন ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের মহান দায়িত্বে। ১৯১৭ সালের ৩ রা জানুয়ারি ভারতরক্ষা আইনে মাস্টারমশাইকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সন্দেহে চুঁচুড়ার গোন্দলপাড়ার বিপ্লবীদের আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি পিস্তল এবং জ্যোতিষবাবুর হাতের লেখা এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার করে পুলিশ। এই দলিল থেকে ভারতবর্ষের আসন্ন সশস্ত্র বিপ্লবের অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যায়। জ্যোতিষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয় এবং চার্লস টেগার্টের আদেশে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। তাঁর হাতের আঙুলের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বের করে, ভ্রুর মধ্যে পিন ঢুকিয়ে মাথায় বুকে ও পাঁজড়ে হাতুড়ির ঘা দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করতে থাকে পুলিশ। অকথ্য অত্যাচারের ফলে মাস্টারমশাইয়ের সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায়। তবুও মাস্টারমশাই তাঁর আদর্শ থেকে একচুল ও সরে আসেননি। পুলিশের জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি কথাও

না বলে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করে ছয়দিন ধ্যানমগ্ন থাকেন। জেলখানায় অন্ধকূপ সেলের মধ্যে তাঁকে আটকে রেখে দেওয়া হয়। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে মাস্টারমশাই উন্মাদ হয়ে যান। ইংরেজ সরকার তাঁকে বহরমপুরে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে চিকিৎসার নামে অমানুষিক অত্যাচার করে। তাঁর চোখে সরষের তেল ঢেলে দেওয়া হয়,চোখের মধ্যে ধারালো চাকতি ঘুরিয়ে তাঁর চোখের শিরাগুলিকে জখম করে দেওয়া হয়। কয়েদিদের দিয়েও জ্যোতিষচন্দ্রের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। ইনজেকশন দিয়ে তাঁর শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়া হয়।[৬]

দীর্ঘ চারবছর জেলের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করার পর অবশেষে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্র জেল থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি চুঁচুড়ায় ফিরে এসে যুব সম্প্রদায়কে একত্রিত করে দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্রকে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।[৭] সেখান থেকে তিনি পাঞ্জাবে যান বিপ্লববাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য, সেখানে বিপ্লবী সংগঠন করার ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়া হয় মাস্টারমশাইয়ের কাছে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে চুঁচুড়ায় ফিরে হুগলীর বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ে এসে তিনি তরুণ সম্প্রদায়কে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।[ক] তাঁরই অনুপ্রেরণায় কত ছাত্র হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে দেশজননীর উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।এরপর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিসে বিপ্লবী হানার অজুহাতে জ্যোতিষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে ব্রম্ভদেশে মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে-সময় মান্দালয় জেলে বন্দি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।[৮] সেখানে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মত এবং পথ নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। অবশেষে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্রকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেলখানায় থাকতে থাকতেই মাস্টারমশাই "মার্কসীয় রাজনীতিতে" আকৃষ্ট হন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁর এই মার্কসীয় চিন্তাধারাকে "স্বদেশী বাজার" নামক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা প্রচার করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের পর সুভাষচন্দ্র "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে স্বতন্ত্র সমাজতন্ত্রী ঘেঁষা দল গঠন করে নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাতে থাকলে জ্যোতিষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক দলে যোগদান করেন। এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি এই দলেরই সদস্য ছিলেন।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্র চুঁচুড়া দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। চুঁচুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবেন মন্ডল মহাশয় মাস্টারমশাইকে দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। এর কিছুদিন পরে মাস্টারমশাইকে চট্টগ্রাম যুব সম্মেলনে সভাপতি করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। চট্টগ্রামের যুব সম্প্রদায় মাস্টারমশাইয়ের আদর্শ,ত্যাগ ও দেশভক্তি দেখে ও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হন। সেখানকার বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন জ্যোতিষবাবুর দেশভক্তির অগ্নীস্ফূরণে মেতে ওঠেন। এরপরই তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পরিকল্পনা করা হয়, এর ফলে চট্টগ্রামে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে।[খ] জ্যোতিষবাবু দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের প্রথম সারির নেতা,তাঁর প্রচেষ্টাতেই বঙ্গদেশে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটে। দেশের মানুষ তাঁর মুখের একটি কথায় হাসতে হাসতে জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা অর্জন করেছিল। দেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন পরম পূজনীয় বিপ্লবী। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মাস্টারমশাই আবার গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ নয় বছর আবার তাঁকে জেলের কষ্টকর জীবন কাটাতে হয়। জীবনের মূল্যবান কুড়িটা বছর ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে জেলের অন্ধকার কারাকক্ষে কাটিয়েছেন ও অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। দেশসেবার আদর্শ,দেশভক্তি ও পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য কোনও কষ্টই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর অসীম মনোবল,অদম্য তেজ, ও দেশভক্তি তাঁকে স্বাধীনতার মহান পূজারীরূপে গড়ে তুলেছিল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে মাস্টারমশাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলনে জ্যোতিষচন্দ্র সুভাসচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।[৯] কলকাতার এলবার্ট হলে "হলওয়েল মনুমেন্ট "- অপসারণের বিশাল জনসভায় সুভাসচন্দ্র এই শ্রদ্ধেয় নেতাকে সভাপতির পদে বরণ করে মাস্টারমশাইয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন রেখেছিলেন।[১০]

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে "ভারত ছাড়ো"- আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের কোনোও আপসমূলক প্রস্তাবেই ইংরেজ সরকার সাড়া দেয়নি। এরফলে ৭ ই অগাষ্ট বোম্বাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গণসংগ্রামের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গান্ধীজি দীপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন যে, " We shall do or die".[১১] এরফলে এই সংগ্রাম সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এক মরণপন

সংগ্রামে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রচন্ড দমননীতি অবলম্বন করেন। চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। মাস্টারমশাইকেও ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বন্দি হিসাবে তিন বছর দমদম সেন্ট্রাল জেলে রেখে অত্যাচার চালাতে থাকে।[গ] তিনবছর পর মাস্টারমশাই জেল থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১২] কিন্তু ১৯৪৬ এর ফরওয়ার্ড ব্লকের "আরা সম্মেলনে"র সিদ্ধান্তক্রমে মাস্টারমশাই আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

মাস্টারমশাইয়ের মতো নির্ভিক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীনেতা ভারতবর্ষের মাটিতে কমই জন্মছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন। জেলের অত্যাচার তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে কিন্তু তাঁর মনের অদম্য সাহস ও দেশপ্রেম এতটুকুও কমাতে পারেনি। পরাধীনতার যন্ত্রণা তাঁর মনকে কুরে কুরে খেয়েছে। বারবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলের মধ্যে নির্যাতন করা হয়েছে। আর বারবারই জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি অহিংস নীতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে চাননি। তাঁর বৈপ্লবিক চেতনার আগুনে উজ্জীবিত হয়ে কানাইলাল,গোপীনাথ সাহা এবং সূর্য সেনের দল দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।[১৩] তাঁর জীবনাদর্শে হাজার হাজার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছে। তাঁর উপদেশ দানে চরিত্রগঠন সম্ভব হয়েছে হাজার হাজার ছাত্রের। ছাত্ররা তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্রের স্বপ্নকে সফল করেছেন।[১৪] যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে মাস্টারমশাই বছরের পর বছর জেলের মধ্যে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন,তা ব্যর্থ হয়নি। ভারতমাতার শৃঙ্খলিত চরণযুগল অবশেষে মুক্ত হয়েছে বিদেশী বর্বর জাতির নাগপাশ থেকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। তাঁর জীবনে কোনও লোভ,পদমর্যাদা বা কামনা বাসনার হাতছানি ছিল না। তিনি ছিলেন একমাত্র সকলের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ই মার্চ এই অকিঞ্চন,স্বদেশপ্রাণ,সর্বত্যাগী,আদর্শ মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর দেহ দেশমাতৃকার পবিত্র মৃত্তিকায় বিলীন হয়েছে। দেশজননীর পবিত্র স্নেহের আশ্রয়ে জ্যোতিষচন্দ্র লাভ করেছেন শান্তির নির্মল আশ্রয়। এমন সর্বভারতীয় পরিচিত,মহাবিপ্লবী,যিনি কিনা

সুভাষচন্দ্র,মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো মানুষকেও বিপ্লববাদে দীক্ষিত করেছেন সেই মহামানব ই আজ ইতিহাসে অ-চর্চিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রচেষ্টাতেই বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বিপ্লববাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তাই ইতিহাস শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই সমস্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যদি ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথা কাব্যগ্রন্থ, (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯০০), ৯৪।
২. নলীনি কিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ,(কলকাতাঃমিত্রম,১৯৩০), ২১-২৩।
৩. সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, প্রথম খন্ড, (কলকাতাঃ দেজ পাবলিশিং, ২০১৩), ৩১।
৪. অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, হুগলী জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস, (কলকাতাঃ পত্রভারতী, ২০০২), ৮৪-৮৯।
৫. ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, (কলিকাতাঃ অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৬০), ৮৮-৯২।
৬. উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নির্বাসিতের আত্মকথা, (কলিকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ১০৫-১০৬।
৭. বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, (নয়া দিল্লীঃ ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৩), ১১৫-১১৭।
৮. ডাঃ ননীগোপাল দেবদাস, স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিতাভিধান, (কলকাতাঃ ডাঃ ননীগোপাল দেবদাস মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ১৯৯৬), ৭৩।
৯. শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬), ১৭৭।
১০. সনৎ কুমার মজুমদার সম্পাদিত, জনতার কথা, (কলিকাতাঃ নবকুমার প্রকাশনী, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), ৫২।
১১. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ), ৩১০-৩১৫।
১২. জ্যোতি বসু, যতদূর মনে পড়ে,(কলকাতাঃ ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৮), ৯৪।

১৩. তুষার চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা, (কলকাতাঃ নবজাতক প্রকাশনী, ২০১০), ৬৭-৭১।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, হুগলী জেলা সংখ্যা, (১৯৯৮), ২৮।

ক. Sedition Enquiry Committee Report, Govt.of India, (1918), 15-23।

খ. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭), ৫-৭।

গ. হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, (কলকাতাঃ কমলা বুক ডিপো লিমিটেড, ১৯২৮), ৩৩৪-৩৪১।

উনিশ শতকের নারী লেখিকাদের শিশুসাহিত্য

দেবাংকৃতা সরদার
স্বাধীন গবেষক, পিএইচ. ডি (আর্টস), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *উনিশ শতক—বাঙালি তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই যেমন গড়ে উঠেছিল একাধিক সংস্কার আন্দোলন, তেমনই এই সময়কে চিহ্নিত করা হয় বাংলার নবজাগরণের কাল হিসাবে। সেই কালেরই বৈশিষ্ট্য হিসাবে সূত্রপাত হয় গদ্যের যুক্তিবাদী ধারার। অন্যদিকে এই সময় থেকেই নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় শিশুশিক্ষার উপাদান বিষয়ে। যার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে। এরই হাত ধরে পরোক্ষে বিস্তার ঘটে নারীশিক্ষার। পরবর্তীকালে তাঁদেরই কেউ কেউ সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এঁরা অনেকেই অবদান রাখেন। এই প্রবন্ধে তাঁদের রচিত শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ : *উনিশ শতক, নারী লেখিকা, শিশুসাহিত্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিশু, উদ্দেশ্যমূলকতা, নীতিশিক্ষা।*

উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়টি বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রারম্ভকাল এবং এই সময়কেই বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনাকাল হিসাবে মনে করা হয়। এই শতকের প্রথমার্ধে বাংলা শিশুসাহিত্যের উদ্ভব অনেকখানি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও এই শিক্ষার ভিত্তিভূমির উপর নির্মিত।পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে বাংলায় নবজাগরণের যে সূত্রপাত হয়, তারই ফলে উনিশ শতকের বাংলা শিশুসাহিত্য নবরূপে, নতুন চিন্তাধারার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। নবোদ্ভূত এই রচনাশৈলী বিশ শতকের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছে এবং সাহিত্যের মধ্যেকার জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার দিকটি আরও বেশি করে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে। নতুন নতুন পত্রিকার জন্ম হয়েছে, রচিত হয়েছে নানারকমের, নানা স্বাদের শিশুসাহিত্য।

উনিশ শতকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নারীশিক্ষার উন্মেষ ও তার প্রসার। এই শতকের প্রথম দিকে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসারঘটেছিল মূলত মিশনারিদের প্রচেষ্টার দ্বারা। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ২১ মার্চ তারিখে*সমাচার দর্পণ* পত্রিকায়

কয়েকজন স্ত্রীলোক স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব নিয়ে চিঠি লেখেন।[১]সেখানে তাঁদের একাধিক প্রশ্ন ছিল—

> সভ্যদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার থাকলেও এদেশে নেই কেন, এদেশের স্ত্রীলোকেরা অন্যদেশের নারীর মতো ইচ্ছামতো ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে পারে না কেন, তাদের আট-দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ দেওয়া হয় কেন, এই কুপ্রথার ফলে তাদের সারাজীবন অপদার্থ স্বামী নিয়ে ঘর করতে হবে কেন, কেন তাদের বহুপত্নীক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষের পুনর্বিবাহের সুযোগ আছে, নারীর সেই অধিকার নেই কেন।[২]

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬) প্রচলনের আগেই নারীসমাজের মধ্যেকার এই আলোড়নই সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন ও অধিকারের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায় এবং তাঁদের পত্নীরা বাঙালি বালিকাদের জন্য একাধিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। তবে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ভদ্রঘরের মেয়েরা লেখাপড়া করতে আসত না, তাদের আট-দশ বছরের মধ্যেই বিবাহ হয়ে যেত। কারণ অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অকালেই বিধবা হয়ে যাবে।[৩] অকাল বৈধব্য মেয়েদের শিক্ষার জন্য নয়, বরং অশিক্ষাই দায়ী। এইসমস্ত ঘরের বালিকা মেয়েদের অধিক বয়স্ক কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াই ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে দুর্গতি ও অকাল বৈধব্যের কারণ।

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের অনেক আগে থেকেই (মূলত উচ্চবর্ণীয়) পুরুষসমাজ ছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিক্ষিত। পুরুষজাতির শিক্ষার অধিকার পরম্পরাগত ভাবে স্বীকৃত ছিল। স্ত্রীশিক্ষার আলোকে নারীজাতি আস্তে আস্তে শিক্ষিত হতে শুরু করল। ১৮১৯ সালে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য ক্যালকাটা জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২১ সালে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান ফরেন সোসাইটি অব ইংল্যান্ড-এর উদ্যোগে কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য কুমারী কুক নামে একজন শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত হয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালের ক্যালকাটা রিভিউ (Vol. XXV) থেকে জানা যায়, তখনও মেমসাহেবের স্কুলে ভদ্রঘরের মেয়েরা পড়ত না। অধিকাংশ বালিকা হয় বালবিধবা, কিংবা নিম্নশ্রেণী---এমন কী বেশ্যাকন্যারাও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির নির্দেশে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' রচনা করলেও ফিরিঙ্গি-পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাদের পাঠাতে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু বেথুন এসে 'বরফ

ভাঙলেন'। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তাঁর উদ্যোগে, সরকারি সাহায্যে ও বাঙালি সমাজের বদান্যতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পরে বেথুন স্কুল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই ভবনে বেথুন কলেজও স্থাপিত হয়। এই স্কুল পরিচালনায় বিদ্যাসাগর যোগ দেওয়ায় মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে এই বিদ্যালয়ে কন্যাদের পাঠাতে লাগল।[৪]

স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা গিয়েছে, বহু পরিবারে মেয়েরা আর মূর্খ ছিলেন না, বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাবতী ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাড়ির বালিকা-বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। মানকুমারী বসুও বাড়ির বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি তাঁর পিতা ও দাদার সহায়তা পেয়েছিলেন। কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দাশ রীতিমতো বেথুন স্কুলে, বেথুন কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন।[৫] উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে যাঁরা বিদ্যালয়ে গেছেন কিংবা গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁদেরই কেউ কেউ প্রবেশ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। আবার দেখা যায়সেই নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নির্মিত সেই শিশুসাহিত্যের জগতটি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় বেছে নেওয়া যেতে পারে তাঁদেরই কয়েকজনকে।এই প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং কুসুমকুমারী দাশেরপ্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : (১৮৫০-১৯৪১)

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী উনিশ শতকের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় নারী ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলার প্রেক্ষাপটে নারীদের ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এইসমস্ত বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকও ছিলেন। এমনকি বাংলার নারী-পোশাকের পরিবর্তনসাধন এবং অন্তরালবর্তিনীদের আচার-আচরণে, শিষ্টাচারে এবং অন্তঃপুর থেকে বাইরে আনার দ্বারা সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্ম যশোরের নরেন্দ্রপুর গ্রামে । তাঁর বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় এবং মা নিস্তারিণী দেবী। সে সময়কার রীতি অনুসারে খুবই অল্পবয়সেদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি সাত বছরের শিশুকন্যা। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যখন প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে ফিরলেন তখন তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বোম্বেতে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। এরপর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর তিন সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও কবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি দীর্ঘ সফরে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেছিলেন।[৬]

১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫) ঠাকুরবাড়ির সহায়তায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় মাসিকপত্র *বালক* প্রকাশিত হয়। এরপর এই পত্রিকাটির কার্যাধ্যক্ষ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হয়নি, এক বছর মাত্র চলেছিল। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কার্যাধ্যক্ষের পদ থেকেরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অব্যাহতি নেন।ফলেতাঁর পক্ষে একা পত্রিকা দেখাশোনা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। পরে*ভারতী* পত্রিকার সঙ্গে এই পত্রিকাটির যুক্ত করেপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুনভাবে প্রকাশিত এই পত্রিকার নামকরণ করা হয়*ভারতী ও বালক*। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৩ (১৮৮৬) বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। তবে এই নতুন পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন তা জানা যায় না। তবে মনে করা হয়তৎকালীন *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদকস্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩) এইপত্রিকা পুনরায়*ভারতী* পত্রিকা নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে।[৭]

পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বাক্ষর রেখেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁর লেখা বিখ্যাত শিশু নাটক হল *টাক ডুমা ডুম ডুম* ও *সাত ভাই চম্পা*। *টাক ডুমা ডুম ডুম*নাটকে *তিনি রচনা করলেন পশু এবং মানুষের সমন্বয়ে মজাদার শিশু সেব্য কাহিনি।*নাটকের একেবারে শেষে শেয়ালের গানটি*শিশুদের আনন্দদানের পাশাপাশি* তাৎপর্যবাহী*হয়ে উঠেছে—*

গান-- নাকুর বদলে নরুণ পেলুম—

ঢোলক-- টাক ডুমা ডুম ডুম—

গান-- নরুণের বদলে হাঁড়ি পেলুম---

ঢোলক-- টাক ডুমা ডুম ডুম—

গান-- হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম---

ঢোলক-- টাক ডুমা ডুম ডুম—

গান-- টোপরের বদলে বউ পেলুম---

ঢোলক-- টাক ডুমা ডুম ডুম—

গান-- বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম---

ঢোলক-- টাক ডুমা ডুম ডুম—
টাক ডুমা ডুম ডুম [৮]

শেয়াল বরের কাছ টোপর না পেয়ে তার বিবাহিত বউকে হরণ করে নেয়। কারণ বরের বিবাহের আগে শেয়াল তাকে টোপর দিয়ে সাহায্য করেছিল। তাই বরের টোপর বাসরঘরে ভেঙে গেলে বনের মধ্যে শেয়াল সকলকে ভয় দেখিয়ে বরের বিবাহিত বউকে একরকম ছিনিয়ে নেয়। এমনকি বর টোপরের দাম দিতে চাইলেও তা নিতে শেয়াল অস্বীকার করে। যেমনভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার সময় নারীকে ডাকাতের দল বলপূর্বক হরণ করত। *এরপরে* শেয়াল বউয়ের বিনিময়ে ঢুলির কাছ থেকে ঢোলক পেয়ে বউকে ঢুলির হাতে সমর্পণ করে দেয়।জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের আনন্দদানের কথা ভেবে উপকথার গল্প অনুসরণ করে *এই নাটকটি রচনা করেছেন।*

সাত ভাই চম্পা গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মুখপাতের চিত্র অঙ্কন করেছেন নন্দলাল বসু। রূপকথার গল্পকে কেন্দ্র করে তিনি শিশুদের উপযোগী নাটক রচনা করেছেন। রাজা বীরসিংহ রায়ের দুই রানি, বড় রানি *বা* ভালো *রানি* দুয়োরানি, ছোট রানি *বা মন্দ রানি হল* সুয়োরানি*।* সুয়োরানি রাজার রাজত্ব, আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য সন্তান আকাঙ্ক্ষার কারণে পুজো-অর্চনা ও ধর্মে-কর্মে টাকা ঢাললেও তার মধ্যে বাৎসল্যের প্রতি কোন টান থাকতে দেখা যায় না। বরং বাৎসল্যরসের অধিকারী করে দেখানো হল দুয়োরানিকে। তিনি হলেন গোয়ালকুড়ানি। তাঁর নির্জলা উপোস ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর ষষ্ঠী ঠাকুর প্রসন্ন ও সহৃদয় হয়ে তাঁকে সন্তানের জন্য বরদান করে। এইভাবে জন্ম নেওয়াসাতজন পুত্রসন্তান কনক, স্বর্ণ, নাগেশ্বর, গোলক, কাঁঠালী, জহুরি, দোলন তাদের মা দুয়োরানিকে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর একটিমাত্র কন্যাসন্তান সে মায়ের সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকার অঙ্গীকার করে। এই নাটকে বিভিন্ন ধরনের ফলের কথা ও তার সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে। এই নাটকটি পাঠের মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সব জায়গা কিংবাসেখানকার বিখ্যাত ফলের সঙ্গে শিশুদের অচিরেই পরিচয়পর্ব ঘটে যায়। যেমন, নরেন্দ্রপুরের লাল টকটকে সিঁদুরে আম, ইংল্যান্ডের আপেল, মোজাফরপুরের লাল টুকটুকে লিচু,নাগেশ্বরের আঙুর কাবুলের আমিরের বাগানের ইত্যাদি।

শিশুদের বিদ্যালয়শিক্ষার আদর্শে রচিত *কিন্টার গার্টেন* নামক প্রবন্ধে তিনি পুত্রসন্তানদের শৈশবে বিদ্যালয়ের ঘেরাটোপে, সীমাবদ্ধ-সংকীর্ণ পরিবেশে, মুখস্থ

পাঠদান রীতিতে, শুষ্ক জ্ঞান আহরণের দ্বারা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ঘোর বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। বরং তার পরিবর্তে উন্মুক্ত গৃহ পরিসরে, প্রকৃতির বুকে, পশু-পাখি, জীব-জন্তুকে কেন্দ্র করে, খেলাধুলা, চঞ্চলতার মধ্যে দিয়ে আদর্শ শিক্ষাগ্রহণের কথাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন।তাঁর *ব্যায়াম* রচনাটি বালকদের শরীর-স্বাস্থ্য বর্ধিত, বলিষ্ঠ, পুষ্ট, স্বাস্থ্যকর করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর এই রচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি তাঁর *স্ত্রী-শিক্ষা* নামক প্রবন্ধে শিশুর প্রতি কেমন আচরণ হওয়া উচিত, শিশুর মনস্তত্ত্ব এবং সেই জন্য সর্বোপরি শিশুর মাতাকে শৈশবকাল থেকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, শিশুর প্রতি পিতা-মাতার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। *তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন যে,* সাংসারিক জীবনে নানান কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে করতে মেয়েদের মনে, মায়েদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, শিশুর সঙ্গে শিশুর মতো করে চলা*র মনোভাবই অন্তর্হিত হয়ে পড়ে,* শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে চলার ক্ষমতাই তারা আর রাখে না। *প্রকৃত অর্থে দেখতে গেলে তাঁর এই প্রবন্ধগুলিকে শিশুসাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা না গেলেও শিশু সম্পর্কে তাঁর ভাবনার পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে।*

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : (১৮৫৮-১৯২৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। তাঁর লেখাকবিতাগুলির ভাব ও ভাষাসৌন্দর্যে যে নারীমানসের স্পর্শ এবং সরলতা ফুটেছিল তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট ভবানীপুরের মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। শৈশব কেটেছেবর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মজিলপুরে। পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র ছিলেন বারুইপুর কোর্টের অ্যাডভোকেট। অন্যদিকে মাতা ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন মজিলপুরের দত্তবাড়ির মেয়ে। তাঁর পিতা মজিলপুরের জমিদার বাড়িতেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কন্যাকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।কন্যার লেখাপড়ার প্রতি পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগতভাবে পিতার উদ্যোগ থাকলেও সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী মাত্র দশ বছর বয়েসে কলকাতায় তাঁর বিবাহ হয় । ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বউবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত জমিদার অক্রুর দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৯]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীরকাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *ভারত-কুসুম* (১৮৮২), *অশ্রু-কণা* (১৮৮৭), *আভাষ* (১৮৯০), *শিখা* (১৮৯৬), *স্বদেশিনী* (১৯০৬), *সিন্ধুগাথা* (১৯০৭)। তাঁর *অলক* নামক কাব্যগ্রন্থটি বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী' (১৯২৭)-তে প্রকাশিত হয়েছে।[১০]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বিখ্যাত শিশুধর্মী রচনার পরিচয় পাওয়া যায় *অশ্রুকণা* (১৮৮৭) কাব্যগ্রন্থের 'গ্রাম্য ছবি' ও 'গার্হস্থ্য চিত্র' কবিতার মধ্যে দিয়ে। এই দুটি কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি মা ও ছেলের স্নেহ-মায়া-মমতা মাখানো আদরণীয় সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং 'গ্রাম্য ছবি' কবিতায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে দুই বোনের একাত্ম হয়ে বিচরণ করার সুন্দর চিরাচরিত মূর্তি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মা ও শিশুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তিনি সুনিপুণভাবে তাঁর লেখনশৈলীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গেতাঁর 'গ্রাম্য ছবি' কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।...
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কানে দুল, দুল দুল, গাছ-ভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে;... [১১]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্যধর্মী কবিতার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবিতা হল*অশ্রু-কণা* কাব্যগ্রন্থের 'গার্হস্থ্য চিত্র' (মা ও ছেলে) নামক কবিতাটি-

ফুট-ফুটে জোছনায়, ধব-ধবে আঙিনায়,
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।...[১২]

রাতের জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির অপরূপ শোভা বর্ণনার পাশাপাশি এই কবিতায় উঠে এসেছে খুব ঘরোয়া কিছু ছবি। যেখানে নারীর ভূমিকা স্নেহময়ী মাতা রূপে সন্তান পালনে রত। জননী গৃহকাজ করেন, গৃহকে নির্মাণ করেন, তাঁরই পরিচর্যায় চারিদিকে ফুল ফুটে থাকে—আর এইসমস্ত কাজের পরিসমাপ্তি ঘটলে জননীর অবসরপ্রাপ্তি ঘটে। তিনি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একখানি মাদুর পেতে শিশুপুত্রকে কাছে

নিয়ে পরম শান্তিতে থাকেন। মায়ের সারাদিনের অবিরাম পরিশ্রমের কষ্ট হোক কিংবা ক্লান্তি, নিমেষেই দূরীভূত হয়ে যায় সন্তানকে কাছে পেলে। চাঁদের আলোয় মাখামাখি আশ্চর্য সেই কল্পনানির্মিত জগতে মা শিশুর মাথায় ধীরে ধীরে হস্তচালনা করে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। 'মা' এবং 'ছেলে'র এই চরম প্রার্থিত যুগলবন্দীতে চাঁদও যেন মোহিত হয়ে যায়।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর *বাবা বুঝি এল* কবিতাটিতে দেখা যায়পাঠশালায় পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। ফলে পাঠশালায় বালকদের বদলে এখন চড়ুই পাখি বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। বালকদের আর লেখাপড়া করার তাড়া নেই, তারা অবাধ স্বাধীনতায় বাগানে ঘুরে বেড়ায় কিংবাখেলাধুলা করেবেড়ায়।এই কবিতায় বাবার আগমনের অপেক্ষায় থাকে সন্তানেরা। তাদের পিতাকে কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে অন্যত্র থাকতে হয়। ফলে পুজোর ছুটিতে 'বাবা' যে বাড়ি আসবেই, তা তারা জানে এবং সেই প্রতীক্ষায় সর্বক্ষণ থাকে। তাই রেলগাড়ির শব্দ যেন পুজোর ছুটিতে 'বাবা'র আগমনের বার্তা বয়ে আনে।

তাঁর *চির আকাঙ্ক্ষিত* কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে একজন নারীর কাছে চির আকাঙ্ক্ষার বিষয় তার শিশু, যার মধ্যে দিয়ে নারীর মাতৃত্বের বাসনাও প্রকাশ পেয়েছে। *সখা ও সাথী* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১) প্রকাশিত তাঁর *মা ও মেয়ে* নামক কবিতাটিও বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে উল্লেখযোগ্য কবিতা।কবিতাটির মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও তাদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির জন্য নারী-পুরুষের শারীরিক ক্ষমতাকে যে আলাদা ভাবে নির্মাণ করা হয় না, সে কথামা ও ছোট্ট মেয়েটির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

কুসুমকুমারী দাশ : (১৮৭৫-১৯৪৮)

বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন কুসুমকুমারী দাশ। তাঁর জন্ম হয় বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রনাথ দাশ এবং মাতা ধনমণি দাশ। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে মেয়েদেরজন্য একটি হাইস্কুল তৈরি হয়েছিল। সেই স্কুলে কুসুমকুমারী দাশ যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছেন, তখন স্কুলটি উঠে যায়। এরপর তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়তে আসেন।১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় বরিশালের সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে।কুসুমকুমারী দাশের দুই পুত্রের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ ও অন্যজন অশোকানন্দ দাশ এবং কন্যাসন্তান হলেন সুচরিতা দাশ। তিনজন ব্যক্তিই ছিলেন নিজস্ব গুণে কৃতী।[১৩]

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল* পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (পৌষ ১৩০২) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কবিতা *আদর্শ ছেলে* ।তবে কবি কুসুমকুমারী দাশ যে আশা নিয়ে এই কবিতা রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁর সেই আশা, ভরসা কিংবা স্বপ্ন--কোনোটিই পূরণ হয় নি বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই তিনি এই কবিতা লেখার পর হতাশ হয়ে রচনা করেছিলেন *মনুষ্যত্ব* নামক কবিতা। তারও পরবর্তীতে তিনি রচনা করেন*'মানুষ কে?'* নামক কবিতা। বাংলাশিশুসাহিত্যের জগতে তাঁর বিখ্যাত কবিতাসমূহ-- *দাদার চিঠি* (*মুকুল*, কার্তিক, ১৩০২), *খোকার বিড়াল ছানা* (*মুকুল*, অগ্রহায়ণ, ১৩০২), *খোকার আদর, পাখির ছানা চুরি* ইত্যাদি । *খোকার আদর, পাখির ছানা চুরি*ইত্যাদি কবিতাগুলি শিক্ষামূলকজনপ্রিয় শিশু কবিতাগুলির অন্যতম।তাঁর রচিত একখানি কবিতার গ্রন্থ *কবিতা-মুকুল*, এম. এম. মজুমদার কর্তৃক আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।*প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হত। তিনি শিশুদের জন্য কবিতা রচনা ছাড়াও বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ও মনীষীদের উদ্দেশ্যে, যেমন—*মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি বন্দনা* (রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে) ইত্যাদি কবিতা রচনা করেছেন।শিশুদের মঙ্গল কামনায়, আনন্দদানের উপাদান নিয়ে, তিনি তাদের খেলার সামগ্রীনিয়ে, জীবজন্তু, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শিশুসাহিত্যমূলক কবিতা রচনা করেছেন।[১৪]তিনি *স্বাবলম্বী* কবিতার মধ্যে দিয়ে শিশুদের তথা সমাজকে শিক্ষাদান করেছেন। শিশুদের প্রতিকল্যাণকর চিন্তারবশবর্তী হয়েতিনি কবিতা রচনায় সামিল হয়েছেন। তাঁর *উদ্বোধন* নামক কবিতায় তিনি বঙ্গের ছেলে-মেয়েকে আহ্বান করে কবিতাটি রচনা করেছেন। এইসমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কবিতা রচনার সমকাল এবং দেশ-কালের পরিস্থিতির নিরিখে শিশুদেরকে কালের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়। এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁর শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলি নীতিমূলক কিংবা উদ্দেশ্যবাহী হয়ে পড়ায় পাঠের অনাবিল আনন্দকে অনেকসময়েই যে হারিয়েছে তা বলাই যেতে পারে।

তাঁর *আদর্শ ছেলে* কবিতাটি নিম্নরূপ ---

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে ?
মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন
মানুষ হইতে হবে--- এই তার পণ,...[১৫]

পূর্বোক্ত কবিতার পরে দেখা যেতে পারে *মনুষ্যত্ব* নামক কবিতাটিকে। কারণ তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিতে তিনি হয়তো 'আদর্শ ছেলে' গড়তে ব্যর্থ হয়েছেন। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত পুরুষেরা ইংরেজ রাজদরবারে চাকরি করার তাগিদে দলে দলে ভিড় করতে থাকে। মাতৃভাষাচর্চাকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষার গভীরে না পৌঁছে কেরানি পদপ্রার্থীদের জন্য নির্মিত এহেন শিক্ষাব্যবস্থাকে কবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আক্রমণ করেছেন। কবি এই কবিতায় ব্যঙ্গ করে বলেছেন-

একদিন লিখেছিনু আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে'।
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?[১৬]

কুসুমকুমারী দাশের *দাদার চিঠি* কবিতায় দেখা যায়, দাদার চিঠির অপেক্ষায় বাড়ির বড়ো থেকে ছোটো, সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। কলেজে পড়াশুনা করার জন্য দাদাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। এই ঘটনা যেমন বাড়ির লোকজনের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তেমনিই দাদার থেকে সকলের বিচ্ছেদ খুবই যন্ত্রণার। সেই বিচ্ছেদ বেদনা, সকলের করুণ আর্তিও কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যায়, দাদা যেদিন বাড়ি থেকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, সেইদিন 'বুলী' একজন কিশোরী মেয়ে, দাদার আদরের বোন, সে দাদার দোর আটকে বলেছিল 'যেতে নাহি দিব'। মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির কথা। যেখানেও এক 'চারি বৎসরের' শিশুকন্যা তার পিতার পুজোর ছুটির শেষে কর্মস্থলে গমনকালে বিষণ্ণ, ম্লান মুখে এই কথা বলে পথ আটকেছিল 'যেতে আমি দিব না তোমায়'।কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশুরা কাউকেই আটকাতে পারে না। পিতা হোক কিংবা ভ্রাতা, নিজ কার্যোপলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েনিজেদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। *দাদার চিঠি* কবিতায় দেখা যায়দাদাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায় ভাই নলিন। আর দাদা একাই কলকাতা শহরের 'সিটি কলেজে' পড়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের কথা প্রবাসে থেকে দাদার মনে পড়ে। প্রবাসে বসবাস করেও কাউকে ভুলে না গিয়ে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভাইবোনদের প্রতি অগাধ ভালবাসা, একে-অপরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনকে

কীভাবে অটুট রাখতে হয়, কবি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে শিশুদের উদ্দেশ্যে সেই শিক্ষাই দান করে গেছেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যবাহী কবিতার পাশাপাশি কুসুমকুমারী দেবী শিশুদের জন্য তাদের অত্যন্ত প্রিয় খেলার সঙ্গী বিড়ালছানা নিয়ে অনাবিল আনন্দপূর্ণকবিতা রচনা করলেন। তাঁর *খোকার বিড়াল ছানা* কবিতাটি নিম্নরূপ—

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
খেতে শু'তে সকল সময় থাকবে তারা কাছে,
না হ'লে কি খোকামণির খাওয়া দাওয়া আছে...[১৭]

পাখি কিংবা জীবজন্তুর প্রতি শিশুর কৌতূহল কিংবা ভালোবাসা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। শিশুরা এইসমস্ত প্রাণীদের নিয়ে কল্পনার জাল বিস্তার করে এবং তাদের নামকরণ করে তাদের সঙ্গে নানাধরনের সম্পর্কে সম্পর্কিতহতে চায়। যেমন, এই কবিতায় খোকামণি বিড়ালছানাগুলিকে 'সোনামুখী', 'সোহাগিনী', 'চাঁদের কণা' বলে চিহ্নিত করে। শিশু যেমন পরিবারের সকলের আদরের ধন, চোখের মণি, তেমনি শিশুও তার প্রিয় বিড়ালছানাগুলিকে সেই পরিচয়ে, সেই সম্পর্কে আবদ্ধ করতে চায়। শিশুরা এইসমস্ত প্রাণীদের দুঃখে সমব্যথীও হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের*শিশু* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সমব্যথী' কবিতায় এক খোকার কুকুর-ছানা, টিয়া পাখির প্রতি মানুষের অবহেলা, তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে পোষ মানানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা যায়। কুকুর-ছানা, টিয়া পাখির সঙ্গে খোকা নিজে এতটাই একাত্মবোধ করে, যে তাদের দুঃখ-কষ্ট, অবহেলায় দুঃখিত হয়ে নিজের মায়ের তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে মাকে নানা রকমের প্রশ্ন করে। কুসুমকুমারী দাশের কবিতাতেও সমধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। হয়তো বা এই সমধর্মিতা একটি নির্দিষ্ট যুগের যুগবৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে।

উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে যে বালিকারা বাড়ির বিদ্যালয়ে কিংবা বাইরের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষালাভ করলেন; অথবা যে মহিলারা বিবাহের পর স্বামীর উৎসাহে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। এঁদের অনেকে আবার সরাসরি সাহিত্যচর্চা না করলেও সমাজ সচেতনতার ফলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতেন। এই সময়ের পত্রপত্রিকাগুলির পরিচালকমণ্ডলী নারী লেখিকাদের লেখার প্রবণতাকে মোটের উপর উৎসাহপ্রদান করতেন। যার ফলে

গার্হস্থ্যের নিগড় ভেঙে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিবার এবং পরিবারসংলগ্ন সমাজ ছাড়িয়ে বাইরের জগতে ব্যক্তি হিসাবে এই লেখিকারা পরিচিতি পেতে শুরু করেন। বাংলা তথা ভারতের সার্বিক নারীমুক্তির ইতিহাসে আজও এঁদের অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃত হন। গোটা উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে যে সমস্ত নারী সাহিত্যিক শিশুসাহিত্য নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই নারী সাহিত্যিকরা নতুনযুগের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারী জীবনের আদর্শ, বালিকা শিক্ষা বিষয়ক নীতির রচনা কিংবা শিশুর একান্ত নিজস্ব জগৎ নিয়ে শিশুসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন।কোনো কোনো নারী সাহিত্যিকের রচিত শিশুসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছেনারীর নিজস্ব স্বর।ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে শিশুদের বিদ্যালয়পাঠ্য কিংবা শিশুপাঠ্যের প্রয়োজনে যে শিশুসাহিত্য রচিত হতে শুরু করেছিল, সেই ক্ষেত্রটিকে এইভাবে সমৃদ্ধিশালীকরেছেন এই নারী সাহিত্যিকদের অনেকেই।

উল্লেখপঞ্জি:

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (সপ্তম খণ্ড), কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৩

২. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩

৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি* , অলোক রায় (সম্পা), কলকাতা : দে'জ, আগস্ট, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪-৫

৬. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা: দে'জ , নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা৯-১৯

৭. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সম্পা), *বালক*, কলকাতা : দে'জ, ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৩৮

৮. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, *জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচনা সংকলন*, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), কলকাতা :দে'জ, ১৪১৮, পৃষ্ঠা ১৪৬

৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি* , অলোক রায় (সম্পা), কলকাতা : দে'জ, আগস্ট, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৮

১০. অলোক রায়, *উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান*, কলকাতা : অক্ষর, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৫

১১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার মিত্র, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *শিশু কিশোর সাহিত্য সংগ্রহ ১*, কলকাতা: শিশু কিশোর আকাদেমি, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪৭৯

১২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭৮

১৩. ভূমেন্দ্র গুহ (সংকলন ও সম্পা), *কুসুমকুমারী দাশের দিনলিপি*, কৃষ্ণনগর : আদম, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩

১৪. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি* , অলোক রায় (সম্পা), কলকাতা : দে'জ, আগস্ট, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২২৯, ২৩৩

১৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি* , অলোক রায় (সম্পা), কলকাতা : দে'জ, আগস্ট, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৩০

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ২৩৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পিপিলস রিলিফ কমিটির ভূমিকা : একটি অনালোচিত অধ্যায়

সপ্তর্ষি মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, গৌড় মোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সারসংক্ষেপ: *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে সে দেশের জনগণ, বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র বিশেষত ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার ক্ষেত্রে মূলত ভারতের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবদানের ইতিহাস বেশি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যায় না, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের যথেষ্ট অবদান ছিল। যেমন ১৯৭১-এ ভারতে আসা বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থীদের সেবায় পিপিলস রিলিফ কমিটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। তবে এই বিষয়টি তেমন ভাবে আলোচিত হয় নি। মুক্তিযুদ্ধে পিপিলস্ রিলিফ কমিটির ভূমিকার বিষয়টি অনালোচিত থেকে গেলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।*

সূচক শব্দ: *মুক্তিযুদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গ, শরণার্থী, পি আর সি, সাহায্য, ত্রাণকার্য, শিবির, পূর্ববঙ্গ।*

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য লাভ করার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলাদেশের এই সাফল্যের ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি সংগঠন এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের ইতিহাস চর্চায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখন আর কেবল মুক্তিযুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের সামরিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবদান চর্চার মধ্যে আটকে না থেকে, ভারতের বেসামরিক-বেসরকারি মহলের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল বাংলাদেশী শরণার্থী এদেশে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল ভারতের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শরণার্থীদের সেবায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সবথেকে বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতে প্রায় এক কোটি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁর মধ্যে সবথেকে বেশি- ৭,৪৯৩,৪৭৪ জন শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল।[১] পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং তাদের সঙ্গী আলবদর, রাজাকার, শান্তি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে লাখ লাখ শরণার্থী বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সবথেকে বড় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এই শরণার্থীদের নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছিল। সেই সময়ে শরণার্থীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান হল পিপিলস্ রিলিফ কমিটি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের সেবায় অনন্য অবদান রেখেছিল পিপলস্ রিলিফ কমিটি। এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি একটু অন্য রকম সংস্থা। রাজনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, এটি আসলে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন একটি মেডিকেল ইউনিট ও ত্রাণ সংগঠন। যেটি ১৯৪৩-এ গড়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এমনই ভয়াবহ ছিল সেই দুর্ভিক্ষ যে, হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রাস্তা-ঘাট, ফুটপাথে, বাজারে, গ্রামে-শহরে, রেলের প্ল্যাটফর্মের পাশে যত্রতত্র মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত সেই সময়ে। গ্রাম বাংলা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ শহর কলকাতার দিকে ছুটে এসেছিল খাবারের আসায়। অবস্থা এমনই খারাপ ছিল যে, অভুক্ত–অসহায় মানুষেরা শহুরে বাড়িগুলিতে গিয়ে খাওয়ার জন্য ভাতের ফ্যান চাইত। এমনই এক পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের সেবার কাজে এগিয়ে আসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ত্রাণকার্য সংঘবদ্ধভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৪৩ সালের ২৯-শে সেপ্টেম্বর কলকাতার ৬২নং বউবাজার স্ট্রীট (বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট)–এর ভারত সভা হলের ছাদে ১৪টি বাম গণসংগঠনের প্রতিনিধি এবং ২৯ জন বিশিষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতিতে পি আর সি বা Peoples Relief Committee গড়ে ওঠে। ঐ

সভায় উপস্থিত বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র নাথ রায়, আবদুল্লাহ রসুল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণিকুন্তলা সেন, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বি কে বসু, ডাক্তার নারায়ণ রায়, ডাক্তার নরেশ ব্যানার্জী, জ্যোতি বসু, মুজফ্‌ফর আহমেদ, সৈয়দ নওশের আলি প্রমুখ। পি আর সি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তৎকালীন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পীকার সৈয়দ নওশের আলি, অধ্যাপক নীরেন্দ্র নাথ রায় এবং চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন যুগ্ম সম্পাদক এবং অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২] দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় পি আর সি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৪৫ সালে পি আর সি-র মেডিকেল ইউনিট ঢেলে সাজানো হয় এবং ঐ বছর পি আর সি-র এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীও গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পি আর সি -র সেবাকার্য অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে যে বিপুল সংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসে তাঁদের সেবায় পি আর সি নিয়োজিত হয়েছিল। এছাড়া যখনই বন্যা, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষ বিপদে পড়ে, তখনই পি আর সি ত্রাণকার্যে ছুটে যায়।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও পি আর সি ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক একই ভাবে এই সময়ে সাইক্লোন বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পি আর সি। ১৯৭০-এর জানুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য পি আর সি-র সভাপতি মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস কলকাতার ডেপুটি কমিশনে আট হাজার টাকার ওষুধ তুলে দিয়েছিলেন। এক বছর বাদে ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানে সেনা প্রশাসনের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কাতারে কাতারে অসহায়-নিঃসম্বল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে চলে আসে, তখনও পি আর সি তার মানবিক ভূমিকা পালন করেছিল। পি আর সি-র তরফে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ শিবির, মেডিকেল ক্যাম্প, ফিল্ড হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। আহত, অসুস্থ শরণার্থী-মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পি আর সি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করে। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি পি আর সি-র তরফে সাধ্যমত শরণার্থীদের খাবার, বস্ত্রও দান করা হয়। পি আর সি-র তরফে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়। আবেদনে বলা হয় যে, এর আগে আর্ত ও বিপন্ন মানুষের সাহায্যের জন্য পি আর সি যখনই আবেদন করেছে জনগণের কাছে, আপনারা এগিয়ে এসেছেন সাহায্য নিয়ে। মাত্র কয়েক মাস আগে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন দুই বাংলা

বিধ্বস্ত তখন আপনারা অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। আজ আবার পি আর সি আপনাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে পূর্ব বাংলার অসহায় মানুষদের জন্য, যারা নিরস্ত্র অবস্থায় পাক সামরিক বাহিনীর বর্বর আক্রমণের সামনে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের আর্ত মানবরা সাহায্যের আশায় আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে। এখনই সাহায্য সংঘঠিত করে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। আশা করি সুদীর্ঘকাল আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত আপনার সুপরিচিত পিপিলস্ রিলিফ কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য, ওষুধ, রক্ত দিয়ে সাহায্য করবেন বাংলাদেশের শরণার্থীদের।[৩] কমিটি-র তরফ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পি আর সি –র তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডাক্তার অমিয় বসু এবং হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী শুকনো খাবার, বস্ত্র, ওষুধ পি আর সি–র অফিসে পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা ছিল– পি আর সি, ২৪৯ নং, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২। মানুষের বিপুল সাড়া মিলেছিল সাহায্য প্রেরণে। পি আর সির পক্ষ থেকে মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, দীপক চন্দ্র, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল রায়, অমিয় বোস প্রমুখ প্রসিদ্ধ ডাক্তারবাবুদের পাশাপাশি নতুন পাশ করা যুব ডাক্তাররা শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন। কলকাতার বহু তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা ডাক্তারবাবুদের সাহায্য করেছিল।

এপ্রিল মাস থেকেই পি আর সি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ত্রাণ শিবির খোলে। ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমাতে বনগাঁ, বয়রা, হেলেঞ্চা প্রভৃতি জায়গায় শিবির খোলা হয়। বনগাঁ থেকে বয়রা সীমান্ত পর্যন্ত ৫ থেকে ৬টি আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল পি আর সি-র তরফে, যেখানে এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত ২৫ থেকে ৩০ হাজার শরণার্থীকে সাহায্য করা হয়। ২৫-শে এপ্রিল পি আর সি-র সভাপতি মণীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বনগাঁ সীমান্তে পি আর সি-র ত্রাণ কার্যের পরিদর্শন করেছিলেন। এই দিন ***আনন্দবাজার পত্রিকা*** –র কর্মচারী ইউনিয়ন গুঁড়ো দুধ, চা-বিস্কুট, সাবান প্রভৃতি ত্রাণদ্রব্য পি আর সি-র ত্রাণ শিবিরের মারফত শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছিল।[৪] পি আর সি-র শরণার্থী সেবার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের চিকিৎসা পরিষেবা, যার জন্য পি আর সি – বেশি পরিচিত। প্রথম থেকে শরণার্থী-মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পি আর সি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পি আর সি-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সীমান্তে একটি অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল খোলা। ১৯৭১ সালের ১৬-ই মে রবিবার বনগাঁর মতিগঞ্জে বাংলাদেশ সংহতি সাহায্য

কমিটির সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্যে ৫টি বেড সম্পন্ন একটি অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল খোলা হয়। উদ্বোধন করেছিলেন পি আর সি-র সভাপতি তথা সেই সময়কার বিখ্যাত হৃদয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার অমিয় কুমার বসু।[৫] ঐ দিন হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। সভায় পি আর সি–র সহসভাপতি তথা শিশু চিকিৎসক ডাক্তার মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভায় ডাঃ বিশ্বাস হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পি আর সি-র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যুব সমাজের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় পি আর সি-র অতীতের সেবামূলক কাজের ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন, ১৯৪৩ সাল থেকে পি আর সি সেবা কাজ করে গেলেও, এই প্রথম কোন একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পি আর সি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দানের সুযোগ পেয়ে গর্বিত এবং ধন্য। এই কাজে সকলকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছিলেন তিনি। ১৬-ই মে হাসপাতাল উদ্বোধনের দিন পি আর সি এবং বনগাঁ মহকুমা বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। ঐ দিন ৪০ জন রক্তদান করেছিলেন। বনগাঁয় পি আর সি-র ফিল্ড হসপিটালটি মুক্তিযুদ্ধের সময় অসাধ্য সাধন করেছিল। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে পি আর সি-র কর্মীবৃন্দ শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে। ১৭-ই মে থেকে ৩-রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বনগাঁতে পি আর সি-র ফিল্ড হাসপাতাল থেকে ১৬ হাজার ৫০০ জন অসুস্থ শরণার্থীকে ওষুধ দেওয়া ও চিকিৎসা করা হয়। মোট ৩৪ জন বাঙালি স্বাধীনতাসংগ্রামীকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় ঐ সময়ের মধ্যে এবং ১ লক্ষ শরণার্থীকে ভ্যাকসিন দিয়ে ‘পরিচয় পত্র’ দেওয়া হয়।[৬] পি আর সি কলেরা মহামারী ঠেকাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিক থেকেই কাতারে কাতারে অসহায় মানুষ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। আর প্রথম থেকেই পি আর সি বাংলাদেশের শরণার্থীদের মধ্যে প্রধানত মেডিকেল ও অন্যান্য রিলিফ কাজ শুরু করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সীমান্ত এলাকায় পি আর সি শাখা কেন্দ্র খুলেছিল। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে গুরুতর আহত এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করা হত এই শিবিরগুলিতে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হত এই

শিবিরগুলিতে, প্রয়োজনে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করা হত। পি আর সি-র পক্ষে সবথেকে বড় সেবা কেন্দ্র বনগাঁতে ও বসিরহাটে, মাঝারি ধরণের সেবাকেন্দ্র রাণাঘাটে খোলা হয়। পরের দিকে হাসনাবাদ-গেদে অঞ্চলেও শিবির খোলা হয় পি আর সি-র তরফে। অনেক আহত-অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাকে পি আর সি-র শিবিরে নিয়ে আসা হত। প্রয়োজন মতো তাঁদের অস্ত্রোপচার এবং রক্তদান করা হত। কলকাতা ব্লাড ব্যাঙ্কের অধিকর্তা ডাক্তার এস বি দত্তের সহায়তায় পি আর সি বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। পি আর সি-র পক্ষে ডাক্তার মণীন্দ্র লাল বিশ্বাস, ডাঃ দীপক চন্দ, ডাঃ নরেশ ব্যানার্জী, ডাঃ অমিয় বোস, ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য –এর মতন তৎকালীন প্রথিতযশা চিকিৎসকদের পাশাপাশি, সদ্য পাশ করা বহু তরুণ ডাক্তার মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের চিকিৎসা করতেন, প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও করতেন। বসিরহাট মহকুমায় পি আর সি-র চিকিৎসকরা ৭৫ হাজারের বেশি শরণার্থীকে এবং ৫ হাজারের মতন মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছিলেন।[৭] এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই হাসনাবাদের শরণার্থী শিবিরগুলিতে কলেরা রোগ দেখা দেয়। সরকারের তরফে সাহায্য পৌঁছানোর আগেই সেখানে পি আর সি-র চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছিল। পি আর সি হাসনাবাদের শিবিরে ২টি স্যালাইন সেট সহ ভ্যাকসিন কিট পাঠায়।[৮] বনগাঁতে ৫ লক্ষের বেশি শরণার্থীকে কলেরার ভ্যাকসিন দেওয়া হয় পি আর সি –র তরফে। পি আর সি –র উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম দিনাজপুরে ১টি করে সাহায্য শিবির খোলা হয়েছিল। এছাড়া বনগাঁতে ৩ টি এবং বারাসাতে ২ টি শিবির খোলা হয়।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর তৈরি করা INA –এর ঝাঁসি বাহিনীর প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের উদ্যোগে পি আর সি বারাসাতে Make Shift হাসপাতাল চালু করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লক্ষ্মী সায়গল একজন প্রথিতযশা ডাক্তারও ছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রথমে পদ্মজা নাইডু-র কাছে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন শরণার্থীদের সেবায় কাজ করার জন্য। কিন্তু পদ্মজা নাইডু তাকে শরণার্থী সেবায় যোগদান করতে বারণ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, লক্ষ্মী সায়গল বাংলা বলতে পারেন না তাই খুব একটা কাজে তিনি আসবেন না। তখন লক্ষ্মী সায়গল বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির সভাপতি জ্যোতি বসুর কাছে শরণার্থী সেবার কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে, শ্রী বসু তাঁকে কলকাতায় পি আর সি-র সাথে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার লক্ষ্মী সায়গল বস্ত্র ও চিকিৎসার সরঞ্জামে ভর্তি কয়েক ক্রেট ত্রাণ সম্ভার নিয়ে কলকাতায় পি আর সি-

র কাজে যোগ দিয়েছিলেন।[৯] কলকাতায় এসে লক্ষ্মী সায়গল নিজ উদ্যোগে পি আর সি-র হয়ে শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেন। লক্ষ্মী সায়গলের নেতৃত্বে পি আর সি-র একটি সেবামূলক প্রতিনিধি দল বারাসাতে এসে উপস্থিত হয়, যেখানে একটি পুরানো লম্বা বাড়িতে অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়। এটি ছিল 'Make Shift Hospital'। যার বৈশিষ্ট্য হলো, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এটি গুটিয়ে নেওয়া যেত। লক্ষ্মী সায়গলের উদ্যোগে পি আর সি বারাসাতের ঐ হাসপাতাল শিবিরে চিকিৎসার জন্য আসা প্রতিটি শরণার্থীকে কলেরা, ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করেছিল। তাছাড়া লক্ষ্মী সায়গল গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির তরুণীদের নার্সিং ট্রেনিং–এর প্রাথমিক পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের ইঞ্জেকশান দেওয়া, সাজ-সরঞ্জাম সহ শিরা ফুঁড়ে ড্রিপ চালু করতে শিখিয়েছিলেন।[১০] এই তরুণীরা পি আর সি-র নার্স হিসেবে শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। পি আর সি-র তরফে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি কিছু ত্রাণও দেওয়া হয় শরণার্থীদের। শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল ৯৮০০০ কম্বল এবং ৩৮,৭০০ টাকা। পি আর সি-র ডাক্তার প্রশান্ত রায় ইংল্যান্ড থেকে কিছু পাউন্ড চাঁদা তুলে পাঠিয়েছিলেন।[১১] অর্থাৎ এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও পিপিলস্ রিলিফ কমিটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য মানবিক সেবা দান করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সূত্র নির্দেশ:

১. *Bangladesh Documents,* Volume-II, Ministry of External Affairs, Government of India, Printed at B.N.K. Press Private Limited, Madras, 1972, Page- 82.

২. নরেশ ব্যানার্জী 'পিপলস্ রিলিফ কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', বিমল সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, অমিয় কুমার হাটি, ***পিপিলস্ রিলিফ কমিটি, দ্যুতিময় ইতিবৃত্ত,*** পিপিলস্ রিলিফ কমিটি, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৪৫।

৩. ***গণশক্তি,*** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ৩।

৪. ***গণশক্তি,*** ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১,কলকাতা,পৃঃ ২।

৫. ***গণশক্তি,*** ২১ মে, ১৯৭১,কলকাতা,পৃঃ ১।

৬. ***গণশক্তি,*** ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ৩।

৭. শ্যামল পাঁজা, 'পি আর সি আর্ত ত্রাণে ৫০ বছর', বিমল সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যরা, ***প্রাগুক্ত***, পৃঃ ১৯-২০।

৮. ***গণশক্তি***, ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ২।

৯. লক্ষ্মী সায়গল, 'পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পিপলস্ রিলিফ কমিটিকে সহকর্মীর বৈপ্লবিক অভিনন্দন', বিমল সেনগুপ্ত ও অন্যান্যরা, ***প্রাগুক্ত***, পৃঃ ২৫।

১০. লক্ষ্মী সায়গল, ***প্রাগুক্ত***, পৃঃ ২৬।

১১. বিমল সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যরা, ***প্রাগুক্ত***, পৃঃ ১১১।

বঙ্গনারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা

শুভ্র সরকার
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিকম্ স্কিল ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : *বাংলা সাময়িক পত্রের শুভ সূচনার পর ক্রমাগত আবির্ভূত হয় বিবিধ বিষয় নির্ভর পত্রিকা। প্রতিটি বাংলা সাময়িকপত্রই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ৩৪টি পত্রিকায় সম্পাদনা বা পরিচালন গোষ্ঠী মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবে সমস্ত পত্রিকাই শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রকাশিত হত না। আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হতো। এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল ‘নব্যভারত’, ‘বাংলার কথা’, ‘মুক্ত’, ‘অর্চনা’ ও ‘মাতৃভূমি’ ‘শ্রমিক’ সমকালে বাঙালী মানসের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এগুলির অবদান অনস্বীকার্য।*
সূচক শব্দ : *প্রেক্ষাপট, মূল বক্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য।*

প্রেক্ষাপটঃ ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে অতি দ্রুত। এরপর বাঙালীর জীবনে যে নানাবিধ ভালমন্দ বিবর্তন ঘটেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন। প্রধানত মুদ্রণ যন্ত্রের সৌজন্যে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র ‘দিগদর্শন’ (মাসিক) প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জোশুয়া ম্যার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক ম্যশম্যান এবং প্রকাশক ছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন।

বাংলা সাময়িকপত্রের শুভ সূচনার পর ক্রমাগত আবির্ভূত হয় বিবিধ বিষয় নির্ভর পত্রিকা। যেমন – ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ (জুন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রতিটি বাংলা সাময়িক পত্রই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালের বাঙালী মানসের সামাজিক-নৈতিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষার চেতনা বিস্তারে এগুলির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা সাময়িক পত্রের ঐ বিচিত্র ভুবনে একটি সাধারণ ধর্ম বজায় ছিল সর্বক্ষেত্রে – প্রতিটি সাময়িকপত্রই পরিচালিত ও সম্পাদিত হত পুরুষের দ্বারা। মহিলাদের সম্পাদনা বা পরিচালনায় প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্রের জন্য বাঙালীর প্রতিক্ষা সমাপ্ত হয় ১২৭৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে। মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র পাক্ষিক ‘বঙ্গমহিলা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৭ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখে।

সম্পাদিকার নাম উল্লেখিত ছিল জনৈকা খিদিরপুর নিবাসিনী। সম্ভবত মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদিকা। নারী সম্পাদকের হাতে প্রকাশিত 'বঙ্গমহিলা' বাংলার সমাজ ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসের নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিল। আমরা ভারতের স্বাধীনতা পূর্বকালীন অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতার সময়কালের মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস (১৮৭০-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে), প্রায় ৭৭ বছরের সময়সীমায় প্রকাশিত মহিলা সম্পাদিত-পরিচালিত বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করব। পত্রিকাগুলি সমকালের পাঠকমহলে বিশেষত মহিলা মহলের রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনার বিকাশে যে প্রয়াস করেছিল তারই বিশ্লেষণ করব। ৭৭ বছরের দীর্ঘ সময়ে বহু মহিলা সম্পাদিত-পরিচালিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে।

মূল বক্তব্যঃ

এই পত্রিকাগুলির সম্পাদনা বা পরিচালকগোষ্ঠী মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবে সমস্ত পত্রিকাই শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রকাশিত হত তা নয়, আরও কিছু বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল মহিলা পত্রিকাগুলি। রাজনৈতিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল 'নব্যভারত', 'বাংলার কথা', 'মুক্ত', 'অর্চনা' ও 'মাতৃভূমি। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'শ্রমিক' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পত্রিকা ছিল। এটি মহিলা সম্পাদিত একমাত্র শ্রমজীবীদের পত্রিকা। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি শুধুমাত্র মহিলা সমাজেই রাজনৈতিক-সামাজিক-চেতনা প্রসারিত করেনি, সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সমগ্র বাঙালী সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল পত্রিকাগুলি এবং একটি আদর্শ দেশ নির্মানের জন্য যে উপাদানগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের যথাযথ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মহিলা সম্পাদকরা। এই সামাজিক পরিবর্তনকালে ভারতীয় জনমানসে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করার লক্ষে অসংখ্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল পত্রিকাগুলি যা কিনা তৎকালীন বা নারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধি করেছিল এবং পরবর্তীকালে তা স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং অধিকাংশ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী মত গঠনের চেষ্টা করত। তবে সময়ের সঙ্গে ভাবনাচিন্তা প্রসঙ্গ ও কৌশল পরিবর্তিত করেছিল মানসিক অবস্থা অনুযায়ী। প্রাক্স্বাধীন ভারতে

ব্রিটিশ সরকারের নঞর্থক ভুমিকাগুলি, যেমন – দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ইঙ্গ-ব্রহ্ম-যুদ্ধ ইত্যাদির তৎকালীন সরকারের উদাসিনতা সম্পর্কে পাঠকের উত্তরোত্তর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পত্রিকাগুলিতে আলোচিত হত। বঙ্গভঙ্গের মধ্যে আবির্ভূত ভারতমহিলা, সুপ্রভাত, জাহ্নবী ইত্যাদিতে বয়কট আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গের নীতি রূপায়ণে লর্ড-কার্জনের মুখ্য ভূমিকা, কংগ্রেস ও দিল্লির দরবারের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যা কি না ব্রিটিশ সরকারকে ভীত-ত্রস্ত করেছিল। এছাড়া গান্ধিজীর চরকা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন কংগ্রেসের অন্তর্কলহ স্বরাজ কমিটি সংগঠন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং স্বদেশী জিনিস তৈরি করতে উৎসাহ দান, যা কিনা নব্য-ভারত, বাংলায় কথা, সেবা ও সাধনা মাতৃমন্দির-বঙ্গনারী এই পত্রিকাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হত। বাংলার উগ্রপন্থী আন্দোলন, কংগ্রসের কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট এই বিষয়েও পত্রিকাগুলি আলোচনা করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরালে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ্যে এসেছিল কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ধারা। কয়েকটি পত্রিকায় কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেছিল। সেগুলি হল – ‘শ্রমিক’, ‘জয়শ্রী’, ‘মন্দিরা’, ‘অর্চনা’। আমাদের আলোচিত বহু পত্রিকাই প্রত্যক্ষ কোন রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা চালিত ছিল। ‘ভারতী’, ‘ভারত মহিলা’, ‘সুপ্রভাত’, ‘জাহ্নবী’ প্রত্যেকটিতে ধারাবাহিক সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে প্রচার করত। ‘নব্যভারত’ এই পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর নজর দিত। যেমন – চিত্তরঞ্জন দাশ কথিত ‘স্বরাজ’-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচার করা। অনুরূপভাবে গান্ধীজিকে প্রবলভাবে সমর্থন করত ‘সেবা ও সাধনা’ পত্রিকাটি। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সংঘাত নিয়ে আলোচন করত মাতৃমন্দির’। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েও সচেষ্ট ছিল। ঊনিশ শতক থেকেই সচেতন ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সুস্পষ্ট হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের আড়ালে ইউরোপীয় আগ্রাসন উপনিবেশগুলিতে কিভাবে নিজের আর্থিক মুনাফা লাভ করে দেশগুলি তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে চলেছিল তারও নিদর্শন ছিল এই পত্রিকাগুলিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দেশগুলির স্বার্থসংঘাত, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, মধ্য প্রাচ্যের তেল দখলের লড়াই ইত্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ছিল ‘মন্দিরা’য়। প্রাক্‌স্বাধীন ভারত (১৮৭০ খ্রী. – ১৯৪৭ খ্রী.) এই সময়কালের মধ্যেই সারা বিশ্বের দেশে দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষিত নারীরাও এ বিষয়ে

সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে প্রচার শুরু করেছিলেন বাংলার সাময়িকপত্রগুলি। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় অধিকাংশ মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্রই মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারে পক্ষে মতামত দিয়েছিল।

সমাজে অন্দরমহল থেকে বর্হিমহল পর্যন্ত বিস্তৃত অজস্র রকম কুসংস্কার দূরীকরণে মুক্তকণ্ঠে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল পত্রিকাগুলি। নারীর শিক্ষা, দেশসেবা, সমাজসেবা, স্বনির্ভরতার আহ্বানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্রগুলি। যেমন - বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বহু সন্তানের জন্মদান ইত্যাদির বিপক্ষে প্রচার করেছিল পত্রিকাগুলি। বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের পক্ষে, বিধবাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল অনেক পত্রিকা। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সম্পাদিকারা দেশ ও সমাজকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিদেশের উদাহরণ এনেছেন বার বার। এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলি, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া সব দেশ থেকেই সাধ্যমত উপাদান সংগ্রহ করেছেন এঁরা। বিবিধ মহীয়সী নারীর জীবনী উল্লেখ করে ভারতীয় নারীদের দেশ সেবা ও সমাজসেবায় অনুপ্রাণিত করেছিল পত্রিকাগুলি। খুব বেশি মাত্রায় রচিত হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার জীবনী (সুপ্রভাত), পন্ডিতা রমাবাঈয়ের কথা (দীপালি ও বিজয়িনী)।

নব্য ভারত (১৩২৮ বঙ্গাব্দ / ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) :

১290 বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ মাসে (১৮৮৩ খ্রি.) জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের উদ্দেশ্যে ‘নবভারত’ প্রকাশিত হয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সম্পাদনায়। এবার পত্রিকার ভার নেন তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী। গভীর শোকের মধ্যে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করে মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যায় প্রফুল্লনলিনীর ‘নব্যভারত’।

জাতীয়তা

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

“বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনটি ব্যর্থ হইতে দিলে ভারতের কল্যাণ অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িবে। এ সঙ্কট সময়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরঈ ভারতের জন্য চিন্তা করা কর্তব্য। মত পার্থক্য দূরে রাখিয়া জাতীয়তার অনুরোধে সকলে মিলিয়া মিশিয়া আন্দোলনটাকে সফল করিবার নিমিত্ত আত্ম-নিয়োগ করিতে না পারিলে পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।” (‘নব্যভারত’, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ব., ৩৯শ খন্ড, পৃ.৪১৭)।

'বাঙ্গলার কথা' (১৩২৮ ব./১৯২১ খ্রী.)

'নব্যভারত'-এর মতো 'বাঙ্গলার কথা' আকস্মিকভাবে মহিলা সম্পাদিকার দ্বারা পরিচালিত হয় কিছুকাল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৪ আশ্বিন (১৯২১ খ্রী.) 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশিত হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায়। পরিচালকমন্ডলী পত্রিকাটিকে বলেছিলেন – 'বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপাত্র'। পত্রিকার দাম ছিল এক আনা এবং বার্ষিক মূল্য ছিল ৪ টাকা। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে চিত্তরঞ্জন প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসতেন। এভাবেই একবার তাঁকে বন্দি করা হলে 'বাঙ্গলার কথা'র দায়িত্ব নেন তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর থকে 'বাঙ্গলার কথা'র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জন প্রবর্তিত 'স্বরাজ' আন্দোলন নিয়ে একাধিক লেখা ছিল পত্রিকায়, যেমন – "মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর বাঁচিতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার লাভ না করিলে আমরা জগৎকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব ? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে। হিন্দু মুসলমান সকলকে এক হইয়া সেই মহাবোধনের পূজারি হইতে হইবে।" ('বাঙ্গলার কথা', ২৯ পৌষ, ১৩২৮ ব. প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, পৃ.১০৭)।

শ্রেয়সী (১৩২৯ ব./১৯২২ খ্রী.)

"শ্রেয়সী' পত্রিকার জন্ম হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা দেবী ঠাকুর (১২৮০-১৩৭৪ ব.) এর উদ্যোগে বালিকাদের সাহিত্যসভার মুখপাত্ররূপে 'শ্রেয়সী'র প্রকাশ হয়েছিল ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। পত্রিকাটি প্রথমে হাতে লিখিত ছিল, তারপর প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯ খ্রি.)-র চেষ্টায় এটি মুদ্রিত রূপ পায়। এরও পর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাস (১৯২২ খ্রি.) থেকে কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় 'শ্রেয়সী' এক বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তারপর এর প্রবাহ মিশে যায় 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সঙ্গে – "আগামী বৎসর বৈশাখ মাস হইতে শ্রেয়সী এই আশ্রমের শান্তিনিকেতন পত্রিকার সহিত একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে আমাদের সকলেরই সুবিধা হইবে।

এক বছরের আয়ু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেও 'শ্রেয়সী' রুচিশীল, প্রগতিশীল ও উন্নতমানের পত্রিকা ছিল। নারী ও শিশুর বিকাশে পত্রিকাটির ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল।

'শ্রেয়সী' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, যা কিছু শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলময় তারই সাধনা করবে পত্রিকা।

'মুক্ত' (১৩৩৭ ব./১৯৩০ খ্রী.)

তরুবালা সেন পরিচালিত 'মুক্ত' প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯৩০ খ্রি.)। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক ছিলেন, তরুবালা সেন। সচিত্র 'মুক্ত'-কে বলে হয়েছে – 'Pictorial Weekly' বা 'সচিত্র সাপ্তাহিক'। 'মুক্ত'র রাজনৈতিক সংবাদগুলি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। সমকালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সযত্নে মুদ্রিত হয়েছিল পত্রিকায়, যেমন – "গত ২৩শে মার্চ সন্ধ্যা সাতটার সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে সর্দ্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসি দেওয়ার পর রাত্রি সাড়ে আটটার সময় একটি মোটর লরী করিয়া মৃতদেহ তিনটি সৎকারের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।" (শনিবার, ১৪ চৈত্র, ১৩৩৭ ব., পৃ.৩)।

'অর্চনা' (১৩৫১ ব./১৯৪৪ খ্রী.)

'অর্চনা' পত্রিকাটি দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ১৩১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯০৪ খ্রি.) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। দীর্ঘদিন পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পর চল্লিশতম বর্ষ থেকে এর সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন চিত্রিতা দেবী। তীব্র রাজনৈতিক চেতনা ও কালচেতনার পরিচয় দিয়েছিল 'অর্চনা' । বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দেশবিভাগের প্রস্তুতি ইত্যাদি গুরুত্ব দিয়েছিল পত্রিকা। 'অর্চনা'-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে সর্বদাই হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ নিয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন –

বাঙলা বিভাগ

সম্পাদকীয় নিবন্ধ

'১৬ই আগষ্ট কলকাতার বুকে যে হত্যাকান্ড চলেছিল তারপর ভাবা গিয়েছিল যে সে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আর পুনরাবৃত্তি হবে না – রাহুগ্রস্ত বাংলা বুঝি রাহুমুক্ত হলো ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ২৫শে মার্চ থেকে কলকাতার রাজপথে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধূমায়িত হচ্ছে...ভারতের চল্লিশ কোটি অধিবাসীর মুক্তির দিন যখন এগিয়ে আসছে তখন এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জগতের কাছে ভারতের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করবে। তাতে আর সন্দেহ কী..." ('অর্চনা', চৈত্র, ১৩৫৩ ব., বিয়াল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ.২৯)।

'মাতৃভূমি' (১৩৫২ ব./১৯৪৫ খ্রী.)

'মাতৃভূমি' সেকালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল। নাম থেকেই অনুধাবন করা যায়। পত্রিকাটি ভারতভূমির উন্নতিতে নিবেদিত ছিল। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৩৫২ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যা (১৯৬৪ খ্রি.) থেকে পত্রিকার সম্পাদিকা

হন অমিতা দত্ত মজুমদার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন, গোপাল ভৌমিক। আমরা ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দের 'মাতৃভূমি' নিয়ে আলোচনা করব।

সরকারি প্রেসে অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে জাতীয়বাদী পত্রিকাগুলি সাতদিনের জন্য বন্ধ ছিল। ৮ই অক্টোবর পত্রিকাগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটে। আর নোয়াখালিতে ব্যাপক লুঠতরাজ, হত্যালীলা, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, নারীধর্ষণ, নারীহরণ প্রভৃতি আরম্ভ হয় ১০ই অক্টোবর হইতে। সুতরাং সুরাবর্দী গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন না যে বাংলার জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক নাদিরশাহী অত্যাচার করিয়াছিল। ('মাতৃভূমি', কার্ত্তিক, ১৩৫৩ ব., অষ্টম বর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃ.৫৮২)।

সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যঃ-

১৮৭০ খ্রী. থেকে ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত প্রকাশিত মহিলা সম্পাদিত, পরিচালিত পত্রিকাগুলির নানাবিধ তাৎপর্য (সামাজিক ও রাজনৈতিক) ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপস্থাপিত হবো। যা কিনা এই আলোচনায় নতুন দিগন্তের সূত্র নির্দেশ করবে। এই পত্রিকাগুলি তার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও দেশ ও সমাজের সঙ্গে কল্যাণকর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা করেনি। কয়েকটি পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ জাতি গঠন এবং এই কারণে রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। এছাড়া পত্রিকাগুলি সমগ্র বাঙালি সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল। আমাদের আলোচিত বহু পত্রিকা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা চালিত ছিল। প্রাক্ স্বাধীন পর্বের মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিল। রাজনৈতিক ভাবনার সাথে সাথে এই পত্রিকাগুলি অর্থনৈতিক বিষয়ে পরাধীন দেশবাসীকে নানাভাবে সচেতন করেছিল। পরাধীন ভারতের নারী-পুরুষ এবং শিশুদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে চেয়েছিল এই পত্রিকাগুলি। এই পত্রিকাগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতি। সমাজের অন্দরমহলে এবং কুসংস্কার দূরীকরণ ও পরিমার্জনের জন্য পত্রিকাগুলি একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিল। দেশের জনগণ শিক্ষিত হোক, সংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক, মহিলারা উন্নত হোক, শিশুরা রোগমুক্ত হোক, নারীমনে জাতিগঠনের চেতনাবোধে গড়ে তুলে সর্বোপরি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করুক–এই সমস্ত পবিত্র শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল আলোকময়ী সম্পাদিকাদের লেখনীতে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. এ আর দেশাই, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং কলকাতা, দ্বিতীয় অনুবাদ সংস্করণ, ২০০১

২. গীতা চট্টপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' (১৯০০-১৯১৪) প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা – ১৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০
৩. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড (১৯১৫-১৯৩০), প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪
৪. ঐ, তৃতীয় খন্ড (১৯৩১-১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ, ২০০১
৫. 'বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭ ব.।
৭. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪০১ ব.
৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র' (প্রথম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৯ ব.
৯. ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪ ব.
১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী' বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৫৭ ব.
১১. স্বপন বসু ও মুনতাসীর মানুন (সম্পা) 'দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৫ ।
১২. স্বপন বসু, 'সংবাদ সাময়িক পত্রে ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ', দ্বিতীয় খন্ড, পঃবঃ বাংলা একাদেমি, ২০০৩ ।
১৩. হরিপদ ভৌমিক, 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা', ১ম ও ২য় খন্ড, পুস্তক বিপণি, কলকাতা (১৯৮৭ ও ১৯৮৮) ।
১৪. Bagal Jogesh Chandra, 'Women's Education in Eastern India, the 1st Phase' কলকাতা, 1956.
১৫. Karlekar Malavika, 'Voice from within : early personal narratives of Bengal Women', Delhi, 1991.
১৬. Murshid Gulam, 'The Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905', Sahitya Samsad, Rajasahi University, 1988.
১৭. Sarkar Tanika, 'The Hindu Wife and Hindu Nation : Domesticity and Nationalism in Nineteenth Century Bengal' Studies in History, July-Dec, 1992.

আনিসুজ্জামানের জীবনী: একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ

আসরাফুননেসা বেগম
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সংক্ষিপ্তসার: *অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের অনেক পরিচয় -একটি প্রচলিত ইংরেজি বর্ণনা ধার করে বলা যায় তিনি মাথায় পরেন অনেক শিরস্ত্রাণ। তিনি একজন গবেষক, লেখক, সমাজচিন্তক, সংস্কৃতিতাত্ত্বিক, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, অতিথিপরায়ণ, পরিবারসমর্পিত একজন হাসিখুশি মানুষ। তাঁর সান্নিধ্য সততই অনুপ্রেরণাদায়ী এবং শিক্ষামূলক। যে ক্ষেত্রেই তিনি কাজ করেছেন সফল হয়েছেন এবং তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃজনপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গবেষণা ও লেখালেখিতে তাঁর নিজের জবানিতে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের শুরুটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনার সময় থেকেই। তিনি কতকগুলো এলাকা বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার। এর প্রধানটি ছিল বানালিসত্তার বিবর্তন ও বিকাশ, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালি সত্তার। এই গবেষণা অবধারিতভাবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সাহিত্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্বের অঞ্চলে। পরাধীন ভারতে মুসলমানরা ছিল দুই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির অধীনে – একটি ইংরেজ শাসন দ্বিতীয়টি জাতিগত ইতিহাস। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারায় একদিকে বিষয়বিত্ত ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়েছে মুসলমানেরা অন্যদিকে জাতিগত ইতিহাসে অভিমানী আত্মসমর্পণ করায় বর্তমানের পরিবর্তে অতীতের দিকে গেচগে সম্প্রদায়টি। কিন্তু বাংলায় মুসলমানরা এই দুই শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও নিজেদের প্রকাশ করেছেন, একটা জাগরণের পটভূমি তৈরি করেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই জায়গাটাতে জোরালো আলো ফেলেছেন।*

মূলশব্দ: *সামাজিক এলিট, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, সমাজচিন্তক।*

মূল পাঠ :

বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্য এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যে কয়েকজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় আনিসুজ্জামান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কেবলমাত্র সাহিত্য গবেষকই নন, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নাগরিক সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের একজন সাক্ষী এবং বিশ্লেষক ও সামাজিক এলিট। তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা বৃটিশ শাসনামলে, শিক্ষা

ও কর্মযাত্রা পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকৃত বিকাশ, অর্জন ও স্বীকৃতি।

আনিসুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এণ্টালির কাছে ৩১ ক্যান্টোফার লেনে। পিতার নাম আবু তাহের মোহাম্মদ মোয়াজ্জম এবং মায়ের নাম সৈয়দা খাতুন। পিতামহের নাম শেখ আব্দুর রহিম। আনিসুজ্জামানের পিতা প্রথম যৌবনে বসিরহাট শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নিয়োজিত হন পরে কলকাতা শহরে এসে হোমিও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। আনিসুজ্জামান তাঁর 'কাল নিরবধি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর পিতার প্রথম রোগী ছিলেন বিখ্যাত গবেষক ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র সফিয়ুল্লাহ। মা সৈয়দা খাতুন খুব পড়াশোনা করতে ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান তাঁর 'কাল নিরবধি' গ্রন্থে বলছেন-"মা ভালবাসতো পড়তে, খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন-শিরোনাম বা তার দুপাশের বিজ্ঞাপণ থেকে প্রায় শেষ পাতার প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম পর্যন্ত"।[১]। আনিসুজ্জামানের পিতামহ আব্দুর রহিম ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি', 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'জেহাদ' (মোহাম্মদ মেয়ারাজউদ্দিনের সঙ্গে মিলে, ১৮৯০), 'ইসলাম' (১৮৯৬), 'নামাজতত্ত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তমালা' (১৮৯৮), 'হজবিধি'(১৯০৩), 'ইসলাম ইতিবৃত্ত'(১৯১০), 'নামাজ শিক্ষা'(১৯১৭), 'ইসলাম নীতি', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ(১৯২৫), 'রোজাতত্ত্ব' (১৯২৬), 'কোরান ও হাদীসের উপদেশাবলী' (১৯২৬) ও 'খোৎবা' (১৯৩২)। ওয়াশিংটন আরভিংয়ের 'দ্য আলহামরা' অবলম্বনে লিখেছিলেন দুটি উপন্যাসোপম রচনা-'আলহামরা'(১৮৯১) ও 'প্রণয়যাত্রী'। উপন্যাস দুটি সম্পর্কে আনিসুজ্জামান 'কাল নিরবধি' গ্রন্থে বলছেন- "শেষ দুটি বই তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা; এর মধ্যে প্রথমটি দুষ্প্রাপ্য দ্বিতীয়টি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে সার্থক রূপান্তর। তবে তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল ধর্ম ও ইতিহাস। পাশ্চাত্য লেখকেরা ইসলামের রীতিনীতি ও শাসনপ্রণালির যে-বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, তিনি তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; অন্যপক্ষে বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও আবিষ্কারের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন ঐশীবাণী এবং ধর্মের অন্যান্য রীতিনীতিকে। এসব বই জনপ্রিয় হয়েছিল, কোনো কোনো বই স্কুল, মাদরাসা বা মক্তবের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল"।[২]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে আনিসুজ্জামানের পিতামহ আব্দুর রহিম প্রকাশ করেন বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা 'মিহির'। তৎকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান পরিচালিত সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে মিহিরই প্রথম একটি বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েছিল- "তাই হিতবাদী লক্ষ্য করেছিলেন, 'ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এই পত্রিকার নতুনত্ব' আর সময় লিখেছেন, 'মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ'..."[৩]

আনিসুজ্জামান বাংলার মুসলিম আধুনিকতামুখী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম প্রজন্মের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় যে সংগতি ফিরে পাবার পরে আনিসুজ্জামানের বাবা প্রথমে যা করেছিলেন তা হল আনিসুজ্জামানের দিদিদের পড়াবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিয়ে এক বাঙালি খ্রিস্টান স্কুল শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বসিরহাট ছাড়ার সময়ে ঘিপুকুর মাইনর গার্লস স্কুলে তাঁর বড়দিদি পড়তেন পঞ্চম শ্রেণিতে আর মেজদিদি পড়তেন তৃতীয় শ্রেণিতে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে ভাঙা বছরে কেউ আর স্কুলে যাননি, পরে তাঁর মেজদিদি ও ছোটদিদিকে কর্পোরেশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে মেজদিদি উত্তীর্ণ হয়ে যান পার্ক সার্কাস গার্লস স্কুলে। একসময়ে গৃহশিক্ষিকা চলে গেলে তার বড়দিদির পড়াবার ভার নেন বেনজির আহমদ। এখানে বেনজির আহমদের সম্যক পরিচয় নেওয়া আবশ্যক-বেনজির আহমদ ছিলেন সেযুগের পরিভাষায় যাকে বলা হতো –স্বদেশী ডাকাত। সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করা যাবে এই বিশ্বাস থেকে এক সময়ে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্রবে গিয়েছিলেন, তবে তেমন কোন দলের সদস্যপদ লাভ করতে সমর্থ হন নি...তখন বেনজির আহমদ কিছু মুসলমান তরুণ নিয়ে নিজেই একটি দল গড়ে তোলেন। টাকা জাল করার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার ও বন্দী হন এবং তাকে সরকারি আদেশে অন্তরীণ করা হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অন্যত্র চিকিৎসার ফল না পেয়ে তিনি আনিসুজ্জামানের বাবার শরণাপন্ন হন এবং তাঁর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হন। আনিসুজ্জামান কাল নিরবধি গ্রন্থে বলছেন- "কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ খুঁজতে গিয়ে বেনজির আহমদ প্রথমে বড়োবুকে পড়াতে শুরু করেন। তিনি নিয়মিতভাবে আসতে পারতেন না, তবে যথাসাধ্য করতেন, তাতে কাজ চলে যেত। তবু তিনি ভাবলেন এতে যথেষ্ট ঋণ পরিশোধ হল না। তখন তিনি হাতেম তাইয়ের উপাখ্যান গদ্যে লিখে আব্বাকে সমর্পণ করেন আমার মায়ের নামে তা প্রকাশ করার জন্যে। সৈয়দা খাতুনের হাতেম তাই ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হল, প্রকাশক- এ টি এম আনিসুজ্জামান, ২২

নাসিরুদ্দীন রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা”।[৪] বেনজির আহমদ আর একটি কাজ করেছিলেন-আনিসুজ্জামানের বড়দিদির কবিতা লেখার স্পৃহাকে উসকে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা ‘গুল বাগিচা’ প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল ওহাব সিদ্দিকি সম্পাদিত শিশুতোষ পত্রিকা গুল-বাগিচায়, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে।

বেনজির আহমদ এবং আনিসুজ্জামানের পিতা মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম এর সম্পর্ক বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা উঠে আসে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল কম। তার কারণ সামাজিক সংস্কৃতির শিকড়ে নিহিত এক ভেদ-ভাবনা। সশস্ত্র বিপ্লবীদের গড়ে ওঠা এবং দীক্ষাগ্রহণ পর্ব ছিল বিশেষভাবে হিন্দুত্ববাদী। তারা গীতা পাঠ করতেন, দেবী কালিকার পূজায় অনেকে নিবেদিত ছিলেন, বিবেকানন্দের বাণী ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয়। এই পরিমণ্ডলে ইসলামধর্মাবলম্বীরা সর্বদা সাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। আমাদের মনে পড়ে কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসে এই দিকটি মুক্তমনে তুলে ধরেছেন। সেখানে জাহাঙ্গীর নামে যুবকটি সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিতে চায়। প্রমত্ত নামের চিন্তাশীল হিন্দু যুবক এই প্রসঙ্গে সমস্যাটির আলোচনা করে এবং হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়কেই এবিষয়ে সংস্কারমুক্ত হবার আহ্বান জানায়।

এই পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯৩০ এ বিপ্লবী সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়। তাঁর সংগঠনে বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবক ছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে এই মানসিকতারই উত্তরাধিকার ছিলেন বেনজির আহমদ। তিনি তাঁর বিশ্বাস অনুসারে ছিলেন এক সমর্পিত প্রাণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। এই বেনজির আহমদকে সাদরে পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন আনিসুজ্জামানের পিতা। এখান থেকে বোঝা যায় তিনি ইসলাম ধর্মের অনুরাগী হলেও সংস্কারের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ শাসকের ভয়ও তিনি করতেন না। পিতার এই মুক্তমনের প্রতিফলন আনিসুজ্জামানের চরিত্রে অল্প বয়স থেকেই দেখা যায়।

পাঁচ বছর আগে ঘটে গেছে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা। জন্ম হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসকে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মিশ্রিত করবার ফলে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন পাকিস্তানকে এমন দুটি খণ্ডে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যার পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির কোন মিল নেই। তার থেকেও বড় কথা, পশ্চিম পাকিস্তান সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে চাই পূর্ব পাকিস্তান তথা

পূর্ববঙ্গের ওপর। এই সময়ে আনিসুজ্জামানের পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে এবং আনিসুজ্জামান তখন জগন্নাথ কলেজের মানবিকী বিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এইসময় দেশে সংঘটিত হয়েছে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলন ১৯৫২। আনিসুজ্জামান ছিলেন সেই আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন সদস্য। আন্দোলনের সমর্থনে তিনি 'রাষ্ট্রভাষা কী ও কেন' এই শিরোনামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। তিনি আগাগোড়াই ছিলেন প্রগতিশীল মনের মানুষ, সবকিছুতেই তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। মানবিকী বিদ্যা বিভাগের ছাত্র আনিসুজ্জামানের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে ওঠে। ১৯৫২ খ্রিস্টব্দে তিনি ছাত্রদের সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ ভাবনাকেও তিনি তাঁর কর্মধারার অংশ করে নেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং কাজী মোতাহার হোসেনকে সভাপতি ও ফইয়েজ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স ও এম এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে আনিসুজ্জামান বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন, পিএইচডি করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলো হিসেবে গবেষণা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন- "১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। ...এই পরিস্থিতিতে যে ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে গেলাম, তার কারণ একান্তই ব্যক্তিগত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের রিডারের পদের জন্য আবেদন করেছিলাম আগের বছরে- বিভাগের অধ্যক্ষ ও আমার শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের পরামর্শে। তার জন্যে সাক্ষাৎকারের সময় ধার্য হয়েছে ২৬ মার্চ সকালবেলা"।[৫]

উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে 'এই পরিস্থিতি' এবং 'এই অবস্থা' বলে যে ঘটনাধারাকে নির্দেশ করেছেন আনিসুজ্জামান তা ছিল রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল। ১৯৬৯-৭০ এ পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ। একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনপণ সংগ্রাম, অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসক এবং রাজাকারদের অত্যাচার –দুই-ই তখন চরমে। এই অবস্থায়

কেন্দ্রীয় রণাঙ্গন ঢাকা থেকে হয়ত খানিকটা দূরে থাকতে চেয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে রিডারের পদ তিনি পেলেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কর্মজীবনের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পনেরো – ষোলো বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ খুবই মর্যাদাবান ছিল। এই বিভাগের মর্যাদাবান হওয়ার দুটি কারণ ছিল। এক, এই বিভাগের মহান শিক্ষকেরা- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নিলীমা ইব্রাহিম, মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান এবং আরও অনেকে। দুই, ব্রিটিশ শাসনবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে বাংলা বিভাগের গৌরবজনক ভূমিকা। ব্রিটিশ আমলে ও পাকিস্তান আমলে বাংলা বিভাগ সব সময় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে।

ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের অগ্রসর, সমাজসচেতন, বিবেকী ভূমিকা সেই সময়ের পূর্ববঙ্গের সমাজ ও রাষ্ট্রের জনমত গঠনে মৌলিক অবদান রেখেছিল। ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করা, দিকনির্দেশনা দেওয়া, অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে যেকজন শিক্ষক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন শ্রদ্ধেয় আনিসুজ্জামান তাঁদের অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেপথ্যে পালন করতে হয় তাঁকে- মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা করা। সাহিত্য পত্রিকার সেই প্রথম বারো বছরের সংখ্যাগুলো বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা পত্রিকারূপে গণ্য হয়।

এরই মধ্যে এল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। এল মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশবাসীর জীবনে সে ছিল এক অসাধারণ সময়। দেশ জুড়ে তখন চলছিল মিছিল আর সমাবেশ। আনিসুজ্জামান ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। সমগ্র বাংলাদেশ তখন একটি মাত্র দাবিতে একাত্ম- স্বাধীনতা। ওদিকে পাকিস্তানিরাও প্রস্তুত এই দাবিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। ২৫ মার্চ তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে বাংলাদেশবাসীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। বাংলাদেশবাসীর প্রতিরোধশক্তি একে একে ধসে পড়তে লাগল পাকিস্তানি সেনাবাহিনির ব্যাপক আক্রমণে। সেনাবাহিনি

চট্টগ্রাম দখল করে নিলে আনিসুজ্জামান সীমান্ত পেরিয়ে আগড়তলা চলে যান। সেখান থেকে কলকাতা- "১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল, সোমবার, আগড়তলায় এসে পৌঁছোলাম। এভাবে স্বদেশ ত্যাগ করতে যে কত তীব্র যন্ত্রণাবোধ হয়, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্যতার যে কী গ্লানি চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা যে কেমন পীড়ন করে, তা বুঝি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অনুভব করতে হয়। নাৎসি জার্মানি থেকে পলাতক শরণার্থীর কথা পড়েছিলাম এরিখ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসে। রাতের অন্ধকারে ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া সেইসব চরিত্রের মিছিলে আমিও যোগ দিলাম"।[৬] তারপর মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বাংলাদেশবাসীর ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ১৯৭১ এর ডিসেম্বর, ঘোষিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আনিসুজ্জামানও দেশে ফিরে এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন- " মন্ত্রীসভা ঢাকায় আসেন ২২ ডিসেম্বর। তার দিন দুই আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পরিকল্পনা-কমিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করে লেখা আমার চিঠিটা তাঁর হাতে দিই। তাতে লিখি যে, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পূর্বপদে ফিরে যেতে চাই। আমার পদত্যাগপত্রে চোখ বুলিয়ে একটু হেসে তাজউদ্দীন বলেন, 'এত তাড়া কেন, ঢাকায় গিয়েও পদত্যাগ করা যাবে'। আমি বললাম, 'ঢাকায় যেয়ে একবার প্রশাসনের মধ্যে ঢুকে পড়লে বের হওয়া কঠিন হবে"।[৭] এই সময় তিনি আর একটি গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত হন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এটি ছিল তাঁর জন্য একটি যোগ্য কাজ। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তিনি আগাগোড়া নিয়োজিত ছিলেন সেই দেশের সংবিধান রচনায় তাঁর এই ভূমিকা তাঁকে নিঃসন্দেহে মহিমান্বিত করেছে। বস্তুত এই কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হন।

কেবল সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র ছাড়াও দেশের নানা সংকটকালে তিনি একজন বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছেন। স্বৈরাচারী এরশাদ যখন রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনি চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণির নাগরিকদের একটি সভা আহ্বান করেছেন, তাঁর নিজের হাতে লেখা সভার দুষ্প্রাপ্য বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করছি- "বাংলাদেশে যে স্বৈরশাসন চলছে এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মঘোষণা ও অন্যান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে

যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা চলছে তা একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে আঘাত করছে, অন্যদিকে তেমনি জাতির ভবিষতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢভাবে প্রতিরোধ ও জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণির নাগরিকদের একটি সভা আহ্বান করছি"। [৮]

আনিসুজ্জামান ছিলেন আপাদমস্তক ইহজাগতিকতাবাদী। পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত সেক্যুলারিজম শব্দের অর্থ ইহজাগতিকতা, যার অর্থ দাড়ায় ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিযুক্ততা। যেকোন কারণে আমাদের সংবিধান ও আচার-অনুষ্ঠানে সেক্যুলারিজমের অর্থ দাঁড়িয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থ যাই হোক না কেন চিন্তায় ও কর্মে সেক্যুলারিজমের বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন আনিসুজ্জামান। ইহজাগতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কথা ও লেখায়। ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি আনিসুজ্জামান কৈশোরেই অর্জন করেছিলেন।

কলেজের ছাত্রাবস্থায় যে অসাম্প্রদায়িক ও ইহজাগতিক মননের তিনি অধিকারি হলেন সেই মননবোধই তাঁকে পরবর্তী সময়ে পরিচালিত করেছে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচনে। দেশ-বিদেশের সভা-সেমিনারে, সাহিত্যচর্চায়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসুচীতে আনিসুজ্জামানের অবস্থান বরাবরই ছিল ইহজাগতিকতা ও মনুষ্যত্বের পক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই 'আনন্দমঠ ও বঙ্কিম প্রসঙ্গ' নামে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অধিবেশনে পাঠ করলেন তিনি। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শে গঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে এটি ছিল এক সম্ভাবনাময় তরুণের দুঃসাহসের পরিচয়। 'বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঐতিহ্য' তাঁর এই বক্তব্য ক্ষুব্ধ করেছিল অনেককে। সেই অধিবেশনে উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একজন বক্তা বললেন, তাঁকে পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়া উচিত। অন্য কেউ হলে হয়তো এমন প্রতিক্রিয়ার পর এ জাতীয় প্রবন্ধ লেখা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু স্থিতধী ও ধীমান আনিসুজ্জামান তা করেননি। এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া তাঁকে চিন্তার নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল।

আনিসুজ্জামানের বিভিন্ন গবেষণা কেবলমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাব্দধ থাকেনি। তাঁর কাজে সমাজ, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম এসমস্ত বিষয়গুলি নানান পরিমণ্ডলে যুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় ও মননশীল প্রবন্ধ রচনায় তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব সামনে আসে। সেখানে যে মান তিনি বেঁধে দেন তা অতিক্রম করা দুরূহ।

মনের মুক্তি এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাঁর গদ্যকে বিশিষ্ট করে তোলে। তরুণ চিন্তাবিদ আনিসুজ্জামান হয়ে ওঠেন তাঁর সময়ের অন্যতম এক চিন্তানায়ক। বাঙালির মনীষার বিকাশের শ্রেষ্ঠ ধারায় তাঁর নাম যুক্ত হয়। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করেন এবং বাঙালিত্বের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এক অখণ্ড মানবসত্তায় নিজেকে বিলীয়মান করে তোলেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তাশীল ও শ্রমশীল এক গবেষক। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের গবেষক বলে চিহ্নিত করা যায় না। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে অবশ্যই তিনি বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু অন্তরের পরিচয়ে তিনি একজন মুক্তবুদ্ধি, মানবতাবাদী বিশ্বনাগরিক। গবেষণা ও মননশীল ভাবনার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে তো অবশ্যই আন্তর্জাতিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত।

চুরাশি বছর বয়সে আনিসুজ্জামানের জীবনাবসানকে অকালপ্রয়াণ বলা চলে না, তবে অসময়োচিত মৃত্যু নির্দ্ধিধায় বলা যায়। জীবীত থাকলে তিনি নিশ্চিতভাবেই আরও কিছু কাজ করে যেতেন। শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশের সীমানা ছড়িয়েছিল। তাঁর রচনা সম্ভার বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এর বাইরে একটি ন্যায়পরায়ণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্পন্ন রাষ্ট্রের আঁকা তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিল অসামান্য মনস্বিতায় পূর্ণ। 'ইহজাগতিকতা' নামক আলোচিত প্রবন্ধে আনিসুজ্জামান লিখেছেন- "যে জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং যে জীবন জন্ম ও মৃত্যুর সীমায় আব্দধ, সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উৎকণ্ঠাকেই বলা যায় ইহজাগতিকতা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এ এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরলোক ও পরকাল সম্পর্কে কিংবা অতিপ্রাকৃত ও আত্মা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রশ্রয় পায় না। পৃথিবী ক্ষুদ্র হোক আর বিপুলা হোক, জীবন পদ্ম পত্রে নীর হোক আর জীবনকোষের সমাহার হোক, এই পৃথিবীতে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পরিপূর্ণ মানবজীবনের সাধনাই ইহজাগতিকতার মূল কথা"। [৯]

তথ্যসূত্র:

১. আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ ৩৯-৪০

২. তদেব, পৃ ২৯

৩. তদেব, পৃ ২১

৪. তদেব, পৃ ৪১

৫. তদেব, পৃ ১১-১২

৬. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ পৃ ৫৩

৭. তদেব, পৃ ১৮২-১৮৩

৮. মনঞ্জুরুল ইসলাম সৈয়দ, আনিসুজ্জামান সম্মাননা গ্রন্থ (সম্পাদিত), চন্দ্রাবতী একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৭, পৃ ৬৫

৯. https://www.prothomalo.com/onnoalo/

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৫ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

২. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৬ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)

৩. আনিসুজ্জামান, বিপুলা পৃথিবী, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

৪. আনিসুজ্জামান, মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০০ (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯)

৫. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, চারুলিপি, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮ (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৬৪)

হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর অচর্চিত হাসির কাব্য

সুদীপ্ত সাধুখাঁ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: *উনিশ শতকে বিশেষত বাংলা সাহিত্যে রেঁনেসার যুগে হাস্যরসের অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল সাহিত্য,প্রবন্ধ ও গানের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেকেই সাহিত্যে হাস্য রসের পরিবেশন করেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত, নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই হাস্য রসকে রূপ দান করেছেন। নাট্যকার-প্রাবন্ধিক-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে আমরা জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক হিসেবে বেশি করে দেখি। কিন্তু তাঁর বহু চর্চিত দেশাত্মবোধক গানের জনপ্রিয়তার আড়ালে প্রায় অচর্চিত প্রহসনধর্মী হাসির গানে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার কথাও আমাদের কাছে বিস্মৃত হলে চলবে না। হাস্যরসের ভান্ডে নৈতিক শিক্ষা আর সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তরকে পরিবেশন করেছেন এই 'বসুন্ধরার সেরা' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের গান কেবল বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতিতেই নয়, সামগ্রিক ভারতীয় সাহিত্যেও কৌতুক ধারার চরম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই অচর্চিত বা স্বল্প চর্চিত প্রতিভাকে চর্চার চেষ্টা করেছে।*

মূল শব্দ: *দ্বিজেন্দ্রগীতি, হাস্য রস, শ্লেষ, সংগীত, রেনেসাঁ।*

মূল আলোচনা:

"অঙ্গ ভঙ্গী করে, ক্যারিকেচার করে লোক হাসানো যায়, কিন্তু লিখে পাঠকের মুখে হাসি ফোটানো অত সোজা ব্যাপার নয়। বিস্তর পড়াশোনা না থাকলে হাসির লেখক হওয়া যায়না। ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপারস', জোরোম-কে-জেরোম, পিজি ওডহাউস এর পাতা উল্টালে বোঝাযায় জানার পরিধিটা কত বড়"। হাসির লেখা নিয়ে এই ধারনা প্রকাশ করেছেন বর্তমানে হাসির লেখক হিসাবে খ্যাত সঞ্জিব চট্টোপাধ্যায়।[1] অবশ্য বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসত্মক রচনার খোঁজ করলে যে হতাশ হতে হবে তা নয়। হাতের কাছে হাসির রাজা সুকুমার রায় কিংস্বা শিব্রাম চক্রবর্তীতো আছেনই। প্রথম জন ছন্দে আর দ্বিতীয় জন গদ্য ভাষায় নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করে পাঠকের মন আকর্ষন করেছেন।

কিন্তু আমাদেরকে যদি উনিশ শতকে বিশেষত বাংলা সাহিত্যে রেঁনেসার যুগে হাস্যরসের অনুসন্ধান করতে বলাহয়, যদি বলা হয় রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে হাসির

ভান্ডার খুঁজে আনতে তাহলে কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ায় স্বাভাবিক। বহুমুখী রবীন্দ্রনাথ নিজেকিছু হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও তা যতটা নির্মল আনন্দদায়ক তার তুলনায় বরং রসে ডোবানো বৌদ্ধিক পিঠে-পুলি বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্লেষাত্মক রচনায় বাবু চরিত্রের হাস্যকর দিকগুলি ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক সামাজিক জীবনকে তিনি তীব্র শ্লেষের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করেছেন, কংগ্রেসের রাজনীতিকে ভিক্ষান্নজীবির রাজনীতির সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু যদি কবিতা ও নাটকের মধ্যে প্রহসনের খোঁজ করা হয় তাহলে যে নামটি সর্বাগ্রে করতে হয় তাহল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।[২]

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁরগান বাংলা গানের ধারায় এক আশ্চর্য মাত্রা সংযোজন করেছে—তাতে আছে দেশ, কাল ও সমাজ, তাতে আছে মানুষ, আছে সমকাল আর ভাবীকালের সংকেত, আছে প্রেম, আছে বিরহ। মানব মনোজগতের বিচিত্র কক্ষগুলিতে তিনি সংগীতের মুর্চ্ছনা নিয়ে প্রবেশ করেছেন।

দেশ ও জাতির ক্রান্তি পর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম; সময়কাল ১৯শে জুলাই, ১৮৬৩ থেকে ১৭ই মে, ১৯১৩। পারিবারিক সূত্র থেকে তিনি পেয়েছিলেন সুকণ্ঠের অধিকার। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন সুকণ্ঠি গীতিকার এবং রাজপরিবারের দেওয়ান হিসাবে একটি মার্জিত সংস্কৃতির অধিকারী। মূলত পিতার প্রভাবেই পরিবারের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শৈশব থেকে সংগীতের প্রতি আকর্ষন। পরবর্তী কালে ছাত্র জীবনে ইংরেজী সাহিত্যপাঠ ও আরও পরে কৃষিবিদ্যা পড়তে বিদেশযাত্রা (ইংল্যান্ডে) তাকে প্রচলিত সংগীত ঘরানার বাইরে বেরিয়ে দিকদর্শনের সুযোগ করে দেয়। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতের সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হলেও ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সংগীতের পরিবর্তে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক— বিশেষত কবিতা রচনা করেছেন।

১৯০৩ এর পর থেকে আমরা পায় এক অন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে, যিনি দক্ষ নাট্যকার, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক। অবশ্য এই পর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মূলত গীতিকার— তাঁর গানে তখন গীতিকাব্যের অনাবিল মূর্চ্ছনা। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালে দেদণ্ডপ্রতাপ বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করে বাঙালীর হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করলেন। আর এর বিরোধীতায় বাংলায় যে জনজাগরণ ঘটল তা তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, তাই তার গানের ভাষা দেশপ্রেমমূলক (যা তৎকালীন সময়ে 'দেশগান' নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে)। অবশ্য প্রেম ও বিরহের গান আর প্রহসনধর্মী হাসির গানে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার কথাও আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় নয়।

পারিবারিক সূত্র ধরেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের দেওয়ান এবং দক্ষ সংগীত জ্ঞ। বাবার সংগীত চর্চার প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল। এইবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ নেবার সময় থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু। সেইসময় ১৮৮২তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' প্রকাশিত হয়।[৩] এর পর বিলেতে তাঁর পাশ্চাত্য নাটক-কবিতাকে আরও গভীর ভাবে চর্চার সুযোগ করেদেয়।

১৮৮৬তে দেশে ফিরে একদিকে সরকারী চাকুরি সূত্রে দেশদর্শন অন্যদিকে অবসর সময়ে কাব্য ও সংগীত চর্চায় নিজেকে ব্যপৃত রাখেন। সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চাকুরি জীবনের থেকে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত মূলত কবিতা ও সংগীত সৃষ্টিতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই সময়কালে তাঁর প্রায় ১২ খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের কবিতা ও গান আছে। জীবনের পরবর্তী ও অন্তিম ১০ বছরে তিনি সৃষ্টি করেচলেন বিখ্যত সব ঐতিহাসিক, পৌরানিক ও সামাজিক নাটক, যা সমকালীন সমাজে 'ডি. এল. রায়ের নাটক' হিসাবে আলাদা পরিচিতি লাভ করেছিল।[৪]

সমকালে তিনি নাট্যকার হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করলেও নাটক, কবিতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বহুমুখী সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছেন। আর কবি হিসাবে তিনি যে নতুন ঘরানার জন্ম দিলেন তা হল হাস্যরসাত্মক কবিতা। বিশিষ্ট সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীর মতে "দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তনি কবি। যদিও দেশবাসীর নিকট প্রধানত নাট্যকার রূপেই পরিচিত, তা হলেও তাঁর সমগ্র লেখক ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কবি পরিচিতি। ...... এই সত্ত্বা তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই অনুসৃত হয়ে আছে—তা সে কাব্যই হোক আর নাটকই হোক আর সংগীতই হোক"।[৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করাযায়। দেশাত্মবোধক গান, নাট্যগীতি, হাসির গান ও প্রেমের গান। দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/ তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা" গানটি। গানটি দেশপ্রেমিক বাঙালীদের তখন যেমন আলোড়িত করেছিল তেমনি দেশজ প্রকৃতির অপরূপ কোমলতা, অনাবিল সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করে সমকালীন মানসলোককেও প্রভাবিত করেছিল। এই গানে ভারতবর্ষের যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে

আমরা আজও তার সাথে একাত্ম বোধ করি। "ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ" চরনটিতে বাংলার পারিবারিক স্নেহ বন্ধনটিকে ছন্দের যাদুতে তুলে ধরেছেন।

এই সংগীত ও কাব্য সৃষ্টিতে তিনি যে নতুন ঘরানার জন্ম দিয়েছেন তা হচ্ছে – হাস্যরস। গুরুগম্ভীর বিষয়, স্বদেশ-সমাজ সচেতনতা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভেদকে তিনি সুচারু রুপে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। চেষ্টা করছেন সমাজকে হাসির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে, সচেতন করতে।

ইংরেজী সাহিত্য পড়ে, লন্ডনে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি বছর অতিক্রান্ত করেও পাশ্চাত্যের অন্ধ্ অনুকরণকারী না হয়ে তার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন এমন উদাহরণ কিন্তু সমকালে বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা ইংল্যান্ডে শিক্ষার্জনে গিয়েছেন তারা সকলেই নিজেদের সমাজ সংস্কৃতিকে হেঁয় মনে করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তা করেননি। 'বিলাতফের্তা' হয়েও সাহেবী 'হ্যাটবুট' ছেড়ে ধুতি-চাদরকে বেছে নিয়েছেন।[৬]

তাঁর হাসির কবিতার মাঝেও এই সমাজ ও কৃষ্টি সচেতনতা ফুঁটে উঠেছেঃ

"আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাটবুট আর কোটপ্যান্ট প'রে
সেজেছি বিলিত বাদর"।[৭]

অথবা,

"আমরা বিলিতি ধরনে হাসি
আমরা ফরাসি ধরনে কাসি
আমরা পা ফাঁক করিয়া
সিগারেট খেতে বড় ভালোবাসি"।[৮]

কবিতার সাথে যদি তাঁর জীবনযাত্রাকে তুলনা করি তাহলে তাঁর মন আর মুখের যে কোনো ফারাক নেই তা বোঝাযায়। অনুকরণ সর্বস্ব বাঙালী বাবু হতে তাঁর সায় ছিলনা কোনোমতে। কবির এই আত্মবিশ্লেষনে ধরা পড়েছে তীব্র শ্লেষ।

ছদ্মবেশী দেশপ্রেমকে তিনি কোনো দিনই সমর্থন করতে পারেননি। আবার বাঙালি জীবনের অলস, স্বার্থপর, নীতিহীন আর দায়বদ্ধহীন চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করেছেন এভাবেঃ

"নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !

সকলে বলিল 'যাওনা নন্দ, কর'না ভায়ের সেবা' !
নন্দ বলিলঃ 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক;
তখন সকলে বলিল—হাঁ, হাঁ, হাঁ তা বটে, তা বটে ঠিক !"[৯]

আবার বাঙালির এই স্বার্থপরতার কারনে জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল পরাধীনতার জ্বালা। পরাধীনতার গ্লানিকে তিনি মেনেনিতে পারেননি। তাই তার কবিতা হয়ে উঠেছে ব্যাঙ্গাত্মক ও হাস্যমুখর। তার প্রমান মেলে এখানেঃ

"জয় জয়, বৃটিশ সিংহ বৃটিশ সিংহ," বলে জোরে ভঙ্কা বাজায়!
পাহারা ফিরছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যায় !
—আমাদের ভক্তি যা —এ যে গো প্রাণের দায়ে,
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায় ![১০]

এভাবেই হাস্যরসের ভান্ডে নৈতিক শিক্ষা আর সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তরকে পরিবেশন করেছেন এই 'বসুন্ধরার সেরা' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর এই হাস্যরস বিশ্লেষণ করে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন—"কবিতার হাস্যরস ধারা ক্ষীন শ্রোতে নিদাঘ তটিনির মতো বয়ে আসছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় সেই ধারা শ্রাবনের উজ্জ্বল প্লাবনে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটি কেবল বঙ্গসাহিত্য নয়, ভারতীয় সাহিত্যেই কৌতুক ধারার চরম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।"[১১]

অবশ্য তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। সেই জন্য প্রথমে হাসির গানের দিকে তিনি ঝুঁকে ছিলেন। তবে হাসির গানগুলিও দেশাত্মবোধক গানের মতো সমকাল, সমাজ ও স্বদেশকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে নিজ হৃদয়ের কোমলতা আর আবেগকে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। তাঁর গানগুলিতে সুরের ল্যাবন্য, স্বরের বিন্যাস ও চলন সবই খুব মৌলিক ও আধুনিক। দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব হল এই যে, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত দেশি সংগীত ঘরানার সঙ্গে বিলেতি চালের গানকে স্বাচ্ছন্দে মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক মৌলিক ঘরানার, যার স্বতন্ত্র পরিচয়ই হল 'দ্বিজেন্দ্রগীতি'।

সহায়তা:

১. সঞ্জিব চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, বইএর দেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর২০১২

২. দ্বিজেন্দ্রলাল—(সম্পাঃ) তরুন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিম পাবলিসার্স, ২০০৬ পৃঃ ১৪৭
৩. দ্বিজেন্দ্রলাল—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ২০০5 পৃঃ ১০৩
৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পীতম ভট্টাচার্য ও দেবাশিস বসু, প্রকাশক অরুন কুন্ডু ২০1২ পৃঃ ১1৮
৫. দ্বিজেন্দ্রলাল—(সম্পাঃ) তরুন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিম পাবলিসার্স, ২০০৬ পৃঃ ১৩৮
৬. দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও শিল্পমানস—ড. দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়,করুণা প্রকাশনী, ২০০৮ পৃঃ ১7৮
৭. দ্বিজেন্দ্রলাল—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ২০০5 পৃঃ ১৮৭
৮. ঐ পৃঃ ১৮৭
৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পীতম ভট্টাচার্য ও দেবাশিস বসু, প্রকাশক অরুন কুন্ডু ২০1২ পৃঃ ১৩৬
১০. দ্বিজেন্দ্রলাল—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ২০০5 পৃঃ ১৮৯
১১. দ্বিজেন্দ্রলালরায়—পীতম ভট্টাচার্য ও দেবাশিস বসু, প্রকাশক অরুন কুন্ডু ২০1২ পৃঃ ১২০

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস 'স্তিমিত রণতূর্য'; শাঁখচির বা শাঁখারি জনগোষ্ঠীর 'অস্তিত্ব' বিপন্নতার আখ্যান

উৎপল ডোম
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : *ঔপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়া জেলার ভূমিপুত্র।অন্ত্যজদের নিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম সারির লেখক।ওনার উপন্যাস রচনার মূল সুর অন্ত্যজ বা প্রান্তিক জীবন ভাবনা।এই ভাবনাকে আশ্রয় করে উপন্যাসগুলি রচিত।তবে উপন্যাসগুলি লৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ।উপন্যাসের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেনপুরুলিয়া জেলা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজীবন থেকে।এছাড়া ওনার স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতাউপন্যাসেরকাহিনির মধ্যে বর্তমান।লেখকের কথনবিশ্বে সহজেই একটা ভৌগোলিক পরিসর খুঁজে পাওয়া যায়।যে পরিসরে মধ্যে খাসি, শাঁখারি, ইটভাটার শ্রমিক, লক্ষ কারিগর, সাঁওতাল, হাঁড়ি, বাউরি, শবর, কুড়মি, আখচাষি প্রভৃতি সহায়-সম্বলহীন মানুষের বসবাস।লেখকের উপন্যাস গুলি এইসব সহায় - সম্বলহীন মানুষের হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।'স্তিমিত রণতূর্য' উপন্যাসে সহায়-সম্বলহীন শাঁখারি বা শাঁখচির তথা শঙ্খ শিল্পীদের কথা বলা হয়েছে।যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যাদের 'অস্তিত্ব'আজ বিপন্ন, বিপন্ন তাদেরজীবন, 'পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি'থেকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে।সমাজ, সময়, প্রসাশনিক ক্ষেত্র থেকে কিভাবে বঞ্চিত হয়ে শাঁখারি বা শাঁখচির তথা শঙ্খ শিল্পীদের 'জাতবৃত্তি'বিলুপ্ত হয়ে যায় - ঔপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত তা যথার্থতার সাথে 'স্তিমিত রণতূর্য' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন।*

সূচকশব্দ: *শাঁখারি বা শাঁখচির – লোকাচার- গ্রামীণব্যবস্থা - প্রসাশনিক ব্যবস্থা - অস্তিত্ব বিপন্নতা।*

শঙ্খাসুরের অস্তি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর জন্ম হয় শাঁখের।কিন্তু সেই শাঁখ পেলেও তা পূর্ব কথা মতো ব্যবহারের জন্য নারায়ণের হাতে দেওয়া যাচ্ছে না।বাজাবে কী করে? তাতে কোনো ফুটো নেই।তখন সেটা নিয়ে যাওয়া হয় অগস্ত্য মুনির কাছে।তিনি তখন 'কুশ' দিয়ে শঙ্খের মুখ ফুটো করে দেন।এবার তাতে ফুঁ দিলে সৃষ্টি হয় শঙ্খধ্বনি।তাই যে করাত দিয়ে শাঁখারি বা শাঁখচির শঙ্খ ছেদন করে তার নাম এই 'কুশ' থেকে 'কুশকরাত'।পুরুষানুক্রমে শঙ্খ শিল্পীরা দু'হাতে 'কুশকরাত'অর্থাৎ শাঁখের

করাতটিপেটের কাছে আঁকড়ে ধরে 'তিনপুয়া' জায়গায় বসে শাঁখ চিরে যাচ্ছে 'কু- র্ - র্ - র- কুট! কু- র্ - র্ - র্ – কুট।'কোনো রমণীর দুহাতকে কল্পনা করে, যেন সে শাঁখকে দুহাত ধরে ফুঁ দিয়ে পবিত্র ধ্বনি তোলে বিগ্রহের সামনে, তুলসি থানে, সেই শাঁখকেই শাঁখারি কুশকরাত দিয়ে অবলীলায় দুহাতে ছেদন করে।শাঁখচিরের প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে উজ্বল হয়ে ওঠে এক এয়ো স্ত্রী।তার মনে হয় যে শাঁখ সে গড়তে চলেছে,তা এমনই এক নারীকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলবে।সেই নারীর হাতের শোভা বাড়াবে।বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীর সমস্তআর্কষণ ছিন্ন করে মায়ামোহ ত্যাগ করে,শাঁখারি নিজেকে আবদ্ধ করেছে একটি শাঁখের কাছে, একটি করাতের কাছে।শাঁখচির যেন তার সমস্ত সময়,নিষ্ঠা,ভালোবাসা সব কিছু সে অকাতরে বলি দিয়েছে একটি করাতের তলায়।'স্তিমিত রণতূর্য'উপন্যাসটি শাঁখারি বা শাঁখচির জনগোষ্ঠীর জীবনকথা তথা শঙ্খ শিল্পীদের অস্তিত্ব নিয়ে রচিত।শঙ্খ শিল্পীদের কথা, দৈনন্দিন জীবনের হাঁসি - দুঃখ - বঞ্চনা - উল্লাস - রসিকতা - নানা সমস্যা, সংকট ও উত্তরণ কথা - বেঁচে থাকার লড়াই - যান্ত্রিক যুগে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই প্রভৃতির নিরিখে শাঁখারি বা শাঁখাচির জীবনের এক জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী ছবি চিত্রিত হয়েছে।এই 'স্তিমিত রণতূর্য' উপন্যাসটি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে শাঁখারি বা শাঁখাচির তথা শঙ্খ শিল্পীদের বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে অবস্থান বিচার অন্যদিকে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার কাছে নিজেরা বিকিয়ে গিয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে নাকি নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে রত থেকেছে—হত দরিদ্র শঙ্খ শিল্পীদের এই সংকটময় জীবনকথা বর্তমান আলোচনা পত্রে উপস্থাপন করে স্পষ্টতা প্রদান করতে চেষ্টা করেছি।

এই উপন্যাসের কাহিনির পটভূমিবাঁকুড়া জেলার 'হাটগ্রাম'।হাটগ্রাম মানেই শাঁখারিদের কথা।এই গ্রামে চার হাজার মানুষের বসবাস।কিছু উৎকল ব্রাহ্মণ বাদ দিলে বেশির ভাগ মানুষ শাঁখারি গোষ্ঠীর।এক জায়গায় এত শাঁখারি পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই।"তুমার যদি শাঁখার দরকার, তাইলে তুমাকে এই হাটোগ্ গ্যারামে আসতেই হবেক.... না আইলে ই-জিনিস পাচ্চু কোথায়।"তাই বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ সব জায়গায় লোককে হাটগ্রামে আসতে হয়।দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত ধুলোবালির অপরিসর পথ। এটাই গ্রামের মূল সড়ক।এই সড়কের দু-পাশে শাঁখারি দের ঘর।গ্রামে হাসপাতাল আছে কিন্তু ভালো ডাক্তার নেই।টিউবকলের সংখ্যাও কম।বড় বাজার হাট, দোকান পাট নেই। বিদ্যুৎ এর খুঁটি বসানো হয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।তাই মাঝে মাধ্যে চোর-ডাকাতের আর্বিভাব ঘটে।দু-দুটো ইস্কুল আছে

কিন্তু শাঁখারি ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার গরজ নেই।আছে শাঁখের চাহিদা,আছে শাঁখারির চাহিদা।হাটগাঁয়ের মানুষ শঙ্খ শিল্পী হিসেবে খ্যাত।তেলুচরণ ভদ্র, গোপাল ভদ্র, মনোবোধ কুন্ডু, ওজিত দত্ত, গঙ্গারাম মন্ডল, পরেশ কুন্ড, খাঁদু ভদ্র, তুলসি নন্দ - এরা পুরুষানুক্রমে শাঁখারি।শাঁখ নিয়েই এরা কারবার করে চলেছে।ভোরের সূর্য যেন উদিত হওয়ার আগে গ্রামের শাঁখারিদের ঘরে ঘরে কড়া নেড়ে বলে "উঠো,উঠো হে, কচন ভদ্রর বাপ! এ আদরি কুন্ডু, এ তেলুচরণ! উঠো তুমরা। হাতে ধর কুশকরাত।পুরি কাটো, মাঝার কর! তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় - কুররর্-কুট! কুররর-কুট!" উৎকল বামুনরাপাইকার হয়ে গ্রামে গ্রামে শাঁখের ব্যাপারি করে।শাঁখারিদের ঘরে ঘরে ঢুকে কারিগর দের কাছ থেকে শাঁখের তৈরি হরেক রকম মাল জোড় হিসেবে নিয়ে টিনের সুটকেসে ঢুকিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে।শাঁখারি দের সিজিন বলতে দূর্গা পুজোর মাস আর বিয়ের মাস গুলো।তবে শাঁখের কাজে কোনো লিঙ্গভেদ নেই।ভেদ শুধু শাঁকচিরের বেলায়।মেয়েরা শাঁখচির হতে পারে না।যাদের পুঁজি নেই, লোকবলও নেই তারা বাধ্য হয় ভ্রাম্যমাণ উৎকল পাইকারদের ভরসা করে থাকতে।পেট চালাতে গিয়েই শাঁখারিরা হয় পাইকারদের ওপরে নির্ভরশীল, আর নয়তো মহাজনদের ওপরে।পানু ভদ্র, ভুবন লায়েক,দিলীপ কর্মকার, আদিত্য কুন্ডু - এরা সবাই মহাজন।গ্রামে এদের রোজগারও বেশি, লোকবলও বেশি।এই গ্রামে মহাজনদের একটা অনিবার্য বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কারিগরদের ওপর।শাঁখারিরা যে অর্থনৈতিক খাদে পড়ে আছে তার থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।কেউ ইচ্ছা করলেও এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না।কেউ আবার সালভর বাণীতেই কাজ করে মহাজনদের হয়ে।এই সব শাঁখারিদের বারোমাসই ঘরে ঘরে শিশুর কান্না আর বৃদ্ধের পরিতাপ শোনা যায়।শোনা যায় শাঁখারি বউদের কপাল চাপড়ানি আর শব্দহীন অশ্রু পতন।গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র সরমার মতো বিধবা, যাদের ব্যবসার পুঁজি নেই, তারা দৈনিক দশ-বিশ টাকা খাটিয়ে 'গেনি'তৈরি করে।'গেনি' চুড়িকে ঠাকুর শাঁখাও বলে।এই চুড়ি কেবলমাত্র পুজোর অর্ঘ্য হিসেবে কাজে লাগে। এছাড়া ছায়া, পুষ্প, আদরি, অন্নপূর্ণা, ফুলরানি এরাও সরমা দিদির মতো একজন।

এই সব শাঁখারি শাঁখচির দেরআপদে বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মতো লোক এক জনই আছে গ্রামে 'প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বংশী মাষ্টার।'গ্রামের সবাই মান্য করে, সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।গ্রামের একমাত্র বিদ্বান ইনি।বংশী মাষ্টার শিক্ষকতার অবসরে আস্ত বড় বড় শাঁখের ওপর নানা পৌরাণিক কাহিনির চিত্রের নানান কারুকার্জ করে থাকেন।যেমন মরীচি বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন, লবকুশকে অস্ত্রশিক্ষা

দিচ্ছে সীতা, সীতা হরণ, জটায়ুর আক্রমণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতার উপদেশ প্রভৃতি।বিভিন্ন সময়ে বংশী শঙ্খ শিল্পীদের প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো। এই জন্য বংশী মাষ্টার গরম্যান্টের ঘর থেকে অনেক গুলো সার্টিফিকেট পেয়েছে।গ্রামের অনেককে বংশী এই কাজে উৎসাহিত করে। হাটগ্রামের বেশিভাগ মানুষ লেখাপড়া না জানা, অচেতন।যার জন্য উৎকল পাইকার আর মহাজনের এখনো হিসাবের হেরফের করে শোষন জারি রেখেছে।শাঁখারিদের এবং তাদের ছেলেপুলেদের যে লেখাপড়ার প্রতি অনীহা আছে তা নয়।পেটের জন্য এক পাই অন্ন জোগাড় করতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে সদাতৎপর।তাছাড়া লেখাপড়া করবে কখন? অর্থের অভাব, বই - পুঁথি দেবে কে? ঘরে শিক্ষার পরিবেশ নেই।কারো কারো আবার অভিভাবক নেই।তাই পেটের দায়ে নিজেদের বন্ধক রাখে মহাজন বা পাইকারদের কাছে।আবার এরা খুব ভীতু, আনন্দপ্রিয়, সংস্কার বিশ্বাসী।কোথাও কোনো পুকুর সম্পর্কে, কোনো গাছ সম্পর্কে, ডুংরি সম্পর্কে এদের ধারণা এইগুলো ডাইন- ভূত - পিশাচের ডেরা ।আবার “শাঁখারি যদি পাইকার হয়, তাইলে তার ভর্তি টিনের সুটকেশ নিয়ে ঘরে ঢুকা চলবেক নাই।তাইলেই অভিশাপে পড়বেক।” গ্রামের কোনো বউ মানুষ সন্তান জন্ম দিতে না পারলেহাট গাঁয়ের পাশে এক সাধকের কাছে গেলেই কলঙ্ক দূর হয়।গাঁয়ের কালী তলায় পারুলের আরতির ভর হয়।সে পুজোর জন্য জবা ফুল চায়।আরতিকে মা কালী ভেবে পুজো করা হয়।গাঁয়ের লোক ছাড়াও আশেপাশে থাকে লোক আসতে আরতির কাছে ঝাড়-ফুক করাতে, অশান্তি দূর করতে।হাট গাঁয়ে অবস্থান হয় ‘আরতি কালীর’। সকলে আরতীকে দেবী মানতে থাকে।ভাদ্র মাসের ২৮ তারিখ থেকে চারদিন হাটগ্রামের শাঁখারিদের কাজকর্ম বন্ধ থাকে। চারদিন ধরে পূজা চলে ‘অগস্ত্য মুনির’।“হরিবোল / ঢাকের ঢোল! - দাও, দাও, একটা বিঁড়ি দিবে ত দাও।”

গত তিন বছরে হাটগ্রামের চেহারা পাল্টে গেছে। তাই বংশী মাষ্টার তেলুচরণকে বলে “হাটগাঁটা দেখতে দেখতে কেমন পাল্টে গেল! মন্দির ছিল নাই, মন্দির হৈল।বিজলি ছিল নাই, বিজলি হৈল।আ-র বড় জিনিস যেটা হৈল –‘চ্যারাই মিশিন’।” এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উঠলে সরমাদিদি একটাই বাক্য আউড়ে দেয় “যাইকে গাঁয়ে মিশিন ঢুকল, তাইকে সোব পাল্টে গেল!” গাঁয়ে ইলেকট্রিক আসার পর মহাজনের ঘরে ঘরে এখন শাঁখচেরায়ের মেশিন।কম সময়ে বেশি মাল তৈরি করা হয়।একজন কর্মী রাখলেই ঢের।তাই ভুবন লায়েকের মতো মহাজনেরা বলে “দেখ মেজিকের মতম কাজ হচ্ছে।”শাঁখারিদের বলে “কেমন যুগ পড়ে গেল, অহো! মডার্ন যুগ!” বলরাম নন্দকে

জানায়, “এখন মেশিন আনার পর থেকে ব্যাবসাটা একচেটিয়া তাদের হাতে চলে গেছে।শুধু টাকা রোজগারই করছে না, সেই সঙ্গে পুরো ব্যাবসাটার তারা মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে ওই মেশিন দিয়ে।তারা চাইছে মুনাফার কথা চিন্তা করে, শিল্পীর দরদ-ভালোবাসার কথা চিন্তা করে নয়, মেশিনটিকে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করে।কম মজুরিতে বেশি উৎপাদন।” বেকার হয়ে যাচ্ছে ‘কুশকরাত’।যা ছিল এতদিন শাঁখারিদের অহংকার।এই প্রচীন অহংকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে, কেউ কেউ পেটের জ্বালায় অপারগ হয়ে মহাজনের কাছেই কাজ করতে ঢুকছে।কিন্তু তখন সে শাঁখচির নয়, সাধারণ কর্মী মাত্র।মেশিন এসে শাঁখচিরের ‘কাজ’ জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছে।শাঁখা তৈরির কর্মটা এখন মেশিনে হয়ে যায়।গ্রামে মেশিন আসার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক ঘরে ঘরে ‘কুশকরাত’ চলত।প্রত্যেক ঘরে রেক থেকে মান্তাসা, চূড়, ব্রেসলেট, বোবি শাঁখা, বালি শাঁখা ইত্যাদি হত, অখন্ড শাঁখ থেকেশাঁখের পুরো কাজটাই হত।কিন্তু মেশিন আসার পর সেরকম আর হচ্ছে না।পাইকারও আর তেমন আসে না।তাই এখন শাঁখারীদের শেষ সম্বল ঐ ‘কুশকরাত।’এটাকে সন্তান স্নেহে আগলে রাখলেও গ্রামের বহু শাঁখারি তাদের পৈতৃক বৃত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে।“মিশিন আর মিশিন! আর ভুবন লায়েক! দুনিয়ায় আর মানুষ নাই?”

শশধরের কথামতো “গোটা শাঁখারি সমাজের এই মন্দার জন্য শুধু কি যন্ত্রই দায়ী?”উত্তর ‘না’।যন্ত্রের সঙ্গে সময়ও দায়ী।মানুষও।উৎকল পাইকাররা গ্রামে এসে বলাবলি করে আগে ছেলেরাও শাঁখের আংটি পরত, পাঞ্জাবিতে শাঁখের বোতাম লাগত, মেয়েরা চুলের ক্লিপ, শাড়ির ব্রোচ ইত্যাদিও কিনত উৎকলদের কাছ থেকে।কিন্তু এখন সুন্দর এইসব জিনিস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে।সে জিনিস শহর থেকে অজগ্রামেও ঢুকে যাচ্ছে।তাহলে মেশিনে উৎপাদিত জিনিস গুলো যাচ্ছে কোথায় ? যাচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে হোলসেলারদের কাছে।কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, হাজারিবাগ, গয়া, পাটনা চলে যাচ্ছে মালের পেটি।তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যত তাড়াতাড়ি শাঁখ শাঁখার সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, অন্য রাজ্যের মানুষ তত তাড়াতাড়ি নিজেদের সংস্কার মুক্ত করতে পারছে না।কারণ এখনও তাদের কাছে শাঁখা -সিঁদুর ত্রয়োস্ত্রীর শুভ চিহ্ন। শঙ্খধ্বনি তাদের ঘরে ঘরে, দেবালয়ে।

হাটগ্রামের শাঁখারি বা শাঁখচির জনগোষ্ঠী উৎখাত হয়ে আসছে সেই আদিকাল থেকে।পাঁচ পুরুষ আগের কথা - এদের আদিবাস ছিল সুপুর গ্রামে।হাটগ্রাম থেকে ১৫ মাইল দূরে।সেখানে শাঁখারিদের ঘর আর উঠান লাগোয়া ছিল ছোট ছোট

চাষবাড়ি।আশপাশ ছিল জঙ্গলে ভরা।একদিন এক হরিণশাঁখারিদের শষ্য খেতে আসে।উঠোনে কাজ করছিল শাঁখারি।‘দকনা’ নিয়ে ঘষছিল। হরিণের শষ্য খাওয়া দেখে শাঁখারি ক্রুদ্ধ হয় ।‘দকনা’ দাঁড়াকাঠটি ছুঁড়ে মারে হরিণের গায়ে।আহত হরিণ রাজার কাছে উপস্থিত হলে, রাজা বুঝতে পারে কারা একে আঘাত করেছে।রাজার রোষের খবর সুপুরে এসে পৌঁছায়।শাঁখারিরা তখন ভয়ে তাদের ছেলে পুলে, দড়িখোলা খাট, বিছানা, কাপড়ে বাঁধা শাঁখ, শাঁখের রেক, দকনা, আডুন, শান পাথর ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে।রাজার কানে শাঁখারিদের গ্রাম ত্যাগের খবর গেল।রাজা বলে – ‘টেকাও!’শাঁখারি গোষ্ঠী যখন হাট গাঁয়ের কাছে তখন রাজার লোক এসে খবর দিল।শাঁখারিরা বলল “না, আমরা যখন একবার সুপুর ছাইড়ে আইসেছি তখনকে আর সেখিনে যাব নাই।তবে হঁ, আমরা রাজার মুলুকেই থাকব। এই হাটগাঁয়ে।”সেই থেকেই এই হাটগাঁয়ে শাঁখারি গোষ্ঠীর বাস।বংশী মাষ্টার বলে “এই গল্পটা থেকে শাঁখারিদের মনে রাখা দরকার - তাদের শস্যহানি করছিল বলে তারা দাঁড়াকাঠ ছুঁড়েছিল।এখানে হরিণ হল অত্যাচারীর প্রতিনিধি, রাজা হল প্রকৃত অত্যাচারী, আর ওই দাঁড়কাঠটি হল অত্যাচারিত শাঁখারিদের প্রতিবাদের প্রতীক।কিন্তু সেই প্রতিবাদের পরিণতি কী হল? ক্ষমতাসীন রাজা রুষ্ট হল এবং দরিদ্র দুর্বল শাঁখারিদের উৎখাত হতে হল তাদের আদি বাসভূমি থেকে।”শাঁখারিরা, গল্পের গভীরতা যতটা - নায্য অধিকার থেকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রেক্ষিতে ততটা যেতে পারে না এরা।

ন্যায্য অধিকার নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে একবার মুখ খুলেছিল বলরাম ভদ্র।কিন্তু এই প্রতিবাদের পরিণতি হল বলরামের আকস্মিক মৃত্যু।গ্রামবাসী একদিন সকালে দেখল, বংশী মাষ্টারের বাড়ি যেতে রাস্তার পাশে খেজুর গাছের ঝোপে বলরামের দেহ পড়ে আছে।খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে দুঃস্থ শঙ্খ শিল্পীদের লোনদেওয়া হবে।১০হাজার টাকা।সরকার থেকে বলা হয়েছে এই লোনের অর্ধেক টাকা ফেরত দিতে হবে।বাকি অর্ধেক ছাড়।তবে অর্ধেক টাকা কখন বা কোন সময়ের মধ্যে দিতে হবে, সে বিষয়ে নিদির্ষ্ট করে কিছু বলা নেই।বিজ্ঞাপনের ৭ দিনের মধ্যে আবেদন পত্র হাটগ্রাম অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের কাছে জমা দিতে হবে।তবে লোনটি দেওয়া হবে শুধুমাত্র দুঃস্থ শঙ্খ শিল্পী বা কারিগরদের।শিল্পীরা আবেদন করল। দরখাস্ত লিখে দিল বংশী মাষ্টার।তবে আদিত্যচরণ, লক্ষীকান্ত, দিলীপ, পানু, ভুবন লায়েক প্রভৃতি মহাজনেরা আবেদন করেনি তা নয়।এইসব মহাজনেরা ঘরের বউয়ের নামে, ভাইয়ের নামে, ব্যাটার নামে - নামে কাগজ লিখে জমা করে

এল।সরকার থেকে লোন দেওয়া হল।তবে কিসের নিরিখে দেওয়া হল বোঝা গেল না।একজন দরিদ্র পেল তো অন্য দরিদ্র পেল না।মহাজনেরা বা যাদের ঘরে ঘরে মেশিন আছে তারা সবাই পেল।বলরাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে বলেছিল "এই শালা গরম্যান্ট লোনের নামে টাকাগুলো হরির লুট করে দিল।আমারা টাকাও পালি নাই, আমাদের ব্যাবসাও চৌপাট হয়ে গেল।"দরিদ্র শাঁখারিরা লোন পেল না আর যাদের ঘরে মেশিন রয়েছে তাদের দুজন করে বেনামে লোন পেয়েছে, যারা লোনের টাকায় ফুর্তি করছে, সুদে খাটাচ্ছে, কোন বিচারে এরা লোন পেল? এই সব অন্যায় কথা গুলো নির্ভীকভাবে প্রকাশ্যে বলরাম বলে আসে।পরেরদিন সকালে বলরামের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল খেঁজুর গাছের ঝোপে।

এর আগেও একবার জেলা পরিষদের মাল দেওয়া হয়েছিল৬৩৫ টাকার বস্তা।সরকার থেকে ঠিক করা হয় কম দামে কাঁচামাল জোগান দিয়ে শঙ্খ শিল্পীদের সাহায্য করা হবে।তখন বাজারে দাম ১৬০০ থেকে ৩৫০০ টাকা।১০০ পিস মানে এক বস্তা।সাইজ অনুযায়ী দাম।শাঁখারিরা কাঁচামাল কিনত হাওড়ার বাগনান বা কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে।মাল বেছে নেওয়ার কোনো উপায় ছিল না।যা বস্তাবন্দী থাকত তাই নিতে হত।গরীব শিল্পীদের পক্ষে এই মাল কেনা সম্ভব হতো না।ব্যবসা চালানো দুস্কর হয়ে পড়ত।তাই বাঁকুড়া জেলার শিল্পীদের কথা ভেবে সরকার থেকে মালের দাম ঠিক করা হয় ৬৩৫ টাকাবস্তা।মাল যাতে প্রকৃত শাঁখারিরাই পায় তার জন্য ইন্দপুর থানা মানে হাট গ্রামের থানা, বিষ্ণুপুর, কতুলপুর, ইন্দাস ইত্যাদি থানাওয়ারি এবং অভিজ্ঞ শঙ্খ বণিকদের প্রতিনিধি করা হল।কমদামে মাল পেয়েও শাঁখারিদের কোনো লাভ হল না।কারণ আদিত্য কুন্ড, ভুবন লায়েকের মতো দালালরা সরকারি ভালো মালের বস্তা সরিয়ে তার বদলে রদ্দি কমা মাল শঙ্খ শিল্পীদের দিত।ভালো মাল গুলো আলাদা বস্তায় রাখত।এর ফলে তেলুচরণ ভদ্র, নিমাই মন্ডল, মদন চরের মতো অন্যান্য গরীব কারিগরা মাল তোলা বন্ধ করে দিল।'সরকারের এই প্রকল্পটির ঝাঁপ পড়ে গেল!'

তেলুচরণের মতো বংশী মাষ্টারের আবার নতুন করে মনে হতে লাগল "দাঁড়াকাঠের এই মিথটি আজও সত্য হয়ে রয়েছে শাঁখারিদের জীবনে। শুধু শাঁখারিদের জীবনে কেন, সমস্ত নিম্নবর্গদুর্বল মানুষদের জীবনে।সময় পাল্টে গেছে, সমাজও পাল্টে গেছে,কিন্তু অত্যাচার তেমনিই রয়ে গেছে ।পাল্টে গেছে অত্যাচারের প্রতীক দাঁড়াকাঠটি।আজও শস্যনাশকারী হরিণের প্রতিবাদে দাঁড়াকাঠ ছুঁড়লে নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হতে হয় সর্বহারাকে। যেভাবে আজ নয় কাল উৎখাত হতে চলেছে তেলুচরণের

মতো শাঁখারিরা।যেভাবে উৎখাত হয়ে গেল শাম সেন। কেউ বৃত্তি থেকে, কেউ ভূমি থেকে।”

ভুবন লায়েক এখন এই অঞ্চলের প্রধান।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সে দাঁড়িয়েছিল।তার জেতার প্রধান কারণ হল বিশাল কর্ম বাহিনীএবং হাটগ্রামের জন্য প্রচুর প্রতিশ্রুতি।হাটগ্রামে ভুবনের নেতৃত্বে ‘হাটগ্রাম মৈত্রী সংঘ’ তৈরি হয়েছে।সংঘের সভাপতি ভুবন।মাধা সোনার টুকরো ছেলে, অখণ্ড গুনের অধিকারী।বামুন আর উৎকল দের ছেলেদের নিয়ে দল তৈরি করেছে।বীরত্বের নামে অপকর্ম করা তাদের কাজ।ভুবনের নেতৃত্বে এই দল পরিচালিত।নেশা করার টাকা না থাকলে পাইকারদের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায় করে।লোককে হুমকি দেয়।এছাড়া এই সংঘের দল খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত।হাট গাঁয়ের মানুষ নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রাথী হিসেবে বংশী মাষ্টারের নাম প্রস্তাব করেছিল।কিন্তু তার নাম জোর করে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।মাধার দল শাঁখারিদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসেছিল “মনে রাখবে, ভুবন খুড়া যদি জিতে, তাইলে পায়রাচালিতে হাসপাতাল আর আরতি কালী মন্দির বিল্ডিং হচ্ছেই।আর যদি না জিতে তাইলে ঘরে ঘরে হাসপাতাল।‘মাইক নয়ে প্রচারে বেরিয়ে জেতার আগেই ধ্বনি তোলে ‘হাটগ্রামের’রূপাকার ‘ভুবনখুড়া - জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ’!”নন্দ, তেলুচরণ, খাঁদু, পরেশ কুন্ডু আরও অনেকে মাধার দলের ভুবনখুড়ার জন্য আত্মবলিদানের উদ্দীপনা দেখে, এই নোংরা রাজনীতি থেকে বংশী মাষ্টারকে সরিয়ে নিল।

জীবনের অন্তিম পর্বে এসে বংশী হিসেব করে বসে নিজ কৃতকর্মের।আরতি কালী মন্দিরের উদ্যোগটি তার কাছে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়।বংশী চেয়েছিল “কোনও ছুতোয় হাটগ্রামের অসংগতি মানুষগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে।একটি ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে আসার জন্য আহ্বান জানাতে।পরের কাজ পরে।কিন্তু সেখানেও আড্ডা হল যত বাস্তুঘুঘুদের।” বংশী চেয়েছিল যাতে আরও বেশি করে সেই মানুষের সংস্পর্শে আসা যায়,আরও বেশি করে তাদের সুখ-দুঃখে - ক্লেশে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায়,তার জন্যই সে প্রার্থী হতে চেয়েছিল পঞ্চায়েতে।রাজনীতিতে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল এখানেও প্রকৃত শোষকরাই শোষিতদের প্রতিনিধিত্ব করে।অন্যদিকে গ্রামে এমন কিছু জিনিসের আমদানি হতে লাগল যা হাটগ্রামকে উচ্ছন্নের দিকে দিন দিন এগিয়ে নিয়ে গেল।“বংশীর মনে এই ধারণা উদ্ভাসিত হয় একদিকে চেরাই মেশিন, অন্যদিকে আরতিকালী মন্দির - এই দুটোই হল হাটগ্রামের

দুঃস্থ দরিদ্র শাঁখারিদের জীবনে প্রকৃত শাঁখের করাত।যতদিন অজ্ঞতা থাকবে, ততদিন এই করাত তাদের আসতে কাটবে, যেতেও কাটবে।”

সরমা দিদির মৃত্যুর পর বংশী ভেবেছিলে সরমার মেয়ে শিলীর বিয়েটা মোটামুটি জায়গায় দিতে পারলেই শান্তি।কিন্তু তা আর হল না।ঘর পরে থাকল।শিলী একদিন হাটগাঁ থেকে পালিয়ে গেল কাজল লায়েকের সঙ্গে।ব্যপারটা বোঝার পর বংশীর মনে হয় শিলী কিছু অন্যায় করেনি।কারণ “এই তো হাটগাঁ।এখানে থেকে কি করত সে? সে হয়ে উঠতো আর এক সরমা দিদি।কিংবা ছায়া, পুষ্প, আদরি, অন্নপূর্ণা, ফুলরানি।এর বেশি তো নয়? এখন এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে যদি সত্যি সে ভিন্নতর কোন জীবনের সন্ধান পায়, নিদেনপক্ষে একটু আলোও যদি পায়, তাহলে মন্দ কি?” সরমার মৃত্যুর পর শিলী মামা বংশীর আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে।নিজের স্বাধীনে বাঁচাতে চেয়েছিল।সরমার মহাজন বিষ্ণু লায়েকের কাছে কারবার করত। কাঁচামাল এনে তৈরি মাল পৌঁছে দেওয়া, সাদা মাল নিয়ে রঙ করে ফিনশিং মাল ফেরত দেওয়া, কুচি শাঁখা কিনে পেটলাল খিলান তৈরি করে হালকা দরে বিক্রি করা প্রভৃতি কাজ।এই সূত্রেই কাজলের সঙ্গে পরিচয়, সম্পর্ক গড়ে ওঠে।একটা সময় বস্তত, শিলীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেল।সে কিশোরী থেকেও আর কিশোরী থাকল না।নিজস্ব চেতনা জাগ্রত পেল “এই প্রথম সে টের পেল সমস্ত মানুষ ন্যায্যত টিকে থাকে তাদের আপন-আপন ক্ষেত্রে সংঘর্ষের মধ্যেদিয়ে, প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে।এবং এই সংঘর্ষে শেষমেশ নিজেকেই লিপ্ত হতে হয়।অস্তিত্বের এই লড়াইয়ে কেউই তার হয়ে লড়াই করে না।আরও আশ্চর্য হল, প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত এই সংঘর্ষের জন্য তাকে হাতিয়ারও কেউ যোগান দেয় না।তার হাতই হয়ে ওঠে হাতিয়ার।এই হাত দিয়ে পৃথিবীর শতশত অক্ষৌহিণী পীড়িত মানুষ অবিরাম বাজাতে চাইছে রণতূর্য।তারা আপন আপন সংগ্রামে রত।সংঘর্ষে রত।”

শাঁখারি বা শাঁখচির তথা শঙ্খ শিল্পীরা সমাজ ও সময়, রাজনৈতিক পরিবেশ, সমাজিক মানুষ, সর্বোপরি যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ-যন্ত্রনার কাছে সংঘর্ষে হারমেনে নিজ বৃত্তি থেকে সরে আসতে বাধ্য হল।যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে তারা যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।শুধু শাঁখারিরা নয়, এই ব্যবসার যুক্ত পাইকার, কর্মকার, কুশকরাত সারানোর ওস্তাদরাওনিজ নিজ বৃত্তি থেকে সরে এসে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করল।করাতের টাল ভাঙতে জানা মিস্ত্রি গ্রামে তিনজন ছিল।কালীপদ ভদ্র, সুভাষ ভদ্র,নাড়ু।বেশকিছু দিন ধরে গ্রামে কুশকরাতের সংখ্যা কমে আসছিল, কাজে মন্দা দেখাদিয়েছিল, তাদের বৃত্তিটি মার খাচ্ছিল।তাই এরা বাধ্য হয়ে পুরুলিয়া চলে

গেছে।কর্মকারেরা আগর কারখানায় কাজ নিয়েছে।এই করে তেলুচরণের কুশকরাতটাও বেকার হয়ে পরে।করাতের টাল ভাঙ্গার লোক নেই।আর ভাল করে মাল না ঘষলে মহাজনেরা মাল ফেরত পাঠায়।তেলুচরণের পরিবার আজ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।অন্নপূর্ণা তার ছেলেকে বলছে "হাই দেখ, গরম মাড় আছে টিনের থালাটায়।খাবি ত খা।গোগলি ভাজাটা লিস না।দুপহরে ভাত দিয়ে খাবি।"লাল্টু মাড়ের থালাটায় চুমুক দেওয়ার আগে করুণ স্বরে বলে "মা, বুনি খাবেক নাই? ভেন্ডি খাবেক নাই? আমি একাই খাব?" নকশা কাটার কাজ করতে করতে অন্নপূর্ণার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে।তেলুচরণের ভরা কাঁধে অন্নপূর্ণার শরীরটা পদ্মপাতার মতো 'তিরতির' করে কাঁপতে থাকে।ঘরের ভিতর তক্তার ওপর অন্নপূর্ণাকে শুইয়ে দেওয়ার পর চোখে জল আসে তেলুচরণের।মনে হল "দু-এক বছর নয়, এই তিরিশ-তিরিশটা বছর ধরে তার চোখের সামনেই আছে তার বউ।তবুও একদিনও সে তাকে তেমন করে লক্ষ্যই করেনি।পরের দিন হাটগ্রামের নামো পাড়ার ভূদেব ডাক্তার এল।কিন্তু একদিনের ভেতরেই অন্নপূর্ণার শরীর কাহিল হয়ে গেছে।যদিও এটা একদিনের রোগ নয়।আসলে অন্নপূর্ণা দীর্ঘদিন ধরে নিজের শরীরে রোগ পুষে রেখেছিল।বলেনি,কারণ রোগজ্বালায় মানুষের বিশ্রাম দরকার।ডাক্তার ওষুধসাথে পেটের খাবারও দরকার।কিন্তু তেলুচরণের তো কোনা ব্যবস্থায় নেই।"মহাজনের কাছে যতক্ষণ আছে, সে চেষ্টা করে গেছে সেই কাজটা সময় মতো করে যেতে।যাতে সংসারটা চলে।"ভূদেব ডাক্তার তেলুচরণের হাতে একটা লেখা খড়খড়ে কাগজ দিয়ে বলে "বুকের ফটো করাবি।প্রধান যদি লেখে দেই, তাহলে বিনা পওসায় ফটো তুলে দিবেক পায়রাচালি হাসপাতালে।"না, তেলুচরণ প্রধানের কাছে যাবে না।গুম মেরে বসে রইল।নির্বাক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সে বিচার চাইল, সমাধান চাইল।নজর গেল পড়ে থাকা কুশকরাতটার দিকে।তার মনে হল "বুনি - ভেন্ডি - লাল্টুর মতো কুশকরাতটিও অঝোরে কাঁদছে।"করাতটি কোলে নিয়ে সে বেড়িয়ে পড়ল বিক্রি করার জন্য।গ্রামের মাঝপাড়া থেকে উত্তরপাড়া সব শাঁখারির ঘর ঘর গিয়ে বলল "তিনশ না দিবে ত দুশো হলেও দাও? আমার বহুত দরকার।বউটা আমার মরতে বসেছে।"কিন্তু কে কিনবে এ জিনিস? কেউ নিতে রাজি হল না।কেউ মুখ ফুটে কথাও বলল না।"মৃত সন্তানকে কোলে আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে জননী, সেইভাবেই নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।"

হাটগ্রামে তেলুচরণের মতো নন্দ, নিমাই, খাঁদু, মথন,তরু, মালতি, সন্ধ্যা আরোও অনেকে আছে।যারা আজ তেলুচরণের মতো একই বধ্যভূমিতে দাড়িয়ে,

যেখানে প্রাণের কোনো ইশারা নেই।যেখানে এক অদৃশ্য বহ্নিমাণ শ্মশানচিতা তাদের শেষ জীবনটুকু ছিনিয়ে নিয়ে গ্রাস করতে ‘লকলক’করছে ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. রক্ষিত সৈকত, ‘স্তিমিত রণতূর্য’, গল্পসরণি, ৪ যশোহর রোড, দমদম, কলকাতা ৭০০০২৮, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪ ।

২. ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ সম্পাদিত, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯,চতুথ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৪ ।

৩. ভট্রাচার্য দেবাশিস, ‘বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা’, অক্ষর পাবলিকেশনস, ত্রিপুরা ২০১০ ।

৪. মিদ্দে সুরঞ্জন, ‘প্রান্তজনের সাহিত্যচর্চা’ নান্দনিক, ১০/১২ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ , প্রথম প্রকাশ : ৯ আগস্ট ২০১৯ ।

৫. সেনমজুমদার জহর , ‘নিম্নবর্গের বিশ্বায়ণ’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৭ ।

৬. রক্ষিত সৈকত, ‘প্লাস ওয়ান’,সম্পাদনা পলমল অরূপ, ‘কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, প্রথম প্রকাশ :কলকাতা বইমেলা ২০১৩ ,ডাভ পাবলিশিং হাউস,কলকাতা ৭০০০০৯, পত্রিকা।

৭. পাল শ্রাবণী সংকলন, ‘পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা’, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রোড, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ : ১৯ জুলাই ২০১১।

৮. মন্ডল দীনবন্ধু, ‘সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন’, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৫।

নজরুল কাব্যে পুরাণ ভাবনা

অরুনাভ মুখার্জ্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ, ঝালদা, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : *'নিখিল বাংলার চারণকবি' কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তা-চেতনাতে পুরাণ ভাবনার স্বরলিপি সুর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারে বারে। বিংশ শতাব্দীর এক অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা বুকে নিয়ে 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্য' এর মধ্যদিয়ে নজরুলের আবির্ভাব। বিদ্রোহ, প্রেম, মানবতা, উল্লাস, আবেগ-উন্মাদনা প্রকাশের অকুণ্ঠ প্রয়াসে তিনি এত সাবলীল ভাবে পৌরাণিক মিথকে ব্যবহার করেছেন, যা বহুল পরিমাণে আমাদের কাছে 'অ-চর্চিত'ই থেকে গেছে। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরল প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে পুরাণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে কীরূপ আত্মীকরণ করেছিলেন, সেই আপাত 'অ-চর্চিত' বিষয়কে 'চর্চার' আলোকে উদ্ভাষিত করতেই আলোচ্য রচনায় অবতারণা।*

মূলশব্দ : *সামূহিক চৈতন্য, উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত, বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া, শিবতত্ত্ব, ভূমিলীন মানবমহিমা, জীবনাদর্শ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, সমবায়ী ঐতিহ্য, জীবনবেদ।*

মূল বিষয় :

বর্তমান শতাব্দীর ছিন্নমূল, অস্তিত্বচেতন, দ্বন্দ্বজর্জর এবং সংগ্রাম-মুখর সময় প্রেক্ষিতে পুরাণ বা মিথ ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় সন্দেহ নেই। কারণ ব্যক্তি প্রতিভা অন্তর্গূঢ় সত্তায় ও অন্ধকার আবর্তনে শুধু নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান-ই বহন করে না, সৃষ্টি মুহূর্তে তাঁর হৃদয় হয়ে ওঠে সামূহিক চৈতন্যের আধার। পুরাণ এই সামূহিক চৈতন্যেরই অংশ – "একটি চেতনা, যা মানুষের কল্পনা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের সঙ্গে জড়িত। এতে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের আদর্শ সব মিলিয়ে এমন একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়েছে, কল্পনা যেখানে বস্তুভিত্তিক এবং প্রত্যয়গ্রাহ্য হতে পারে"[১]।

সাহিত্য রচনায় মিথ চেতনা তথা পৌরাণিক ভাবনার প্রয়োগ একটি বিদগ্ধ রীতি বলেই সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। সমকালীন জীবন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা যখন তার অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার রূপায়ণ অসম্ভব বলে মনে করেন, তখন

তিনি তাঁর অভীপ্সার প্রতিমান অন্বেষণ করেন মিথের মধ্যে - পুরাণ কাহিনীর মধ্যে। আধুনিক বাংলা কবিতাও পুরাণ কলার পরিচর্যায় পেয়েছে দেশকাল অতিক্রান্ত সর্বজনীন আবেদন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র অনুবাদ কর্ম, 'মঙ্গলকাব্য' বা 'পদাবলী সাহিত্যে' পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও, বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতেই পুরাণের ব্যাপক প্রয়োগে সমকালীন জীবন-যন্ত্রণা রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এর প্রয়োগ আরো বেশি মাত্রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাৎপর্যবাহী হয়ে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রানুসারী কবিকুলের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রভক্ত-প্রতিবাদী মোহিতলাল বা অপরাপর কবিদের রচনায় আমরা পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হতে দেখি। ভারতীয় পুরাণকল্পের বহুভঙ্গিম ব্যবহার এঁদের রচনায় সমৃদ্ধ শিল্পমূর্তি লাভ করেছে সন্দেহ নেই। তাৎক্ষণিক মুহূর্তে অনুভূত ভাবনার প্রতিমান অন্বেষণের প্রয়োজনে পুরাণের কাছে প্রত্যাবর্তন এঁদের রচনায় সঞ্চার করেছে এক নতুন মাত্রা।

পুরাণ হল প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিকতার লিপিবদ্ধ রূপ। "প্রকৃতপক্ষে পুরাণের জন্ম পুরাঘটিত এবং বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়"।[২] বলাবাহুল্য, এই হৃদ্যতা শিল্পসফল অভিব্যক্তি লাভ করেছে বাংলা সাহিত্যের অপর এক বিতর্কিত কবি-পুরুষ কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯ খ্রিঃ – ১৯৭৬খ্রিঃ) কবিতায়। বস্তুত কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যচর্চা শুরু হয় উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ভারতীয় ক্লীব ও জড়সমাজ পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে। স্বাভাবিক ভাবেই সমকালীন সমাজের ক্লীব নৈরাশ্যপীড়িত মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত বাঙালির চরিত্রে নজরুল পান নি তাঁর চৈতন্যলালিত বিদ্রোহী ও বলবান ব্যক্তিত্বের সন্ধান। উপনিবেশ শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষে সমকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন-জরাজীর্ণ-অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, ভগ্নপক্ষ-নৈরাশ্যমগ্ন-চূর্ণস্বপ্ন সমাজপ্রবাহ নজরুলের মানসগোচর হয়েছিল। ফলত সমসাময়িক জীবন ও সমাজ কাঠামোয় তাঁর মানসলোকধৃত ভাব-অভীপ্সার রূপায়ণ সম্ভব ছিল না বলেই তিনি একই সাথে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় পুরাণকথায়, হিন্দু এবং ইসলামী ঐতিহ্য, গ্রিক ও বাইবেলীয় পুরাণ-প্রসঙ্গ ইত্যাদিতে।

প্রথমেই উল্লেখ্য, মিথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান শর্ত হলো পুরাতন ঘটনা প্রসঙ্গের যুগপৎ নতুন ব্যাখ্যা এবং যথাযথ প্রয়োগ। "কবির সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর অতীত পুরাণের প্রসঙ্গকে আরোপ করে কবি যখন তাঁর বক্তব্যকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলেন, তখনই তা প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে"।[৩] কাজী

নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও এর বত্যয় ঘটেনি। এ কাজে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন আবাল্য। আমরা জানি, “নজরুলের কবিসত্তার অঙ্কুরোদগম লেটো গানের মধ্যদিয়ে। মাত্র এগারো-বারো বছর বয়সে রুজি-রোজগারের আশায় এবং নিজ স্বভাব বসত নজরুল পিতৃব্য বজলে করিমের সাহচর্যে যোগ দেন ‘লেটোর দলে’। নজরুলের কবিতা ও গান রচনার প্রকৃত সূতিকাগার এই লেটোর আসর। লেটো দলে থাকাকালীন-ই নজরুল লোক-ঐতিহ্য, লোককথা, লোকসঙ্গীত, বাউল, কীর্তন প্রভৃতির সাথে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।[৪] পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন আরবি ও ফার্সি চর্চার বৃহত্তর সুযোগ এবং ইকবাল ও ওমর খৈয়ামের কাব্যচর্চার রীতি প্রকরণ ও মেজাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে প্রেম ও প্রতিবাদের বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুটনে। নজরুলের কবিতা পড়তে পড়তে আমরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, তা হলো তাঁর রচনায় ইসলামী অনুষঙ্গের চেয়ে হিন্দু পুরাণ প্রসঙ্গই ব্যবহৃত হয়েছে অধিক। আমরা জানি, হিন্দু ধর্মে ও হিন্দু পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস তিনি একই সাথে সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা। নজরুলের সাহিত্যে এই শিবতত্ত্ব তথা শৈবভাবের কথা বারবার উঠে আসতে দেখা যায়। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’তে শিব নিম্নোক্ত চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত। যেমন – ‘মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে’, ‘মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ’, ‘আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর’, ‘আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!/ আমি ব্যোমকেশ, ধরি’ বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর’, ‘আমি পিনাক-পাণির ডমরু-ত্রিশূল’ ইত্যাদির মধ্যে শিব কখনো সংহারক, কখনো প্রতিবাদী, আবার কখনো বা সৃষ্টির দেবতা। ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাতেও কবি শিবকে একাধারে প্রলয়পাগল ও নবউন্মেষের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছেন। এখানে নটরাজ-এর নৃত্যপর চিত্র নজরুল রূপায়িত করেছেন এইভাবে -

i) “আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙলো আগল!”

ii) “ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!”

iii) “দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!”

iv) “এবার মহানিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে

করুন বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,"

v) "তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে –
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
কাল ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর!"

লক্ষণীয়, উদ্ধৃতাংশগুলিতে নটরাজ শিব নজরুলের অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার যথাযথ প্রতিরূপক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। জীর্ণ-পুরাতন জীবনধারা, ক্লীব, ভীতি-শাসিত ও উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল পৌরুষহীন জরাক্রান্ত সমকালীন সমাজের ধ্বংস কামনা করে, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন সমাজ গড়ার জন্য তিনি যুব শক্তির উদ্বোধন কামনা করেছেন পুরাণকথার শিবের বিশাল দিগন্তের পটভূমিতে। অনুরূপভাবে দেখি, 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায় নজরুল তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তীব্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে শৈবভাবের আশ্রয় নিয়েছেন এইভাবে–

i) " গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে!"

ii) "আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!"

iii) "বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে"।

আবার 'পূজারিণী' কবিতার কবিপ্রিয়ার বিরহ ব্যথায় বিচলিত হয়ে ওঠার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে শিবকে আশ্রয় করে নজরুল যেমন লিখেছেন –

"হেম-গিরি-শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা কণ্ঠে হায়, ...
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়েতোর পেতে পুনরায়!"

তেমনি আবার ছলনাময়ী নারীর কথা বলতে গিয়ে ক্রোধে মনকে বিরুদ্ধাচারণ করতে আহ্বান জানিয়ে নজরুল লিখেছেন -

"জ্ব'লে ওঠ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালা সম ধক-ধক,
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা
অনন্ত পাবক"।

কিন্তু পরক্ষণেই কবি প্রেমের শাশ্বত মৃত্যুঞ্জয়ীরূপকে ব্যক্ত করেছেন এবং তাও আবার মহাদেবকে মিথ হিসেবে তুলে ধরেই -

"অমর হইয়া আছে - রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকন্ঠ কবি!"

'মানুষ' কবিতায় কবি নজরুল মানুষের বেশে ঈশ্বরের প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে পুরাণ প্রসঙ্গকে বারবার ব্যবহার করে আমাদের সুপ্ত চেতনায় আঘাত করে বলেছেন -

"ও কে? চন্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা ব'লে করো ঘৃণা!
দে'খো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি-না! ....
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলানাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!"

নজরুল শুধু শিবের মিথকেই ব্যবহার করেন নি, শিবের সাথে সাথে সৃষ্টির পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণু, বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, বাগদেবী সরস্বতী, শক্তিরূপিণী দুর্গা, জমদগ্নীর পুত্র পরশুরাম, ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক ভৃগু, 'স্বর্গ-বেশ্যা ঘৃতাচীপুত্র মহাবীর দ্রোণ', কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ', ক্ষমাহীন ঋষি দুর্বাসা, বিষাদিনী শকুন্তলা,' অত্যাচারী কংস প্রভৃতির পৌরাণিক প্রসঙ্গের বিস্ময়কর ব্যবহার ঘটেছে নজরুলের কাব্যে। এই সব কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ও গ্রিক পুরাণ একত্রীকৃত। 'ধূর্জটি' হলেন শিব, এখানে শিবের ধুম্রবর্ণ জটা চিত্রিত। 'হোমশিখা' কথার মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক ঘৃতনিক্ষিপ্ত অগ্নির শিখার রূপ ফুটে উঠেছে। 'জমদগ্নি' হলেন জনৈক ঋষি, পরশুরামের পিতা, কামধেনুর অধিকারী। তিনি আবার সাগ্নিক। কেননা তিনি তাঁর পুত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন মাতা রেনুকাকে হত্যা করার জন্য এবং কামধেনুর জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। 'বোরবাক' হলো স্বর্গের পক্ষীরাজ, 'উচ্চৈঃশ্রবা' হল ইন্দ্রের ঘোড়া, সমুদ্রমন্থনে এর উৎপত্তি। 'পরশুরাম' বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, 'বলরাম' বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। 'ভৃগু'

বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর পিতা, ধনুর্বিদ্যার বিদ্যার প্রবর্তক। এঁর কাহিনীটি হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর - এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা জানবার জন্য মুনি-ঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে যান, তাঁকে ইচ্ছে করেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে তুষ্ট করে তারপর ভৃগু শিবের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইচ্ছাপূর্বক অসম্মান করায় তিনিও ক্ষুব্ধ হন। শিবকে শান্ত করে তিনি বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে দেখেন বিষ্ণু নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছেন। ভৃগু তাঁর বক্ষদেশে পদাঘাত করায় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাগ্রত হয়ে বিষ্ণু রাগ করা দূরে থাক, ভৃগুর পায়ে ব্যথা লেগেছে কি না জানতে চান। ভৃগু তখন স্থির করেন দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। - এইসব পৌরাণিক কাহিনী থেকে এক একটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে নজরুল তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে যাত্রা করেছেন।

শুধু তাই নয়, ইত্যাদি অনুষঙ্গের নবতর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও আমাদের বিস্মিত করে। যেমন 'বারাঙ্গনা' কবিতায় নজরুল সমাজে যারা পরিত্যাক্তা, সেই পতিতাদের প্রতি মাতৃত্বের অপরিসীম মমত্ববোধ প্রকাশ করতে পুরাণকে দৃষ্টান্ত করেছেন এইভাবে-

"স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায় –
তাঁদেরই পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়!
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময় জন্ম যাঁহার – মহাপ্রেমিক সে যীশু!- .....
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি? ....
শুন ধর্মের চাঁই –
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়"।

নারীদের নারীত্ব সর্বাবস্থাতেই অক্ষুন্ন থাকে, পতিতাদের মধ্যেও হৃদয়ের মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য রয়েছে। সামাজিক বিচারে কলঙ্কিনী নারীও প্রেমের একনিষ্ঠার মধ্যদিয়ে

সতীত্বের মর্যাদা পাবার যোগ্য - একথা নজরুল পুরাণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে পরিস্ফুট করেছেন। আরো একটু এগিয়ে বলা যেতে পারে, নজরুলের মনোচৈতন্যের অভীপ্সার রূপায়ণ মিথ সহযোগেই প্রাণ পেয়েছে। বর্তমানকে তিনি পুরাণের ঘেরাটোপ পরিয়েছেন। তাঁর ভাবনার প্রতিমান তিনি প্রায় প্রতিটি কাব্যেই খুঁজে পেয়েছেন পুরাণ উৎসে।

শুধুমাত্র হিন্দু পুরাণ-ই নয়, ইসলামিক ঐতিহ্যপ্রীতিতেও নজরুল সাহিত্য ঐতিহ্যঋদ্ধ। ইসলামিক জীবন অনুষঙ্গ, ধর্মীয় রীতিনীতির উল্লেখ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার নতুন ও পুরাতন ইতিহাসের ব্যবহার করেছেন নজরুল তাঁর অজস্র কবিতায়। কেবল ধর্মীয় সংস্কার জড়িত শব্দ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আরব ভূখন্ডের স্থান-নাম বিন্যাসের অদ্ভুত কৌশলে নজরুল অবিশ্বাস্য গাম্ভীর্যে সাধারণ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান পাঠকের বোধাতীত সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। ‘বিষের বাঁশী’র ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম’এ কবি যখন বলেন –

“উরজ য়্যামেন নজদ হেজাজ তহমা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারান-স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে সাল্লাল্লাহ আলায় হি সাল্লাম”।

তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ‘উরজ’ থেকে ‘তিরহান’ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার এক একটি অঞ্চল মাত্র এবং এর শেষ অংশে যে বাক্যটি রয়েছে, ‘তাঁর ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর শান্তি ও করুণাধারা’। এই শান্তিবাণী মুসলমানেরা হজরত মহম্মদের নাম উচ্চারণ মাত্রেই পাঠ করেন। নজরুল এই পুরাকথাকে কাব্যের আঙিনায় নিয়ে এসে এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আবার পরাধীন জাতির ভূমিলীন মানবমহিমাকে মহিমান্বিত গৌরবের অধিকারী করতে চেয়ে কবি ঘোষণা করেছেন -

“খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!”

একইসাথে ‘ইস্রাফিল এর শিঙ্গা’, ‘তাজি বোররাক’, ‘জিব্রাইল’, ‘হাবিয়া দোজখ’, ‘জাহান্নাম’, ‘বেহেশত’, ‘শোহরত’, ‘আব’, ‘জমজম’, ‘জুলফিকার’ - প্রভৃতি ইসলাম পুরাণ বাহিত শব্দ ব্যবহারে নজরুল আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বি শিল্পী। নজরুলের ‘উমর ফারুক’, ‘এ মোর অহংকার’, ‘চক্রবাক’, ‘তুমি মোরে ভুলিয়াছ’, ‘সন্ধ্যা’, ‘ভোরের সানাই’, ‘যৌবন জল-তরঙ্গ’ প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় ইসলামী অনুষঙ্গের পাশাপাশি হিন্দু মিথের গভীর সংস্থাপনে তাঁর পৌরাণিক মানসিকতার পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। যদি

তাঁর ‘রীফসর্দার’ কবিতাটি একটু বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব এখানে কৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের শিকার আফ্রিকার বন্দীত্ব ও মৃত্যুবরণকারী মরুকেশরী রীফসর্দারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বারে বারে কবি ইসলামের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন, উঠে এসেছে কামাল, আমানুল্লাহ প্রমুখের কথা। -

“কাঠ মোল্লার মৌল বীর
যুনদানে ইসলাম কয়েদ।
আজো ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরই বরে, মোজাদ্দেদ”।

এখানে “মোজাদ্দেদ’ শব্দটির মূলে রয়েছে আরবি শব্দ ‘মুজাদ্দিদ’ - অর্থ হলো ধর্ম সংস্কারক। ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ও উদ্দীপনা দানকারী সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ। আবার ‘কাঠমোল্লা’ হলেন অর্ধ-শিক্ষিত অন্ধসংস্কারবদ্ধ মোল্লা” - যাদের ওপর নজরুল চিরকাল খড়গহস্ত ছিলেন। এছাড়াও এখানে রয়েছে ‘কারবালা ফোরাত’, ‘জয়নাল আবেদিন’, ‘এজিদ’ প্রমুখের প্রসঙ্গ। ‘বাংলার আজিজ’ কবিতাতেও নজরুল ইসলাম ধর্মের দুর্দিনের প্রেক্ষিতে আজিজের বীরত্ব, সমাজসেবা ও হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী-প্রয়াস প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে কোরাণ, আল্লাহু আকবর, গোরস্থান, মোয়াজ্জিন, আজান প্রভৃতি ইসলামী প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এদিক থেকে উর্দু কবি ইকবালের জীবনাদর্শের সঙ্গে নজরুলের গভীর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। ‘ইংরেজদের পদানত, পরাধীন, সংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন ইকবাল’। নজরুলও সমকালীন ও পূর্ববর্তী মুসলিম ঐতিহ্যের প্রাণময় প্রয়োগসূত্রে সমকালীন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের গৌরবময় পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন। ‘কামালপাশা’, ‘আনোয়ার’, ‘রণ-ভেরী’, ‘মোহররম’, ‘কোরবানী’, ‘শাত-ইল-আরব’, ‘খেয়াপারের তরণী’ প্রকৃতি কবিতায় মুসলিম পুরাণের অবাধ ও নিষ্কুণ্ঠ প্রয়োগ ঘটেছে। ইউরোপীয় মিথের রূপায়ণে কবি তাঁর ‘সাম্যবাদী’ কাব্যের ‘নারী’ কবিতায় লিখেছেন -

“কখন আসিল ‘প্লুটো’ যমরাজ নিশীথ পাখায় উড়ে
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে!
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরি’
মরণের পুরে, নামিল ধরায় সেই দিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি’

আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!”

এখানে গ্রিক-রোমান পুরাণের পাতালাধিপতি প্লুটোর সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পুরুষকে সমীকৃত করেছেন নজরুল। “প্লুটোর মতোই আধুনিক পুরুষেরা যমরাজ, অন্তঃপুর নামক পাতালপুরীতে তারা নির্বাসিত করেছে নারী সমাজকে। মূলত আলো, নম্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক নারীকে বিবর বন্দী করলে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই বিভাবরীর অন্ধকার নেমে আসবে। নজরুল যক্ষপুরীর মতো অন্তঃপুরের অন্ধকারের বন্ধন ভেঙে নারী সমাজকে সবলে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। চুড়ি বন্ধনেরই প্রতীক-চিহ্ন এবং এখানে সেই বন্ধন ভাঙার আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে পাশ্চাত্য পুরাণের রূপকাবরণে”।[৫] শুধু তাই নয়, নজরুলের ক্ষেত্রে এইসব পৌরাণিক শব্দবন্ধের ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়েছে এক নস্টালজিক অনুভূতি।

আবার শুধুমাত্র বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, প্রেম প্রসঙ্গে - রোমান্টিক অনুভবের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যানুসরণ - পুরাণের মিথকল্পকে ব্যবহার নজরুলের স্বভাবধর্ম। তাইতো তিনি ‘রণতূর্য’-এর পাশাপাশি গ্রীক পুরাণের ‘অর্ফিয়াসের বাঁশরী’-কেও সমান মর্যাদায় স্থাপন করেছেন। শকুন্তলা, দময়ন্তী, কামরতি-র সাথে সাথে লায়লা-মজনু, শিরি-ফিরহাদ, মমতাজ-নুরজাহানকেও চিত্রিত করেছেন। বস্তুত বাঙালির সমবায়ী ঐতিহ্যকে তিনি বিস্মৃত হন নি; হিন্দু-মুসলিম উভয় পুরাণের মিশ্র প্রয়োগে তিনি সমকালীন ও আধুনিক জীবনবেদ রচনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বেগম আক্তার কামাল, ‘বিষ্ণুদের কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ’, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ৩

২. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, সম্পাদিত ‘আধুনিক কবিতার ইতিহাস’, বাকসাহিত্য, ১৯৬৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ২০৩

৩. লায়েক আলি খান, ‘নজরুল প্রতিভা’, শিক্ষণ, তৃতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা - ২০৫

৪. মুখার্জ্জী, অরুণাভ, ‘নজরুল চেতনায় রবীন্দ্রনাথ’, অংশুমান প্রকাশন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৪২০, পৃষ্ঠা - ৩৩

৫. মাহবুব সাদিক, ‘মিথ-ঐতিহ্যচেতনা এবং নজরুলের কবিতা’, ‘শিল্পতরু’, ‘নজরুল সংখ্যা’–১৯৯০, প্রধান সম্পাদক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ঢাকা - ১২০৫, পৃষ্ঠা – ৫৮

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ঔপনিবেশিক বাংলায় সংস্কৃতচর্চা: একটি স্বল্পচর্চিত অধ্যায়

প্রীতম গোস্বামী
পিএইচডি রিসার্চ স্কলার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *বর্তমান প্রবন্ধটি ঊণবিংশ শতকের এক প্রায় বিস্মৃত চরিত্রের উপনিবেশিক রাজধানীর বুকে বসে সংস্কৃত জ্ঞানানানুশীলনের প্রচেষ্টার অনুসন্ধান। উপনিবেশিক আমলে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের অনুগ্রহপুষ্ট নব্য ইংরাজী শিক্ষিত গোষ্ঠী যখন সংস্কৃতচর্চাকে অবজ্ঞেয় এবং পশ্চাতগামী বিদ্যাচর্চা হিসাবে দেখছিলেন ঠিক তখনই নব্য ইংরাজী শিক্ষার আঁতুড়ঘর হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজের পাশেই সংস্কৃত কলেজে কি প্রকার বিদ্যাচর্চা হচ্ছিল তার একটি বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে এই কলেজের জ্ঞানচর্চার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তিত্ব তারানাথ তর্কবাচস্পতির শাস্ত্রচর্চার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতরা আধুনিকতার বাধ্যবাধকতায় কিভাবে মুদ্রণের এবং আধুনিক সম্পাদনের সুযোগগুলিকে তাঁদের জ্ঞানপরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছিলেন তার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং Alexander Cunningham এর উদ্যোগে Asiatic Society of Bengal প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণ এবং সম্পাদনের মাধ্যমে যে Asiatic Research শুরু করেন তার পাশাপাশি এক বৈকল্পিক মুদ্রণ ও সটীক সম্পাদনের কাজ চলছিল সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের হাত ধরে যা এতাবৎ অনেকাংশে অনালোচিত থেকে গেছে। শাস্ত্রাধ্যায়ী তারানাথ তর্কবাচস্পতির পাশে থেকে যান একজন ব্যাবসায়ী এবং সমাজ সচেতন তারানাথ যাঁর পরিচয়েও স্থানাভাবের কারণে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে।ঊনিশ শতকের প্রাচীন ও নবীনের দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে সংস্কৃত পণ্ডিতের জ্ঞানজগত কি প্রাগাধুনিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রয়ে গেছিল না তার মধ্যে দিয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি এক বৈকল্পিক আধুনিকতার সেই জিজ্ঞাসাই বর্তমান প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখকের উদ্দিষ্ট।*

সূচক শব্দ : *তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চা, মধ্যবিত্ত সমাজসংস্কার, সংস্কৃত কলেজ, বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন।*

ভূমিকা

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঊণবিংশ শতাব্দীর বাংলার অত্যন্ত জটিল, বহুমাত্রিক এবং পারস্পরিক বৈপরীত্যে দীর্ণ সমাজ এবং জ্ঞানজগতের (cognitive paradigm) স্বীকৃত কিন্তু অসমাদৃত চরিত্র। সাধারণ আলোচনায় তাঁর নাম তো উঠে আসেই না বিদ্যাচর্চার জগতেও তিনি এক দ্বিচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলেই উল্লিখিত হন যিনি বহুবিবাহ রদ আইন পাসে প্রথমত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে পরে তার বিরোধিতা করেন। ঊনিশ শতকের বিচিত্র ও পারস্পরিক বিরোধিতার যুগের এক অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ এই চরিত্রটির মুল্যায়নও সহজ, একবর্ণীক নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে মধ্য-অন্ত ভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ও ইংরাজি শিক্ষা ক্রমশই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্গের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছিল। শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রেই নয় জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা একপ্রকার সর্বমান্যতা এবং বলা যায় একমাত্রিকতা পেয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণী জ্ঞান ও চিন্তাজগতে সংর্বাপেক্ষা বিপন্নতার এবং ক্রমে শতকের শেষ ভাগে প্রায় অবিচ্ছিন্ন অবজ্ঞার স্বীকার হচ্ছিলেন তাঁরা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একেবারেই ইংরাজি জানতেন না)। Brian A. Hatcher তাঁর Whats Become of the Pandit? Rethinking the condition of the Sanskrit scholars in Colonial Bengal প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই ধীরে ধীরে কার্যকরী ও অর্থোপায়ী শিক্ষা হিসাবে এই পণ্ডিতদের প্রচলিত টোল শিক্ষা অকৃতকার্য হতে থাকে। কোম্পানীর সৃষ্ট বিভিন্ন পদ যথা সিভিল কোর্টে হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র বাখ্যাতা জজপণ্ডিত, আমিন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষক ও মুন্সী, বিভিন্ন অ্যাংলো-ভার্নাকুলার কোম্পানীর বিভিন্ন আইনগ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা (যেমন Nathaniel Halhed এর Code of Gentoo Laws প্রণয়নে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদ ভঙ্গার্ণব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহায়তা করেন) এবং বিভিন্ন অনুবাদ কার্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাঁদের অর্থোপার্জনের সুযোগ দানের প্রচেষ্টা করা হয়।[১] ঔপনিবেশিক কলকাতায় বিভিন্ন সময় কায়স্থ ও অন্যান্য সৎশুদ্র ধনীরা যে সমস্ত অনুবাদের কার্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন সেগুলির অনেকগুলিতেই এই সংস্কৃতজ্ঞরা সহায়তা করেন যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব সঙ্কলিত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুম বা কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত সম্পূর্ন মহাভারতের গদ্যানুবাদ বা ঐ একই উদ্যোগ যা নিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি

ও পরে আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া একাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং আমাদের আলোচ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি পুস্তক প্রকাশ, সংস্কৃত পুথির সটীক মুদ্রণ ছাড়াও নানা প্রকার ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এ সকল ছাড়াও মূলতঃ বিদ্যাজীবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা ঔপনিবেশিক রাজধানীতে দুটি কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতরা মূলতঃ নবাগত ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষাদান, দেশজ ভাষা পরীক্ষকের কাজ এবং ফোর্ট উইলিয়ামের ছাত্রদের জন্য বাংলা গদ্য পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আর্মহার্স্টের ও সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবেত্তা হোরেস হোম্যান উইলসনের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ঔপনিবেশিক কোলকাতার সংস্কৃত চর্চার এই শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা অধ্যাপনা, গ্রন্থাগারিকতা, পুস্তক সম্পাদনা এমনকি শেষে অধ্যক্ষতাতেও নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের আলোচ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতির কর্মজীবনের সৃষ্টিশীল শ্রেষ্ঠাংশ এই বিশেষ কলেজেই (১৮৪৫-১৮৭৪) অতিবাহিত হয়। তারানাথের জীবন ও সমকালের আলোচনায় ঔপনিবেশিক এই পটভূমি ও সংস্কৃত কলেজের ভূমিকার কথা মনে রাখতে হবে।[২]

তারানাথের বাল্যকাল ও শিক্ষাপর্ব: টোল ও 'কালেজীয়' ধারার সমন্বয়

তারানাথ অম্বিকাকালনায় 'বাঙ্গাল ভট্টাচার্যের গোষ্ঠী' বলে পরিচিত এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত বংশে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে (তারাকান্ত তর্কভূষণের মতে ১৮০৬) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালিদাস সার্বভৌম (যিনি বর্ধমানের জজপণ্ডিতের কাজও করতেন) কালনায় স্থায়ী ও বৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন ও ঊনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতেও তা ছাত্রপরিপূর্ণ ছিল। তারানাথের বাল্যশিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সুপণ্ডিত অধ্যাপক পিতার সতর্ক তত্ত্বাবধানে সূচনা হয়। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের (১৮৩০) আগে তারানাথের বাল্যশিক্ষা তৎকালিক পাঠশালা ও টোলের শিক্ষাব্যবস্থার এক নিখুঁত চিত্র। টোলে প্রবেশ করে ব্যাকরণ শিক্ষার পূর্বে ছাত্ররা বাংলা লেখা পড়া শিখে আসত। তারাধন তর্কভূষণ বলছেন যে তারানাথ বাল্যে তালপত্রে লেখা অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণমালা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, শতকিয়া, বুড়কিয়া, পণকিয়া, দশকিয়া,সেরকিয়া ও পশুরি শেখার পর তাঁর পিতা কালিদাস সার্বভৌম তাঁকে হস্তাক্ষর উন্নতির জন্য বিভিন্ন পত্রের নকল করতে ও মৌলিক পত্র লিখতে শেখান।[৩] শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে তারানাথ এই 'বাংলা লেখাপড়া' শেখেন খোঁড়া কৃষ্ণমোহন নামে এক গুরুমশাইয়ের

পাঠশালায়। তারপর দশম বছরে উপনয়ন দিয়ে কালিদাস তাঁকে নিজের টোলে প্রথমে একবছর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রথমে আবৃত্তিপাঠ ও পরে ব্যাখ্যাপাঠ অধ্যয়ন করান ও তারপরে অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের পাঠ দেন। এছাড়াও তারানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র তারিণীচরণ ন্যায়রত্নের কাছে (যিনি বর্ধমানের জজপণ্ডিতী ও সদর আমিনী কাজে নিযুক্ত ছিলেন) কালিদাসের কুমারসম্ভব ও মাঘের শিশুপালবধ পাঠ করেন এবং শাস্ত্রালোচনা ছাড়াও মানসাঙ্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৪]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারানাথ তাঁর পিতৃবন্ধু ও তৎকালিক সংস্কৃত কলেজের অন্যতম পরিচালক রামকমল সেনের নির্বন্ধাতিশয্যে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁর প্রিয় ছাত্র ও তাঁর সঙ্গে প্রায়শঃ আলোচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে তুলনায় দেখা যাবে যে তারানাথ তাঁর চেয়ে অনেক পরিণত বয়েসে এবং অনেক বেশী সংস্কৃত শিক্ষা নিয়ে কলেজে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত ব্যাকরণের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট না হয়ে তিনি সরাসরি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কাছে অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। অলঙ্কারের শ্রেণীতে থাকাকালীনই তারানাথ কাব্য অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে কাব্য শ্রেণীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং বহু অমুদ্রিত কাব্য স্বহস্তে লিখে নেন। এরপর অলঙ্কার অধ্যয়নের সময়েই বীজগণিত ও লীলাবতী শিক্ষা করে জ্যোতিষ-গণিত অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রের কাছে গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায়, সূর্যসিদ্ধান্ত, খগোল ও গোলাধ্যায় অধ্যয়ন করেন। এই সময়ই তিনি সংস্কৃত কলেজে পশ্চিমভারতীয় অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রীর কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি যে তারানাথের অতিদ্রুত বহুশাস্ত্র পাঠ দেখে নাথুরাম বলতেন 'তারা তু পবন এব'। ১৮৩১ সালের ১০ই মে তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়ে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নিমচাঁদ শিরোমণির কাছে ন্যায় অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি বৃদ্ধ নিমচাঁদ শিরোমণিকে এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদিত মহাভারতের প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেন এবং মহাভারতের এই সম্পাদনা মূলতঃ তাঁরই কীর্তি। ন্যায়ের শ্রেনীতে পাঠকালীনই তিনি শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে যথাক্রমে বেদান্ত ও স্মৃতির শ্রেণীতে পাঠ নেন এবং ষড়দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করেন ।[৫] এই সময়েই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ বিষয়ক বহু গ্রন্থ হাতে লিখে নেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর এই সময়েই পরিচয় ঘটে এবং তিনি নিজে ঈশ্বরচন্দ্রকে বহু তর্কসভায় পূর্বপক্ষ করান। ন্যায়ের শ্রেণীতে থাকাকালীন তিনি অলঙ্কার শ্রেণীতে

অধ্যাপনার জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হয়েও গ্রহণে বিমুখ হন। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই যে তারানাথ পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণাধ্যাপক রূপেই খ্যাতি পান। সিদ্ধান্তকৌমুদীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ থেকে শুরু করে শব্দরত্নাকর, শব্দস্তোমমহানিধি ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ যে সমস্ত কাজে তারানাথ বিখ্যাত হন তার প্রায় সমস্তই ব্যাকরণ বিষয়ক।কিন্তু তারানাথ কখনোই কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে পাঠ করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি তাঁরে পিতার টোলের ধারাটির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করেন বলা যায়। তারাধন তর্কভূষণ জানিয়েছেন যে তারানাথের ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জনের পর কাব্য, অলঙ্কার ইত্যাদিকে অত্যন্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। তারাধন যেভাবে এই সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাকে সমর্থন জানান ও কাব্যকে শিশুশাস্ত্র বলে উল্লেখ করেন তাতে গোঁড়া সংস্কৃত পণ্ডিতের স্বভাবধর্ম ফুটে উঠেছে এবং কেন পণ্ডিতদের বিচারধারা আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষিত ধারায় হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল তা বোঝা যায়।[৬]তবে তারাধনের এই বক্তব্যের সাথে মতপার্থক্য দেখা যেতে পারে যেহেতু তারানাথের সটীক সম্পাদনার তালিকায় বহু কাব্য ও নাটক আছে যার মধ্যে ভারবী, মাঘ ও মুদ্রারাক্ষস সবিশেষ উল্লেখ্য। ১৮৩৫ সালে তারানাথ কলেজ ত্যাগ করেন এবং এডুকেশন কাউন্সিলের দ্বারা তর্কবাচস্পতি(১৫ জানুয়ারী) উপাধি পান। ১৮৩৬ সালে তারানাথ প্রাচীন স্মৃতিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জজ পণ্ডিত পদের উপযুক্ত বিবেচিত হন। ১৮৩৮ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র তারিণীচরণ ন্যায়রত্নের পরলোকগমনের পর তারানাথকে ঐ পদের জন্য নির্বাচিত করা হয় কিন্তু ঐ সময় জজপণ্ডিতের পদ উঠে গিয়ে শুধু সদর আমিনী পদ থাকে যা তারানাথ নিতে অস্বীকার করেন। ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার সাথে আপোষ না করার ও তার বিরুদ্ধাচারী প্রথাগত পেশার প্রতি আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পাই তারানাথের জীবনে।[৭] ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ বারানসীতে হনুমান ঘাটের কাছে পরমহংস বিশ্বনাথ স্বামীর কাছে শ্রীহর্ষ রচিত দুরূহ ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম অধ্যয়ন করেন। তারপর বারানসীর অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে সভাষ্য বেদবেদান্ত, মহাভাষ্য সহিত পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী, সাংখ্য, বেদান্ত এবং জ্যোতিষের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন ।[৮] এ কথা উল্লেখযোগ্য যে এর কয়েক বছর পর যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ বেদ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রদের বারানসী পাঠান, তখন সাম্পদায়িক পণ্ডিতরা বাঙালী ছাত্রদের বেদ পাঠ দেন নি। উপনিষদ পাঠে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁদের ফিরে আসতে হয়।[৯]কাশীতে থাকাকালীন তারানাথ মৎস্য মাংস, সিদ্ধ চাল এবং পরমান্ন ত্যাগ করেন।তারাধন জানাচ্ছেন যে এই সময়

কাশীর বিখ্যাত শাব্দিক কাশীনাথ শাস্ত্রীর শিষ্য রাজারাম শাস্ত্রীর সাথে তাঁর বহু তর্কালোচনা হত। তারানাথ পলাণ্ডু (পেঁয়াজ)ভোজী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ম্লেচ্ছাচারী জ্ঞানে তাদের সাথে সহজে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতেন না।[১০] এই খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান ও শুদ্ধাচারকে জ্ঞানানুশীলনের সাথে অকারণ সংযুক্তি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিজস্ব প্রাগাধুনিক ভুবনটিকে চিনিয়ে দেয়। অত্যন্ত উল্লেক্ষ্য এই যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের বিষয়ে ধারণায় তারানাথের সাথে বিদ্যাসাগরের চিরন্তন বৈপরীত্য ছিল। ছাত্রজীবন থেকে সিদ্ধান্তকৌমুদীর সটীক প্রকাশের সময় পর্যন্ত তারানাথের সাথে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের তিক্ত বিরোধ ছিল। বিদ্যাসাগর চিরকালই মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের বাঙালী ব্রাহ্মণদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করতেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বিদ্যাসাগর জীবনীতে জানাচ্ছেন যে কাশীতে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতাকে দেখতে গেলে সেখানে বাঙালী ব্রাহ্মণদের সাথে তাঁর প্রভূত বিবাদ হয়। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের দেখে মুগ্ধ হন ও তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাশীর গৃহে তাঁদের বহুবার নিমন্ত্রণ করেন।[১১] বহু পরে তারানাথের সাথে বিবাদের সময়েও তারানাথের মত খণ্ডনের সময় তিনি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করেন।[১২] ছাত্রজীবনের কিছু মৌলিক অভিজ্ঞতায় ও স্বধর্মে কখন যেন এই দুই ব্যক্তির পথ অজান্তেই পৃথক হয়ে যায়।

শাস্ত্রাধ্যায়ী তারানাথঃ সংস্কৃত কলেজের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক

ঔনিবেশিক সরকারের আইন ও শাসনযন্ত্রের চাকরী প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি তারানাথ টোলে বিদ্যাদান করে ছাত্রবেতনজীবি হতেও অনাকাঙ্খী ছিলেন। তারানাথ 'দিনপাত' করার জন্য অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা বা রাজ সরকারে চাকুরী না করে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেশ কিছু ছাত্র ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষিত প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র উদ্যোগী রামগোপাল ঘোষের মতই বৈকল্পিক আধুনিকতার সন্ধান দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মূলতঃ পুস্তকব্যবসাকে নিজেদের অন্যতম পেশারূপে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস। পরবর্তী কালে এই প্রেস বিদ্যাসাগর কর্তৃক লিখিত ও মুদ্রিত বহু গ্রন্থের প্রকাশক এবং বিদ্যাসাগরের প্রধান আর্থিক উপার্জনের অবলম্বন হয়ে ওঠে।[১৩] ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র যেখানে মুদ্রণের পাশাপাশি লোহার মুদ্রণ ব্লক ঢালাইয়ের কাজও হত। বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র

কবিরত্ন জানিয়েছেন যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার চাকরী সত্ত্বেও ‘এই মুদ্রাযন্ত্রই পিতৃদেবের লক্ষ্মীস্বরূপ’।[১৪]বিদ্যাসাগর ও বিদ্যারত্নের তুলনায় তারানাথের বানিজ্য উদ্যম ছিল বহুমুখী এবং বিস্তৃত। কলকাতা, শিউড়ি, অম্বিকাকালনা এবং মেদিনীপুরের রাধানগরে ছড়িয়ে থাকা এই ব্যবসায়ের মধ্যে ছিল বিলাতী সুতার বস্ত্র, পশ্চিম ভারতের শাল, ঘি-মাখন, ঢেঁকিছাঁটা চালের এমনকি সোনারূপার। এরমধ্যে শালের ব্যবসাই বহুবিস্তৃত হয়েছিল। তারানাথের অতিবিস্তৃত ব্যবসা প্রথমে প্রচুর পরিমাণে সাফল্য আনলেও শেষে বিভিন্ন কারণে তিনি লক্ষাধিক টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সংস্কৃত কলেজের বেতন, ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধে গ্রহণে বাধ্য ব্রাহ্মণ বিদায় ও প্রণামী এবং সংস্কৃত গ্রন্থের সটীক মুদ্রণের আয় থেকেই তারানাথকে প্রায় ত্রিশ বছরে এই ঋণ শোধ করতে হয়।[১৫] বিদ্যাসাগর বা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত তাঁর বানিজ্য কোন স্থায়ী অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সন্ধান দিতে পারে নি।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারানাথকে বহু নির্বন্ধে সম্মত করে (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর) তাঁর প্রশংসাপত্রগুলি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ Major G.T.Marshall এর কাছে জমা দেন। তারানাথ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীর ব্যাকরণ অধ্যাপক হিসাবে ৯০ টাকা বেতনে যোগ দেন।১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী তিনি ১৫০ টাকা বেতনে অবসর নেন। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন অবসর নেওয়ার পর শিক্ষকাভাব হওয়ায় তারানাথ ন্যায় ও অলঙ্কারের অধ্যাপনাও করেছেন।[১৬]তারানাথের সাথে ১৮৪৪ সালে যখন বিদ্যাসাগর মিলিত হন তখনকার কথা বলতে গিয়ে শম্ভুচন্দ্র জানাচ্ছেন যে তারানাথ নিজস্ব চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করছিলেন। কিন্তু মার্শাল সাহেবের সুপারিশে দেখা যায় “ He does not teach a “*Tole*” or public school, but he has, I am creditebly informed several private pupils.......”[১৭]তারানাথের অতুল পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করে মার্শাল লিখছেন “In every department he is, in my opinion, is far above mediocrity and in several branches of science I doubt if any Pundit can compete with him namely, in the Upanishads of the Veds, in the Vendanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha and Patanjala.”[১৮]মার্শাল এও সুনিশ্চিত করেন যে তারানাথের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবেই সংস্কৃত কলেজের নিজেদের উদ্যোগে, তারানাথের কোন আবেদনে নয়ঃ “This recommendation is made

altogether from a conviction of this individual's superior qualifications and without any solicitation direct or indirect on his own part; only his willingness to accept the appointment if offered to him;having been ascertained".[১৯] তারানাথের অধ্যাপক জীবন অবিমিশ্র প্রশংসায় পূর্ণ। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন " তিনি কি ব্যাকরণে, কি স্মৃতি , কি অলঙ্কার বা কি ন্যায়শাস্ত্র সর্বশাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তা ভিন্ন তিনি বেদের ও উপনিষদের শিক্ষায় সুপটু ছিলেন। তৎকালে তিনিই পাণিণি ব্যাকরণবেত্তা ছিলেন। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহা তাঁহার সিদ্ধবিদ্যা ছিল। পঞ্জাব বা বোম্বে হইতে কোন পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত কলেজে আসিলে তিনিই তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন................................তিনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।"[২০]কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন " তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগগজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ"।[২১] **১৮৬৭** খ্রীষ্টাব্দে (?) কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বৃহৎ উদ্যোগে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদের সময় ব্যাসকূট এবং অনুশাসন পর্বস্থিত অতিদীর্ঘ মোক্ষপর্বাধ্যায় অনুবাদের সময় অন্য কোন সম্পূর্ন ষড়দর্শনবেত্তা পণ্ডিতকে না পেয়ে তারানাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তারানাথের সাহায্যেই সম্পূর্ণ অনুশাসন পর্বের অনুবাদ হয়। কালীপ্রসন্ন অনুশাসন পর্ব প্রকাশকালীন ভূমিকায় লেখেন "এই বিষয়ের কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।তিনি এরূপ না করিলে ভারতের দুরাবগাহ কুটার্থের কখনোই প্রকৃষ্টানুবাদ করণে সমর্থ হইতাম না।"[২২]উল্লেখ্য, অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের প্রত্যেকটি মুদ্রিত পর্বের পূর্বেই কালীপ্রসন্নের একটি করে ভূমিকা ছিল। এই সমস্ত ভূমিকাতে এক তারানাথ ছাড়া আর কোন অনুবাদক পণ্ডিতের নাম কিন্তু উল্লেখিত হয় নি। কিন্তু কর্মজীবনে তারানাথের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর অধ্যাপনাপটুত্বে বা এই সকল অনুবাদন সহায়তায় নয়। তাঁর অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সটীক সম্পাদনের তুলনারহিত দক্ষতায় বিশেষতঃ পাণীনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য ভট্টোজীদীক্ষিত প্রণীত সুবিশাল সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থ স্বকীয় সরলা নামক টীকা সহ মুদ্রণে।

<u>সংস্কৃতচর্চায় তারানাথঃ সংস্কৃতগ্রন্থের মুদ্রণ ও টীকাকরণের নূতন অধ্যায়</u>

তারানাথের বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা এবং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সটীক প্রকাশ এবং মুদ্রণের যে ব্যবস্থা করেন তার বিস্তৃত তালিকা আমরা পাই তাঁর পূর্বোল্লিখিত দুটি

জীবনীতে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে। ১৮৫১-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মল্লিনাথের টীকা সহ কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের প্রকাশ, শব্দেন্দুশেখর, শব্দকৌস্তভ এবং বৈয়াকরণভূষণসার প্রভৃতি দুরূহ ব্যাকরণ গ্রন্থের অবলম্বনে শব্দার্থরত্ন গ্রন্থ রচনা, বাক্যমঞ্জরী, ধনঞ্জয়বিজয় ব্যায়োগের টীকা, ছন্দমঞ্জরী, গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি রচনা করেন।[২৩] ১৮৬২ সালে তারানাথ সিদ্ধান্তকৌমুদীর সটীক মুদ্রণে অগ্রসর হন যে পর্ব আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করছি। বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত তিনটি ব্যাকরণ অর্থাৎ বোপদেবের সূত্রাকারে রচিত মুগ্ধবোধ, শর্ববর্মার রচিত কলাপ এবং অমরকোষ কোনটিই গভীরভাবে ব্যাকরণশিক্ষার অনুকূল না হওয়ায় পাণীনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য ভট্টোজীদীক্ষিত প্রণীত সুবিশাল সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থ যা বারানসীতে মূলতঃ মারাঠী পণ্ডিতরাই অনুশীলন করতেন তার মূল পুথি বারানসী থেকে আনিয়ে প্রকাশের প্রয়োজন হয়।Education Department ২১০০ টাকা মূল্যে এই সটীক সিদ্ধান্তকৌমুদীর দুইশত কপি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র জানান যে তিনি ১২০০ মুল্যে ঐ দুইশত গ্রন্থ সটীক সম্পাদন করবেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ E.B.Cowell জানান যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোন সংস্কৃত গ্রন্থের টিকা প্রস্তুত করেন নি এবং এই কাজের জন্য তারানাথের নাম মনোনীত করেনঃ " –I question if anyone in Bengal is equal to him".[২৪] তারানাথের দুরূহ শ্রমে রচিত সরলা নামক টীকা সহ সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অতি সমাদৃত হয় ও ১৮৭৪ সালের মধ্যে তিনবার মুদ্রিত হয়। বারানসীর পণ্ডিতসমাজ এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করেন। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ পাঠ্য হিসাবে মুদ্রিত হয়। বোম্বাই গভর্নমেন্ট এই গ্রন্থ পঞ্চাশ কপি ক্রয় করেন এবং বেনারস কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ একশত কপি ক্রয় করেন। Cowell শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে জানান " The book is well-done and it is a great boon to Sanskrit learning that we have now a standard edition of such a valuable work".[২৫] শম্ভুচন্দ্র জানাচ্ছেন যে মারাঠী পণ্ডিতরা এই গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিক্ষাবিভাগের এক ইংরেজ কর্মচারীর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হন।[২৬] বিশেষ উল্লেখ্য এর প্রায় দশ বছর বাদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন তাঁর আবার অতি অল্প হইল

পুস্তিকায় তারানাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন তখন তিনি মারাঠী পণ্ডিতদের এই সমালোচনা ‘ তারানাথের ব্যাকরণ জ্ঞান নাই’ কে বারবার ব্যবহার করেন।[২৭]

তারানাথের এই গ্রন্থ সম্পাদন একটি একক ও ব্যতিক্রমী কীর্তি। Brian A. Hatcher তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে এই সময় পণ্ডিতরা তাঁদের পার্থিব জ্ঞান ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে গণমানসে ও বিদ্যাজগতে ক্রমশই হেয় হয়ে পড়ছিলেন। বিদ্যাসাগর থেকে বনমালী বেদান্ততীর্থ পর্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞরাই পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা রীতি ও গোঁড়ামি নিয়ে কঠিন ভাবে সরব হচ্ছিলেন। নূতন সৃষ্ট bourgeois moraleর সামনে প্রাচীন ব্রহ্মণ্যপাণ্ডিত্য নিতান্তই হীন প্রতিপন্ন হচ্ছিল।[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “সংস্কৃতওয়ালাদের” লিখনশৈলী নিয়ে ক্রমশই হয়ে উঠছিলেন ব্যাঙ্গাত্বক এবং অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ তাঁর অনুগামীরা দ্বরকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের রচনাবহুল সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রকে ‘ভট্টাচার্যের চানা’ নাম দিয়ে বিদ্রুপ করতে থাকেন।[২৯] বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে জানান সাহিত্য সমালোচনার শ্রেষ্ঠ ও উচিত রূপ হল জার্মান শৈলী।[৩০] এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা রচনার দায়িত্ব পাশ্চাত্যশিক্ষায় অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবেই ইংরাজীতে অজ্ঞ এবং বহুক্ষেত্রেই সংস্কৃত পণ্ডিতের প্রাচীন ভুবনে বাস করা তারানাথের উপর সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকার ভার দিয়ে Cowell ও শিক্ষাবিভাগ যে সিদ্ধান্ত নেন তা ব্যতিক্রমী এবং Brian Hatcher এর পণ্ডিতদের সাধারণ মর্যাদার অবনমনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৮৬৪-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারানাথ সটীক রত্নাবলী নাটিকা, ঢেঙ্কাণলের মহারাজার অনুরোধে মধুসূদন স্বরস্বতীর সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকা সিদ্ধান্তবিন্দুসার, ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যা, প্রাচীন মন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ড সঙ্কলন তুলাদানপদ্ধতি,কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম থেকে সপ্তদশ সর্গের মুদ্রণ, সটীক বেণীসংহার নাটক, আশুবোধ ব্যকরণ (পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য), ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দেবর মধ্যে প্রথম সংস্কৃত অ-কারান্ত ভাবে প্রস্তুত শব্দস্তোমমহানিধি অভিধান, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সটীক বৃত্তরত্নাকর, মুদ্রারাক্ষস ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, সটীক পাণিণির অষ্টাধ্যয়ী সূত্র, ১৮৭১-৭৩এর মধ্যে সটীক ধাতুরূপাদর্শ, সাংখ্যকৌমুদী, ভামিনীবিলাস, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, হিতোপদেশ, সর্বদর্শনসংগ্রহ, কবিকল্পদ্রুম পরিভাষেন্দুশেখর, লিঙ্গানুশাসন এবং গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এই প্রস্তাবের সংস্কৃত উত্তর ‘বহুবিবাহ’ রচনা করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি তাঁর বৃহত্তম রচনা

বহুখণ্ডে বিভক্ত অ-কারান্ত ক্রমে প্রস্তুত বাচস্পত্য অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন।[৩১] ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর Wodro ১০০০০ টাকার ব্যবস্থা করেন এবং ১৮৮৪ সালে J.H.Cripto আরও ৫০০০ টাকার ব্যবস্থা করেন।[৩২]কিন্তু ৫৬০০ পৃষ্ঠার এই মহাগ্রন্থ রচনায় ৮০০০০টাকার অধিক ব্যয় হয় যা তারানাথ ও তাঁর পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সরবরাহ করেন। তারাধন তর্কভূষণ জানাচ্ছেন যে তারানাথ তাঁর গৃহে ও এই কাজের জন্য প্রস্তুত পৃথক পাঠগৃহে বেদ, উপনিষদ, কাব্য, ব্যাকরণ,ছন্দ,অলঙ্কার, পুরাণ, ষড়দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত জ্যোতিষ,ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, বৈষ্ণব দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, পাকশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র সংক্রান্ত বিপুল গ্রন্থ ও পুথি সংগ্রহ করেন ও যার নিয়ত পাঠ ও সব্যাখ্যা সঙ্কলন তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে গুরুতর হানি করে।[৩৩] তারানাথ এই কার্যে তাঁর তিন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে সহায়তা করতে বললেও তাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন নি।বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে “ একালে সংস্কৃত রচনা বিড়ম্বনা মাত্র”। তিনি আবার অতি অল্প হইল পুস্তিকাতেও তারানাথকে এই অভিধানের ভ্রমসম্ভাবনা নিয়ে আক্রমণ করেন।[৩৪]

এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও তারানাথ ১৯০৬ বিক্রম সম্বতে পটলডাঙ্গায় বিশ্বপ্রকাশ নামক যে দেবনাগরী ও বাঙলা অক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র প্রকাশ হয় সেখান থেকে একটি বাঙলায় পঞ্জিকা প্রকাশ করেন।এতে তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আকার ও গতি বিষয়ে আদি আর্যভট্ট, বরাহমিহিরের সূর্যসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্যের মতগুলি পয়ার ছন্দে প্রকাশ করেন। এই পঞ্জিকা এবং বিদ্যাসাগরের অতি অল্প হইলর প্রত্যুত্তরে অতি সংক্ষিপ্ত লাটী থাকিলে পড়ে না পুস্তিকা তারানাথের বাংলা রচনাশক্তির প্রমাণ। দুঃখের বিষয় এই দুটি রচনাই বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তারাধন যদিও জানাচ্ছেন যে দীর্ঘদিন দেবনাগরী রচনার চর্চায় থেকে তারানাথ অনেক সময় বাংলা রচনাতেও দেবনাগরী বর্ণবিন্যাস করে ফেলতেন।[৩৫]কিন্তু আমরা তারানাথের হিন্দু কলেজের ব্যকরণ পাঠশালার ক্ষেত্রে তারানাথের যে রিপোর্ট (ইনস্পেকস্রন) ও চিঠি দেখতে পাই তাই সংস্কৃত পণ্ডিতের বাংলা লেখার প্রমাণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রুপের ‘সংস্কৃতওয়ালা’দের ‘নদী-গিরি-পর্বত-কন্দর’ ভাষার প্রতিবাদ।

তারানাথ-বিদ্যাসাগর সংঘাতঃ বহুবিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রদ্বন্দ্ব

যে বিশেষ ঘটনা দ্বারা তারানাথ প্রাচীণপন্থী বলে জনমানসে পরিচিত ও বিদ্যাসাগরের সাথে আমৃত্যু বিবাদে জড়ান তা হল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার।

শম্ভুচন্দ্র জানাচ্ছেন যে তারানাথ বহুবিবাহ অকর্তব্য মানতেন কিন্তু অশাস্ত্রীয় নয় যে কারণেই তিনি স্বকীয় গ্রন্থপ্রকাশ করে মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।[৩৬] তারাধন তর্কভূষণ জানাচ্ছেন যে তারানাথ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে বিদ্যাসাগর যে অহেতুক দম্ভ প্রকাশ করেন ও পণ্ডিতদের সমরাঙ্গনে সদর্পে আহ্বান করেন তার প্রতিক্রিয়াতেই তারানাথ এই সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং গঙ্গাধর কবিরত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, রাজকুমার ভট্টাচার্য এবং সত্যব্রত সামশ্রমীর সঙ্গে একযোগে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেন।[৩৭] দুই বর্ণনাই একথার কোন ব্যাখ্যা দেয় না যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিবারক যে আবেদন করা হয় তারানাথ তাতে সাক্ষর করেন কেন? তিনি কি জানতেন না যে বিদ্যাসাগরের আবেদনের পেছনে যথেষ্ট হৃদয়াবেগ ও কর্তব্যবোধ থাকলেও তাঁর যুক্তির ভাষা অবশ্যই শাস্ত্রনির্ভর? আর যদি বিদ্যাসাগরের দম্ভোক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধও হন তা হলেও পরম স্নেহাস্পদ, প্রিয়তম ছাত্র বিদ্যাসাগর (কৃষ্ণকমলের বক্তব্যে যাঁকে তারানাথ সর্বদাই আদর করে "ঢিপলে" বলে ডাকতেন)[৩৮] তাঁর সঙ্গে কিছুমাত্র আলোচনা না করে অকস্মাৎ গ্রন্থ রচনা করে কটুভাষায় প্রায় প্রতারণার অভিযোগ করার (অহো বৈদগ্ধী প্রজ্ঞাবতো বিদ্যাসাগরস্য যদকিঞ্চিৎকরাভিনবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিতা ইতি; " প্রজ্ঞাবান বিদ্যাসাগরের কি চাতুরী!অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন")[৩৯] কারণ কি? তারানাথ ও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কি আগেই ফাটল ধরেছিল ? তারাধন এই ভাঙনের দায় পুরোপুরি বিদ্যাসাগরের উপর চাপিয়েছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর কুৎসিত, কটূ আচরণেই এই সম্পর্ক আগেই ভেঙে যায়। তিনি এই বিবাদের মূল উৎস হিসাবে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের (তারানাথের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪৪-?) সাথে বিদ্যাসাগরের তুমুল কলহের কথা বলেছেন কিন্তু এই কলহের কোন কারণ নির্দেশ করেন নি।[৪০]তারানাথের প্রতিবাদের হেতু কৃষ্ণকমলের স্মৃতিচারণ থেকে কিছুটা ধারণা করা যায় ও তার সাথে বিদ্যাসাগরের প্রত্যুত্তর মিলিয়ে পড়লে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়.কৃষ্ণকমল জানাচ্ছেন যে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ও সূত্রের বিভিন্নতাই তারানাথের বহুবিবাহের শাস্ত্রবিরুদ্ধতার ব্যাপারে দোলাচলতার কারণ। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তার যুক্তি আসলে একপ্রকার শাস্ত্রীয় কূটনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ মনুবচন

" সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্তা দ্বারকর্মণি।
কামতস্ত প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহ বরাঃ।।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রানাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রাহ্মণঃ স্মৃতা।।"[৪১]

বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যা ছিল এই যে মনুর এই বচন অনুসারে পুরুষ ধর্মাচরণ করার জন্য স্বজাতীয়া নারীকে বিবাহ করবে কিন্তু পরে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিবাহে স্বজাতিয়া বা ভিন্নজাতীয়া বিবাহ সম্ভব। কিন্তু মনু প্রতিলোম বিবাহের বিরোধী ছিলেন (নিম্নজাতীয় পুরুষের উচ্চজাতীয়া নারীকে বিবাহ)। তাই মনুর এই বক্তব্য কেবল অনুলোম বিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু কলিযুগে জাত্যন্তর বিবাহ উঠে গিয়েছে তাই বহুবিবাহ কলিতে স্বাভাবিকভাবেই নিষিদ্ধ। তারানাথ প্রথমত বিদ্যাসাগরের এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হন ও আগ্রহী হন কিন্তু এই শ্লোকের সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থও সম্ভব এবং কলিতে মনুবচন একমাত্র মান্য নয় এই ভিত্তিতে এর বিরোধী হন।কিন্তু কৃষ্ণকমলের এই বক্তব্যও তারানাথের কাজের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে না কারণ তারানাথের নিজের কথাতেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রীয় যুক্তিতে অনেক বিরুদ্ধ আলোচনা হতে পারত। কিন্তু তারানাথ সেক্ষেত্রেও নিজের হৃদয়ের কথাই শুনেছিলেন। বহুবিবাহ নিবর্তনকল্পে তারানাথের আচরণ তাই আজও অবাখ্যাত। কিন্তু এই আচরণের ভিত্তিতেই তারানাথের সাথে বিদ্যাসাগরের চিরস্থায়ী বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত হওয়া প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবে লেখেন " অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে,কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই;নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে;কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই;বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি,বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা, এই কয়টি কথা অনেকাংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"[৪৩] "অনেকেই বলিয়া থাকেন" বলতে বিদ্যাসাগর কি মারাঠী পণ্ডিতদের বোঝাতে চাইছেন? একথার নিশ্চিত কোন উত্তর নেই। বিদ্যাসাগর 'Jack of all trades,master of none'বলেই তারানাথকে নিষ্কৃতি দেন নি। তাঁকে দ্বিচারী আখ্যা দিয়ে জানাচ্ছেন 'ধর্মবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে লোক যেমন আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েন; রোষবশে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইলে লোককে তেমন অনাদরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"[৪৪] 'রাগদ্বেষ' বলতে কি বিদ্যাসাগর তাঁর সাথে তারানাথের তারাধন কথিত পূর্ববিবাদের ইঙ্গিত দিচ্ছেন? বহুবিবাহ বিষয়ক

প্রস্তাবের দ্বিতীয়ভাগের বৃহত্তম অংশ জুড়েই আছে তারানাথের বক্তব্য খন্ডন। তারাধন এই প্রত্যুত্তরকে প্রত্যুত্তর বলেই মানেন নি এবং 'গ্রাম্য রসিকতায় পূর্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৫] তারানাথ 'গ্রাম্য রসিকতার' খেউড়ে প্রবৃত্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই এই গ্রন্থের উত্তর দেন নি। তারাধনের বক্তব্য যে অত্যন্ত ' biased' তা বলা বাহুল্য। Brian A. Hatcher এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য একদেশদর্শী বলে বর্ণনা করেছেন।[৪৬]

উপসংহার

ঊণবিংশ শতকের অনেক নায়কের মত তারানাথ ও আজ প্রায় বিস্মৃত একটি চরিত্র। সংস্কৃতবিদ্যা চর্চা যতই অবহেলার স্বীকার হতে থাকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের গুরুত্ব ততই হ্রাস পায়। মেকলের প্রশ্রয়প্রাপ্ত কোলকাতার ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক যুবসমাজ সংস্কৃতকে দেখতেন উন্নাসিক দৃষ্টিতে। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত আদৌ পড়ান হত না যেমন হত না অন্য অনেক কলেজেই। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীতে সংস্কৃত ছিল ঐচ্ছিক বিষয়।চার্লস উড ডেসপ্যাচ থেকে স্যাডলার কমিশন পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতিতেই সংস্কৃতচর্চা ক্রমাগত অবহেলিত হয়ে চলেছিল। Brian A. Hatcher তাঁর অসাধারণ রচনায় এই পণ্ডিতসমাজের ক্রমবিস্মৃতির যে ছবি তুলে ধরেছেন তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ণেল আলকট, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Johan Buhler প্রমুখ তারানাথকে যে বিপুল সম্মান করেছিলেন বলে তারানাথের জীবনীকাররা লিখেছেন তাও সামগ্রিক অবক্ষয়ের চেহারাটা বিশেষ বদলায় না। তারানাথের ক্ষেত্রে এই বিস্মৃতির অনুঘটক হয়েছিল ঊনিশ শতকের বাংলার সর্বাপেক্ষা বীর্যবান ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ব্যক্তিগত বিরোধ। তারানাথের আধুনিকতা ও স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে তাঁর আধুনিকতা সম্পূর্ণ শাস্ত্রনির্ভর ছিল। তিনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনাধুনিকতাকে বর্জন করেছেন কিন্তু যেখানে শাস্ত্র আর আধুনিকতার সত্যসত্য দ্বন্দ্ব বেধেছে সেখানে সচরাচর শাস্ত্রেরই পক্ষে থেকেছেন। শাস্ত্রাধ্যায়ী এবং শুদ্ধাচারী যে চরিত্রের জন্য তারানাথ তাঁর জীবনীকারদের অগাধ সুখ্যাতি পেয়েছেন তার কদর প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বাধ্যবাধকতা শাস্ত্রাচার ও দেশাচার উভয়ের ওপরেই কঠোর প্রভাব ফেলে। যার সামূহিক ফল সংস্কৃতানুশীলনকারীদের আলোচনা ছাড়া সামগ্রিকভাবে তারানাথের ব্যাপারে বিস্মৃতি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তারানাথের যে versatility কথা বলেছেন বানিজ্যের ব্যাপারে[৪৭]

তাও ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার কারণে এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের জ্বলন্ত ও বহুব্যাপী ব্যক্তিত্বের পাশে সংস্কৃত কলেজের আরেক নক্ষত্রের উপস্থিতি তাই ক্রমম্রিয়মাণ হতে বাধ্য হয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. Brian A. Hatcher,"Whats Become of the Pandit? Rethinking the condition of the Sanskrit scholars in Colonial Bengal", *Modern Asian Studies*, 2005, 39(3): 683-723.

২. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত, ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাত্ ১৩০০বঙ্গাব্দ, ভূমিকা।

৩. তারাধন তর্কভূষণ, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী ও সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি, কলিকাতা, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ১৩০০বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা ৯-১১।

৪. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃষ্ঠা ৬-৭।

৫. তদেব পৃষ্ঠা ৭-১২।

৬. তারাধন তর্কভূষণ,পৃষ্ঠা ১৫।

৭. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃষ্ঠা ১৩।

৮. তদেব পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

৯. দেবব্রত বিদ্যারত্ন, পুজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৪।

১০. তারাধন তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ১৫।

১১. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ইংরেজী-সংস্কৃত যন্ত্র,কলিকাতা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ২১২-১৪।

১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আবার অতি অল্প হইল দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১১৯৬।

১৩. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

১৪. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, ঁগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪১।

১৫. তারানাথ তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ২২-৩৩

১৬. গোপীকামোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডঃ১৮৫৮-১৮৯৫, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৪০।

১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের সংস্কৃত কলেজ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৮ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১৮. তদেব।

১৯. তদেব ।

২০. হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, সেকালের সংস্কৃত কলেজ দ্রষ্টব্য প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩২ পৃষ্ঠা ৬৪৮-৬৪৯।

২১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা ২০৩।

২২. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত,পৃষ্ঠা ৫৩।

২৩. তদেব পৃষ্ঠা ২৬-২৭।

২৪. গোপীকামোহন ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৯।

২৫. তদেব।

২৬. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত,পৃষ্ঠা ২৭-২৯.

২৭. দ্রষ্টব্য সুত্র নং ১২।

২৮. Brian A. Hatcher , “Whats Become of the Pandit?”pp. 697-701.

২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, এস.আর.লাহিড়ী প্রকাশণ, কলিকাতা,১৯০৪, পৃষ্ঠা ২৭১।

৩০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বঙ্কিম সংখ্যা ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২।।

৩১. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত,পৃষ্ঠা ২৯-৩৩।

৩২. তদেব পৃষ্ঠা ৩৪।

৩৩. তারানাথ তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ৮৬-৮৮।

৩৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,আবার অতি অল্প হইল দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৯৩।

৩৫. তারানাথ তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ৫৩,৬৪,৮৯।

৩৬. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত,পৃষ্ঠা ২৩।

৩৭. তারানাথ তর্কভূষণ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

৩৮. বিপিনবিহারী গুপ্ত,পৃষ্ঠা ২১১।

৩৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২১।

৪০. তারানাথ তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫।

৪১. বিপিনবিহারী গুপ্ত,পৃষ্ঠা ২১০-১১।

৪২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পর্ব পৃষ্ঠা ১০১৮।

৪৩. তদেব পৃষ্ঠা ১০২০।

৪৪. তারানাথ তর্কভূষণ পৃষ্ঠা ৯০।

৪৫. Brian A. Hatcher , "Whats Become of the Pandit?" pp. 715-716.

৪৬. বিপিনবিহারী গুপ্ত,পৃষ্ঠা ২০৯।

রহস্যময় গল্পলোক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোৎস্না দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’র ভূমিকায় লেখক জগদীশ ভট্টাচার্য এই লেখক সম্পর্কে বলেছিলেন – “নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা কালের পৃষ্ঠায় নিজস্ব স্বাক্ষর উজ্জ্বল করে তুলেছে। .... রূপে ও রসে, ভাবনায় ও বেদনায় বিচিত্র তাঁর শিল্পলোক।” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প একদিকে কাব্যিক ভাষার স্পর্শে গীতি-কবিতার মতো ব্যঞ্জনাময়, অন্যদিকে তা জীবনরহস্যের অলৌকিকতায় ভাস্বর। কখনো তিনি প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের মাঝখানে খুঁজে পান মানুষের ভয়ংকর জান্তব ছবি, কখনো দেখেন কামার্ত প্রকৃতিকে, কখনো বিবেকের আয়নায় দেখেন মানবিকতার বর্ণমালা।

লেখক নিজে ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ গ্রন্থে দেশবিদেশের নানা ছোটগল্পের আলোচনার শেষে ছোটোগল্পের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন – “আধুনিক ছোটগল্প হল ‘যন্ত্রণার ফসল।” লেখক নিজে গত শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মহামন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদির যন্ত্রণাজাত ছোটগল্পের রূপায়নে ছিলেন অদ্বিতীয়। জীবনের ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দুই রূপের দ্বৈতবোধে তাঁর একাধিক ছোটগল্প জীবনের পরিণত রূপের আভাস দেয়। কিভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈপরীত্যে মানুষের পৈশাচিকতার বীভৎস ছবিকে রূপায়িত করেছেন লেখক, তার উদাহরণ হিসাবে আমরা ‘বীতংস’, ‘টোপ’, ‘নক্রচরিত’ ইত্যাদি গল্পের উদাহরণ তুলতে পারি। তবে তিনি সরাসরি গল্পে বিষয় বর্ণনায় আবদ্ধ থাকতে চাননি। নিজে তা করেনওনি। তাঁর গল্পের জটিল-কঠিন-বীভৎস বিষয়কেও তিনি রম্য বাক্যরীতির আড়াল দিয়েছেন বাস্তব বিষয়ের গল্পকেও বর্ণনার গুণে তিনি করে তুলেছেন রহস্যময়।

একদা উত্তরবঙ্গে বসবাস সূত্রে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের বনপ্রকৃতি, নদী-প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পের সর্বত্র। লেখকের ‘বীতংস’ গল্পে আছে সুন্দরলাল নামে এক অর্থ পিশাচ, নারীলোভী শয়তান মানুষের ছবি, কার্যে যে অসুন্দর, নাম তার সুন্দরলাল। ‘বীতংস’ কথাটির আভিধানিক অর্থ ‘পক্ষী বা মৃগ’ ইত্যাদি ধরবার ফাঁদ। সুন্দরলাল এখানে আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানের জন্য গুনীন সেজে বসে থাকে সাঁওতাল পরগনায়। বুধনীর গ্রামীন সরল, কৃষ্ণ সৌন্দর্য তার ভেতরের লোভকে জাগিয়ে তোলে। লেখক একদিকে তুলে ধরেন

সাঁওতাল পরগণার অপরূপ বনশ্রীর বর্ণনা। এখানে ছবির মতো নীল পাহাড়', 'স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়' দিগন্ত জুড়ে। সুন্দরলালের নেশা ধরা চোখে মনে হয় জীবনের সব আনন্দ বুঝি এইখানেই আছে। কিন্তু 'সাধু মহাপুরুষ' সুন্দরলাল তার বাইরের পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে যে চা-বাগানের কুলীর সাপ্লায়ারের সর্পিল স্বভাবটাকে, যেন তারই আভাস দিতে শালবনে ঘেরা সাঁওতাল পরগনার দূরবর্তী পথের উপমায় লেখকের মনে হয়েছে ওটা "যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাসের প্রসারিত নিশ্চল বাহু, যেন মৃত্যুর আগে একবার ঐ পাহাড়টাকে মুখের ভেতর টেনে আনবার শেষ চেষ্টা করেছিল।" ঠিক যেভাবে দেবতার নির্দেশের ছলনায় সুন্দরলাল গিলে খায় বুধনী সহ অনেক সাঁওতাল পুরুষ-রমনীদের।

'হাড়' গল্পে এক রহস্যময়ী অতীন্দ্রিয় জগতের পটভূমিতে বিশ শতকের চারের দশকের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাহাকার, যুব সমাজের বেকারত্ব, বড়লোকের উন্নাসিকতার মতো বাস্তব বিষয়গুলিই চিত্রিত হয়েছিল। তখন "দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে।" বেকারেত্বর যন্ত্রনায় অস্থির যুবকটি বাবার প্রতিপত্তিশালী বন্ধুর বাড়ি গেছে চাকরীর সুপারিশপত্রের জন্য। "বুভুক্ষু কলোনি'র দুর্গন্ধের পাশে সেখানে গ্ল্যান্ডিফ্লোরার উগ্র মধুর সুরভিত জীবনযাপন চমৎকার বৈপরীত্য রচনা করে দেয়। বড়লোক রায়বাহাদুর উদরপীড়ায় পীড়িত যুবকটিকে দেখাতে থাকে তার রহস্যময় হাড়ের কালেকশন, 'পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পূজো করে কুমারী মেয়েকে বলি' দিয়ে তার হাড়গুলিকে পুঁতে দেওয়া হয়, সাতবছর পরে সেই হাড় ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। যে সেই হাড় কুড়িয়ে আনতে পারে সে হয় যাদুবিদ্যার অধিকারী। 'সে যা খুশি তাই করতে পারে। রায়বাহাদুর সেই হাড়টাই পেয়েছেন, মন্ত্রটা পাননি। চাকরী না হওয়ার যন্ত্রনা বুকে নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই যুবকটি পথ দিয়ে ফেরার সময় দেখল কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে ডাস্টবিন থেকে হাড় কুড়িয়ে নিয়ে একটা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অসুস্থ ক্ষুধার্ত ছেলে প্রাণপণে সেই হাড়টা চুষে খাচ্ছে। যুবকটির তখন মনে হল ঐ ক্ষুধার্ত মানুষগুলিও হাড়টাকে পেয়ে গেছে, শুধু মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী। যে মন্ত্র পেলে ওরা আবার উজ্জীবিত হতে পারে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার শ্রী ফিরিয়ে দিতে পারে।

'নক্র' কথাটির অর্থ কুমীর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত' গল্পে মহাজন নিশিকান্ত কর্মকার চুরির সোনায় সিন্দুক ভরে ফেলে। দুর্ভিক্ষের বাজারে প্রচুর চাল মজুত করে রাখে পরে বিক্রি করে লাভ করবে এই আশায়। নিশি আবার পরম বৈষ্ণব,

শুধু মানুষের লোভের গ্রাস কেড়ে খাবার সময় সে কুমীরের মতই হাঁমুখ করে থাকে। শুধু তো অন্নের সমস্যা নয়, '৪৩-এর মন্বন্তরের মানুষের বস্ত্র সমস্যাও ছিল প্রকট। এখানে নিশিকান্ত কেবলই অনুভব করে অন্ধকার গ্রামের পথে যেন ঘুরে বেড়ায় কতগুলি অস্থি সর্বস্ব ছায়ামূর্তি। অগণ্য নারী দেহ যেন বস্ত্রের অভাবে নগ্ন দেহে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে। জমিয়ে রাখা চালের বস্তায় বর্ষার জল পড়ে পচন ধরে। হঠাৎ কেন যেন জান্তব তুলনা মনে জাগে নিশিকান্তর। যেন মাঠের মাঝে গলিত গোরুর মৃতদেহ আগলে বসে থাকা কুকুর, ক্ষুধার্ত শকুনির ভিড়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। ঠিক যেমন ক্ষুধার্ত মানুষগুলিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে নিশিকান্ত, বস্ত্র সমস্যার বীভৎস রূপ প্রকট হয় 'দুঃশাসন' গল্পে। বিষয়গত ভাবে গল্পটির সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি। দেবীদাসই যেন দুঃশাসনের মতো সারা বাংলার দ্রৌপদীদের বস্ত্র লুণ্ঠনে উদ্যত হয়ে আছে। দেবীদাস কেমন যেন ভয় পেতে থাকে। লক্ষণ মচির বাড়িতে এসে দেবীদাস আবিষ্কার করে ফেলে একটি ষোড়শী মেয়েকে। বস্ত্রের অভাবে সে সম্পূর্ণ নগ্ন। মেয়েটির কোনো খানে একপালি কাপড়ও নেই, কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, মর্যাদাটুকু নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।'' রহস্যময় প্রেতলোক থেকে উঠে আসে বাংলার দ্রৌপদীর দল, নব কুরুক্ষেত্রেরও বুঝি দেরী নেই আর।' ফসলহীন রিক্তমাঠেও কৃষকদের ধারালো হেঁসোগুলিতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠতে দেখে গৌরদাসের বড় ভয় করতে থাকে। দেবীদাসও হয়ে পড়ে বিষন্ন ও পাণ্ডুর। তাহলে কি দুঃশাসনের মত বাংলার দ্রৌপদীদের বিবস্ত্র করছে যারা, তাদের বিনাশও অনিবার্য হয়ে উঠবে?

'টোপ' গল্পেও উত্তরবঙ্গের তরাইয়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির মাঝখানে খুঁজে পান আনন্দিত রমণীয় বৃক্ষলতার সম্ভার। সেখানে সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জল পাতার শান্ত, শ্যামল, সমুদ্র, দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।'' কোথায় শালের ফুল ঝড়ে পড়ে পথে, ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে আসে। কিন্তু প্রকৃতির হৈ উজ্জ্বল সুন্দর রূপের বৈপরীত্যই যেন রাজাবাহাদুরের মানুষ মারা হিংস সত্তাটি সুচিত্রিত হয়ে ওঠে। 'বীতংস' গল্পে যেমন রমনীয় প্রকৃতির মাঝখানে সুন্দরলালের বীভৎস লোভী অর্থগৃধ্নু, কামুক স্বভাব স্পষ্টতর হয়ে থাকে, তেমনি 'টোপ' গল্পেও একদিকে লেখক তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের অপরূপ সৌন্দর্যকে। রাজাবাহাদুরের শিকারী চোখে ওটি ''একেবারে প্রাগৈতিহাসিক

হিংস্রতার রাজত্ব” আর লেখকের বর্ণনায় তা “আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে – অফুরন্ত প্রকৃতি – পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রং দিয়ে আঁকা অথচ এই সুন্দরী প্রকৃতির মাঝখানেই ভয়ংকর মানুষের শিকার খেলা লজ্জা দেবে অরণ্যের পশুকেও। জীবন্ত শিশুকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে রাজাবাহাদুর বাঘ শিকার করবেন ঐ অরণ্যে। অরণ্যের হিংসার রাজস্ব আশ্চর্য সুন্দর। শালবনে মৃদু মর্মর, বনমুরগীদের ডাক, ময়ূরের পাখা ঝাপটানো, কিন্তু রাজাবাহাদুরের বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে পৌঁছল না কোনো শিকার “কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভাল্লুক।” নিষ্ঠুর কঠিন রাজাবাহাদুর মাছ ধরবার জন্য ব্যবহার করেন জীবন্ত টোপের, এক মানব শিশুর, যে শিশুর কেউ খবর রাখবে না, জঙ্গলে কীপারের একটি ‘বেওয়ারিশ’ ছেলে যদি হারিয়ে যায়ও। “কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরে ছিলেন রাজাবাহাদুর, লোককে ডেকে দেখানোর মতো।” সেই বাঘের চামড়ায় তৈরি ‘চমৎকার’ চটিজোড়া, ‘যেমননরম, তেমনি আরাম’, মানুষের হিংস্রতার কাঠিন্য সেখানে কোথাও লেগে নেই। এইভাবে যেন প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর রহস্যময় অনুভবের মাঝখানেই মানুষের হিংস্র পৈশাচিক কাঠিন্যকে উন্মোচন করেন লেখক।

‘ফলশ্রুতি’ গল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে ক্ষণকালের রহস্যলোক সৃষ্টি করে এক নারীর চকিত আবির্ভাব, তার ভদ্রতা, সৌজন্য আতিথ্যের বৈপরীত্যে উন্মোচিত হয় নাগরিক নরনারীর হীন সন্দেহ, অবিশ্বাসের ছবি। গল্পের কথক ও তার স্ত্রী অনু বিহারের রাজগীর পৌঁছাতে গিয়ে ট্রেনের গন্ডগোলে পড়ে সেখানে এক রাত্রির আতান্তরে পড়ে গেল। সবে মাত্র ঘরকুনো শান্তিপ্রিয় গদ্যময় স্বামীর কবিস্ত্রী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল পাহাড় ঘেরা রাজগীরের অ্যাডভেঞ্চার প্রসঙ্গে, কল্পনায় ভেসে উঠেছিল ‘জরাসন্ধের পুরী’, বিম্বিসারের রাজধানী, ভগবান তথাগতের চরণধন্য – পঞ্চগিরির শিখর মালা-....রাজগৃহ”। তখন সেই কল্পনাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে স্বামীটি নেমে এল তীব্র বাস্তবে। রাজগীরের রাতের মতো একটা থাকার আস্তানা চাই। কুম্ভের স্নানের রোমান্টিকতাই বরং হাস্যকর ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

হঠাৎ সমস্যার সমাধান কল্পে এক তরুণীর কন্ঠে শোনা গেল বিশুদ্ধ বাংলা। পটনাগামী এই কলকাতার দম্পতিকে আদরে গৃহে স্থান দিল ঐ তরুণী ও তার মা। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিতা মেয়েটির পেছনে যেতে ঐ দম্পতির মনে কেমন যেন একটা অলৌকিক অনুভূতি জন্মাতে লাগল। মনে হল ‘অপরিচিত দেশের অন্ধকার রহস্য ঘেরা পাহাড়ের ভেতর থেকেই যেন এই রহস্যময়ী মেয়েটি বেড়িয়ে এসেছে।” মেয়েটি যেন

কী এক অপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতায় ঐ আশ্রয় সন্ধানী দম্পতিকে অভিভূত করে ফেলে। প্রৌঢ়া মা-টিও যেন নিষ্প্রাণ। মূক, রহস্যময়।হঠাৎ ওদের মনে একটা অলৌকিক ভয়ের সঞ্চার হল। স্বামীটি আর্তনাদ করে বলে মেয়েটিকে – “কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো?” ওদের মনে হয়, এ বুঝি কোনো অজ্ঞাত প্রেতলোকের দিকে যাত্রা, মেয়েটি সহজ কৌতুকে উত্তর দিল “ভয় পাচ্ছেন বুঝি? কলকাতার মানুষতো, এক মুঠো ঝোপ দেখলেই গন্ডার আর গরিলার কথা ভাবতে বসেন।” দূর থেকে সে দেখায় তাদের বাড়িটা, কেমন যেন ভৌতিক চোখের মতো আলো মিটমিট করে জ্বলে সেখানে। মেয়েটির মার্জিত শিক্ষা ও বুদ্ধির ছাপ স্বামীকে মুগ্ধ করেছিল, আর স্ত্রী অনু ক্রমশই হয়ে উঠছিল ‘কঠিন ও ঘর্মাক্ত’। রাত্রির কয়েক ঘন্টার জন্য সেই অচেনা মেয়ে নিরু ওদের পূর্ণ আতিথ্য দিল। চমৎকার খাবার জুটল। কুন্ডে স্নানও হল। তখনো গল্পের কথক ভাবতেই থাকে “শিক্ষায় , রুচিতে এবং স্বাভাবিকতায় এমন পরিপূর্ণ কে এই মেয়েটি?” স্ত্রীটির অবশ্য মনের সন্দেহ যায় না। অচেনা যুবতী মেয়েটিকে নিয়ে স্বামী সম্পর্কে সন্দিহান হয় সে। মেয়েটি মনের ব্যধির ইঙ্গিত দেয়, তারা ভালোলোক নয়, সেকথাও জানিয়ে দেয় নির্বিবাদে।

ওরা ফিরে আসে। পাহাড় থেকে ভেসে আসা হাওয়ায় রাতের রহস্য যেন আরও ঘনীভূত হয়। অপরিচিতার বাড়িতে ওরা স্বামী-স্ত্রী অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে। যাবার আগে নিরু আরও রহস্যময় কণ্ঠে বলে দেয়, ওর সঙ্গে যেন আর দেখা না হয়। রাতের অতিথিরা ক্ষণিকের অতিথি হয়েই থাক। আবার ভোর ফোটার আগেই নিরুর আতিথ্য নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ট্রেনে চেপে বসল। তখন “সূর্য ওঠেনি, শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির তমসা ফিকে হয়ে যাচ্ছে।” ধীরে ধীরে সকালের আলো ফোটে। রাত্রির রহস্য মায়াও স্পষ্ট হতে থাকে। ওদের সন্দেহের মধ্যে। কে এই নীরু। স্বামীর মনে হয় একি এক রাতের স্বপ্ন মাত্র। নিরু কি ঢাকা পড়ে গেল রাত্রির রাজগীরের রহস্যময় কোনো অবগুণ্ঠনের নীচে।

কিন্তু সকালের আলো সব কিছুকে বড় স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ করে তোলে। রহস্যময়ী রাত্রির অতিপ্রাকৃত ভাবনা সেখানে কোথাও জায়গা পায় না। অনু ততক্ষণে বুঝে নেয়, এ হচ্ছে অচেনা যুবককে বশ করার জন্য যুবতী নারীর ফাঁদ। নইলে বিবাহিত হয়েও নিরুর শাঁখা-সিঁদুর থাকবে না কেন? বিধবা মা, রাত্রিবেলায় ‘কপকপ করে কতগুলো খিচুড়ি গিললো।’ কোনো পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই অচেনা লোককে স্টেশন থেকে ডেকে এনে বাড়িতে তোলে। এইভাবে গতরাতে যে মেয়েটিকে অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্যানুভূতি দিয়ে গড়া মনে হয়েছিল, যার কাছে বুঝি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। সেই

নিরু মায়াবিনী –পণ্যা রমণীতে পরিণত হয়ে যায়, নাগরিক দম্পতির চোখে সে খারাপ, পতিতা মেয়ে হয়ে ওঠে। নিরু ভদ্রলোকের মেয়ে হতেই পারে না। তাহলে আর ভদ্রতার ঋণ স্বীকার করে কী হবে! সুতরাং পরম নিশ্চিন্তে সুখাসীন স্বামীর ঠোঁটে উঠল সিগারেট।'' ততক্ষণে ''উজ্জ্বল সূর্যালোকে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেছে, দিগন্তে মিলিয়ে গেছে পঞ্চগিরির পাণ্ডুর আবাস আর নিশীথের স্বপ্ন বিলাস।'' এক রাত্রের বিপদের মধ্যে আশ্রয়দাত্রী নিরুর স্মৃতিই ফিকে হয়ে গেল এমন করে।

'জান্তব গল্পে পাইন দেওদারে ছাওয়া ছোট্ট গ্রামে যেন এক অলৌকিক ভীষণ পুরুষের মতো মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয় গুম্ফা লামা, যার বয়সের বুঝি কোনো গাছ-পাথর নেই। পাহাড়ীরা ওকে ভয় পায় খুব, সে যেন ''এদেশের দুর্বোধ্য রহস্য এবং দুর্বোধ্য ভয়। সে মানুষ কিংবা অপদেবতা অথবা আর কিছু এ সম্বন্ধেই যথেষ্ট সন্দেহ তথা সংশয় আছে।'' কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে যতই অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকের পরিবেশ গড়ে উঠুক না কেন, সে রহস্যজাল ছিন্ন হয়ে বাস্তবের মনস্তত্ত্বে পৌঁছতেও পাঠকের দেরী হয় না। তাই গুম্ফালামার অতীতের মনস্তত্ত্বকে এর পরেই উন্মোচিত করেন লেখক। তাকে দেখে যতই মনে হোক না কেন, ও একটা 'অমানুষিক মানুষ',কিন্তু গুম্ফা লামা সত্যি সত্যিই মানুষ।তবে কতদিনের যে মানুষ সেকথা গুম্ফা লামার নিজেরও স্মৃতি থেকে বোধহয় মিলিয়ে গিয়েছে।'' গুম্ফা লামার সঙ্গী শুধু একটি হিংস্র কুকুর। মানুষ ওদের দেখে ভয় পায়। আর গুম্ফা লামা জানে মানুষ তার শত্রু। ত্রিশ বছর আগেও ছিল তার সুখী বিবাহিত জীবন। স্ত্রী মাইলিকে সে পাগলের মতো ভালোবাসত। কিন্তু মাইলি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে 'রাত কাটাতে আরম্ভ করলো কুঁজো কালো একটা বাঙালির সঙ্গে।'' তারপর মাইলির সেই প্রেমিককে হত্যা করে গুম্ফা লামা হল দেশান্তরী। ফাঁসির দড়িতে তার বড় ভয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী মাইলিকে আজও সে বুকের ভেতর খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ ঘোরতর শীতের রাত্রিতে গুম্ফালামা অতীতের স্মৃতিতে উত্তাল হয়ে উঠে। কিন্তু একটা মাত্র ছেঁড়া কম্বলের ভাগাভাগি নিয়ে সেই একান্ত বিশ্বস্ত সহচর কুকুরটার সঙ্গেই বিবাদ প্রকট হয়ে ওঠে গুম্ফা লামার। উষ্ণতা প্রয়াসী কুকুরটা যখন তার এতকালের প্রভুর প্রতিও হিংস্র হয়ে ওঠে, গুম্ফা লামা মেরে ফেলে কুকুরটাকে। লাল্লু ছিল তার চির সহচর, তাকে সে মেরে সরিয়ে দিল পাহাড়ের মাথা থেকে। ''আজ সে নিঃসঙ্গ। এতদিন পরে বিরাট পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ।'' যাকে অতীন্দ্রিয় অশীরীরী শক্তিমান মনে করত গাঁয়ের সাধারণ মানুষ, সেই গুম্ফা লামাম এবার মানুষী আর্তনাদে, অনুশোচনায় ভেঙে পড়ল। সে ভাবলো

“লাল্লু তো মাইলি নয়। তার জীবনে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সান্ত্বনা। সে, কী করল?” বিশ্বস্ত লালু আর সাড়া দেবে না মনিবের ডাকে। শেষ পর্যন্ত দিশাহারা ভাবে লালুকে খুঁজতে গিয়ে পাহাড়ী বন-কুকুরের সম্মিলিত কামড়ে মৃত্যু হয় গুম্ফা লামার। ‘জান্তব’ প্রতিশোধ আর মানুষী অনুশোচনার আশ্চর্য গল্পলোকটিকে এই ভাবেই নির্মাণ করেন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ কামনাও কখনো কখনো নারীকে রহস্যময়ী করে তোলে, ‘দুর্ঘটনা’ গল্পে স্টোবের আগুনে পুড়ে যাওয়া ইন্দিরা তাই মিথ্যা গল্প বানিয়ে বিভাস-ইলার সুখের সংসারটা ভেঙে দিতে পারে। ‘পুষ্করা’ গল্পে কলেরা মহামারীর ভয়ংকর পরিবেশে শ্মশানের কালো রাত্রির বুকে তর্করত্ন যখন ভাবে, দেবী এসে শিবাভোগের মাংস নিজে খেয়ে গেছেন, এবার গ্রামকে তিনি রক্ষা করবেন মহামারী থেকে, কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় ঘুচে যাবে নিরন্নের মনের অন্ধকার, রিক্ত ভাণ্ডার হবে শস্য শ্যামলা, তখনই বোঝা যায় – কোথাও সত্যকার কোনো অতীন্দ্রিয়তা নেই এখানে। আসলে তর্করত্নের “শশ্মান কালী এসেছিল ওই ঢোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই।” মা কালির মতোই জিভ বার করে সে শেষ নিঃশ্বাস নেবার অপেক্ষায় মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করছে। শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও যে কখনো অতীন্দ্রিয় রহস্যময়ী প্রেমিকার মত প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, তার নিদর্শন ধরা পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বনতুলসী’ গল্পে, সেখানে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে কামার্ত, সর্বগ্রাসী ভালোবাসা গড়ে ওঠে। বনতুলসীর ঊর্ণনাভ প্রেম এখানে যুবকটিকে হননের পথে টেনে নিচ্ছিল। “প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ...মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও ইন্দ্রিয়াত্মক প্রবৃত্তির করাল রূপ শুধু রহস্যময় নয় ভয়ঙ্করও। এইভাবে আশ্চর্য বর্ণনার মায়ায়, কাব্যিক ভাষার জাদুতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমন এক বিচিত্র গল্পলোক নির্মাণ করেন, যা তাঁকে করে তোলে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক স্বতন্ত্র অভিনব রূপকার।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

২. সাহিত্যে ছোটগল্প : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩. গল্পচর্চা : সম্পাদনা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রামমোহন’ নাটক : একটি পর্যালোচনা

অভিজিৎকুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ (Abstract) : *বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব প্রকরণগুলিতে নানা বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই প্রকরণগুলির মধ্যে অন্যতম নাটক। তাঁর নাট্যসম্ভারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন জীবনী-নাটক ‘রামমোহন’। কুড়ি বছর বয়স থেকে শুরু করে বিলাত যাওয়ার আগে পর্যন্ত রামমোহন রায়ের জীবন কেন্দ্রিক নাটক ‘রামমোহন’। এই নাটকে সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা, প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত রামমোহনের জীবন উপস্থাপিত। বৃত্তগঠন, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ রচনা, গানের প্রয়োগ ও দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতি সৃজনে নাটকটিতে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নাটকটির কাহিনির বেশির ভাগই রামমোহনের বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে কোনো কোনো নাট্য সমালোচক গঠনগত দিক থেকে যেমন সামান্য ত্রুটির সন্ধান পেয়েছেন তেমনি দু-একটা ক্ষেত্রে কাল্পনিক বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রামমোহনের জীবনী নয়, তাঁকে নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাই সম্ভাব্য বিষয়ের আশ্রয় নিয়ে ‘রামমোহন’-কে করে তুলেছেন যথার্থ জীবনী-নাটক।*

সূচক/মূলশব্দ (Key Word) : *প্রগতিশীল, জীবনী-নাটক, সংস্কারমুক্ত, স্বধর্মপরায়ণা, সতীদাহ, পঞ্চসন্ধি, সহমরণ, সর্বধর্ম-সমন্বয়, সংগ্রামশীল, উদার, দ্বন্দ্বময়।*

মূল আলোচনা (Discussion) :

বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব প্রকরণগুলিতে নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য আঙ্গিকে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ‘উপনিবেশ’ থেকে শুরু করে ‘মন্দ্রমুখর’, ‘লালমাটি’, ‘পদসঞ্চার’, ‘নিশিযাপন’ প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস যেমন তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে তেমনি ‘বীতংস’, ‘ভাঙ্গাবন্দর’, ‘দুঃশাসন’, ‘ভোগবতী’ প্রভৃতি গল্প সংকলনও রয়েছে তাঁর সৃষ্টির সম্ভারে। ‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’, ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’, ‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি তাঁর রচিত প্রবন্ধ সংকলন। এছাড়া তিনি রচনা করেছেন ৬০টির

মতো গান ও কবিতা। প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার ধারক ও বাহক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার আধুনিক নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ। এর ফলশ্রুতিতেই জীবনী নাটক, গুরুরসাত্মক নাটক, কৌতুক নাট্য, শিশু নাট্য, একাঙ্ক নাটকের মতো বিভিন্ন ধরনের নাটক আমরা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। 'অভ্যর্থনা', 'আগন্তুক', 'এক সন্ধ্যায়', 'ঘুম পাড়ানী গান', 'চারমূর্তি', 'চোরাবালি', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'পান্থনিবাস', 'প্রাচীর', 'বারো ভূতে', 'ভাড়াটে চাই', 'রামমোহন', 'শহীদের ডাক' প্রভৃতি হল তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক। এগুলির মধ্যে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ও 'রামমোহন' জীবনী বিষয়ক নাটক। তবে জীবনী-নাটক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে 'রামমোহন' (১৯৫২) নাটকটি।

রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র জীবন স্থান পায়নি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নাটকে। কুড়ি বছর বয়স থেকে শুরু করে বিলাত যাত্রার আগে পর্যন্ত রামমোহন রায়ের জীবন কেন্দ্রিক নাটক 'রামমোহন'। মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের নয়ের দশকের শেষ ভাগ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা, প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত রামমোহনের জীবন নিয়ে এ নাটক রচিত। নাটকটি শুরু হয়েছে পরম বৈষ্ণব পিতা দেওয়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধের মধ্য দিয়ে। মাতা তারিণী দেবীর সঙ্গেও নাস্তিক রামমোহনের চরম বিরোধের চিত্র নাটকে বর্তমান।[১] স্বধর্মচ্যুত রামমোহনকে পিতৃ শ্রাদ্ধের অধিকার দেননি ক্ষিপ্ত মাতা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নাটকে রামমোহনের আদর্শ জয়লাভ করলেও কঠোর আদর্শবতী, স্বধর্মপরায়ণা জননী তারিণী দেবীর চরিত্রটি স্পর্শ করে যায় আমাদের হৃদয়। ভ্রাতৃবধূর সহমরণ দেখে বিচলিত রামমোহন সমাজ থেকে এই প্রথা নিবারণ করার জন্য উৎসর্গ করেন নিজ জীবন ও যৌবন। সমগ্র নাটকে তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভোলানাথ মুন্‌সী, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ দত্ত প্রমুখ উপস্থিত। শেষ পর্যন্ত বেন্টিকের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা নিরসনের বিল পাশ করাতে সমর্থ হয়েছেন রামমোহন। এর জন্য রামমোহনের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিরা। এ সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করে তিনি যে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন, অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নাটকে তা ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার। আসলে রামমোহনের সংগ্রামী বাস্তব জীবনের চিত্র এ নাটকে প্রস্ফুটিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' (১৯৫২) নাটকটি চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি করে দৃশ্য বিভাগ। সংগ্রামী, কর্মযোগী, যুক্তিবাদী, রামমোহনের জীবনকাহিনি এ নাটকে রূপায়িত। যার ফলে নাটকটিতে রক্ষিত হয়েছে ক্রিয়া ঐক্য (Unity of action)। তবে কাহিনির প্রবহমানতার ক্ষেত্রে কিছুটা যোগসূত্রের অভাব চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক সময় একটা দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও ভাবের সমন্বয় নাট্যকার সব সময় রক্ষা করেছেন। আর নাট্য ঘটনাগুলি লাঙ্গুলপাড়া, রাধানগর এবং কলকাতায় সংগঠিত হওয়ায় স্থানগত ঐক্য (Unity of Place) খুব একটা বিঘ্নিত হয়নি।[২] এই স্থানগুলিকে কেন্দ্র করেই নানাবিধ কার্য সম্পন্ন করেছেন রামমোহন। আর নাট্যকার যেহেতু রামমোহনের বিলাত যাত্রার আগেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন তাই নাট্য ঘটনাগুলি খুব দূরবর্তী স্থানে ঘটেনি। অন্যদিকে প্রায় তিন দশক ধরে রামমোহনের জীবনের নানা ঘটনা উপস্থাপিত হওয়ায় সব সময় কাল ঐক্য (Unity of time) রক্ষিত হয়নি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন পিতা রায়রায়ান রামকান্তের বাড়িতে নাট্য কাহিনির সূত্রপাত। এই কাহিনি শেষ হয়েছে বিলাত যাবার আগে স্ত্রী উমা দেবীর সঙ্গে রামমোহনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। নাটকে যেভাবে নানা বয়সের রামমোহন-কে আমরা পেয়েছি তাতে সময়গত ঐক্য রক্ষায় নাট্যকার যথার্থতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

'রামমোহন' নাটকটিতে যে নাটকীয় পঞ্চসন্ধি বিষয়টি রয়েছে তা যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই পৌত্তলিকতা বিরোধী, স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী, উদার মানসিকতার রামমোহনের সঙ্গে পিতামাতার মত পার্থক্যের মাধ্যমে নাট্যদ্বন্দ্বের সূচনা।[৩] যাকে মুখসন্ধি (Introduction) বলা হয়। এই অঙ্কেই নাস্তিক রামমোহনের সঙ্গে মত পার্থক্য বাড়তে থাকে তাঁর পরিবারের। স্ত্রী উমা, বউদি অলকা নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন তাঁকে। কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তিনি। মায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকা সত্ত্বেও, মায়ের ইষ্ট দেবতা রাজ রাজেশ্বর, রাধারাণীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি। তাই ক্ষিপ্ত মাতা তারিণীদেবী তাঁকে পিতৃ শ্রাদ্ধের অধিকার দেননি। এই ঘটনায় নাট্য বিষয় মুখসন্ধি অতিক্রম করে প্রতিমুখসন্ধিতে (Rising action) পৌঁছেছে। অগ্রজ জগমোহনের মৃত্যুর পর বৌদি অলকাকে সহমৃতা হতে দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে পড়ে রামমোহনের। বৌদির জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেও দেশ থেকে সহমরণ দূর করার সংকল্প করেন তিনি। এর ফলে পরিবার ও কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজপতিদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। পৈতৃক

বাড়ী পরিত্যাগ করে রাধানগরে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে বাধ্য হন। মাতা তারিণী দেবীর উৎসাহে রামজয় বটব্যাল রামমোহনকে বিতাড়ন করেন সেখান থেকেও। দ্বিতীয় অঙ্কের এই ঘটনায় নাট্য দ্বন্দ্ব আরো ঘনীভূত হয়ে পড়ে। তৃতীয় অঙ্কে এই বিরোধ ধারণ করে চরম আকার। রামমোহন কলকাতায় গিয়ে বিদ্যাচর্চা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন নিবিড় ভাবে। উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্যক্তি ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্‌সী, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ দত্ত, কালীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি রামমোহন বিরোধীদের কথা এই দৃশ্যে চিত্রায়িত। তাঁরা সুকৌশলে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতি থেকে বাদ দিয়েছেন রামমোহনকে। এইভাবে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্ম নিবেদিত রামমোহনের জীবন যখন টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে তখন মাতা তারিণী দেবীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁর। চিরাচরিত প্রথায় বিশ্বাসী মাতা তারিণী দেবী ম্লেচ্ছ পুত্রের গৃহে জল স্পর্শ না করে চলে গেছেন। এই ঘটনায় নাট্য বিষয় চরম বিন্দুতে অর্থাৎ গর্ভসন্ধিতে (climax) উপনীত হয়েছে। এই অঙ্কের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দৃশ্যটি সংঘটিত হয়েছে তৎকালীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের প্রাসাদে। তখন সতীদাহ প্রথা নিরসনের ব্যাপারে রামমোহনকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বেন্টিক। মানুষ বেন্টিক যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে তাও এই দৃশ্যে ব্যক্ত। এখান থেকেই নাট্য ঘটনা চরম অবস্থা অতিক্রম করে বিমর্ষসন্ধির (Falling action) দিকে যাত্রা শুরু করেছে। চতুর্থ অঙ্কে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ 'ধর্মসভা'র নেতৃত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সতীদাহ বিরোধী বিল পাশ হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত রাধাকান্ত দেবরা কামনা করেছে রামমোহনের মৃত্যু। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে জনতাকে। এই বিলকে রদ করার জন্য ফান্সিস বেথিকে পাঠানো হয়েছে বিলাতে। রামমোহনও দিল্লীর বাদশাহের দূত গিরিকে উপলক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরে, বেথির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার মূল লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা করেছে বিলাত। তাঁর সঙ্গী হয়েছে রাজারাম। যে রাজারাম প্রসঙ্গে নাটকের একেবারে শেষে রামমোহন বলেছেন – "...হ্যাঁ, ওই আমার সঙ্গে যাবে। বাপ-মা-মরা মুসলমানের ছেলে, সাহেবরা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল, আমি ওকে সন্তান বলে বুকে টেনে নিয়েছি। মুসলমান-খ্রীশ্চান-হিন্দু ও তো কেহ না। ওর কোনো জাত, কোনো ধর্ম নেই, তাই ও সকলের।" অর্থাৎ নাটকটি পরিসমাপ্তিতে বা উপসংহৃতি সন্ধিতে (catastrophe) পৌঁছেছে কুসংস্কার দূরীকরণ ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে। সুতরাং

নাটকীয় পঞ্চসন্ধির মধ্য দিয়ে যে ‘রামমোহন’ নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত, সে কথা বলা যেতেই পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রামমোহন’ নাটকে বহু চরিত্রের ভিড়। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির চরিত্র থাকলেও সক্রিয় চরিত্র তুলনামূলক কম। রামমোহন, রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণী দেবী, অলকা (অলকমণি) দেবী, উমা দেবী অত্যন্ত সক্রিয় চরিত্র। ন্যায়রত্ন, পুরোহিত, দেওয়ান, নবকিশোর রায়, রামজয় বটব্যাল, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ রায়, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দকিশোর বসু, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ দত্ত, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চরিত্রের নাট্য ঘটনায় কমবেশি অবদান থাকলেও অন্যান্য চরিত্রগুলি একেবারেই নিষ্ক্রিয়। এদের অনেকের সংলাপ পর্যন্ত নেই। আসলে রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত। নাটকে আদর্শবাদী, কুসংস্কারমুক্ত, কর্মযোগী, মানবিক, সংগ্রামশীল, যুক্তিবাদী, শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী রামমোহন চরিত্র নানা ঘটনার মাধ্যমে রূপায়িত। রামমোহনের পিতা রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ী মানুষ। তিনি শুধু ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, সেই সঙ্গে বিশ্বাস রাখেন বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারে। প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার অধিকারী রামমোহনের আচরণ পছন্দ করেন না তিনি। নাস্তিক রামমোহনের আচরণে মাতা তারিণী দেবীও অত্যন্ত বিরক্ত। এজন্য তিনি রামমোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বামী রামকান্তকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি রামমোহনকে পিতৃ শ্রাদ্ধের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা প্রসঙ্গে বলেছেন – “নাস্তিক, কুলাঙ্গার, এ শ্রাদ্ধে তোমার অধিকার নেই। আর (কাঁপতে লাগলেন) এই মুহূর্তে – এই মুহূর্তেই এ বাড়ি থেকে তুমি বেরিয়ে যাবে।” রামমোহনের স্ত্রী উমা দেবী সাধারণ গৃহস্থ নারী। স্বামী রামমোহনের বাবা-মায়ের মতের বিরুদ্ধে যাওয়াটা পছন্দ করেননি তিনি। গতানুগতিক জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী উমা দেবী স্বামীর কাজের সমর্থক না হলেও, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সর্বদা তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। এমনকি রামমোহনের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাঁকে বিলাত যেতে বাধা দিয়েছেন। অলকা বা অলকমণি দেবী রামমোহনের বৌদি। তাঁর থেকেই আমরা জানতে পেরেছি ছোটবেলা থেকেই রামমোহন জেদি এবং যুক্তিবাদী। তিনি রামমোহনকে বারবার বাবা মায়ের মতের অনুগামী হবার কথা বলে, ব্যর্থ হয়েছেন। নাটকে তাঁর সতী হওয়ার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

তাঁরাচাঁদ দত্ত, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ রামমোহন বিরোধিতায় ভাস্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের সংস্কারমুক্ত, উদার মানসিকতা নাটকে উদ্ভাসিত। অন্যান্য চরিত্রগুলিও স্বল্প পরিসরের মধ্যে যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে নাট্যকারের দক্ষতায়।

চরিত্রানুসারী সংলাপ প্রয়োগে এই নাটকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বংশ মর্যাদায় বিশ্বাসী, ঈশ্বর ভক্ত দেওয়ান রামকান্তের পরিচয় তাঁর সংলাপে প্রকাশিত। রামমোহন প্রসঙ্গে স্ত্রী তারিণী দেবীর কথার উত্তরে তিনি বলেছেন –“কি লিখেছিল। (উত্তেজিত) তুমি দেখোনি সে খাতা, আমি দেখেছি। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা নিয়ে সে কী যুক্তিতর্ক আর কটু সমালোচনা। ভাবতে পারো ফুলু, রায়রায়ান কৃষ্ণচন্দ্রের বংশে এমন অনাচার, বিষ্ণুমন্ত্রে যাদের নিত্য উপাসনা, যাদের ওপর প্রভু রাজরাজেশ্বরের আশীর্বাদ – সেই বংশের ছেলে আজ বিগ্রহ পূজোর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়।” আবার সন্তান রামমোহনের প্রতি তারিণী দেবীর স্নেহ থাকলেও ধর্ম এবং স্বামীর মতামতকে তিনি যে সবার ওপরে রেখেছেন তা তাঁর কথাতেই ব্যক্ত – “জানি সব জানি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। সমাজ, ধর্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে। সে যেই হোক, কেমন করে তাকে স্বীকার করব? সন্তানের চেয়ে ধর্ম বড়। তারও চেয়ে বড় আমার স্বামীর আদেশ।” রামমোহনের সংলাপে বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। মা তারিণী দেবীর সঙ্গে কথোপকথনকালে তিনি যখন বলেন – “আমি বলতে চাই একটি মাত্র পথে সব সমস্যার সমাধান আছে। হিন্দুর হোক – মুসলমানের হোক – ঈশ্বর একমাত্র; ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই এক অদ্বিতীয়ই সারা ভারতবর্ষকে এক সঙ্গে মেলাতে পারে – হিন্দু মুসলমানের ভেদ ঘোচাতে পারে – দেশ জুড়ে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে পারে।” তখন তিনি যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় অটল সেটা অনুধাবন করা যায় সহজেই।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে স্বামী জগমোহনের মৃত্যুর পর, সহমৃতা হবার জন্য যখন তাঁর স্ত্রী অলকাকে চিতায় তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন তাঁর উক্তি – “...আমার সন্তানকে ফেলে আমি মরতে পারবো না। আমি শুনতে পাচ্ছি সে আমার জন্যে কাঁদছে, (আর্ত চিৎকারে) বাবা – আমি আসছি – আমি আসছি – তোকে ছেড়ে কোথাও আমি যেতে পারব না-” এই সংলাপে যে আকর্ষিকতার সৃষ্টি হয়েছে তা সৃজন করেছে বিশেষ নাট্য পরিস্থিতি। এমনকি সংলাপটি নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সহায়তা

করেছে। আসলে নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমের যাদুস্পর্শে এ নাটকের সংলাপ হয়ে উঠেছে যথাযথ।

নাটকে গান অনেক সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য এই নাটকে গানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সমগ্র নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র একটি গান। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ব্যবহৃত এই গানটি খুব সংক্ষিপ্তাকারে খোল করতাল সহযোগে উপস্থাপিত। রামমোহনের চেষ্টার ফলে সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ হয়। তখন তাঁকে আক্রমণ করে হাসি ও জীবজন্তুর ডাকের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য সহযোগে গাওয়া হয়েছে-

"ব্যাটার সুরাইমেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল-
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল
ওঁ তৎ সৎ বলে বানিয়েছে ইস্কুল,
ধর্মাধর্ম গেল ব্যাটা মজালে জাতকুল!"

কিছুটা সংলাপের পর আবার শোনা যায়-

"ওঁ তৎসহ বলে ব্যাটা
মজালে জাতকুল।"

আসলে এই গানের দ্বারা নাট্যকার তুলে ধরেছেন তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র।

দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। এই নাটকটিও অগ্রসর হয়েছে দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। পিতামাতার সঙ্গে রামমোহনের দ্বন্দ্ব যেমন নাটকে পরিবেশিত তেমনি রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী রাধাকান্ত দেব প্রমুখের সঙ্গে সমাজ সংস্কারক রামমোহনের দ্বন্দ্বও স্পষ্টাকারে প্রতিভাত। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করি এই দ্বন্দ্ব। তবে রামমোহন, তার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা তারিণী দেবী প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়। মায়ের কথা মতো গৃহ দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করায়, রামমোহনকে মায়ের থেকে দূরে সরে আসতে হয়েছে। তবু নিজের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাস থেকে তিনি সরেননি। কিন্তু পরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলেছেন – "রিস্‌ক্'। রিস্‌ক্' সেদিনই চরম নিয়েছি – যেদিন আমার অমন মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত আমি সম্পর্ক রাখতে পারিনি। আজ আমার কাউকেই আর ভয় নেই দ্বারকানাথ।" একথার মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বময় রামমোহনের হৃদয়টি আমাদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

রামমোহনের মাতা তারিণী দেবীর আচরণেও অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন ম্লেচ্ছ, নাস্তিক পুত্রকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন তিনি। পরে সেই মাতাই বলেছেন – "আমি যাচ্ছি মেজ বৌ! মোহন, তোমায় আজ আমি অভিশাপ দেব না – আশীর্বাদও করব না। শুধু বলে যাই – যে সত্যের ওপর ভর দিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ, তা থেকে তোমার পা যেন কখনো না টলে।"

আবার রামমোহনের পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেন – "কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র করলেও সে যে এই বংশেরই সন্তান। আমার রক্ত তার শরীরে।" তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয়টি। তাই বলা যায় 'রামমোহন' নাটকটিতে নানা রূপ দ্বন্দ্বের স্রোত ধারা প্রবাহিত।

এই নাটকটির বৃত্তগঠনে কিছু ত্রুটি থাকলেও চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায়, দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি সৃজনে নাট্যকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীকে যতটা সম্ভব বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে। আমরাও বিভিন্ন লেখকের রামমোহন জীবনী পাঠ করে উপলব্ধি করতে পারি এ নাটকে চিত্রিত বিষয়গুলি বেশির ভাগই ইতিহাস সম্মত। তবে বৌদি অলকার সতী হবার সময় রামমোহন সেখানে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন কিনা তা নিয়ে অনেকে রামমোহন বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪] অনুরূপভাবে নাটকে চিত্রিত আরও দু-একটি ঘটনা ইতিহাস সম্মত কিনা তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যকার ইতিহাস অনুসারী। নাটকের ভূমিকায় তিনি স্বীকারও করেছেন – "রামমোহন সম্বন্ধে যে সমস্ত উপকরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলির ওপর নির্ভর করে এবং ঐতিহাসিক সততাকে যথাযোগ্য রক্ষা করেই অগ্রসর হতে চেয়েছি। স্বাধীনতা নিয়েছি নামমাত্র এবং যেটুকুও নিয়েছি তা কল্পনাশ্রিত নয় – সম্ভাব্যতার (Probability-র) ওপরেই নির্ভরশীল।" আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহনের জীবনী নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে নাটক লিখতে চেয়েছেন। তাই খুব কম হলেও প্রয়োজন অনুসারে হয়তো সম্ভাব্যতার পথে গমন করেছেন। সব মিলিয়ে 'রামমোহন' যে যথার্থ জীবনী-নাটক হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৫] এখানেই নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, জুন- ১৯৯৯, পৃ. ৪২৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মাঘ-১৪১৩, পৃ. ৩১।

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মে-২০০৩, পৃ. ৩৬৬।

সহায়ক গ্রন্থ (References) :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা – ১৩৮৬।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মাঘ – ১৪১৩।

৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, সুর এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৮৯৭।

৪. সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মাস্টার মশাই, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০১৮।

৫. সরোজ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে – ১৯৯৬।

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মে-২০০৩

৭. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, জুন-১৯৯৯।

৮. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র-১৪০১।

৯. Sophia Dobson Collet, The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, Fourth Edition – 1994.

সুন্দরবনে চিংড়িচাষ, সমাজ-অর্থনীতি ও পরিবেশ প্রসঙ্গ

উজ্জ্বল বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সারসংক্ষেপ: *বিগত ৩০ বছর ধরে সুন্দরবনে জীবিকা অর্জনের বিকল্প উপায় হিসাবে মেছো ঘেরীতে চিংড়ি চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মূলত তিন ধরণের মানুষ এই পেশার সঙ্গে জড়িত। চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পোনা বা মীন যারা নদী থেকে সংগ্রহ করে তারা মীনধরা, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র নারী। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে মীন ক্রয়কারী এজেন্ট, যাদের কাজ মীনধরাদের কাছ থেকে মীন কিনে প্রকৃত চিংড়ি চাষীকে বিক্রি করা। আর সবশেষে আছে মেছো ঘেরীর মালিক, যারা প্রভূত ধনশালী। এই অর্থ আগমনের সূত্র ধরে সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। চিংড়ি চাষ সুন্দরবনে ধনবৈষম্য বাড়িয়েছে। প্রাচীন মৎস্যজীবি সম্প্রদায় এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। বলপূর্বক ঘেরী দখল, চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া, রাজনৈতিক দল গুলির নিজ নিজ প্রভাবাধীন ক্ষেত্র তৈরী করা – বর্তমানে সুন্দরবনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাশাপাশি মীনধরা ও চিংড়ি চাষের ক্ষতিকর দিক গুলি সম্পর্কে সরকারী- বেসরকারী- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ ঘনীভূত হচ্ছে। তবে এই প্রতিবাদ সামগ্রিক ভাবে চিংড়ি চাষের উপর না পড়ে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মীনধরাদের উপর বর্ষিত হয়।*

সূচকশব্দ: *মীনধরা, মেছো-ঘেরী, আবাদে লোক, ইকোলজি, ঘেরী মালিক, নারীর ক্ষমতায়ন।*

মূল প্রবন্ধ:

ভারতে মৎস্য চাষের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। দেশের পূর্ব দিকের রাজ্য গুলিতে পুকুরে বা বড় জলাশয়ে যে মাছ পালন হত তার ইতিহাস শতাব্দী পুরাতন। তবে সেক্ষেত্রে নদী নালা থেকে ধরা মাছ পুকুরে ফেলে লালন করা হত মাত্র, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাছের পোনা তৈরী করে মৎস্য চাষ অনুপস্থিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্রিড ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম ১৯৭০ সাল নাগাদ মৎস্য চাষের সূত্রপাত ঘটে।[১] একই পদ্ধতি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় ও সাফল্য আসে। মনে রাখা দরকার ইতিমধ্যে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে গেছে।

সুতরাং বানিজ্যিক চিংড়ি চাষ ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র উপকূলবর্তী মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেয়।

বাঙালীর মৎস্য প্রীতি প্রায় প্রবাদে পরিণত। সেই তালিকায় চিংড়িও বাদ যায় না। চিংড়ি ও ইলিশের লড়াই তারই প্রমাণ দেয়। কিন্তু মাছ ধরা যাদের পেশা অর্থাৎ যারা 'জেলে' বা 'মৎস্যজীবী', সমাজে তাদের স্থান নিচের সারিতে। ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবী জাতির মধ্যে জেলিয়া কৈবর্ত, মালো, তিওর, বাগদি, দই, ঘাসি অন্যতম।[২] প্রাচীন শাস্ত্র, আইন গ্রন্থে এইসব জাতি গুলি 'শূদ্র' বা 'অন্তজ' হিসাবে চিহ্নিত, এমনকি প্রায়শই সেগুলি 'অস্পৃশ্য' হিসাবেও বর্ণিত। বর্তমানে এরা SC/ST সম্প্রদায়ভুক্ত। জাতিগত নিম্নাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ সঙ্গীন। 'পদ্মা নদীর মাঝি' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য চিংড়ি চাষিদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নব উত্থিত এই পেশায় কোন জাতিগত ব্যবধান নেই, বিভিন্ন ধর্মের ও শ্রেণীর মানুষ এর সঙ্গে সংযুক্ত। বিদেশী মুদ্রা আনার কারণে মেছো-ঘেরীতে চিংড়ি চাষ 'লিভিং ডলার' (living dollars) হিসাবে প্রতিপন্ন।[৩] অর্থাৎ সুন্দরবনের চিংড়ি কারবারীরা বেশ ধনশালী এবং চিংড়িচাষ সহজে বড়লোক হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোন নৈকট্য আপাত সদৃশ্য এই দুই পেশার মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

ব্রিটিশদের হাত ধরে সুন্দরবনে যে চাষবাসের কাজ শুরু হয়েছিল, তার গুরুত্বপূর্ন বিষয় ছিল বাঁধ। বাঁধ তৈরী করে নোনাজল আটকে চাষের পদ্ধতি ভারত সরকারও গ্রহণ করে। সুন্দরবনে এখনও বড় অংশের মানুষ কৃষিজীবী। এ অঞ্চলে কৃষির সবথেকে বড় সমস্যা হল প্রাকৃতিক বিপর্জয়, বারংবার বাঁধে ফাটল, বন্যা, নোনাজল ঢুকে কয়েক বছরের জন্য কৃষিকে অনুপযুক্ত করে তোলা, নদী ভাঙ্গন ও তার ফলে জমি হারানো,নতুন বাঁধ নির্মানের জন্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সরকার কর্তৃক জমি দখল ইত্যাদি। তাছাড়া 1987 সালে UNESCO কর্তৃক সুন্দরবন World Heritage Site হিসাবে ঘোষিত হয়। সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য ভারতের উপর আন্তজার্তিক চাপ বৃদ্ধি পায়। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্দরবনে বহু প্রচলিত মধু-মোম-মাছ-কাঁকড়া-কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা খুব সঙ্গীণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সুন্দরবনে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য BLC (boat license certificate) পাওয়া খুব কষ্টকর। এরপরও আছে বনবিভাগের সুরক্ষাকর্মীদের বিবিধ অবৈধ অত্যাচার (জঙ্গল থেকে ধরা

মাছ, কাঁকড়া, মধু কেড়ে নেওয়া, নৌকা বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি)। এসবের মাঝখানে সুন্দরবনে জনবসতি কিন্তু কমেনি, বরং বেড়েছে, যার অন্যতম কারণ দেশভাগ ও নিরন্তর অভিপ্রয়াণ। স্বভাবতই প্রয়োজন বিকল্প জীবিকার সন্ধান।

সুন্দরবনের পরিবেশ নোনা জলে মাছ চাষের (Brackish water fish farming) জন্য আদর্শ স্থান। বিশ্বের অন্যান্য দেশে নোনা জলে চিংড়ি চাষে সাফল্য মিললে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশেও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। মৎস্য গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও চাষীদের নিরন্তর পর্যবেক্ষণের ফলে চিংড়ি চাষ ভারতে শিকড় গড়তে শুরু করে।[৪] ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ভারত চিংড়ি চাষে প্রভূত উন্নতি করে। ভারতের মাছ রপ্তানীর ২২% চিংড়ি এবং বিশ্বের মধ্যে চিংড়ি উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে। ভারতের অন্যান্য উপকূলবর্তী রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও চিংড়ি চাষ শুরু হয়, চাষের এলাকা গুলি সাধারণত 'মেছো-ঘেরী' (আয়তনে সাধারণত ২ হেক্টরের কম) নামে পরিচিত, যেখানে অধিক সংখ্যায় বাগদা চিংড়ির (Penaeus Mondon) চাষ হয়।

চিংড়ি চাষের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সংযুক্ত। চাষের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিংড়ির মীন (prawn seed) বা পোনা। মীন দুভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে – হ্যাচারীতে কৃত্রিম ভাবে তৈরী করে, অথবা প্রাকৃতিক ভাবে নদী থেকে সংগ্রহ করে। আমাদের রাজ্যে হ্যাচারী কম। তাছাড়া হ্যাচারী মীনের সবথেকে বড় সমস্যা আসে ১৯৯৪ সালে। চিংড়িতে WSSV নামক একটি রোগ হয়। রোগগ্রস্থ চিংড়ি বিদেশে রপ্তানী বন্ধ হয়। এতে চিংড়ি চাষীদের বহু ক্ষতি হয়।[৫] তখন দেখা যায় নদী থেকে সংগ্রহ করা মীনে সে সমস্যা অনেক কম। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী। সুন্দরবনের নদী-নালার জলে মীন সহজলভ্য ও সুপ্রচুর, এর চাহিদাও বেশী। এই মীন বিদেশেও রপ্তানী হয়।[৬] সুন্দরবনে মীন ধরার কাজে যারা জড়িত তারা অধিকাংশই নারী। এই জীবিকা অনেকটা প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহের মতই।

চিংড়ি চাষের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে মীন ক্রয়কারী কুঠি মালিক বা এজেন্ট। এরা এক ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগী। এদের কাজ হল মীনধরাদের কাছ থেকে মীন কিনে চিংড়ি চাষী বা ঘেরী মালিককে সরবরাহ করা। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব প্রকৃত চিংড়ি চাষীকে বা ঘেরী মালিককে। এরা নিজের জমিতে বা লিজ নেওয়া জমিতে মাছ লালন করে এবং তা বাজারে বিক্রির জন্য তৈরী হয়। চতুর্থ পর্যায়ে আছে মাছ

ব্যবসায়ী বা বড় মাছ ডিলার , যাদের মাধ্যমে চিংড়ি পসেসিং হয়ে বিদেশে রপ্তানী হয়। সর্বশেষ ক্ষেত্রটি সুন্দরবনে হয় না, তা সাধারণত শহর কেন্দ্রিক ঘটনা। এখানে আমরা প্রথম তিনটি শ্রেণীর লোক, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, চিংড়ি চাষের ইকোলজিকাল এফেক্ট, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরেরে ভূমিকা, এই চাষের প্রতি সরকারী-বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে আসা যাক মীনধরাদের কথায়। সুন্দরবনের নদীর পাড়ে জলে দাঁড়িয়ে মীনধরারা, যাদের অধিকাংশই নারী, তারা মশারির মত নেট ব্যবহার করে বাগদার মীন ধরে। তারা আর্থ-সামাজিক ভাবে একেবারেই প্রান্তিক। অন্যভাবে বলা যায়, সুন্দরবনের সবথেকে প্রান্তিক মানুষরা মীনধরে তাদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। অনু জালে, এ. এ. ডগু, অমিতেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকরা তাদের বই তে মীনধরাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নন্দিনী ভট্টাচার্য সুন্দরবনের দুটি গ্রামের মীনধরাদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষনা করেছেন। তা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রথমেই মনে রাখা দরকার মীনধরা কোন পরিবারের একমাত্র জীবিকা নয়, তা প্রধান জীবিকার সহযোগী বা সম্পূরক জীবিকা। কেন সে এই জীবিকা বেছে নিল? এক্ষেত্রে দুটি বিষয় দেখা যায়, Push factor – সুন্দরবনে বিবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জমি হারানো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। চাষের জমি হারিয়ে দরিদ্র পরিবারের মানুষ জীবিকার মাধ্যম হিসাবে মীনধরাকে বেছে নেয়। কারণ এখানে পুঁজির প্রয়োজন হয় না, বিশেষ দক্ষতার দরকার নেই । তাই সহজেই কোন দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা একাজে নিযুক্ত হতে পারে। Pull factor- অনেক সময় কোন দরিদ্র পরিবারের মানুষ অতিরিক্ত উপার্জনের আশায় মীনধরাকে জীবিকা করে। কারণ যেকোন সময় বা অবসর সময়ে মীন ধরা সম্ভব। তাই পরিবারের মহিলা সদস্যাদের পক্ষে সংসার সামলে একাজ করা সুবিধাজনক। তাছাড়া কুটি মালিকের কাজ থেকে দাদন পাওয়ার আকর্ষন থাকে। সাধারণত বর্ষাকালে মীন বেশী মেলে। আর এসময় জঙ্গলে যাওয়ার কাজও বন্ধ থাকে। প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় মীনধরার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। সুন্দরবনে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে মীন ধরাকে এক ধরণের 'নিরাপত্তা জাল' (safety net) বলা যেতে পারে।[৭]

এবার আসা যাক মহিলাদের সঙ্গে মীনধরা জীবিকার সম্পর্ক বিষয়ে। অনু জালে মীনধরাকে সুন্দরবন এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়ণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে দেখেছেন।[৮] কিন্তু এই বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কোন পরিবারের মানুষ মীনধরাকে জীবিকা করে তার

অস্তিত্ব সংকটের কারণে, বেঁচে থাকার জন্য। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ঘেরী মালিকদের তুলনাই চলে না। গবেষিকা নন্দনী ভট্টাচার্য দক্ষিন ২৪ পরগনার তিনটি গ্রামের মীনধরাদের নিয়ে (কামদেবনগর, উত্তর গোপালনগর ও হরেকৃষ্ণপুর) যে ফিল্ড স্টাডি রিপোর্ট দিয়েছেন, তা থেকেই তাদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা পরিষ্কার হয়।[৯] মনে রাখতে হবে সুন্দরবনের কোন প্রান্তিক নারী যখন মীনধরাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, তখন সেটা তার যতটা না পছন্দের, তার থেকে বেশী বাধ্যতার। মেয়েরা মাছ বা মীন ধরে তাদের পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার জন্য, বিশেষত তার সন্তানের জন্য। কারণ জমি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অধীন। অর্থাৎ নিজ পরিবারেই সে প্রান্তিক। আর একজন শহুরে নারীর প্রান্তিকতা থেকে গ্রাম-গঞ্জের নারীর প্রান্তিকতা অনেক বেশি। সুতরাং মীনধরাকে সুন্দরবনের মেয়েরা পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর পেশা হিসাবে দেখে।[১০] তার মধ্যে বাধ্য-বাধকতার সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের সুন্দরবনেও একই দৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে।

মীনধরারা তাদের ধরা মীন বিক্রি করে কুঠি মালিক বা মধ্যসত্ত্বভোগী এজেন্টের কাছে। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। মীনের দাম সর্বদাই ওঠা নামা করে। বর্ষাকালে মীন বেশি ধরা যায়। তখন এর দাম কমে। শীতকালে আবার উল্টোটাই দেখা যায়। তাই একাজে মীনের বাজারদর সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার। মীনধরারা গুনতিতে কুঠি মালিককে মীন বিক্রি করে। তখন কুঠি মালিকদের চেষ্টা থাকে মীন সংখ্যায় কম করে দেখানোর। মীন বিক্রির এই জায়গা বা কুঠিগুলি সাধারণত ভেড়ির উপর অবস্থিত। কুঠি মালিকরা বিরাট বড় ব্যবসায়ী নয়। তাদের কাছে মীন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। মীন কেনার পর তারা দ্রুত সেগুলি ঘেরী মালিককে বিক্রি করে। সাধারণত প্লাস্টিকের প্যাকেটে জলসহ মীন ভরে তা বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই কেনা-বেচায় তাদের কিছু লভ্যাংশ থাকে। মীন সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পেতে কুঠি মালিকরা মীনধরাদের দাদন দেয়। শেষ পর্যন্ত মীন এসে পৌঁছায় ঘেরী মালিকদের কাছে। এবার আমরা তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো।

দক্ষিণ এশিয়ায় চিংড়ি চাষকে অনেকে 'নীল বিপ্লব' (Blue Revolution) বলে চিহ্নিত করেছেন।[১১] সমগ্র বিশ্বে চিংড়ি চাষের ৮৫% হয় এশিয়াতে, যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। এই বিপুল পরিমান অর্থের হাতছানির কারণে সরকারও এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তজার্তিক অর্থসংস্থা চিংড়ি চাষে অর্থ বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। দেখা

যাবে ১৯৯২ সালে যেখানে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৬৮.৫ মিলিয়ন ডলার, সেখানে কেবল চিংড়ি চাষে অর্থ লগ্নির পরিমাণ ৪২৫ মিলিয়ন ডলার। চিংড়িচাষে লভ্যাংশের পরিমান কম নয়। এই লভ্যাংশের বড় অংশ ঘেরী মালিক বা চিংড়ি চাষীদের কাছেও পৌঁছায়। সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্ধ্রপ্রদেশের পর আমাদের রাজ্যেই বেশী চিংড়ি চাষ হয়, যার অধিকাংশই ঘনীভূত হয়ে আছে সুন্দরবনে। বিগত ৩০ বছর ধরে সুন্দরবনে হঠাৎ করে বড়লোক হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল এই চিংড়ি চাষ, তা লটারী লাগার সমতুল।[১২]

স্বভাবতই চিংড়ি চাষ সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক জীবনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। দুটি শব্দ প্রায়শই চলতি বাংলায় ব্যবহার করা হয়- 'আবাদে লোক', 'ডাউন এলাকা' বা ডাউনের লোক'। ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবনে উপজাতি বা আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়েছিল জঙ্গল কেটে চাষাবাদের বিস্তার ঘটানোর জন্য। অর্থাৎ 'আবাদে লোক' মানে সুন্দরবনের লোক। বর্তমানে এই শব্দটি নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্টতার সূচক কম বুদ্ধির মানুষ, যার রুচি-সংস্কৃতি তথাকথিত সভ্য সংস্কৃতির তুলনায় হীন। অন্যদিকে 'ডাউন এলাকা' মানে কেবল ভৌগোলিক ভাবে নীচু নয়, তা অর্থনীতি ও জাতিগত হীনতার পরিচায়ক। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সুন্দরবনে SC/ST জনসংখ্যা বেশি এবং এখানের অর্থনীতি বেশ ভঙ্গুর। অর্থাৎ সুন্দরবনবাসীকে বোঝাতে দুটি শব্দের উদ্ভব। বর্তমানে এটি যে কেবল সুন্দরবনবাসীকে বোঝায় তা নয়, বরং এটি নিকৃষ্ট লোকের হীনতার বিশেষণ। এহেন আবাদে বা ডাউন এলাকায় চিংড়ি চাষ অর্থ আগমনের কাণ্ডারী। সুতরাং এখানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চঞ্চলতা দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক।

একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখা যাবে সুন্দরবনের বেশির ভাগ মেছো-ঘেরী গুলি মূল ভূখন্ডের কাছাকাছি বা উত্তর দিকে অবস্থিত।[১৩] অর্থাৎ যে এলাকায় মেছো ঘেরী আছে সেগুলি তুলনামূলক সমৃদ্ধ বা উল্টোটাও সত্য। এদের একটি বিশেষ প্রবণতা হল কলকাতার বা নিকটবর্তী শহরে জমি কেনা। স্বভাবতই সুন্দরবনের এইসব উঠতি বড়লোক চিংড়ি চাষের পাশাপাশি তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে ও শহরের পাশে জমি কেনে অর্থকৌলিন্যের পাশাপাশি সমাজ কৌলিন্য অর্জনের আশায়। কিন্তু মীনধরাদের পক্ষে এহেন কৌলিন্য অর্জনের চিন্তা বাতুলতামাত্র। সুতরাং চিংড়ি ব্যবসায় সরাসরিভাবে বহু লোক জড়িত – মীনধরা, ডিলার, ভেড়ী মালিক, পাইকারী

ব্যবসায়ী প্রভৃতি। এরা একে অপরের উপরের উপর নির্ভরশীল হলেও, কোন ঐক্যবদ্ধ সমাজের জন্ম দেয়নি, বরং চিংড়ি চাষ এলাকায় ধন-বৈষম্য বাড়িয়েছে।

বর্তমানে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, পরিবেশ সচেতনতা বিরাট ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মীনধরা ও চিংড়ি চাষের ক্ষতিকর দিক গুলি সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ ঘনীভূত হচ্ছে। এই প্রতিবাদের তিনটি মুখ্য দিক। প্রথমত, মীনধরা সুন্দরবনের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। জল ও স্থলের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই বাদাবন যেমন বড় বড় সাইক্লোনের ধার কমিয়ে দিতে পারে, তেমনি এই নোনাজল ও বাদাবন আবার অসংখ্য প্রজাতির জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক প্রজনন স্থল ও লালিত হওয়ার জায়গা। মীন ধরার কারণে বহু অন্য প্রজাতির মাছের লার্ভা নষ্ট হয়। এছাড়া মীন ধরার সময় দাপাদাপিতে ম্যানগ্রোভ নষ্ট হয় ও বাঁধের ক্ষতি হয়। নদীর স্বাভাবিক পলল প্রক্রিয়া (তীরে পলি জমা) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দ্বিতীয়ত, বিদেশের চাহিদা মেটাতে ও অতিরিক্ত লাভের জন্য অবৈধ মেছো-ঘেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক কৃষিজমি মেছো-ঘেরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের জন্য ঘেরী মালিকরা জলে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ওষুধ দেয়, প্রোটিন জাতীয় খাবার বাড়ায়। এর ফলে মেছো ঘেরী এলাকায় জলদূষণ ঘটে। মাটির তলার ভৌম জলও দূষিত হয়। মাটিতে ph এর মাত্রা বাড়ে।[১৪] তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক জলসম্পদের উপর মানুষের অধিকার স্বাভাবিক ও চিরন্তন। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ বিভিন্ন ভাবে নদী,পুকুর বা জলাশয়ের জল ব্যবহার করেন। এমনকি ব্রিটিশ আমলেও সুন্দরবনের নদ-নদীতে মাছ ধরার অধিকার ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যৌথ অধিকারভুক্ত জলাশয়গুলি আর্থিক স্বার্থে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত মালিকানায় পরিণত হচ্ছে।[১৫]

চিংড়ি চাষের প্রথম পর্যায়ে এর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু চিংড়ির বিরাট অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা ভেবে এবং সেই সঙ্গে উপকূল অঞ্চলের ইকোলজি ঠিক রাখতে এই ঘটনা একটা জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ জারী করে উপকূলের ৫০০ মিটারের মধ্যে কোন মেছো-ঘেরী থাকবে না।[১৬] এর ভিত্তিতে সরকার আইন তৈরী করে এবং চিংড়ি চাষের উপর কিছু শর্তাবলী জারী করে। উদ্দেশ্য দুটি। ১. যাতে ম্যানগ্রোভের ক্ষতির পরিমাণ কমে। ২. বিদেশ থেকে আগত চিংড়ির বিভিন্ন রোগ আটকিয়ে (বিদেশী সীড গুলিকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়) ও ভারতীয় হ্যাচারী ও ঘেরীর উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করে

চাষের ক্ষতির পরিমাণ কমানো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার সঠিক নজরদারী করতে পারে না। তার ফলে নিম্নস্তরে তৈরী হয় একাধিক দ্বন্দ্ব, সুন্দরবন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিংড়ি চাষের জমি নিয়ে কৃষি জমির মালিক ও ঘেরী মালিকের মধ্যে বিবাদ সুন্দরবনের অহরহ ঘটনা। ঘেরী গুলি সাধারণত তৈরী হয় একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে। এক্ষেত্রে চিংড়ি চাষি ও জমির মালিকের মধ্যে চুক্তি হলেও , ঘেরী গুলি অনেক সময় অবৈধ ভাবে তৈরী হয়। স্থানীয় সংবাদপত্র 'ব-দ্বীপ বার্তা'য় এই ধরণের খবর একাধিক বার প্রকাশিত হয়েছে যে, বাঁধে ফাটল ধরিয়ে বহু চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সেই জমি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। শেষে জমির মালিক বাধ্য হয়ে তা ফিশারীর জন্য লিজ দেয়।[১৭] এইসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গুলি নিজেদের প্রভাবাধীন ক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়ায়। ফলে সুন্দরবনে চিংড়ি চাষ নিয়ে রাজনীতির এক অদ্ভূত খেলা চলে, যাকে অমিতেষ মুখোপাধ্যায় 'Prawn Politics' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৮] বাংলাদেশে বাগদা মীনের ভাল চাহিদা আছে। কিছু ব্যক্তি এই মীন সংগ্রহ করে BSF কে ঘুষ দিয়ে বিদেশে পাচার করে। আবার দেখা যায় অনেক সময় বাঁধ ভেঙ্গে চাষের জমি ডুবে গেলে সেচ দপ্তর নতুন বাঁধ দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমি দখল করে। অনেক সময় এই শত্রুতার বদলা নিতে মেছো-ঘেরীতে বিষ দেওয়া হয়। এসবে কৃষি জমির মালিকের ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৯] সুতরাং চিংড়ি চাষ শক্তি রাজনীতির এক বিরাট ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সুন্দরবনে বহু ধরণের লোক আছে যারা সরাসরি চিংড়ি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না হলেও, এর নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। যেমন- পঞ্চায়েতের নেতা, সেচ আধিকারিক, মৎস্য দপ্তর, BSF আধিকারিক প্রমুখরা।

চিংড়ি ব্যবসা ও চিংড়ি নিয়ে রাজনীতি সুন্দরবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এর সুফল যে কেবল চিংড়ি চাষি বা ব্যবসায়ী ভোগ করে তা নয়, বরং বিভিন্ন ভাবে অর্থের লেনদেন হয়। এর একদম প্রান্ত বিন্দুতে আছে মীনধরাদের অবস্থান। কিন্তু সুন্দরবনের ইকোলজী ক্ষতির জন্য যতটা না দায়ী করা হয় বাগদা চাষকে, তার থেকে বেশী দায়ী করা হয় মীনধরাদের, যাদের অধিকাংশই নারী। তারা বাঁধের ক্ষতি করে, অন্য মাছের মীন নষ্ট করে, কিন্তু চিংড়ি ব্যবসাই যে এর জন্য সামগ্রিক ভাবে দায়ী তা সরকার স্পষ্ট করে না। বেসরকারী ক্ষেত্র থেকেও মীনধরাদের জীবিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। এর কারণ দুটি - নারী হিসাবে তারা প্রান্তিক এবং অর্থের নিরিখেও তারা প্রান্তিক। তাই সস্তা প্রতিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই হয়।

সূত্রনির্দেশ:

১. Gulab D. Khedhar and others, A review on shrimp aquaculture in India, Reviews in Fisheries science and Aquaculture, Taylor & Francis, 2020, p.2

২. Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen a socio-economic history of Fisheries and Fishermen of colonial and post-colonial West Bengal, Abhijeet publications, Delhi, 2008, p.14

৩. Annu Jalais, Forest of Tigers, Routledge, New Delhi, 2010, p.133

৪. Gulab D. Khedhar and others, op. cit., p.2

৫. ibid, p. 08

৬. Amites Mukhopadhyay, Living with disasters, Cambridge University Press, 2016, pp. 136-139

৭. A. A. Danda, Surviving in the Sundarbans: Threats and Responses, Dissertation for doctor´s degree at the University of Twente, 2007, p.114

৮. Annu Jalais, op. cit. p. 133

৯. Nandini Bhattacharjee, A study on the Meendharas, Dissertation for doctor´s degree at the University of Calcutta, 2006, pp. 68-90

১০. Amites Mukhopadhyay, op. cit. p. 127

১১. Annu Jalais, op. cit. p. 123

১২. ibid, p. 133

১৩. ibid, p. 34

১৪. Gulab D. Khedhar and others, op. cit. pp. 11-12

১৫. Sanae Ito, From Rice to Prawns: Economic Transformation and Agrarian Structure in Rural Bangladesh, Routledge, 2010, pp. 51

১৬. The Supreme Court Verdict, http://base.d-p-h.info/en/fiches/premierdph/fiche-premierdph-4040.html

১৭. ব-দ্বীপ বার্তা, ক্যানিং, 2005, October 16-31

১৮. Amites Mukhopadhyay, op. cit. p. 133

১৯. Ibid

চৈতন্যসমকালীন বৈষ্ণব মহিলা পদকর্ত্রী মাধবী দাস ও তাঁর পদাবলী

মনীষা পাল
প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক, এম. এ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতা একটা সম্বৃদ্ধ ধারার সৃষ্টি করেছিল। যার ভূমিকা রচনা করেছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং সমকালীন সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। বৈষ্ণব কবিতার প্রধান ধারাটি হল রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক। সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষায় শ্লোকের আকারে প্রেমকবিতা প্রচুর লেখা হয়েছে। সেইসব মানবিক প্রেমকবিতার মধ্যেও কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণের নাম আছে। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত বহির্বঙ্গের কবি হালের 'গাহা-সত্ত-সই'-এ প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কবিতা পাওয়া যায়। আর বাংলাদেশে আমরা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা পাই দশম শতকে সংকলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্নামৃত' নামক সংকলন দুটিতে। বাংলাদেশে দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে সংস্কৃত কবিতা রচনার প্রসার ঘটে। এই সময়ই জয়দেবের হাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাব্য সৃষ্টি হয়। বাংলা পদাবলীর পূর্বসূরী জয়দেবের এই গীতগোবিন্দের পদগুলি।

বৈষ্ণব পদের পরবর্তী ইতিহাস বড়ু চন্ডীদাসের আখ্যানকাব্যের পদ, বিদ্যাপতির ব্রজবুলি কবিতা এবং চন্ডীদাসের বাংলা কবিতার মধ্য দিয়ে চৈতন্যযুগে এসে পৌঁছেছে। চৈতন্যলীলা এই পদাবলী সাহিত্যে পুষ্টি সঞ্চার করেছে। তুর্কি বিজয়ের আগে পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। চৈতন্য পূর্বকাল পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের এই স্বরূপের সঙ্গে ভাগবত এবং অন্যান্য পুরান কথিত বিষ্ণু ও কৃষ্ণ মাহাত্মর যোগ ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম তখনও পর্যন্ত ছিল আস্বাদ্য, পূজ্য নয়। চৈতন্যযুগে প্রথম সেই প্রেম পূজ্য হয়ে ওঠে। চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম নতুন রূপ নিয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়েছে, এবং বৈষ্ণব ভক্তরা কাব্যচর্চাকে ভক্তিসাধনার অঙ্গ বলে মনে করেছেন। প্রেমের মধ্যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও পদাবলীতে ঘটেছে আর একটা বিশিষ্ট সংযোজন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকবিতার পাশাপাশি গৌরাঙ্গবিষয়ক কবিতা রচনারও সূত্রপাত হয়েছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির দুটি বিশেষ দিক ছিল, রাধাকৃষ্ণের যুগল

লীলায় যত প্রকার ভাব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় রাধা ভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের জীবনেও ততপ্রকার ভাব বৈচিত্র্য লক্ষ করে পদকর্তারা পদ রচনা করেছেন। এছাড়াও গৌরাঙ্গের পূর্বজীবন অর্থাৎ তাঁর বাল্য, যৌবন, সাধনা এবং সন্ন্যাস জীবনও অনেক পদকর্তার পদের বিষয় হয়েছে। চৈতন্যদেবের সমকালে এবং তার পরবর্তীতে তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব কবিতা রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা বৈষ্ণব পদাবলী ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে আমরা একজন মহিলা কবির সন্ধান পাই, মাধবী দাস। তিনিই বোধহয় একমাত্র মহিলা কবি যিনি সেইসময় বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এ সম্পর্কে লিখেছেন— "এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজন মাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভসুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবীদেবী। কবিতাকুসুমের পরিমল বিস্তার মাত্র ইহার গৌরব নহে, মাধবীর গুন গরিমা পুরুষ সমাজেও দুর্লভ ছিল।'[১] চৈতন্য সমসাময়িক কাল বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, যে যুগে নরহরি সরকার, রূপ গোস্বামী, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, কবিরঞ্জন, কবিশেখর, নরোত্তম দাস, বলরাম দাস, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখের মতো বিশিষ্ট পদকর্তাগণ পদ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই যুগে একজন মহিলা হয়ে বৈষ্ণব পদ রচনা এবং পদকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাধবীদেবীর পান্ডিত্য এবং প্রতিভার পরিচায়ক। আমরা এই প্রবন্ধে পদাবলী রচনাকর্ত্রী মাধবী দাস এবং তাঁর পদ সম্পর্কে জানব।

চৈতন্য পরিজনদের মধ্যে অন্যতম একজন শিখি মাহিতী। প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থেই তাঁর নাম উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের লিখনাধিকারী ও মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত। এই শিখি মাহিতীরই ভগিনী ছিলেন মাধবী বা মাধুরী দেবী। অপর ভ্রাতা মুরারী মাহিতী ও ভগিনী সহ শিখি মাহিতীর বাস ছিল বংশীটোটায়। মহাপ্রভুকে প্রথমবার দেখাতেই মুরারী ও মাধবী ভগবদবতার জ্ঞানে তাঁর ভক্ত হন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চৈতন্য ভজনে নিযুক্ত করতে পারেননি। পরবর্তীতে শিখি স্বপ্নদর্শনে চৈতন্য ও জগন্নাথকে একাত্মা হিসেবে উপলব্ধি করার পর মহাপ্রভুর অনুরাগী হন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য থেকে জানা যায় যে শিখি, মাধবী ও মুরারী নীলাচলে তিনভ্রাতা বলে পরিচিত ছিলেন। মাধবীকেও ভ্রাতা হিসেবে উল্লেখ করার মূলে ছিল তাঁর পান্ডিত্য ও পুরুষের ন্যায় জপতপ। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার সাড়ে তিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি একজন ও মাধবী অর্ধজন ছিলেন—

"জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন।।
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী তিন আর ভগিনী অর্ধজন।।"[২]

মহাপ্রভু জীবগণকে যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেন জগতের মধ্যে মোট সাড়ে তিনজন ব্যক্তি তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করতে পারেন। তিনজন হলেন স্বরূপ গোসাঞি, রায় রামানন্দ ও শিখি মাহিতী এবং অর্ধজন মাধবী দেবী। হয়ত তিনি স্ত্রী হওয়ায় এখানে তাঁকে অর্ধ ধরা হয়েছে। এই থেকেই তাঁর ভক্তি ও জ্ঞানের গভীরতার কথা বোঝা যায়, বোঝা যায় তিনি নগন্য নন। তাঁর বৈষ্ণবতা ও কৃষ্ণভক্তি আর কোনো প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে এই সাধ্বী ধর্মরতা ও বৈষ্ণব তপস্বিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী।।"[৩]

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবি কর্ণপুর প্রচলিত গৌড়ীয় অবতারলীলাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি শিখি মাহিতীকে ও মাধবীকে শ্রীরাধার দুই দাসী যথা রাগলেখা ও কলাকেলীর অবতার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।৪ এছাড়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যেও মাধবী দেবীকে শ্রীরাধার দাসীগণের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। নীলাচলবাসী ভক্তদের নাম গণনার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি।।"[৪]

কাব্যে আরও একটি ঘটনায় আমরা মাধবী দেবীর কথা পাই। আচার্য্য একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন এবং উত্তম চাল আনার জন্য প্রভুর কীর্তনিয়া ছোট হরিদাসকে মাধবী দেবীর কাছে পাঠান। মহাপ্রভু তৃপ্তি সহকারে সেই অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করার পরেও ছোট হরিদাসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেন। এই শাস্তির কারণ হিসেবে—

"প্রভু কহেন বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হবে মুনেরপি মন।।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্র চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।"[৫]

মহাপ্রভু নিজে স্ত্রী দর্শন করতেন না। বৈরাগী হয়েও তাঁর ভক্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজনেও স্ত্রী সম্ভাষণ করবেন তিনি সেটা মেনে নেননি। এরপরে সকলের শত অনুরোধেও তিনি হরিদাসকে ক্ষমা করেননি। হরিদাস দূর থেকেই আরাধ্য চৈতন্যের দর্শন লাভে সাময়িক আস্বস্ত হতেন। কিন্তু এই দূরত্ব ক্রমশ তাঁর হৃদয়কে ক্লিষ্ট করে তোলে। তাই বৎসরান্তে একদিন হরিদাস দূর থেকে প্রভুকে শেষ প্রণতি জানিয়ে বিদায় নেন। নীলাচল থেকে বেরিয়ে গিয়ে হরিদাস প্রয়াগে পৌঁছান, এবং ত্রিবেণী বক্ষে ঝাঁপ দেন। প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুর এই বিহিত হয়ত বিপুল মর্যাদা বহনে ও লোকশিক্ষায় পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘটনা যে নিস্কলঙ্ক শশাঙ্কের অঙ্কে চিরন্তন কলঙ্কের আভাসও রেখে যায়নি তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়! আর এই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন মাধবী দেবী। এছাড়াও ৪০৪ চৈতন্যাব্দের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' পত্রিকাতেও মাধবী দেবীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেখানে মাধবী দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে— "মাধবী তপস্বিনী এবং কবিতাকামিনী ও সুপন্ডিতা ও পদরচনাকর্ত্রী ছিলেন। ...মহাপ্রভু... ভক্তবৃন্দকে লইয়া যখন যে কিছু লীলা করিয়াছিলেন শ্রীমাধবী তাহা চাক্ষুষে দর্শন করিয়া উড়িয়া ও বঙ্গভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন।"[৬]

মাধবী দেবী সংক্রান্ত আলোচনার পর এখন মাধবীদেবীর পদাবলীর গতিপ্রকৃতি উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংগ্রহে এবং সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব পদসংকলন 'পদকল্পতরু'তে মাধবী দাসের নামে বাংলা ভাষায় সর্বমোট পাঁচটি পদের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে প্রথম তিনটি পদ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক ও শেষ দুটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক।

প্রথম পদটি—

"কলহ করিয়া ছলা আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল-রায়।
যতেক ভকতগণ। হৈয়া সকরুণ মন
পদ-চিহ্ন-অনুসারে ধায়।।
নিতাই বিরহ-অনলে ভেল ধন্দ।
সে আঠারনালা হৈতে কান্দিতে কান্দিতে পথে
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ।।
সিংহ দুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।

হরে কৃষ্ণ হরে বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচল বাসীরে সোধায়।।
জাম্বুনদ-হেম জিনি গৌর বরণ-খানি
অরুন বসন শোভে গায়।
প্রেম ভরে গরগর আঁখি যুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়।।
ছাড়ি নাগরালি-বেশে ভ্রমে পহু দেশে দেশে
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসেতে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্ট গৃহে করল প্রবেশ।।১।।"[৭]

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ কলহের ছল করে ভক্তবৃন্দকে ছেড়ে একা একা নীলাচলে চলে গেছেন। ভক্তগণ তখন সকরুণ মন নিয়ে প্রভুর পদচিহ্ন অনুসারে অগ্রসর হন। নিমাইয়ের বিরহ অনলে দগ্ধ হয়ে তাঁর সান্নিধ্য-আশায় পথে কান্দিতে কান্দিতে নিতাই সিংহদুয়ারে দাঁড়ান। মহাপ্রভুর বর্ণনা দিয়ে ব্যাকুল হয়ে নীলাচল বাসীকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর সন্ধান। এখানে মাধবীদেবী নিতান্ত সহজভাবে চৈতন্যের যে রূপবর্ণনা করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। মাধবী দাস তাঁকে জানান মহাপ্রভু ভট্ট গৃহে প্রবেশ করেছেন। জীবনী গ্রন্থেও আমরা মহাপ্রভুর এই যাত্রার উল্লেখ পাই। নীলাচলের পথে কোনো ভাব বিশেষের বশীভূত হয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 'দণ্ড' ভেঙে ফেলেন। এই উপলক্ষে কৃত্রিম কলহ করে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদকে পিছনে ফেলে একাই শ্রীমন্দিরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁকে মুর্ছিত অবস্থায় প্রাপ্ত হন ও নিজের গৃহে নিয়ে যান। পরে নিত্যানন্দ প্রমুখেরা খুঁজতে খুঁজতে সার্বভৌম গৃহে উপস্থিত হন। সুতরাং এই পদটির একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।

দ্বিতীয় পদ—

"আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌর কিশোর-রাজ।
ফাগু উঝলি করে ফেলাফেলি
নীলাচল-পুরী মাঝ।।
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরি

ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে   পড়িয়া ফাঁফরে
দূরে থাকি দেখে নাটে।।
দুবাহু তুলিয়া   বেড়ায় নাচিয়া
ভকত-গনের সঙ্গ।
নীলাচল বাসী   মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ।।
বাজে করতাল   বোলে ভালি ভাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবি দাস   মনেতে উল্লাস
সদা বলে হরি বোল।।২।।"[৮]

এই পদটি ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর বসন্তলীলার ছবি। নীলাচলে পুরী মাঝে মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করছেন। তাঁদের উৎসবের কথা শুনে প্রেমবিহ্বল নাগরীও সেখানে পৌঁছায়। কিন্তু গৌর দর্শনে মুগ্ধ নাগরী দূর থেকেই তাঁর লীলা দর্শন করে। শ্রীগৌরাঙ্গ খোল করতাল সহযোগে ভক্তদের সঙ্গে দুবাহু তুলে নৃত্য করে বেড়ান। নীলাচলবাসী মুগ্ধ নেত্রে সেই লীলা দর্শন করেন। মাধবী দাস উল্লাসের সঙ্গে সারাক্ষন হরি হরি বলেন। দোললীলাকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তনের সুমধুর চিত্র ফুটে উঠেছে এই পদটিতে।

তৃতীয় পদে মাধবী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ বিহনে নবদ্বীপ ধামের করুন অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। পদটি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

"নীলাচল হৈতে   শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে   দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ।।
ভাবয়ে পন্ডিত রায়।
পাই কি না পাই   শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে যায়।।
তরুলতা যত   দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।

রবির কিরণ   না হয় স্ফুরণ
মেঘগণ দেখে রাতা।।
ডালে বসি পাখী   মুদি দুটি আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি   ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া।।
ধেনু যূথে যূথে   দাঁড়াইয়া পথে
কারো মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের   ঠাকুর পন্ডিত
পড়িল আছাড়ি গা।।৩।।"[৯]

জগদানন্দ নীলাচল থেকে নবদ্বীপ আসেন শচী মাতার দর্শন লাভের আশায়। দূর থেকেই পন্ডিত নাদীয়াকে দেখেন। মহাপ্রভুর বিহনে নবদ্বীপ যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। অকালে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা, মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে সূর্য, পাখিগুলিও ফল জল ত্যাগ করে সারাক্ষন গোরাচাঁদের নাম নিয়ে ডেকে চলেছে, ধেনুরাও নির্বাক ও নিঃস্পন্দ হয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে। নীলাচল থেকে মহাপ্রভু শচী মাতার সংবাদ পাওয়ার জন্য জগদানন্দ পন্ডিতকে মাঝে মাঝে নবদ্বীপ ধামে পাঠাতেন। এই জগদানন্দের মুখে গৌরবিহনে নবদ্বীপের করুন অবস্থার কথা শুনে মাধবীদেবীর কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তিনি মাত্র কয়েকটি ছত্রে নবদ্বীপের সেই বিষাদময় রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন এই পদটিতে। মাধবীদেবী গৌরাঙ্গের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে থাকার সুবাদে মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলা স্বচক্ষে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল কবিহৃদয় মহাপ্রভুর সেই লীলাকে পদাবলীগুলির মাধ্যমে চিরস্থায়ী রূপে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

এরপরের পদদুটি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক। একটি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের ও অপরটি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশের পদ। চতুর্থ পদটি—

"রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ-রস পীবই
কমলিনী মধুকর রাজ।।
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল হোয়ল সব অঙ্গ।

গদ গদ কহয়ে রায় ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ।।
সো ধনি-চাঁদ-বয়ন কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয় তাপ কিয়ে মেটব
সোই করব কিয়ে কোল।।
ঐছন কতহুঁ বিলাপই মাধব
সহচরি দূরহি হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহতহি মাধবি দাস।।৪।।"[১০]

রাধা মাধব কুঞ্জে বিলাস করছেন। দুজনেই আনন্দিত। হঠাৎই রাধার অদর্শনে জীবন কাটানো অসম্ভব হবে ভেবে কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে পড়েন। শ্রীরাধিকার চাঁদবদন অদর্শনে, অমৃত রূপ বাণী শ্রবণ না করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের তাপ কি করে মেটাবেন সেই চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েন। এই ধরণের কত নিছক বিলাপই না মাধব কুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধার কাছে করেন। মাধবী দাস বলেন প্রেমের আধিক্য বশত বিচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রেমিকের অন্তরে ঘনীভূত হয়েছে বিষাদের ছায়া। শ্রীকৃষ্ণের অধীরতার প্রকাশ হৃদয়স্পর্শী।

শেষের পদটি কৃষ্ণের প্রেমাবেশের পদ—

"পরশিতে রাই-তনু   আপনে ভুলল কানু
মূরছি পড়ল ধনি-কোর।
শ্যামকে হেরইতে   ধনি ভেল গদ গদ
ঢড়কি ঢড়কি বহে লোর।।
শ্যাম মুরছিত হেরি   চকিতে ললিতা ফেরি
রাধা-মন্ত্র শ্রুতি-মূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু   নিরখই রাই-তনু
হেরি সখী সচকিত ভেল।।
চিত্র-পুতলি যেন   বেঢ়ল সখিগণ
নিরখই শ্যাম-মুখ-চন্দ।
কি ভেল কি ভেল বলি।   ধাওল বিশাখা আলী

সব জনে লাগল ধন্দ।।
শ্যামর-সুন্দর- বদন সুধাকর
সুমুখি নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবি দাস
বিদগধ মাধব রাধে।।৫।।"[১১]

রাধিকার অঙ্গস্পর্শে আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণ মুর্ছিত হয়ে রাধার কোলে পতিত হন। শ্যামকে দেখে রাধার আনন্দাশ্রুও বাঁধ মানে না, তিনিও বিহ্বল। মুর্ছিত শ্যামের কানে ললিতা রাধা মন্ত্র দেয়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্যাম পুনরায় রাধার মুখচন্দ্র দর্শন করেন। সখিগণ তখন আনন্দিত হয়ে শ্যাম-রাধাকে বেষ্ঠন করে।

মাধবীদেবী উড়িষ্যার অধিবাসী। উড়িয়া তাঁর মাতৃভাষা। তিনি যেমন উড়িয়া ভাষায় চৈতন্যলীলাকে কাব্যরূপে প্রকাশ করেছেন তেমনই বাংলা ভাষাও তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন হয়েছে। তাঁর পদ পাঠের পর একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর পদগুলি সমসাময়িক অন্যান্য বাঙালি কবির থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। পদগুলির ভাব, ভাষা ও লিখনভঙ্গী সুন্দর ও মনোরম। কিন্তু তাঁর পদের বিশেষ যে বৈশিষ্ট্য তা হল এর সারল্য ও মাধুর্যতা। তিনি নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় এবং কোনোরকম কৃত্রিমতা ছাড়া কবিতায় ভাবপ্রকাশে সমর্থ ছিলেন। আর এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর পদগুলিতে এনে দিয়েছে এক অনাবিল মাধুর্যতা। শব্দ নির্বাচনের কথা যদি বলা হয় তাহলে একথা সত্যি যে তাঁর পদে 'ভেল', 'ডালি', 'বিলসই', 'উঝালি', 'কাঁপই', 'কহই' প্রভৃতির মতো গ্রাম্য শব্দ দুর্লভ নয়। কিন্তু এই ধরণের শব্দের প্রয়োগ অল্পই, এবং এই প্রয়োগ পদকে দুষ্ট না করে তার কাব্যসৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীঅচ্‌যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি; স্ত্রীকবিমাধবী। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা। সন ১৩০৫। পৃষ্ঠা ১৫৯।
২. সুকুমার সেন (সম্পাদিত) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৯। পৃষ্ঠা- ১৭০।
৩. তদেব। পৃষ্ঠা - ১৭০।
৪. শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেটলি., প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০। পৃষ্ঠা- ৩২৫।

৫. সুকুমার সেন (সম্পাদিত) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭০।

৬. ৪০৪ চৈতন্যাব্দের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া' পত্রিকা। (দ্রষ্টব্য- শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি: চৈতন্য পরিকর। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড্ ; প্রথম প্রকাশ- ১৯৬০। পৃষ্ঠা ৩২৫।)

৭. সাহিত্য রত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): বৈষ্ণব পদাবলী। সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ৩১৪।

৮. তদেব।পৃষ্ঠা- ৩১৪।

৯. তদেব। পৃষ্ঠা- ৩১৪।

১০. তদেব।পৃষ্ঠা- ৩১৫।

১১. তদেব।পৃষ্ঠা- ৩১৫।

অচর্চিত চারণ কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রতিবাদ

সুমন্ত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া

"সোঁদা মাটির গন্ধ আছে/আমার ঘ্রানে/
গাব গুবিতে বাউল গানে/ আমার কিছু ভালোবাসার মূর্তি আছে
নিজস্ব এক ফুর্তি আছে/ এইসব নিয়েই ঘর গৃহস্থ, জীবনযাপন
পায়ের নুপুর হাতের কাঁকন/ সবুজছায়া বসতবাটি
আমার আছে নিজস্ব এক শীতলপাটি "।[1]

পাঁচ এর দশক থেকে যার অগণিত কাব্যগ্রন্থে (ঘুম ভাঙার কবিতা ১৯৫০, সূর্য শপথ ১৯৫৬,দেওয়ালের অক্ষর ১৯৬২, পোস্টার কবিতা থেকে নয়ের দশকের 'একটি প্রচ্ছদপটের গল্প' কবির আত্মজীবনী ১৯৯৮) মোহাবিষ্ট হয়ে অনুজ কবির দল দূর থেকে দেখেছেন সেই কায়া মূর্তি, যিনি এগিয়ে চলেছেন একতারা হাতে সমাজের তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে।একটা ছায়াশীতল মরুদ্যানের সন্ধানে। সেই কবিই হলেন বাঁকুড়া জেলার **চারণ কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।** কখনো তিনি রবীন্দ্রনাথের মত শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের জয়গান গেয়েছেন,কখনো নজরুলের মতো সর্বহারা সম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করে,সকল বৈষম্য অত্যাচার শোষণকে ভেঙে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।আবার কখনো প্রেমিক কবির মতো বলতে চেয়েছেন ফুলের কথা,ভালোবাসার কথা। এই সব্যসাচী কবির হাতে একদিকে প্রতিবাদের খড়গ, অন্যদিকে প্রেমের বাঁশরী আসলে এই দুইয়ের যোগসুত্র তীব্র জীবনাগ্রহ। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে **'পুষ্পমাসি', টুসু', বৈদ্যনাথের কড়চা, ভাদু, আমার ভুবন, অযোনিসম্ভবা মানুষের প্রতীক্ষায়, দস্যি মেয়ে, পদাবলী যখন আমি, দেহিপদপল্লব,সবুজ দ্বীপের মেয়ে, নুপুর বোষ্টমী** প্রভৃতি কবিতা গুলিতে মানুষের কাছে প্রেম নিয়ে ঘুরে ঘুরে এসেছে।আর প্রতিবাদের কবিতাগুলি যথা- **ঝুটআজাদী জবাব চাই, খাদ্য দে,প্রধানমন্ত্রীকে খোলাচিঠি, পোস্টার কবিতা, বাবু-গো, বাংলা মা, জঙ্গলের ছড়া, কবিতা পড়ছি, ম্যানিফেস্টো, কইতে বারণ**

ইত্যাদি কবিতাগুলি সাম্প্রতিকতার নিরিখে উজ্জ্বল দর্পণ হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

সূচক শব্দ:- *প্রেম,প্রগতি, প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রতিবাদ প্রতীক্ষা নারী, কামনা,জীবন, মূল্যবোধ,সর্বহারা,মুক্তি সংগ্রাম।*

মূল আলোচনা:

চারণ কবি বৈদ্যনাথ ১৯৪৬ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে অজস্র প্রেমের কবিতা লিখেছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা সাধ্যাতীত। আর প্রেমের কবিতা গুলিতে বাস্তববাদ, বস্তুপুঞ্জ ও প্রবাহমান অস্তিত্বের অন্তবাহী রূপ ফুটে উঠেছে বারবার।কোথাও দেশ প্রেম, মা,মাটি, মানুষ সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কোথাও ব্যঞ্জনাময় গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতা গুলিতে এক অসাধারণ মৌলিকত্ব ধরা পড়েছে। আবার কোথাও প্রেমময় আধ্যাত্মিক ভাবনা ষোড়শোপচারে পূজার নৈবেদ্য সুনিপুণভাবে কবিতায় এসে গেছে।

কবি প্রেম প্রত্যাশার মানস ভ্রমনে ছন্দ, যতি, লয় ও চিত্রকল্পের সমন্বয়ে জীবন ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কবিতাকে পাঠকের মনের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।প্রেমের কবিতাগুলি অক্ষভূমি থেকে সরে গিয়ে প্রেমের বন্দনা গানে বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে ফলে প্রেম হয়েছে প্রতিবাদ।তাই 'জীবন'' কবিতাতে তিনি লিখলেন -

বসন্ত তুই কেমন আছিস? কৃষ্ণচূড়ার আগুন !
তোর ঘরে কি চোর ঢুকেছে?ছদ্মবেশি ফাগুন ! [2]

আবার কোথাও লক্ষ্য করা যায় তার কবিতায় নৈরাশ্যের ছোঁয়া, হুতাশী প্রেম, যেমন প্রকৃত নারীর মতো কবিতায়-' দ্বিতীয় রমণী কোন নেই/ তন্ন তন্ন করে খুঁজে তবু ও পাইনি/ কোনো মনের মানসী /কিংবা কোনো নারীকেই।'

কোন কোন জায়গায় প্রেমের কাছে কবির আত্মসমার্পণ কবিতাকে অপূর্ব মাধুর্য দান করেছে। মাটিতে হৃদয়, আকাশে দৃষ্টি রেখে তিনি প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।তার এই সমর্পিত হৃদয়, পাঠকের মানে এক গভীর বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে। 'চরনগাঁথা ১৪০০' কবিতায় তিনি লিখলেন- "ঘর ভেঙেছিস /পর করেছিস/তেরোশতে।

সে ঘর আবার/ গড়বো বুকের/ পাঁজর দিয়ে।
প্রেম ছাড়া কি ধর্ম আছে ।[3]

একটা সময় তিনি মানবিক ভালোবাসার সীমা ছাড়িয়ে নৈসর্গিক প্রেমের ঠিকানা খুঁজতে ব্যস্ত থেকেছেন। প্রেম সেখানে হয়ে গেছে শ্বাশত চিরকালীন 'শীতলপাটি' কবিতায় তিনি লিখলেন-

বিনোদ বেণী পান খাওয়া ঠোঁট রঙিন চুড়ি /ত্রিভুজ মার্কা ছোট্ট ঘুড়ি
ঘুঙ্গুর পরা পোষ মানা এক পায়রা এবং/ টেস্কোনা আর চড়ুই পাখি
এসব নিয়েই ব্যস্ত এখন ব্যস্ত থাকি।[4]

জীবনবোধের পূর্ণ আঙ্গিকে অন্তর্নিহিত মহাসত্যকে সমুদ্রমন্থনের নেয় তুলে এনেছেন পাঠকের মনে-' দস্যি মেয়ে' কবিতাটি.আবার 'নূপুর বোষ্টমী' তোও একই অঙ্গসজ্জায় সাজিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি লিখেছেন-

"অঙ্গ জুড়ে পেচিয়ে রাখা হলুদপেড়ে শাড়ি
শাড়ির নিচে সায়া এবং সায়ার নিচে মায়া
ওইটুকু তোর ছোট্ট জমিদারি ।[5]

অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। যেন নাড়ি ধরে টানে, যেন একাধারে তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কবি, আবার অন্যদিকে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে আলাপরত কৃষ্ণ। আবার 'চিঠি' কবিতাটিতে পায় পরলোকগত পত্নীর জন্য বিরহ, যেন মদনভস্বের পরে রতির বিলাপ।

তুমি না এলে সব শূন্য থেকে যাবে/ শিউলি ঝরে যাবে দুবেলা কেঁদে কেঁদে/ সানাই বাজবে না/ পৃথিবী সাজবে না /তোমার মত আহা বিনোদ বেণী বেঁধে।

কবিমন এখানে এক ক্রন্দিত আবেগের মূর্ত প্রতীক যা দারুণভাবে হৃদয়বোধ্য উপলব্ধির অঙ্গনে ভাস্মর।

কিছু কিছু কবিতায় প্রথম জীবনের প্রেমের ঘটনা গুলোকে স্মৃতিতে ধরে রেখে রোমন্থন করেছেন পৌঢ় বয়সে। যেমন-'পুষ্পমাসি' কবিতাটির চারটি লাইন বলেছেন-

পাতিয়ে ছিলুম দেখন হাসি,মিষ্টি ঠোঁটের হাসি।
ঐ হাসিতেই গলায় নিলুম হয়তো প্রেমের ফাঁসি।
প্রেম জানিনে প্রেম বুঝিনে সঙ্গ শুধু বুঝি।
সঙ্গ পেতে পুষ্পমাসি তোমায় আজও খুঁজি ।[6]

আবার 'রূপশালি মেয়ে' কবিতায় দেহজ প্রেমকে কবিতার ছন্দে এনে এক অপরূপ চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন।নারীদেহের বর্ণনার মধ্য দিয়ে -

'সমস্ত নারীর মধ্যে যদিও নরম কিছু আছে
চোখ মুখ, ওষ্ঠ কিংবা পীনোন্নত দেহের সৌস্টব।[7]

আসলে এসবই হল প্রেমিক কবির এক কাব্যময় কামনার বিষ্ফোরন,ব্যথাহত জীবনের করুণ আর্তনাদ। আবার তার কবিতার মধ্যে পাই বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক অনুষঙ্গ যেমনটি পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিষ্ণু দের কবিতা মধ্যে।কবি নিজের লেখা লিরিকের প্রেম ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নিজেই আত্মকথায় লিখেছেন - নিষ্কাম ভালোবেসে, নির্মল আনন্দ খুঁজে বেড়িয়েছি সারা জনম..দেহ কে ঘিরে দেহের উর্দ্ধে দেহাতিত প্রেমে মুগ্ধ হতে না পারলে কি আমার দেশের এই নরম মাটিতে সৃষ্টি হতে পারত বৈষ্ণব পদাবলী? বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে তার কবিতায় লিরিক ধর্মীতা ফুটে উঠেছে-' রূপশালি মেয়ে 'পুষ্প মাসি, তালপাতার বাঁশি, নুপুর বোষ্টমী, বনমরালি, প্রেম পুষ্প, চিঠি, কুমারী অঞ্জনা, কানামাছি, দস্যি মেয়ে, ইত্যাদি কবিতায়।' তালপাতার বাঁশি' সুন্দর এক গ্রামীন পরিবেশের মধ্যে গভীর প্রেম কামনা চিত্রিত হয়েছে বনমালী কবিতায়। তালপাতার বাঁশিতে সুন্দর এক গ্রামীন পরিবেশের মধ্যে কবির প্রেম কামনা চিত্রিত হয়েছে। বনমরালী কবিতায় কবির নিষ্কাম প্রেমের আকুতি বিশুদ্ধ কামনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-

'ময়ূরপঙ্খী বাঁকাচুড়ো /সেইরূপে আমার মন -হরণ
হে বনমরালি,শুধু এক ফালি বৃন্দাবন /কামনা এই
এর বেশি কিছু কামনা নেই'।[8]

এখানে যেন কবি সেই বিশুদ্ধ কামনার তালিকা তৈরি করেছেন। আবার 'কানামাছি' কবিতায় হৃদয় প্রার্থনার আর্তি প্রকাশিত-

আমাকে তুই কেমন করে ছুঁবি
দুচোখে তোর কানামাছি ভোঁ ভোঁ/ দুরন্ত এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে
আর কতকাল দাঁড়িয়ে আমি রবো।[9]

ভালোবাসার আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে 'কানামাছি'র আর্তি 'নুপুর বোষ্টমী' কবিতায় যেন দানের মধ্যে মিশে গেছে। তাই 'নুপুর বোষ্টমী' কবিতাতে কোন চাওয়া নেই, কেবল দেওয়া এবং দেওয়া।যেমন-

দুহাত তুলে দিচ্ছি তোকে রাধা নামের বাঁশি
নীল যমুনার জল/ কদম তলার জমি
তুই আমাকে না দিস কিছু নাই বা দিলি/ নুপুর বোষ্টমী।[10]

প্রেমের সাথে প্রতীক্ষাও যে একান্ত প্রয়োজন প্রতীক্ষমান প্রেমকে প্রকাশিত করতে কবি 'কুমারী অঞ্জনা' কবিতায় লিখেছেন -

এপাশে প্ল্যাটফর্ম ওপাশে ছোট নদী/ কখনো এসে থাকো রাতের ট্রেনে যদি
সবুজ ঢাকা গৃহ প্রদীপ জ্বেলে দিও/ আমি তো জেগে আছি উঠোনে নিরবধি
এপাশে প্ল্যাটফর্ম ওপাশে ছোট নদী।[11]

দীপ্যমান অপূর্ণ প্রতীক্ষা প্রেমের অন্যতম মূল সুর। সেই সুর কে কবি এনেছেন এই কবিতায়।

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব প্রেমের যথার্থ অন্তিমতা মাথুর পর্যায়ের পদে।সেখান ও রাধার মধ্যে এক বিপুল অপূরণীয় প্রতীক্ষা চোখে পড়ে।রবীন্দ্রনাথ ও তাদের প্রেমের কবিতা সেই বিপুল প্রতীক্ষার উচ্চারণ লক্ষ্য করি 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস' ইত্যাদি কবিতায় পায়-

হে মন উদাসী/ দুর্গেয় রহস্য ভেঙে জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
পূর্ণিমা রজত রাত্রি সময়ের নীড়ে/ তুমি এসো এসো আর বার
হে মন ফেরারি মন হে বাউল সন্ন্যাসী আমার।[12]

বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ দান পায় 'দোষ কী' কবিতায়। 'দোষ কী' কবিতর প্রথম চার লাইনে এই রূপদান হয়েছে এই ভাবে-

রাই জাগো রাই জাগো- পদাবলী কীর্তন
ধূপের গন্ধে সুখ সারি করে ঝগড়া
ফিসফিস কথা হলে ফের হবে নিন্দা
দ্বারে উঁকি মারে চঞ্চলমতি বৃন্দা।[13]

'কোন এক কন্যা' কবিতায় পায় সংঘমিত্রা তুমি এই পৃথিবীর আশ্চর্য রমণী।ঘরের দেওয়ালে শান্তি গিরি মাটির আলপনা কিংবা 'সবুজ দ্বীপের মেয়ে' কবিতা তে পাই -

সবুজ দ্বীপের মেয়ে তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরি
বাদামি রোদের দিনে দারুচিনি লবঙ্গ-এর দেশে
তোমাকে পাওয়ার জন্যে দারুচিনি লবঙ্গ-এর দেশে
এখনও অপেক্ষা করে জাহাজের একটি নাবিক।[14]

সুতরাং বৈদ্যনাথের কবিতায় প্রকাশিত প্রেম ভাবনার সাথে বিষ্ণুদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দ জয় গোস্বামী প্রভৃতি কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার পুষ্প মাসি কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট যেমন -

দেখুন হাসি পুষ্প মাসি তোমায় পড়ে মনে।
বেশ কিছু দিন কাটিয়ে ছিলুম শান্তি নিকেতনে।

তুমি তখন পুতুল ছিলে তুমি তখন কাদা।
তোমার ছবি বানিয়ে ছিলেন রামকিঙ্কর দাদা।[15]

এসবের বিচিত্রতার মধ্যে ও কবি কবিপ্রিয়াকে পদাবলী কবিতায় নির্মল পরিবেশের মধ্যে আপন ভালোবাসার রাজ্যে আহ্বান করেছেন। যা চিরন্তন শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। তাই পদাবলী কবিতায় শুনি -

এসো না নির্মল বাতাসে মুখ রেখে,
দুজনে বসে থাকি সবুজে দেহ ঢেকে।
মনের ময়না যে শেকল সয়না যে,
দুচোখ তনময় আকাশ দেখে দেখে।[16]

এবার দেখব তার কাব্যে প্রতিবাদ, যা জ্বলন্ত মশাল এর ন্যায়। প্রতিবাদ জীবন যাপনেরই এক অঙ্গ। সমাজ সময়, নানা যুগে, নানাভাবে, সেই প্রতিবাদকে ভাষা দান করে। প্রতিবাদী কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর কবিতা রচনা কাল১৯৪৯-১৯৯৯। এই সময় এর অন্তর্গত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলন, গ্রাম বাংলার নানা বিধ শোষণ-বঞ্চনা, অমানবিকতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বাদেশিকতা ও প্রতিবাদী চেতনাবোধর চিত্র ধরা পড়েছে তার বিভিন্ন কবিতায়। তবে তার বিভিন্ন ধরনের কবিতার মধ্য থেকে প্রাধান্য পেয়েছে প্রতিবাদী মানসিকতা। সারা বাংলা জুড়ে ঘটে চলা প্রতিটি সামাজিক বঞ্চনা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন।

১৯৪৯সালের ১৫ ই আগস্ট ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লিখলেন -

এই দুনিয়ার তোরাই মালিক /তোরাই রাজা-বাদশা নবাব
ওদের পায়ে সেলাম ঠোকা/ মিথ্যে তোদের ঘুচুক স্বভাব বুক ফুলিয়ে ধরলে লাঠি
মুখ ফুটে দে স্পষ্ট জবাব।

১৯৪৭এর স্বাধীনতাকে অনেকের মতো কবি ও মেনে নেন নি। তাই তিনি বলেছেন -

এটা কি সত্যই স্বাধীন দেশ/অন্য নেই, বস্ত্র নেই
নেই ফুল মধু -গন্ধ প্রেম জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম। কিংবা এ আজাদী ঝুট
এ নেতারা ঝুট /অন্য আজাদী চাই।

কবি দেখলেন বহু আত্ম বলিদান এর মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা এলো সেই স্বাধীনতাকে উপভোগ করার জন্য দেশমাতাকেই কেটে টুকরো করতে হলো।এই দেখে কবি লিখলেন -

ধন্য ব্রিটিশ সিংহ মামা/ ধন্য স্বরাজ বিক্রেতা
ধন্য বসেন গান্ধী জহর/জিন্না প্রমুখ দেশ নেতা
কিনলো স্বরাজ সস্তা দরে /ভারত মাতার বুক ফেড়ে।

কবি জবাব চেয়েছিলেন এই কি জীবন ফাঁসি পরার। জেলহাজতের এই কি দাম,আন্দামানের নির্বাসনের এই কি উচিত দাম পেলাম।এই ভাবে কবি জবাব চাইতে চাইতে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন এবং বলে উঠলেন-

ঘরে নাই ভাত হাঁড়ি উপোস /কাদের দোষ? জবাব চাই
জবাব না পেলে লেখনি বন্ধ করব নাই?(জবাব চাই)[17]

সম্ভবত জবাব না পেয়ে তিনি মেহনতী মানুষের কবি হয়ে উঠেছিলেন।মেহনতী মানুষের জন্য আপোষহীন আন্দোলন করতে করতে কবি সমাজটাকে আপাদ- মস্তক চিনে ফেলেছিলেন।১৯৫১র একুশে এপ্রিল কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনে বকুল ও বন্দনা নামে দুই নাবালিকা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এর প্রতিবাদে চারণ কবি লিখলেন-

নিরন্ন দেশ ক্ষুধার্ত লোক/ উনিশশ একান্ন সাল
ফুলের মতো নিষ্পাপী /দুই ছোট বোনের রক্তে লাল।(খাদ্য দে)।

১৯৫৩ র ১ লা জুলাই ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৭দিন ধরে বামপন্থী দলের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।তারই প্রতিবাদে কবি লিখলেন-

আর কতদিন সইবো মা /দুঃখের বোঝা বইবো মা
গর্জে ওঠে কলম আমার ছন্দরে /ট্রামের চাকা বন্ধ রে।

এই বছরেই ৫ ই জুলাই বার্নপুর শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এতে সাতজন শ্রমিক মারা যান।কবি লিখলেন-

হাপরে আগুন গনগনে লাল /সাঁড়াশি আর হাতুড়ি যার
ইট বয়ে বয়ে পিঠ ভেঙ্গে গেছে আজ যাহার
তামাটে হয়েছে রোদে পুড়ে দেহ রং যাদের

পেটে ভাত নেই আজ তাদের।(প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি)

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের দুহাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নেন।এই ঘটনায় কবি লেখেন -

শিক্ষক আজ পাননি রুটির দাম /পথে-ঘাটে তাই জমে ওঠে সংগ্রাম।

১৯৫৬ র ২১ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তি করার চেষ্টার প্রতিবাদে হরতাল হয়। কবি লিখলেন -বাংলা বিহার যুক্ত করার/ কালপেঁচাদের বিবৃতি

পড়ছি এবং শুনছি এবার/ সর্বনাশের কূটনীতি

আজ প্রতিবাদ ঝান্ডা উড়া ও / মিথ্যে ভড়ংং ঐক্য ছল

বাংলাটা নয় অতুল্য আর/ বিধান রায়ের খাসমহল। (পোস্টার কবিতা)

১৯৫৭ তে পারমানবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে সারা পৃথিবীব্যাপী ঘরে ছাত্র যুব ঐক্য কবি লিখলেন-

চায়না আমরা রন সম্ভার/ বৎসের খেলা বিস্ফোরণ

অস্ত্র চায়না যুদ্ধ চাইনা /আমাদের ঘরে সাম্য শান্তি নেমে আসুক

চায়না দেখতে শিশুপুত্রের মৃত্যু মুখ।

১৯৬৬ র মার্চ এ পশ্চিমবঙ্গে যে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খাদ্য আন্দোলন দেখা দেয়। পুলিশ স্টেশনে খাবার চেয়ে ১০ বছরের ছেলে ইসলাম বুলেট এর শিকার হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমকালীন প্রায় সব কবিই যথা -সুভাষ মুখোপাধ্যায়,বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্রোণাচার্য ঘোষ প্রমুখ কবিরা কলম তুলে ধরলেন। কবি লিখলেন- পুত্রহারা জননীর শোকার্ত চিৎকার

এখনো গুমরে মরে, ফুঁপে ফুঁপে কেঁদে ওঠে

শত শত নুরুলের মা।

১৯৭২ এ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আন্দোলনে কবি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মেদিনীপুরের জেলে কারাবরণ করেন।এই সময় জেলে বসে ১৫ টি কবিতা লেখেন যা 'পোস্টার কবিতা'। ১৯৭৫ র জরুরি অবস্থা জারি হতে তিনি লিখলেন -

বুকের ভেতর মাদল বাজে/ ঘরের ভেতর ভ্রষ্টাচার বিপক্ষকে আগল দিয়ে

ছাগল পোষা ধর্ম যার,সেই বেদেনী মন্ত্র জানে

ভেড়া বানায় মরদকে গিরগিটিকে কুমির বানায়

বাদুড় বানায় বলদ কে। (জঙ্গলের ছড়া)

১৯৭৮ এ 'ম্যানিফেস্টো' কবিতায় কবি সশস্ত্র বিপ্লবের পথকেই যথার্থ বলে মনে করেছেন কবি লিখলেন- একটি শিশুর মুখে দুগ্ধ যদি না জোটে এখনো তাহলে বিপ্লব

একটি মায়ের মুখে না যদি এখনো জোটে অন্ন কিংবা রুটি তাহলে বিপ্লব

..... ফুল নয় মালা নয় চন্দনের ফোটা নয়, যত পারো থুতু ছুঁড়ে দাও ভেদ বুদ্ধি নেতাদের মুখে।[18]

১৯৭৯ সালে 'কবিতা পড়ছি' কবিতায় লিখলেন-

মালিক পক্ষের সরকার/ সরকার পক্ষের পুলিশ পুলিশের হাতে বেয়োনেট

কারখানার পাঁচিলে পাঁচিলে দলা দলা রক্ত/ গেটে তালা।[19]

ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চোখা চোখা বক্তৃতার ধুম। অন্ধকার রাত্রে মালিকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক।

আবার 'কইতে বারণ' কবিতায় কবি সমাজের আর এক রূপকে তুলে ধরলেন ১৯৯১ সালে -

রাজা উজির হচ্ছে যারা পড়ছে গলায় জয়ের মালা। গাড়ি বানায় বাড়ি বানায় লকার

প্রকার সোনাদানায় উঠছে তারা ফেঁপে ফুলে প্রতিশ্রুতি শিকেয় তুলে

স্বরাজ তাদের স্বাধীন তারা বাকি সবাই সর্বহারা।[20]

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে দেখি ছদ্মবেশী নেতা ও সমাজ সেবক দের প্রতি -'খচ্চর ছেলে' কবিতায়।তিনি লিখলেন -

দেশটা বিকিয়ে মানুষ ঠকিয়ে যারা আছে আজ সুখে।

হিসি করে দিতে পারি আমি সেই ভ্রষ্ট' নেতার মুখে।[21]

শুধু জ্বালাময়ী ভাষণ নয়,শোষিত সর্বহারা মুক্তি সংগ্রামে বৈদ্যনাথের কবিতাগুলি যেন শনিত প্রহরনের মতন ঝলমল করে উঠেছে,ন্যায় সংগত ক্রোধের দীপ্তিতে।কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর কথায় -"তোমার কবিতায় নজরুলের ঝাঁঝ, দারুন তেজি তেজি ভাষা। তুমি হচ্ছ বাংলার আর এক চারণ" I[22]

চারণ কবির প্রতিবাদের ধারাটি অনেক ব্যাপক, অনেক অনিবার্য, অনেক বেশি শক্তিশালী।তার কাব্যের স্লোগান কখন যেন কবিতায় পরিণত হয়।ভাবি কালের পাঠকসমাজ এই কবিতার মধ্য থেকেই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পান। প্রেমের মোড়কে

প্রতিবাদের ভাষা।এই প্রতিবাদ কালে কালে যুগে যুগে, যার রং আদৌ ফিকে হয়ে যায় না। প্রগতির প্রকৃত সাধনার আহ্বান কবিরাই জানান কোথাও অঙ্গীকারে,কোথাও প্রতীক্ষায়,কোথাও জবাব চেয়ে এর বেশী কিছু করার থাকে না কবিদের। সমাজকে পথ দেখাতে জনমত গঠন করতে কবিদের কলম সদা প্রস্তুত থাকবেই যেমনটি ছিল প্রেমিক ও প্রতিবাদী কবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তথ্যসূত্র:

১. চারণ কবি বৈদ্যনাথের নির্বাচিত কবিতা, সম্পাদনা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপ্রসন্ন মিশ্র, প্রকাশনা - চারণ কবি বৈদ্যনাথ সাহিত্য একাডেমী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রথম প্রকাশ বিষ্ণুপুর মেলা, ২৩ শে ডিসেম্বর ২০১২ পৃষ্ঠা-১১১.

২. তদেব পৃষ্ঠা-২১

৩. তদেব পৃষ্ঠা -১১৪

৪. তদেব পৃষ্ঠা-১১১

৫. তদেব পৃষ্ঠা-১৩

৬. তদেব পৃষ্ঠা-৭৮

৭. তদেব পৃষ্ঠা-১৮৯

৮. তদেব পৃষ্ঠা-১৩৫

৯. তদেব পৃষ্ঠা-১৬

১০. তদেব পৃষ্ঠা-১৩

১১. তদেব পৃষ্ঠা-৫০

১২. তদেব পৃষ্ঠা-১৭৬

১৩. তদেব পৃষ্ঠা-১৬১

১৪. তদেব পৃষ্ঠা-১৫২

১৫. তদেব পৃষ্ঠা-৭৮

১৬. তদেব পৃষ্ঠা-৭৭

১৭. তদেব পৃষ্ঠা-১৭৮

১৮. তদেব পৃষ্ঠা-১৪৩

১৯. তদেব পৃষ্ঠা-৬০

২০. তদেব পৃষ্ঠা-৫৫

২১. তদেব পৃষ্ঠা-১৬৭

২২. শব্দ নৈঃশব্দ্য, চারণ কবি বৈদ্যনাথ স্মরণ সংখ্যা,সম্পাদনা দিলীপ তালওয়ার,প্রকাশনা সমরেন্দ্র গোস্বামী,৪৩ মহেশমাটি,মালদা, ২০০২ পৃষ্ঠা ১১৮.

ব্যক্তি ঋণ :-

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়,অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,হরিপ্রসন্ন মিশ্র, সুব্রত পন্ডিত ও চারণ কবি বৈদ্যনাথ সাহিত্য একাডেমীর সদস্য বৃন্দ।

মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যে অন্ত্যজ

দেবজ্যোতি শীট
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : *বর্তমান বিশ্বের বহুচর্চিত অন্যতম বিষয় 'দলিত', যারা 'সবার পিছে, সবার নীচে। সামাজিক স্তরবিন্যাসে নিম্নবর্গকে সাধারণভাবে অন্ত্যজ বলা হয়, সেই বর্ণবিভাজনে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল বিভাজিত। স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রশ্নে ভাজ্য কীভাবে ভাজকের গরিষ্ঠতাকে ক্ষীয়মান করতে সক্ষম তা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষত মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরে সন্ধান করলে পাওয়া যায়। সেই অচর্চিতের চর্চিত চর্চায় অন্ত্যজ আজকের হাড়ি, মুচি, ডোম, কাহার, বাগদী, দুলে, সাঁওতাল, ফকির, মতুয়া ইত্যাদি যারা জাতিগত ও সম্প্রদায়গতভাবে দলনের শিকার; সমান্তরালে প্রাচীন কালের দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব, হব্যহীন দেবকুল, শবর, ব্যাধ, কিরাত প্রভৃতিরাও অচর্চিত অন্ত্যজ হিসেবে চর্চিত হতে পারে। ইমারত তার ভিতের উপর নির্ভরশীল, তাই মৃত্তিকা প্রোথিত অন্ধকারময় দলনের বিস্মৃত এক অধ্যায় হ'ল অন্ত্যজের চর্চিত চর্চা।*

সূচক শব্দ : *সাবলটার্ন, ডিকনস্ট্রাকশন, সম্ভাব্যতার সূত্র, বহুমাত্রিক, এথিরোক্লোরোসিস, বয়াংসি', নিম্নবর্গ, চন্ডাল, ব্যাস, বৃষ্ণি, শূদ্র*

বর্তমান বিশ্বের' Subaltern' একটি চর্চিত অভিমুখ, যা বর্তমান বৈশ্বিক এক জীবন্ত বাস্তব,ভারতবর্ষেও এরই প্রত্যক্ষ রূপ ভাস্বরিত। যুগেযুগে ধর্ম, বর্ণ ও অর্থের নিরিখে বিভাজিত স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রাচীন পুরাণ-শাস্ত্র ও সাহিত্যের কালজয়ী প্রবাহ ও বর্তমানের বিশ্লেষণী আতসের অভিযোজনই হ'ল অচর্চিতের চর্চিত রূপান্তর। এক্ষেত্রে জ্যাক দারিদা (Jacques Derrida) র 'ডিকনস্ট্রাকশন থিয়োরী' (Deconstruction Theory) প্রসঙ্গটি আমাদের মনে আসে। ফ্লেগে (Feuerbach), রাসেল (Bertand Russell), ভিটগেনস্টাইন (Ludwig Joseph Johann wittgenstein), ম্যুর (G.E.Moore) এর মতো বহু দার্শনিক Emotion ও Knowledge এ নবনির্মীয় সমালোচনার সূত্রপাত করেন। এরই নামান্তর হিসেবে প্রসঙ্গটি আবেগমূল্য ও জ্ঞানজমূল্যের তুলাদন্ডের আধুনিক অন্ত্যজদের বিড়ম্বিত অতীত অচর্চিতের চর্চিত প্রয়াস। সম্ভাব্যতার (Probability) নিয়মে এহ'ল অতীতের অভিজ্ঞতার স্তূপীকৃত সত্যতা।

ভাবনার আপেক্ষিকতায় ভাষার নতুন বোধসৃষ্টি হয়, ভিনগেনস্টাইনের ভাষায় তা বহুমাত্রিক। সেই ভাবকে স্মরণ করে ভাবনার স্তরায়নে যুগবাহি বঞ্চিতের নাম বলতে পারি 'অন্ত্যজ'। বেদ, মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যের পরিসরে তারই সাধারণ বর্ডারলাইন আঁকা যেতে পারে।

শেক্সপীয়র যতই বলুন, নামে কি যায় আসে, তবুও বলতে পারি নামে কি নাহয়? পুরাণে রামনামেও শিলা জলে ভাসতে সক্ষম হয়েছিল। সভ্যতা-সমাজের সৃষ্টিপর্বেও নাম-পদবী ব্যবহার কিম্বা বর্ণবিভক্ত সমাজসৃষ্টির মূলেছিল জীবনকে সুষমভাবে গড়েতোলার প্রয়াস। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কূটাভাসে স্বার্থ ও সুযোগকে নিশ্চিত করতে উচ্চবর্গীয়রা আসন দখল করে, বিপরীতপক্ষকে অপরবর্গে পরিণত করেছে। স্বার্থসিদ্ধির আয়ুধে যে যত বেশি শাণ্ দিতে পেরেছে ,তারাই লাভকরেছে বিজয়ের জয়মাল্য। দরিদ্র স্বজাতি যেমন ধনী প্রতিবেশীর দ্বারা নিগৃহীত হয়,একইভাবে দেবে-দৈত্য, সুরে-রাক্ষস, আর্যে-অনার্য, উচ্চবর্গীয়ে-নিম্নবর্গ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যে শূদ্র কালপরম্পরায় নির্যাতিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। অবশ্য সূচনায় যা-ছিল প্রয়োজনীয়তা;তা-ই সমাজধমনীর অন্তর্গাত্রে জমে ওঠা বসার মত এথিরোক্লোরোসিস (Atherosclerosis) সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সূচনার সাথে ক্রমবর্ধমান অংশের কোনোদিন হুবহুসাদৃশ্য থাকেনা। বৈদিক সাহিত্যের সাথেও মহাকাব্যিক বা আরো পরবর্তীকালের সমাজভাবনার ক্রমপরিবর্তনেও তা লক্ষ্যকরা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯১ঋষিসূক্তের অন্যতম ৯০তম পুরুষসূক্তটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।১

প্রাথমিক বর্ণপ্রথার ঋগ্বেদীয় নিদর্শন নিচের শ্লোকে পাই-

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখ মাসীদ্বাহু রাজন্যঃকৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পড্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।"২

শূদ্রেরা দেবসৃষ্ট নয় এবং তাদের কোনো দেবতা নেই বলে তান্ড্যমহাব্রাহ্মণে (৫:৮:১১) বলা হয়েছে, তাই তাঁরা যজ্ঞের অধিকারীও নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪:১০১:৩১) নারী, শূদ্র, কুকুর ও কালোপাখিকে অসত্য, পাপ, অন্ধকার হিসেবে একাকার করা হয়েছে। আধুনিক আলোচনায় রনজিৎ গুহ ১৯৮৩সালের পর তাঁর আটখন্ডে সংকলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থে প্রান্তজন, অচ্ছুত, নিম্নবর্গ, অন্ত্যজ, Subaltarn ইত্যাদি ধারণাকে বিকশিত করেছেন।বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে মুসোলিনীর কারাগারে বিপক্ষের শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইতালির চিন্তাবিদ গ্রামশি(Antonio Francesco Gramsci) 'Subaltern' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ।পরবর্তীকালে

গ্রামশিপন্থীরা শব্দটিকে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা Study অর্থে অন্যমাত্রা দিয়েছিলেন।ভারতবর্ষে আত্মজাগৃতির রাস্তা ধরেই প্রথম বি.আর.আম্বেদকর এইসমস্ত ব্রাত্য,খাটো,ছোটলোক ইত্যাদিদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন,সেই স্মরনীয় তারিখটি ছিল ২৫/১২/১৯২৭, যেদিন ঘটেছিল মনুসংহিতার প্রজ্জ্বলন। বহুরৈখিক এই শূদ্রত্ব ভাবনা মহাভারতে তথা সংস্কৃত সাহিত্যের স্থানেস্থানে বিশেষ মাত্রায় উল্লেখিত রয়েছে।ইতিহাস যেহেতু ভবিষ্যতের ছায়াপথ নির্মাণ করে তাই, ধূসর অতীতকে অস্বীকার না করে,বর্তমানের সোপান ধরে ,মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্রত্বের প্রসঙ্গগুলি ছুঁয়ে যাওয়া যেতে পারে।

শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। শব্দার্থের তিলেক ফারাকে জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতেপারে। প্রাচীন ভারত উপমহাদেশে কৃতি-বিকৃতির মূলে ছিল আর্য-অনার্য ভাবনা। আর্যরা উন্নাসিক ও ঔপনিবেশিক মূর্তিতে এদেশে এলে, স্বভূম থেকে বিচ্যুতির শ্লাঘা সহ্য করেছিল এদেশীয় 'বয়াংসি'রা। বহু মনু , বহু ব্যাসে বিভাজিত ও নিয়ন্ত্রিত ভারতীয়দের জীবনে বিমিশ্রণ ও গতিময়তায় শূদ্র-সঙ্করজের সৃষ্টি;যারা অপরবর্গ নামে ত্রিবর্গ(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য)থেকে অধঃক্ষেপিত হয়েছে। একসময় সমাজ পিরামিডের শীর্ষবিন্দু হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণেরা। যদিও সে ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত ছিল না, ছিল অর্জিত। ক্রমশ বুদ্ধি,বল ও অর্থের সমবায়ে, প্রাধান্যের সংজ্ঞার্থ বিবর্তিত হয়েছে।শূদ্র ও শূদ্রাতিশূদ্রে 'অনিরবসিত' (জলঅচল)' নিরবসিত' (জলচল)র মধ্যে কোয়ারনটাইন (Quarantine) রেখা স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। জল অচলে বৃষল,পুল্কস, স্বপাক ,ডোম,চাঁড়ালরা অবস্থান করেছিল।মনুসংহিতার পথানুসরণ করে সেই বিভেদ -সঙ্কীর্ণতা স্বার্থের নামান্তরে পরিণত হয়।

ঋগ্বেদের সময় অর্জিত ব্রাহ্মণত্বের সংবাদে জাতিভেদের চরম ভাব ছিল না।নিম্নোক্ত বক্তব্যটি তার-ই সাক্ষ্য বহন করে-"আমি বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি,আমার কন্যা যব ভেজে ছাতু বানিয়ে বিক্রিকরে এবং আমার ছেলে চিকিৎসক ।"

আসলে-"ঋগ্বেদের অতিশয় আধুনিক অংশের রচনার সময়ও ঋগ্বেদের দেবগনের উপাসনা ছিল, পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হয় নাই এবং সমাজের ভিন্নভিন্ন শ্রেণি ভিন্নভিন্ন 'জাতি' হইয়া দাঁড়ায়ও নাই। সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে 'জাতি'বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই। দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে যে মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা হাস্যজনক।"৩

গীতাগ্রন্থের ১৮ অধ্যায়ের ৪১ নং শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও গুণভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্রের বিভাজনের কথা বলা হয়েছে; অর্থাৎ সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া উচিত। মনু ব্রহ্মা থেকে যে চতুঃবর্ণের ধারণা দিয়েছিলেন তাছিল কর্মভিত্তিক। পরবর্তীকালে উচ্চবর্গীয়রা প্রভূত্বসুখ লাভের জন্য তা জন্মভিত্তিক সঙ্কীর্ণতায় তা গন্ডীবদ্ধ করেছে। 'ভগবৎগীতায়' শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তথ্য কর্তারমপি মাংবিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্। "৪

[গুণকর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণের সৃষ্টি।আমি এই সৃষ্টির কর্তা হলেও আমাকে অব্যয় পরমেশ্বর ও অকর্তারূপে জানবে।]

তথাকথিত যে বিদেশীরা আর্যভাষায় কথা বলতেন তারা সবসময় এদেশীয়দের অসুর,অনার্য, পক্ষিজাতীয় (বয়াংসি) ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছেন। ধর্মভিত্তিক পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যেই সুরের ভ্রাতারূপে অসুরের পরিচয় আছে। কশ্যপ-অদিতিপুত্ররা সুর,কশ্যপ-দিতিপুত্ররা অসুর ,দানব বা দৈত্যরূপে পরিচিত। প্রজাপতির দুইকন্যার উৎস এক, নামান্তরে একজন দেবসেনা, অপরজন দৈত্যসেনা-এখানে নামান্তরেও অধঃক্ষেপ! একইভাবে বলা যায় ব্রহ্মা থেকেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি। তবে একই স্রষ্টার উৎসজাত হয়েও শূদ্র অস্পৃশ্য! অসুরদের মত শূদ্রও সর্বহীনতা প্রাপ্ত, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের সর্ববিজয় ঘোষিত হয়েছে। এই চতুঃবর্ণের বাইরে আরেক অন্ত্যজরা হলেন বর্ণসঙ্কর। দেবতাদের মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞহব্যের বিরোধিতা করেছেন। অশ্বিনীকুমাররা কিন্তু সূর্যপুত্র হয়েও বৈদ্যবৃত্তির কারনে মহাভারতের কোথাও কোথাও শূদ্রের তকমা লাভ করেছেন। এঁরা জন্মের থেকে কর্মবিভাজিকায় গুরুত্ব পেয়েছিলেন। অথচ কর্ণের ক্ষেত্রে জন্মপরিচয় বড়হয়ে উঠেছে। মহাভারতের 'যুধিষ্ঠির অজগর সংবাদ '(২৫) বনপর্বে আছে-'

শূদ্রে চ তদ্ভবেল্লক্ষা দ্বিজ চেচ্চন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণ ।।"

[শূদ্রে যদি বিদ্যালক্ষণ থাকে তবে সে শূদ্র নয়,ব্রাহ্মণে যদি সে লক্ষণ নাথাকে,তবে সে ব্রাহ্মণ নয়।]

প্রাচীন ভারত অনুসন্ধানে স্পষ্ট যে, শূদ্র শব্দটি নিম্নার্থে ব্যবহৃত হলেও তা জন্মভিত্তিক সঙ্কীর্ণতায় বাঁধাপড়েনি।

ভারত ইতিহাসে যে দশ রাজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে পাঁচ আর্য, পাঁচ অনার্যের যুদ্ধ। ভারতাগোষ্ঠীর রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে ছিল এই যুদ্ধ। পুরু এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত ও পুরুর সম্মিলনে কুরুবংশের উৎপত্তি ঘটেছে। একবার যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা ইন্দ্রের কাছে দস্যুধর্ম জানতে চাইলে, ইন্দ্র রাজ্যেবসবাসরত যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন তারাহলেন-যবন,কীরাত,গান্ধার, চীন, শবর, শক, কঙ্ক, মঠ ইত্যাদি। আরো বলেছেন- ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররাও আছে। তাছাড়া দস্যুও কিছু আছে।

দেবতারা যাঁর সাহায্যে স্বর্গ উদ্ধার করেছিলেন সেই দধিচী ছিলেন শূদ্র। দক্ষিণ ভারতের উদ্ধারকর্তা অগস্ত্য ছিলেন শূদ্র পর্যায়ের। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মিকী ছিলেন দস্যু। বর্তমানেও ভারতের উত্তরপ্রদেশে 'বাল্মিকী' পদবীধারীরা তপশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত।

মহাকাব্যিকযুগে রামায়ণ ও মহাভারতেও অন্ত্যজদের বিশেষ করুণা বা অনুগ্রহের পাত্রহতে দেখাগেছে,তবে তাদের কতটুকু নিজস্বতা ছিল তাদের অবস্থান থেকেই তা স্পষ্ট। রামায়ণে সদাচারী, নিষ্পাপ শম্বুককে বধ হতে হয়েছিল তার নিম্নবর্গীয়তার কারনে। শূদ্রের তপস্যার অধিকার নাই অথচ সে তার সীমা লঙ্ঘন করার অপরাধে শাস্তি পেয়েছে অন্যদিকে শম্বুক হত্যার পাপ থেকে রামকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তীর্যগযোনি পবননন্দনেরা অনায়াসে রাবনবধ করতে পারত, রাবনবধের কৃতিত্ব রামকে দেওয়ার জন্য এত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। উচ্চের কৃতিত্ব দলিতবর্গের মধ্য দিয়েই এসেছে। আর্যরামচন্দ্র অনার্য বনচর বানরসৈন্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এসত্য ভেদাভেদ মাত্রায় তীর্যকগতি লাভ করে বিষয়ান্তরে পৌঁচেছে। মহাভারতের নিম্নবর্গের অবস্থান ও বিস্তৃতির পরিসরে লক্ষ্য করা যায়, ক্ষত্রিয় গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রের সাথে মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনু কেন্দ্রিক বিবাদে কামধেনু আত্মরক্ষায় যে সৈন্য উদ্গীরণ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শক, যবন (সম্ভবত আলেকজান্ডার পূর্ববর্তী ধারনা নয়), পৌন্ড্র, কিরাত, খশ, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল ও ম্লেচ্ছ। বিনতানন্দন গরুড় বিমাতা কদ্রুর কাছ থেকে নিজমাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গথেকে অমৃত আনয়নে যাত্রা করে।যাত্রাপথে জঠরানল নির্বাপিত করার জন্য সমুদ্র প্রান্তে সহস্র নিষাদ ভক্ষণের পরামর্শ গরুড়কে বিনতা দিয়েছিলেন। সেই নিষাদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা 'নির্দয় ও দূরাত্মা '। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সমুদ্র সীমায় বসবাসকারী কোনো ব্রাক্ষণ পাপী হলেও তাকে ভক্ষণ করা যাবে না। এক ব্রাক্ষণ দম্পতি গরুড়ের কণ্ঠনালী

থেকে তাই নিস্ক্রান্ত হবার সুযোগ পেয়েছিল। লক্ষ্যনীয় স্ত্রীলোকটি নিষাদী ,শুধু সে,স্বামীর ব্রাহ্মণত্বে উদ্ধার পেয়েছে-

"সমুদ্র কুক্ষাবেকান্তে নিষাদালয় মুক্তমম্।
ভবনানি নিষাদানাং তত্রসন্তি দ্বিজোত্তম!
পাপীনাং নষ্টলোকানাং নির্ঘৃণানাং দুরাত্মজাম্
নিষাদানাং সহস্রাণিতান ভুক্ত্বামৃতমানয়।
ন চ তে ব্রাহ্মণং হন্তুং বুদ্ধিঃ কার্যাকথঞ্চন।
অবধ্যঃ সর্বভূতানং ব্রাহ্মণো হ্যনলোপমঃ। "৫

মহাভারতের ধর্মনীতির প্রবক্তা কৃষ্ণ 'ব্রাহ্মণ' নয়, 'বৃষ্ণিবংশীয়'। রাজনীতিজ্ঞ বিদূর ছিলেন দাসীপুত্র, অন্যদিকে কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব শকুনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না।বিদূরকে বলা যায় ভারতীয় সভ্যতার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী।

'সমুদ্র মন্থন' কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়, বাসুকীনাগের পুচ্ছভাগ অদিতিপুত্র দেবতারা এবং দিতির পুত্র দৈত্যরা সম্মুখভাগ ধারণ করেছে,এঁরা সকলেই কশ্যপের সন্তান। বাসুকীনাগের সম্মুখভাগ (সাপের মুখ)পুচ্ছভাগের মত নিরাপদ নয়। উচ্চ-নীচের সুবিধাভোগের চতুরতা এখানে দূর্লক্ষ্য নয়, অথচ একই উৎসে (কশ্যপ) জাত হলেও দানবেরা অধিকারে নিম্নবর্গ। আবার মন্থিত গরল বা কূট অনার্য দেবতা(?)শিবকেই ধারণ করতে হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে চতুঃবর্ণের সৃষ্টি হলেও শূদ্র অস্পৃশ্যে ,উৎকৃষ্ট সুবিধাভোগে হয়েছে বঞ্চিত।

মহাভারতের মূলকাহিনী চন্দ্রবংশ থেকে ধরা হয়। ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী থেকে পুরুবংশের সৃষ্টি হয়নি। অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা-যযাতির বংশধর কৌরব ও পান্ডবরা। আবার দাসরাজকন্যা মৎস্যগন্ধার মধ্য দিয়েই হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থে রাজবংশের বিস্তার। মনুসংহিতার বিরোধিতায় পরাশরসংহিতা বহুপতিক ব্যবস্থাপথকে সহজ করেতুলেছে। অর্থাৎ মনু তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থার সুবিধাভোগের রাস্তা নির্মাণ করেন, আবার পরাশর নিজের কামনা চরিতার্থ করতে সমাজবিধিকে নিজের মত করেতুলেছিলেন। এই পরাশর ছিলেন ব্রাহ্মণ শক্ত্রি ও বৈশ্য অদৃশ্যন্তির পুত্র। কোনো নারীর শূদ্রপুরুষ বা অনার্য পুরুষ গ্রহণের মত দ্বিচারী কোনো প্রমাণ মহাভারতে প্রকট হয়নি।

মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের ঔরসজাত এবং বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অম্বিকা ও অম্বালিকা নন্দনের বিস্তার। ব্যাসদেব ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ বা কাল। ভৃগু

বর্ণপ্রথা সম্পর্কে ভরদ্বাজকে বলেছিলেন-'ব্রাহ্মণেরা সুশ্রী, বৈশ্য হলুদ, ক্ষত্রিয় লাল এবং শূদ্রেরা কাল' (মহাভারত ১৮৮:৮)। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ (শূদ্র?) থেকেই ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর উৎপত্তি, কৌরব-পান্ডবদের সূচনা।

গুরুদ্রোণাচার্য অর্জুনের অর্জিতগুণের চেয়ে সর্বোচ্চ আসন দিতেগিয়ে একলব্যের পারঙ্গমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব খর্বকরতে হীনউপায় অবলম্বনেও পিছপা হননি। গুরুদক্ষিনার ছলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদনে তাকে বিকলাঙ্গ করেছেন। কারণ সে নিম্নবর্গ, নিষাদকুলজাত। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের সীলমোহর থাকলে এই কাজ দ্রোণ করতেন বলে মনে হয়না। নিষাদকুলের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করতে হরিবংশ পুরাণে একলব্যের কাহিনীতে যাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেবভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্রহিসেবে সংস্কৃতরূপ দেবার চেষ্টাহয়েছে। একলব্যের জন্মানোর সময় যদুবংশীর হাতে নিহত হবার দৈববাণী হয়েছিল। তাই তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিলে মগধ রাজ্যে এসে পৌঁছায়। নিষাদরাজা হিরণ্যধনুর পুত্ররূপে একলব্য তখন পরিচিত হয়েছিলেন। এভাবেই অন্যবর্গ কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠলে তাতে অন্য কাহিনীর সংযোগে উচ্চবর্গীয়ের করুণাটুকু বামহাতে মনসা পুজোর মত দায়সারা হয়েছে।

মহাভারতের 'যতুগৃহপর্বাধ্যায়ে' উল্লেখ আছে যে বিদূর ও যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। এই দুইজন ম্লেচ্ছভাষা কীভাবে বা কোথাথেকে শিখেছেন সে ঘটনার উল্লেখ পাইনা। অনুমান করতে পারি এর উৎসে হয়তো অস্পষ্ট এক কাহিনীরেখা আছে।যেখানে মান্ডবের অভিশাপে ধর্ম শূদ্রাদাসীরগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।তাঁর নাম হয় বিদূর।তাঁর পিতা ছিলেন মৎস্যগন্ধার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ। ধর্ম বিদূর রূপে জন্ম গ্রহণ করলেও, আবার এই ধর্ম যুধিষ্ঠিরের ঔরসজাত পিতা, পান্ডুর ক্ষেত্রজ হিসাবে পরিচিত। এই জটিল আবর্ত থেকেই অনুমান করা যায় এই দুজনের ম্লেচ্ছ ভাষা নাজানা অসম্ভব নয়। আবার মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যেই এই ধর্মঠাকুরকে অন্ত্যজদের ডোমদেবতা হিসেবে পাচ্ছি। বিদূরের শূদ্রত্বের মোচনহেতু হয়তো ব্যাসদেব ধর্মের আবরনে হস্তিনাপুরের রাজমন্ত্রীরূপে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য বিদূর ব্যাসদেবের ক্ষেত্রজ ও ঔরসজাত। সত্যবতী নন্দন (ধীবর কন্যার পুত্র) ব্যাস নিজ পরিচয়ের অন্তরালে আর এক শূদ্রানন্দনকে ফল্গুর মত প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। ফলত নিজে জাত্যাতীর্ণ হয়েই পরবর্তী অপরবর্গকে নিম্নবর্গে পরিণত করেছে?

দাসরাজকন্যা(রাজকন্যা?)মৎস্যগন্ধার যোজনগন্ধা হয়েওঠার ক্ষেত্রেও উচ্চবর্গীয়ের দূরভিসন্ধি লক্ষ্য করাযায়। ব্রাহ্মণ পরাশরের সঙ্গমকামনার নির্লজ্জ প্রকাশ পুনর্ভূ হবার নিদান ও পদ্মগন্ধা হবার প্রলোভনে স্বার্থসিদ্ধির পথনির্মান বলা যেতে পারে। এরসাথে

যুক্ত হয়েছে গিরিকা-উপরিচর বসুর কাহিনী। সেখানেও ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধার নিম্নবর্গতার হীনতা লাঘব করে হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্ঞীতে উত্তীর্ণ করেছেন।

বারাণবতের কাহিনীতে দেখা যায় যতুগৃহে অবস্থানের সময় উচ্চবর্গীয় পাঁচসন্তান ও একমাতার জীবন রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করতেহয়েছে অনার্য নিষাদ মা ও সন্তানদের।ক্ষত্রিয় জীবন রক্ষার কারনে নিষাদ জীবন এখানে হয়েছে তুচ্ছ। কুন্তীর ব্রাহ্মণ ভোজনহেতু স্ত্রীলোকসহ বহুজন আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেই আমন্ত্রণে শিখন্ডি হয়েছিল নিম্নজরা, নিরাপদে অন্যান্যরা ফিরে গিয়েছিল।শুধুমাত্র-

> "এক নিষাদ স্ত্রী তার পাঁচপুত্রকে নিয়ে এসেছিল,সে পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হ'ল।"৬

ব্রাহ্মণ বেশধারী পান্ডবরা বারানাবৎ থেকে অরণ্যে আসার সময়ে গঙ্গারতীরে পৌঁছন। বিদুর পারাপারের ব্যবস্থা করার জন্য কৈবর্ত জাতির একমাঝিকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেসময়ে সেই কৈবর্তজাতীয় ব্যক্তি যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবহার জানতেন-

> "সর্ববাত সহাং নাবং যন্ত্র যুক্তাং পতাকিণীম্।
> শিবে ভাগিরথৌতীরে নরম বিপ্র সম্ভীকৃতাম।"

এরপর ভীমের সাথে রাক্ষস বলে পরিচিতা হিড়িম্বার বিয়ে হয়ে। স্মরণীয় এদেশীয়দের আর্যরা রাক্ষস বলে অভিহিত করেছিলেন।সেই রাক্ষসী হিড়িম্বা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচও বীর ছিলেন। অরণ্যপর্বে বদরিকাশ্রম গমনের সময় রাক্ষসরা এবং রাক্ষসজাত ঘটোৎকচও পঞ্চপান্ডবসহ দ্রৌপদীকে সহায়তা করেছিল। এই দুর্গম গন্ধমাদন পর্বতাঞ্চল ছিল গন্ধর্ব ও অসুরদের দ্বারা রক্ষিত। তারপর লক্ষ্য করা যায় যে অনার্য রমনী গ্রহণে ভীমের অসুবিধা না থাকলেও দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভরে কানীন বা সূতপুত্র কর্ণকে উচ্চবর্ণীয় নারীলাভে বঞ্চিত হতে হয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণ নারীর অধিকারও উচ্চবর্গীয়ের একাধিপত্যে ছিল।

মহাভারতের 'বকপর্বাধ্যায়' অংশে ,একচক্রানগরে ব্রাহ্মণগৃহে পান্ডবদের বসবাসকালে বকরাক্ষস ব্রাহ্মণ ও তার পরিবারকে পালাক্রমে খেতে চাইলে ব্রাহ্মণকে ক্রন্দনরত দেখে তাঁর স্ত্রী বলেছেন-

> "তুমি প্রাকৃতজনের মত বিলাপ করছ কেন?"৭

তাহলে কি শুধু প্রাকৃতজনের বিলাপ করার জন্য জন্ম হয়েছে?

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে বহু অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হয়েছিল। তখন যথাক্রমে ভীম,অর্জুন, নকুল ও সহদেব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন ও জয় করেছেন। ভীম উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট-সুক্ষ্মেরসাথে ব্রহ্মপুত্র ও পূর্বসাগর তীরবর্তী ম্লেচ্ছদেশে। অন্যদিকে "নকুল মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতুল শাল্যেরকাছে প্রচুর ধনরত্ন আদায় করলেন এবং সাগরতীরবর্তী ম্লেচ্ছ, পল্লব ও বর্বরগণকে জয়করে দশহাজার উষ্ট্রে ধনবোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।"৮

আবার ইন্দ্রপ্রস্থের বৈভব ও উপঢৌকন বর্ণনাকরে ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন বলেছেন- "শূদ্রেরা কার্পাসিক দেশবাসিনী শতদেশে তন্বীশ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিয়েছে। ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, সোধময় অলঙ্কার এবং হস্তিদন্তের মুষ্ঠিযুক্ত অসি দিয়েছেন।"৯

কৈলাস শিখর ও কুবেরভবনের হংসকারন্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ স্বর্ণপদ্মময় সরোবর ক্রোধবশ (তাচ্ছিল্য ও অবহেলিত নামের প্রমাণ) রাক্ষসরা রক্ষা করছিল। দর্পিতভীম পরদ্রব্য স্বর্ণকমল চয়ণ করতেগিয়ে বলেছেন-

> "যক্ষপতি কুবেরকে তো এখানে দেখছিনা,আর তাঁর দেখা পেলেও আমি অনুমতি চাইতে পারিনা,কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থণা করেননা (দস্যুতাকরেন?), এই সনাতন ধর্ম (মনুসংহিতার?)।"

আবার 'যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায়'এ বহুরাক্ষস ভীমের হাতে নিহত হলে যুধিষ্ঠির বলেছেন-"ভীম তুমি হঠকারিতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর করো না।"১০

দেব-রাক্ষসের সম্পর্ক উল্লেখ করে দেবতার ক্রোধে গুরুত্ব আরোপ করে রাক্ষসবধের নৈতিকতার প্রশ্ন উঠেছে,নচেৎ রাক্ষসজীবন মূল্যহীন।

শূদ্র, অন্ত্যজ বা হীনবংশজাত মানুষের পক্ষপাতযুক্ত কোনও যুক্তি বা প্রমাণ মহাভারতে দেখানো হয়নি। ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থার সুবিধাভোগের নীতিতে বহু বাক্যসুযোগ ব্যবহার করা হয়েছে।বনপর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

> "সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।......কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়,সে স্থানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বসাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয়না।"

এক্ষেত্রে বর্ণসঙ্করের প্রসঙ্গও আছে। তবে আধুনিক সমাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তরের মধ্যে মর্যাদার বদলে জন্মসূত্রকে প্রাধান্য দেয়। মহাভারতের 'বনপর্বে'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মাহাত্ম্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে শূদ্রের কৃতিত্বের ছিটেফোঁটাও লক্ষ্যকরা যায়না। আবার ক্ষত্রিয়রা ততদূর সম্মানীয় ,যতদূর তাঁরা ব্রাহ্মণদের সম্মানিত করেছেন। দানদক্ষিণা ও সম্মাননার ভীড়ে শূদ্র ও অন্যান্যরা হয়েছেন ব্রাত্য। মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু ব্রহ্মার কাছ থেকে বরে যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষসের অবধ্য হলেও কুবলাশ্ব রাজার শরীরে প্রবেশ করে হত্যাকরেছে। এ আশীর্বাদে ছলনা ছিল। আসলে নিম্নবর্গের গৌরবকে বারবার দমিত করাহয়েছে নানাভাবে। স্ত্রীলোক ও অন্ত্যজদের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে গল্পাকারে মহান করে তোলা হয়েছে। যেমন ধর্মব্যাধের প্রসঙ্গ-

> "ধর্মব্যাধের গৃহেগিয়ে কৌশিক বললেন,বৎস তুমি যে ঘোর কর্মকর তা তোমার যোগ্য নয়।ধর্মব্যাধ বললেন,আমি আমার কুলোচিত কর্মই করি।"১১

ব্রাহ্মণ ও ধীবরকন্যাজাত ব্যাসদেব উচ্চবর্গীয় ভাবনায় বেদ ও ধর্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ব্যাধকে উচ্চকুল ও মান্যতা দিতে পরাঙ্মুখ বলেই 'কুলোচিত ' শব্দার্থকে 'মহান' হিসেবে গড়ে তুলেছেন। 'পূর্বকৃত কর্মের ফল' বলে শূদ্রের মহনীয়তা নির্মূলের প্রচ্ছন্ন প্রলেপ কাহিনীটিতে ব্যবহৃত। সামাজিক কাঠামোয় কুলবৃত্তিকে জন্মভিত্তিক অনুশাসনে পর্যবসিত করা হয়েছে। যা ছিল পূর্বজন্মের 'সু' বা 'কু'এর সাময়িক সন্তুষ্টির অজুহাতমূলক বক্তব্যমাত্র। ধর্ম, কর্ম, দেব-দ্বিজের প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার কথার উল্লেখ শুধু হয়েছে,তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি। আবার অপকর্মের জন্য ব্রাহ্মণের ভাবীশূদ্রত্ব প্রাপ্তির শাস্তি বিধিত হতে দেখা যায়না। প্রায়শ্চিত্যের কঠোর শাস্তি নিম্নবর্গীয়দের ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রযোজ্য।

মহাভারতের বড় অংশজুড়ে দেব-দৈত্য,সুর-অসুর যুদ্ধ বারবার ঘটেছে। দেবতাদের ছাড়া অন্যান্যদের চিরস্থায়ী জয়েরমাল্য দেওয়া হয়নি। 'বিরাট পর্বে' যুধিষ্ঠিরের সাথে বিরাটের কথোপকথনে অপ্রিয় আচরণকারীর শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ হলে নির্বাসন, আর বাকীরা বধযোগ্য বলাহয়েছে। শ্রেষ্ঠবর্ণ ছাড়া জীবনের অধিকারও তার নেই।

অগস্ত্যের অভিশাপে সর্পরূপধারী নহুষ 'ব্রাহ্মণকে'? -এই প্রশ্ন যুধিষ্ঠির কে করেছিলেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির সত্য,দান,ক্ষমা,সচ্চরিত্র, অহিংস,তপস্যা,দয়াযুক্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। শূদ্রের এই গুণাবলী থাকলে যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন-
"যে শূদ্রে ঐ সব লক্ষণ থাকে তিনি শূদ্র নন,ব্রাহ্মণ;যে ব্রাহ্মণে থাকেনা তিনি ব্রাহ্মণ নন,তাকে শূদ্র বলাই উচিত। "১২ কিন্তু বাস্তবে তার উচ্চবর্গীয়ে স্থান নেই, এ কথার কথামাত্র।

মহাভারতের কাহিনী থেকে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে তৎকালীন নিম্নবর্গীয়ের অবস্থান সংক্ষিপ্ত আলোচিত হতে পারে।

তবে বর্ণবিভক্ত সমাজের প্রান্তবাসী নিষাদ,সবর,কিরাত কিন্তু শূদ্র নয়। এরা বর্ণবিন্যাসের ছকের বাইরে আর এক নিম্নবর্গীয়।বাণভট্টের কাদম্বরীতে শবর সেনাপতি একলব্যের সাথে কাহিনীর প্রসঙ্গ এসেছে সপ্তম শতাব্দীতে শূদ্রকের সভায় চন্ডাল ও চন্ডাল কন্যার বর্ণনা ও তৎকালীন বর্ণিল(?) সমাজের পরিচয় তুলে ধরে।কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্ত প্রদত্ত শকুন্তলার স্বর্ণখচিত অঙ্গুরীয় একজন ধীবর; মৎসের অভ্যন্তরে পায়।নির্দোষ এই ধীবরকে রাজপ্রহরীরা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যঙ্গও করেছে। ধীবর রাজপ্রাসাদে এসে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত পুরষ্কারের বখরা প্রহরীদের সে দিতে বাধ্য হয়। কারণ ধীবর উচ্চবর্গীয়ের অধীন।

কালিদাসের 'রঘুবংশ কাব্যে' আছে শম্বুক হত্যার করুনদৃশ্য। রামের হাতে নিষ্পাপ শম্বুক তপস্যা করার কারনে হত হয়েছে। হত্যার দায়ে রামের পাপ হয়নি। রাম সীতা উদ্ধারের সময় বর্ণগতভাবে শূদ্রেরও নীচে অবস্থিত বানর,ভালুক ইত্যাদিদের সহায়তা নিয়েছেন, নিষাদরাজ গুহকের আতিথেয়তাও গ্রহণ করেছেন। শবরীর এঁটোকুলও খেয়েছেন (বাল্মিকীরামায়নে এই কাহিনিটি যদিও নেই)। অথচ সেই রামচন্দ্র শূদ্রের তপস্যার অপরাধে শম্বুক বধ করেছেন।-

> "তপঃশীর্ণ শূদ্রের মুখটি শুষ্করেণুযুক্ত পদ্মের মতো,রাম
> খড়্গের আঘাতে সেটিকে মৃণাল থেকে বিচ্যুত করলেন।"

বল্লাল সেন উচ্চ-নীচবর্ণের উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণের সুযোগ ত্রিশবৎসর দিলেও লক্ষণ সেন একবছর ও সময় না দিয়ে তা জন্মভিত্তিক শূদ্রত্বের গন্ডিতে জগদ্দল করেছেন।

জন্মগত জাতিভেদ প্রথার সূচনাকাল বৈদ্যবংশীয় গৌড়রাজ বল্লাল সেন(১১৫৮-১১৭৯)ও বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী থাকা থাকাসত্ত্বেও সুন্দরী ডোমললনা নর্তকী পদ্মিনীকে বিয়ে করেছিলেন। আনন্দ ভট্ট লিখেছেন-

"বিজয় সেনের জারজপুত্র বল্লাল সেন দুষ্কর্মপরায়ণ,
সাধুপীড়ক, ডোম এবং চন্ডাল কন্যায় আসক্ত। "১৩

ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে -

"জন্ম না জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দিজ উচ্চতে।
বেদপাঠী ভবেবিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।।"

[জন্মমাত্রই সবাই শূদ্র। সংস্কারে দ্বিজ পদবাচ্য হয়। বেদপাঠে বিপ্র হয় এবং ব্রহ্মকে জানলে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয়।]

আধুনিক ছোঁয়াছুঁয়ির দুনিয়ায় প্রাচীন ভাবনার এই কুটিল-জটিল ব্যবস্থাকে উচ্চবর্গীয়েরা স্বার্থসিদ্ধির ঘুঁটিতেসাজিয়ে ফেলার চেষ্টাও করছেন। সব বৃত্তি যদি দাসত্ব হবে,তবে শূদ্রের দাসত্ব শুধু নিম্নমানের কেন বিবেচিত হবে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।রাজতরঙ্গিনীর উদ্ধৃতিতে পরিসমাপ্ত করতে পারি-

"শূদ্র অশিক্ষিত, রুচি হীন;ডোম্বী বর্বর;কিন্তু কল্হন বড় শিল্পী এবং সৎ ঐতিহাসিক;তাই অপক্ষপাত চিত্রণে দেখি দ্বিজ ব্রাহ্মণও বহুবার, ঐ রূপে চিত্রিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মন্ত্রী স্বার্থসর্বস্ব; ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্রপরায়ণ; কায়স্থ কুটিল, অসৎ; বরং সাধারণ শূদ্র সৈন্য সৎ ও প্রভুভক্ত।"১৪

তথ্যসূত্র:

১. বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা-ড.শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৭-৪৮।

২. ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০/৯০/১২ (Ref. উদ্বোধন পত্রিকা, ISSN 0971-4316-115-1419/তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ১৭১।

৩. ঋগ্বেদ সংহিতা, অনু.শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত, কলকাতা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের, (অষ্টম অষ্টক-ভূমিকা-On Board of the 'NUDDEA'London,26th May,1886. যন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৮৭।

৪. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, -স্বামী রামসুখ দাস, প্রথম সং., গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৬। পৃ.৩০৫-৩০৬।

৫. মহাভারতম্, আবির্ভাব, দর্শনাচার্য হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণম্,প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলি, ৯, পৃষ্ঠা-৩৯০।

৬. মহাভারত-সারানুবাদ রাজশেখর বসু, মাইতি বুক হাউস ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল. ৭০০০৭৩, প্রথম সং, ২০১৯, পৃ.৫৯।

৭. ঐ, পৃ .৬৩।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা১০২।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৪।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৯।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা২০৬।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৪।

১৩. বল্লাল চরিত-[১৫১০ সালে রচিত ১৯০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত] তথ্যসূত্র-সমাজ দর্পন ১৫ বর্ষ, সংখ্যা ১২, জুন ১৯৯৯।

১৪. প্রাচীন ভারত:সমাজ ও সাহিত্য-সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল. ৯ পৃষ্ঠা-৪৪৯-৪৫০।

নভেল করোনা ভাইরাস: মানসিক ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

শুভঙ্কর ঘড়া
স্যাক্ট-১, গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়,
সুতাহাটা, চৈতন্যপুর, পূর্বমেদিনীপুর

সারসংক্ষেপে *(Abstract):- বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণে যে মহামারী রূপ নিয়েছে তার প্রভাব শুধু মানুষ নয় সমস্ত জীবের উপর পড়েছে। নোবেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমশ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা আগামী দিনে পৃথিবীর সমগ্র জীবের অবস্থান যে বিপন্ন হবে তা বলার অবকাশ রাখে না। এর ফলে মানুষ আজ অজানা রোগে রোগাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন ঔষধ ও টিকাকরণ আবিষ্কৃত হলেও তা কতটা মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক বা প্রাণ বাঁচাতে পারে চিকিৎসক ও গবেষকের কাছে একটা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আর কত এইরকম ভাইরাসের সম্মুখীন হতে হবে তা আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। এই অদৃশ্য দানব ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি যাতে পায় তার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ও কর্মসূচীগুলি পালন করলে আমাদের হয়তো অনেকটা মানুষের চিন্তা দূর হবে।*

সূচক শব্দ *(Keywords):- নোবেল করোনাভাইরাস, ভাইরাস সংক্রমণ, ভ্যাকসিন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট, মানসিক ব্যাধি, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা।*

মূল আলোচনা:-

আমাদের এই সৌন্দর্যময় বসুন্ধরাতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে, আজও সকল জীব তাদের জীবৈচিত্র্য প্রবাহমান রয়েছে। সৃষ্টির পর থেকে এই ধরাধামে কত মহাজাগতিক প্রলয় ঘটেছে,প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী বা মানবঘটিত কারণে জীববৈচিত্র্যের কত পরিবর্তন ঘটেছে ।কিছু জীব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিছু জীব লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে, তার কারণ হিসেবে অনেকে দায়ী করেছেন মানুষেরদ্বারা ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিঅকথ্য ব্যবহার ও দূষণ সৃষ্টি ।দিনের পর দিন যত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে মানুষের নিজের বাঁচার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় করছে, যেমন আমাজনের জঙ্গলে আগুন লাগানো, উত্তর মেরু প্রদেশে বড় শিল্প স্থাপন করে বরফ গলিয়ে জলস্তর বৃদ্ধি ঘটানো, বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে স্ট্রাটোস্ফিয়ারেওজোন

গ্যাসের ফাটল ধরিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে আগমন ঘটছেতোর ফলেজীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।প্রকৃতিতেএকঅস্বাস্থ্যকরপরিবেশেরবাতাবরণতৈরি হয়েছে। আজ এই সৌন্দর্যময় বসুন্ধরা বড় অসুখে ভুগছে।সমস্ত জীবগুলোকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে প্রাণ নেওয়ার জন্য আগমন ঘটেছে প্রাণঘাতী মারণ ভাইরাস নভেল করোনা ভাইরাস ।

এই ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়াবহতা এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেহয়তো অনেকটা আমরা সামলাতে পারবো, কিন্তু সেইসঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে থেকে যাবেমানুষ ও প্রাণীদের মধ্যকার রোগ সংক্রমণের বিষয়টি। বর্তমানে এই ভাইরাসের টিকাকরণ দেওয়ার প্রস্তুতি পর্ব চললেও আমাদেরএকে অপরের সাথে মেলামেশা বা সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাণঘাতী ভাইরাস এর আগমন ঘটেছে তা বিজ্ঞানীরা অবগত আছেন। যা সকল প্রাণীকূলকে সংক্রমিত করে আসছে।যারফলস্বরূপমৃত্যুঘটেছেলক্ষাধিকপশু-পাখীতথামানুষের।

বিশ্বেরবিভিন্ন দেশেরভাইরাস সংক্রমণেরতথ্যদেওয়াহলো -

ঘটনা	সূচনা	শেষ	মৃত্যু (লক্ষ)
ব্ল্যাক ডেথ (কালো মৃত্যু)	১৩৩১	১৩৫৩	৭৫
ইতালীয় প্লেগ	১৬২৩	১৬৩২	২.৮
সিভিল এর মহামড়ক	১৬৪৭	১৬৫২	২০
লণ্ডনের গ্রেট প্লেগ	১৬৬৫	১৬৬৬	১
মার্সেইয়ের মহামড়ক	১৭২০	১৭২২	১
প্রথম কলেরা মহামারী	১৮১৬	১৮২৬	১
দ্বিতীয় কলেরা মহামারী	১৮২৯	১৮৫১	১
রাশিয়া কলেরা মহামারী	১৮৫২	১৮৬০	১০
গ্লোবাল ফ্লু মহামারী	১৮৮৯	১৮৯০	১০
ষষ্ঠ কলেরা মহামারী	১৮৯৯	১৯২৩	১
এনসেফ্যালাইটিস লেথার্গিকা মহামারী	১৯১৫	১৯২৬	১৫
স্পেনীয় ফ্লু	১৯১৮	১৯২০	১০০০
এশিয়ান ফ্লু	১৯৫৭	১৯৫৮	২০

হংকং ফ্লু	১৯৬৮	১৯৬৯	১০
ইবোলা ভাইরাস	১৯৭৬, ২০১৪, ২০১৬		১১ (হাজার)
সার্স	২০০২	২০০৪	৭৪৪ (জন)
এইচ১এন১ মহামারী	২০০৯	২০১০	২.০৩
মার্স	২০১২	২০১৫	১০
নিপা	১৯৯৮	২০১৮	১৭ (জন)
এইচ. আই. ভি. / এইডস	২০১০	২০১৯	৩ কোটি ২০ লক্ষ সংক্রমিত
কোভিড-১৯	২০১৯	১৬ই জানুয়ারী, ২০২১ পর্যন্ত	২,০১৭,৮৪৩ (জন)

এইসবভাইরাসের বেশিরভাগ বাদুড় থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয় এবং তার জন্য বাদুড়ের অ্যান্টিভাইরাস প্রতিক্রিয়াকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীর শরীরে বাহককিনা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বনাঞ্চল কেটে ফেলা এবং বন্যপ্রাণীদের বসতিতেহানা দেওয়ার ফলে এইসব সংক্রমণের হার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। এইসব সংক্রমণের ক্ষেত্রে মানুষকে বলা হয় 'ডেড এন্ড হোস্ট'। মানুষের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হলে বা ভীষণ রকম পরিবর্তনেএই বাদুড়ের লালায় ভাইরাস ক্ষরণ অতিরিক্ত বেড়ে যায় যা অবশ্যম্ভাবীরূপে অনেক সংখ্যক জীবজন্তু এমনকি মানুষকেও সংক্রমিত করে। শুধু এই নয় অনেক ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রমাগত 'মিউটেশন' বা 'প্রতিরোধক জিন' অর্জন করার ফলে জীবাণুনাশক ড্রাগস-এ অনেক বেশি প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সম্পূর্ণ না হলেও ওষুধের কর্মক্ষমতা কমেছে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে একই শ্রেণীভূক্ত এন্টিমাইক্রোবিয়ালস মানুষ ও প্রাণীদের প্রয়োগ করা হয়। তাই উভয় এই মাইক্রোবিয়ালস্ প্রতিরোধের অংশীদার হতে পারে। নোবেল করোনাভাইরাস চীনের উহান প্রদেশের একটি সামুদ্রিক প্রাণী বাজার থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অল্পকয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের মানুষ সংক্রমিত হতে থাকে।২০২১সালের,১৬জানুয়ারি WHOরিপোর্ট

অনুযায়ী বিশ্বের মানুষের সংক্রমণের সংখ্যা হলো ৯৪,৩১২,১৯৫ জন, মৃত্যু ঘটেছে ২,০১৭,৮৪৩ জন, সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৭,৩৪৪,৩৪২ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সংক্রমিত বিভিন্ন দেশের তথ্যগুলি হলো-

দেশের নাম	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	সুস্থতার হার
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২৪,১০২,৪২৯	৪০১,৮৫৬	১৪,২২৮,৯৬৯
ভারত	১০,৫৪৩,৬৫৯	১৫২,১৩০	১০,১৭৮,৮৮৩
ব্রাজিল	৮,৩৯৪,২৫৩	২০৮,২৯১	৭,৩৬১,৩৭৯
রাশিয়া	৩,৫২০,৫৩১	৬৪,৪৯৫	২,৯০৯,৬৮০
ইউনাইটেড কিংডম	৩,৩১৬,০১৯	৮৭,২৯৫	১,৫০৩,৬৫৪
ফ্রান্স	২,৮৭২,৯৪১	৬৯,৯৪৯	২০৮,০৭১
তুর্কী	২,৩৭৩,১১৫	২৩,৬৬৪	২,২৪৬,০৪৭
ইতালি	২,৩৫২,৪২৩	৮১,৩২৫	১,৪১৩,০৩০
স্পেন	২,২৫২,১৬৪	৫৩,৩১৪	---
জার্মানী	২,০২৩,৮০২	৪৬,৫৩৭	১,৬৪১,২০০

ভারতবর্ষে মার্চ মাস থেকে লকডাউন এর জন্য মানুষ গৃহবন্দী। কর্ম থেকে বিচ্যুতি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ক্রোধ,সন্দিগ্ধতা,উদ্বিগ্নতা,হতাশা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়ির সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছে। আবার কেউআত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেমানসিক চিন্তায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারমতানুযায়ীপরিবারের শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি ও মানসিক স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য অনেক নির্দেশিকা পালন করার কথা বলা হলেও বাস্তবতা করতে অনেক ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। সমগ্রবিশ্ববাসীর কাছে একসময়চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনটা বাজবে তো? প্রতিনিয়ত মানসিক চিন্তায় ক্ষুধামান্দ্য ও ঘুমের সমস্যার দরুণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গবেষকরা জানিয়েছেন গৃহবন্দী জনিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে গার্হস্থ্য হিংসা বিপদজনক আকার ধারণ করেছে। WHO "*মেন্টাল হেলথ এন্ডসাইকো সোশ্যাল কনসিডারেশন ডিউরিং দি কোভিড-90 আউটব্রেক*" শীর্ষক নিবন্ধে মানসিকস্বাস্থ্য নিয়ে তাদের পরামর্শ দিতে গিয়ে শিশুদের দুঃখ, ভয় ইত্যাদি অনুভূতিগুলোকে স্বাভাবিকভাবে

প্রকাশ করতে দেওয়া আবশ্যক এবং যতদূর সম্ভব তাদের মা-বাবা বা নিকটজনের কাছে থাকবার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরী।

করোনা আবহকালে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার সব স্তরে পড়াশোনা একসময় বন্ধ করা হলেও পরে ইউজিসি নির্দেশে সর্বস্তরে অনলাইনে গঠন ও পরীক্ষা পঠন পাঠন ও পরীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে নানা রকম সমস্যার মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। ইন্টারনেট, ডাটা প্যাক, ফোনের সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানসিক চিন্তা কে বাড়িয়ে তুলছে। এই ভয়াবহ দিনগুলো কাটিয়ে উঠে বর্তমানে ধাপে ধাপে স্কুল ও কলেজ খোলার নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আনন্দের বিষয় আবার স্কুল-কলেজ খুলবে। সকলের সমাগম হবে। অভিভাবকদের কাছে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সব স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পঠন-পাঠন শুরু হবে তো? ছেলেমেয়েরা নিরাপদে থাকবে তো ? পানীয় জল ও শৌচালয় পরিষ্কার থাকবে তো? ছোটরা তো সবসময় মাস্কপরে থাকতে পারবে না। স্কুলে কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি কোভিড পজিটিভেরকারণেতার সন্তানের পরে যদি সংক্রমিত হয় তাহলে কি হবে?

মানসিক ব্যাধি

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আবহাওয়া কালে গৃহবন্দি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আগ্রহ, মনোভাব, আচরণ ধারার উপর বিস্তর প্রভাব পড়েছে। তার ফলস্বরূপ মানুষকে নানা রকম মানসিক ব্যাধির স্বীকার হতে হয়েছে। বিশেষত 12 থেকে 18 বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যেদুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ খাওয়ানোর সমস্যা, মেজাজ, অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিস-অর্ডার, বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ, সিজোফ্রেনিয়া, এডিএইচডি, আত্মহনন, প্যানিক ডিস-অর্ডার, সামাজিক ভয় ইত্যাদি রোগের মত লক্ষণ বেশি করে দেখা গিয়েছে যা DSM-5 এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর ফলস্বরূপ যে সমস্ত সমস্যার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল।

শিশু

উত্তেজিত হওয়া, সময়-অসময়ে মোবাইল ব্যবহার, গেম খেলা, বাড়ির জিনিস অপচয় বেশি, ঘুমের অসুবিধা, খাবারে অনীহা, মাথার যন্ত্রণা, পড়তে অমনোযোগী প্রভৃতি।

কৈশোর

একাকীত্ববোধ, খিটখিটে মেজাজ, জীবন-মরণবাঁচার লড়াই, পরিবারের মধ্যে সমস্যা, অ্যালকোহল পান, পর্নোগ্রাফি দেখা, প্রেমে অশান্তি, আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া, ভবিষ্যৎচিন্তা, সংক্রমণের চিন্তা, ঘুমের সমস্যা প্রভৃতি ।

বয়স্ক

গৃহবন্দী, জীবন-মরণ বাঁচার লড়াই, পরিবারের সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে সমস্যা, কাজ নেই, ঘুম নেই, টাকা শেষ, খাওয়ার কম, পরিবারের প্রিয়জন হারানোর শোকে স্তব্ধতা,আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া, বিস্তৃতি, সংক্রমনের চিন্তা, ডিভোর্স,খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি।

এই সমস্যাগুলো মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। আজ একটু একটু করে মানসিকচাপ গুলো কমতে শুরু করেছে। মানুষ নতুন করে কাজে যেতে শুরু করেছে। অফিস, প্রতিষ্ঠান খোলা শুরু হয়েছে। তাই শিশু থেকে বয়স্ক সবাইকে স্বাস্থ্য নিয়ম বিধি মেনে এগিয়েচলতেহবে। অভ্যাসে পরিণত করতে হবে মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ও শারীরিকদূরত্ব বজায় রাখা। মানসিক চিন্তা দূর করে নতুন করে কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলতে হবে। মানুষ গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে মানুষ অনেকটা আজ মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

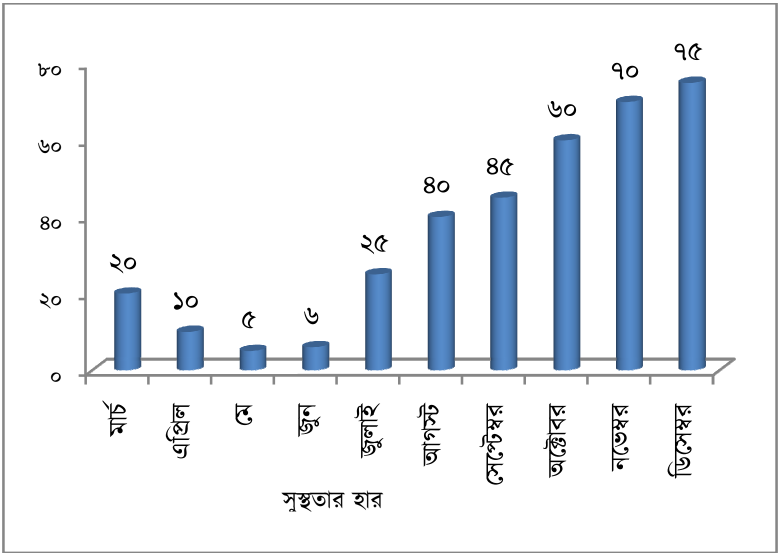

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রোগ নির্দেশিকা অনুযায়ী 60 বছর বা তার বেশি বয়সেনোবেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত রোগের কারণে মৃত্যু ঘটেছে।

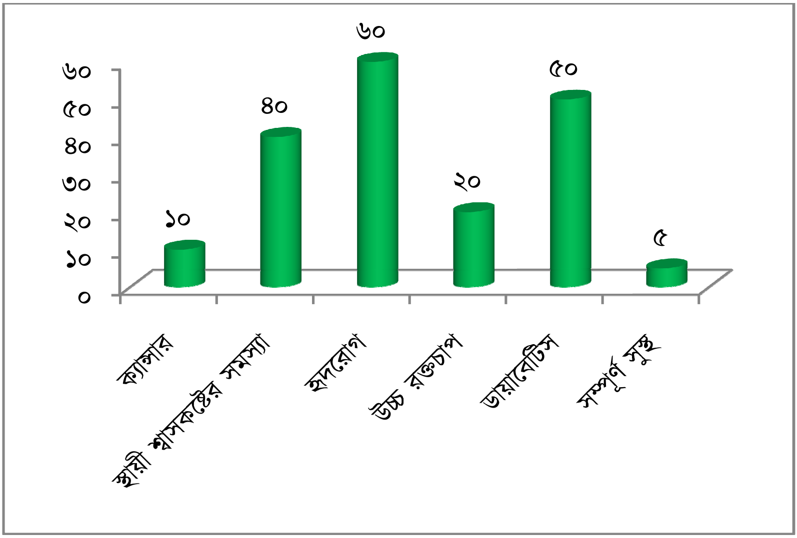

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা

নভেল করোনা সংক্রমণের দাপটে আমাদের সচল প্রবাহমান পৃথিবীর সভ্যতা যেন অনেকটা পিছিয়েএসেছে। সময় যেন আজ অনেক থমকে দাড়িয়েছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা কঠিন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এমার্জেন্সি জন্য UK-Pfizer'ও BioNTech ভ্যাকসিন তৈরি হয়। পরে রাশিয়ার স্পুটনিক' ভি ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পর মানুষের মনে অনেকটা স্বস্তি ফিরেছে। এর পর বিশ্বের একের পর একদেশে ভ্যাকসিন তৈরির কাজ শুরু হয়। কমির্ণটি ভ্যাকসিন,মওডের্ণা, AstraZeneca, সিনোভা, ভিক্টর, তজিনামের্ণা, কভিশিল্ড কো-ভ্যাকসিন ইত্যাদি।এইসব ভ্যাকসিন তৈরি তৈরির কাজ ইতিমধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের শেষ করে টিকা দেওয়ার ছাড়পত্রের অনুমতির দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যাবে ভ্যাকসিনগুলি। ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ীএইসব ভ্যাকসিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের মধ্যে কতদিন থাকবে এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া কি কি দেখা যাবে তা ঠিক হবে উল্লেখ করেননি। ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে Pfizer ভ্যাকসিন দেওয়ার পর নরওয়ের 23 জন বয়স্ক মানুষ মারা গিয়েছে। ভারতে কভিশিল্ড ভ্যাকসিন দেওয়ার পর অনেকে অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। যারা গর্ভবতী মা বা যাদের এলার্জি বা শ্বাসষ্টজনিত সমস্যা আছে তাদের ভ্যাকসিন নিতে বারণ করা হয়েছে। তাই প্রতিরোধ গঠনকারি ভ্যাকসিন এর টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হলেও চিন্তার ভ্রুকুটি মাথা তুলে

দাঁড়িয়েছে।ভ্যাকসিন নেওয়ার আগেচিকিৎসকের পরামর্শনিতে হবে।মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও নিজের শরীরের মধ্যেপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রাণায়াম করা

নিয়মিতভাবেভোরে ওঠে প্রাণায়াম করতে হবে, এতে আমাদের একদিকে যেমন দুশ্চিন্তা দূর হবে তার পাশাপাশি হৃদপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন ঠিক থাকবে। এছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম করাও বয়স্কদের হাঁটাচলা করা দরকার।

মনের ভয় দূর করা

নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করলে অনেকটা মানসিকচিন্তা দূর হয়ে যায়।এর জন্য আমাদের বাড়ির সবার সঙ্গে খোলামেলাভাবেমেশা, গল্পকরা, স্বাস্থ্যবিধিমেনে চলা দরকার।

উত্তেজনা কমানো

যেকোনো অফিসের কাজ করার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। পারিবারিক সমস্যা বা নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা ফলে কাজের উপর যাতে না প্রভাব পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিয়মিতমাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব

মাস্কপরাটাওআমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাই যাতে মেলামেশা করে সেদিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

খাবার খাওয়ার আগে পরিষ্কার জল ব্যবহার ও স্যানিটাইজার করা

খাওয়ার আগে পরিষ্কার জল দিয়ে বার বারহাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার করা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। খোলা খাবারনাখাওয়াভালো। বেশি করে শাকসবজি খাওয়া দরকার।

সচেতন স্বাস্থ্য সচেতন

কোন জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, গন্ধহীন বা অন্য কোন শারীরিক সমস্যা দেখাদিলে নিকটস্থ হসপিটাল নার্সিংহোম বা ভাল ডাক্তার দেখান। আমাদের কোনো রোগ গোপন করা চলবে না।

তরুণদের স্বাস্থ্য সচেতনতা

যারা জাতির মেরুদণ্ড তাদের নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তারা যেন ওই নির্দেশিকা মেনে চলে ও অন্যদের সতর্ক করেন। বিধিনিষেধ ভেঙে যেন নিজেদের বিপদের মুখামুখি না হয়। কারণ তরুণ প্রজন্মসমাজ গঠনের কারিগর।

মোবাইল ফোন ব্যবহার

ছোটরা যাতে মোবাইল ফোন উপযুক্তকাজে ব্যবহার করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। তা না হলে মোবাইলের প্রতি আসক্তি বাড়বে। এছাড়া মেজাজ খিটখিটে, নিদ্রাহীনতা, খাওয়ার চাহিদা কমে যাওয়া, আত্মহনন, অল্পবয়স থেকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, সামাজিক বিপদমূলক কাজে যোগদান করে নিজেদের বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

কর্মসন্ধান

যারা নতুন চাকুরী বা কাজের জন্য চিন্তায় ছিলেন তারা আগের ন্যায় আবার কর্মের জন্য অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আবার সব আগের মত স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

করোনা পজিটিভ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো

যে সকল ব্যক্তিরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তারা একটু চিকিৎসা পেলে সেরে উঠবে। কিন্তু তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হলে চলবে না। তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের নিরাপদ থাকার ও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার পরামর্শ দিতে হবে।

নভেল করোনা ভাইরাস এর জৈবিক বিশেষত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে এবং এটির উচ্চসংক্রামক বৈশিষ্ট্যই এই রোগটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। আতঙ্কে আজ সংক্রমণের লক্ষণ যুক্ত ব্যক্তিরা করোনা পরীক্ষা করতে নারাজ।পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ও এ এসএসএইচএ কর্মীদের কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বেশি করে করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং আর্থিকভাবে ভেঙে পড়া মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্লাব, বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।শিশু, কিশোর-কিশোরীদের গৃহবন্দি থাকার কারণে, প্রিয়জন হারানোর ব্যাথায়, ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তারকারণে যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ঘটেছিল আজ তার অনেকটা চিন্তার অবসান ঘটেছে।ভারতেইতিমধ্যে কভিশিল্ড ও কো-ভ্যাকসিনের ছাড়পত্র মেলায় নভেল করোনাভাইরাস মোকাবেলা বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ভারত তথা বিশ্ববাসী। স্কুল আবার খুলবে। শিশু-কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে

যাবে। হয়তো অনেকদিন তাদের মেনে চলতে হবে শারীরিক দূরত্বের নিয়ম কানুন। পাল্টে যাবে আমাদের বাংলা সামাজিক সংস্কৃতির প্রাত্যহিকতা। এ এক অন্য স্বাভাবিকতা। সকলকে এগোতে হবে সাবধান ভাঙাচোরার ভিতর দিয়ে। এই চড়াই-উৎরাই টানাপোড়েনের সময় সবচেয়ে জরুরি বোধহয় শিশু,কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের প্রসঙ্গ। আশা করা যায় যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত সুচিন্তন ও যৌথদায়বদ্ধতার মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের এই ভয়াবহময় সংকট কালকে অতিক্রম করতে পারব।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রসাদ, আর, বিন্দু শজন পেরাপ্পাদন, জ্যোতি শেলার, জ্যাকব কোশী (২০২০) । *অতিমারীর সহজপাঠ*। সম্পা. পি. জে. জর্জ । বেঙ্গালুরু: দ্য হিন্দু ।

২. দাশ, যতীন্দ্র কুমার (২০২০) । *রোগী-চিকিৎসকের অধিকার ও কর্তব্য এবং কোভিড-১৯*। *বিজ্ঞান কথা*। সম্পা. নকুল পারাশর । নয়ডা: বিজ্ঞান প্রসার ।

৩. গনি, মহ: আব্দুল (২০২০) । *কোরোনা ভাইরাস সংক্রমণ: স্বাস্থ্য বিপর্যয় ও তার মোকাবিলার উপায়*। *বিজ্ঞান কথা*। সম্পা. নকুল পারাশর । নয়ডা: বিজ্ঞান প্রসার।

৪. মুখার্জী,মৃণাল (২০২০)। *অতিমারি থেকে অন্য-স্বাভাবিকতা – শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ও যত্নের প্রসঙ্গ*।*বিজ্ঞান কথা*। সম্পা. নকুল পারাশর । নয়ডা: বিজ্ঞান প্রসার ।

৫. চক্রবর্তী, রাজাগোপাল ধর (২০২০)। *কোরোনা ভাইরাস নিয়ে আর্থিক দুশ্চিন্তা*। *বিজ্ঞান কথা*। সম্পা. নকুল পারাশর । নয়ডা: বিজ্ঞান প্রসার ।

৬. আমীন, মো: রুহুল (২০২০)। *করোনার ভয়াল গ্রাসে অচল বিশ্ব*। সম্পা. ইফতেখার আহমেদ টিপু । ঢাকা: দৈনিক নবরাজ সংবাদপত্র ।

৭. Dalal P K, Roy D, Choudhary P, Kar SK, Tripathi A. *Emerging mental health issues during the COVID-19 pandemic: An Indian perspective. Indian Journal of Psychiatry.* 2020 [cited 2021 Jan 8]; 62, Suppl S3:354-64.

৮. Available from: https://www.indianjpsychiatry.org/text.asp?2020/62/9/35

৯. Kecojevic A, Basch CH, Sullivan M, Davi NK (2020). *The impact of the COVID-19 epidemic on mental health of undergraduate students in New Jersey, cross-sectional study.* PLoS ONE 15(9): e0239696. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239696

১০. Roy, Adrija, Arvind kumar Singh, Shree Mishra, Aravinda Chinnadurai, Arun Mitra, OjaswiniBakshi (2020). *Mental health implications of COVID-19 pandemic and its response in India. International Journal of Social Psychiatry.* Pp. 1-14. https://doi.org/10.1177/0020764020950769

১১. WHO. (2020b). WHO. *COVID-19: resources for adolescents and youth.* WHO; World Health Organ. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-adolescents-and-youth/en/.

১২. Betty Pfefferbaum, M. D., J. D. and Carol S. North, M. D., M. P. E. (2020). *Perspective Mental Health and the COVID-19 pandemic. The New England Journal of Medicine.* 383:510-512. Doi:10.1056/NEJ Mp 2008017.

১৩. Muller, Imelda, *Mental Health Awareness Among High School and College Students: Barriers to Knowledge, Accessibility, and Utilization of Resources* (2015). *Family Medicine Clerkship Student Projects.* 100. https://scholarworks.uvm.edu/fmclerk/100

কুমুদিনী মিত্র : আদি বিংশ শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মিকার সাহিত্যচর্চা

পায়েল দেশমুখ
পিএইচ. ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *'কুমুদিনী মিত্রঃ আদি বিংশ শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মিকার সাহিত্যচর্চা' নামক প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলায় এক অচর্চিত নারী সাহিত্যিক কুমুদিনী মিত্রের সাহিত্যচর্চার আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর লেখা বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনার করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন জনমানসে কুমুদিনী মিত্রের রচিত সাহিত্যের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। বিখ্যাত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়েছিল কুমুদিনী মিত্রের। ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তাঁর রচনাগুলির মধ্যে মুক্তচিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি মূলত 'অনুপ্রেরণামূলক' সাহিত্য রচনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কুমুদিনী মিত্রের জীবনের প্রায় এক বিস্মৃত অধ্যায়ের কথা উঠে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।*

সূচকশব্দ: *কুমুদিনী মিত্র, সাহিত্যচর্চা, শিখের বলিদান, মেরী কার্পেন্টার, সুপ্রভাত।*

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছিল। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন- এই সময় পর্বেই বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে, মধ্যবিত্ত শ্রেনীর গঠনের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ ছিল সুস্পষ্ট।আমরা সকলেই জানি, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুসরন করে আধুনিক সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।কিন্তু উজ্জ্বল এই চালচিত্রে নারী লেখকদের স্থান ছিল কি?বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, একাধিক মহিলা লেখক ঊনিশ শতকেই সাহিত্যচর্চা করছিলেন, যাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে সরিয়ে রাখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। উল্লেখ্য বাংলায় বালিকাদের জন্য যথাবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু, এর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাঙালি মহিলারা লিখেছেন কবিতা, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকথা, আত্মজীবনী। সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা। বলা বাহুল্য, এই মহিলারা পরিবারে, বিশেষ করে স্বামীর উৎসাহ এবং সহায়তা পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা না থাকলে সেই যুগের গৃহবাসিনীদের পক্ষে সাহিত্যের চর্চায় একনিষ্ঠ থাকা

সহজ ছিল না।[১] এই প্রবন্ধে আমি বিংশ শতাব্দীর এক 'স্বল্পখ্যাত' নারী সাহিত্যিক- কুমুদিনী মিত্র-কে নিয়ে আলোচনা করব। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কুমুদিনী মিত্র এক পরিচিত নাম। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়া থেকে কলকাতা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলার[২] কিংবা মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সংগঠন নির্মাণ থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মেয়েদের দাবি তুলে ধরা-সর্বক্ষেত্রেই কুমুদিনী ছিলেন অগ্রগন্যা। কুমুদিনী মিত্রের রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন নিয়ে আলোচনা হলেও তাঁর সাহিত্যিক জীবন 'অচর্চিত' রয়ে গেছে। আমার এই নিবন্ধে সংক্ষেপে কুমুদিনী মিত্রের 'অচর্চিত' সাহিত্যিক জীবনের বিবরণটুকু উপস্থাপিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রয়াস থাকবে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা শ্রাবণ ৮১নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে কুমুদিনী মিত্রের জন্ম।[৩] পিতা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ সমাজসেবী কৃষ্ণকুমার মিত্র। মাতা লীলাবতী মিত্র ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত নেতা রাজনারায়াণ বসুর কন্যা। ইনি সম্পর্কে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পিসি ছিলেন। ১৮৭২খ্রিষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর অমতে নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে কৃষ্ণকুমার ও লীলাবতীর বিবাহ হয়।[৪] তাঁদেরই জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন কুমুদিনী। ছোটো থেকেই কুমুদিনী বড় হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্ম পরিমন্ডলে। ৮১নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িটিতে কৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিবারের সঙ্গেই বাস করতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক ও তত্ত্বজ্ঞানী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁদের পরিবার। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বাড়িতে উপাসনা হত।[৫] কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখছেন, "কুমুদিনী যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণী কুমুদিনীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই সন্তান ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল রত্ন হইবে। বহু নরনারী কুমুদিনীর রূপ দেখিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের বাড়িতে প্রতিদিনই খুব উৎসাহ ও ভক্তির সহিত উপাসনা হইত। কুমুদিনীর মাতা তাহাকে লইয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন"।[৬] কুমুদিনীর শিক্ষার সূচনা হয়েছিল তাঁর মা লীলাবতী দেবীর কাছে। উল্লেখ্য পুরুষদের সঙ্গে সমঅধিকার লাভের জন্য লীলাবতী গুরুত্ব দিয়েছিলেন মহিলাদের শিক্ষিত হওয়াকে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে লীলাবতী দেবী মন্তব্য করেছিলেন "শিক্ষার প্রকৃত ফল আমাদের বঙ্গীয়া ভগিনীদের হৃদয়ে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে...নারীজীবন যে আর অবহেলা অবজ্ঞার জীবন নয় তাহা দেশীয়

লোকেরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে"।[৭]যাহাইহোক মার কাছে 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়ে কুমুদিনী ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'ব্রহ্মময়ী বৃত্তি' পান। এরপর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব প্রদত্ত সুবর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমুদিনী বি.এ. কুমুদিনী মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী মেডেল লাভ করেন।[৮]

ঊনবিংশ ও আদি বিংশ শতাব্দীতে বাংলা উপন্যাসে দুটি ধারা প্রধান ছিল- ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাস। বহু আলোচিত এসব প্রসঙ্গ। কুমুদিনী মিত্র মূলত ইতিহাসকেন্দ্রিক বিষয়ই লিখতেন। তবে তাঁর লেখাগুলি কখনই উপন্যাসের চেনা ছকের মধ্যে বিচরণ করত না। তিনি মূলত ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী, জাতি(শিখ)-র ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখনী ছিল 'অনুপ্রেরণা' মূলক সাহিত্যের আধার। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'বাঙালির মনোরাজ্যে যে ভাবের প্লাবন আসে তাহার মূলেও মহিলাকবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা কম ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, হিরন্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণের সংগীত, কবিতা, প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি ক্রমশ প্রকাশিত হইয়া নরনারী নির্বিশেষে বাঙালি মাত্রকেই জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করে'।[৯]

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক, বাংলা তখন হিন্দুত্বের জাগরনে উত্তাল। বাঙালি মধ্যবিত্ত নিজেদের অতীত অন্বেষণের মধ্য দিয়ে, নিজেদের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। এই হিন্দু জাগরণের দোসর হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্য। অতীতের বীরগাঁথা গুলি জনসাধারনের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চলতে থাকে। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পরিনত হয়েছিল তাঁরাও জীবন ও দাম্পত্যে স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল।[১০] জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করা হয়েছিল বাংলার মাটিতে তা মহীরুহে পরিনত হবার আগেই ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গ' করতে। এই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষনে, মাত্র ২১ বছর বয়েসে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমুদিনী লিখলেন 'শিখের বলিদান'। উল্লেখ্য শিখের ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে এক পত্রিকায় ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের সর্বপ্রথম 'শিখের ইতিহাস' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিখ জাতির ইতিহাস নিয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'ভারতী' পত্রিকা। এরপর ধারাবাহিক ভাবে বাংলায় শিখদের উপর লিখতে থাকেন দীনেন্দ্র কুমার রায় ('শিখ ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি', 'শিখ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা'), ব্রজসুন্দর সান্যাল। শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়('পাঞ্জাব ভ্রমন'), জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত (সুখমনী),দেবেন্দ্রনাথ মিত্র('শিখ পরিচয়'), বরদাকান্ত মিত্র('শিখ যুদ্ধের ইতিহাস'), বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('গুরু গোবিন্দ সিংহ') প্রভৃতি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শিখ জাতি নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর 'বীর গুরু' প্রবন্ধে গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী বর্ণিত আছে। 'বালক' পত্রিকার জন্য তিনি 'শিখ স্বাধীনতা' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কথা' কাব্যগ্রন্থে ও পরবর্তীকালে সংকলিত 'কথা ও কাহিনি'(১৩১০ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থে'বন্দী বীর' নামক কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিখদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন। কুমুদিনী মিত্রের 'শিখের বলিদান' বাংলা সাহিত্যে শিখের ইতিহাস রচনায় ছিল নতুন সংযোজন। তৎকালীন বাংলায় শিখ জাতির ইতিহাস নিয়ে লেখা বইগুলির মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়। বইটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রায় ছয়টি সংস্করণ ছাপা হয়ে গিয়েছিল। 'শিখের বলিদান' বইটি বাংলার বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। তাই বারবার এটি ব্রিটিশ শাসকের রোষানলেও পড়েছিল। প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে এটি প্রকাশিত হত। যাহাইহোক 'সঞ্জীবনী'র ম্যানেজার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই বই ছাপার সময় প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন।[১১] বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ির নিচের তলায় অবস্থিত 'সাম্য প্রেস' থেকে। বইটি কুমুদিনী তাঁর ভাই সুকুমারকে উৎসর্গ করে কুমুদিনী উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন "শিখেরা প্রাণ দিতেন, তবু ঈশ্বরকে ত্যাগ করতেন না। তোমার সুকোমল প্রাণ তাঁহাদেরই মত, ঈশ্বরকে ভালোবাসুক"।[১২] কৃষ্ণকুমার মিত্র এই বইটি সম্পর্কে লিখেছেন 'এই পুস্তক বাঙ্গলাদেশের যুবকদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন'।[১৩]

'শিখের বলিদান' গ্রন্থটি সর্বমোট সাতটি অধ্যয়ে বিভক্ত ছিল। 'শিখ জাতি' নামে প্রথম অধ্যায়ে শিখজাতির উদ্ভব, শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা, শিখদের মধ্যে কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে তাঁদের মধ্যে 'পরম ব্রহ্মের' প্রচার করা, শিখ জাতির শৌর্য, বীর্য এবং নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ, তাঁদের 'গুরু' পরম্পরা এবং সর্বোপরি মোঘলশক্তির পতনের পর পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের উত্থান ও তাঁর নেতৃত্বে শক্তিশালী ফৌজ নির্মাণ

আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুমুদিনী রণজিৎ সিংহের ফৌজের বিশ্বস্ততা এবং ধর্মের প্রতি একাগ্রতাকে অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় 'তেগ বাহাদুর'-এ ঔরঙজেবের সময় হিন্দুদের দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করে শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখদের সংগঠিত হওয়া এবং ধর্মের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করার মহান কাহিনী বিধৃত আছে। পরবর্তী অধ্যায় 'ফতেসিংহ ও জরওয়ার সিংহ'-এ স্থানীয় এক ব্রাহ্মনের মণিমুক্তোর উপর লোভের কারণে গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশুপৌত্র ফতেসিংহ ও জরওয়ার সিংহকে ওয়াজির খাঁ কাছে অর্পণ করেন। ওয়াজির খাঁ তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলে অল্পবয়েসি দুই বালক তাঁর বিরোধিতা করে। এতে ওয়াজির খাঁ ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেন। 'মণিসিংহ' নামক অধ্যায়ে গুরু গোবিন্দ সিংহের অন্যতম অনুচর মণিসিংহের কথা এবং লাহোরের শাসনকর্তার ষড়যন্ত্রে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।পরবর্তী তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে 'হকিকত', 'তরুসিংহ' এবং 'সুবেগাসিংহ' নামক তিন শিখ যুবকের উপর। যারা ধর্ম রক্ষার জন্য শত অত্যাচার, প্রলোভন সহ্য করেও বিপথগামী হয়নি এবং বীরের মতো শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিল।[১৪] কুমুদিনী মিত্র রচিত 'শিখের বলিদান' বইটিতে শিখ জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু আসলে এটি বাঙালিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার একটি প্রয়াস ছিল। মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন মূলক আইনের কারনে তৎকালীন বঙ্গে কেউই সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে কিছু বলা ও লেখার সুযোগ পেতেন না। একজন সাধারণ মহিলা হিসাবে কুমুদিনীও সেই চেষ্টা করেননি। কিন্তু মাত্র একুশ বছর বয়েসে কুমুদিনী তাঁর গ্রন্থের মধ্য দিয়ে পরোক্ষে জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। এখানে অত্যাচারী মোঘল শাসক যেন ব্রিটিশ সরকারেরই এক রূপ। মোঘলরা যেমন বারবার শিখদের নিপীড়ন করেছে, তাদের মধ্যে বিদ্রোহের সামান্য আভাস পেলে প্রলোভন দেখাতো, তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইত, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারো তো ঠিক একই পন্থা অবলম্বন করেছিল। তাই, কুমুদিনী শিখদের উদাহরণ তুলে বাঙালিকে তাদের মতো সংঘবদ্ধ ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে বলেছেন। কুমুদিনীর এই প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল। বাংলায় এই বই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বই সম্পর্কে বলেছিলেন, '...আমার ছেলেদের পড়িবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তোমার "শিখের বলিদান" একখানি আনইয়াছিলাম। বইখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিতে বিলম্ব হয় নাই। দুঃখের বিষয়, ঘরের ছেলেদের

হাতে দিবার মত এমনতর বই আর বাঙ্গালায় নাই'।[১৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট 'বেঙ্গলি'-তে কুমুদিনী রচিত 'শিখের বলিদান' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন তিনি এই বই পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন। বইয়ের সহজ সরল ভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে এবং বাংলার প্রতিটি বালকের হাতে এই বই থাকা আবশ্যক।[১৬]

'শিখের বলিদান' গ্রন্থের সাফল্যের পর কুমুদিনী মিত্র রচনা করলেন 'মেরী কার্পেন্টার' নামে একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিও সাম্য প্রেস থেকে সেখ আবদুল লতিফের দ্বারা মুদ্রিত হয়েছিল।[১৭] গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ। নিজের মা-কে উৎসর্গ করে কুমুদিনী লিখেছিলেন 'নারী-জীবনের লক্ষ্য যাহা, বাল্যকাল হইতে তাহা তোমার নিকট শুনিতেছি। চিরদিন যে আদর্শের কথা বলিতেছিলে, মেরী কার্পেন্টারের জীবনীতে তাহা পাইলাম'।[১৮] কৃষ্ণকুমার মিত্র এই বই সম্পর্কে বলেছেন 'নারীজাতির প্রাণে নরহিতৈষণা, জনহিতৈষণা প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য অতঃপর কুমুদিনী "মেরী কার্পেন্টারের জীবনবৃত্তান্ত" প্রকাশ করে'।[১৯] শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লেখেন তিনি অনেককেই মেরী কার্পেন্টারের জীবনী বাংলায় লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন কিন্তু একমাত্র কুমুদিনী তাঁর অনুরোধ রেখেছেন। তিনি আশা করেন, 'ইহা পাঠ করিলে এদেশীয় নারীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন'।[২০] 'মেরী কার্পেন্টার' গ্রন্থে কুমুদিনী শ্রীমতী কার্পেন্টারের জীবনকে বেশ কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সূচনাপর্বেই তিনি লিখছেন, 'যে জনহিতৈষিণী, মনস্বিনী মহিলা এই পৃথিবীতে আসিয়া ইহাকে ধন্য ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন, যে রমনী কুলশিরোমণি, পরার্থে আত্মবলিদান এবং জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দশের ও দেশের কল্যাণ-কামনায় জীবনোৎসর্গ করিয়া ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত-দৃষ্টান্তস্বরূপা ও লোকশিক্ষার আদর্শরূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, যিনি দীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্না চিরাবরুদ্ধা ভারত ললনাদিগের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শ্রবনে দরবিগলিতাশ্রু হইয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন-সেই প্রাতঃস্মরনীয়া পুন্যশ্লোকা বরণীয়া রমণীর চরিতালোচনা পরম শিক্ষারস্থল'।[২১] কুমুদিনী এই ছোট্ট সূচনার মধ্য দিয়ে প্রায় এক লহমায় পুরো বইটির বিষয়বস্তু আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর ভাষা চয়ন, সরল লিখন পদ্ধতি এককথায় অনবদ্য। নিঃসন্দেহে তিনি এসলিন কার্পেন্টারের লেখা মেরী কার্পেন্টারের জীবন-চরিত পড়েছিলেন এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু বাংলা ভাষায় কুমুদিনীর অবদান নিঃসন্দেহে অভিনব

ছিল। মেরী কার্পেন্টারের জন্ম ও শৈশব বর্ণনা করতে গিয়ে কুমুদিনী লিখেছেন মেরী কার্পেন্টার শৈশব থেকেই 'আমি কাজের লোক হইতে চাই' ("I want to be useful, I want to be useful") এমন দাবি করতেন এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁর হৃদয়ে 'পরোপকার' প্রবৃত্তির জন্ম হয়েছিল বলে কুমুদিনী মনে করেন।[২২] তারপর শ্রীমতী কার্পেন্টার তাঁর প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে শিক্ষায়ত্রীর চাকরী গ্রহণ করেন। কুমুদিনী আমাদের জানান রাজা রামমোহন রায় ও ডাক্তার টকারম্যানের সান্নিধ্যে মেরী কার্পেন্টারের জীবনদর্শন বদলে যায়। এই সময় শ্রীমতী কার্পেন্টারের পিতৃবিয়োগ ঘটে। কুমুদিনী লিখেছেন মেরী কার্পেন্টার এই সময় নিজের মনকে শক্ত করেছিলেন। মেরী কার্পেন্টারের জবানীতে কুমুদিনী লিখছেন "এ পৃথিবীতে যাঁহাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসিতাম, তাঁহাকে হারাইয়া যদিও বাহিরে শোক প্রকাশ করিতেছি; কিন্তু ভিতরে শান্তি বিরাজমান"।[২৩] এরপর মেরী কার্পেন্টার দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও অপরাধীদের জন্য সংশোধন বিদ্যালয় স্থাপন করার কাহিনী কুমুদিনী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মেরী কার্পেন্টারের চারবার ভারতে আসা এবং ভারতের নারীজাতির উন্নতির ও তাদের শিক্ষার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা কুমুদিনী তাঁর মেরী 'কার্পেন্টার' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মেরী কার্পেন্টারের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু ডাক্তার মার্টিনো সমাধির প্রস্তর ফলকে যে বিবরণটি খোদাই করেছিলেন, কুমুদিনী তাঁর বইয়ের একদম শেষে তাঁর একটি সুন্দর বাংলা তর্জমা করেছেন। 'মেরী কার্পেন্টার' গ্রন্থের একদম শেষে কুমুদিনী সমাজের কাছে প্রশ্ন করেছেন 'ভারতবাসী এখনও নারীজতিকে অতি হীন অবস্থা এবং হীন আদর্শের মধ্যে রাখিয়াছেন। নারীগণ যাহাতে সুশিক্ষিতা হইয়া জগতের কার্যকরিতে পারেন, তাঁহারা নারীদিগকে কি সেই সুযোগ প্রদান করিবেন না?'[২৪] এ যেন সত্যিই তৎকালীন বাংলার হাজার হাজার রমনীর মনের কথা। যারা শুধুমাত্র সমাজের বিধিনিষেধের কারনে অন্তঃপুরে বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। কুমুদিনী তাঁর এই গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন, 'এই মহীয়সী মহিলার জীবনী কি আমাদের শিক্ষা দিতেছে না যে, নারীজীবন অবজ্ঞার বস্তু নহে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে, নারীজীবন কত দূর উন্নত এবং মহৎ হইতে পারে? নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কিছু করিতে পারা যায় কি না, তাহা পুণ্যবতী মেরী কার্পেন্টারের জীবন হইতে কি দেখিতে পাইতেছি না? তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যসমূহ কি সকল পুরুষ এবং রমণীরই অনুকরনীয় নহে?'[২৫] ভারতীয় রক্ষনশীল সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই মনে করে, নারী অপেক্ষা পুরুষ মহান, কন্যা সন্তান তাদের কাঙ্ক্ষিতও নয়।

কুমুদিনী যেন তাঁর বইয়ের মাধ্যমে সেই সমাজের উপর আঘাত হানলেন। উল্লেখ্য কুমুদিনী নিজেও মেরী কার্পেন্টারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনকে নানা কাজে বিস্তারিত করেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন 'সুপ্রভাত'-এর সম্পাদিকা, তেমনই মেয়েদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠন করা, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হয়ে মেয়েদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতেও অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কুমুদিনী মিত্র রচিত 'মেরী কার্পেন্টার' গ্রন্থটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন 'বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সমাজে ইহার খুব আদর হইয়াছিল'।[২৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'মেরী কার্পেন্টার বীরঙ্গনা। ইহারা কোন বিশেষ দেশের নহেন- ইহারা বিশ্বের অধিবাসিনী;-এই জন্য ইহারা সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই পূজনীয় এবং পুরুষেরও ভক্তির পাত্রী। তথাপি ইহাদের কর্মক্ষেত্র অনেকটা পরিমাণে আমাদের অপরিচিত হওয়াতে দেশের সাধারণ রমণীদের নিকট ইহাদের দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম হয় না। শিক্ষিতা যাহারা আছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের শিক্ষা যদি যথার্থ হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তবে উপকার পাইবেন'।[২৭] ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'দি ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' (The Indian Messenger) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই লিখেছিল, 'খুব ছোট পরিসরে কুমুদিনী মিত্র মেরী কার্পেন্টারের জীবনী তুলে ধরেছেন। মেরী কার্পেন্টার স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আদর্শ...আমরা আশাকরি এই গ্রন্থ সকলের দ্বারা প্রশংসিত হবে'।[২৮] 'দি ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার' (The Indian Social Reformer) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই কুমুদিনীকে 'উদীয়মান লেখিকা' (rising author) বলে বর্ণনা করে এবং তাঁরা কুমুদিনীর লেখা গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'মেরী কার্পেন্টার বইটি পড়ে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় লেখিকার মতই অনুপ্রাণিত হবেন বলেই তারাআশা রাখেন'।[২৯] স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির সরল ও বিশুদ্ধ ভাষার প্রশংসা করেন।[৩০] ১৩১৩ বঙ্গাব্দের 'বামাবোধিনী পত্রিকা' মন্তব্য করেছিল 'পুস্তকখানি স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিশেষ পাঠ্য'।[৩১] ১৩১৩ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' গ্রন্থটির সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, 'প্রাতঃস্মরনীয় মেরী কার্পেন্টারের এই সুলিখিত জীবন-চরিতখানি পড়িলে বঙ্গনারীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের নারীগণের (শিক্ষিতা মহিলাগণেরও) কার্য্যক্ষেত্র, ইংরাজ মহিলাদের কার্জক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু মহৎ জীবনের নকল করিয়া কেহ বড় হয়না। সেই জীবন হইতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াই উন্নত জীবন লাভ করা যায়। অতএব সর্ব্বদেশের পূতশীলা নারীগণের জীবন-চরিত

আমাদের পাঠ্য। এইজন্য এই পুস্তকখানি আমাদের বালিকা, যুবতী ও প্রবীণাদের হাতে দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ বেশ সুন্দর'।[৩২]

সাহিত্যিক কুমুদিনী মিত্র 'শিখের বলিদান' ও 'মেরী কার্পেন্টারের' জীবনী লেখার পর যে বৃহৎ কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন তা ছিল পত্রিকার সম্পাদনা। তাঁর নিজের সম্পাদনায় বাংলায় প্রকাশিত হয় 'সুপ্রভাত' নামক পত্রিকাটির। যদিও 'সুপ্রভাত'ই কুমুদিনীর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা নয়। এর আগে কয়েক মাসের জন্য তিনি 'অন্তঃপুর' পত্রিকা ও 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজও সামলেছিলেন।[৩৩] যাই হোক, তাঁর নিজের সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা ছিল 'সুপ্রভাত'। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৯০৭/১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে। কিন্তু স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটি মাত্র সাত বছর চলেছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে নানা কারনে কুমুদিনী কতৃক সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' বন্ধ হয়ে যায়।[৩৪] 'সুপ্রভাত'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচারিত হত। বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় আমরা দেখি 'বেঙ্গল সোপ'-এর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটিও ছিল বেশ আকর্ষণীয়,-

"আজ
ধনীর সুপ্রভাত! গৃহীর সুপ্রভাত!
সৌখীনের সুপ্রভাত! মহিলার সুপ্রভাত!
কারণ,
যুক্তবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারখানাজাত
বেঙ্গল সোপ
অভিনব শিল্প জগতে অভাবনীয় জুগান্তর
ঘটাইয়াছে"।[৩৫]

বেঙ্গল সোপ ছিল একটি দেশীয় কারখানায় নির্মিত বস্তু। তেমনই ছিল এইচ বসুর রেকর্ড।[৩৬]'সুপ্রভাত' এই স্বদেশী বস্তুগুলির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে একদিকে যেমন স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছিল ঠিক তেমনই পরোক্ষে জাতীয়তাবাদের প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছিল।প্রথম বর্ষের শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "আগে চল, আগে চল ভাই!" গানের প্রথম চারটি লাইনকে উদ্ধৃত করে।[৩৭] ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতেও আমরা দেখি কুমুদিনী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা শুরু করছেন।[৩৮] 'সুপ্রভাত'-

এর বিষয়বস্তু ছিল অভিনব। একদিকে যেমন 'নিহিলিস্ট রমণী ভেরার কাহিনী',[৩৯] 'জাপানের রাজা ও প্রজা',[৪০] 'সিপাহী বিদ্রোহের অজ্ঞাত ইতিহাস',[৪১] 'ম্যাটসিনি ও নারীজাতি',[৪২] 'ফরাসী-বিপ্লবের একটি আলেখ্য',[৪৩] 'ভারত-মঙ্গল',[৪৪]'জার্ম্মাণ রাজ্য গঠনের ইতিহাস'[৪৫] প্রভৃতি ছাপা হত, তেমনই 'সেখ সাদি',[৪৬] 'উমেশ চন্দ্র'[৪৭]-র জীবনীও প্রকাশিত হত পত্রিকার পাতায়। আবার অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধ যেমন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা প্রবন্ধ 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'[৪৮] প্রথম ছাপা হয়েছিল 'সুপ্রভাত'-এর পাতায়। এরই সঙ্গে প্রকাশিত হত বিভিন্ন কবিতা ও ছবি। ছবির বিষয়ভাবনাও বেশ নুতন ছিল। একদিকে যেমন ক্ষুদিরাম বসুর ছবি[৪৯], দুর্গাচরণ সান্যালের ছবি[৫০] প্রকাশিত হয়েছিল তেমনই প্রকাশিত হয়েছিল আসামের স্বগৃহে তাঁত চালানোয় নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ছবি।[৫১] যাহাইহোক বাঙালি জীবনে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু মাত্র সাত বছর চলার পর কোন অজ্ঞাত কারনে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'সুপ্রভাত' বন্ধ হবার পর কুমুদিনী মিত্র রচনা করেছিলেন 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী'। কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথায় এই গ্রন্থও 'শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল'।[৫২]বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, 'প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে...২১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ গ্রন্থ, কাগজের মলাট, বিলাতী বাঁধাই, সুন্দর সোনার জলে নাম লেখা। পুস্তকের প্রারম্ভে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের চারিবর্ণে মুদ্রিত সুন্দর একখানি ছবি আছে এবং ভিতরে ২০ খানি হাফটোন ছবি আছে'।[৫৩] বিজ্ঞাপনে আরো বলা হচ্ছে 'বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের ডাইরেক্টর কত্তৃক এই পুস্তকখানি সমূদয় স্কুল কলেজের প্রাইজ পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে'।[৫৪] উল্লেখ্য কুমুদিনী রচিত 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' গ্রন্থটি 'তুজুক ই জাহাঙ্গীরী' থেকে অনুপ্রাণিত। গ্রন্থটিতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেক,জন্মকথা,দ্বাদশ আদেশ,প্রজানুরাগ,হিন্দুজাতির প্রতি আকবরের অনুরাগ, জাহাঙ্গীরের ধর্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।[৫৫] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমুদিনী মিত্র 'সমাধি' নামে একটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন।[৫৬] বইটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল 'গল্পগুলি অশ্রু ও বিষাদ মাখান। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। নায়ক নায়িকার দুঃখে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া ওঠে'।[৫৭] কিন্তু কুমুদিনী রচিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানা যায় না।

কুমুদিনী মিত্রের সাহিত্যকীর্তি বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিই ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। তিনি মূলত এই

চরিত্রগুলির জীবনী রচনা করেছেন। সেই সময়ের হিন্দুত্ববাদী মূল্যবোধকেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যেমন মুসলিম শাসন মানেই বিদেশী এবং তারা অত্যাচার করে। যদিও পরবর্তীকালে তিনি যখন 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' লিখছেন এই আদর্শ থেকে তিনি অনেকটা দূরে সরে এসেছেন। আসলে কুমুদিনীর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাঙালিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। সমকালীন কোন লেখিকার মতো আমরা তাঁর লেখায় 'পাতিব্রত্য'র কথা পাই না। গৃহই নারীর একমাত্র কর্মস্থান কিংবা স্বামীই তাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা উচ্চারিত হয়নি তাঁর লেখায়। বরং উল্টোটাই দেখা গেছে। মেরী কার্পেন্টারের জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বাঙালি নারীকে কার্পেন্টারের জীবনের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে চেয়েছেন এবং নারীকে ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে বের করে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. সুমিতা চক্রবর্তী, 'বাংলা সাহিত্যে নারী ঔপন্যাসিকঃ প্রাক্-স্বাধীনতা কাল', দ্রষ্টব্য সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'এবং মুশায়েরা', "নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা", শারদীয়া ১৪২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯।

২. মানসী রায়চৌধুরী, 'শ্রীমতী কুমুদিনী বসু', দ্রষ্টব্য "পুরশ্রী", কলকাতাঃ জুলাই ২০১০, পৃষ্ঠা ৯।

৩. সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মচরিত', কলকাতাঃ পত্রলেখা, ১৯৩৭, পৃষ্ঠা ১৪৭।

৪. সারদা ঘোষ, 'নারীচেতনা ও সংগঠনঃ ঔপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯-১৯২৫', কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৬৪।

৫. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৬. ঐ।

৭. লীলাবতী মিত্র, 'পুরাতন বেথুন স্কুল', দ্রষ্টব্য "ভারতী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৮. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫৭।

৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী', বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। আরো দেখা যেতে পারে ঘোষ, 'নারীচেতনা ও সংগঠন', পৃষ্ঠা ৬১।

১০. Goutam Neogi, 'Bengali Women in Politics: The Early Phase (1857-1905)', *Indian History Congress,* Vol. 46, p. 484.

১১. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

১২. 'উৎসর্গ', দ্রষ্টব্য কুমুদিনী বসু, 'শিখের বলিদান', কলকাতাঃ সাম্য প্রেস, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৩. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

১৪. বসু, 'শিখের বলিদান'।

১৫. 'গৃহকর্ত্রীর প্রনীত অন্যান্য পুস্তক', দ্রষ্টব্য বসু, 'শিখের বলিদান'।

১৬. ঐ।

১৭. কুমুদিনী মিত্র, 'মেরী কার্পেন্টার', কলকাতাঃ সাম্য প্রেস, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৮. "উৎসর্গ", দ্রষ্টব্য ঐ।

১৯. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

২০. শিবনাথ শাস্ত্রী, "ভূমিকা", দ্রষ্টব্য মিত্র, 'মেরী কার্পেন্টার'।

২১. মিত্র, 'মেরী কার্পেন্টার', পৃষ্ঠা ১।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা ৩।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫।

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৬।

২৫. ঐ।

২৬. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেরী কার্পেন্টার সম্বন্ধে মন্তব্য', দ্রষ্টব্য মিত্র, 'মেরী কার্পেন্টার', পৃষ্ঠা i-ii.

২৮. *The Indian Messenger*, Calcutta:1st July,1905 দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা ii.

২৯. *The Indian Social Reformer*, Bombay: July 15, 1906 দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা iii.

৩০. স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য ঐ।

৩১. 'বামাবোধিনী পত্রিকা', কলকাতা, শ্রাবণ,১৩১৩ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য ঐ, পৃষ্ঠা iv.

৩২. 'প্রবাসী', কলকাতাঃ ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ষষ্ঠ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৯২। আরো দেখা যেতে পারে মিত্র, 'মেরী কার্পেন্টার', পৃষ্ঠা iv.

৩৩. রায়চৌধুরী, 'শ্রীমতী কুমুদিনী বসু', পৃষ্ঠা ৯।

৩৪. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৩৫. কুমুদিনী মিত্র(সম্পা.), 'সুপ্রভাত', দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩৬. মিত্র(সম্পা.), 'সুপ্রভাত', প্রথম বর্ষ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

৩৭. ঐ।

৩৮. মিত্র(সম্পা.), 'সুপ্রভাত', দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩৯. মিত্র(সম্পা.), 'সুপ্রভাত', দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪২-৫৬।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭-৬২।

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৯।

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৯-৭৩।

৪৩. ঐ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৫-১১৫।

৪৪. ঐ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৯১৬ বঙ্গাব্দ।

৪৫. ঐ, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮।

৪৬. ঐ,পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

৪৭. ঐ,পৃষ্ঠা ৬৮-৭৪।

৪৮. ঐ, তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯-২৩।

৪৯. ঐ, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮০।

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬।

৫১. ঐ, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫০।

৫২. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৫৩. 'গৃহকর্ত্রীর প্রনীত অন্যান্য পুস্তক', দ্রষ্টব্য বসু, 'শিখের বলিদান'।

৫৪. ঐ।

৫৫. কুমুদিনী মিত্র, 'জাহাঙ্গীরের আত্মজিবনী',কলকাতা।

৫৬. ভট্টাচার্য (সম্পা.), কৃষ্ণকুমার, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৫৭. "সমাধি" দ্রষ্টব্য কুমুদিনী মিত্র, 'শিখের বলিদান'।

বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা

রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃতবিভাগ,
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলি

সারসংক্ষেপ: *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সংস্কৃত সুপণ্ডিত তথা বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, শিল্পী, দয়ারসাগর তথা বড় হৃদয়ের মানুষ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে তথা সংস্কৃত সাহিত্যে তার বহু রচনার মধ্য দিয়ে স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে চমৎকার সৃষ্টি হল 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। মহামুনি পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে লাভ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে সেই উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করতে মহর্ষি কাত্যায়ন 'বার্তিকগ্রন্থ' রচনা করেছেন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'ব্যাকরণমহাভাষ্য' রচনা করেছেন। আর এই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে যাতে আরো সরল ও সুমধুর করা যায় এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় যাতে বালকেরা খুব সহজে আগ্রহী হতে পারে তার, প্রথম বাংলা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার যে বিবর্তনের ইতিহাস, আমরা যদি সে দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখব যুগে যুগে সময়ের প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ বৈয়াকরণরা রচনা করেছেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বরদরাজাচার্যের লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী তথা মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিতের বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী থেকে বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী যদিও আলাদা, তথাপি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ের বিচারে এই বঙ্গভাষাশ্রিত কৌমুদী গ্রন্থটিও উক্ত দুটি সংস্কৃত কৌমুদীর সমান্তরাল তথা সম গুরুত্বসম্পন্ন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৌমুদীর বিষয়বস্তু, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, উক্ত দু'টি কৌমুদীর সাথে তুলনাত্মক বিশ্লেষণ তথা তৎকালীন সময়ে তা কতটা*

প্রাসঙ্গিক ছিল এবং আজ তা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সূচক-শব্দ: *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্যাকরণ কৌমুদী, সংস্কৃত, পানিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ব্যাকরণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কাত্যায়ন, বার্তিক গ্রন্থ, কাশিকা, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী, ভট্টোজি দীক্ষিত, লঘু সিদ্ধান্তকৌমুদী, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, সংস্কৃত কলেজ, বামন ও জয়াদিত্য।*

পরমপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাত্ করেছিলেন তখন স্পষ্টতই দ্বর্থহীন ভাষায় পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন - এতদিন খাল-বিল, নদী-নালায় জল খেয়েছি । এখন সাগরে এসে মিশেছি । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মাস্টারমশাই লিখছেন" শ্রীরামকৃষ্ণ - আজ সাগরে এসে মিল্লাম। এতদিন খাল,বিল, হৃদ, নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি । "[১] যুগাবতার ভগবান শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত বাণী হতেই প্রমানিত হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন যথার্থ জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত । এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন শুষ্ক পন্ডিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃতার্থে বিনয়ী ও রসিক হৃদয়ের মানুষ। তাই রামকৃষ্ণের এহেন প্রশংসার উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন - সাগরে যখন এসেছেন কিছুটা নোনা জল ও খেয়ে যান । কথামৃতকার মাস্টারমশাই লিখছেন - " বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) - তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান । (হাস্য) "[২] ভগবান রামকৃষ্ণদেব কিন্তু ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররের এই রসিকতায় একেবারেই তার প্রশংসা থেকে বিমুখ হননি , বরং আরো সুন্দর ও মধুর ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বললেন - "তুমি নুনের সাগর কেন হবে গা, তুমি তো অমৃতের সাগর ।"[৩] আমরা ভগবান রামকৃষ্ণদেব এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এহেন কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যিনি একাধারে জ্ঞানী ,পন্ডিত ও বিনয়ী।

বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সংস্কৃত সুপণ্ডিত তথা বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, শিল্পী, দয়ারসাগর তথা বড় হৃদয়ের মানুষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে তথা সংস্কৃত সাহিত্যে তার বহু রচনার মধ্য দিয়ে স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন 1 সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে

চমৎকার সৃষ্টি হল 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' l ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ তথা সমাজসংস্কার l খুব ছোট থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় শাস্ত্র পরম্পরার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেনl বাল্যকাল থেকেই বীরসিংহের এই সিংহশিশু সর্বদাই মানুষের দুঃখে কষ্টে ঝাঁপিয়ে পড়তেন । প্রয়োজনে যেকোনো উপায়ে তাদের সাহায্য করতে পিছুপা হতেন না। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৫০ সালে তিনি অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন । সংস্কৃত শাস্ত্রে তিনি এমনই বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন যে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের দ্বারা 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসাগর এই বছরই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা সেরেস্তাদার পদে যোগদান করেন ।[৪]

বিদ্যাসাগরের রচনাবলীকে আমরা মূলত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি - ১. মৌলিক রচনা এবং ২. অনুবাদ মূলক রচনা। তার মৌলিক রচনা গুলি মূলত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে লেখাl তবে বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা অপেক্ষা অনুবাদমূলক সাহিত্য অধিক আকর্ষণীয় l বিদ্যাসাগর মূলত হিন্দি ।,সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের অবলম্বনে তার অনুবাদমূলক সাহিত্যগুলি রচনা করেছেন। ১৮৪৭ সালে রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে আরম্ভ করে ১৮৯২ সালে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পর্যন্ত বিদ্যাসাগর অজস্র অনুবাদমূলক সাহিত্য রচনা করেন। ১৮৫৪ সালে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদমূলক সাহিত্য 'শকুন্তলা' রচনা করেন। ১৮৬০ সালে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' এবং বাল্মিকীর 'রামায়ণম্' কে অবলম্বন করে অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্য 'সীতার বনবাস' রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম ১৮৫৩ সালে রচিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'।[৫]

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্যক্ জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে 'সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । যদিও এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় লক্ষ্য করলেন যে, যদি সংস্কৃত নাটক, কাব্য ও দর্শনাদি শাস্ত্রের জ্ঞান সম্যক্-ভাবে লাভ করতে হয় এবং এই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অধিকারী হতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি ভালো ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করার আবশ্যকতা আছে । আর সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'

নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ রচনা করেন। তারপর এই বছরই তিনি ব্যাকরণ কৌমুদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং ১৮৬২ সালের চতুর্থ ভাগ রচনা করেন।[৬]

মহামুনি পাণিনি তারা 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে লাভ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে l পরবর্তীকালে সেই উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করতে মহর্ষি কাত্যায়ন 'বার্তিকগ্রন্থ' রচনা করেছেন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'বব্যাকরনমহাভাষ্য' রচনা করেছেন । আর এই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কে যাতে আরো সরল ও সুমধুর করা যায় এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় যাতে বালকেরা খুব সহজে আগ্রহী হতে পারে তার , প্রথম বাংলা ভাষায় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' গ্রন্থটি রচনা করেন।

মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা আছে রক্ষা ও সেই ভাষার যথার্থ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সূত্র রচনা করেছেন । আমরা অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায় চারটি করে পাদ দেখতে পাই। কিন্তু পারিনি এখানে কোন অধ্যায় বা কোন পাদে কি বল কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সূত্র রেখেছেন এরকম নয়। বাড়তি কার্কার্তন কোন সূত্রের অপূর্ণতা লক্ষ্য করে বার্তিক রচনা করেছেন । এখানেও তিনি পাণিনির ক্রমকেই অনুসরণ করেছেন। আর মহাভাষ্য কার পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে সেই সূত্রের এবং বার্তিকগুলির সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রয়োজনে তিনি নূতন সূত্র বা ইষ্টি রচনা করেছেন।[৭]

তবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার যে বিবর্তনের ইতিহাস আমরা যদি সে দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখব যুগে যুগে সময়ের প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ বৈয়াকরণরা রচনা করেছেন। এই বিষয়ে যদি কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ দের নাম উল্লেখ করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাশিকাকার জয়াদিত্য ও বামন, ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি পদমঞ্জুরীকার হরদত্ত, প্রদীপকার কৈয়ট, এবং লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীকার বরদরাজাচার্য, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত প্রমূখরা। এরা প্রত্যেকেই সংজ্ঞা, পরিভাষা, সন্ধি, সমাস, কারক ইত্যাদি প্রকরণ অনুসারে সংস্কৃত ব্যাকরণের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন । তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বরদরাজাচার্যের লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী তথা মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিতের বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী থেকে বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী যদিও

আলাদা, তথাপি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ের বিচারে এই বঙ্গভাষাশ্রিত কৌমুদী গ্রন্থটিও উক্ত দু'টি সংস্কৃত কৌমুদীর সমান্তরাল তথা সম গুরুত্বসম্পন্ন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৌমুদীর বিষয়বস্তু, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, উক্ত দু'টি কৌমুদীর সাথে তুলনাত্মক বিশ্লেষণ তথা তৎকালীন সময়ে তা কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল এবং আজ তা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশেষভাবে বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব

- **ব্যাকরণ কৌমুদীর বিশেষত্ব এবং ভট্টোজিদীক্ষিতের বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী ও বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা :-**

১. মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত তার সিদ্ধান্তকৌমুদীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন পুর্বার্ধ এবং উত্তরার্থ। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তার ব্যাকরণ-কৌমুদীকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন - ক) প্রথম ভাগ খ) দ্বিতীয় ভাগ গ) তৃতীয় ভাগ ও ঘ) চতুর্থ ভাগ।

২. ভট্টোজি দীক্ষিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রণীত সূত্রগুলিকে সংজ্ঞা ,পরিভাষা, সন্ধি, কারক, সমাস ,কৃৎ প্রত্যয় ,তদ্ধিত প্রত্যয়, বৈদিক প্রকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকরণে ভাগ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তার কৌমুদী গ্রন্থে পাণিনির সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে প্রথমে বর্ণের বিভাগ, বর্ণের উচ্চারণের স্থান, স্বরসন্ধি ,ব্যঞ্জনসন্ধি, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে সরল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবেশের পথকে সুপ্রশস্ত করেছেন।

৩. ভট্টোজিদীক্ষিত তার সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বর্ণের জ্ঞানের জন্য কেবল "অ-ই-উ-ণ্"[৮] থেকে "হ-ল্"[৯] পর্যন্ত ১৪টি মাহেশ্বর সূত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তার ব্যাকরণ কৌমুদীতে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ এইভাবে বর্ণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

৪. সিদ্ধান্তকৌমুদীতে সংজ্ঞা প্রকরণে বিভিন্ন সূত্রের মধ্য দিয়ে তালব্যবর্ণ, মূর্ধন্যবর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ, অঘোষ বর্ণ ও অঘোষ বর্ণ, তথা বর্ণগুলির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রযত্ন ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের কৌমুদীতে খুবই স্পষ্ট ভাবে বর্ণ ধরে ধরে কোন বর্ণের কোথায় উচ্চারণ স্থান ,কোন বর্ণের কি ধরনের প্রযত্ন ,কোনগুলি সঘোষ বা কোনগুলি অঘোষ তা দেখানো হয়েছে।

৫. দীক্ষিতের কৌমুদীতে সন্ধিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- অচ্ সন্ধি ,হল্ সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কৌমুদীতে সন্ধি গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা

হয়েছে স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জন সন্ধি। তবে এ বিষয়ে বলে রাখা ভালো যে এখন আমরা যে ব্যাকরণ কৌমুদী পাই সেখানে কিন্তু স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি এই তিন প্রকার বিভাগই লক্ষ্য করি । বস্তুতপক্ষে সম্পাদক পাঠকদের সুবিধার জন্য তৃতীয় বিভাগটি অর্থাৎ বিসর্গ সন্ধি এই ভেদটি নিজের থেকে সংযোজন করেছেন ।[১০]

৬. দীক্ষিত তার কৌমুদীতে পাণিনির প্রণীত সূত্রগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে বৃত্তি রচনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি বিষয়ে পাণিনি সূত্র করেছেন "অক: সবর্ণে দীর্ঘ:" ।[১১]

অর্থাৎ অক্ এই প্রত্যাহারস্থিত অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই বর্ণ গুলির পর যদি স্বরবর্ণ থাকে তবে উভয় মিলে দীর্ঘ স্বর হবে। যেমন রবি +ইন্দ্র = রবীন্দ্র । কিন্তু বিদ্যাসাগর তার কৌমুদীগ্রন্থে এইভাবে সবর্ণ দীর্ঘের কথা বলেননি। তিনি খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকলে উভয় মিলে আকার হবে, ইকার কিংবা ঈকারের পর ইকার কিংবা ঈকার থাকলে ঈ-কার হবে, উকার কিংবা ঊকারের পর উকার কিংবা ঊকার থাকলে উভয় মিলে ঊকার হবে ইত্যাদি।

৭. পাণিনি যেমন তার অষ্টাধ্যায়ীতে বৃদ্ধি, গুণ, প্রাতিপদিক ,ধাতু প্রভৃতি ব্যাকরণ এর বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ গুলোকে ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন সংজ্ঞাসূত্র করেছেন, এবং পতঞ্জলি-ভট্টোজিদীক্ষিতাদি বৈয়াকরণেরা পরবর্তীকালে ভাগ্য বৃত্তি রচনার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় সেই সব সূত্র গুলি ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেরকমই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অতীব সরল পদ্ধতিতে তার কৌমুদী গ্রন্থের পরিভাষাপ্রকরণে সেইসব পারিভাষিক শব্দগুলিকে পাঠকদের উপযোগী করে বুঝিয়েছেন। পাণিনি সূত্র করেছেন "সুপ্তিন্তং পদম্"[১২]। অর্থাৎ সুপ্-প্রত্যয় এবং তিঙ্-প্রত্যয় কোন প্রাতিপদিক বা ধাতুর পরে বসে পদ উৎপন্ন হয়। এখান থেকে আমাদের বুদ্ধি পরামর্শের দ্বারা বুঝে নিতে হয় ধাতু এবং প্রাতিপদিক হল সমস্ত পদের প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতি এবং প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয় সংস্কৃত পদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারমধ্যে প্রকৃতি শব্দ বোঝাতে গিয়ে খুব পরিস্কার ভাবে বলছেন কোন বস্তুবাচক বা ক্রিয়া বাচক অথবা বিশেষণবাচক যা-কিছু তাহাই প্রকৃতি। তারপর তিনি খুব স্পষ্ট করে বলছেন- " সরল ভাষায় বলতে গেলে পদের মূলভাগকে প্রকৃতি বলে। শব্দ অর্থাৎ প্রাতিপদিক বা ধাতুর হলো পদের মূলভাগ । তাই প্রাতিপদিক এবং ধাতুই হলো প্রকৃতি।

৮. পাণিনি ধাতু এই ব্যাকরণের পরিভাষাকে বোঝাতে গিয়ে দুটি সূত্র করেছেন ক) "ভূবাদয়: ধাতব:"[১৩] খ) "সনাদ্যন্তা: ধাতব:"[১৪]।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ধাতু সংজ্ঞা বলতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বলছেন যাহার দ্বারা ক্রিয়া বোঝায় তাকে ধাতু বলে, এবং তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন - ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্ ইত্যাদি।

৯. বিদ্যাসাগর মহাশয় তার ব্যাকরণ-কৌমুদী যে ব্যাকরণ এর প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সরল ভঙ্গীতে লিখেছেন তার প্রমাণ প্রাতিপদিক পরিভাষাটির সংজ্ঞা দেখে বোঝা যায়। প্রাতিপদিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলছেন যাহা বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক তাহাই প্রাতিপদিক । উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন - বস্তুবাচক চন্দ্র , সূর্য, তরু, লতা, জল ইত্যাদি। বস্তুর বিশেষণবাচক দৃঢ় ,স্থির, প্রবল, মন্দ, সুন্দর ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুতপক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই প্রাতিপদিক শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও নিগূঢ় অর্থবহ। মহামুনি পাণিনি তাই প্রাতিপদিক সংজ্ঞা দিতে দুটি সূত্রের মাধ্যমে বলেছেন - ক) 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়: প্রাতিপদিকম্'[১৫] অর্থাৎ ধাতুভিন্ন এবং প্রত্যয়ভিন্ন অর্থবান শব্দই প্রাতিপদিক খ) "কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ"[১৬] অর্থাৎ কৃত্-প্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত ও ও সমাসান্ত শব্দও প্রাতিপদিক।

এইভাবে বিদ্যাসাগর তার ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ভাগে ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গ সন্ধি, ণত্ববিধান, ষত্ববিধান, সুবন্ত প্রকরণে স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ,স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, অব্যয় শব্দ, সর্বনাম শব্দ ইত্যাদি খুব স্পষ্টভাবে বিশদে পাঠকদের উপযোগী করে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ জুড়ে তিনি আলোচনা করেছেন তিঙন্ত প্রকরণের বিভিন্ন ধাতুরূপ, আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ বিধান , বাচ্য পরিবর্তন, লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ইত্যাদি লকারার্থ বিধান, ভাদ্বি, চুরাদি ইত্যাদি গণের ধাতুরূপ বিধান ,কৃৎ প্রত্যয় । আর চতুর্থ ভাগে বিভক্তি নির্ণয় ,কারক, স্ত্রী-প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় ও সমাস প্রভৃতি র আলোচনা আমরা দেখতে পাই , যা খুবই সহজ-সরল ও সাবলীল ।

- **ব্যাকরণ কৌমুদীর কিছু ত্রুটিপূর্ণ দিক**

পাণিনি ধাতু এই ব্যাকরণের পরিভাষাকে বোঝাতে গিয়ে দুটি সূত্র করেছেন ক) "ভূবাদয়: ধাতব:" খ) "সনাদ্যন্তা: ধাতব:"।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ধাতু সংজ্ঞা বলতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বলছেন যাহার দ্বারা ক্রিয়া বোঝায় তাকে ধাতু বলে, এবং তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন - ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্ ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর সনন্ত-নিজন্ত প্রভৃতি যে বারোটি ধাতু প্রত্যয় যোগেও পুনরায় ধাতু উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে ধাতু পরিভাষাটি বোঝাতে গিয়ে কিছু বলেননি বা উদাহরণও দেননি। যেমন জ্ঞা-ধাতুর পরে সন্-প্রত্যয় যোগ করলে জিজ্ঞাস ধাতু হয় । পা-ধাতুর পরে সন্-প্রত্যয় করে পিপাস ধাতু হয় ইত্যাদি । তাই মহামুনি পাণিনি 'ধাতু' এই ব্যাকরণের পরিভাষাকে বোঝাতে গিয়ে দুটি পৃথক পৃথক সূত্র করেছেন ক) "ভূবাদয়: ধাতব:" খ) "সনাদ্যন্তা: ধাতব:"।

২) সবর্ণ দীর্ঘ বিষয়ে পাণিনি সূত্র করেছেন 'অক: সবর্ণে দীর্ঘ:' । আর এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ব্যাকরণ কৌমুদীতে প্রথমেই বলেছেন অকারের পর অকার থাকলে উভয় মিলে আকার হয়। আর এর উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই তিনি বলেছেন শশ + অঙ্ক: = শশাঙ্ক: । শশাঙ্ক এই পদটিতেতে বস্তুতপক্ষে সমাস হয়েছে। আর আমরা জানি সমাসের ক্ষেত্রে " সুপো ধাতু-প্রাতিপদিকয়ো:"[১৭] এই পাণিনির সূত্র অনুযায়ী ধাতু এবং প্রাতিপদিকের পূর্বপদ এবং উত্তর পদ উভয়পদেরই বিভক্তির লোপ পায়। যেমন 'রাজন্ ঙস্ + পুরুষ সু' এই অবস্থায় পূর্বপদের ঙস্ এবং উত্তরপদে সু বিভক্তির লোপে রাজপুরুষ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এখানে উভয়পদের বিভক্তি লোপের পরে সমাসের পুনরায় 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' এই সূত্রানুসারে প্রাতিপদিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ায় সু-ঔ-জশ্ প্রভৃতি 21 টি বিভক্তি যুক্ত হয়ে রাজপুরুষ:, রাজপুরুষম্, রাজপুরুষেণ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ নিষ্পন্ন হতে পারে। কিন্তু এখানে যদি পুরুষ এই উত্তরপদে সু বিভক্তিটির লোপ না করা হতো তাহলে কেবল রাজপুরুষ: এই প্রথমান্ত পদটিই নিষ্পন্ন হতে পারত, কিন্তু অন্যান্য পদগুলি নিষ্পন্ন হতে পারত না। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন শশ + অঙ্ক: = শশাঙ্ক: এই উদাহরণটি দিয়েছেন তখন এই কথা নিশ্চয়ই মাথায় রাখেননি। না হলে তিনি অঙ্ক: এই উত্তর পদ্ধতিতে প্রথমা বিভক্তি রাখতেন না। এখন আমরা যে কৌমুদীর সংস্করণ পাই সেখানে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে এ বিষয়ে কোনো সংশোধনমূলক পরিবর্তন দেখতে পাই না।

৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতিপদিককে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - ক) বস্তুবাচক এবং এর উদাহরণ দিয়েছেন তিনি চন্দ্র, সূর্য, তরু, লতা, জল ইত্যাদি খ) বস্তুর বিশেষণবাচক- দৃঢ়, প্রবল, মধুর, মন্দ, সুন্দর ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে তিনি এইক্ষেত্রে প্রাতিপদিক বিষয়ক পাণিনির প্রথম সূত্র 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়: প্রাতিপদিকম্' অনুযায়ী

বস্তুবাচক রূঢ় শব্দগুলিকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি পাণিনির দ্বিতীয় সূত্র 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' অনুযায়ী রাজপুরুষ ,শশাঙ্ক, কুম্ভকার, দাশরথি ইত্যাদি যৌগিক শব্দের কোন উদাহরণ প্রাতিপদিক শব্দটি বোঝাতে গিয়ে দেননি।

পরিশেষে বলা যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান যতই আলোচনা করা হোক, তা যেন কিছুতেই শেষ করা যায় না। বিদ্যাসাগর এমন এক যুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন বাংলা সাহিত্য বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেনি। সেই সময় এর সংস্কৃত নাটক সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়েই পাঠকদের আত্মিক বিনোদন ও মানসিক শান্তি খুঁজে নিতে হতো । কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তার মর্মার্থ অবধারণ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। রীতিমত সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে এইসকল শাস্ত্রে অবগাহন করা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সেসময় ব্যাকরন শাস্ত্র বলতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ,কাতারের বার্তিক ,পতঞ্জলির মহাভাষ্য, লঘু-সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, কাশিকা, মুগ্ধবোধ ,সারস্বত ব্যাকরন, দুর্ঘট-বৃত্তি এগুলোই ছিল ব্যাকরণ শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে লেখা এবং এই গ্রন্থ গুলির জ্ঞান আহরণ করতে অন্তত ১০ থেকে ১২ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। তাছাড়া সেসময় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন বিদ্যালয় বা কলেজ ছিল না । কেবলমাত্র পণ্ডিতদের টোল বা চতুষ্পাঠীই ছিল সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাছাড়া সেসময় ব্রাহ্মন ব্যতীত অন্য জাতির পক্ষে সংস্কৃত শেখা সামাজিকভাবে অনেকটা কঠিন ছিল। এইরকম এক সংকট ময় পরিস্থিতিতে যাতে বঙ্গ সন্তানেরা সরল ও সাবলীল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, যা আজও নবীন সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত উপাদেয় ও যুগোপযোগী । এরপর এরপর বিদ্যাসাগর দেখলেন যে যদি সংস্কৃত নাটক, সংস্কৃত কাব্যে ও মহাকাব্যে এবং দর্শনসাহিত্যে যথাযথভাবে রসাস্বাদন করতে হয় তবে বাংলা ভাষায় অত্যন্ত সরল ও সাবলীলভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করতে হবে । আর এই কথাকে মাথায় রেখেই বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন, যার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা আমরা সমগ্র প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি।বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন মহাপন্ডিত । তাই পরম পূজনীয় মাস্টারমশাই তার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বলেছেন - "বিদ্যাসাগর মহাপন্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে

পড়তেন তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।... ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্য বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।"[১৮] এইসব আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে যে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন তৎকালীন কালে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার জন্য তার অবদান অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তেমনি আজও তাঁর অবদান সংস্কৃত জগতের শিক্ষার্থীদের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও সমুজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম-কথিত(প্রথম খন্ড) বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎকার। পৃষ্ঠা-৪৭
২. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম- কথিত (প্রথম খন্ড), বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎকার। পৃ. -৪৭
৩. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম-কথিত (প্রথম খন্ড),বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎকার। পৃষ্ঠা-৪৭
৪. Vidyasagar: The life and afree-life of an eminent Indian, Brain hatcher.
৫. Google p.d.f source
৬. ব্যাকরণ-কৌমুদী, শ্রী পূর্ণচন্দ্র দে সম্পাদিত, সংশোধিত ও সম্বর্ধিত।
৭. ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, শ্রী গুরুপদ হালদার।
৮. মাহেশ্বর সূত্র, সংখ্যা - ১
৯. মাহেশ্বর সূত্র, সংখ্যা- ১৪
১০. ব্যাকরণ-কৌমুদী, প্রথম ভাগ, শ্রী পূর্ণচন্দ্র দে সম্পাদিত।
১১. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ. -৬/১/১০১
১২. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ.- ১/৪/১৪
১৩. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ. - ১/৩/১
১৪. অষ্টাধ্যায়ী, পা.সূ.- ৩/১/৩২
১৫. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ. -১/২/৪৫
১৬. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ -১/২/৪৬
১৭. অষ্টাধ্যায়ী, পা. সূ. - ২/৪/৭১

১৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম-কথিত (প্রথম খন্ড), বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা- ৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬-৮৭, মুদ্রিত।

২. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (প্রথমো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।

৩. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (তৃতীয়ো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।

৪. মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ, সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস প্রকরণ), সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা - ৭, (পুনর্মুদ্রণ ২০০৯-১০) ।

৫. M.M.JHA, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রানুক্রমণিকা, Google plystore Applicatuon.

৬. দে, পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকরণ-কৌমুদী (প্রথম ভাগ), The sansket press Dipository, calcutta-30.

৭. হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা - ০৬ ।

৮. সামন্ত, অমিও কুমার, বিদ্যাসাগর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০1৪ ।

৯. ইসলাম, নুরুল, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী, ২০1৮।

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সাময়িক পত্রপত্রিকার ইতিবৃত্তান্তঃ প্রসঙ্গ মালদহ জেলা

সমিত সাহা
স্নাতকোত্তর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: *ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় যে সমস্ত সাময়িক পত্রপত্রিকা গুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দৈনন্দিন সমাজ ও রাজনৈতিক সংবাদের পাশাপাশি অজস্র গদ্য, পদ্য বা প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। রচনাকারের বিবরণে সমসাময়িককালের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠত। পত্রপত্রিকার ইতিহাসের আদিপর্বে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে এই ধরনের বহু সাময়িক পত্রপত্রিকার উদ্ভব ঘটে। কিছুকাল সাড়ম্বরে সফলতার সহিত প্রকাশিত হয়ে আকস্মিক ভাবে সাময়িক বা চিরকালের জন্য পত্রিকাগুলির অন্তর্ধান ঘটে। এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় পত্র-পত্রিকাগুলির সাথে সাথেই অজস্র সাহিত্যিক রচনা ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্ভারের অবলুপ্তি ঘটে চিরতরে। তৎকালীন সময়ে বাংলার এই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী সাময়িক পত্রপত্রিকা সম্ভারে জেলা মালদহ জেলার কুসুম, গৌড়বার্তা, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, মালদহ আখ্‌বার প্রভৃতি নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।*

সূচক শব্দ: *ঔপনিবেশিক যুগ, কুসুম, গৌড়বার্তা, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, মালদহ আখ্‌বার, রাধেশচন্দ্র শেঠ, বিনয় কুমার সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র আগারওয়ালা, লালবিহারী মজুমদার, মৌলভী আব্দুল গনি খান চৌধুরী।*

বিষয় বিশ্লেষণ:

উনিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপুর্ব উন্নতি ঘটে। কালক্রমে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের হাতধরে মফঃস্বলেও শিক্ষার আলো পৌঁছায়। বাঙ্গালীর চিন্তার জগতে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের লেখনীতে। প্রাথমিক পর্বে কতিপয় শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতিক চর্চার উদ্দেশ্যেই সাময়িক পত্রের উদ্ভব, ক্রমে এগুলি দৈনন্দিন সংবাদ প্রচারের গণমাধ্যমের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। পত্রপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত পদ্য, গদ্য, নাটক বা প্রবন্ধে স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনন ও চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে

থাকে। এগুলি সমসাময়িক কালের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ন উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার এই সাময়িক পত্রিকাগুলি ভবিষ্যতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের হাতেখড়ির প্রথম বিচরণক্ষেত্র। ক্ষেত্রানুসন্ধানে এমন বেশ কিছু দুর্লভ সাময়িক পত্রের নাম পাওয়া যায় যেগুলি যথেষ্ট সুনাম অর্জনের অধিকারী না হলেও বহু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক উপাদান ও তথ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল। ডঃ তুষার কান্তি ঘোষ, ডঃ ফণী পাল, শ্রী কমল বসাক, শ্রী গোপাল লাহা প্রমূখ পন্ডিতবর্গ মালদহ জেলার সাময়িক পত্রপত্রিকা নিয়ে সীমীত আলোকপাত করেছেন। তাদের মূল্যবান আলোচনায় সাময়িক পত্রগুলির পরিচয় এবং বিশেষ কিছু প্রকাশিত সংবাদ ছাড়া অন্য কোনো তথ্য উঠে আসেনি। ঔপনিবেশিক আমলে প্রকাশিত মালদহ জেলার সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে রাজনৈতিক তথ্য ছাড়াও বেশ কছু সাহিত্যিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত যেগুলি পরবর্তিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। অধিকাংশ পত্রিকাগুলির প্রকাশনা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে কেন কর্পূরের মত উবে গেল সে প্রশ্ন রয়েই যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উপনিবেশিক আমলে প্রকাশিত এমনই কিছু সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশকাল, বিবিধ বিবরণ, গুরুত্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতি আকস্মিক ভাবে সাময়িক কালের জন্য বা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।

কুসুম

প্রাক্স্বাধীনতার যুগে মালদহ জেলার সাময়িক পত্রের অভ্যুদয় হয়েছিল পুরাতন মালদহের ভূমিপুত্র পন্ডিত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে। পুরাতন মালদহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠের সময় অল্পবয়সেই তিনি সহপাঠীদের নিয়ে ‘ছাত্র হিতৈষী’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করেন।[১] মাসের নির্দিষ্ট দিনে সংগঠনের সদস্যরা জনকল্যাণ এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি স্বরচিত গদ্য-পদ্য এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও ভূতভবিষ্যৎ বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করত। কালক্রমে তাদের উদ্যোগে নির্বাচিত রচনাবলী নিয়ে ‘কুসুম’ নামক ক্ষুদ্র পত্রিকার শুভ সূচনা ঘটে। প্রাথমিক পর্বে পত্রিকাটি হাতে লিখে প্রকাশ করা হত। পরবর্তীতে সদস্যদের থেকে চাঁদা তুলে কলকাতার প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাধেশচন্দ্র নিজেই ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক এবং প্রকাশক। উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে কুসুমের জন্ম হলেও পত্রিকাটি খুব বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।[২] রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পত্রিকাটির কোন সংখ্যাই আজ পাওয়া

যায় না। পরাধীনতার যুগে মালদহের মত মফঃস্বল অঞ্চলে কুসুম পত্রিকার প্রকাশনা সমকালীন মালদহ জেলার পত্রপত্রিকার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে নবযুগের সূচনা করেছিল। জেলার প্রথম প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে তাই আজও 'কুসুম' শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

গৌড়বার্তা

'কুসুম' পত্রিকা অস্তাচলের প্রায় এক দশক পর ওকালতি পাশ করে রাধেশচন্দ্র শেঠ কংগ্রেসী রাজনীতি এবং সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৭ সালে পুরাতন মালদহ থেকে 'গৌড়বার্তা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার শুভ সূচনা করেন।[৩] সম্ভবত মধ্যযুগের স্মৃতি বিজড়িত গৌড় নগরীর জনজীবন ও সমাজের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি জনসমক্ষে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে 'গৌড়বার্তা' নামকরণ। এটি ছিল মালদহ জেলার দ্বিতীয় সাময়িক পত্রিকা। জেলায় কোন মুদ্রণ যন্ত্র না থাকায় কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে পত্রিকাটি পুরাতন মালদহ থেকে প্রচারিত হতে থাকে। সে সময় 'গৌড়বার্তা'র কোন বিনিময়মূল্যের উল্লেখ ছিল না।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় ১৭৮০ সালে মালদহের মদনাবতীতে স্থাপিত হয়। পরবর্তিতে তাঁর পেশাগত বদলি, সন্তানের অকাল মৃত্যু, প্রতিকূল পরিবেশ ও স্থানীয় উপদ্রবের কারণে তিনি সপরিবারে প্রথমে ১৭৯৯ সালে বংশীহারীর ছোট খিদিরপুরে এবং পরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হন। তখন মুদ্রণযন্ত্রটিকেও তিনি তার সঙ্গে নিয়ে যান।[৫]

প্রধানত ছাপাখানার সমস্যাতেই 'গৌড়বার্তা'র গতি থমকে যায়। সমকালীন শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'গৌড়বার্তা'কে সে সময় বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। রাধেশচন্দ্র শেঠ তার পত্রিকার মৃত্যুর জন্য মালদহবাসীর অশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন কারণ সে সময়ে নীল ব্যবসা ও প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য যেসব ইংরেজ সাহেব বা বাঙালি ভদ্র মহোদয় মালদহ জেলাতে এসেছিলেন তারা কেবলমাত্র বৃত্তিগত ও আর্থিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেই স্বদেশে ফিরে যান। সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'গৌড়বার্তা'র সমালোচনা পত্রিকাটির গুরুত্ব প্রমাণ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ১৯৬৩ সালে সুধীর কুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'মজুমদার প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে মুদ্রিত হয়ে 'গৌড়বার্তা'র প্রত্যাবর্তন ঘটে।[৬] পত্রিকাটির পরবর্তী সম্পাদক যথাক্রমে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার এবং উৎপল মজুমদার। আধুনিককালে মালদহ জেলা থেকে 'গৌড়বার্তা' পত্রিকাটি সগৌরবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

গৌড়দূত

১৮৮৯ সালে মালদহ জেলা থেকে জেলার তৃতীয় সাময়িকপত্র 'গৌড়দুতে'র শুভসুচনা ঘটে।[৭] রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদনায় এবং পুরাতন মালদহ নিবাসী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র আগারওয়ালার সহযোগিতায় পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। প্রাথমিক পর্বে পত্রিকাটির বিনিময়মূল্য ধার্য করা হয় ১ আনা।[৮] ১৮৯৫ সালে রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের উদ্যোগ ও উৎসাহে জমিদার শ্রী কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় ও শহরের কয়েকজন সহৃদ উকিল মোক্তারের ব্যক্তিগত আর্থিক সহায়তায় ইংরেজবাজার শহরে 'কৃষ্ণকালি প্রেস' নামে জেলার প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এটি ছিল উয়িলিয়াম কেরির পর মালদহ জেলার দ্বিতীয় এবং স্বদেশী উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম ছাপাখানা। আর ১৮৯৫ সাল থেকেই পত্রিকাটি ইংরেজবাজারের 'কৃষ্ণকালি প্রেস' থেকে ছাপানো হতে থাকে।[৯] ১৮৯৭ সালের ১২ই'জুন উত্তর-পূর্ব ভারতে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল অসম হলেও উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।[১০] এই ভূমিকম্পে 'কৃষ্ণকালি প্রেস' বিনষ্ট হওয়ায় 'গৌড়দূতে'র প্রকাশনা দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১১]

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে রাধেশচন্দ্র শেঠ পুরাতন মালদহ নিবাসী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র আগারওয়ালার সহযোগিতায় পুনরায় 'গৌড়দূত' পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ভাবে পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন। ১৯১১ সালে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় যান। সেখানেই মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে।[১২] কৃষ্ণচন্দ্র তার বাড়িতে ব্যক্তিগত ছাপাখানা স্থাপন করে 'গৌড়দূতে'র প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যান। এই সময় ফরিদপুর থেকে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আগত কবিরাজ শ্রী লালবিহারী মজুমদারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের আনুগত্যে 'গৌড়দূতে'র সুদক্ষ পরিচালনা এবং ক্ষুরধার লেখনী প্রতিভার জন্য শ্রী বিহারী 'কবিভূষন' উপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকাটির সহ-সম্পাদনার ভার তার হাতে অর্পণ করেন এবং নামমাত্র মুল্যে পত্রিকার স্বত্বাধিকার সহ মুদ্রন যন্ত্রটিও তাকে অর্পণ করেন। ১৯১৭ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর লালবিহারী নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদকের পাশাপাশি পূর্নস্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন লালবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ মজুমদার এবং তার পর কিরণশঙ্কর মজুমদার বিংশ শতকের নব্বইয়ের

দশক পর্যন্ত ‘হিরন্ময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স’ থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনা চালিয়ে যান।[১৩] এরপর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

মালদহ জেলার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘গৌড়দূত’ পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। শ্রী রাধেশচন্দ্র শেঠ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ১৮৮৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে মালদহ জেলা থেকে সর্বপ্রথম প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।[১৫] ফলে সমকালীন ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষন চিত্র তাঁর সম্পাদনায় সাফল্যের সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। তিনিই প্রথম ‘গৌড়দূত’ পত্রিকায় মালদহে রেলপথ স্থাপনের দাবি তোলেন। এছাড়া সমকালীন মালদাহ জেলার স্থানীয় কিছু সংবাদ যেমন- ইংরেজবাজার পৌরসভার দায়িত্বে গাফিলতি; জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও পুলিশ বিভাগের অনৈতিক কার্যকলাপ, সরকারি অপদার্থতা, জমিদার-প্রজা দ্বন্দ বিবিধ বিষয় পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন।[১৬] পরবর্তী সম্পাদক কবিভূষণ লালবিহারী মজুমদার সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন- নবীন চন্দ্র বসু হত্যা কান্ড, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মালদহে আগমন, জিতুসাঁওতালের বিদ্রোহ, সরোজিনী নাইডুর মালদাহে আগমন, জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সমালোচনা সহ নিয়মিত প্রকাশ করেন। এছাড়া পত্রিকায় বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত যা সমকালীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক তথ্য বহন করে। পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে লালবিহারী মজুমদার ‘মালদহ অবলম্বনে জীবনস্মৃতি’ শিরোনামে আত্মজীবনী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তার সম্পাদনায় পত্রিকাটি পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়। পত্রিকাটিতে ‘সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক’ শব্দটি ব্যবহৃত হত। ১৯৫৫ সাল নাগাদ প্রচারিত এই পত্রিকার মূল্য ছিল বাৎসরিক ৪ টাকা এবং মফঃস্বলে বাৎসরিক ৬ টাকা (ডাক মাসুল সহ)।[১৭]

মালদহ সমাচার

১৮৯৮ সালে রাধেশচন্দ্র শেঠের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও মালদহের আইনজীবী শ্রী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় জেলার চতুর্থ সাময়িক পত্রিকা ‘মালদহ সমাচার’ প্রকাশিত হয়। পাক্ষিক পত্রিকাটির বিনিময় মূল্য ধার্য করা হয় এক পয়সা। পত্রিকাটি মালদহে স্বদেশী ভান্ডারের ‘ধন্বন্তরি প্রেস’ থেকে ছাপানো হত। ১৯২১ সালে চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল ঘোষ মহাশয় পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।[১৮] রঙ্গলাল বাবুর অবসরের পর ১৯৩১ সাল থেকে কালীপ্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যব্রত চক্রবর্তী পত্রিকা

সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। স্বাধীনতার পর বর্তমানকালেও পত্রিকাটি বংশানুক্রমিক ভাবে সম্পাদনা করছেন সত্যব্রত বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী সঞ্জিব কুমার চক্রবর্তী।[১৯]

মালদহ জেলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে 'মালদহ সমাচারে'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৬ সালের জুন মাসে চিন্তাবিদ বিনয় কুমার সরকারের প্রবন্ধ 'বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বঙ্গসমাজ' পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ ঐ বছরের আগস্ট মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। মালদহের সমকালীন বিদগ্ধ পন্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, হরিদাস পালিত, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিপিনবিহারী ঘোষ, বানেশ্বর দাশ প্রমূখ সাহিত্যানুরাগীবৃন্দের মূল্যবান রচনা পত্রিকাটির সাহিত্য বিভাগকে বহু গুণে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২১ সালের মালদহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জনসভা, সুভাষচন্দ্র বসুর নঘরিয়ার জনসভা, আগস্ট আন্দোলন, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মালদহ ভ্রমণ, ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট মালদহের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হিসেবে 'মালদহ সমাচার' আজও *'শতাব্দি প্রাচীন সাপ্তাহিক'* রূপে স্বমহিমায় বর্তমান। প্রাক্স্বাধীনতা যুগে পত্রিকাটি ২ পয়সা, স্বাধীনতাত্তোরকালে ২ আনা এবং সম্প্রতিকালে ১ টাকা বিনিময়মূল্যে পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে পরিবেশিত হয়।[২০]

গম্ভীরা

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি'র সাহিত্য সমালোচনা বিভাগের পরিচালনায় ১৯১৪ সালের জুন মাসে মালদহের কলিগ্রাম থেকে 'গম্ভীরা' পত্রিকাটির শুভসূচনা ঘটে। মূলত মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণচরন সরকার মহাশয়। এটি ছিল মালদহ জেলার প্রকাশিত অন্যতম প্রধান সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা। মালদহ জেলার প্রাচীনতম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'গম্ভীরা' থেকেই পত্রিকাটির নামকরণ। এটি ছিল সমসাময়িক কালের এই জেলার প্রথম সচিত্র পত্রিকা। ডাক মাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ছিল ১ টাকা।[২১] পত্রিকাটি কলকাতার মেছুয়া বাজার রোডস্থিত 'মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে মুদ্রিত হত।[২২] এই পত্রিকায় তৎকালীন বাংলার খ্যাতিমান সাহিত্যিক, গবেষক ও পন্ডিতবর্গের সমৃদ্ধ রচনাবলী প্রকাশিত হত। আর মালদহ ভিত্তিক রচনা যেমন গম্ভীরা লোকসংস্কৃতি, মালদহের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ব, জনগোষ্ঠী প্রভৃতি বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া

হত। বিনয় কুমার সরকার, হরিদাস পালিত, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত বসু, কালিদাস রায়, বঙ্কিম সেন প্রমুখ প্রথিতযশা পণ্ডিতবর্গের সাহিত্য প্রবন্ধাবলী পত্রিকাটিকে সমকালীন বঙ্গসমাজে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীতে পত্রিকাটি গম্ভীরা লোকসংস্কৃতি সমিতিরও মুখপত্রে পরিনত হয়। ১৯১৭ সাল নাগাদ হটাৎই এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[২৩] সম্ভবতঃ জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রাণপুরুষ বিনয় সরকারের বিদেশযাত্রার ফলে কৃষ্ণচরন পত্রিকা সম্পাদনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

মালদহ আখ্‌বার

প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বিকাশ লাভ করায় ১৯২৪ সালে মালদহ জেলার মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি মৌলভী আব্দুল গনি খান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ‘মালদহ আখ্‌বার’। মুর্শিদাবাদ থেকে আগত গনি সাহেব পত্রিকাটি কিছুদিন অন্যত্র থেকে ছাপানোর পর নিজ গৃহে স্থাপিত ‘রহমানিয়া প্রেস’ থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন। উর্দু ফার্সি মিশ্রিত বাংলা ভাষায় পত্রিকাটি মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষায় নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।[২৪] তৎকালীন সংবাদিক সুধীর কুমার চক্রবর্তীর বিবরণ থেকে জানা যায় ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ বিষবৃক্ষের যে বীজ বপন করা হয়েছিল দুই শতক পরে অঙ্কুরিত সেই চারার পরিচর্যায় এগিয়ে এসেছিল ‘মালদহ আখ্‌বার’। এই পত্রিকা ভারত বিভাজনের সমর্থনে ঔপনিবেশিক শক্তির পাশে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদকে কলঙ্কিত করতে কুণ্ঠিত হয় নি। পত্রিকাটিতে সমসাময়িককালের হিন্দু ধর্মের নর-নারীর ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরনের সাম্প্রদায়িক কুৎসাগুলোকে জনসমক্ষে এনে ধর্মের বিজয়োল্লাস করা হয়েছিল। এই সমস্ত সংবাদের তীব্র বিরোধিতা করে ‘গৌড়দূত’।[২৫] এহেন মুখোরোচক সংবাদ স্থানীয় জনমানসে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। ফলে পত্রিকাগুলি বেশ জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ভালো বাজার পেয়েছিল। এই ধরনের জনপ্রিয়তার দরুন সম্পাদক আব্দুল গনি খানকে ব্রিটিশ সরকার ‘খান সাহেব’ উপাধিতে ভূষিত করে।[২৬] খান সাহেবের মৃত্যুতে বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ১৯৫৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র আনিসুর রহমান পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তান গমন করার পর পত্রিকাটি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।[২৭]

'মালদহ আখ্‌বার' সময়কালে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হলেও ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। মালদহের পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চেতনার জাগরণে এই পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের কারণে 'গৌড়দূত' পত্রিকাটি 'মালদহ আখ্‌বারে'র বিরোধিতায় মুখরিত হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে মালদহ জেলা থেকে প্রকাশিত উপরোক্ত সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি ছাড়াও আরও বেশ কতকগুলি পত্রিকার নাম পাওয়া যায় যেমন- ১৯২৫ সালে আইনজীবী রমাপ্রসন্ন সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'মালদহ হিতৈষী', ১৯৪১ সালে যথাক্রমে নন্দগোপাল চৌধুরীর 'ডমরু', আকবর মুন্সির 'আদিনা', আব্দুর রহমানের 'মিনার' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৮]

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে পরাধীন ভারতবাসী যখন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে জর্জরিত সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিল। বাঙালির প্রতিবাদের ভাষা শহর কলকাতা থেকে মালদা জেলার মত মফঃস্বলকেও আন্দোলিত করেছিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লেখনীর তীক্ষ্ণ তীর ব্রিটিশ শাসককে বারংবার বিবিধ প্রতিবন্ধকতায় বিধ্বস্ত করেছিল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভাষা প্রকাশের সর্ব্ববলিষ্ঠ মাধ্যম ছিল সমকালীন পত্রপত্রিকা। দেশের জাতীয় পত্রিকা গুলির পাশাপাশি আঞ্চলিক সাময়িক পত্রপত্রিকা সমাধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। কেবলমাত্র দৈনন্দিন সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম হিসেবেই নয় পত্রপত্রিকাগুলি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। গণমাধ্যমগুলির গতি রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার নির্লজ্জভাবে 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' (১৮৭৮, লর্ড লিটন) প্রয়োগ করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস করেছিল। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রশাসনিক প্রতিকূলতাকে অমান্য করে মালদহের মত শিক্ষা বিমুখ জেলায় একদিকে যেমন- 'গৌড়বার্তা','গৌড়দূত', বা 'মালদহ সমাচারে'র মত প্রতিবাদী সংবাদপত্র জনমত গঠনে সাহায্য করেছিল। তেমনি 'মালদহ আকবরে'র মত পত্রিকা সংখ্যালঘু বা পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভের আশায় বেশ কিছুকাল লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। সমসাময়িক কালে শিক্ষিত পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকদের উত্তরাধিকারীদের পত্রপত্রিকা সম্পাদনায় অনীহা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিধিনিষেধের বেড়াজাল, স্বাধীনতাপূর্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ পত্রিকা

আজ কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। পত্রপত্রিকাগুলি সংরক্ষণের অভাবে জেলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য এবং সাংস্কৃতিক দূর্মূল্য রচনাবলী চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে, যা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয় বরং সমগ্র ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিক জগতে বড় ধরনের বিপর্যয়।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত),*গৌড় মালদহ সংবাদ,* ১৩তম শারদীয়া সংখ্যা, ২০০৯, মালদা, পৃ ২৯।

২. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত), *গৌড় মালদহ সংবাদ,* ২৩তম শারদীয়া সংখ্যা, ২০১৯, মালদা, পৃ ৩১।

৩. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা,* *অক্ষর,* কলকাতা, ২০২০, ISBN ৯৭৮৯৩৮৩১৬১১৭১, পৃ ৩৬৯।

৪. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত), *গৌড় মালদহ সংবাদ,* ২৩তম শারদীয়া সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

৫. ভট্টাচার্য মলয়শঙ্কর (সম্পাদিত), *মালদহ চর্চা,* ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় পুস্তক ও প্রকাশক বিক্রেতা সভা, মালদহ, ২০১২, ISBN ৯৭৮৮১৯০৬৪৮৪৯৩, পৃ ৬২৬-৬২৯।

৬. বসাক কমল, *মালদাহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* অনিমা, কলকাতা, ISBN ৯৭৮৯৩৮৩১২৩৩৫৩, পৃ ১৯৪-১৯৫।

৭. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।*

৮. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত), *গৌড় মালদহ সংবাদ,* ২৩তম শারদীয়া সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৯. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।*

১০. https://en.wikipedia.org/wiki/1897_Assam_earthquake.

১১. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।*

১২. বসাক কমল, *মালদাহের পুর্বসুরি গ্রন্থকারঃ জীবনালেখ্য,* সাত্যকি, মালদহ, ১৯৯২, পৃ ১৫।

১৩. ঘোষ রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদাহের অবদান,* স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহ গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, ১৯৯১, মালদা, পৃ ৩২৭-৩৩১।

১৪. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭০।*

১৫. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, তদেব, পৃ ৩৬৯।*

১৬. মুখার্জি হরিদাস, *বিনয় সরকারের বৈঠকে,* ১ম খণ্ড, মালদহ, পৃ ২৮৫।

১৭. গৌড়দূত, মালদহ, ১৭মে, ২৪নভেম্বর, ১৯৪৫; ২৪ ফেব্রয়ারি, ১৯৪৬; ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫৫।

১৮. মিশ্র সমর, *মালদা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, অক্ষর, ২০১৭, কলকাতা,* ISBN 9789382041689, পৃ ১০৪-১০৫।

১৯. বসাক কমল, *মালদাহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬।

২০. ঘোষ তুষারকান্তি, *মালদহের ইতিহাসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৩।*

২১. বসাক কমল, *মালদাহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪।

২২. গোস্বামী পলাশ, উৎসারিত আলো, ঐতিহাসিক উদ্ধার সংখ্যা, ২০১৩, মালদা, পৃ ৪৪-৪৫।

২৩. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত), *গৌড় মালদহ সংবাদ,* ২৩ তম শারদীয়া সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ৩৪।

২৪. বসাক কমল, *মালদাহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪।

২৫. চৌধুরী অভিজিত (সম্পাদিত), *গৌড় মালদহ সংবাদ,* ২৩তম শারদীয়া সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

২৬. মিশ্র সমর, *মালদা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।*

২৭. বসাক কমল, *মালদাহের সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮।

২৮. ভট্টাচার্য অজিতেশ, *মধুপর্ণী* মালদহ জেলা সংখ্যা, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ ১৮৩।

বিঃদ্রঃ তথ্য সংগ্রহে সহায়তায় ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, জনাব এম আতাউল্লাহ্, শ্রী প্রথমেশ পাল, শ্রী সৌমেন্দ্রপ্রসাদ সাহা মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

(অ) চর্চিত এক নারী : 'অনাম্নী অঙ্গনা'র আলোকে

রচনা রায়
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
আমডাঙা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারত মহাকাব্যের মহারণ্যে চর্চিত, বিশ্লেষিত ও আলোচিত চরিত্র সংখ্যা বহু। তেমনি অন্ধকারে সংগুপ্ত রয়েছে এমন একাধিক চরিত্র, যারা মহাকবির করুণাদৃষ্টি থেকে চির বঞ্চিত। অথচ তাদের জীবন নিয়েও গড়ে উঠতে পারত স্বতন্ত্র কোন মহাকাব্যীয় উপাখ্যান। যেমন একলব্যের কাহিনি, যেমন বিদুর কাহিনি। প্রথম অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা নিষাদ জাতক একলব্যের আখ্যান পাই। কিন্তু সমগ্র মহাভারতের কোথাও এই নিষাদ জাতকের আত্মত্যাগের মহিমার কোন উল্লেখ নেই; নেই গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিজের বুড়ো আঙ্গুল গুরুকে উৎসর্গ করার পরবর্তী জীবন বৃত্তান্ত। হয়তো মহাকবি একলব্যের বিনয় নয়, গুরুদক্ষিণার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাই এর প্রতি মহাকবির এমন উপেক্ষার দৃষ্টি। মহাভারতের বিদুর চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বাদ দিয়ে এ মহাকাব্য সম্পূর্ন নয়। বিদুর মহাকবির আত্মজ হলেও কবি তার জীবন পরিক্রমার বিশেষ চর্চা করেন নি। কৌরব রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হয়েও বিদুর নিজেকে কখনো চর্চায় আনেননি। ধর্মের স্বরূপ হয়েও তাকে নানা সময়ে সহ্য করতে হয়েছে অবহেলা, অপমান কখনো বা অপ্রীতিকর ব্যবহার। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় বিদুর মাতা সেই অনাম্নী নারী, যিনি মহাবুদ্ধি বিদুরের মাতা ও মহাতাপস ব্যাসদেবের পরিচর্যাকারী হয়েও মহাকাব্যের চর্চিত আলোকরেখা বাইরে অবস্থান করেছেন। কুরুরাজবধূ অম্বিকার অনুরোধে যে নারী তার যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, মহাভারতে সেই নারীর পূর্বজীবনের বা মাতৃত্বকালীন পরবর্তী জীবনের কোনো পরিচয় লিপিবদ্ধ করা নেই। মহাভারতের মহাসমুদ্রে সে নারী এমনই অপাংক্তেয় যে তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই মহাকাব্যে। ধর্মজ্ঞানী বিদুরের মাতা হলেও সেই নারীর অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কোথাও; সে রয়ে গেছে সকলের অলক্ষ্যে, পাঠকের কৌতূহলের অজ্ঞাতে।*

সূচক শব্দ: *শূদ্রাণী, কুমারীত্ব, সংসর্গ, মাতৃত্ব।*

মূল আলোচনা:

মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু কৌরব-পান্ডবের দ্বন্দ্ব ও পরিণামে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শুধু এটুকুকে যদি মহাভারতের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে মহাভারতের বিরাট কলেবরে নিহিত বহু গুরুত্বপূর্ণ কাহিনির প্রতি অমর্যাদা করা হবে। বস্তুত মহাভারত এমন এক মহাসমুদ্র তুল্য কাব্য, যার মধ্যে মিশে আছে ভারতীয় পুরাণ-উপপুরাণের নানা ঘটনা, রয়েছে ভারতীয় দর্শনের গভীর-জটিল-তাত্ত্বিক আলোচনার বিস্তৃত ধারা, রয়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিস্তৃত বিবরণ । সেইসঙ্গে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও। এককথায় সমগ্র ভারতীয় জাতির জীবন-ইতিহাস-দর্শন ব্যক্ত হয়েছে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি উপকাহিনিতে। মহাকবি কখনো রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন জীবনের গভীর তত্ত্ব, কখনো বাস্তব অভিজ্ঞতায় চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন কার্যকারণ সূত্রে। এককথায় মহাভারতের মহাসমুদ্রে মিশেছে ভারতীয় জীবনের সমস্ত জাতিসত্তা। অতি সুদক্ষ শিল্পীর মতো মহাকবি আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত এমন একখানি কাহিনির অবতারণা করেছেন যার প্রতি বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে আছে ভারতীয় পুরাণ, উপপুরাণ ও জীবনের নানান তত্ত্বকথা।

মহাভারতের কাহিনি থেকে আমরা সকলেই অবগত আছি যে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর কুরু রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজমাতা সত্যবতী ও শান্তনু পুত্র ভীষ্ম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সংকট থেকে খুব সহজেই মুক্তি দিতে পারতেন ভীষ্ম। কিন্তু তিনি তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল। এই সংকট থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেন রাজমাতা সত্যবতীর কানীন পুত্র মহামুনি ব্যাসদেব। নিয়োগ প্রথায় তিনি কৌরব বংশের উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে সম্মত হন। প্রথমে ডাক পড়ে জ্যেষ্ঠ রাজবধূ অম্বিকার। কিন্তু মুনির ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আতঙ্কিত হয়ে অম্বিকা সে রাতের মিলন সার্থক করতে পারে নি। পরবর্তী সময় সার্থক মিলনে কুরুবংশের সর্বাঙ্গসুন্দর উত্তরাধিকারীর আকাঙ্ক্ষায় সত্যবতী অম্বিকাকে পুনরায় ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে আদেশ দেন। কিন্তু এবার অম্বিকা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে তার পরিবর্তে একজন শূদ্রাণী পরিচারিকাকে ব্যাসদেবের শয্যাগৃহে প্রেরণ করেন। এই দাসীপুত্রের গর্ভে জন্ম নেন প্রাজ্ঞ, বিদ্বান বিদুর। কাশীদাসী মহাভারতে যে তথ্য আমরা পাই, তা এই রূপ:

"পুনরপি এল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে।।
সেবিকা আছিল তাঁর পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি স্থানে সুবেশাদি করি ।।
নবীন যৌবন তার হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে ॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান ।।
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি ধর্ম্ম মহামতি।।
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত।।" [১]

ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর ভাই হওয়া সত্ত্বেও বিদুর কেবলমাত্র দাসী গর্ভজাত হবার কারণে সমাজে 'ক্ষত্তা' বা পারশব নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা জানি না, কোন সেই দাসী, যিনি মহামতি, মহাজ্ঞানী বিদুরের মাতা! মহাভারতকার সেই শূদ্রা নারীর জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক রচনা করেননি। মহাকাব্যে কোথাও তাকে মেধাবী পুত্রের গরবিনী মাতা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়নি। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এ নারীকে নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি। কিন্তু আধুনিক মানসিকতায়, বর্তমান যুক্তিবাদীযুগে যখন সবধর্ম-বর্ণের মানুষকে আমরা সমান আসন দিতে আগ্রহী, তখন কবি বুদ্ধদেব বসুর কলমে সেই অজানা অনাম্নী অঙ্গনা হয়ে ওঠেন কাব্যের নায়িকা। মহাভারতের এক নাম গোত্রহীন নারীকে নায়িকা হিসেবে তুলে আনা আধুনিক কবির কৃতিত্ব। মহাজ্ঞানী, বেদজ্ঞ, কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের ঔরসে দাসীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল এক প্রকৃত বুদ্ধিমান, স্থিতধী, ধর্মাত্মার। 'অনাম্নী অঙ্গনা' সেই কাহিনি, যেখানে আমরা একটি নারীর কুমারীত্ব থেকে কুমারীত্ব হরণের গল্প জানতে পারি, জানতে পারি মাতৃত্বের গর্বে ও আস্বাদনে পরিপূর্ণ এক নারীর অন্তর বেদনাকে। অম্বিকা বা অম্বালিকা রাজবধূ হয়েও যে সার্থকতায় পৌঁছাতে পারেনি, অঙ্গনা দাসী হয়ে সেই কার্য সুন্দর ও সাবলীল ভাবে সুসম্পন্ন করেছে, যার ফলশ্রুতিতে তার

কোলে আলো করে জন্ম নিয়েছে একটি সুস্থ, সুন্দর ,স্বাভাবিক, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত ধর্মপ্রাণ পুত্র।

মহামতি বিদুরের জন্ম বৃত্তান্ত এ নাটকের মূল আখ্যান। যদিও বুদ্ধদেব বসুর মতে —

> *"বিদুরের জন্মকথাও মহাভারতে অনিশ্চিত। কালীপ্রসন্নে বিদুর একবার অত্রিমুনির পুত্ররূপে কথিত হয়েছেন (আদি : ৬৭), কিন্তু নীলকণ্ঠের মতে 'অত্রিশব্দেন সূর্যো গৃহ্যতে, তস্য পুত্র ধর্মং বিদুরং বিদ্ধি— "অত্রি" শব্দের অর্থ [এখানে] সূর্য, ধর্ম [-রূপী] বিদুর তারই পুত্র। আর্যশাস্ত্রের পাদটীকায় বৈকল্পিক পাঠ 'বিদুরং বিদ্ধি লোকেহস্মিন্ ধর্মং ধর্মভৃতাং বরম্ বিদুরকে এই জগতে ধর্মধারক ধর্ম বলে জানবে।' বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দিয়ে আর্যশাস্ত্রের অনুবাদে বিদুরকে আবার বলা হয়েছে 'সূর্যের পুত্র ধর্ম (যম)। যিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র সেই অত্রি কেমন করে সূর্যের সঙ্গে শনাক্ত হতে পারেন, বা সূর্যের পুত্রকে ধর্ম বলা হলো কোন পুরাণ বা প্রবচন অনুসারে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, তার প্রয়োজনও তেমন জরুরি নয়। এই রকম গোলযোগের স্থলে বিদুরকে ব্যাসের ঔরসজাত দাসীপুত্র বলে ধরে নেয়াই সমীচীন, এবং মহাভারতের কাহিনির মধ্যে সেই ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ। যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই তাকে 'ক্ষত্তা' (বর্ণসংকর) ব'লে সম্বোধন করে থাকেন, আর ভীষ্ম বিদুরের বিবাহ দেন একটি সুনির্বাচিত পারশবী কন্যার সঙ্গে (আদি : ১৪৪)। ('পারশবী' অর্থ শূদ্রাণী)"* [২]

নাট্য রচনায় বুদ্ধদেব বসু এত জটিল তত্ত্বে যান নি। ব্যাসদেবের ঔরসজাত দাসীপুত্র হিসেবেই ধরে নিয়ে তিনি 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় নানামুখী ভাবনার বিচ্ছুরণে নাটকের কাহিনি বৃত্তান্ত বিস্তারিত করেছেন। বিদুর মাতা এক অখ্যাত, অনাম্নী নারী। নাট্যকারও সেই নারীর কোন নামকরণ নাটকের দেননি, তাকে কেবল 'অঙ্গনা' হিসেবেই পরিচায়িত করেছেন। সেই অনাম্নী অঙ্গনা মহাকাব্যে সম্মানিতা না হলেও এযুগের কবির দৃষ্টিতে তিনি সম্মানীয় ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। কাহিনি শুরু হয়েছে সংগীতের সুর মূর্ছনার মাধ্যমে। অঙ্গনা নাম্নী এক নারীর ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষা এবং

স্বপ্নের নীড় রচনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সংগীতের মাধ্যমে। একজন তন্তুবায় যুবককে বিবাহ করে অঙ্গনা সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝা যায়, হস্তিনাপুরের জ্যেষ্ঠ রানী অম্বিকার একান্ত অনুগত দাসী অঙ্গনা। তার শরীরে মনে পূর্বরাগের অস্থিরতা থাকলেও দাসত্ব থেকে তার মুক্তি নেই। স্বাধীনতা তার কাম্য হলেও দাসত্বের রজ্জু তার পায়ে বাধা। বিষাদাচ্ছন্ন অঙ্গনার কণ্ঠে শোনা যায় প্রেম-ভালোবাসা-স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাতরতা। সে জানে তার ভবিতব্য —

"আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,
আমরা শুধু দেখে যাবো-- মেনে নেবো-- কথা বলবো না।" [৩]

এ নাটকে অঙ্গনা প্রধান চরিত্র। কিন্তু প্রথম অংশের পরেই দ্বিতীয় অংশে গুরুত্ব পায় রাজমাতা সত্যবতী ও কুরু কুলবধূ অম্বিকার কথোপকথন। কাশী রাজকন্যা অম্বিকা রাজবধূ হয়েও তার যন্ত্রণা কিছু কম নয়। অতি অল্প বয়সে সন্তানহীন অবস্থায় তাকে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা মাথা পেতে নিতে হয়েছে। রাজমাতা সত্যবতীর নির্দেশে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাকে অঙ্কশায়িনী হতে হয়েছে এক ভীষণ মূর্তি 'চক্ষুপীড়ক কর্কশগাত্র তপস্বী'র। অনিচ্ছাকৃত এই মিলনে অম্বিকা জন্ম দিয়েছে এক অন্ধ পুত্রের। তাই সত্যবতী পুনর্বার কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তায় রাজবধূ অম্বিকাকে ব্যাসদেবের শয়নগৃহে যাবার জন্য পুনরাদেশ দিয়েছেন। তার প্রথম সন্তান জন্মান্ধ, ভরতবংশের সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত। অতএব একটি সুস্থ, নিষ্কলঙ্ক, অনবদ্য, সর্বাঙ্গ শোভন পুত্রের কামনায় রাজমাতা সত্যবতীর অম্বিকার প্রতি এহেন নির্দেশনামা। কিন্তু এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হতে পারে না রানী অম্বিকা —

"আমাকে দয়া করুন, আমি পারবো না।"

— বেদনাহত হয়ে সে বারংবার অনুরোধ করতে থাকে তাকে যেন এই কঠিন কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যবতী বৃহৎ স্বার্থে তথা ভারতবর্ষের রক্ষার্তে অম্বিকাকে নির্দেশ দেন রাত্রির দ্বিতীয় যামে পুষ্পমাল্য সুগন্ধি হয়ে মহাতাপস ব্যাসদেবের শয্যাসঙ্গী হতে। সত্যবতীর আচরণে অম্বিকা ব্যথিত হয়। সেই সঙ্গে জানতে পারে ভারত বংশের একটি গোপন তথ্য। সত্যবতী অত্যন্ত আবেগে, অপকটে প্রকাশ করেন তার যৌবনের কাহিনি। মহামুনি পরাশরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের আনন্দময় মিলন অনুভূতির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে রাজমাতা সত্যবতী জানান তারই ফলশ্রুতিতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম। শুধু পুত্র প্রাপ্তি নয়, মৎস্যগন্ধা সত্যবতী এরপর পদ্মগন্ধায়

পরিণত হয়েছিলেন আর তার কৃষ্ণবর্ণ হয়েছিল কনকবর্ণা। ঠিক এই মুহূর্তে অম্বিকা উপলব্ধি করতে পারে নারী জীবনের সীমাবদ্ধতাকে। তার মনে হয় —

"আশ্চর্য!
তাঁরাই পূজ্য হন জগতে
যারা দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর।
যাদের পক্ষে নারী
শুধু এক রন্ধ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে
ধমনীর আগুন তাঁরা নিভিয়ে দেন — প্রয়োজনমতো,
অথবা নিষ্ক্রান্ত হন ভূপৃষ্ঠে।
কেমন স্বচ্ছন্দে চ'লে যান তাঁরা।
আপন মনে, আপন পথে, একবার পিছন ফিরে না-তাকিয়ে,
হোক তিনি কৌমার্যহারক, বা গর্ভজাত সন্তান।" [৪]

আশ্চর্য, নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর ভাষার দক্ষতা। সংলাপের এই বক্তব্য নাটকটিকে গভীর থেকে গভীরতর ব্যঞ্জনায় নিয়ে যায়। গদ্য ঘেঁষা কাব্যিক ছন্দের সৌন্দর্যময় বিন্যাস আমাদের ভুলিয়ে দেয় এ কোন অতীতের মহাকাব্যের কথা নয়; এ যেন সমকালীন নারীর হৃদয় যন্ত্রণার নির্যাস। মহাকাব্যের সীমা লগ্ন হলেও এ আসলে একালের কাহিনি। আর এইভাবে সংলাপ হয়ে ওঠে এ নাটকের প্রাণ, নাটকের গভীরে পৌঁছানোর জন্য ব্যঞ্জনাময় কাব্যিক মাধুর্য।

মাতা সত্যবতীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেও অম্বিকা পালানোর পথ খুঁজতে থাকে, আর সেই মুহূর্তে সে আবিষ্কার করে অঙ্গনাকে। যে অসহনীয় যন্ত্রণা অম্বিকা সহ্য করে চলেছিল সেই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে বেছে নেয় বিনীত, নম্রভাষী, আজ্ঞা পালনকারী অঙ্গনাকে। সেই ' তীব্র পুরুষের অভ্যর্থনা'র জন্য নানা রানী অম্বিকা নানা উপদেশে, উপমায়, ছলনায়, নীতিকথায় অঙ্গনাকে রাজবধূর ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের মিলনশয্যায় যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু অঙ্গনা ক্ষুদ্র নারী, জ্ঞান তার সামান্য। অম্বিকা তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার শর্তে অঙ্গনাকে ব্যাসদেবের শয্যায় পাঠাতে উদ্যত হলে অঙ্গনা প্রথমে রানীর প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হতে পারে না। তার অন্তরে জাগে প্রবল দ্বিধা-সংকোচ। কারণ চিরকাল সে জেনে এসেছে 'সেই বিবাহ কলঙ্কিত, বধূ যেখানে পূর্বব্যবহৃতা। তাই তার কাম্য — ' দাসীত্ব থেকে মুক্তি, আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন।'

বুদ্ধিমতী অম্বিকা তাকে আশ্বস্ত করে জানান —

‘কোনো ঋষি যাকে স্পর্শ করেন, অঙ্গনা,
সেই নারী থাকে নির্দোষ, নির্মল, কলঙ্করহিত,
হোক কুমারী, সধবা, বা ভর্তৃহীনা।
সেই সংযোগ
জলচিহ্নের মতো বিলীন হয়ে যায় মুহূর্তে। ”[৫]

রানীর আদেশে একপ্রকার বাধ্য হয়েই রানীর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে অঙ্গনা প্রবেশ করে ব্যাসদেবের কাছে। ব্যাসদেব যিনি ‘বিচিত্রবীর্যের মাতৃক ভ্রাতা, সত্যবতীর দ্বৈপায়ন সন্তান, পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, তেমনি তিনি জ্ঞানী বংশের শ্রেষ্ঠ।’ রানী অম্বিকা অঙ্গনাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই এক রাত্রির পরেই অঙ্গনা পাবে চিরমুক্তি। কিন্তু অঙ্গনা জানে ‘শুধু একরাত্রি নয় আমার সমস্ত জীবন এতে জড়িত’,তবু রানীর নির্দেশমতো অঙ্গনা প্রবেশ করে ব্যাসদেবের শয্যা গৃহে। নাট্যকার এখানে তার কোনো বর্ণনা দেয় নি। নাট্যিক কৌশলে কেবলমাত্র অম্বিকা এবং অঙ্গনার কথোপকথনেই সেই অপূর্ব, মায়াময় কাব্যিক মিলন রাত্রির বর্ণনা করেছেন। অঙ্গনার সংলাপের মধ্যে রয়েছে তার হৃদয়ের নিবিড় সমর্পণ। এক অনির্বচনীয়, কোমল, অন্তহীন নির্ভার রাত্রিশেষে, ঊষার পূর্বক্ষণে অঙ্গনা নারীত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকেও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির এমন একরাত্রির মিলন সংসর্গে বদলে গিয়েছিল তরঙ্গিণীর জীবনের ছন্দ। অনুরূপ ব্যাসদেবের সঙ্গে অঙ্গনার মিলন তার ব্যক্তিজীবনের ধারা বদলে দিয়েছে। তার মনে হয়েছে ব্যাসদেবের নিঃশ্বাসের ফুৎকারে সে গর্ভিনী। এই অংশে নারী মনের অদ্ভূত দ্বান্দ্বিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ধরা পড়েছে অম্বিকার সংলাপ ও আচরণে। যে পুরুষের সঙ্গ তার কাছে দুর্বিষহ, যার ভীষণ মূর্তি দেখে অম্বিকা আতঙ্কিত এবং দ্বিতীয়বার সেই পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে অস্বীকৃত, সেই রানী অম্বিকা যখন উপলব্ধি করতে পারেন তার পরিবর্তে তার প্রেরিত দাসী অঙ্গনা ব্যাসদেবের স্পর্শে তৃপ্ত এবং সফলভাবে গর্ভিনী, তখন অম্বিকার অন্তরে কোথায় যেন জ্বলে ওঠে কৌতূহল মেশানো ঈর্ষা। শূদ্রকুলজাত দাসী হয়েও অঙ্গনা কখন যেন হস্তিনাপুরের জ্যেষ্ঠ রানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়। অঙ্গনার সাফল্যকে সানন্দে মেনে নিতে অসুবিধা হয় রানী অম্বিকার। এই অংশে বারংবার তাই তার কণ্ঠস্বর হয়েছে তীক্ষ্ণ, ঈর্ষার ঝলক প্রকাশ পেয়েছে চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোনের মৃদু ব্যঙ্গাত্মক হাসিতে। গত রাত্রির মিলন বর্ণনায় অঙ্গনার অভিব্যক্তিতে অম্বিকা হয়ে পড়েছেন ঈর্ষান্বিত —

"তোর ভাষা আজ উক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে,
যেন কোনো কল্পনায় তুই আবিষ্ট।
ঋষির কিছুটা ভক্ত হ'য়ে পড়েছিল — তা-ই কি?" [৬]

নারী মনের এমন দুর্বোধ্য গতিপ্রকৃতি সত্যি বিচিত্র!! অথচ কবির কাছে তা অধরা থাকেনি। বুদ্ধদেব বসুর কল্পনায় ধরা পড়েছে রানী অম্বিকার ব্যর্থতার গ্লানি

অঙ্গনা অম্বিকার দাসী। রানীর আদেশ পালনই তার কর্তব্য। আমরা সমস্ত নাটক জুড়ে দেখলাম অম্বিকা আর অঙ্গনার মধুর ও তিক্ত সম্পর্ক। কিন্তু প্রকাশ্যে অঙ্গনা কখনোই তার তিক্ততা রানীর কাছে প্রকাশ করেনি। তার প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশ পেল যখন অম্বিকা তাকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেন। সে দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দেয় যে সে দাসীত্ব থেকে মুক্তি চায় না —

"যদি আমার পরিচর্যা কখনো আপনাকে তুষ্ট ক'রে থাকে
তা'হলে, করুণাময়ী, আমাকে চিরকাল আপনার দাসী হয়ে
থাকতে দিন।"

— বক্তব্যটি বিস্ময়কর বটে, কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে অঙ্গনার গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয়। যে সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছে, তাকে সে এই রাজপরিবারে জন্ম দিতে চায়, লালন করতে চায় এই রাজপুরীতে। ব্যাসদেবের পুত্র অন্য কারো নামে পরিচিত হবে, লালিত হবে অন্য কোন সংসর্গে তা অঙ্গনার চিন্তার পক্ষে অসহ্য। আশ্চর্য অঙ্গনার মানসিকতা দৃঢ়তা! কয়েক মুহুর্তের জন্য অম্বিকার চোখ বিস্ফারিত ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়। অঙ্গনা জানে তার পুত্র রাজ সিংহাসন পাবে না কখনো। কারণ সে শূদ্রা দাসীর পুত্র। কিন্তু ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তার 'পুত্র হবে ধীমান, প্রাজ্ঞ, নম্র, মৃদুভাষী, ধীর।' তার নাম হবে বিদুর, 'কেননা বিদ্যা হবে তার স্বভাব সিদ্ধ।' এমনকি কুরুবংশে যখন ঘোর যুদ্ধের দামামা বাজবে তখনো বিদুর থাকবে 'ঘটনাস্থলে উপস্থিত — তবু থাকবে শান্ত, শান্তির সাধক, নির্লিপ্ত, যেন সিন্ধুবিহারী হংস, তরঙ্গ যাকে সিক্ত করে না।' [৭]

ব্যাসদেবের এক রাত্রির সংসর্গে অঙ্গনা যেন নতুন রূপে আবির্ভূত হলো জগতের সামনে। এই অঙ্গনা নেহাতই মৃদুভাষী, বা অনুগত আজ্ঞা পালনকারী দাসী নয়; এক রাত্রির অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে নারীত্বের রহস্য, পান করেছে নারীত্বের স্বাদ, জেনেছে অস্পষ্ট অনুভব শূন্য। অঙ্গনাকে পূর্ণ করে তুলেছে একবিন্দু ব্যাসদেব। তাই অঙ্গনা আজ স্বাবলম্বী।বলিষ্ঠ চরিত্রে মাতৃ হৃদয়ের অধিকার দাবি করতে চায়। জন্ম দিতে চায় এমন এক সন্তানের, যে হবে — *"পিতার মত বিদ্যান, মাতার মতো নেপথ্যচারী,/ মাতার*

মতো দীনতায় ধন্য, পিতার মত উদাসীন,/ ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র নয়,/নয় শত্রু বা মিত্র, সংসারী বা সন্ন্যাসী।" [৮]

অম্বিকা বুঝে উঠতে পারে না অঙ্গনার নারীত্বের অহমিকাকে। শুধু তার মনে হয়, এই মেয়ে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে অম্বিকা অঙ্গনার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে চলে যান অন্তঃপুরে। গুঞ্জন সুরে গানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নাটক। তবে গানের মধ্যে ধরা পড়ে অঙ্গনার কুমারী থেকে নারীতে উত্তরণ হবার অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ দক্ষতায় নারীকে এ নাটকে যেভাবে উদ্ভাসিত করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। পরবর্তী সময়ে মনোজ মিত্র 'যা নেই ভারতে' (২০০৫) নাটকে মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব অবলম্বনে কাহিনি রচনা করেছেন। সেখানেও নিয়োগ প্রথায় জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডুর বর্ণ পান্ডু ও মহাজ্ঞানী বিদুরের জন্ম বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে স্থান পায়নি কোন অনাম্নী অঙ্গনা। প্রসঙ্গত মনে পড়বে, একালের সাহিত্যিক শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ মহাভারতের বিনির্মিত পাঠে বিদুরের স্বগতোক্তিতে উল্লেখ করেছেন —

> *"অতি মৃদুভাষী ছিলেন তাঁর মাতা। পিতার সংশ্রবে আসার পর থেকে পিতামহী তাঁকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। গড়ে দিয়েছিলেন একটি ছোট্ট আবাস স্থল, যাতে প্রাসাদের প্রাচুর্য্য না থাকলেও অভাবও নেই। সেই রম্য গৃহের একান্তে একটি পুষ্করিণী এবং একটি উদ্যান রয়েছে। মাতার পালিতা হংসের দল সেই পুষ্করিণীতে খেলা করে সারাদিন। হরিণ আর খড়গোসের দল খেলে উদ্যানে। মাতা এঁদের পরিচর্য্যায় থাকতেন সারাদিন। রাজকোষ থেকে আসতো মাসোহারা। মহারাণী সত্যবতী মাঝে মাঝেই মাতাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন প্রাসাদে পূজাদি উপলক্ষে। শূদ্রাণির এমন ভাগ্যে যারা ঈর্ষিত তারাও জানে সে ঈর্ষার খবর বাতাসও পেলে প্রাণ সংশয় হতে পারত। ইনি মহারাণী সত্যবতীর পুত্রবধু। রাণী অম্বিকা বা অম্বালিকা ক্ষেত্রজ পুত্রের গর্ভ, কিন্তু এই নারী অনূঢ়া ছিলেন। বিবাহ পিতা কখনো করেন নি ঠিকই, কিন্তু হস্তিনাপুর আগমনে এই গৃহ কখনো বঞ্চিত হয়নি তাঁর পদার্পণে। বিদুর জানেন মাতা জীবিত থাকলে এবারেও তার অন্যথা হত না। হস্তিনাপুর রাজশক্তির কর্ম সম্পন্ন*

হলে পিতা এই কুতুহল-শালা ছেড়ে চলে আসতেন তাঁর মাতৃ-আলয়ে, যেখানে বর্তমানে তিনিও বাস করেন একা। কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করতেন। তারপরে আবার বিদায় নিতেন। কেউ জানেনা কত দিনের সে বিদায়! কিন্তু মাতা কি অবিচল! দিনের পর দিন বছরের পর বছর প্রতীক্ষায় তাঁর যেন কোনো ক্লেশ নেই। অন্তত বিদুর কখনো দেখেননি। যেমন শোনেননি তাঁকে নিজের অতীতের কথা বলতে। অনেক অনুরোধে শুধু বিদুরকে এইটুকু জানিয়েছিলেন তিনি এক বিজিতা জাতির রমণী যাঁকে কাশী রাজকন্যা দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছেন দাস বাজার থেকে ক্রয়ের পরেই। ব্যাস্! এই শুরু, এই শেষ। অতীত যখন মহান কিছু দিতে সক্ষম নয় তখন তাকে স্মরণ না করাই শ্রেয়। সেই জাতি অদ্যাবধি বিজিত। তাদের জয়ের বা স্বাধীনতার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বিদুর এক বয়সে কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন অনেক। কে হতে পারে? চেদী, মৎস্য, বিরাট, গান্ধার, কোশল? কোন রাজ্য? কোন জনপদ? অনেক বোঝার চেষ্টা করেছেন। মাতার শরীর গঠন থেকে পাঠ করে নিতে চেয়েছেন উত্তর। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। গৌরবর্ণের সংস্কৃতভাষীদের সাধারণ যে চেহারা মাতাও তার ব্যাতিক্রম না। এখন এমন চেহারা বহু বহু রাজ্যের মানুষের বৈশিষ্ট্য। এর থেকে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। রাণী অম্বিকা বা অম্বালিকা এ প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তাঁরা শুধু মাত্র দাসীকে জানেন, তার ইতিহাস তাঁদের আগ্রহের বস্তু কখনোই ছিল না। পিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন একদিন সাহস ভরে। পিতা স্মিত হাস্যে বলেছিলেন, ইনি জন্মান্তর লাভ করেছেন। এঁর পূর্ব জন্মপরিচয় নিতান্তই গর্হিত কাজ। এখন এঁর পরিচয় পিতার পরিচয়েই। এর পরে বাকী ছিল ভাষা এবং কথন পদ্ধতির পরীক্ষা। কিন্তু পিতার আদেশে মাতার শিক্ষাও হয়েছে সংস্কৃতে। বৈদিক ছান্দস্ মাতার অধিগত না হলেও কথপকথন প্রাকৃতের থেকে স্বতন্ত্র। বিদুরের

বাল্যকালে এই সংস্কৃত শ্রবণ তাঁকে সাহায্য করেছে দ্রুত এ ভাষা আয়ত্ত্ব করতে। পিতার অভিলাষও এই ছিল।" [৯]

বক্তব্যটির উল্লেখ হয়তো কিছুটা দীর্ঘায়িত হল বটে কিন্তু একবিংশ শতকের সাহিত্যিকের আলোচনায় একটি অনালোচিত চরিত্র সামান্য অংশে হলেও গুরুত্ব পেয়েছে। এ যুগের সাহিত্যিক সেই অজ্ঞাতনামা নারীর জীবন ইতিহাসকে চর্চা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সাহিত্যিক শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষের বক্তব্য মহাকবি ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের অনুপন্থী নয়, তবু মনে রাখতে হবে শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষের মহাভারত গভীর অনুধ্যানের ফসল। বাংলা মহাভারত চর্চার পরম্পরায় এই গ্রন্থ এক অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। কালের দর্পণে মহাভারতের ঘটনা পরম্পরাকে অক্ষুন্ন রেখেও সাহিত্যিক নব কলেবরে মহাভারতের বিনির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু কল্পনার গাঢ়তায় মহাভারতের এক অনাম্নী, উপেক্ষিত নারীকে 'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটক রচনায় বিদুর জননীকে চর্চার আলোকিত বিন্দুতে স্থাপন করেছেন, তেমনি সাহিত্যিক শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষের বিনির্মিত পাঠে পুনরায় বিদ্যুৎ মাতা চর্চার আলোক রেখায় স্থাপিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর মতে পুরাণ হচ্ছে 'একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরন্তন নূতন।' কবি সাহিত্যিকেরা মহাভারতের এই চিরপুরাতন কথাকেই চির নতুন করে বারবার পাঠকদের সামনে মেলে ধরেন। বুদ্ধদেব বসুও সেই প্রচেষ্টা করেছেন। মহাকাব্যিক পটভূমিকায় বিদুরের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনায় তিনি এক মহাভারতের অজ্ঞাত অখ্যাত নারীকে পাঠকের সামনে চিত্রায়িত করেছেন 'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকে।

আকর গ্রন্থ :

বুদ্ধদেব বসু, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা- ৯১

তথ্যসূত্র :

১. কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ৩২তম সংস্করণ এর পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৪

২. বুদ্ধদেব বসু, মহাভারত কথা, সিগনেট প্রেস দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯, কলকাতা - ৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৬

৩. বুদ্ধদেব বসু, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২১

৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৫
৫. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৪
৬. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৮
৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৬
৮. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭০
৯. শুদ্ধসত্ব ঘোষ, মহাভারত অষ্টম পর্ব, ২০ নভেম্বর ২০১১ (http://104.237.2.102/guruchandali/comment.php?topic=16294)

ভাবনা সহায়ক :

১. বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, সিগনেট প্রেস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা
২. তরুণ মুখোপাধ্যায়, কাব্যনাট্য বিভাবনা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা
৩. ডঃ কনিকা সাহা, আধুনিক বাংলা কাব্য নাটক উদ্ভব ও বিকাশ, সাহিত্যলোক, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪
৪. সম্পাদনা ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, ঢাকা ১০০০

ভারতীয় মননে রবীন্দ্রচর্চার পটভুমিতে শন্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা

পঞ্চানন দেওয়াশী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির গভীরতা, কল্পনার ব্যাপকতা, শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা এত বিশাল যে রবীন্দ্রনাথ শুধু দেশকালের সীমায় আবদ্ধ থাকেননি । তাই এই বীর পুরুষকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল যা রবীন্দ্র পর্ব নামে পরিচিত । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে ছিলেন দার্শনিক, প্রকৃতিবাদী, মনস্তাত্ত্বিক । তাঁরই প্রতিফলন ঘটেছে তার একাধিক কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পে । তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্কে অতি নিবিড় করে দেখেছেন । তাঁর মতে প্রকৃতির মধ্যে খারাপ কিছু থাকতে পারে না । প্রকৃতির সান্নিধ্যে এলে সমস্ত কিছু সামাজিক কুসংস্কার মুছে গিয়ে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর হয়ে ওঠে তারই প্রমাণ স্বরূপ উঠে এসেছে 'গীতিমাল্য' কাব্যের অন্তর্গত 'সুন্দর' কবিতার মধ্যে-*

"এই লভিনু সঙ্গ তার,   সুন্দর হে সুন্দর ।
পূর্ণ হল অঙ্গ মম,   ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর
আলোকে মোর চক্ষু দুটি   মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদয়গগনে পবন হল   সৌরভেতে মন্থর
সুন্দর হে সসুন্দর ।।"

রবীন্দ্রনাথের মতে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠতে পারে সকল মানুষের প্রেম প্রীতি ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে । বর্তমান সমাজে নারীরা কত অবহেলিত,কত লাঞ্ছিত । একবিংশ শতাব্দিতেও পণপ্রথার জন্য বহু নারীকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে । তারই উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরেছেন "দেনাপাওনা" গল্পে নিরুপমা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে । নিরুপমার অকাল মৃত্যুর পর তার শাশুড়ি বিবাহের জন্য পুত্রকে একটা চিঠিতে লিখেছেন "এবার বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতেনাতে আদায়"। এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজে নারীদের স্থান কোথায় তারই স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন । তিনি বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য 'রাখি বন্ধন' উৎসব শুরু করেছিলেন । ভাই-বোনের

সম্পর্ককে আরও নিবিড় ভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য ঠাকুর পরিবারে প্রথম ভাইফোঁটা উৎসব পালন করা হয় ।

সূচকশব্দ: *প্রকৃতিবাদী, মনস্তাত্ত্বিক, ভাতৃত্ববোধ, ভাইফোঁটা, রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষণ পদ্ধতি ।*

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা ও গানে তরুণদের জয়গান গেয়েছেন এই প্রসঙ্গে- "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "সবুজের অভিযান" কবিতাটি-

"ওরে আমার নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।"

তিনি কোনোদিন পুঁথিগত শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না । হাতে কলমে কাজ শেখাকে যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করতেন । এইজন্য তিনি বোলপুরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সেখানে এখনো পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ শেখানো হয় । তিনি নিজে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন । ফলস্বরূপ উঠে এসেছে "দুই বিঘা জমি" কবিতায় উপেনের মতো চরিত্র "রক্তকরবী" নাটকে রাজার মতো চরিত্র ।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হল হাতে করে নিয়ে যাওয়া সময়ের আয়না-যেখানে সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটেছে । যে আয়নায় আমরা সর্বপ্রথম মানুষের অন্তর্জগতের প্রতিফলন ঘটেছে । যেমন "চোখের বালি" উপন্যাসে বিনোদিনী নামক এক বাল্যবিধবার হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক টানা-পোড়েনের নিপুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি" সূচনাতে তিনি নিজেই বলেছেন-"আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র । বাইরে থেকে কোন ইশারা এসেছিল আমার মধ্যে, সে প্রশ্নটা দুরূহ । ঠিক করতে হল এখানকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে । শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হতো এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে । এখানকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয় । তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয় । তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুমনা তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই

কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে । মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বের গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি । চোখের বালি গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুন করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা । এই ঈর্ষা মহেন্দ্রর সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করতো না । যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে এলো হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে । সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো । সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে ।”

রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে” উপন্যাসটির মধ্যেও সমাজ চিত্রের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ শুধু অংশগ্রহণই নয় রীতিমতো নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন তিনি নিজেকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় । তাঁর পক্ষে স্বদেশীকতার নামে উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি, আসলে এটি একটি ত্রিমাসিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস । এই উপন্যাসের নায়িকা বিমলা তার স্বামী নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ এর আগমনের পর থেকে এক অদ্ভুত মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে । তখন নিখিলেশের থেকে সন্দীপকেই তার মনে হতে থাকে পৌরুষবান, বেশি আকর্ষণীয়, শক্তিশালী বলে । সন্দীপের মুখচ্চারিত “বন্দেমাতারাম” ধ্বনিতে সে তখন মহোচ্ছন্ন। সন্দীপের প্রদর্শিত পথই তার কাছে মনে হয় এক এবং অদ্বিতীয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মোহভঙ্গ ঘটে । স্বামী নিখিলেশের অসীম ধৈর্যে এবং সহায়তায় তাকে সন্দীপ প্রদর্শিত পিচ্ছিল পথ থেকে ফিরিয়ে আনে । ঘরের বাঁধন শিথিল হলেও তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় বাইরের জগতের উদার আকাশ । সেই আকাশে সে ডানা মেলে দেয়-প্রাণভরে মেলে দেয় মুক্তির স্বাদ ।

রবীন্দ্রনাথের গানকে বোঝার শেষ নেই । তার গানগুলি যেন বাঙালির মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে । তাই আমরা বলতে পারি রবীন্দ্র সংগীত হল একটা দায়িত্ব, তাকে যে রুপে পূর্বজদের কাছ থেকে বর্তমান প্রজন্ম লাভ করছে, সেই রূপে তাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন- “আমার গান মানুষকে গাইতেই হবে ।” নিজের সৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই দৃঢ়চেতা মন্তব্যই প্রমাণ করে যে তিনি কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন । সুতরাং আধুনিক প্রজন্ম

হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এই কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করে তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে অবিকৃত ভাবে এই দায়িত্বকে পালন করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রবীন্দ্রসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো ।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার শুধু বিরোধিতা করেই থেমে থাকেনি ,তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি **১৯০১** খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্য পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন আছে। তিনি গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের ওপরও এখানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি বলতেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক না থাকলে আর যা হোক শিক্ষার আদানপ্রদান সম্ভব হয় না ।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় । বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন-"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে,বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেবো । কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে"। তিনি বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন ।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

(ক) রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা করবে, এবং স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে ।

(খ) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির কোলে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন- তাই আজও শান্তিনিকেতনে খোলা আকাশের নিচে, গাছের তলায় বসে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে।

(গ) শান্তিনিকেতন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজ ও সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে । ফলে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়তালিকার মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি ।তিনি বলছেন সময়তালিকা হবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী ।

(ঙ) জাতি, ধর্ম , বর্ণ, আর্থিক বৈষম্য , আর্থাৎ কোনোরকম পার্থক্য এখানে করা হয় না। এইখানে ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে শিক্ষালাভ করে ।

(চ) শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের শৈশবকাল থেকেই শিশুরা যাতে ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজে গর্ব অনুভব করে, সে চেষ্টা এই শিক্ষাব্যবস্থায় আছে ।

(ছ) শান্তিনিকেতনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচলিত আছে। যথার্থ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত একথা রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন । তাই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মাধ্যম হল মাতৃভাষা ।

(জ) শান্তিনিকেতনে নানা রকম কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষি কাজ ও উদ্যান পরিচর্যার শিক্ষা দেওয়া হয় ।

(ঝ) সমাজসেবা ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । একদিকে যেমন সমাজসেবা মূলক কাজে যুক্ত হয়,অন্যদিকে পল্লীর উন্নয়নের সাথে যুক্ত হয় । এই দুটি কাজই শান্তিনিকেতন শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যিক ।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখ করেননি । তবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুশীলন, প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, সৃজনধর্মী কাজকর্ম প্রভৃতি মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন, শিক্ষক তাঁর প্রয়োজনমতো পদ্ধতি উদ্ভাবন করে পড়াবেন । তিনি প্রাচীন তপবনের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । তিনি মনে করতেন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে সেখানে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় । শ্রেণি শিক্ষণের গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তে তিনি প্রকৃতির খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন । এ ছাড়াও শিক্ষার্থীকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ে যৌথ জীবনযাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলন ।

তিনি সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন । তিনি বলেছেন ইতিহাস, ভূগোল,বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষযগুলি সহজ-সরলভাবে সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখাতে হবে । শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব স্পষ্ট । ইরেজি মাধ্যমে শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য হল- আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিচ্ছেদ । এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হল পরভাষায় শিক্ষা, শিক্ষায় পরধর্ম, মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম । স্বাভাবিক বাহন । “শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ”। ইংরেজি ভাষা মাধ্যম

হওয়াতে শিক্ষার্থীদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় ভাষা শিক্ষায় । উপরন্তু এই শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় দেশের জনসাধারণের নিকট এই ভাষা পৌছোয় না । মাতৃভাষায় শিক্ষা নয় বলে শিক্ষালয়ে বিষয়গুলি প্রাণের সামগ্রী হয়ে ওঠে না । শিক্ষিতরা, অশিক্ষিতই থেকে যায় ।

তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টির অসংখ্য ফসল ক্ষেত্র । রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু প্রসঙ্গ একাধিক বার এসেছে । তাই তিনি মৃত্যু সম্পর্কে “ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী” কাব্য গ্রন্থে বলেছেন-

“মরণ রে ।
তুঁহু মম শ্যাম সমান”।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা একথা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমান প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়েছে । তাই তিনি বিরাজ করছেন আমাদের মর্মে, তথা মননে ।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, শুভম পাবলিকেশন, কলকাতা, 200৭ ।

২. রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, শুভম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২00৫ ।

৩. রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, শুভম পাবলিকেশন,কলকাতা, ২00৩ ।

৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিকেশন, ২0১৯ ।

৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি, ২0১0 ।

৬. “চার অধ্যায়” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, পুনশ্চ,কলকাতা, জানুয়ারি ২00২ ।

৭. রবীন্দ্র সাহিত্যর চার দিগন্ত, তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থবিকাশ পাবলিকেশন, ২00৯ ।

৮. রবীন্দ্র চেতনায় শৈশব, রেখা রায়চৌধুরী,দীপায়ণ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৪।

৯. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,বিশ্বভারতী প্রকাশনী,সাধারণ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪।

১০. গীতবিতান (অখন্ড),রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,প্রেম (৭০),সাহিত্যম,কলকাতা, ১৪০৯ পৃ:২৭৮।

১১. রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চার একত্রে ররবীন্দ্রনাথ,অমিতাভ চৌধুরী,১ম খন্ড,দেজ পাবলিশিং কলকাতা,জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫,পৃ:৪৯।

১২. শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষা দর্শন, সুশীল রায়, বুক হাউস ২৭,সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, ২০০১ ।

১৩. সাম্প্রতিকালীন ভারতীয় শিক্ষার ধারা,ড.দেবাশিস পাল,ড.দিলীপ কুমার ঠাকুর, সামিদুল হক,রীতা বুক হাউস,কলকাতা-০৯,২০১৪ ।

উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন ও সুকান্তি দত্তের ছোটোগল্প

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষক (পিএইচ. ডি), বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ১৯৯১ *সালে ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পর দেশ যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা প্রবণতার দিক থেকে মূলত অর্থনৈতিক। তবে এর মাধ্যমে দ্রুত বদল ঘটতে থাকে উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সেইকারণেই উৎপাদনব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি কিংবা সাহিত্য—পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই। শুল্কের প্রাচীর সরিয়ে নেওয়ার পর দ্রুতগতিতে দেশের বাজার ছেয়ে যায় বিদেশি ভোগ্যপণ্যে। প্রযুক্তির জগতেও আসে জোয়ার। পূর্বের তুলনায় মানুষের জীবন সর্বার্থেই হয়ে ওঠে গতিময়। কর্মসংস্থানের ধরনও পাল্টে যেতে থাকে। পারিবারিক গঠন কিংবা ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বহু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে মানুষের মননের জগৎ। প্রজন্মের তফাতে মানসিক দূরত্ব, মূল্যবোধ কিংবা চাওয়া পাওয়ার দিক থেকেও অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যেতে থাকে। আর এই সবকিছু ছাপ রেখে যেতে থাকে সমকালীন সাহিত্যে, যার অন্যতম হল বাংলা ছোটোগল্প। মুক্ত অর্থনীতি পরবর্তী নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন যে যে লেখক, তাঁদেরই একজন হলেন সুকান্তি দত্ত (১৯৬৫)। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের নিরিখে এই প্রবন্ধে বুঝতে চাওয়া হয়েছে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা কেমনভাবে ব্যক্তি মানুষ কিংবা সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।*

সূচক শব্দ : *উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, পুঁজি।*

এক

“উদারতন্ত্র প্রাথমিকভাবে একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলে। তবে রাজনীতি ছাড়া উদারতান্ত্রিক মতবাদের প্রয়োগ আছে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এবং বর্তমানে উদারতন্ত্র বলতে মূলত আর্থনীতিক উদারতন্ত্রকেই বোঝানো হয়।

উদারতান্ত্রিক মতবাদটির জন্ম সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে। তৎকালীন ব্রিটেনে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের অবসান ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই মতবাদের উৎপত্তি। এই মতবাদটির প্রাথমিক প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন জন লক।

...স্বাধীনতা, তা সে যেমনই হোক, কখনোই সম্পূর্ণতা পেতে পারে না যদি না তার পিছনে থাকে আর্থনীতিক স্বাধীনতা। সে অর্থে উদারতন্ত্রের মতবাদটিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিল আর্থনীতিক উদারতন্ত্র সম্পর্কে মতবাদটি। আর্থনীতিক উদারতন্ত্রের ধারণাটি প্রাথমিকভাবে অ্যাডাম স্মিথের। অ্যাডাম স্মিথ আর্থনীতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের মাত্রা কমানোর পক্ষে ছিলেন। স্মিথ মনে করতেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব মূলত তার নাগরিকদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা এবং জনকল্যাণমূলক কাজগুলি কার্যকর করা।

অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুগামী ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির অন্যান্য কাজ ব্যক্তি উদ্যোগপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

উদারতন্ত্র অতএব প্রচলিত কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকাঠামোটি ভেঙে একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা বলে, আর এই ভাঙনের প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় উদারীকরণ। উদারীকরণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারীকরণের মূল কথা যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান, তেমনই সামাজিক ক্ষেত্রে উদারীকরণের মূল কথা জীবনযাপনের স্বাধীনতাসমূহকে স্বীকৃতি দান। আর আর্থনীতিক উদারীকরণ বলতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্যের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াটিকে বোঝানো হয়।”[১]

উনিশশো নব্বইয়ের দশক থেকে ভারতীয় অর্থনীতি দেশীয় মিশ্র অর্থনীতি থেকে মুক্ত অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়। বলা ভালো পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়। **১৯৯১** সালে উদার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারকে বলা হতো Hindu Rate of Growth, যা **১৯৫০-১৯৮০** সময়পর্বে বাৎসরিক সর্বাধিক **৩.৫** শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে মাথাপিছু উপার্জনবৃদ্ধির হার ছিল **১.৩** শতাংশ[২]। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে নিয়ে ভারত দেউলিয়া হওয়ার দিকে যাচ্ছিল। **১৯৯১** সাল পর্যন্ত ভারত নির্দিষ্ট স্থির মুদ্রা বিনিময় নীতি মেনে চলত। অর্থাৎ তা আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠাপড়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। **১৯৯১** পরবর্তীকালে কিছুটা আন্তর্জাতিক চাপে আর কিছুটা অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতায় পি.ভি. নরসিমহা রাওয়ের (১৯২১-২০০৪) সরকার অর্থনৈতিক উদারীকরণকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক সমুদ্রে যেন গিয়ে মেশে এতদিনের আটকে রাখা ভারতীয় অর্থনীতির নদীটি। তাই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রবেশের সময় হিসাবে **১৯৯১** পরবর্তী

সময়কেই ধরা হয়। এই পরিবর্তনের ব্যাপারটি ঘটেছিল ভারতসরকারের বহিঃঋণের ক্রমবর্ধমান মাত্রা থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে। এছাড়াও ভারত ছিল ১৯৪৭ সালে সম্পাদিত গ্যাট (GATT; General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশ। এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বিশ্ববাণিজ্যকে অবাধ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ অন্য দেশের পণ্যকে নিজের দেশে ঢুকতে বাধা দেওয়ার নীতি তৈরি করেছিল, তা থেকে সৃষ্টি হয় বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা। গ্যাট চুক্তি পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি অবাধ করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয়, প্রাথমিকভাবে ২৩টি দেশ এতে স্বাক্ষর করেছিল। পাঁচ দশক ধরে এটি কার্যকর থাকার পর ডাঙ্কেল প্রস্তাব দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO; World Trade Organization) গঠিত ও কার্যকরী হওয়ার পরে (১৯৯৫) গ্যাটের অবসান ঘটে, নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১২৩ টি দেশ। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভারত সরকার বহুকাল ধরেই ঋণ নিচ্ছিল। রাজীব গান্ধির (১৯৪৪-১৯৯১) জমানায় (১৯৮৪-১৯৮৯) বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার মাত্রাও দ্রুত বাড়ে। ফলস্বরূপ ১৯৯১ সালে ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৭০ বিলিয়ন ডলার। যার শতকরা ৩০ ভাগ নেওয়া হয়েছিল বেসরকারি মহাজনদের কাছ থেকে। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হন নরসিমহা রাও। তাঁর জমানায় (১৯৯১-১৯৯৬) তিনি এমন এক সাহসিকতার পরিচয় দিলেন যা তাঁর চেনা স্বভাবের সঙ্গে বেমানান। তিনি অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করলেন ড. মনমোহন সিংহকে, যিনি এর আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসচিব ও গভর্নর হিসাবে কাজ করেছেন। অর্থমন্ত্রী স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা পেয়ে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটালেন, আমদানির উপর থেকে কোটা সরিয়ে দেওয়া হল, শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল, রপ্তানিকে উৎসাহ দেওয়া হল এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হল। অভ্যন্তরীণ বাজারও খুলে দেওয়া হল। লাইসেন্স-কোটা-পারমিট রাজ বহুল পরিমাণে তুলে দেওয়া হল।[৩] রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসারণকে নিরস্ত করা হল। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে প্রণীত নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল শিল্পের জন্যই লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা উঠে গেল। সেই সময় থেকে ভারতীয় বাজারে বিশ্ব পুঁজির প্রায় অবাধ প্রবেশ ঘটায় তা ভারতীয় অর্থনীতিকে বিভিন্ন উপায়ে রূপান্তরিত করেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ভারত সরকার দশ হাজারেরও বেশি বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের ফলই হল বিশ্বায়ন, যা সমগ্র পৃথিবীকে পরিবর্তিত করেছে । বিশ্বায়ন হল সেই পদ্ধতি, যাতে ব্যবসায়িক পুঁজি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বায়নের মূল কথাটি হল বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তোলা, যাতে পণ্য, পরিষেবা, প্রযুক্তি, পুঁজি এবং শ্রমশক্তির দেশান্তর গমনে কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকে। দুই বা ততোধিক দেশের রাজনৈতিক সীমারেখা যেন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়ন্ত্রক পুঁজিসংলগ্ন সংস্কৃতিরও বিশ্বায়ন ঘটে।

আজকের বিশ্বায়নের বিশ্বগত পটভূমি তৈরি হতে শুরু করে ১৯৭০-এর দশক থেকে। ১৯৭৩ সালে OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ভুক্ত দেশগুলি একজোট হয়ে তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং বিপুল সম্পদ আয়ত্ত করে। তারা এই টাকা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার কাজে লাগায়। কিন্তু আশির দশকের গোড়াতে ঋণসংকট তৈরি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দেয়। ঋণ নয়, তারা চাইছিল বিদেশি বিনিয়োগ। এই সময়ে উন্নত দেশগুলিতে মন্দা চলছিল। তারাও চাইছিল বাইরের বাজার। ফলে দুই চাহিদা মিলে মিশে তৈরি হয় দেশে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগের রাস্তা সুগম করে দিতে বিকাশশীল দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনেই বাধ্য হয় খোলামেলা নীতির দিকে ঝুঁকতে। এ ব্যাপারে তাদের চাপ দিতে শুরু করে উত্তমর্ণ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো সংস্থাগুলি। আস্তে আস্তে বিশ্বায়ন শব্দটি হয়ে দাঁড়ায় এই সমস্ত দেশের জপমন্ত্র।[৪]

বিশ্বায়নের মূল স্তম্ভ তিনটি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি। এর মধ্যে লগ্নিপুঁজির প্রবাহ বিংশ শতকের শেষ দুই দশকে এত বেশি বেড়েছে যে, পণ্যবাণিজ্য বা বিনিয়োগের বৃদ্ধি তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। লগ্নিপুঁজির এই প্রবাহ ঘটেছে তিনভাবে—বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সরকারি ও বেসরকারি শেয়ার ও ঋণপত্রের কেনাবেচার মাধ্যমে।[৫]

বিশ্বায়নের ফলে ভারতে দেশীয় কোম্পানিগুলির পাশাপাশি বিদেশি কোম্পানিগুলিও অবাধে প্রবেশ করতে থাকে ভারতীয় বাজারে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে মহার্ঘ ভোগ্যপণ্য ও প্রযুক্তিগুলি দ্রুত মধ্যবিত্তের নাগালে আসতে থাকে। নিম্নবিত্তরাও এর সুফল ধীরে

ধীরে পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে পথ চলতে শুরু করা ভারতের সরকারি দূরদর্শনের মুষ্টিমেয় চ্যানেলের পাশাপাশি ১৯৯৩ সাল থেকে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলের প্রবেশ ঘটে। আর এই ব্যবস্থার হাত ধরে দ্রুত বিদেশি চ্যানেলসমূহও এসে হাজির হয়। ১৯৬২ সালে যে ভারতে মাত্র ৪১টি টেলিভিশন সেট ছিল, ১৯৯৫ সালে গিয়ে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি, দর্শক সংখ্যা পৌঁছায় ৪০ কোটিতে আর চ্যানেলের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে যায়।[৬] ১৯৯৫ সালের ৩১ শে জুলাই ভারতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সূত্রপাত হয়, আর তার সাক্ষী থাকে কলকাতা। মোদী-টেলস্ট্রা নামক প্রথম মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাটি ছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মোদী ও টেলস্ট্রা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগ।[৭] ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার নব্বই শতাংশের উপরে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী। ১৯৯৫ সালেই প্রথম দেশের সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য চালু হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। কম্পিউটার প্রবেশ করে ব্যক্তি মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করে। দ্রুত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করেন। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ১২১ কোটিতে।

দুই

বিশ্বায়নের প্রভাবে উৎপাদনব্যবস্থা ও পদ্ধতির যে পরিবর্তন এসেছে, তা প্রভাবিত করেছে উপরিকাঠামোকেও। সাহিত্য উপরিকাঠামোর অংশ। এই অবসরে সেই ক্ষেত্রটিতেও যে পরিবর্তনের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। স্বভাবতই বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রটিও বিশ্বায়নের নানান চিহ্ন কিংবা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটাতে শুরু করে দিল বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই। এই নতুন যুগের ছোটগল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল বিশ্বায়ন, বিনোদন কিংবা দ্রুত সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে যাওয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও তার ব্যবহার। শুধুমাত্র এই বিষয়গুলিতেই যে বাংলা ছোটোগল্পের জগৎ সীমাবদ্ধ থাকল তা নয়, বরং বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পুঁজির প্রভাবে পরিযান কিংবা মেধা ও শ্রমের দেশান্তরগমন--এ সবই হয়ে উঠতে লাগল ছোটোগল্পের বিষয় আশয়। পাশাপাশি ছোটোগল্পের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করতে থাকল বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিভাষাসমূহ। চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহার হওয়া শব্দগুলি অনায়াসে জায়গা করে নিতে থাকল লেখকের বাকভঙ্গীর অংশ হিসাবে। বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেশারও বৈচিত্র্য বহুগুণ বেড়ে গেল।

এইসব বৈচিত্র্যময় পেশাসমূহের সঙ্গে যুক্ত লেখককুলের অভিজ্ঞতা বাংলা ছোটোগল্পের ধারাটিকে পরিচালনা করল বিভিন্ন গন্তব্যে। বিশ্বায়নের ফলে মানুষের জীবনে যান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তার মনের দিকটি ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকল। দেখা দিল নতুন নতুন মানসিক বিকার। আর সেইসব জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার রাস্তাও অন্ধগলির অভিমুখেই মানুষকে ঠেলে দিতে থাকল। নতুন ধরনের এই সংকটকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং মননের রসে জারিত করে বাংলা ছোটোগল্পে প্রবেশ করালেন এইসময়ের ছোটোগল্পকাররা।

তিন

উদারীকরণ, বিশ্বায়ন এবং তার দ্বারা সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ধরনের বদল এনেছিল তা এই সময়ে ক্রিয়াশীল যে ছোটোগল্পকারদের লেখায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ধরা পড়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুকান্তি দত্ত (জন্ম ১৯৬৫, নিউ ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ)। বিদ্যালয় জীবনেই অবশ্য তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। লেখায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নয়ের দশকে। সে-পর্যায়ে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। সেই থেকে তিন দশক ধরে নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন একশো তিরিশটিরও বেশি গল্প, বেশ কয়েকটি উপন্যাস-উপন্যাসিকা ও অন্যান্য গদ্য। চারটি গল্পগ্রন্থসহ উপন্যাস প্রবন্ধ মিলিয়ে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার, নীললোহিত সম্মাননা, ভাষা-শহিদ বরকত স্মরণ পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননা। তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প* (জানুয়ারি ২০২০)-এর ভূমিকায় সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় সার্থকভাবেই বলেন—

> "নব্বই দশকে যে তরুণ প্রজন্মের লেখকরা বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অবশ্যই সুকান্তি দত্ত ছিলেন অন্যতম উল্লেখ্য প্রতিশ্রুতিবান।"

যে সময়ে লিখতে এলেন এই তরুণ লেখক, সেই সময়টিকেও অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করে সাধন চট্টোপাধ্যায় জানান—

> "ঊননব্বইতেই সরকারিভাবে সোভিয়েত-এর পতন ঘোষণা, বিশ্বায়ন বা বিশ্বপুঁজির বদলচরিত্রের রূপ কর্পোরেটায়নকে একানব্বইতে আমাদের তৎকালীন সরকারের সিলমোহর, বাবরি মসজিদ ভাঙা, ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান, টেররিজম এবং প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষকে

> বিচ্ছিন্নতাবাদী সত্তায় রূপান্তরিত করে দেওয়া, হেডোনিজম বা ভোগ্যসংস্কৃতির রমরমায় দিকে দিকে রব উঠে গেছিল পরিবর্তন এবং উন্নয়ন।
>
> ভাবনার জগতে, তত্ত্বগতভাবে নিত্য নতুন ইউরোপের ঢেউ এসে, আমাদের যা কিছু চিন্তার পুঁজি বাতিল বলে ঠেলে দেওয়া হল। উত্তর আধুনিক, গ্র্যান্ডন্যারেটিভ ভেঙে পড়া, সাবঅলটার্ন চেতনা থেকে লিঙ্গবৈষম্য, সাইবার জগৎ থেকে সত্য উৎপাদন, এন জি ও, পরিবেশ আন্দোলন—পৃথিবী যেন রেনেসাঁ পরবর্তী জগতের ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দর্শনগত নানা খণ্ড খণ্ড সত্যের সন্ধানে ছুটল। কোথাও কোনো অমোঘতা নেই; পৃথিবী এসে দাঁড়াল এক দর্শনগত সংকটের মুখে।

সুকান্তি বা নব্বই দশকের সচেতন লেখকদের প্রজন্ম এমনই প্রেক্ষিতে সাহিত্যচর্চা করতে এসেছিলেন।"

তিন দশক ধরে প্রকাশিত গল্পের মধ্যে ১৯৯৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে লিখিত তেইশটি গল্পকে নির্বাচন করে প্রকাশিত হয়েছে সুকান্তি দত্তের *শ্রেষ্ঠ গল্প* (অভিযান, জানুয়ারি ২০২০)। তাঁর এই তেইশটি গল্পের বেশিরভাগেরই অন্যতম বিষয় কিংবা চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন ও তার বাজার অর্থনীতি। লেখকের কলমে গল্পগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা নয়, বিশ্বায়ন কিংবা বাজার অর্থনীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় কেমন চেহারা নেয়, তাঁর এই ছোটোগল্পগুলি পাঠকের সামনে তা তুলে ধরে সুনিপুণ ভঙ্গীতে। গল্পের বিষয় কিংবা অনুষঙ্গে অবধারিতভাবে এসে যায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও বিবর্তন, বিশ্বায়ন বনাম ব্যক্তির মননের বিরোধ তথা অসহায়তা, শ্রমিকের ক্ষুধা আর ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা পুঁজিমালিকের ভাবনাগত অবস্থান, পাশাপাশি এক একটি গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে বিশ্বায়িত এই দুনিয়ায় ব্যক্তি ও পরিবার সম্পর্কের বদলসমূহ। গল্পে জায়গা করে নেয় বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার সাপেক্ষে মানুষের অবস্থান। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের কাছে এই সময় ও প্রতিবেশ কেমন ভূমিকা নিয়েছে, তা গল্পের কাহিনিসূত্রে চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন। আর এই নির্মাণের অবসরে তাঁর কলম ছোটোগল্পে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে লেখকের নিজস্ব পাঠজগতের বহু অভিজ্ঞতাকে। তাই তাঁর ছোটোগল্পে পাঠক আবিষ্কার করে নেন রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন কিংবা জীবনানন্দ দাশ পাঠের গভীর উপলব্ধি কোথাও কোথাও চেতনার প্রকাশে লীন হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বায়ন শুধু যে তাঁর ছোটোগল্পে চালিকাশক্তি হয়ে উঠে ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিমননকে নিজ অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এমনটা একমাত্রিকভাবে সত্য হয়ে ওঠেনি; বরং তাঁর এই তেইশটি ছোটোগল্পের অন্তত বেশ কয়েকটিতে বিশ্বায়নের স্রোতের নীরব কিংবা সরব বিরোধিতায় উজ্জ্বল একাধিক চরিত্রের দেখা পান পাঠক। ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতের অন্তরালে লেখকের রাজনৈতিক চিন্তাধারাটিকেও পাঠক আবিষ্কার করে নিতে পারেন পাঠ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই ক্ষেত্রে লেখক তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে প্রশ্নহীনভাবে তুলে ধরেন নি; বরং একাধিক ছোটোগল্পে রাজনৈতিক আদর্শ কীভাবে ব্যক্তি এবং পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার পরিপন্থী ভূমিকা পালন করেছে, তা দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন। উদার অর্থনীতির প্রসার বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানকেও অনুকূলে আনতে পেরেছিল, যার ফল সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো হয় নি। এই সমস্ত ধরনের প্রবণতাকে আমরা দেখার চেষ্টা করব তাঁর *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এ প্রকাশিত গল্পসমূহের নিরিখে।

চার

যে তিন দশকের মানবমন ও অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিবর্তনকে তাঁর ছোটোগল্পে লেখক আত্তীকৃত করেছেন, তার একাধিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বিষয়টির অগ্রগতি মানুষকে পূর্বতন দশকগুলি থেকে আলাদা করে দিয়েছিল তা হল প্রযুক্তি, বিশেষভাবে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার। একাধিক ছোটোগল্পে মানুষের সুখ থেকে শোক পর্যন্ত প্রযুক্তি কীভাবে জড়িয়ে থাকে তার বিবরণ অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরেছেন লেখক। সেইরকমই একটি ছোটোগল্প “পর্নোগ্রাফির দিনরাত”।এই ছোটোগল্প এক সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ‘পর্নোগ্রাফি’ শব্দটিকে পাঠকের মননে হাজির করে। পাঠক উপলব্ধি করেন মনহীন শরীরের সাধনা ব্যক্তি মানুষকে সম্পর্কসমূহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ্যপণ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশে নারী পুরুষ হারিয়ে ফেলে সম্পর্কের অন্তর্লীন প্রেমকে। আর সেই প্রেমহীন দাম্পত্যকে পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর কিই বা মনে করা যায় ? সম্পর্কের যে নৌকায় বহুদূর পাড়ি জমানোর অঙ্গীকার নিয়ে একটি দম্পতির যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রেমহীন সেই দাম্পত্যের ফাটল দিয়ে হু হু করে প্রবেশ করতে থাকে ব্যভিচার আর তার বাহক হয়ে ওঠে তথ্য-প্রযুক্তির স্রোত--

> “বাংলা পর্নোগ্রাফির সিডির প্রিন্ট সাধারণত ভালো হয় না। অস্পষ্ট, ক্যামেরার ঝাঁকানি, কখনও বা আলো কম। এটা কিন্তু বেশ ঝকঝকে। বাবুরাম ভক্ত, অফিসে কম্পিউটার ও তা সম্পর্কিত সব কিছুর সাপ্লায়ার,

> সিডিটা হাতে দিয়ে বলেছিল—আজ রাতে দেখবেন স্যার, একদম ফাটাফাটি।” (শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃষ্ঠা ১৩৩) ।
>
> “...ইন্টারনেট-তরঙ্গ বেয়ে যজ্ঞের রথ ছুটে চলে, ডলারের থলি হাতে উন্নয়নের খই ছুড়ে দিয়ে সে ছুটে চলে দুদ্দাড়, শুনতে পাও কি তুমি? সময়ের আগ্নেয়গিরি থেকে ধেয়ে আসা লাভাস্রোত আমোদ-সংস্কৃতির পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে তোমায়।” (ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৭) ।

“হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্ব” একটি বহুমাত্রিক গল্প। বিশ্বায়নের প্রভাবে বদলে যাওয়া মূল্যবোধ, বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে প্রতিকার না চেয়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ভগ্নীপতির সঙ্গে টাকার বিনিময়ে রফা করে নেওয়া দাদা কিংবা পুরুষতন্ত্রকে অন্তরে বহন করে চলা আধুনিক বৌদি কর্তৃক মৃত্যুকে পুঁজি করে সুবিধা আদায়ের কাহিনির পাশাপাশি এই গল্পের শুরুতেই অবধারিত স্বাভাবিকতায় জায়গা করে নেয় তথ্যপ্রযুক্তি—

> “ইলেকট্রিক-চুল্লির গনগনে গর্তে বডি ঠেসে দেওয়ার ঠিক আগ-মুহূর্তে সেলফোনে কল। হাই-ভল্যুম রিংটোনে জনপ্রিয় চটুল সুর। যদিও কোনো কান্না হা-হুতাশের চিহ্ন নেই চারপাশে, তবু বোনের শরীরটুকু চিরতরে পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসার আগ-মুহূর্ত, কার কল না দেখেই কেটে দেয় প্রলয়।” (শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃষ্ঠা ১৪২)।

লক্ষণীয়, “হাই-ভল্যুম রিংটোনে জনপ্রিয় চটুল সুর” বাক্যবন্ধের মাধ্যমে সেলফোনের মালিকের চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠককে নির্ভুল ধারণায় পৌঁছে দেন লেখক। এখানে গল্পের চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে তারই ব্যবহৃত সেলফোনের রিংটোন। “রাজগিরের চিঠি” গল্পের চরিত্র আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত জিনিসের তালিকাতেও তথ্যপ্রযুক্তির ছাপ লক্ষণীয়—সে কাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ল্যাপটপ কিংবা ই-বুক। তবে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধিক প্রভাব দেখা গিয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের শেষতম ছোটোগল্প “গল্প@ফেসবুক”-এ গল্পের নামকরণ থেকে চরিত্র কিংবা তাদের জীবনযাত্রা—সবক্ষেত্রেই পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ফেসবুক ইত্যাদির ব্যবহার। এই সময়ের পাঠকও এতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন যে, খুবই স্বাভাবিকতার সঙ্গে এ গল্প পাঠকসমাজে গৃহীত হচ্ছে। যদিও প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেশের কত শতাংশ মানুষই বা এই জগতের সঙ্গে পরিচিত তা নিয়ে। তাঁরা কি নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের মতো দক্ষ মননের স্বাভাবিকতায় এ গল্প পড়তে পারবেন? এ প্রশ্ন সত্ত্বেও আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারি যে, আজকের দিনের টেকস্যাভি

লেখক বইয়ের কিংবা পত্রিকার পাতার বদলে সামাজিক মাধ্যমে যখন লেখেন, তখন পাঠকরুচি কেমনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা সেই পাঠকরুচি গতানুগতিকের বাইরে অন্য কোনও গন্তব্যে অগ্রসর হওয়া লেখককে কি ধরনের সমালোচনা করে। আর এই সব কিছু নিয়েই গড়ে ওঠে আর একটি গল্প। সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তথ্যপ্রযুক্তি ও সেই সংক্রান্ত পরিভাষা—

> "স্মার্টফোনের গ্যালারি ঘেঁটে ফোটোগুলো দেখছিল সৌরভ। ফোনটা বছরখানেক আগে কেনা, খুব বেশি দামি নয়, কিন্তু ক্যামেরাটা বেশ ভালো, চমৎকার ফোটো ওঠে। তারিখ ধরে ধরে পেছিয়ে যেতে যেতে আঠারোই মার্চের তোলা ফোটোগুলোর দিকে চোখ আটকে গেল তার।" (শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃষ্ঠা ২৪২)।

কিংবা—

> "কম্পিউটারে এসে ফের কি-বোর্ডে সচল হয়ে উঠল আঙুল, টাইপ-এডিট-টাইপ, একটানা চলল রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। কাল রবিবার, সুতরাং নিশ্চিন্ত। লগ অন করল ফেসবুকে, আরও অনেকগুলি লাইক পড়েছে পোস্টটায়। সদ্য শেষ করা গল্পটিতে ফের চোখ বুলিয়ে নিয়ে আপলোড করে নতুন একটা পোস্ট দিয়ে অপেক্ষা করে কয়েক মিনিট। না কোনো লাইক কমেন্ট নেই, এত রাতে কে আর জেগে আছে, লগ আউট করে শুতে চলে যায়।" (শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃষ্ঠা ২৪৩)।

পাঁচ

বিশ্বায়নের প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী হলেও সেই প্রভাব সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক স্তরে সমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়নি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তের কাছে বিশ্বায়ন পৌঁছিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ও আবেদনে। মোটামুটিভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে অভিযোজিত করতে পারলেও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ততখানি পেরে ওঠেনি। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটেও একথা প্রযোজ্য। বিশ্বায়নের ফলে একদিকে যেমন শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের কর্মনিযুক্তির প্রসার ঘটেছিল, বেড়ে গিয়েছিল কর্মকেন্দ্রিক পরিযাণ, অন্যদিকে উন্নয়নের গ্রাসে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তাদের বাসস্থান কিংবা খাদ্যনিরাপত্তা। নগর ক্রমশই গ্রাস করে নিচ্ছিল পার্শ্ববর্তী শহরতলি কিংবা গ্রামগুলিকে। দ্রুত গজিয়ে উঠছিল শপিং মল, হাউসিং কমপ্লেক্স, মার্কেট কমপ্লেক্স, ব্যাঙ্ক, প্রচুর বেসরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান,

বড়ো বড়ো উড়ালপুলে ঢেকে যাচ্ছিল আকাশ—পাশাপাশি এই স্রোতে গৃহহীন হয়ে পড়ছিল বেশ বড়ো সংখ্যার প্রান্তিক মানুষজন। পুঁজির বিপুলতার সঙ্গে তারা লড়াইয়ে পেরে না উঠে অনেকসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। কেউ বা নিজেই হয়ে উঠছিল নতুন এই বাজারের খাদ্য। আর একদিকে ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি দ্রুত নানান রূপে নিঃশব্দে বর্ধিত হয়ে চলছিল নারীমাংসের বাজার। সুকান্তি দত্ত খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের একাধিক আখ্যানে এই ব্যাপারগুলিকে তুলে ধরেছেন। এরকমই কয়েকটি ছোটোগল্প হল "আশ্চর্য হাঁড়ি ও ল্যাংড়া বিশে", "তিমিরগাথা", "উচ্ছেদ", "ফেরিওয়ালি", "বিধু বিশ্বাসের খিদে", "রাত তিনটের পর" ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে "উচ্ছেদ" গল্পটি। ঝুপড়ি উচ্ছেদ করে শহরের সৌন্দর্যায়ন ঘটানো হয়। খালের পাড়ে রোপণ করা হয় ফুলগাছ। আর তারই আড়ালে উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া মানুষদের কেউ মনে রাখে না—

> "কিছু মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্যে অনেক মানুষকে মরতে হবে পিঁপড়ের মতো—এটাই সত্য, মেনে নিতে শেখো এটা, এ প্রকৃতির নিয়ম, প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খলে ব্যাং খেয়ে বাঁচে সাপ, আবার সাপ খেয়ে বাঁচে ময়ূর—প্রকৃতির সৃষ্টি তুচ্ছ মানুষ কী করে পালটে দেবে এ নিয়ম ?...
>
> তোমার খাওয়া জুটছে না বলে তুমি ফুটপাথ দখল করে মাল বেচতে বসে পড়বে, এ চলতে পারে না। আজ ফুটপাথ দখল করেছ, কাল অন্যের বাড়িটাও দখল করে নেবে, তুমি কীভাবে খাবার জোগাড় করবে সেটা তোমার ব্যাপার, রাষ্ট্র দায়িত্ব নেবে কেন ? যে নাগরিকেরা রাষ্ট্রকে মোটা টাকা কর দিচ্ছে তাদের সুখ সুবিধার কথা ভাববে না রাষ্ট্র? তোমার থাকার জায়গা নেই, কিংবা জায়গা থাকলেও সেখানে রুজির সুবিধা নেই বলে যেখানে-সেখানে তুমি ঝুপড়ি বানিয়ে বসে পড়বে—এ চলতে পারে না। তাই উচ্ছেদ জরুরি, শুধু ঝুপড়ি কেন, আমাদের জীবন ভাবনাচিন্তা মনপ্রাণ থেকে অনেক কিছুরই উচ্ছেদ প্রয়োজন..." (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, পৃষ্ঠা ৭০-৭১)।

শুধু উচ্ছেদই নয়, বিশ্বায়ন ও তার অর্থনীতি প্রান্তিক মানুষকে ঠেলতে ঠেলতে জীবন এবং মানুষ হিসাবে সম্মানের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। ঠেলে ফেলে দেয় গভীর কোনো অসম্মানের খাদে। সেইরকম একটি গল্প "রাত তিনটের পর"। জীবন জীবিকার লড়াইয়ে হেরে যাওয়া, ঋণগ্রস্ত গোবিন্দ শেষমেশ তার নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে দেহব্যবসায় নামার অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হয় না, স্ত্রীর জন্য খরিদ্দারও ঠিক করে

আনে। ঋণ শোধ করতে না পারা গোবিন্দ উত্তমর্ণ হীরালালকে নিজের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায় বিনাপয়সায় দেহদানের দ্বারা তাকে তুষ্ট করার জন্য। আর তারই উদ্যোগে হীরালাল যখন স্ত্রী ছবির ঘরে প্রবেশ করে, তখন বাইরে ছটফট করে উপায়হীনতার আক্রোশে পুড়তে থাকে সে। গল্পের শেষে দেখা যায় গোবিন্দর অবদমিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোরকে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে। যার ফলে "রাত তিনটের পর রাষ্ট্র এসে দাঁড়াল গোবিন্দর ঘরের সামনে।" (পৃষ্ঠা ১৭৩)। এইভাবেই সাধারণ মানুষের অসহায়, মানবিকতা অতিক্রান্ত জীবনযাপন প্রণালী লেখক তুলে ধরেন অপূর্ব মুনশিয়ানায়।

ছয়

বিশ্বায়ন যেভাবে দ্রুত পূর্বতন উৎপাদনব্যবস্থাসমূহকে বদলে দিয়েছিল, তাতে পরিবর্তিত হচ্ছিল সমাজ এবং সামাজিক মূল্যবোধ। আর যেহেতু সেই সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত, তাই আরও আগে ঘটে গিয়েছিল ব্যক্তি মানুষের বদল। বিশ্ব থেকে ঘরের নিভৃত কোণ পর্যন্ত যেভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় পরিবার ও ব্যক্তি সম্পর্কের দ্রুত বদল ঘটে চলেছিল। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছিল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এই ক্ষুদ্র পরিবারগুলি প্রায়শই শহর বা সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিচ্ছিল। তাতে একদিকে যেমন পারিবারিক মূল্যবোধের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটছিল, পাশাপাশি খুব দ্রুত গৃহীত হচ্ছিল ভোগবাদী পণ্যসংস্কৃতি। এই পরিসরের মানুষদের বেড়ানোর জায়গা হয়ে উঠছিল নতুন তৈরি হওয়া শপিং মলের সুখী পরিবেশ। তবে সমস্ত বয়সের মানুষের কাছে এই বদলে যাওয়া সংস্কৃতি সমানভাবে গৃহীত হয় নি। বিশ্বায়নের সংস্কৃতিকে দ্রুত গ্রহণ করে নিয়েছিল তরুণ প্রজন্ম। মধ্যবয়সীরা সাধারণভাবে ছিলেন দ্বিধান্বিত, আর প্রবীণরা এই প্রক্রিয়া থেকে অনেকাংশে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। মূলত এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল মধ্যবিত্ত সমাজে। যেখান থেকে উচ্চবিত্ত জীবনের হাতছানিতে পরিবার ভেঙে তরুণ প্রজন্ম বেরিয়ে এসে জীবন জীবিকার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গায় বাস করতে চাইছিল। তাদের মননের গভীরে মূল্যবোধেরও সাংঘাতিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তারা পণ্য করতে শিখে গিয়েছিল মানবিক অনুভূতিকে। শোককে চাপা দিতে শিখেছিল অর্থের বিনিময়ে। উন্নতির পশ্চাতে তাদের দৌড় ছিল অন্তহীন। সুকান্তি দত্ত তাঁর একাধিক ছোটোগল্পে এই বদলগুলিকে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হল "লেবুপাতার ঘ্রাণ", "খোলা চিঠি উষসীকে", "পর্নোগ্রাফির দিনরাত",

"হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্ব", "পরমা, তোমার জন্যে", "সাবান-সুন্দরীদের কোরাস", "গল্প@ফেসবুক" ইত্যাদি। এই গল্পগুলিতে যেমন পারিবারিক সম্পর্কের বদল দেখানো হয়েছে, তার পাশাপাশি কয়েকটিতে উঠে এসেছে পরিবারের অন্তর্গত কিংবা পরিবার নিরপেক্ষ ব্যক্তি সম্পর্কের বদলের দিকগুলি। শুধু সম্পর্কই নয়, ঘটে গিয়েছে মূল্যবোধের পরিবর্তন। দ্রুত পালটে যাওয়া দাম্পত্য সম্পর্ক কিংবা সমলিঙ্গের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব সেই দিকগুলিকেই ইঙ্গিত করে। এইপ্রসঙ্গে বলা যায় উদারীকরণ কিংবা বিশ্বায়ন ব্যক্তি স্বাধীনতার যে আপাত প্রসার ঘটিয়েছিল তার ফলে পূর্বতন সমাজস্বীকৃত সম্পর্কের বাইরেও দেখা গিয়েছিল সম্পর্কের নানান মাত্রা। পরিবারসম্পর্ক আর মূল্যবোধের পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে তার উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে "লেবুপাতার ঘ্রাণ" গল্পটি---

> "বীথি বেঁচে থাকাকালীনই পঞ্চাশে পা দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার চোখের সামনে সব কিছু কত দ্রুত পালটে যাচ্ছে। সেদিনের এই কলোনিতে টাইমকলের জল এল, তারপর বছর দশেক হল দুটো মিনিবাসের রুট, একটা সি টি সি'র রুট, সকাল সন্ধ্যার দুটো কলেজ, মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল। পাড়ার দোকানেও কত অচেনা মুখের ভিড়। সবচেয়ে অস্বস্তি লাগত চেনা মানুষেরা যেন চোখের সামনে কেমন পালটে গেল। তার বন্ধুরা যারা একসময় তাদের মতে সিনেমায় নোংরা নাচ-গান-দৃশ্যের সমালোচনায় মুখর ছিল, তারাও এখন দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব কিছু ফেলে টিভির সামনে বসে সেইসব নাচ-গান উপভোগ করে।...
>
> প্রিয়নাথ জীবনে কোনোদিন মদ কী জিনিস জানেননি, জানবার আগ্রহ ছিল না বিন্দুমাত্র আর এখন মাঝেমধ্যেই তার এই বাড়িতে রাতে দোতলার ঘরে ওরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদের আসর বসায়। তা খাক, জীবন তো ওদের। বউমা বয়কাট চুল আর হাতকাটা নাইটি পরে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। প্রথম প্রথম চোখে একটু ধাক্কা লাগলেও এখন সয়ে গেছে। মাঝরাতে স্টিরিয়োতে ওরা ভিনদেশি বাজনা শোনে—এসবই প্রিয়নাথের চেনাজানা পৃথিবী থেকে অনেক দূরের, যে-কোনো ভিনগ্রহ থেকে উড়ে আসা একদল প্রাণীর মধ্যে তিনি এক আদিম মানুষ।"(*শ্রেষ্ঠ গল্প*, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)।

"পরমা, তোমার জন্যে" গল্পটি ব্যক্তি সম্পর্কের আর এক নতুন মাত্রা তুলে ধরে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা অশেষ মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। গল্পের সূত্রপাত থেকেই তাঁকে দ্বিধান্বিত দেখতে পাওয়া যায় ভ্যালেন্টাইন ডে তে স্ত্রী রঞ্জনাকে তিনি কী উপহার দেবেন তাই নিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বয়সগত পার্থক্য অনেকটাই। পার্থক্য মননগতও । দুজনের পছন্দ অপছন্দ অনেক আলাদা। আলাদা জীবনবোধও। আর তাই এই স্ত্রীর 'ভ্যালেন্টাইন ডে'র উপহার শেষ পর্যন্ত স্থির হয় প্রথমপক্ষের কিশোরী কন্যার পরামর্শে। মূল্যবোধের তফাতে দাম্পত্যের সুরটি কেটে কেটে যায়—

> "তার (অশেষ) প্রথম যৌবনে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বলে কিছু পালন করার রেওয়াজ ছিল না। তা বলে মন দেওয়া-নেওয়া কম ছিল এমন তো নয়। দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো, এসবই কমবয়েসি ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেমের উৎসব তখন...
>
> তবে তখন তো আজকের অনেক কিছুই ছিল না, ইন্টারনেট থেকে শপিং মল—কত কিছুই নতুন এখন ! কিন্তু তা বলে যৌবন শেষ করে এখন ভ্যালেন্টাইন ডে পালন ! অথচ কিছুই করার নেই তার, রঞ্জনাকে ভালোবাসা দেখাতেই হবে ! আর রঞ্জনার ধারণা যত বেশি দামের উপহার তত বেশি ভালোবাসা ! তুমি ভালোবাসো অথচ খরচ করতে পারো না, তা-লে ফোটো ! ফুটে যাও ! বউ হোক বা বান্ধবী—প্রেমিকা, কত খসাচ্ছে তাতেই ঠিক হবে তোমার ভালোবাসার ওজন । (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১)।

সাত

আগেই বলা হয়েছে যে বিশ্বায়নের প্রভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বদল ঘটেছে। সমস্ত কিছুই হয়ে গিয়েছে পণ্য, তা সে মানুষের শরীরই হোক কিংবা অনুভূতি। বিশ্বায়ন একদিকে যেমন উড়ালপুল, শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্সের রমরমা এনে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কলকারখানা। পেশাচ্যুত হয়েছে মানুষ। উপায়হীন সেইসব পরিবারের সন্তানেরা অর্থ উপার্জনে বাইরের জগতে বেরোলে নিজেরাই হয়ে পড়েছে পণ্য। বিশ্বায়ন আপাতভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসার ঘটালেও নারীকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি অনেকক্ষেত্রেই। বরং নারীই হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের পণ্য। সেইরকমই একটি ছোটোগল্প "ফেরিওয়ালি"। লেখক অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন নতুন অর্থনীতির যূপকাষ্ঠে নারীবলির এই চিত্র—

> "যৌনসম্পর্কে আবেগের কোনো স্থান নেই, তা কেবল এক পরিষেবা ! ভালোবাসা শিশুর খেলনা কিংবা জাদুঘরের প্রত্নসামগ্রী ! শরীর, শুধু শরীর, আর বেচাকেনা। পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন কেবল এক বিশাল বাজার, বাজার, শুধুই বাজার, আর কিছু নয়। শিবঠাকুর জানতে তুমি, জানতে কৃষ্ণ কিংবা রাম। জানলে বাজার-দেবতার কথা। যে দেবতা ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, জগৎজুড়ে উচ্চৈঃস্বরে আবাহন জানায় তাকে অগণিত মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ। বাজার-দেবতার গ্রাস থেকে মুক্তি নেই কারও। নারীমাংস তো সুস্বাদু খুবই, বাজার-দেবতা ভারি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নারী-শরীরের বিকিকিনি।
>
> ... ফেরিওয়ালি, পৃথিবী এক গ্রাম এখন। গ্রাম জুড়ে আগুন। আগুন মাটি ও জলে। আগুন প্রেমে ও কবিতায়। আগুনের ভেতর ডলার সংগীত। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভারত, ম্যানিলা, মুম্বাই, কলকাতা, সব একাকার। ভোগ বিনা গীত নেই, বাজার বিনা গতি নেই, হোটেল রিসর্ট বা সেক্স ট্যুরিজম—টিনা, টি আই এন এ, দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ !
>
> তুমি বড়ো বোকা ফেরিওয়ালি। কলকাতার এক প্রান্তে জীর্ণ এক ফ্ল্যাটে শুধু তিনটি মানুষের চোখের পাতা ভিজে উঠছে বারবার উদবেগে সংশয়ে, তারা এখনও জানে না তুমি লাশ হয়ে গেছ !" (*শ্রেষ্ঠ গল্প,* পৃষ্ঠা ৮৩, ৮৫)।

শুধু নারীমাংসই নয়, মানুষের ক্ষুধার মতো অনুভূতিকেও ব্যবহার করতে কিংবা পণ্য বানাতে চায় বহুজাতিক সংস্থাগুলি। খিদে ও খাদ্যাভ্যাসকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করতে চান তাঁরা। খানিকটা কল্পবিজ্ঞানধর্মী গল্প "বিধু বিশ্বাসের খিদে"তে লেখক সেই কথাই তুলে ধরেন—

> "বহুজাতিক সংস্থার জাঁদরেল এম ডি অবশ্য এদের সঙ্গে একমত নন। তিনি জানালেন, বিধু বিশ্বাসের খিদে নিয়ে এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বরং বাজারের স্বার্থে এই অভিনব খিদে ও খাদ্যাভ্যাস কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তাই প্রকৃত কাজের কাজ। বিশ্ব জুড়ে ঠিকা শ্রমিক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ছে। এতে সুবিধা অনেক, বাজারে মালের চাহিদা থাকলে শ্রমিক নেওয়া যায়, আবার চাহিদা না থাকলে বসিয়ে দেওয়া যায়—ইউজ অ্যান্ড থ্রো। তা ছাড়া আগের মতো শ্রমিককে আর কোনো নির্দিষ্ট কারখানার দাসত্বে বাঁধা পড়ে থাকতে হচ্ছে না, মুক্ত বাজারে শ্রমিকও এখন মুক্ত ! এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক যদি স্রেফ মাটি বা ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, মন্দ কী ? খাওয়ার

খরচ নেই বলে মজুরিও খানিক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে !" (*শ্রেষ্ঠ গল্প*, পৃষ্ঠা ১০৫-৬)।

আট

সুকান্তি দত্তের গল্পে শুধুমাত্র বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবান্বিত চরিত্ররাই যে থাকে তা নয়, বরং বেশ কিছু গল্পের চরিত্রদের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের স্রোতের পরিপন্থী ভাবনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। সেইরকম কয়েকটি ছোটোগল্প হল "তিমিরগাথা", "গন্ধ","বিধু বিশ্বাসের খিদে","একটি অযৌক্তিক আগাছা", "সাবান-সুন্দরীদের কোরাস", "সুধাকবির সিন্দুক", "শিলাবতী", "রাজগিরের চিঠি" প্রভৃতি। "তিমিরগাথা" গল্পের তিমির এইরকমই একটি চরিত্র। কবি জীবনানন্দ দাশ যেভাবে তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* –র "অবসরের গান" কবিতায় নগর সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন কিংবা তাঁর কবিতায় যেভাবে অন্ধকার প্রিয় হয়ে উঠেছে সমস্ত উৎসাহ উদ্যমের বিপরীতে, সেভাবেই যেন সে বিশ্বায়নের উদ্যম, উৎসাহকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধকারের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে থাকতে চায়। "গন্ধ" গল্পটিতে শিক্ষক অত্রি বহুজাতিক সংস্থার বিপণনপদ্ধতির সমালোচনা করে আত্মীয়দের অপ্রিয়ভাজন হয়ে পড়ে। দেখা দেয় মূল্যবোধের সংঘাত। "বিধু বিশ্বাসের খিদে" গল্পের কথক তুলে ধরেন ঠিকা শ্রমিকদের দুর্দশা ও অবর্ণনীয় ক্ষুধার চিত্র। "একটি অযৌক্তিক আগাছা" গল্পের তপেন চক্রবর্তীকে লোকে পাগল বললেও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিপরীতে সে যেন এক মূর্তিমান প্রতিবাদ হয়ে ওঠে তার জীবনযাপন ও দর্শনে।"সাবান-সুন্দরীদের কোরাস" গল্পে অনুপম তার প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে জগুর চোলাই-বাংলা ঠেকে পৌঁছাতে চায় নিঃস্ব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশে জীবনকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। "সুধাকবির সিন্দুক" গল্পে একদা স্বপ্নবিলাসী এক কবিকে দেখা যায়, যিনি নাগরিক বিধিসম্মত জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনকে নির্বাচন করে নেন। "শিলাবতী" এক নারীর গল্প। এ গল্প আমাদের জানান দেয়, শুধু সচেতন হলেই হবে না, সেই সচেতনতাকে সমাজের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চাই। শিলাবতী সেইরকমই এক কর্মী নারী চরিত্র। এই গল্প সামাজিক বিধিব্যবস্থা কিংবা কায়েমি স্বার্থ রক্ষার্থে প্রচলিত আইন কানুনের বিরুদ্ধে যেন এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া শিলাবতী সমাজ পরিচালকদের হিংস্র দাঁত-নখের শিকার হয়। অন্যদিকে "রাজগিরের চিঠি" গল্পটিতে ভিন্নতর এক জীবনবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। গল্পের চরিত্র আনন্দদেব চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেট সংস্থার উচ্চপদস্থ ব্যক্তি

হয়েও প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক মননে ঋদ্ধ। এভাবেই লেখকের বেশ কয়েকটি গল্পের চরিত্ররা যেন বিশ্বায়নের সংস্কৃতির বিপরীত অবস্থান নিয়েছে।

নয়

সুকান্তি দত্তের *শ্রেষ্ঠ গল্প* তেইশটি গল্পের সংকলন হলেও প্রতিটি গল্পই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে সেই গল্পগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণ নয়, বরং এক বিশেষ প্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে গল্পগুলিকে পড়তে চাওয়া হয়েছে। তাই বলা যায় সেই বিশেষ প্রেক্ষিতের বাইরেও গল্পগুলিকে নিয়ে অনেক কথাই বলা বাকি রয়ে যায় সঙ্গতভাবেই। তা সে গল্পের কথনবৈশিষ্ট্য নিয়েই হোক কিংবা একাধিক গল্পে জাদু বাস্তবতার প্রভাব বিষয়কই হোক। পূর্বতন কবি কিংবা লেখকদের প্রভাব যে গল্পগুলিতে পড়েছে, আলোচনার বিষয় হতে পারে তাও। এছাড়াও গল্পগুলির মধ্যে অন্তর্লীন রাজনীতি কিংবা গল্পকারের রাজনৈতিক বীক্ষাও আলোচ্য হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু তা আরও বৃহৎ পরিসরের দাবি রাখে। তবু বিশ্বায়ন একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে কেমনভাবে সমাজ তথা ব্যক্তিমানসে, রাজনীতি-অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল তা যে অনবদ্যভাবে লেখকের কলমের মাধ্যমে ছোটোগল্পের জগতে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে সেই প্রমাণই ধারণ করে গল্পগুলি স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. *বিশ্বায়ন শব্দকোষ*, অনিন্দ্য ভুক্ত, বাংলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_rate_of_growth Accessed on 03/03/2020
৩. *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ*, রামচন্দ্র গুহ (অনু. আশীষ লাহিড়ী), কলকাতা, আনন্দ, ২০১৬, পত্রাঙ্ক ৬২২-২৩
৪. *বিশ্বায়ন শব্দকোষ*, অনিন্দ্য ভুক্ত, বাংলার মুখ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৫
৫. পূর্বোক্ত
৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_India Accessed on 03/03/2020
৭. https://www.news18.com/news/tech/on-this-day-20-years-ago-the-first-mobile-phone-call-was-made-in-india-1028471.html Accessed on 03/03/2020

ভূদেবের জাতীয়ভাবের ধারণায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

মিলন কিস্কু
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পোলবা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *বর্তমান ভারতের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পে নিমজ্জিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে অসহিষ্ণুতা।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক স্লোগানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাছে।ফলত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে – তাহলে কী ভারতের জাতীয় সত্ত্বায় সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের কোন স্থান নেই, ভারতের জাতীয়তাবাদ কি শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদ? উক্ত সমস্যা সমাধানে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কি চিন্তা ভাবনা করে ছিলেন অর্থাৎ জাতীয়ভাবের ধারণায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কি চিন্তা ভাবনা করে ছিলেন। এই প্রবন্ধে সেটাই আলোচনা করা হবে।*

মূল শব্দ: *ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়ভাব।*

মূল নিবন্ধ:

ভূদেবের জাতীয়ভাবের ধারণা:

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) বাংলা নবজাগরণের অন্যতম জ্যোতিষ্ক যদিও বাঙালীর কাছে ততটা পরিচিত নন। অসীম দাশগুপ্ত যাকে ‘Forgotten Brahim’ বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] এছাড়া সুদীপ্ত কবিরাজ যাকে মনে করেছেন “Only social theorist that the celebrated age of the Bengal renaissance produced”.[2] সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়ভাবের ধারণাটি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে । তিনি মনে করেন যে, জাতী ও জাতীয়তাবাদ, এই দুটি বিষয়ের উৎপত্তি ঘটেছে প্রাশ্চাত্যে এবং এই দুটি বিষয় হল আধুনিকতার ফসল । ভূদেব মনে করেন যে, প্রাশ্চাতে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ প্রকৃতি, কারণ প্রাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ Self monitoring এবং Consciousness of Separateness ধারণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ এই জাতীয়তাবাদটি একী ভাষা, এবং ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে, এছাড়া প্রাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ অন্য ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষকে অঙ্গীভূত না করে বহিরাগত করে রাখে, যা ভূদেব মেনে নিতে পারেন নি। এছাড়া ভুদেব মনে করেন যে , প্রাশ্চাত্য

জাতীয়তাবাদ একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে। এই জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় চেতনা ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।– যা ভূদেবের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে নি।

এই কারণে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধে' কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানের বিষয় ছিল জাতীয়ভাবের অনুসন্ধান। তবে তিনি এক্ষেত্রে প্রাশ্চাতের অনুকরণে জাতীয়তাবাদ কথাটি গ্রহন করেন নি। তিনি জাতীয়তাবাদ কথাটির পরিবর্তে জাতীয়ভাবের কথাটি গ্রহণ করেছেন। ভূদেব জাতীয়ভাবের ধারণার ব্যাখ্যাকালে তিনি মনে করেন যে, দেশের স্বাধীনতা না থাকলে জাতীয়ভাব পরিবর্ধনের চেষ্টা করা কোনোমতেই বিরম্বনা নয়। এই প্রসঙ্গে তার অভিমত প্রণিধানযোগ্য "কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয় - জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারানো জিনিসটির অনুসন্ধান নয়।"[৩] আসলে ভূদেব জাতীয়ভাবের ধারণায় ভারতের স্বকীয়তার অনুসন্ধানে পশ্চিমী অনুকরণের তীব্র বিরোধী ছিলেন, অথচ তিনি পশ্চিমীকে পুরোপুরি বাতিল করার কথা বলেন নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য "আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন।[৪] মূলত ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধের' কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় রাজনৈতিক হলেও পদ্ধিগত ভাবে তিনি সামাজিক উপাদানকে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং এক সামাজিক প্রস্তুতির জন্য ভারতবাসীকে তৈরি হতে বলেছেন।ভুদেবের এই সামাজিক প্রস্তুতি সাম্প্রদায়িক ছিল না বরং তা ছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী এবং তিনি এটিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভূদেব জাতীয়ভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে কোন জাতির স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কোনদিনই একবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাহ্য প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেইকারণ পুরুষ- পরম্পরাক্রমে কার্য্যকারী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটি মানুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে।"[৫] এই একরূপকতা যে যে ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় ভূদেব সেইগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এইগুলি হল- (১)

আকার এবং রুপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম এবং আচার সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ সাদৃশ্য, (৪) রাজ্যশাসন এবং সামাজিক প্রণালী সাদৃশ্য। তবে এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে, সাদৃশ্য দুভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে, যথা – বিধিমুখী ও নিষেধমুখী। বিধিমুখী ও নিষেধমুখী তত্ত্বদুটিকে তিনি বাস্তবের নিরিখে কতখানি ফলপ্রুস তা দেখার চেষ্টা করেছেন।তিনি দেখান যে, "ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, উষরভূমি এবং ঊর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ব্বকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষনে লক্ষিত স্থান সকল আছে- ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলতঃ এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্যদেশসাধারণ একটি বিশিষ্টভাবের অনুষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়।"[৬] এই জন্যই "ভারতবর্ষীয়ের সর্ব্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপর্দ্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন।"[৭] এছাড়া ভাষা ও উচ্চারণ সাদৃশ্য কিভাবে জাতীয়ভাব তৈরী করে তার প্রমাণ ভূদেব দিয়েছেন, তাঁর কথাতেই বলা যেতে পারে "ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী অর্য্যেরা সমস্ত দেশে ব্যাপক হয়েন নাই তখন ভারতবর্ষে যত ভাষাভেদ ছিল এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত করিতেছে। কোন একখানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষার এক সংস্কৃত হইতে আপনাপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে এবং সকলগুলিই ভারতবর্ষীয় মাত্রেই আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণ প্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ তাহার অপর প্রমানের প্রয়োজন নাই- এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়।"[৮] তবে "তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয়না বটে কিন্তু প্রতি বর্গের আদ্য অক্ষর দ্বারা তদবর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে, উচ্চারণের যেরূপ পার্থক্য বুঝায় তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে, সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভবনা।"[৯]

ভূদেব শুধুমাত্র জাতীয়ভাবের স্বরূপটাই বিশ্লেষণ করেন নি এর পাশাপাশি ভারতে জাতীয়ভাব উদ্রেকের যে সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেইগুলিও

উল্লেখ করেন। এইগুলি হল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং ঐক্য বা সংহতি। ভূদেবের ভাষায় যাকে বলা যাবে বিভিন্ন ভাগের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন। ব্রিটিশ শাসনে ভারত যে এক রাজ্যশাসনে সর্বতোভাবে এক হয়ে উঠেছে তা তিনি অকপটে মেনে নিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনে সকল ভারতবাসী এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছিলো তা তিনি মেনে নিয়েও; প্রাক ব্রিটিশ যুগের অবদানকেও তিনি মেনে নিয়েছেন। মান্ধার্তা শ্রীরামচন্দ্র থেকে বিক্রমাদিত্য অশোক প্রভৃতি আর্যগণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন- আর আকবরশাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেক প্রদেশ নিজেদের অধীন করে রেখেছিলেন।” ভূদেবের মতে “তাঁহাদিগের সে সমস্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর সম্মিলনোপায় অনেকদূর সুসিদ্ধ হয়েছিল।”[১০]

ভূদেবের জাতীয়ভাবের ধারণায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যঃ

ভূদেব ভারতের জাতীয়ভাবের ধারণায় মুসলিমদের স্থান কি রূপ সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে নিম্নরূপ ভাবে।

ভূদেব ভারতীয় মুসলিমদের জীবনধারা, ধর্মগ্রন্থ এমন কি সংস্কার প্রনালী প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি দেখান যে, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ এবং সংস্কার প্রণালী ভারতের অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা আবার মুসলমানরা যেহেতু একসময় ভারতে ‘সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব করেছিল সেহেতু তাদের সেই উন্নত অবস্থার স্মৃতি এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এমন কি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ভারতবাসীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে যতটা মিলে তার চেয়ে ভারত বহিঃস্থ জনগণের সঙ্গে অনেকবেশী মেলে। এছাড়া ভারতীয় মুসলমানরা ভারত বহিঃস্থ মুসলমানদের প্রতি যতটা সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকেন ততটা এদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকেন না। তার প্রমান হিসাবে ভূদেব দেখিয়েছেন, ”কয়েক বৎসর মাত্র গত হইল। ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান এমন কি তাঁহাদিগের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষোপজীবীরাও জীবিরাও রুশ তুরস্কের যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের অর্থ সাহায্য করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রাভদ্র অনেক মুসলমান লাল টুপি পরিয়া, আপনারা যে তুরস্কের পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে যখন ইংরাজদিগের সহিত পাঞ্জাবের পশ্চিম দিগবর্ত্তী সিতানা প্রদেশে আফ্রেদি প্রভৃতি দুর্বৃত্ত জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতবাসী অনেক মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলকথা ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকেই

ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং সকলেই হয় তুরস্ক সম্রাট, নয় পারস্য অধিপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।”[১১] কিন্তু ভূদেব ভারত বহিঃস্থ আনুগত্যের জন্য তেমন বিচলীত নয়। কারণ তিনি মনে করেন যে, ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থাতেও এই ধরণের আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। এই সম্পর্কে তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, ইংল্যান্ডে ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় সেখানে দুটি সম্প্রদায় আছে একটি হল প্রটেষ্টান্ট মতালম্বী আর একটি ক্যাথলিক ধর্মালম্বী। আর এই ক্যাথলিকরা খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনেকটা ভিন্নরূপ অনুবাদ করে এবং এদের সংস্কার প্রনালীও অন্যরূপ। এছাড়া এরা “ইংল্যান্ডের বহিঃস্থিত পোপ উপাধি বিশিষ্ট জনৈক যাজকপতিকে আপনাদিগের ধর্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার করে।”[১২] এতে করে প্রটেষ্টান্ট মতালম্বীরা এদের রাজ বিদ্রোহী বলে মনে করতো, এমনকি এদেরকে দেশের শাসন কাজে কোনভাবেই নিতো না। বর্তমানে ইংল্যান্ডের মানুষজনের মন থেকে ধর্ম লোপ পাওয়ার জন্য প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কোন বৈর দ্বন্দ্ব নেই। ইংল্যান্ডে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়তাবাদের কোন আঘাত করেনি তেমনই ভারতের হিন্দু- মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ একরূপ হয়ে মিলবে বলে ভূদেব মনে করেন।

ভারতের মুসলমানরা ভারতীয় ভাবধারায় মিলে যাবে বলে ভূদেব মনে করেন। কারণ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যেগুলির মাধ্যমে তারা হিন্দুদের সঙ্গে একাত্মতা হয়ে যেতে পারে যেমন, মুসলমানরা যে রাজ্যেই জয় করে তারা সেখানকার মহিলাদের বিবাহ করে নেয়, ভারতেও তারা তাই করে ছিল। কিন্তু এখানে জাতিভেদ প্রথা প্রাবল্য থাকায় তারা উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের বিবাহ করতে পারে নি কিন্তু তারা অনেক পরিমাণে নিম্নবর্ণের মহিলাদের বিবাহ করেছিল। তাই তিনি বলেছেন “এখানকার ষোল আনার মুসলমানের মধ্যে বারো আনা মুসলমান এইভাবে জন্ম লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন বাকি চার আনা মুসলমান জন্ম লাভ করেছে আর্য জাতীয় গর্ভসম্ভূত মুসলমান ঔরসের মাধ্যমে এবং দীর্ঘ দিন ধরে ভারতে বসবাস করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের আফগান, পারস্য, আরব, তুরস্ক সকল দেশের মুসলমান থেকে বৈচিত্র প্রদান করেছে এবং এরা আকারে প্রকারে ভারতীয় হিন্দুদের যত সাদৃশ্য হয়েছেন ভারত বহিঃস্থ মুসলমানদের তত সাদৃশ্য নয়। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এই সাদৃশ্যতাই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্যে অঙ্গীভূত করবে বলে ভূদেব মনে করেন।

ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের শুধু আকারেই মিল নেই, ভারতীয় মুসলমান হিন্দুদের কিছু আচার ব্যবহারও গ্রহণ করে তারা অনেকটা ভারতীয়তে পরিণত হয়েছে। তার কতক গুলি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন যেমন ভারতের অধিকাংশ মুসলমান জ্যোতির্বিদ্যা গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তারা হিন্দু ব্রাক্ষণ পণ্ডিতদের সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এমন কি তারা তাদের বিবাহের অনুষ্ঠানে হিন্দু প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি আরও বলেছেন ভারতীয় মুসলমানরা গোবধ ও গোমাংস খেতে বেশ সংকোচিত বোধ করে থাকেন। এমনকি পৈতৃক সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রেও তারা হিন্দুদের প্রথা গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও কতকগুলি সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন সেই গুলি তাঁর ভাষাতে বলা যেতে পারে "বাঙ্গালার এবং দক্ষিনাত্যের ত কথায় নাই, ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাক্ষণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রা মহোৎসব করাইয়া থাকেন।অপর অনেক অনুগত ব্রাক্ষণদিগের দ্বারা আপনাদিগের অর্থ ব্যয়ে ব্রাক্ষণ সজ্জনের অথিতি সৎকার করেন।[১৩] কিন্তু যেদুটি বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল নেই সেগুলি হল বৈবাহিক সম্পর্ক ও আহারাদি। তার কারণ হিসাবে ভূদেব বর্ণভেদ প্রথাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য এবং একাধিক বিষয়ে মিলন হেতু তাদের ধর্ম-বিভিন্নতা জনিত তীব্র বিদ্বেষ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ইংরেজ গ্রন্থকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করার জন্য তারা প্রচার করতো যে, মুসলমানরা যখন দেশে রাজা ছিল তারা তখন হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। এই কারণে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মধ্য যতটা মুসলমান বিদ্বেষ দেখা যায় ততটা পারস্য ভাষায় শিক্ষিত সদ ব্রাক্ষণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না বলে ভূদেব মনে করেন। ভূদেব একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা অনুধাবন যোগ্য। ছাপরা বাসী কয়েকজন মৌলবি সম্বন্ধে ভূদেব কে বলেন " মহাশয় ! মৌলবি সাহেব মুসলমান হইলে কী হয় উনি এমনি পবিত্রাকার ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাক্ষণ হইয়াও যদি উহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।"[১৪] এছাড়া তিনি অনেক মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে অনেক জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানরা আর্য মতবাদই গ্রহণ করেন এবং তাহাদের মধ্য একজনের সঙ্গে কথোপকথন সময় তিনি যখন শুনলেন "উও ইয়ে হ্যায়" তখন তার মনে হল যেন প্রাচীন ঋষির মুখ থেকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রক্ষ" বেদ বাক্যটি শুনলেন।

ভারতে মুসলমান শাসনের ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তাদের এই অপকথার বিরুদ্ধে ভূদেবের মন্তব্য হল "তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্যশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে । মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্থ।" [১৫]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থে কিভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে এক নতুন ঐক্য বদ্ধ জাতি ও রাষ্ট্রে অভ্যুদয় হবে তার একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষাতেই এই ছবিটা বর্ণনা করা যেতে পারে "আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্ত বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল,আজ সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্ত পরায়ন পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করবেন। ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ জন্মভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্য পালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয় – সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।" [১৬]

আসলে ভূদেব যে ঐক্যের কথা চিন্তা করেছেন সেই ঐক্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঐক্য নয়। ঐ ঐক্যের মূলে ধর্মবোধ। সেই ধর্মবোধের সর্বোচ্চ সোপানে হিন্দু মুসলমান একেশ্বরবাদ পরস্পর সংযুক্ত এবং ইহার নিম্নসোপানে নানা লোক ধর্মানুষ্ঠানে এরা একত্রিত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূলে সামাজিক ঐক্য এবং এই সামাজিক ঐক্যের মূলে তত্ত্বের ঐক্য।[১৭] যেখানে তত্ত্বের ঐক্য সেখানে ধর্মের বিষয়ে বিশেষ একটা সমস্যা হয় না।

গ্রন্থ নির্দেশিকা:

১. Harihar Bhattacharyya & Abhijit Ghosh(Ed) Indian Political Thought and Movement- Bhudeb and Modernity:Nationalism and Beyond- Kalyan Bhattacharyya, K.P. Bagchi &Company 2007,P.-30

২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৩১
৩. প্রমথনাথ বিশী (সম্পা) ‘সামাজিক প্রবন্ধ’, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩
৪. পূর্বোক্ত পৃঃ ৪
৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ৬
৬. পূর্বোক্ত পৃঃ ৭
৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ৭
৮. পূর্বোক্ত পৃঃ৭
৯. পূর্বোক্ত পৃঃ ৮
১০. পূর্বোক্ত পৃঃ ৮
১১. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯
১২. পূর্বোক্ত পৃঃ ১১
১৩. পূর্বোক্ত পৃঃ ১১
১৪. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩-১৪
১৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪
১৬. রবিন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত – ঐতিহ্য ও পরম্পরাঃ উনিশ শতকের বাংলা, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯৯, পৃঃ ৯১
১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১

সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণ --- এক অনালোকিত অধ্যায়

পুরঞ্জয় তন্তুবায়
প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক

রামায়ণ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যে কেবল মহাকাব্যই নয়,তা বাঙালির তথা ভারতবাসীর কাছে হৃদয়াবেগের সহাবস্থানে সমুজ্জ্বল। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ত্যাগ করে কৃত্তিবাস যখন বাঙালির নিজস্ব ছাঁচে তার অনুবাদ করলেন, তখন তা হয়ে উঠল বাঙালির নিত্য পাঠ্যবস্তু। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির মনের বড়ো কাছের সম্পদ। কিন্তু এই যে নিজস্ব ছাঁচ,তা থেকেই রামায়ণের কাহিনিতে এসেছে অনেকগুলি ধারা। তাতে কাহিনির ভিন্নতা চোখে পড়ে। এর মূলে প্রচলিত জনশ্রুতিরও অবদান আছে। ফলে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে রামায়ণ-কেন্দ্রিক প্রচলিত জনশ্রুতি একাধিক কবির কাব্যে নতুন কাহিনি সংযুক্ত করে রামায়ণের সুদীর্ঘ বহমানতায় বৈচিত্র এনেছে। সুতরাং তা যে পুরোপুরি বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেনি তা বোঝাই যায়। বাংলা রামায়ণের অনুবাদের ধারায় এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণের বিষয়ে। প্রচলিত রামায়ণের কাহিনি থেকে অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের অপর নাম 'অদ্ভুতোত্তর রামায়ণ'। কিন্তু এর রচয়িতা বাল্মীকি কি না তা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কারণ এর কাহিনি মূল রামায়ণের চেয়ে অর্বাচীন। এই রামায়ণের মূল উদ্দেশ্য সীতার মাহাত্ম্য প্রকাশ। অদ্ভুত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ খুব বেশি হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। এই অনুবাদে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাঁকুড়ার ভূলুই গ্রামনিবাসী জগদ্রাম রায়। জগদ্রাম রায়ের রামায়ণ হল মূল রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের সংমিশ্রণ এবং তাতে মৌলিক চিন্তার প্রখরতা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদকর্মে যে চারজন মহিলা কবির সন্ধান পাওয়া যায়,তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণের সার্থক অনুবাদ করেছিলেন সৌদামিনী দেবী।[১]

সৌদামিনী দেবী বিরচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর প্রথম সংস্করণ কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চল থেকে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯০ খ্রি:) প্রকাশিত হয়।[২] যে চারজন মহিলা কবির রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সৌদামিনী দেবীর 'অদ্ভুত রামায়ণ'-ই

প্রথম মূদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল (বাকি তিনজন মহিলা কবি হলেন - চন্দ্রাবতী, গঙ্গামণি দেবী,সুবর্ণনলিনী দেবী)[৩]। এটি বাল্মীকি বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণের সুন্দর ভাবানুবাদ অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় এই কবির নাম চোখে পড়ে না। সৌদামিনী দেবীর জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারা যায়নি। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভাব অনটন ও সাহিত্য সাধনার কথা কিছু জানতে পারা যায়। এছাড়াও কাব্যের অধিকাংশ ভণিতায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের হতাশাজনক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -- "আমি সামান্য জ্ঞানসম্পন্না, ভালোরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। আমি অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছি। এ হতভাগিনীর আর কেহ কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটি বালিকা লইয়া অকুল দুঃখ-সমুদ্রে ভাসমানা। উদরান্নের কোনো উপায় নাই। বিষয় নাই,বিভব নাই। কাজেই গ্রন্থাদি রচনা অথবা দাসীবৃত্তি ভিন্ন উপায় কি আছে? দ্বিতীয় পন্থাপেক্ষা প্রথম পন্থাবলম্বনের নিকট উপস্থিত হইলাম।" শুধুমাত্র রামায়ণই নয়, একাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যেমন 'মাতঙ্গিনী', 'সঙ্গীত-কৈবল্য', 'ইতুর পাঁচালী', 'বৈদ্যজাতির উৎপত্তি', 'কবিতা সুন্দর' ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়েছিল কি হয়নি তা সঠিক জানা যায় না।

অদ্ভুত রামায়ণ মূলত সীতামাহাত্ম্য কথা। সপ্তবিংশ সর্গে রচিত এই কাব্যটিতে সীতার মহিমাই প্রধান বিষয়। মূল বা প্রচলিত রামায়ণের চেয়ে এর কাহিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৌদামিনী দেবী তাঁর অনুবাদ পয়ার,ত্রিপদী ও চৌপদীর নিখুঁত প্রয়োগ ঘটিয়ে কাব্যটি শিল্পসমোন্নিত করে তুলেছেন। অদ্ভুত রামায়ণে সীতার স্বরূপ আলাদা,কাব্যের প্রথম সর্গেই তা বোঝা যায়। সেখানে ভরদ্বাজ মুনি বাল্মীকির নিকট অদ্ভুত রামায়ণ কথা শুনতে চাইলে সীতামাহাত্ম্যের কিছু পূর্বাভাস দেন বাল্মীকি। সংস্কৃতে রচিত মূল রামায়ণে তা এইরূপ --

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি সুব্রত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদা প্রকৃতি সম্ভব।।"[৪]

এর সুন্দর ভাবানুবাদ করেছেন সৌদামিনী দেবী --

"ইচ্ছা দ্বারা চরাচর যাহার সৃজন।
ব্রহ্ম নামে খ্যাত জন্মমোচন কারণ।।
যে সময়ে ধর্মহানি অধর্ম উদয়।
তখনি প্রকৃতি সীতা আবির্ভাব হয়।।"

অর্থাৎ এখানে সীতাকে অবতাররূপে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে অম্বরীশ বৃত্তান্ত, তৃতীয় সর্গে শ্রীমতীর জন্মবিবরণ,চতুর্থ সর্গে নারদ-পর্বত প্রসঙ্গ,শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবিবরণ, পঞ্চম সর্গে কৌশিক-তম্বরু সঙ্গীত,ষষ্ঠ সর্গে পেচক বৃত্তান্ত, সপ্তম সর্গে নারদের সঙ্গীত শিক্ষা,অহংকার ও দর্পচূর্ণ। এখানে সঙ্গীত শিক্ষা, সঙ্গীতের নিয়মকানুন ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখিত। অষ্টম সর্গে রাবণের তপস্যা এবং ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব বর লাভ। তারপর ত্রিভুবন জয় করে রাবণের দণ্ডকারণ্যে গমন,সেখানে রাবণের ভয়ে মুনিরা নিজের অঙ্গ চিরে ঘটপূর্ণ করে রক্তদান করলেন। কিন্তু একটি শর্ত রাখলেন, তা হল এই রক্ত যেন কেউ পান না করে এবং ঘট যেন ভূমিতে পতিত না হয়। রাবণ তাঁর দুর্জয় শক্তিতে দেবতা-গন্ধর্ব-অপ্সর-কিন্নর সকলের কন্যাকে হরণ করে আনলেন। নারীশক্ত স্বামীর প্রতি এখানে মন্দোদরীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে ---

"পরনারীরত স্বামী দেখি মন্দোদরী।
ক্রোধে লাজে ঘৃণাতে মরণ ইচ্ছা করি।।"

তাই ক্ষোভবশত মুনিদের দেওয়া সেই ঘটপূর্ণ রক্তকে বিষরক্ত মনে করে মন্দোদরী মৃত্যু অভিলাষী হয়ে পান করলেন। কিন্তু তাতে মৃত্যু না হয়ে রাবণজায়া গর্ভবতী হলেন। সেই গর্ভেই সীতার জন্ম হল। এই সর্গের নাম 'সীতোৎপত্তি'। নবম সর্গে সীতার বিবাহ সম্পন্ন,পরশুরামের ক্রোধ এবং পরশুরামকে বিশ্বরূপ দর্শনের চিত্র কবি পয়ারে সাজিয়ে বর্ণনা করেছেন ---

“পাতালে চরণধরা হইল উদর।
স্বর্গেতে মস্তক নেত্র চন্দ্র দিবাকর ।।
অষ্টবসু নবগ্রহ রুদ্র হুতাশন।
ঊনপঞ্চাশত বায়ু পিতৃ ঋষিগণ।।”

বিশ্বরূপ দর্শনের পর পরশুরামের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও দর্পচূর্ণ হল। দশম সর্গে শ্রীরামের বনগমন কিন্তু তার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। সীতার অন্বেষণে রাম সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করেন। ভক্ত হনুমান এখানে রামের বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন।

একাদশ সর্গটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রামচন্দ্র হনুমানকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেছেন-

"বিশ্ব সংসারাদি এই ব্রহ্মের অধীন।
ব্রহ্মতেই জনমিয়া ব্রহ্মে হয় লীন।।
এই ব্রহ্ম মায়াধীনে করেন সৃজন।

ব্রহ্ম কভু আপনি সংসারি নাহি হন।।"

মায়ারূপ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। সর্বভূতে আত্মাকে যিনি দর্শন করেছেন তিনিই ব্রহ্মপদে লীন হন। দ্বাদশ সর্গে আছে ব্রহ্মমাহাত্ম বর্ণনা। ত্রিজগতে আদিময়ী প্রকৃতি,আর প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি,মহৎ তত্ত্ব থেকে জন্ম অহংকারের,ত্রিভুবন অহংকারাশ্রিত। বিজ্ঞগণ এই মহৎ তত্ত্বকে জীবন বলেন। এই জীবরূপী মহৎ তত্ত্ব হল অন্তরাত্মা,সেই জীব থেকে দেহী জীবন পায়,জীবনে সুখ-দুঃখ গণ্য হয়। প্রকৃতিতে সঙ্গমের কারণে সংসারের সৃষ্টি হয় এবং কালেতেই তার সংহার হয়। সমস্ত চরাচর কালের অধীন,কিন্তু কাল কারো অধীন নয় ---

"সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কাল কসেচিদ্বশে।
সোহন্তরা সর্বমেবেদং নিরচ্ছন্তি সনাতন।।"[৫]

এর সুন্দর ভাবানুবাদ পয়ারে ---

"সকলেতে ব্যপ্ত কাল, কালে ব্যপ্ত সব।
কালচক্রে ত্রিভুবন ক্ষয় সমুদ্ভব।।"

ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ সর্গে ভক্তিযোগ কথন, হনুমানকৃত রামের স্তুতি আছে। ষোড়শ সর্গে অত্যন্ত সংক্ষেপে সমুদ্রবন্ধন,সীতা উদ্ধারের বর্ণনা এবং সপ্তদশ সর্গে আছে এক নতুন কাহিনির উল্লেখ। তা হল দুইজন রাবণের কথা -- সহস্রানন রাবণ ও দশানন রাবণ। অষ্টাদশ সর্গে সহস্রানন রাবণকে বধ করার জন্য রামের পুষ্করদ্বীপে যাত্রা। প্রচলিত রামায়ণে যেমন দশানন বধ তেমনি অদ্ভুত রামায়ণে সহস্রানন বধের ঘটনাই হল মূল কাহিনি। অদ্ভুত রামায়ণের এই অংশটিকে বাঁকুড়ার কবি জগদ্রাম রায় নাম দিয়েছেন 'পুষ্কর কাণ্ড'। এই অংশেই সীতা মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ। সীতা পুষ্করদ্বীপে যুদ্ধ দেখতে যেতে চাইলে রাম বলেছেন ---

"অবিশ্বাসী নারী জাতি অতি ভয়ঙ্কর।
নারী হয়ে যাবে তুমি দেখিতে সমর।।"

রামের এই ধারণা আমাদের একটু অবাক করে। এরপর হনুমানকে সীতার কাছে রেখে দিয়ে সুগ্রীব, জাম্বুবান, বিভীষণসহ রাম-লক্ষ্মণ যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু দুগ্ধ সমুদ্রের মাঝে গিয়ে রথ আটকে গেল। লক্ষ্মণ এই সময় রামকে সীতার শরণ নিতে বললেন।

ঊনবিংশ সর্গে বাল্মীকি সহস্রানন রাবণের সমস্ত সৈন্যের কথা বলেছেন। বিংশ থেকে ত্রয়োবিংশ সর্গ পর্যন্ত সৈন্যসজ্জা ও রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। চতুর্বিংশ সর্গে আছে সীতার প্রকৃত স্বরূপ। সীতার মহাক্রোধরূপ মূর্তি সংবরণ করার জন্য শঙ্করের

সমরক্ষেত্রে আগমন। পঞ্চবিংশ সর্গে সীতার অমিতারূপ ধারণ। তা দেখে রাম সীতার অষ্টোত্তর শতনামের স্তব করেন। ষড়বিংশ সর্গে সীতা রামকে বরপ্রদান করেছেন এবং অন্তিম সর্গে আলোচিত হয়েছে সীতারামের অভেদতত্ত্ব ---

"যে রাম সেই সীতা
কভু নহে তা অন্যথা
সর্বরূপময় সর্বাধার।"

কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে 'গ্রন্থকত্রীর নিবেদন' নামক পরিচ্ছেদ দিয়ে। ব্যক্তিজীবনে যে দারিদ্রতা সৌদামিনী দেবীকে গ্রাস করেছিল,তাতে তার কাব্যিক প্রতিভা ও অন্তরের ভক্তি শেষ হয়ে যায়নি। হৃদয়ের ভক্তিকে তিনি কাব্যিক প্রতিভায় মিশিয়ে রামায়ণ রচনা করেছেন। আর গ্রন্থের শেষে একটি কথা উত্থাপন করেছেন যা অন্য কোনো রামায়ণ রচয়িতা বোধ হয় করেননি ---

"সীতা রামে বন্দি কহে দেবী সৌদামিনী।
রাম নাম করে আমি জনম দুখিনী।।
অর্থনাশ পতিনাশ আর মানহানি।
বর্ষ পঞ্চবিংশতিতে আমি ভিখারিনী।। "

যে রাম নাম স্তব করলে পাপীর পাপ নাশ হয়,অগতির গতি হয় কুলহীন কুল পায় -- সেই রাম নাম করেও কবির দুঃখদারিদ্রের সমাপ্তি বোধ হয় ঘটেনি। তাই যেন কবি তাঁর সমস্ত অভিমানকে এই পরিচ্ছেদে প্রকাশ করে দিয়েছেন ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

উৎসর্গপত্রে কবি নিজেকে সামান্য জ্ঞানসম্পন্না বলে বিনয় প্রকাশ করলেও তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে রামায়ণকে অনুধাবন করে যিনি রামকথা ও সীতামাহাত্ম্য রচনা করতে পারেন সাহিত্যের সুললিত ছন্দে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে বলাবাহুল্য। যাইহোক, মূল রামায়ণের মতো এই রামায়ণের খুব যে চল ছিল বা আছে এমন কথা বলা যায় না। কারণ এই রামায়ণের অনুবাদ অপ্রতুল,হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা। পালাগানে এই রামায়ণের খণ্ড খণ্ড কিছু অংশ স্থানবিশেষে গীত হয়। অদ্ভুত রামায়ণের আক্ষরিক গদ্যানুবাদ করেছিলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ১৮০০ খ্রিঃ সাহিত্যে আধুনিক যুগ আসার পর যখন একশো বছর অতিক্রান্তের পথে তখনও রামায়ণ রচনা হচ্ছে নতুন ছাঁচে, নতুন

আঙ্গিকে। এখানেই সেই মহান কাব্যের গুরুত্ব এবং সৌদামিনী দেবীও সেই কৃতিত্বের অধিকারী।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা রামায়ণের কবি, অমিয়শঙ্কর চৌধুরী, বাংলা রামায়ণের মহিলা কবিদের তালিকা,তালিকা নং ১৩, প্রথম প্রকাশ -২০০৯, পৃ: ১৯১

২. অদ্ভুত রামায়ণ, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, সিমুলিয়া, বলরাম দে'র স্ট্রীট ৬৮ সংখ্যক ভবনে কৃপানন্দ যন্ত্রে নফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত, সাল ১২৯৭ বঙ্গাব্দ

৩. বাংলা রামায়ণের কবি, তালিকা নং ১৩, পৃ:১৯১,প্রাগুক্ত

৪. অদ্ভুত রামায়ণ, শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সংস্কৃতের আক্ষরিক গদ্যানুবাদ,শ্রী নবকুমার দত্ত কর্তৃক দ্বিতীয়বার প্রকাশিত,৩৯ নং সিমলা স্ট্রীটস্থ 'শান্তি যন্ত্রে' শ্রী বিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত, পৃ:১০

৫. ঐ,পৃ: ৯৮

সুন্দরবনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্যময় নারী (নির্বাচিত)

প্রিয়াংকা মন্ডল
এম ফিল. বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: *'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' এই প্রবাদটি শুনলে যে স্থানটির কথা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় তা হলো সুন্দরবন। মনোজ বসুর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথা সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে শিবশংকর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস, শক্তিপদ রাজগুরু প্রমূখ সাহিত্যিকদের হাত ধরে সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে ধারাটি আরো পুষ্ট হয়। কালানুক্রমিক নির্বাচিত তিনটি উপন্যাস হল, সাধন চট্টোপাধ্যায় এর 'গহীন গাঙ' (১৯৮০)। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এর 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০)। সোহরাব হোসেনের 'গাঙ বিঘিনী'(২০১১)।*

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' উপন্যাসে যে সমস্ত নারীদেরকে পাই, তারা প্রধানত গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করে। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত এরা সংসারের কাজকর্ম করে। সংসারের মানুষগুলোর ভালোর জন্য খেটে মরে। এদের নিজস্ব কোন পরিচয় নেই, স্বামীর পরিচয়ে এদের পরিচয়। মধুর বোন আলতার মাধ্যমে মালো সমাজে বিধবা নারীদের শোষণের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। তবে এই উপন্যাসে ভেড়ি ধারে দলমার ঘরে বসবাস করা নারীদের দেহকেন্দ্রিক জীবিকার ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

'গহীন গাঙ' উপন্যাসের ৩০বছর পর সুন্দরবনের ভূমিপুত্র ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে নারীদেরকে বহুমাত্রিক রূপে তুলে ধরেছেন। যেখানে সালেয়া, যমুনা, পদ্মার মত বহু সংখ্যক নারী গৃহস্থ জীবন-যাপন করছে।আবার ১৪-১৫ বছরের মেয়ের রাখির থেকে শুরু করে হাতের চামড়ায় হিজিবিজি হয়ে যাওয়া ঊষা বুড়ির মত বয়স্ক নারীরা জীবিকার সাথে যুক্ত থাকে জীবনের তাগিদে। উপন্যাসে কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন পরিশ্রমী মিতা মান্ডি কে যেমন পাই, তেমনি পাই ঝুমকি, ববিতা, দেবশ্রীর মত মেয়েদেরকে যারা দেহ কেন্দ্রিক জীবিকার সাথে যুক্ত।

'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসের এক বছর পর সোহরাব হোসেন সুন্দরবনকে নিয়ে রচনা করলেন 'গাঙ বাঘিনী' উপন্যাসটি। উপন্যাসে তিনি সুন্দরবনের নদী,জঙ্গলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো বিধবা নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজলা ও শংকরী কে তুলে ধরেছেন। এদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কত ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিবেশে সুন্দরবনের নারীরা জীবিকা অর্জন করে। এই জীবিকা অর্জনের জন্য তাদেরকে ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণী, উত্তাল সমুদ্রের মতো নানা প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে জীবিকার তাগিদে একশ্রেণীর শোষক খটিদার, ম্যানেজার, কোস্টগার্ডের হাতে নারীদের লাঞ্ছিত ও শোষিত হওয়ার দিকটিও উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। এইভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের নারীরা নিজেদেরকে জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন করে।

সূচক শব্দ: *সুন্দরবন, মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্র,কল্লোল গোষ্ঠী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়,সোহারাব হোসেন, গহীন গাঙ, সমুদ্র দুয়ার, গাঙ বাঘিনী, গৃহস্থ জীবন, জীবিকা, নদী, সমুদ্র, বাঘ, জঙ্গল, শিকার, বিধবা, বনবিবি, মাছ ধরা, খটিদার, আড়তদার, ঠিকাদার, শোষণ, জাল, নৌকা, নারী।*

মূল প্রবন্ধ:

সুন্দরবন বললে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটি শ্বাপদসংলকুল অরণ্যের প্রেক্ষাপট ছবি। আমরা তখন সুন্দরবনের দিগন্ত বিস্তৃত তরঙ্গায়িত জলরাশি দেখতে পাই না।গরান, সুন্দরী, গর্জন বৃক্ষের মুগ্ধ করা সমাবেশ দেখিনা।এমনকি দেখিনা সেই নীলাম্বর উদাসীন আকাশ। সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে বাঘ, যে লতা- গুল্মের আড়ালে অতি সংগোপনে দেহ লুকিয়ে রাখে, আর সুযোগ বুঝে সমস্ত আড়াল সরিয়ে ভীম বিক্রমে লম্ফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ' রয়েল বেঙ্গল টাইগার ' শিকারের ওপর। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় এই বিশাল ব-দ্বীপ পৃথিবীর একক বৃহত্তম ও বিখ্যাত লবণাম্বু উদ্ভিদের বন।ম্যানগ্রোভের অরণ্য, যা স্থানীয় ভাষায় 'বাদাবন' হিসেবে পরিচিত।ভারত ও বাংলাদেশ-এই দুই দেশ মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় প্রায় ২৬ হাজার বর্গ কিমি জুড়ে সুন্দরবনের বিস্তার। তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অরণ্য বাংলাদেশের আর বাকি এক অংশ ৯৬০০ বর্গ কিলোমিটার ভারতে অবস্থিত।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সুন্দরবনের প্রসঙ্গ প্রথম পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। পরবর্তীকালে' কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'শ্রীকান্ত' (১ম খন্ড) উপন্যাসে মেজদার মুখে 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার 'এর নাম উচ্চারণ ছাড়া সুন্দরবনের প্রসঙ্গ আর কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা আমদানির তাগিদে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা বিশেষ কোন অঞ্চল বিশেষ কে সরাসরি হাজির করলেন সাহিত্যের আঙ্গিনায়। তখন থেকে বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায় ঢুকে পড়েছে বাংলা ও বাংলার বাইরের এক বা একাধিক ভূখন্ড। সুন্দরবন ছিল তেমনই এক অজানা ভূখণ্ড। সুন্দরবনকে নিয়ে মনোজ বসু, শিবশংকর মিত্রের মত সাহিত্যিকেরা যতদিন না তাদের অসামান্য লেখনি নিয়ে হাজির হলেন ততদিন সুন্দরবন বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ছিল অচেনা, অজানা ও অনামা।

সুন্দরবন কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত নির্বাচিত উপন্যাস গুলি হল, ১.সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' (১৯৮০)। ২. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০)। ৩. সোহারাব হোসেনের 'গাঙ বাঘিনী' (২০১১)। 'গহীন গাঙ' উপন্যাসটি 'প্রান্তিক' শারদীয়া সংখ্যা ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে 'প্রান্তিক' প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বিষয় হলো মালোপাড়া মানুষের জীবন-যাপন, রীতি-নীতি, সংস্কার -বিশ্বাস সংস্কৃতি আর অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার দিনযাপনের কাহিনী। উপন্যাসে শ্রীপদ জীবন-জীবিকার মধ্য দিয়ে মালোপাড়ার মানুষদের সামগ্রিক জীবন পরিস্ফুট করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটির স্বল্প আয়তনে, স্বল্প চরিত্রের হলেও উপন্যাসটিতে যেসব নারী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা হল ননীবালা যে শ্রীপদর মা, কড়ি যে শ্রীপদর স্ত্রী, আলতা যে শ্রীপ্রদর বন্ধু মধুর বিধবা বোন। এবং ভেড়ির ধারে বাস করা কিছু মহিলা।

উপন্যাসে ননীবালা মালোপাড়ার বয়স্ক গৃহস্থ নারীর প্রতিনিধি হিসেবে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ননীবালার মতো বাড়ির বয়স্ক মহিলারা বাড়ি 'গতপাত' করে পরিষ্কার করে।বাড়ির মঙ্গল কামনায় সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়। ননীবালা ছেলের বউকে গোপনে হিংসে করে,বউয়ের প্রতি তার ছেলের ভালোবাসা দেখে।তাই পান থেকে চুন খসলে বৌমাকে অপদার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করে। নাম লিখতে না জানা ছেলে শ্রীপদর গর্বে গরবিনী মা ননীবালা যৌতুক নিয়ে পটের বিবি মতো লাল টুকটুকে বউ আনার কথা ভাবে; কারণ ছেলের বউ কড়িকে তার পছন্দ নয়। কড়ির সন্তানসম্ভবার খবর ননীবালা সব পরিকল্পনা মাটি করে দেয়। কড়িকে ননীবালা যতই অপছন্দ করুক না কেন কড়ির প্রতি ছিল তাঁর এক ভালোবাসার ফল্গুধারা।তাই বিয়ের

কয়েক বছর কড়ির সন্তান না হলে কবচ,তাবিজ, জুড়িবটি এনে দিয়েছে কড়িকে। ঘুটিয়ারি শরিফের পীরের দরগা কড়ির সন্তান হবার মানত করে।

কড়ি উপন্যাসের শ্রীপদ স্ত্রী,মালোপাড়ার গৃহবধূদের প্রতিনিধি হিসেবে উপন্যাসে পাই। সামান্য ভুলে শাশুড়ির থেকে কথা শোনার থেকে শুরু করে, দীর্ঘদিন বাচ্চা না হওয়ার কারণে পড়া-পড়শীর কাছে নানা কথা শুনতে হয়। স্বামীর ভালবাসা পাওয়ায় পাড়ার মেয়ে বৌদের হিংসা মূলক মন্তব্যের শিকার হতে হয় তাকে।সব সহ্য করে দীর্ঘদিন পর সন্তান হতে কড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।ছেলের ছয় ষষ্ঠীরদিন বাড়ির পুজো ছেড়ে স্বামীকে বাইরে যেতে দেখে কড়ি স্বামীকে শাসন করে।সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে শ্রীপদ যখন জানায় তাকে জঙ্গলে যেতে হবে মাছ ধরতে,তাতে স্বামী সোহাগী কড়ি চমকে ওঠে, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে। শ্বশুরের মত স্বামীকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে সে ছেলের দিব্যি দেয় কিন্ত শ্রীপদকে জঙ্গলে যাওয়ার থেকে আটকাতে অসমর্থ হয়ে, স্বামীর যাত্রাপথ যাতে শুভ হয় সে জন্য প্রার্থনা করে 'মা বনবিব' র কাছে করুণ প্রার্থনা করে। সদ্য মা হওয়া কড়ি ঘটনাক্রমে যেন হঠাৎই বয়স্ক হয়ে যায়।যে তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে নিজেকে সেই মতো প্রস্তুত করে।

উপন্যাসের অল্পবয়সী,নিঃসন্তান বিধবা নারী হলো আলতা।যে স্বামীর মৃত্যুর পর দাদা মধুর বাড়িতে এসে থাকে।স্বামীকে বাঘে খাওয়ার পর আলতা ও তার বিধবা বোনের ঘরে লোক আসে।মালোপাড়ার কোন মেয়ে বিধবা হলে সমাজের লম্পট কোন যুবক তাদেরকে নিগ্রহ করে।শ্রীপদের ভাই লগাই-ই বিধবা আলতাকে প্রথম নষ্ট করে। আলতা রং কটা চুল লাল যৌবনকালে সুন্দরী ছিল কিন্ত পরবর্তী সময়ে অনেক ঝড়-ঝাপটায় রূপে আভা কমে গেলেও পুরুষকে আকর্ষন করার ক্ষমতা হারায় নি। বর্তমানে আলতাকে কুঞ্জ হালদার রাতের বেলায় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যায়। এই উপন্যাসে বাজারের পেছনে ভেড়ির ধার ঘেঁষে সার সার দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে 'নষ্ট মেয়েরা' দেহ কেন্দ্রিক জীবিকার অর্জন করে।

সুন্দরবনের ভূমিপুত্র ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে গঙ্গার মোহনা থেকে বার গঙ্গার দিকে ছড়িয়ে থাকা নতুন দ্বীপ থেকে মানুষের নির্বাসনের গল্প লিখতে গিয়ে তা হয়ে উঠেছে নতুন দ্বীপে বসবাস এর গল্প। 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে বহু নারী চরিত্র কে পাই, সেসব নারী চরিত্র গুলি হল সালেয়া, আভা, মালিনী, মিতা মান্ডি ও তার মা, বিরোজা, যমুনা ঊষা বুড়ি পদ্মা নিতু হেমব্রম, চন্দ্রা, গীতা, লালী, গোলাপীবউ, কুন্তলা, জয়রামের বউ, ঝুমকি, দেবশ্রী ববিতা এবং কালোবউ। এইসব

নারীদের মধ্যে সালেয়া, মালিনী, পদ্মা, চন্দ্রা, যমুনা এরা গৃহস্থ জীবন-যাপন করে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে সালেয়া ভাঙ্গন ধরা দ্বীপে স্বামী হাশেমের সঙ্গে সংসার করে। হাসেম জাল ভুটভুটি নিয়ে ইলিশ মাছ ধরতে গেলে ফাঁকা বালুচরে দুধের বাচ্চা দুটিকে নিয়ে থাকে একা সালেয়া। বর্ষাকালে চাষের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে। ভিন গাঁয়ের মেয়ে বছর পাঁচেক আগে বউ হয়ে এখানে এসেছে ২৪-২৫বছর বয়সে শালিয়া সত্যিকারের কোন রাজা মহারাজা দেখেনি বলে আক্ষেপ করে।কুয়োর ব্যাঙের মত জীবন-যাপনের মধ্যে যতই বাইরের খবর শোনে ততই বিস্মিত হয়।স্বামী,সন্তান-সংসার সর্বস্ব ভাবে সালেয়াকে উপন্যাসে পাই।

পদ্মার বঙ্কিমনগর কলোনি তে বাড়ি।ছেলে-মেয়ে,বৌমা এবং৬১-৬২বছরের স্বামী দিবাকর কে নিয়ে সংসার।আট হাত বাই ১৪ হাত ঘর। তার মধ্যে আবার এককোনে হোগলার দেয়াল করে পার্টিশন করা। যেখানে বড় ছেলের সাথে উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী বউ থাকে। অন্যদিকে পদ্মা ১১-১২ বছরের মেয়ে চন্দ্রা,কুড়ি একুশ বছর বয়সের মেজো ছেলে থাকে। পদ্ম বোঝে এক ঘরের মধ্যে বড় বড় ছেলে মেয়ে আর সদ্য বিয়ে করা ছেলে বৌমার রাত কাটানো সম্ভব নয়।তাই স্বামী দিবাকরকে আরেকটি ঘর করার কথা বলে এবং সেই মতো ভোলা ঘরামি কে ডাকা হয়।এভাবে ছেলেমেয়ে,বৌমা, স্বামী, সাংসারিক সমস্যা নিয়ে পদ্মা গৃহ জীবনে আবদ্ধ।

চন্দ্রা মাইতি ও চূর্ণী পড়িয়া দশ ক্লাসে উত্তীর্ণ মেয়ে।এরা পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক টুকিটাকি কাজ এর সাথে যুক্ত থাকলেও এরা কোন জীবিকার সাথে যুক্ত নয়।মালিনী চক্রবর্তী৪৭-৪৮বছর বয়সের অনূঢ়া নারী মুখে ছেয়ে আছে বৈধব্য।বাবা আশ্রমে প্রাইমারি শিক্ষক।সে ওখানেই পড়াশোনা শিখেছে। বর্তমানে বাবা অসুস্থ হয়ে কলকাতার ফিশারি দপ্তরে কর্মী হয়ে কলকাতার বাড়িতে দাদা বৌদির কাছে থাকলেও মালিনী এখানেই থেকে যায় একা। ছোটবেলার সহপাঠী দুলাল ও যমুনার ছেলে মেয়ে সনৎ ও মিনতিকে পড়ায়। যমুনা স্বামী দুলাল, ছেলের সনৎও মেয়ে মিনতিকে নিয়ে সংসার। স্বামী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়।যমুনা তাই সারাদিনের পর রাতে স্বামীর বাড়ি ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকে।

গীতা,মীতা মান্ডির ও শ্রীদাসের ছোট বোন সরস্বতীর খেলার সাথী।ভুবন তলার মেয়ে বিয়ে হয়ে ওপারে বঙ্কিম নগরের বউ হয়েছে।যে গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা কোলে নিয়ে ও জীবিকার সন্ধান করছে। মিতার মা যে জনার্দন হেমব্রম এর স্ত্রী। বাড়ির কাজকর্ম করে এবং স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে মিতার কথা ভাবে।ভুবন তলার বাসিন্দা

হয়েও জীবিকার জন্য আট-দশ বছর আগে এই নতুন দ্বীপে এসে বাস করছে।পিস মিলের ব্যবসায়ী জয়রাম ডিঙ্গেলের স্ত্রী পুজো দেয় ঠাকুরকে স্বামী ব্যবসায় উন্নতির জন্য।এবং স্বামীর গাঙ্গে যাওয়া নিয়ে খুবই চিন্তিত।

আভা, মাস কয়েক আগে বিধবা হয় অল্প বয়সী আভা।বর গিয়েছিল ভাঁটার সময় ডুবন্ত বিদেশী জাহাজের খোল থেকে দামি হাতঘড়ি,বাক্সভর্তি টর্চলাইট তুলতে।অল্প জলে জাহাজের খোলে ডুব দিয়েছিল ঘড়ি বাক্স ধরতে।লোভের বশবর্তী হয়ে আর একটা বাক্স ধরতে গিয়ে দম ফুরিয়ে যায়। আর ভেসে উঠতে পারেনি মানুষটি।স্বামীকে হারিয়ে আভা পেয়েছে নতুন মানুষ বলাই কে।বলাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আভা মেয়ে লেবারের কাজ করত,কড়া ভর্তি তাগাড় বইতো,ইট টানতো।এখন আভা বলাইয়ের সাথে নদীতে মাছ ধরে জীবন ও জীবিকার তাগিদে।

মিতা মান্ডি ৩৮-৪০ বছর বয়সী দাপুটে মেয়ে।আঁটোসাঁটো মেয়ে মিতা মাতাল বিনোদ কে বিয়ে করে কিন্ত বিয়ের পর বাচ্চা না হওয়ায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে বাবার সাথে নতুন দ্বীপে আসে কাজের সন্ধানে।নতুন দ্বীপে মিতার জীবিকা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় প্রথম পর্যায়ে কুড়ি বাইশ বছর বয়সে শে মাছ বাছাইয়ের কাজ করতো। দ্বিতীয় পর্যায়ের মিতা ঠিকাদার, তাকে এই কাজে যুক্ত করেন আড়তদার ধীলেন বাবু। মিতা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মাছ বাছাইয়ের কাজ করলে তাতে ধীরেন বাবু চোখে পড়ে।মিতাকে তিনি ভুবন তলা থেকে মাছ বাছাইয়ে লেবারের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন।মিতা তার ব্যবস্থা করে দেয় এর মধ্য দিয়েই মিতা ঠিকাদার হয়ে ওঠে।তৃতীয় পর্যায়ে মিতা খাতাদার।ক্লাস থ্রি পড়া মিতাকে ধীরেন বাবু খাতা পেন্সিল দিয়ে নাম,তারিখ, লেবারের নাম বরাবর হাজিরা লেখানো শিখিয়ে খাতাদার করে তোলেন।খাতাদার হওয়ার পর মিতার মর্যাদা বাড়ে,বাড়ে সম্মানও। মিতা হিসেবী, কোথায় কতজন কাজ করবে,কত টাকা দিতে হবে,কত টাকা মাইনে বাড়ানো হবে- এক কথায় মিতা তার জীবিকা নিয়ে খুব সচেতন সতর্কতা এবং হিসেবী।সবমিলিয়ে মিতা উপন্যাসে এক দায়িত্বশীল নারী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

বিরোজামনি, সরু শাবল দিয়ে বালির মধ্যে মৃত ঝাউ গাছের মোটা মোটা শিকর বাকর সংগ্রহ করে জ্বালানি দেবার জন্য।বিরাজার স্বামীর সহদেব বাঁকা শিক,পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে কাঁকড়া ধরতে বেরিয়ে নরম পাক কাদায় আটকে মারা যায়।স্বামীহারা বিধবার অন্নসংস্থানের জন্য মিতার শরণাপন্ন হয়। মিতা তাকে পলাশ বাবুর গোডাউন পাহারা দেয়ার কাজে তাকে নিযুক্ত করে।সে মাঝে মাঝে মাছ বাছাইয়ের কাজ করে

জীবিকার তাগিদে। ২১-২২বছরের নিতু হেমব্রম। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে পেছনের উরুতে সাপের ছোবলে স্বামী মারা গেলে দেশী মদ তৈরি এবং তা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে।ছেলে বিধুকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চায়।

বঙ্কিম নগরের ভীমা বুড়ি,এখন নতুন দ্বীপে থাকে। জীবিকার তাগিদে সে গর্তের মধ্যে থেকে কাঁকড়া ধরে হাটে বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে। ঊষা বুড়ির সাদা থান কাপড়ে মোড়া দেহ পিঠ বেয়ে কাঁচা পাকা চুল,হাতে হিজিবিজি ভাঁজ। আগে হলদিয়াতে থাকতো বর্তমানে নতুন দ্বীপে থাকে।ডিমা গুড়ির হাট পুরনো দ্বীপে ঊষার জন্ম। কোলে চার বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়ে বাবা-মার কাছে ফিরে আসে।একদিকে ভাই-বোনদের টানতে বাবা হিমশিম, তখন ২২-২৩বছরের ভীমা চার বছরের ছেলেটিকে মায়ের কাছে রেখে ঠিকাদারদের সাথে হলদিয়া মাটি কাটতে যায়। সেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খুব কষ্টের সাথে কাজ করে টাকা উপার্জন করে।চার বছরের ছেলের জন্য নতুন ঘর বাঁধার আহ্বানকে অস্বীকার করে।সেই চার বছরের ছেলে বড় হয়েছে বিয়ে করেছে।সে ছেলে এখন শ্বশুর বাড়িতে থাকে ।মায়ের খোঁজ করে না।তাই মাছ বেছে, কাঁকড়া ধরে, বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

লালী ১৬-১৮বছরের এই দ্বীপের মেয়ে।যে এই দ্বীপে মাছ বাছাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মিতা পিসির মতো এক কর্মনিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ন মেয়ে হতে চায়। ১৪-১৫ বছরের মেয়ে রাখি। পরণে বড় ফ্রক। কিশোরী বুকে গামছা আঁচলের মত এদিক ওদিক পেঁচানো। তেমাথানি রাস্তার টিউকলের পাশে বাড়ির বড় চা-বিস্কুটের দোকানে কাজ করে।কুন্তলা ফর্সা কপালে সিঁদুরের দাগ নেই তাই বোঝা যায় না মেয়ে নাকি বউ।সে নতুন দ্বীপে কাজ করতে এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গোলাপি বউ, সন্তান না হওয়ার পর মিতার স্বামী বিনোদ যাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সেই হলো গোলাপি। ভুবন তলাতে গার্হস্থ্য জীবন- যাপন করলেও জীবিকার প্রয়োজনে মাতাল স্বামীকে নিয়ে নতুন দ্বীপে কাজের সন্ধানে আসে। মেজ বউ যে নতুন দ্বীপে মিতার কাছে কাজ করে। তার ছোট্ট ছেলে-মেয়ে দুটোর জ্বর তাই গত মাসের মতো এমাসেও টাকা ধার চায় ডাক্তার দেখানোর জন্য। বিরোজামণির ছোট পেট রোগা বোন ঝুমকি।যে এখন ২২-২৩ বছরের যুবতী মেয়ে। ঝুমকি এখন কলকাতায় বাবুদের বাড়িতে কাজ করে।বাবু বাড়ির ভাত-কাপড়ের ক'বছরে ঝুমকি বদলে গেছে। তার স্বামী কোথায় হারিয়ে গেছে।তবে তার তাতে দুঃখ নেই, ভালোই আছে সে। তাই সে আর

স্বামীর খোঁজ করে না। বাবু বাড়ির কাজ করার পাশাপাশি ঝুমকি দেহ কেন্দ্রিক জীবিকার সাথে যুক্ত। ঝুমকির মত দেবশ্রী ববিতা দিব্যা ও এই জীবিকার সাথে যুক্ত।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট এলাকার মানুষ সোহরাব হোসেন। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের জীবন-জীবিকা কে কেন্দ্র করে লিখলেন 'গাঙ বিঘিনী' উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয় হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাস ও দেশভাগের যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে মনুষ্যবর্জিত ছোট চামাটে- কলস- ডাঙাডুলির মতো দ্বীপে সুন্দরবনের জলে, জঙ্গলে বনচারী মানুষের নিয়তি তাড়িত জীবনের অভিনব উপাখ্যান 'গাঙ বিঘিনী'। বাউলে, কাঠকাটানিয়া-সাবাড়ে, কোস্টগার্ডদের, কাম- কামনা, প্রেম- অপ্রেম,ঘাম- রক্তে সিক্ত দেশভাগের বিষ প্রভাবে অস্থির নায়ক অধর এবং বাঘের পেটে স্বামীহারা সাত জেলের বিধবা পল্লীর সংরাগ দগ্ধ অথচ সংযমসিদ্ধ একালের বনবিবি রূপী নায়িকা কাজলের সম্পর্ক না সম্পর্কের টানাপোড়েনের আকর্ষণ এই উপন্যাসের কাহিনী।

এই উপন্যাসের নারী চরিত্র হাতেগোনা দুটি ;কিন্তু এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাত জেলের বিধবা পাড়ার নারীদের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে যে দুটি নারী চরিত্র কে পাই তারা হলো কাজলা লস্কর ও তার সঙ্গী বিধবা শংকরী সোনা। উপন্যাসে কোথাও এদের দুজনকে বাড়িতে থাকতে দেখা যায় না, ফলে প্রত্যক্ষভাবে আমরা এদের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি পাই না ;কিন্তু উপন্যাসে নানান অংশে এদের গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাটো ছবি আমরা পাই।সাত জেলে বিধবা পাড়ায় এদের বাস। যেখানে পাচকুড়ি বিধবা বাস করে।কোন দলবল ছাড়া কুল কিনারা হীন সমুদ্রে দুইজন নারী কাজলা ও শংকর মিন ধরে, জাল ফেলে, জাল টানে।যদিও সমুদ্রে জাল টানা, জাল ফেলা পুরুষের কাজ কিন্তু সুন্দরবনের নারীরা পুরুষের সাথে সেই কাজ করে থাকে। কাজলার স্বামী যখন বেঁচে ছিল সে তার সাথে জাল দিয়ে মাছ ধরতো মাতলা,রায়মঙ্গল নদীতে।কাজলারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবিকার টানে তারা প্রতিকূল পরিবেশে পাড়ি দেয় এই বিশ্বাস মনে নিয়ে সাগরের জলে অভয় দেবে কালুয়া ঠাকুর, বনে ভাই শাহজঙ্গুলি পাহারা দেয় আর বনেবাস করে মা বনবিবি,তাই তাদের বিপদ হতে দেবে না।

কাজলা ও শংকরী প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তারা তাদের জীবিকা কেন্দ্রিক আর্থিক শোষন সম্পর্কে সচেতন। তারা বোঝে তাদের প্রতি শোষণ খটিদার,আড়দার,ম্যানেজার পারস্পরিকভাবে যুক্ত।সবকিছু জানার পরেও তারা তাদের

সাথে কাজ করে কারণ কাজলা,শঙ্করীদের মত দুঃখী মানুষ যাদের জাল নেই, খাবার জন্য অন্ন মজুত থাকে না। কাজলা ও শংকরীরা এভাবে দিনের পর দিন গৃহছাড়া হয়ে নদী-সমুদ্রের জল ভেসে থাকে কিংবা বনে দিন কাটায়।এমন অনিশ্চিতভাবে দিনের পর দিন কাটানো নিরাপদ হয়না।বনে বন্যজন্তু ছাড়াও মাঝে মাঝে দেখা দেয় আচমকা ঝড় যা সব শুদ্ধ ডুবিয়ে দিয়ে যায়। প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করার পর তাদের সারাদিনের সঞ্চয় নিয়ে যায় খটিদারের লোকেরা আর দিয়ে যায় অর্ধেকেরও কম দাম।

শুধু মাত্র আর্থিক দিক থেকে কাজলা,শংকরিদেরকে শোষিত হতে হয় তা নয়।সুন্দরবনের মেয়েরা মূলত বিধবা নারীরা কর্মক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। এই লাঞ্ছনা দিকটি কাজরা ও শঙ্করের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীহারা বিধবাদেরকে বনরক্ষা কর্মী বা কোস্টগার্ড ভোগ করে যখন তারা জীবিকার সন্ধানে জঙ্গলে যায়। আবার সাবাড়ে কাজ করার সময় খটিদার ম্যানেজার বা অন্য কোনো কর্মী শোষণ করে।কাজলার মতো বিধবারা কিছু বলতে পারে না কারণ জাল বা টাকা কিংবা খাবার তারাই যোগান দেয়।এই ভাবে সুন্দরবনের বিধবারা কোনো-না-কোনোভাবে অত্যাচারের শিকার হতে হয় ।

তবে উপন্যাসে বিধবা কাজলা কোস্টগার্ড ও সাবারের ম্যানেজারের কামনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে জীবন্ত বনবিবি ঘোষণা করেছে।কাজলা ও শংকরী যেভাবে বনে জঙ্গলে, নদী-সমুদ্রের দিনের পর দিন কাটায় তাতে সুন্দরবনের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বিশ্বাস করে।মাছ ধরা এবং সাবাড়ের জীবন থেকে ইতি টানার জন্য কাজলা ও শংকরী হলোধর দার সাথে যুক্ত হয়। বেআইনিভাবে, বিনা অনুমতিতে কোস্টগার্ড অধরের সহায়তায় জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। এই কাঠ বিক্রির একটি অংশ পাবে কাজলা ও শংকরী।সেই টাকায় তারা বাকি জীবন কাটাবে। সাবাড়ের জীবনে তারা আর ফিরতে চায় না।কিন্ত তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায় না।এভাবে সুন্দরবনের নারীরা নানান ভাবে, নানান রূপে উপন্যাসে উঠে এসেছে বাস্তবসম্মতভাবে।

আকর গ্রন্থ:

১. সাধন চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র (১ম খন্ড), কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ ১৪১৮.

২. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সমুদ্র দুয়ার, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০১০.

৩. সোহরাব হোসেন, গাঙ বাঘিনী, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০১১.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. জলিল, এ.এফ.এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০০০।

২. দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৩. মলয় দাস, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

৪. শচীন দাস, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

৫. সনৎকুমার নস্কর ও ছন্দা রায়, সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. ড. দেবজ্যোতি মন্ডল, সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য, জীবন মন্ডল হাট, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা, সমকালের জীবন কাঠি প্রকাশন। প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল ২০১৬।

৭. ইন্দ্রানী ঘোষাল, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন তাদের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, কলকাতা, গ্রন্থন, প্রথম প্রকাশ ২০০৬।

৮. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রি, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, রিডাস সার্ভিস, ২৩ জানুয়ারি ২০০৭।

রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রাতিক্রমী দুই সমনামি কবি: যতীন্দ্র ও যতীন্দ্র

সম্রাট কুমার পাল
প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক

সারসংক্ষেপঃ *যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭ শে নভেম্বর নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহন করেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে তার কর্ম জীবনের সূচনা হয়। সারদাচরনের অর্থানুকুল্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় 'বিদ্যাপতি পদাবলী' সংকলনের কালে তিনি কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিতি লাভ করেন।ইতিহাস চেতনা অতীতের সাথে বর্তমানের যোগাযোগ,ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান সময় এর সম্পর্ক এগুলিকে তুলে ধরেছেন তার কবিতার মধ্যে। কোথাওবা গ্রাম বাংলার মানুষের হাসি-কান্না হৃদয় বেদনার ধারাভাষ্য নিয়ে বহেমিয়ান এলোমেলো জীবনের ঘটনার ছবি এঁকেছেন। অন্যদিকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বধমান জেলায় জন্মগ্রহন করেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।১৯০৩ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার জেলাবোর্ড এর সহকারী ইঙ্গিনিয়ারিং পদে যোগদান করেন। ৩৬ বছর বয়সে প্রথম বই 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়।কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রায় একদশক পরে জন্মগ্রহন করেও রবীন্দ্রনাথ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। গ্রাম মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যথা, বেদনাকে বেশি করে তুলে ধরেছেন। সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেকে অন্যমাত্রায় নিয়েগেছেন।*

সূচক শব্দঃ বহে*মিয়ান,রিয়ালিষ্টিক,আবেষ্টনি,ধারাভাষ্য,বিহঙ্গ।*

নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত সমশেরপুরের বাগচী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রমোহন। এই বাগচী পরিবার এক সময় জমিদার পরিবার হিসাবে পরিচিত ছিল। এই বংশের রামগঙ্গা বাগচী ছিলেন নসীপুররাজের দেওয়ান। তাঁর পুত্র হরিমোহন ছিলেন কবির পিতা। কবির জননী হলেন গিরিশমোহিনী দেবী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কবির জন্ম হয়। কবির ছেলেবেলা অতিবাহিত হয় সমশেরপুর গ্রামে। তখনকারই ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে বহরমপুরে মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয়ে

তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করেন। দু-বছর পর ডাফ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর কবিতা রচনার সূচনা হয়। তাঁর কর্মজীবন ছিল বৈচিত্রময়। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। সারদাচরনের অর্থানুকুল্যে নগেন্দ্রেনাথ গুপ্তর সম্পাদনায় 'বিদ্যাপতি পদাবলী' সংকলন কালে সারদাচরনের প্রতিনিধিরূপে যতীন্দ্রনমোহন নগেন্দ্রনাথ কে সাহায্য করেছিলেন। এই সময়েই তিনি পরিচিত হন কলকাতার সাহিত্যিকমহলে। তিনি অল্প বয়সেই সমকালীন লেখক ও বরেন্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিল কবির অবাধ বিচরণ। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন রবীন্দ্র পরিমন্ডলের একজন অন্যতম কবি। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে যতীন্দ্র মোহনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লেখা' প্রকাশিত হয়। 'লেখা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পূর্বেই 'সাহিত্য' 'ভারতী', 'বঙ্গ দর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তি : 'আমার প্রথম কাব্য 'লেখা' গ্রন্থখানি আমার অনুরোধে কবি (রবীন্দ্রনাথ) অদ্যন্ত অতি সযত্নে দেখিয়া দিয়ে ছিলেন। কাটিয়া ছাঁটিয়া, মাঝে মাঝে দু-চার ছত্র নিজ হইতে যোগ করিয়া দিয়াও তিনি যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, যে কথা আমার ইহজীবনে ভুলিবার নহে, ঐ গ্রন্থ তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'[১]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ শিরে ধারন করে সেই আদর্শে নিজের কাব্য তরনীকে নিয়ন্ত্রন করে 'রেখা' (১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৩), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'নীহারিকা '(১৯২৭), প্রভৃতি কাব্যের সাহায্যে পাঠকমনে নতুন রসের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। ইতিহাস চেতনা, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, তার কবিতাকে এক বিশেষ স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। তার মধ্যে রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও তার স্বদেশ প্রেম এবং সুস্থ জীবনবোধ তাকে এক স্বাতন্ত্রতা দান করেছে। তার কবিতার বিষয়বস্তু মহনীয় বা সাময়িক নয়। গ্রাম জীবনের অকৃত্রিম প্রকৃতি ও মানুষের রুপকে তিনি সারল্যের সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। 'দিদি হারা' কবিতায় কবি গ্রাম্য শিশুচিত্তের বেদনার প্রকাশ ঘটিয়ে লিখেছেন---

"বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই-
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে পুকুর পাড়ে ঝিঝি ডাকে ঝোপে ঝারে,

নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতো জেগে রই;--
রাত হল যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?”[২]

গ্রাম বাংলার মানুষের হাসি-কান্না, হৃদয় বেদনার ধারাভাষ্য নিয়ে বোহেমিয়ান এলোমেলো জীবনের ঘটনাকে তুলে ধরেছেন কবি। অন্ধ বধূ কবিতাটিতে কবি বাঙ্গালীর ঘরের বঞ্চিতা বধূর অসহ্য হৃদয়ে বেদনাকে নিপুণ হাতে প্রকাশ করেছেন----

‘বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি পাতায়,
জন্ম- দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির -বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে---
সকল বালাই বহি আপন মাথায় !’[৩]

তার এই সহৃদয়তায় “চাষার মেয়ে” “জেলের মেয়ে” “মালোর মেয়ে” সকলেই স্নেহ ধারায়--- অভিষিক্ত হয়েছে।

যতীন্দ্র মোহন এই আন্তিরিকতা ও হৃদয় তন্ময়তা কেবল বাঙালি জীবন চিত্রনে নয়, নিসর্গ চিত্রনে ও লক্ষ্য করা যায়। বাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে গ্রাম জীবনের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় মিলেমিশে আছে শৈশব স্মৃতি বিজরিত নিসর্গ প্রকৃতির এক অপরুপ মায়া। গ্রাম বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্যকে যতীন্দ্র মোহন গভীর অনুরাগের সঙ্গে কবিতায় তুলে ধরেছেন। পল্লি গ্রামের সঙ্গে তার যোগ অন্তরের। নদিয়া জেলার যে ছোট্ট গ্রামে কবির জন্ম সেখানকার প্রকৃতি, বাঁশ বাগান, রাঙ্গা মাটির পথ স্বাভাবিক রং রুপ নিয়ে কেবল ইন্দ্রিয় সচেতনতার বিকাশ ঘটায়নি তা হয়ে উঠেছে প্রাণময়। ‘জন্ম ভূমি’ কবিতাটি তার অদ্বিতীয় আস্বাদন,------

‘পুবের দিকে আম- কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা ---
ওইটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী
ওইখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি!’[৪]

আর এই প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে তার রোমান্টিকতা। তিনি রোমান্টিক বলেই হয়তো গ্রামকে ভালোবেসেছেন।গ্রামের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। রোমান্টিক প্রেমের সুমিত প্রকাশে তার কবিতা গুলি হয়েছে অনুপম। ‘হাফিজের স্বপ্ন’ কবিতায় তা বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়েছে।– “ অমা যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ আঁধার খর্জুর বিথী, তাহারি আড়ালে দিয়া!’[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের অভিঘাত কবিকে তার নিজস্বতা থেকে টলাতে পারেনি। তাই তিনি পুরানো দিনের ছন্দ, কল্পনালতা, গ্রাম্য জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রাকৃতিক উদাসীনতা ও নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্ট থেকেছেন, পরাধীন 'ভারতবর্ষে' সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে তিনি কর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন কর্মের মধ্যেই দাসত্বের যুক্তি। কর্মই একমান পথ যা জীবনেকে স্বনির্ভর বা 'স্বাবলম্বী' করে তুলতে পারে। 'বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্ম যোগের অন্ত নাই,

কর্ম সে যে ধর্ম মোদের, কর্ম চাহি 'কর্ম চাই'[৬]

যতীন্দ্র মোহনের কাব্য সাধনা বহুমুখী। তিনি কেবল ঘরোয়া সুখ-দুঃখ বর্ণনায় নিজেকে আরদ্ধ না রেখে তিনি নিজেকে বহুতে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করেছেন। কাব্য রচনার শেষের দিকে তার প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছিল পুরাণের নবজন্ম মূলক কাহিনীকাব্যে। পুরাণের নবজন্ম সাধন আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের অন্যতম কৃত্য। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তি সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বিদায়-অভিশাপ' প্রমুখ কাহিনী কবিতা পৌরাণিক চরিত্ররা রবীন্দ্র কলমে হয়ে উঠেছে আধুনিক মানুষ। রবিন্দ্রানুসারী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচিও এই কৃতিত্বের আধিকারি, তিনি বাঙালি ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন না করে, মহাভারতের কাহিনীর পরিবর্তন না ঘটিয়ে মূল কাহিনীর আধারে আধুনিক যুগের জীবন রস যে ভাবে পরিবেশন করেছেন তাতে পুরাণকাহিনী নবরুপ লাভ করেছে। রাবীন্দ্রিক ধারা থেকে সরে অন্য পথ অনুসরনের প্রয়াস 'কল্লোল' যুগের আগেই শুরু হয়ে যায়। তার প্রধান নিদর্শন মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা।

১৯১৪-১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময় এই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত লেগেছিল ইউরোপে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক অসাম্য আগে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল ইউরোপে। ইউরোপে বিশ্ব যুদ্ধের আগেই তৈরি হচ্ছিল জাতিয় সংঘাত। ফলে ভিক্টোরীয় যুগের শান্তি, সুস্থিতি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। আর মানুষ বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জীবিতদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধের আঘাতে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি ইউরোপে ঘনিয়ে আসে খাদ্য সংকট, নানা দিক থেকে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পরে। ফলে নৈতিকতা এবং মানবিক মুল্যবোধ গুলি হয়ে পরে বিপর্যস্ত। সমাজের এই মৌলিক পরিবর্তনে সাহিত্যের মধ্যে আসে পরিবর্তন। ইউরোপীয় সাহিত্যেকরা রোমান্টিকতাকে ছেরে দিয়ে রিয়ালাস্টিক বা বাস্তবধর্মী সাহিত্য

রচনা শুরু করে। ফলে মানুষের জীবনে এক গ্লানিকর দিকগুলি সাহিত্য উঠে আসতে শুরু করে। আর ফ্রয়েডের 'মনোবিকলন' তত্ত্বের আবিষ্কারের পর সাহিত্য এতকাল নিষিদ্ধ যৌনতার খোলাখুলি ব্যবহার শুরু হয়। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্য আসে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী গতি।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে রবীন্দ্র অতিক্রমি কাব্য চর্চার যে চেষ্টা হয়েছিল তা পাশ্চাত্য অনুসরণে রিয়ালিস্টিক হতে চাইল। ভারতবর্ষ বিশ্বযুদ্ধের অংশ না নিলেও বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভ শুরু হয়। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তা প্রসারিত রুপ লাভ করে। ফলে সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্তিরতা শুরু হয়। আর এই পটভূমিতে রোমান্টিক কাব্য ধারার বিপরীতে রিয়ালাস্টিক কাব্য চর্চা শুরু হয়। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' এই দুই পত্রিকায় সেই বাস্তবধর্মী সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র অতিক্রম প্রয়াসের একজন অন্যতম কবি। তার জন্ম ২৭ শে জুন ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পাতিল পাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতৃভূমি নদিয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে কবির পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত এবং মাতার নাম মোহিতকুমারী দেবী। কবির শৈশব অতিবাহিত হয় হরিপুরের গ্রামীণ পরিবেশে। সেকালের গ্রামীণ পরিবেশ রামায়ণ, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি গানের সমারোহ ছিল। যতীন্দ্রনাথ সাগ্রহে এই সব অনুষ্ঠানের যোগ দিতেন। হরিপুরের গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কবি বার বছর বয়সে কলকাতা যান। কলকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়াশোনা করেন এবং ১৯০৩ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ এ তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। এবং ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নদিয়া জেলার জেলা বোর্ডের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারিং পদে তিনি যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯২৩ সালে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজ এসেস্টের ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। তখন তার বয়স ৩৬ বছর। সেই বছরই তার প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। 'মরীচিকা' র কবিতা গুলি কৃষ্ণনগরের নদিয়া জেলা বোর্ডের চাকরি করবার সময় ও তৎপূর্বে রচিতা। কৃষ্ণনগরের থাকা কালীন কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচির সঙ্গে পরিচয় ও তার সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে তিনি রীতিমত কবিতা লেখা আরম্ভ কারন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় রীতিমত যতীন্দ্রনাথ প্রথম রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে পরিচয় (১৯০৫-১১) তার বক্তব্যঃ-

"   বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হয়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে পরেছে সেও কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা 'কুরুক্ষেত্র' পরেছিলাম, মাইকেলের 'সীতা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোকতরু' প্রভৃতি দশ বিশটা কবিতা ও পরা ছিল। বাল্যকালের পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারত খানি যতীন দেখিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার শেষ করেছিল। গ্রামেরমুচিপাড়া ও কুলাপাড়া বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তার তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখন পরিনি, গান দু- দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হেসে বলল নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথের কি তফাৎ সেটা বোঝাবার জন্য রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থা বলী তোমাদের দেব, আগামি বর্ষাবকাশে পরে দেখো, তারপর তর্ক করো। মিহির প্রদত্ত, আরও দীর্ঘ সমান, এক খানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পরে দেখে আমরা তো অবাক হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণ প্রায় যতীন বললে ধরিত্রী দ্বিধা হও।"[৭]

কবি যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র ছত্র ছায়াতলে পরিবর্ধিত হয়েও কবি দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র—রোমান্টিক বিরোধী এবং রবীন্দ্র কাব্যের বিপরীত স্রোতের কাণ্ডারি। তিনি এক বিশিষ্ট শাখা পথ সৃষ্টি করে এমন এক ধরনের কবিতা লিখেছেন যেন তিনি আপন মহিমায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন। পেশায় তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ইট, কাঠ- পাথর নিয়ে ছিল তার কারবার। সুতরাং তার হাতুড়ির ঘায়ে ভাব জগতের ভাববিলাস সম্পূর্ণ বিনষ্ট করাই ছিল তার অভিলাষ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গিক ভিত্তি করে তিনি রবীন্দ্র প্রভাবের সাবেকী সত্তাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। প্রেম প্রকৃতি, ভগবান, রোমান্টিকতা প্রভৃতি ক্রিতিম তার আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ' আকোবর্জিত' জীবন ও জগত এর অন্তরালবর্তী কঠিন বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের সাথে পাশ্চাত্য কবি ও উপন্যাসিক টমাস হার্ডি র অনেক সাদৃশ্য আছে। হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যেই জীবন ধর্মময় বিজ্ঞান চেতনা আছে, আরও সেই বাস্তব দৃষ্টি আছে যা জীবনের Others side কে নির্ভুল ভাবে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করে। হার্ডি যেমন মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের নিলিপ্ততা ও প্রশান্তি থেকে যুদ্ধোত্তর বাস্তব চেতনার দিকে ইশারা করেছেন, যতীন্দ্রনাথ সেই রকম রবীন্দ্র কাব্যের স্বপ্নালুতা থেকে সাম্প্রতিক বাস্তবায়িত উত্তরণের স্বাভাবিক সেতু নির্মাণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্য রচনাকাল পঁয়তাল্লিশ বছর (১৯১০-১৯৫৪)। তার কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা

ছয়। -- 'মরীচিকা' (১৯২৩), মরুশিখা(১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০) 'সায়ম'(১৯৪০), ত্রিযামা(১৯২৮), 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭)। তার 'মরীচিকা' 'মরুমায়া' 'মরুশিখা' কাব্যে ভালবাসাহীন জীবনের দুঃখ কথা ব্যক্ত হয়েছে রঙ্গ পরিহাসময় বক্রোক্তিতে। ঘুমের ঘোরে কবিতায় কবি লিখেছেন

'চেরা পুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গবী সাহারার বুকে ?'[৮]

জীবনের সামাঞ্জস্যহীনতা এমন ভাবে আর কোন কবিতার কবিতায় বোধ হয় প্রকাশিত হয়নি। তার কাব্য চর্চার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, ঈশ্বর তার কাছে 'বন্ধু' রুপে আবির্ভূত, কখনও সেই বন্ধু আবার তার নিজের সত্তার প্রতিপক্ষ। শিব চেতনাতেও যতীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। তার মতে, নিখিল বিশ্ব জুরে বিরাজ করে রুদ্র দেবতা শিবের অন্তহীন দুঃসহ বহ্নিজ্বালা। তিনি রুদ্রের বহ্নিজ্বালার উপাসক এই বহ্নিকে তিনি বিরাট বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন আর মানব চিত্তে এর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তাই তার মধ্যে 'বহ্নিস্তুতি' র আয়োজন দেখি---

'নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।'[৯]

রবীন্দ্র যুগের রোমান্টিকতা বিরোধী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি অন্যতম কবিতা 'নবান্ন' কবিতাটি কবির স্বর্গতোক্তিমূলক কবিতা। কবিতাটি 'মরুমায়া' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। কবি এক কৃষকের জবানবন্দীতে এই কবিতায় দীনবন্ধু ঈশ্বরের কাছে তার অতি প্রকাশ করেছেন। অঘ্রান মাসে গ্রামে নবান্নের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত। চারিদিকে উৎসবের সমারোহ। কিন্তু তার আগেই সেই কৃষকের পাকা ধানে মই' অর্থাৎ ফসল নষ্ট হয়েছে। এই বিনষ্ট প্রাকৃতিক কারনে নয় মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। কবি যতীন্দ্রনাথ একজন কৃষকের ছদ্মবেশে নবান্নের আপাত খুশির আড়ালে জীবনের দুঃখটাকেই বড় করে দেখেছেন। তিনি সকলের মতোই নতুন ফসলকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শেষ পযন্ত তিনি সময়ের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। কবিতায় তিনি "তুচ্ছ" শব্দটি ব্যবহার করে এক নির্মম ব্যঙ্গ করেছেন যতীন্দ্রনাথ চেতনায়------

'মিথ্যা প্রকৃতি মিছে আনন্দ মিথ্যা রঙিন সুখ
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুঃখ।'[১০]

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে “সেরা শহরের ইট পাথরের বিরাট নগর, যখন প্রচণ্ড তাপে জ্বরঘোরে যেন ধুকে শহরবাসী যখন রুদ্ধশ্বাস ঘরে তড়িৎ পক্ষের হাওয়ার ব্যবস্থা করে তখন কবির দৃষ্টি পরেছে ‘কানন রানির শিশু কন্যা, বকুলের প্রতি কে তাকে তার শ্যামল পরিবেশ থেকে কেরে এনে লোহার খাঁচার মধ্যে আটক করে মানুষের সেবায় লাগিয়ে দিয়েছে। সেই বকুলের দিকে তাকিয়ে কবি বলেছেন—

‘জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরের পথ চলি আর ভাবি,
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটাতে নরের দাবি।’[১১]

‘পাষাণ পথে’কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি শাসক শ্রেণির অবোধ শোষণে শোষক শ্রেণী কি ভাবে ভোগ বিলাসের দাবি হয়ে উঠে সেই কথা ব্যক্ত করেছেন।

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই কবি দুঃখবাদ ও নাস্তিকতার মধ্যে দিয়ে জগত ও জীবনকে ইট –কাঠ- পাথরের মত নীরস মান করেছেন। তার কাব্য গুলিতে প্রকৃতির সরসতা নেই, আছে মরুভূমির উষ্ণতা ও রুক্ষতা। কাব্যের নামকরনের মধ্যে ও আছে সেই অনুভবের স্পর্শ। বিংশ শতাব্দীর কাব্য জগতের মহারথী মোটামুটি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনুসারী ও রবীন্দ্র বিরোধী, রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের কবিরা সাধারণ ও গ্রাম্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং লোক সংস্কৃতি ও পুরাণ কাহিনী ভক্ত। আধুনিক জীবনে সংশয়, বিক্ষোভ, ব্যথতা, নৈরাশ্যের প্রভাব এদের কবিতার মধ্যে তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এই কবির সাধারণত রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজি কাব্যের ভক্ত। যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতায় যে প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি তাতে তাকে অনায়াসেই রবীন্দ্রানুসারী কবি বলা যায়। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে রবীন্দ্র বিরোধী কবি রুপে চিহ্নিত করা হলেও তাকে রবীন্দ্র বিদ্বেষী বলা যায় না। কারন তার একাধিক কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। ‘সায়ম’ কাব্যে ‘রবি প্রণাম’, এবং ‘ত্রিযামা’ কাব্যের ‘কবির ছবি’ কবিতায় তার রবীন্দ্রানুরুক্তি প্রকাশিত। ‘রবি প্রনাম’ কবিতায় তিনি অকপটে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ যেন সমকালীন বাংলা কাব্যকাশে সূর্যের মত, আর যতীন্দ্র প্রমুখ অনুজ কবিগন সেই কাব্যকাশের বিহঙ্গ। তিনি নিজেদের বলেছেন ‘রবির পাখি’। যতীন্দ্রনাথ প্রেম, প্রকৃতি ঈশ্বর, মানুষের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। শ্যামল বাংলার কবি হয়েও তিনি মরুভূমির শূন্যতাকে বেশি করে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি শিবের রুদ্র রুপে বেশি আকর্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই অবিশ্বাসের জগতে নিজেকে স্থায়ী রাখতে পারেনি। রোমান্টিক কবি দৃষ্টি ভঙ্গিকে তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রহন

করেছিলেন। 'সায়ম' কাব্যের 'মন্ত্রহীন' কবিতায় কবি প্রেম ও প্রিয়াকে স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু মাত্র 'সায়ম' কাব্য নয় এই কাব্যের পূর্ববর্তী কাব্য 'মরীচিকা' কাব্যের 'নব নিদাঘ' কবিতায় কবির মনে রোমান্টিক চেতনা বহমান ছিল।

'ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্মে তোর!' [১২]

মুখোশ যেমন মুখ ঢেকে রাখলেও মুখকে মুছে ফেলতে পারেনা তেমনি যতীন্দ্রনাথ রোমান্টিক আবেগ ও সৌন্দর্যানুভুতিকে একসময় সচেতন ভাবে এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হতে চাইলেও তা পারেনি; তিনি হয়েছেন রবীন্দ্রাতিক্রমি কবি।

তথ্যসূত্র:

১. গোরা সিংহরায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা,ভারবি,কলকাতা।
২. তদেব।
৩. তদেব।
৪. তদেব।
৫. তদেব।
৬. তদেব।
৭. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়, রবিন্দ্রানুসারী কবিসমাজ,দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা।
৮. সুশান্ত বসু, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা,ভারবি,কলকাতা।
৯. তদেব।
১০. তদেব।
১১. তদেব।
১২. তদেব।

ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তনে কালিদাস

দেবব্রত বৈদ্য
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
ফকিরচাঁদ কলেজ, দ. ২৪ পরগণা

সারসংক্ষেপ: *ঋষি কবি ব্যাস ও বাল্মীকির পর সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকবি হিসাবে কালিদাসই পরিচিত। তাঁর লেখনী ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব হৃদয়কে অতিনিবিড়ভাবে আপ্লুত করেছে। তাঁর রচনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক রূপ ফুটে উঠেছে। কালিদাসের কাব্যকৃতির গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় বহন করে এই সাতটি রত্ন—**ঋতুসংহার, মেঘদূত**—এই দুটি খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, **কুমারসম্ভব, রঘুবংশ**—এই দুটি মহাকাব্য এবং **মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়** ও **অভিজ্ঞানশকুন্তল**—এই তিনটি নাটক। ধারণার্থক 'ধৃ'-ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যা আমাদেরকে ধারণ করে তাই ধর্ম। বেদোপদিষ্ট ধর্ম পালনের মাধ্যমে সমাজজীবনে যে স্থিতি উৎপন্ন হয় সেই স্থিতিই ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের সহায়ক হয়ে ওঠে। ধর্ম মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করে প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং কল্যাণের পথ দেখায়। কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের পরম আরাধ্য দেবতা হলেন 'শিব'। তিনি শৈব হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তথা অন্যান্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অগাধ। আর যা হল তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যটি যেমন শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বহন করে, তেমনি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যটিও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল পরজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, পূর্বজন্মের সংস্কার পরজন্মকে প্রভাবিত করে—এই বিষয়টি তিনি রচনার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও কৃতকর্মের ফল থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হল মোক্ষলাভ করা। এই মোক্ষলাভ করা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা, তা তিনি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে রঘুর সন্ন্যাস জীবন বর্ণনাকালে দেখিয়েছেন।*

সূচকশব্দ: *কালিদাস, নাটক, মহাকাব্য, ঈশ্বর, শিব, যোগ, মোক্ষ।*

মূল আলোচনা :

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে নানাভাষা, নানা মত, নানা পরিধান—এই ভিন্নতার মাঝে যে মহান্ মিলন তার মূল ঐক্যসূত্র 'সংস্কৃত'। এই সংস্কৃতের মধ্য দিয়েই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ পেয়েছে অখণ্ডতার পরিপূর্ণতার স্বাদ, বিরোধের মধ্যে ঐক্যের চিরন্তন

বাণী। এই সংস্কৃতই আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতভূমিকে অচ্ছেদ্য ভাববন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ বলতে আমাদের কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়।

"যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।।"

এই সংস্কৃত ভাষাকেই উপজীব্য করে ভারতবর্ষের চিন্তা, ভাবনা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বহু বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্কৃত ভাষাতেই রামায়ণ-মহাভারতের মতো কালজয়ী মহাকাব্যদ্বয়, বেদ, উপনিষদ্, পুরাণাদি শাস্ত্র রচিত হয়েছে। আর সেই সংস্কৃত ভাষাকেই মাধ্যম করে মহাকবি কালিদাস তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন। তাই তখনকার ভারতবর্ষ তথা প্রাচীন সভ্যতাকে জানতে গেলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে অবশ্যই জানতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

"ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দ্বে, সংস্কৃতং সংস্কৃতিস্তথা।"

ভারতীয় সাহিত্যগগণে মহাকবি 'কালিদাস'-এর নাম সূর্যের মতো অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করে আছে। তিনি কেবলমাত্র কবি নন, মহাকবি। প্রতিভার স্পর্শে তাঁর নাম তথা খ্যাতি দেশ ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্বহৃদয়ের অভিমুখেও পৌছে গিয়েছে। 'কালিদাস' শব্দটি বর্তমানে কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে দ্যোতিত করে না, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুবর্ণযুগকে সূচিত করে। ভারতজননীর প্রতিভাবান্ সন্তানগণের মধ্যে কালিদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ সন্তান। তাঁর রচনা সহৃদয়ের হৃদয়কে অতি নিবিড়ভাবে আপ্লুত ও পরিতৃপ্ত করে। মহাকবির কাব্যরসসুধা পান করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা কালিদাসকেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতিও জানিয়েছেন। তাই পণ্ডিতমহলে উচ্চারিত সুভাষিতটি উচ্চারণ না করে থাকা যায় না—

"পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গেকনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসঃ ।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব।।"

অর্থাৎ পুরাকালে কবিদের সংখ্যা গণনা করার সময় প্রথম কবি হিসাবে কালিদাসকে কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তারপর তাঁর তুল্য দ্বিতীয় কোনো কবি আবির্ভূত না হওয়ায় পরবর্তী অঙ্গুলির অনামিকা (ন নামিকা = নামহীনা)—এই নাম রাখা সার্থক হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য মনীষীরাও অকৃপণভাবে কালিদাসবন্দনায় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। অধ্যাপক Lassen বলেছেন—"The brightest star in the firmament

of Indian artificial poetry.” এই সমস্ত প্রশস্তির কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ মহাকবি কালিদাস তাঁর আপন প্রতিভার স্পর্শে স্বপ্রকাশ হয়ে আছেন। এই প্রশস্তি প্রদীপ দেখিয়ে সূর্যদর্শন করানোর মতো, যা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, বিক্রমোর্বশীয়, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তল—এই সাতটি রচনা কালিদাসের রচনারূপে বহুল প্রচলিত ও বহুজনস্বীকৃত। এদের মধ্যে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ—এই দুটি মহাকাব্য; মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তল—এই তিনটি দৃশ্যকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার খণ্ডকাব্যরূপে পরিচিত। ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় মহাকবি অননুকরণীয় তথা অদ্বিতীয়। মহাকবির চিত্তাকর্ষক উপমার ন্যায় বর্ণনাও স্বাভাবিক ও কৃত্তিমতাশূন্য। মহাকবির রচনার মধ্যে প্রকৃতির নিসর্গচিত্র, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আইন-আদালত, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি নানান বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে।

ধারণার্থক ‘ধৃ’-ধাতুর উত্তর ‘মন্’ প্রত্যয় যোগ করে ‘ধর্ম’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যা আমাদেরকে ধারণ করে তাই ধর্ম। মহাভারতের ভাষায় বললে—“ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।” ধর্ম যদি আমাদের দ্বারা রক্ষিত হয় তাহলে ধর্মও আমাদেরকে রক্ষা করবে। বেদোপদিষ্ট ধর্ম পালনের মাধ্যমে সমাজজীবনে যে স্থিতি উৎপন্ন হয় সেই স্থিতিই ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের সহায়ক হয়ে ওঠে। ধর্ম মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করে প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং কল্যাণের পথ দেখায়। ধর্ম সৎপথে থাকা ব্যক্তিদেরকে জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখপূর্ণ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি করে মোক্ষপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়। এই ধর্মের উপরেই আমাদের সভ্যতা নির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ধর্মের মূলস্তম্ভ হল—‘বেদ’।

“বেদোঽখিল ধর্মমূলম্।”[১]

ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মীমাংসাসূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন—

“চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ।”[২]

অর্থাৎ যে ক্রিয়া পুরুষের ইষ্টফলের সাধনরূপে বেদে উপদিষ্ট হয়েছে তারই নাম ধর্ম। বেদবিহিত যাগাদিক্রিয়াই ধর্ম। ধর্মশাস্ত্রকার পরপূজ্যপাদ মনু তাঁর সংহিতায় ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।”[৩]

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। ধর্মের লক্ষণে যে সত্যের কথা বলা হয়েছে তার প্রতি জোর দিয়ে মনু আরও বলেছেন—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"[৪]

অর্থাৎ সত্যকথা বলবে, প্রিয়কথা বলবে, কিন্তু সত্যকথা যদি অপ্রিয় হয় তাকে বর্জন করবে। মিতাক্ষরাটীকাতে ছয় প্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে— "বর্ণধর্মঃ, আশ্রমধর্মঃ, বর্ণাশ্রমধর্মঃ, গুণধর্মঃ, নিমিত্তধর্মঃ, সাধারণধর্মশ্চ।"[৫]

কবিকুলশিরোমণি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ধর্মের স্বরূপ ও প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলেছেন—

"কর্মবন্ধছিদং ধর্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ।"[৬]

অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলভোগ স্বরূপ সাংসারিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যার দ্বারা মুক্তিলাভ করতে পারেন তাই হল ধর্ম। মহাকবি ব্যক্তিগত জীবনে কোন ধর্ম মতাবলম্বী ছিলেন তা তাঁর কাব্য পাঠ করলে সহজেই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মহাকবির নাটকত্রয়ের নান্দীশ্লোকে শিবের বন্দনা করা হয়েছে। প্রথমেই বলা যাক 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের কথা। এই নাটকের নান্দীশ্লোকে মহাকবি অষ্টমূর্তিধর শিবকে আহ্বান করেছেন—

"একৈশ্বর্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ।।"[৭]

'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের নান্দীশ্লোকে ভক্তিযোগসুলভ 'স্থাণু', 'একপুরুষ' শিবকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম জানিয়েছেন—

"বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ।।"[৮]

এবং মহাকবি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এর মঙ্গলাচরণশ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিবের কাছে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি র্যা চ হোত্রী,

যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজ প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।”[৯]

কেবলমাত্র মঙ্গলাচরণশ্লোকে নয়, এই নাটকের ভরতবাক্যেও তিনি অনন্ত শক্তির আধার স্বয়ম্ভূ নীললোহিত শিবের কাছে পুনর্জন্ম নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন—

“প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।।”[১০]

আবার তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশেও তিনি জগতের পিতামাতাস্বরূপ শিব ও পার্বতীর বন্দনা করেছেন—

“বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।”[১১]

তাঁর অপর মহাকাব্য ‘কুমারসম্ভব’-এর বিষয়বস্তু আবার শিব ও পার্বতীর প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিরহমূলক খণ্ডকাব্য মেঘদূতেও মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতির বর্ণনায় শিবের প্রতি অনুরাগ ফুটে উঠেছে।

এর থেকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের পরম আরাধ্য দেবতা হলেন ‘শিব’। অর্থাৎ তিনি ছিলেন শৈব। তিনি শৈব হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তথা অন্যান্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অগাধ। আর যা হল তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনার মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনাও দৃষ্ট হয়। ‘কুমারসম্ভব’ মহাকাব্যটি যেমন শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বহন করে, তেমনি ‘রঘুবংশ’ মহাকাব্যটিও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর রচনার মধ্যে দেবী সরস্বতী ও শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর উপাসনাও লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এবং ধন ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী—এই দুই দেবীর সহাবস্থান সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না, তা সত্ত্বেও মহাকবি তাঁর ‘বিক্রমোর্বশীয়’ নাটকে সজ্জনের উন্নতির জন্য এঁদের দুজনের এক হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন—

“পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েঽস্তু সদা সতাম্।।”[১২]

মহাকবির সময়ে সাধারণের ধারণা ছিল লক্ষ্মী চঞ্চলস্বভাবা। এই ধারণাকে অগ্রাহ্য করা কঠিন কাজ। তাই তিনি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন—লক্ষ্মী আশ্রিতদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য ছিদ্র খোঁজেন। তাই রাজা দশরথ অগ্নির মত দীপ্তিমান্ ও চন্দ্রের মত কান্তিমান্ হওয়ার সত্ত্বেও আলস্য ত্যাগ করে রাজকার্য করতে থাকতেন—

"শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোমসমদ্যুতিঃ।"[১৩]

শিব ও পার্বতীর বিবাহানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর দেবী সরস্বতী তাঁদের গুণবর্ণনা স্তবগানের মধ্যে দিয়ে করতে লাগলেন—

"দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন।।"[১৪]

মহাকবির রচনায় বহু দেব-দেবীর উল্লেখ থাকলেও আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে উদার মানসিকতার পরিচয় তাঁর 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের সপ্তম সর্গের একটি শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়—

"একৈব মূর্ত্তির্বিভেদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদৌ।।"[১৫]

কালিদাসের সাহিত্য পর্যালোচনা করে জানা যায় যে তিনি বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী হলেও তাঁর মতে সকলের উপরে এক সৃষ্টিকর্তা বর্তমান, আর তিনি হলেন—'ঈশ্বর'।

"বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষম্।"[১৬]

অর্থাৎ বেদান্তে যাঁহাকে 'একপুরুষ' বলে আখ্যা দেওয়া হয় তিনি এক, দ্বিতীয় কেউ নেই। 'ঈশ্বর' শব্দটির প্রয়োগ তাঁর রচনার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে তিনি বলেছেন—

"বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"[১৭]

অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষ অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষ হয়। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের মঙ্গলাচরণশ্লোকে বলেছেন—

"যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।"[১৮]

'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে মহাকবি ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন—

"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।"[১৯]

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এক, পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছেন।

মহাকবির আবির্ভাবের পূর্বে সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিরা জন্মান্তর, কর্মফল, মোক্ষ, পরমাত্মা প্রভৃতি বৈদিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে ধর্মের প্রবর্তন করে গেছেন সেই সনাতন ধর্ম কালিদাসের যুগেও বর্তমান ছিল। তাই তাঁর রচনার মধ্যে সেই সনাতন ধর্মের তত্ত্বগুলিও ফুটে উঠেছে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল পরজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, পূর্বজন্মের সংস্কার পরজন্মকে প্রভাবিত করে—এই বিষয়টি তিনি রচনার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মেঘদূতের পূর্বমেঘের একটি শ্লোকে বলেছেন—যে প্যুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গে গিয়ে বাস করে, সেই প্যুণ্যের ফল শেষ হয়ে গেলে মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণের নিমিত্ত পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়—

"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাম্।"[২০]

পূর্বজন্মের প্রণয়ের স্মৃতি মনের অবচেতনাংশে থেকে যায়, চেতনাংশে আসতে পারে না। কিন্তু সেই স্মৃতি জীবের অজ্ঞাতসারে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই তত্ত্বের সুন্দর চিত্র 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্তের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।।"[২১]

এমন দৃশ্য রঘুবংশেও রামচন্দ্রের বামনাশ্রম দর্শনের বিবরণদান কালে দেখা যায়—

"উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্যস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ।"[২২]

পূর্বজন্মের অধীতবিদ্যার সংস্কার পরজন্মে মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে তা জানাতে গিয়ে মহাকবি পার্বতীর বিদ্যাশিক্ষার কথা বলেছেন—

"স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।"[২৩]

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করতে হয়। ইহা রঘুবংশে তার মুখ দিয়ে মহাকবি ব্যক্ত করেছেন—

"মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ।"[২৪]

আমরা আমাদের কার্য থেকে বিরত হলে তার ফল আমরা পরে পাই।মেঘদূতে আমরা দেখি যক্ষ তাঁর কার্যে অমনোযোগী হওয়ায় অর্থাৎ রাজা কুবেরের রাজকার্যে

অমনোযোগী হওয়ায় রাজার অভিশাপে নূতন প্রেমিকা থেকে এক বছরের জন্য রামগিরিতে নির্বাসিত হয়েছিল। যা তার কাছে শতাব্দীর তুল্য হয়ে উঠেছিল—

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।"[২৫]

আবার অভিজ্ঞানশকুন্তলে আমরা দেখি শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন থাকার দরুণ অতিথি ঋষি দুর্বাসাকে সেবা না করায় কোপনস্বভাববিশিষ্ট দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ রাজা দুষ্যন্ত পরবর্তিকালে তাঁকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিল—

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"[২৬]

ভারতীয় আস্তিক দর্শনের মূল লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও কৃতকর্মের ফল থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হল মোক্ষলাভ করা। এই মোক্ষলাভ করা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা, তা তিনি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে রঘুর সন্ন্যাস জীবন বর্ণনাকালে বলেছেন—

"তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ।"[২৭]

মোক্ষলাভের আরও একটি পথের কথা মহাকবি মেঘদূতের পূর্বমেঘে উল্লেখ করেছেন—

"তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ।।"[২৮]

রাজার প্রধান কর্তব্য বা ধর্ম হল— প্রজাদের রক্ষণ ও পালন করা। এই প্রজাপালন ও রক্ষণের বহু চিত্র মহাকবির রচনায় পরিদৃষ্ট হয়। মহাকবি তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে বলেছেন—

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।"[২৯]

অর্থাৎ রাজা দিলীপ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন। তিনি আরোও বলেছেন— বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া, বিপদ থেকে রক্ষা করা, অন্ন-

বস্ত্রাদি ভরণপোষণ প্রভৃতি করার জন্য মহারাজ দিলীপই প্রজাদের পিতাস্বরূপ, আর তাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা–

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।।"[৩০]

মহাকবির সময়ে সারা দেশ ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। বর্ণাশ্রম ধর্মের পালক ও রক্ষক হলেন রাজা, তা আমরা 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে সীতার মুখ থেকেই শুনতে পাই–

"নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।"[৩১]

বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রমাণ আমরা 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে পাই। সেখানে আমরা দেখতে পাই তপস্যায় অনধিকারী শূদ্রের তপস্যাবলম্বনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তার মস্তক ছেদন করেছিলেন–

"তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্।
শীর্ষচ্ছেদং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে।।"[৩২]

আবার 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকেও মহাকবির বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করতে পারি। ষষ্ঠ অংকে ধীবর তার জীবিকা সম্পর্কে যা কথা বলেছে তা সত্যিই যেকোনো দেশের মানুষের কাছে আত্মশ্লাঘার বিষয়–

"সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং ন হি তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ।।"[৩৩]

অর্থাৎ যে বৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও কখনও পরিত্যজ্য নয়। কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পাপ্রবণ হলেও যজ্ঞাদিতে পশুহত্যা করে স্বধর্ম পালন করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহাকবি যাগযজ্ঞে পশুহত্যার মতো গর্হিত কাজকে সমর্থন করতেন। মানুষের সবচেয়ে পরম ধর্ম হল 'হিংসা না করা'– "অহিংসা পরমো ধর্মঃ।" এর পরিচয় মহাকবির 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে বৈখানসের উক্তি থেকেই পেয়ে থাকি–

"রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যো।
ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলারাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোমং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।।"[৩৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে, মহাকবির সময়ে সনাতন বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও মহাকবি কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তখন মানুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবের উপাসনা করত এবং এক সম্প্রদায়ের মানুষ অপর সম্প্রদায়ের দেবতাকে সমালোচনাও করত। মহাকবি ঈশ্বর বলতে তাঁর আরাধ্য পরমপূজ্য দেব 'শিব' তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে গিয়েছেন। মহাকবি অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনাদর ও অনাগ্রহ প্রকাশ না করলেও সেই সময়কার ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বলে মনে হয়। তাই তিনি তার রচনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো উল্লেখ করেন নি, বরং বৌদ্ধবিরোধী যজ্ঞে পশু হত্যার মত কাজকে সমর্থন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মনুসংহিতা – ২/৬
২. মীমাংসাসূত্র – ১/১/২
৩. মনুসংহিতা – ৬/৯২
৪. তত্রৈব – ৪/১৩৮
৫. যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি – ১/১, মিতাক্ষরা টীকা
৬. কুমারসম্ভব – ২/৫১
৭. মালবিকাগ্নিমিত্র – ১/১
৮. বিক্রমোর্বশীয় – ১/১
৯. অভিজ্ঞানশকুন্তল – ১/১
১০. তত্রৈব – ৭/৩৫
১১. রঘুবংশ – ১/১
১২. বিক্রমোর্বশীয় – ৫/২৪
১৩. রঘুবংশ – ৯/১৫
১৪. কুমারসম্ভব – ৭/৯০
১৫. তত্রৈব – ৭/৪৪
১৬. বিক্রমোর্বশীয় – ১/১
১৭. রঘুবংশ – ৮/৪৬
১৮. বিক্রমোর্বশীয় – ১/১

১৯. কুমারসম্ভব – ২/৪
২০. মেঘদূত, পূর্বমেঘ – ৩১
২১. অভিজ্ঞানশকুন্তল – ৫/২
২২. রঘুবংশ – ১১/২২
২৩. কুমারসম্ভব – ১/৩০
২৪. রঘুবংশ – ১৪/৬২
২৫. মেঘদূত, পূর্বমেঘ – ১
২৬. অভিজ্ঞানশকুন্তল – ৪/১
২৭. রঘুবংশ – ৮/২৪
২৮. মেঘদূত, পূর্বমেঘ – ৫৬
২৯. রঘুবংশ – ১/১৮
৩০. তত্রৈব – ১/২৪
৩১. তত্রৈব – ১৪/৬৭
৩২. তত্রৈব – ১৫/৫১
৩৩. অভিজ্ঞানশকুন্তল – ৬/১
৩৪. তত্রৈব – ১/১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. কালিদাস। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*। সম্পা. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯।

২. কালিদাস। *কুমারসম্ভবম্*। সম্পা. পণ্ডিত প্রদ্যুম্ন পাণ্ডে। বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১০।

৩. কালিদাস। *মেঘদূত পুরিচয়।* সম্পা. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭।

৪. কালিদাস।*রঘুবংশমহাকাব্যম্*। সম্পা. রামচন্দ্র ঝা। বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, ২০১২।

৫. জানা, নরেশচন্দ্র। *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: সাহিত্যালোক, ১৯৮৮।

৬. জৈমিনি। *মীমাংসাদর্শন*। সম্পা. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ২০০৯।

৭. মনু। *মনুসংহিতা*। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

৮. মল্লিক, রঘুনাথ। *কালিদাস প্রতিভা*। কলকাতা: শ্যামাশঙ্কর মল্লিক, ১৯৭৬।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

১০. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮।

জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : 'শনিবারের ছড়া'

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

"প্রবীর ঘোষ রায় সাহিত্যের প্রথাগত ছাত্র নন। ব্যবহারিক জীবনে তিনি বাণিজ্যের অধ্যাপক এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগে যুগ্ম শিক্ষা আধিকারিক হিসাবে কর্মরত। অনেকানেক বাঙালি কিশোরের মত প্রবীরবাবু কবিতায় নেশাগ্রস্ত হন স্কুলে পড়বার সময় থেকেই। শিলিগুড়ির ছেলেটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন ১৯৭৭-৭৮ সন থেকে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় নিয়মিত – সম্পাদনা করেন 'এই সময়' নামের একটি লিটল ম্যাগাজিন। ১৯৮৬তে চাকরিতে যোগ দেবার পর কিছুদিন কবিতা থেকে দূরে ছিলেন। আবার ৯০ দশকের মাঝামাঝি নিয়মিত লেখা শুরু করেন। প্রতিভাস থেকে একটি চটি বই বের হয়, নাম 'চন্দ্র মল্লিকার দিন।' কবিতার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস এবং ছোট ও বড়দের জন্যে ছড়া। ২০১২-র বুকস ওয়ে প্রকাশ করেন 'ছড়ার ছড়ি'। সেই বছরেই জর্লাক থেকে প্রকাশ পায় কাব্যগ্রন্থ 'ভাবনাগুলি' ২০১৬তে এই বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ বের হয়েছে। ২০২০তে আন্তর্জালে 'ইরিডার্স. কো. ইন থেকে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস 'অনেক দিন পর।' মার্চ ২০২১-এ দেশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য ছড়া সংকলন – 'শনিবারের ছড়া'। মানবতাবাদী এই কবি সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এই বইতে সেই উচ্চারণের শব্দ ধরা আছে পাতায় পাতায়।[১] আরেক ছড়া সংকলন – 'কবির জন্য' প্রকাশিত হয়েছে 'উদার আকাশ' থেকে। প্রকাশক ফারুক আহমেদ। ১৫ এপ্রিল ২০২১। ['কবির জন্য' গ্রন্থে লেখক পরিচিত অংশ থেকে নেওয়া]

'আমি মনে করি 'শনিবারের ছড়া' সংকলনটি নিয়ে লেখা বিশেষ জরুরি ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে যা বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। এই অচর্চিত বিষয়টি পাঠকদের স্পর্শকাতর মনে রেখাপাত নিঃসন্দেহে করবে।

সারাংশ : ছড়াকার প্রবীর ঘোষ রায়ের 'শনিবারের ছড়া' ১০০টি ছড়ার সংকলন গ্রন্থ। বিগত দুবছর ধরে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, সামাজিক অবক্ষয় ও সংস্কৃতির ভাঙন, ধর্মান্ধতার ব্যভিচার, নির্মম অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতার অসহিষ্ণুতা,

ক্ষোভ, সংঘর্ষ, দলিতের আর্তনাদ,গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিষোদ্‌গার, ছদ্ম জাতীয়তাবাদের দাঙ্গার পৈশাচিকতা, সাম্প্রদায়িক হিংসার বলীদানের জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে বইয়ের ছড়াগুলির ছত্রে ছত্রে। নামে ছড়া হলেও তার মধ্যে যে ভাব গভীরতা আছে তা বলাই বাহুল্য। নির্ভীক ছড়াকারের কন্ঠে শোনা যায় ভারতের মর্মবাণী সংহতি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতা। মিশ্র-সংস্কৃতি নিয়ে চলাই তাঁর পাথেয়। মানবতাবাদী কবি যেখানেই দেখেছেন অন্যায় সেখানেই তাঁর কলম গর্জে উঠেছে যেন 'উদ্যত তীক্ষ্ণ তরবারি।'

সূচক শব্দ: স্বৈরাচারী, সন্ত্রাসবাদী, ধৃষ্টামি, সাম্প্রদায়িক, অসহিষ্ণুতা, ছদ্ম-জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় হিংসা, গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ, মানবতার-জয়গান।

'শনিবারের ছড়া' বইটি হাতে পেলাম। মঙ্গলবার ২৩.০৩.২০২১-এ। ছড়াকার অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ রায়ের বিষয় বাণিজ্যবিভাগ জেনে কিছুটা বিস্মিতও হলাম যে, বাংলা সাহিত্য শাখার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়েও তিনি যেভাবে ছড়াচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাতে তাঁর কবিসত্ত্বার প্রবণতাকে শুধুই প্রাগাঢ় করেনি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে নিজের অবস্থানকেও স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন। ফেসবুকের ওয়েবসিরিজের ১০০টি ছড়া নিয়ে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে ছড়াকার প্রতিটি ছড়ার আলাদা আলাদা ভাবে নামকরণ করেননি বরং 'শনিবারের ছড়া-১','শনিবারের ছড়া-২' এইভাবে... 'শনিবারের ছড়া ১০০' সংখ্যার দ্বারাই চিহ্নিত। এখানে রাবীন্দ্রিক স্টাইলকে স্মরণ করায়। যেমন ৩৬ সংখ্যক কবিতা বলাকা। ছড়ার বইটিতে উপরিপাওনা যে কোনো ছড়ার পরিপ্রেক্ষিত কি, উপপাদ্যবিষয় কি তা ছড়া শুরুর আগেই ২-৩-৪ লাইনে ছড়াকার তা নিজেই বলে দিয়েছেন যা আমার মতো পাঠকে ছড়াটি বুঝতে সুবিধা করে দিয়েছে। বিগত ২ বছরে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা সামাজিক অবক্ষয় ও সংস্কৃতির ভাঙন তাঁর ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যে ঘটনাগুলি আমরা আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাতে পেয়েছি কোথাও সাম্প্রদায়িকতার অসহিঞ্চু ক্ষোভ বিষেদ্‌গার সংঘর্ষ, ধর্মান্ধতার ব্যাভিচার নির্মম অত্যাচার, গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ, দলিতের আর্তনাদ, দায়িত্বশীলপদে বসে থাকা ব্যক্তিত্বের কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যকেও কষাঘাত করেছেন তিনি, মাতৃত্বের লাঞ্ছনা, ষড়যন্ত্রকরে মামলা চাপিয়ে জেলে পোড়া, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা তাঁর কলমের লেখনীবাণে তীব্র কষাঘাতে শাণিত করেছেন তিনি। নজর এড়ায়নি করোনাতঙ্ক এবং গোময়, গোমূত্র নিয়ে রাজনীতিবিদের উদ্ভট্‌তত্ত্বের। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়েননি। শাসকের রাঙা চোখের চাহনিকে ভয় পাননি। বরং সাহসিকতা ও বুকের জোরে দম

রেখেছেন। গরু নিয়ে ঘটে যাওয়া বুলন্দশহরের নৃসংশ ঘটনা, ছদ্মজাতীয়তাবাদের দাঙ্গার পৈশাচিকতা "পুলওয়ামা সেনাদের রক্তাক্তলাশে আমরা মর্মাহত, স্তম্ভিত।"(শনিবারের ছড়া-২৩) শোকার্ত মায়ের ক্রন্দন। অসহায়তা দুই সম্প্রদায়ের হিংসার বলীদানের জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর ছড়ায়। গাড়ি বোঝাই বিস্ফোরক কী করে মিলিটারি কনভয়ে ঢুকে যায়। স্বেচ্ছাচারী শাসকের কুযুক্তির আশ্রয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (শনিবারের ছড়া-৩৫/৩৯) ইতিহাস যাদের ক্ষমা করবে না কোনোদিন, ছড়াকারের কন্ঠেগর্জে উঠেছে—'স্বৈরাচারী নিপাত যাও, যুবসমাজ ছাত্রসমাজ জেগে আছে। স্বৈরাচারীর পতন অনিবার্য, ব্রিটিশ পদলেহনকারীদের বীরের সম্মান দেবার উগ্র ধৃষ্টামি! জনগণের টাকা লুট করে বিদেশে পালানো কুসন্তানেরা, রাষ্ট্রের মদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবাদী নাকি গর্ভবতী রমনী! অগত্যা জেলে ঠাঁই তাঁর। বিগত কিছু সময় ধরে ঘটে যাওয়া সমাজের বীভৎস গভীর ক্ষত গুলির দিকে তিনি আলোকপাত করেছেন, রূঢ় বিদ্রূপে। বিশ্ব যখন মৃত্যু উপত্যকা করোনা বিধ্বংসী ছোবলে, মহামারীর বিষ প্লাবনের এই ভয়ংকর গ্রাসের দিশাহীন স্বরূপটি তথা লকডাউন এবং তার ফল পরিযায়ী শ্রমিকের করুণ অসহায়তা সবই উঠে এসেছে ছড়াকারের লেখনীতে। ছড়াকার উদ্বিগ্ন কে বেশি ভয়ংকর? রোগ না ক্ষুধা? কী বেশি দরকারী? ধর্ম না বিজ্ঞান? করোনার দিনগুলি কোন পথ দেখাবে শেষ পর্যন্ত? প্রেম না ঘৃণার! বিশেষত করোনা যে আমাদের গাহর্স্থ্য হিংসার প্রকোপকে বাড়িয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। করোনাকালে লকডাউনে মানুষকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। কিন্তু যার ঘর নেই ফুটপাতে যার রাত্রিকাটে খোলা আকাশতলে, কার্ফুতে বন্ধ রোজ দিন-আনা দিন খাওয়া মানুষের রুজি। তাদের পেটে আগুন জ্বলছে। যে কৃষক সব্জি ফলায় মাঠে, ইস্টিশানে মোট তোলে যে কুলি, ভ্যান ঠ্যালে যে, রিক্সা চালায়, চা-দোকানের ঝাঁপ খোলে, বারবাণিতাদের অন্ধ জগত, সবারই মর্মান্তিক জীবন-নষ্ট, জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে! ছড়াকার' বলেছেন রামেই মারুক কি রাবণে— এদের মরণ যজ্ঞ ঘনিয়ে এসেছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কিংবা মহামারীর বিষ-প্লাবনে তাদের জন্য মহামান্য কোনো নেতার মুখে মধুর ভাষণ বা বক্তৃতাশোনা যায় না। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। তাই তার আশ্রয়দানের পরিবর্তে কৌশলীপন্থা অবলম্বন করেন। গুরু যদি অন্ধ হয় তাহলে ভক্তের পথ খানাখন্দ ভরা হবেই। ছড়াকার বলেছেন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে তফাৎ ভালো মন্দে।

গরীব বলে কবির কথা বাসি হলেই ফলে,
ছদ্মবেশী ঘরভেদী-সব বাড়ছে দলে দলে।

করোনার কালে সর্বজ্ঞদেরও যে অসহায় দেখাচ্ছে ৮৫ নং ছড়াটি তার উদাহরণ। যারা নিজেদের এলেমে চলত এতদিন পাউডার লিপিস্টিক মেখে নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার মাপকাঠিতে বিজ্ঞ বলে জানতো-অর্থ-সমাজ-রাজনীতি তারাও আজ দুর্গতদের মতো কেমন বোকাবাক্সের ভূত!

লকডাউনের জেরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যে কী ভীষণ বদলে গেছে। হাতে অবাধ সময় পেয়ে যাওয়ারটাও কোন গঠনমূলক কাজে লাগানো যাচ্ছে না, দৈনন্দিন একঘেঁয়েমি অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতি প্রিয়জনের খুনসুঁটি ও এখানে (কবি পত্নীর) মনে হয় চিমটি! কোভিড আমাদের জনজীবনকে কেমন যেন রাতারাতি একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। তাই কবি বলে ওঠেন—"কোভিডের হাত ধরে ঘণা-অসূয়া পালা।" (শনিবারের ছড়া-৮২)

দেশটা যখন পুরোপুরি আবোলতাবোলের প্রত্যক্ষ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সকলের কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা (৭০) ছড়াকার মহাকালের হাসির নিষ্ঠুরতাকে ও তুলে ধরেছেন— প্রকৃতির ক্রূঢ়তা আমফান ঝড়ের তাণ্ডব ও বিধ্বংসীলীলা যখন বাতাস ভরে উঠে চেনা অচেনা বিষে—বিজ্ঞেরা বাঁকা হেসে বলেন ক্লিশে, তখন ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায়ের প্রত্যয়—

"আসবে সে দিন, মানবতার সব অপমান
ঘুচিয়ে যখন সবাই হবে সবার সমান।
চলতে পথে হাত ধরেছি, বন্ধু সবাই,
ক্ষুধার, মারীর সব অবরোধ পার হয়ে যাই।"

(শনিবারের ছড়া-৮৩)

পাশাপাশি তাঁর ছড়ায় আরো একটি শান্ত স্রোতধারা বয়ে গেছে যা কিছু কল্যাণকর, শুভ সুন্দর তার জয়গান গেয়েছেন ছড়ায় ছড়ায়। (শনিবারের ছড়া-৩৪) ছড়াতে বউয়ের সঙ্গে দাম্পত্য, খুনসুটি, প্রেম, দাম্পত্য-কলহ আর পরকীয়া নিয়ে মজার রসাস্বাদন কবি প্রেমের অভিমান ধরা পড়ে— (শনিবারের ছড়া-৭৮) নং এ—

"আসবো বলেই যাওয়া আমার, যাবো বলেই আসা,
তুমি যাকে রাগ জানো তা আসলে ভালোবাসা।

যাবো বলেই আসা আমার, আসবো বলেই যাওয়া
যাকে তুমি শূন্য জানো, সে আমার সকল পাওয়া।"

দুর্দান্ত প্রেমের ছড়া (২৭) সংখ্যক ছড়াটি। ছড়াকার বলেছেন এখন কাল মধুমাস, ফাগের দাগ শরীর ও মনে। প্রেম দিয়ে গড়া এই ছড়ায়—

"ভালো চাও তো ওসব ছাড়ো,
এসো, আমার হাত ধরো,
লক্ষ্মী মেয়ের মতো আবার
এই মানুষের ঘর করো।"

প্রেমের কবিতা হিসাবে শনিবারের ছড়া – ৯৯ সংখ্যক টিও বেশ মনকে ছুঁয়ে যায়-

"ভালোবাসি কিনা জানতে চাইল মেয়েটি
আমি তো জানিনা ভালোবাসা কাকে বলে
রইলাম শুধু চেয়ে
চেয়ে দেখলাম, চোখ নয় দীঘি কালো
জানতে চায় সে, সত্যি বেসেছো ভালো?"

কালিদাসের কাল থেকে আষাঢ় ও মেঘদূতের বিশেষ সম্পর্ক-বার্তা।
রামরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও প্রেম সর্বকালেই সত্য (৯৯) মঙ্গল, তাও ধ্রুবসত্যই। কিচ্ছু ভালোলাগে না—মানসিক অবসাদ, বিষাদ, চারিদিকে শুধু মনখারাপ করা খবর। সত্যিই বড়ো গভীর অসুখ আজ পৃথিবীর (শনিবারের ছড়া-৯৬) চিরনতুনের জন্মদিনে কবি মান-অভিমান মিটিয়ে প্রেমের দোলা ভ্যালেন্টাইন ডে ! (৭৪) ভালোবাসার জয় চান কবি। কৃষ্ণ রাধার প্রসঙ্গ তাই স্বভাবতই এসেছে ছড়ায়।

বিষাক্তসাপ ফণা বিস্তার করলেও গোকূলে কৃষ্ণ বেড়ে ওঠার মতো কবি জানেন অশুভ শক্তির ও ধ্বংস করার শক্তি আছে তাই তিনি হাল ছাড়েননি। জন্মাষ্টমী ভারতীয় পুরাণের অন্যতম সেরা কূটনীতিবিদের জন্মতিথি (৪৯) কবি তার মধ্যেও পেয়ে যান নিজের লেখনীর অর্থ।

শনিবারের ছড়া ২১ গানওয়ালার গান যৌবনের ভালোবাসার সেতু-নবীনা কিশোরী এক পাগলীর দুঃখ এবং হতাশার মধ্যে ও চারিদিকে হাসিতামাশার খোরাক মিলতেই থাকে, ছড়ায় উপপাদ্য বিষয় সেখান থেকে নিতে গিয়ে ছড়াকার সাধুদের

(৩৫) সাবধান করে দিয়েছেন। ছদ্মবেশীদের সাবধান করে অশুভের বিনাশ চেয়েছেন তিনি।

সুদিনের দূরতম আশাও দুরাশা মনে হয়। ভোর হয় আর আলো ফোটবার আগেই-তো সবচেয়ে গাঢ় হয় অন্ধকার। রক্তে কলম ডুবিয়ে কবি আঁকেন দিন-বদলের ছবি।

ঠিক আর রাজনৈতিক ভাবে ঠিক এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝাতে ছড়াকারের বিচক্ষণতাও যথেষ্ট সুদৃঢ়। (১৫) মিথ্যার বেসাতি যারা করে মঞ্চের পিছনে তাদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত থাকে সে সর্তক বাণী ও গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। (৯৫) রাজনীতি বড়ো আজব জিনিস, ছড়াকার সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত—নীতিহীনতাই রাজনীতির মূল কিনা ! (৪৩)

স্বার্থান্বেষী স্বার্থের কারণে কে কখন কার সাথে হাত মেলায় শত্রু-মিত্র বদলে যায় তাকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি—"আরে বাবা জানিরে, তোর হাতে ক্ষমতা,তোর পোষা তোতা পাখি তোর বুলি কপচায়।"

আবারশীতকালের অনুকূল জীবনচিত্রটি সুন্দরকরে এঁকেছেন— মেলায়-খেলায়-ছবিতে-নাটকে আহারে বিহারে (১৪)

প্রকৃতি ইছামতীর জল – মাঝিমল্লারের গান – দুর্গাবিসর্জন পাখীদের আনচান শরতের সুন্দর চিত্র ও পাঠকের মনকে করে তোলে সুখনীয়। শরতের আকাশে যে কালো মেঘের ভ্রূকুটি রয়েই যায় সেই অশুভের বিনাশচেয়ে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কবি।(৫৫) নির্বোধের কর্মকাণ্ড,বাঘের গলায় মালা পরানো ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি অন্যদিকে বোধিমানুষের হাসির উদ্রেগ, ভূতের অস্তিত্ব ও কাণ্ড কারখান নিয়ে মস্করা করতে তিনি ছাড়েননি। প্রকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ বড়ো বিপন্ন, অসহায়! ধনী গরিবের বিভেদ রেখার মধ্যে তা ধার ধারে না সে বক্তব্যই স্পষ্ট করেছেন (৮৮) সংখ্যক ছড়ায়। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা— এই প্রবাদ বাক্যটিতে সত্য হয়ে উঠেছে ছড়াকারের— (৮৭) নং ছড়ায়।

'জীবনের গান গাইতে জানে না মৃত্যুর পালাকার।' এই মৃত্যু উপত্যকাই আজ কবির স্বদেশ! তাই ভীষণ ঘৃণার উদ্রেগ করে বিদ্রূপ করেছেন— 'পাথর নিংড়ে রস চায় ওরা, ছেড়ে টসটসে ফল। (৮৬)

আবার সমাজমাধ্যমের কুফল বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপন, মানুষের একাকীত্বের নিঃসঙ্গতার অবসাদের সুযোগ নিয়ে রঙিন স্বপ্নের হাতছানি—ফাঁদে পড়ে ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির শিকার, বিপন্নতার আবহ ঘুণ ধরা সমাজের পৈশাচিক বর্বরতা শিশু চুরির

ঘটনা। আবার সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে লেখা বাস্তবের কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল ঘটে গেলে কাকতালীয় বলে কবি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন— (৯৭) 'শাক দিয়ে ঢাকা আছে মাছ'— (৯৪) এমন সব কাণ্ড কারখানাও জর্জরিত করেছেন তীব্র কষাঘাতে। রক্ষকই ভক্ষক, ঠগ যোচ্চদের স্বরূপও চিনিয়ে দিয়েছেন। (৯৪)। (৭৬) চোরে চোরে মাসতুতো ভাইদের নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন—

"তোকে দেখে হাসি পায়, আমি ত জোকার,
দুনিয়ায় চলে রাজ যতেক বোকার।
তুই খাস চেটেপুটে, আমি খাই লুটে,
তুই খুব হিংসুটে আমি ও কুচুটে—।"

আরো ভিন্ন ভিন্ন সুরে কিছু কিছু ছড়া স্থান পেয়েছে যা এক একটাএক এক স্বাদের। যেমন—কবিরা যেন নিজেদের ভালোটা বোঝার ক্ষমতা রাখেন, বেয়াদপ ভালো নয়। নিজের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তার শুদ্ধিকরণের পন্থা ও দর্শন হয়েছে (২৪)। শুভবুদ্ধিবাদীদের ফড়েরা যে দাবিয়ে রাখতে পারে না তার পরিচয় ও ছড়ায় স্পষ্ট। (৫৩) যে মেঘ কখনো বৃষ্টি ঝরায় না সে সময়ে কবি খুঁজে চলেছেন তাঁর স্বদেশে, কিন্তু 'যে মানুষের কোন স্বদেশ নেই,/ কোথায় পাবে সে তার পরিচয়/....../এপারে মন, শরীর চলে যাচ্ছে ওপারে মায়ের ভিটে টুকরো করে কাঁটাতারের বেড়া,/ রিক্ত জীবন আগুন জ্বেলে রাখতে যদি পারে,/ একদিন ঠিক মানুষের পাশে দাঁড়াবেই মানুষেরা"—সম্প্রতি NRC NPR নিয়ে রাষ্ট্র তথা শাসকদের মধ্যে যে বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা, দেশ ছাড়া হওয়ার সন্ত্রস্ত ভয় একশ্রেণির মানুষের মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে, ছড়াকার স্পষ্টতই সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ভায়ের উঠোন যখন ভাইয়ের জমা লাশে ভরে ওঠে তখন একজন সত্যান্বেষী ই-তো উপলব্ধি করতে পারেন—'শাসকের বেশে পরিচয় ঢেকে ঘাতকেরা পথ চলে।' (৪৮) শাসক শক্তি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে সেনার হাতে অস্ত্র তুলে, যে শাসক তাদের মেনিফেস্টোর সবার শেষে স্থান দেয় শিক্ষা-অন্ন-বস্ত্র তারা যে উন্নয়নের কোনো জোয়ার-ই আনতে পারে না, তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ তার ছড়ার পংক্তিতে পংক্তিতে। দুঃখ এবং হতাশার থেকেও হাসিতামাশার খোরাক খুঁজে নিয়েছেন—

'বিবি তোকে তালাক দেবো, এ ছাড়া আর উপায় নাই,
যে-যা ভাবুক, আমার ঘরে শ্বেত ললসা চাই-ই-চাই।'

নেহাতই শিশুপাঠ্য ছড়াও অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে (৯৩) সংকলনে—(৪৫)। কখনো আবোল-তাবোল লিখে মনে হয় সপ্তাহত পাপক্ষয় হল। (৪০)/৩৬

মৃত্যু উপত্যকাই কবির আজকের ভারতবর্ষ, তবু কেউ জানতে চাইলে ছড়াকার বলেন "ভালো আছি"! (৪১)

সাধারণ মানুষকে একেবারে বোকা ভাবাও ভুল! যা চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকারই সামিল! তবু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি গণতন্ত্রের আশু জয় চান। (৩৮)

ছড়াকার পিছুটানহীন নন, এ সংসার বড় মায়াময়, সহজে কাটতে চায় না তাই প্রজ্ঞাবানকে বলেন— অভিশাপ টাপ না দিতে (৩২)।

সাম্প্রতিক আরো একটি ঘটনা লাভজেহাদি ভয়াবহ রূপনিয়েছে। রাষ্ট্রের তথা শাসকের সাম্প্রদায়িকতার ভাষায় ধীক্কার জানিয়েছেন—(৩০)

"লাভ-জেহাদি দেখাচ্ছে পথ, ভালোবাসায় পুড়ছে ঘর,
রাজার বচন না মানলে পস্তে মরণ জীবনভর।
কী খাবো আর কী পরবো সব তুমি দাও ঠিক করে,
ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকি, লাল গগনে চিল ওড়ে।"

ব্রিটিশ শাসনে পরাধীনতার গ্লানি নির্মম অত্যাচার, বোঝা— বারুদের কাহিনি আর বর্তমান বিশ্বে জৈব ভাইরাসের আক্রমণ তথা আমাদের স্বদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক কাহিনিগুলি অস্তিত্বের সংকট কোনো অংশে কম বলে মনে হয় না। বইটি খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে দেখা গেছে সংকলনে একই গতের বা ধারার ছড়াগুলি পর পর সাজানো নয়, অবিন্যস্ত এলোমেলোভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভিন্ন স্বাদের ছড়াগুলি। একই গতের ছড়াগুলিকে যতটা পেরেছি একসাথে এনে আলোচনা করারই এখানে প্রয়াস পেয়েছি।

শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় না পেয়ে দামাল কবি শাসককে হুঁশিয়ারি দিয়ে সতর্ক করেছেন—

"ভুলোনা শাসক, জওয়ান কিন্তু—
চাষির ঘরের-ই ছেলে।
কী হবে হঠাৎ তোমার দিকেই—
নিশানাটা ঘুরে গেলে!"

সাধারণ জনগণ সব দেখছে শুনছে এবং মনেও রাখছে স্বদেশের নামে যারা গরিবের রক্ত শুষছে। (৮৯)

দলিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার জয়গান শোনা গেছে তাঁর শনিবারের ছড়া-সাড়ে ঊননব্বুইতে যার সাথে জর্জ ক্লয়েডের কালো মানুষদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ব্যক্ত। (P-৯৮)

(৯১) সেই সব দাঙ্গাবাজদের তীব্র ধীক্কার দিয়েছেন যে ঘাতক বিধর্মী ভ্রূণ গেঁথে নিয়েছে ত্রিশুলে এই সব-পৈশাচিক বর্বর উল্লাসের অসভ্যতা ভাষায় ব্যক্ত করতে কবি অপারগ।

বর্তমান সমাজ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কবি ঘোষ রায় (৭৭) বিগত কবি সুকান্তের মতোই এদেশের বুকে আঠারো নেমে আসার প্রার্থনা করেছেন— "পলাশ ফুটেছে তবু বসন্ত হারিয়েছে পথ/আবার আঠারো এসে মুঠি তুলে নেবে কি শপথ?"

তবে পরিশেষে বলা যায় সংকলন গ্রন্থে ছড়াগুলির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে : হারমোনি (harmony):- ঐক্যের বা সমন্বয়ের সুর।

সংকলনের কথা মুখে ইমানুল হকের কথায় বলা যায়—"সময়কে শাসন করতে উদ্যত তাঁর লেখনী। ভারতের মর্মবাণী সংহতি, সম্প্রতি ও সহিষ্ণুতা। মিশ্র সংস্কৃতি তাঁর চলার পাথেয়। আমাদের সময়কে ব্যাখ্যা করতে প্রবীর ঘোষ রায়ের কলম "উদ্যত তীক্ষ্ণতরবারি"। ছন্দে ধ্বনিমাধূর্যে স্বর ও সুর যোজনায় ছড়াগুলি কালাতীতের মানোত্তীর্ণ।"

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হক সাহেব ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে খাঁটি কথাগুলি বলেছেন তা আমার মনে হয়েছে এ যেন আমার নিজেরই কথা, এই বৃত্তের পরিমণ্ডলের বাইরে বেড়িয়ে আমি অন্যভাবে বা ঘুরপথে কী-ই-বা বলতে পারি। তবু কবি ছড়াকার অধ্যাপক ঘোষ রায় বলেছেন, ছড়ার মাধ্যমেই যদি উত্তর দিই তিনি তাহলে খুবই খুশি হবেন : তাই আমার লেখনীর নবতম সংযোজন—

সম্প্রীতি

কেন আজ মিছে হানাহানি কর
কেন গো রক্তক্ষয়---
প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে
করে গো বিশ্বজয়।
হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, নয় ধর্মীয় যুদ্ধ
নীল আকাশের তলে এসো---
প্রীতি অগ্নিতে হই শুদ্ধ।

চেয়ে দেখো ওই অসীমশূন্যে
পারাবত পিকাসোর---
শ্বেত ডানা মেলে উড়ে যায়,
নিয়ে শান্তির বাণীডোর।
নবীনতর সভ্যতা আনো গড় প্রজন্মদীপ্ত—
এসো, সবাইকে ভালোবাসো,
হই সাম্যে মৈত্রে তৃপ্ত।।”

কবি মন স্বতঃই প্রেমিক। বাধা বিপত্তি ঝড় পেরিয়ে শ্বাশ্বত প্রেমেই আমি বিশ্বাসী। তাই কবি প্রবীর ঘোষ রায়ের প্রেমের ছড়ার উত্তরে রইল—

।। **নির্জনতার সঙ্গসুখ** ।।

ধূপ ছায়া পাহাড়ের নিসর্গ নির্জনতা
কত কথা বলে,
এক চিলতে রোদ, আঁকা বাঁকা পথ...
তুলো তুলো মেঘ
কত কি ছবি আঁকে।
দর্পিত নীল ক্রোকাসফুল,
হাওয়ায় মাথা নাড়ে...
এ নদীর কলতান
এ মনে কত গান আনে।
হিজিলের ছপাত ছপাত স্রোতে ভেসে যায়,
তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সাথে
কত কি যে কথা হয়...
যা তোমার উপস্থিতিতে সম্ভব নয়।
এ সময় আমায় কেউ বাঁধা দেয় না,
এ আমার একান্ত নির্জনতা,
এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ভালোবাসা
এ সময়ে মনে কত ফাগুন আসে...
এ নদীর কলতান এ মনে কত গান আনে।

আশা করি, কবি প্রবীর ঘোষ রায় তাঁর উত্তর কবিতায় পেয়ে খুশিই হবেন। বিশেষত এই কথাগুলি আমরাই নিজের এবং কবি ঘোষ রায়কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ইমানুল হকের কাছ থেকে এই কবিতার বর্ণ শব্দ, ভাব ধার নিইনি এখানেই আমার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বলেই ধরে নেব। এখানেই আমার নৈতিক জয়। কী বলুন কবি ও ছড়াকার প্রবীর ঘোষ রায় মহাশয়? ছড়ায় ছড়ায়তো পাঠকে প্রশ্ন করে গেছেন। কী হবে ঘুরে গেল সে প্রশ্ন আপনার দিকে গেলে?

ছড়াকার আশা রেখেছেন সকাল উন্মোচনের। কবি প্রত্যয়ী যে— 'ভুল স্বীকারে যান না মান'। পরিস্থিতি বিশেষে আপনি বাঁচলে বাপের নাম-ই হয় এই শেষ কথা বলে টা টা গুড বাই জানিয়ে শনিবারের ছড়ার আগাম প্রকাশিত হবার সম্ভাবনার বার্তা দিয়েছেন।

হ্যাঁ প্রবীরবাবু,

আপনি বলছিলেন ছড়াতে আপনাকে উত্তর দিলে আপনি বেশি খুশি হবেন। ছড়া পড়ার অভ্যাসবশত খুঁজে পেয়েছি আপনাকে জবাব দেওয়ার আরও একটা উপযুক্ত ছড়া! থুরি শুধু আপনি বলছি কেন সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসকের জাতীয় ফুলের অবমাননার উপর আলোকপাত। আতস কাঁচটি বেশ খাসা!! ছদ্মনামে ছড়াকার পি হাঁড়ি পটার, ছড়ার বই—"ছাল ছাড়ানো ছড়া"—এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত "সাম্প্রদায়ী" (পৃ. ১৭) ছড়াটি সত্যই যথোপযুক্ত "তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির ফলা"—

সাম্প্রদায়ী

হায় ছিঃ ছিঃ
করলি একি
পদ্মফুলের জাত নিয়ে,
হরলি প্রাণ
ফুলের ঘ্রাণ
সম্প্রদায়ী গন্ধ দিয়ে।
ভারত কুল
জাতীয় ফুল
পদ্মে দিল অশেষ মান
আজকে তাই
অসম্প্রদায়

তোকে ছুঁড়ে দিয়েটান।।
দুর্গা দেবী
ভেবে সবি
ঠিক করেছে তার চরণে
চিরকালের
শতদলের
করবে ত্যাগ মনে প্রাণে।।
আজ পদ্ম
আচ্ছা জব্দ
সদ্য ভজে সম্প্রদায়
পুরোহিত
ভেবেহিত
চায়না দিতে দেবীর পায়।।
হায় ছিঃ ছিঃ
করলো একি
পদ্মফুলের জাত খেয়ে,
ছিলো নির্মল
হলো সিম্বল
দলের ধ্বজার নাম লিখিয়ে।।
দুর্গা দেবী
জেনে সবি—
পদ্মে হটায় জাতির ঘ্রাণে—
এমন ভুল
পদ্ম ফুল
করলো কেনো জেনে শুনে?
জাতীয় মানে
স্বসম্মানে
রাখতো যারে মাথায় তুলে,
সাম্প্রদায়ী

গন্ধে মাতি
কুল হারালো পদ্মফুলে।
এবার তাই।
অসম্প্রদায়
জোট বেঁধেছে হাতে-হাত
ধর্ম্ম যাক
কাটুক নাক
পদ্মফুলের— মারবেই জাত।[৩]

তথ্যসূত্র :

১. ‘কবি পরিচিতি অংশ’- নেওয়া হয়েছে প্রবীর ঘোষ রায়ের ‘কবির জন্য’, প্রকাশক : ফারুক আহমেদ, উদার আকাশ, ঘটক পুকুর, ডাক – ভাঙর, থানা – গোবিন্দপুর, জেলা – দঃ ২৪ পরগনা, পিন – ৭৪৩৫০২।

২. প্রবীর ঘোষ রায়, ‘শনিবারের ছড়া’, দেশ প্রকাশন এর পক্ষে ৬, ডালিমতলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬ থেকে মতিউর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ মার্চ – ২০২১।

৩. পি হাঁড়ি – পটার, “ছাল ছাড়ানো ছড়া”- এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছড়া “সাম্প্রদায়ী, পৃ. ১৭,প্রকাশক : রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, দূর্গাপুর-৪, প্রথম প্রকাশ – ১৪১৬

কমলকুমার মজুমদারের 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাস : আদিবাসী জীবনের অভিনব রূপায়ণ

কুহেলী ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ : *বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এক স্বল্প চর্চিত নাম। কথাসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্টতা হল তাঁর অদ্বিতীয় রচনারীতি ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাটিলগ্ন মানুষকে দেখা। তাঁর আটটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম লেখা উপন্যাস সম্ভবত 'শবরীমঙ্গল'। এখানে তিনি শবর কোঁড়া মুণ্ডা তথা আদিবাসী জনজীবনের গল্প বলেছেন। উপন্যাসের নামকরণ বিষয়টির পশ্চাতে লেখকের ইঙ্গিত অনেকটা মধ্যযুগীয়। 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাসের নামকরণের সম্ভাব্য পরিপ্রেক্ষিতটি আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচ্য। এর সঙ্গে আলোচিত হবে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ চর্চার এক দৃষ্টান্ত রূপে এই উপন্যাসের ভূমিকা ও এক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে মাধালি চরিত্রের বিশেষভাবে হয়ে ওঠা। নিম্নবর্গের বা হাড়-হাভাতের কথা বলতে গিয়ে উচ্চবর্ণের ও হাল আমলের বিষয়ীর প্রসঙ্গ উত্থাপন নিছক আখ্যানের কলেবর বৃদ্ধি নয়, সমাজের অতি বাস্তবতার ছবিকে নিখুঁত করে আঁকতে চেয়েছেন লেখক। এ উপন্যাসে কমলকুমার মানুষের ভোগসমৃদ্ধ জীবনকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। ইন্দ্রিয়সুখসঙ্গের সঙ্গী যে ভগবানকে পাওয়ার পথ হতে পারে তা মাধালি চরিত্রের দ্বারা নিরূপিত হয়। মানবধর্মকে সর্বধর্মসার বলে মেনেছেন লেখক। এছাড়াও এ প্রবন্ধে দেখানো হবে আদিবাসী সম্প্রদায় আধুনিক ও পরিবর্তিত সময় ও সমাজের নানা লক্ষণকে আঁকড়ে ধরছে কীভাবে।*

সূচক শব্দ : *কমলকুমার মজুমদার, শবরীমঙ্গল উপন্যাস, নামকরণ, আদিবাসী জনজীবন, নিম্নবর্গ, সংস্কৃতি, প্রেমচেতনা, ঈশ্বরচেতনা।*

মূল আলোচনা :

একথা সত্য যে কমলকুমার মজুমদারের 'শবরীমঙ্গল' নামে যে উপন্যাসটি আমরা পেয়েছি তার সবটুকু কমলকুমারের রচনা নয়, তাতে স্ত্রী দয়াময়ীর হস্তাবলেপন ঘটেছে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির প্রতি অনুমান করেই প্রাপ্ত অংশটির সামান্য সংযোজন-

বিয়োজন করেছেন দয়াময়ী। তাঁর কথায় 'ভেতরে ভেতরে আমি ওনার লেখা খুব পড়েছি, ফলে যেখানে আমার কথাটা বলতে চাই সেটা ওনার ভাষায় ঢুকিয়ে দিয়েছি।'[১] খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিকে দয়াময়ী নিজের সাহিত্যবোধ দিয়ে একটি অখণ্ড কাহিনিরূপে পাঠকের সামনে এনেছেন।

আমরা বলতেই পারতাম এও এক মঙ্গলকাব্য। কিন্তু কাব্য বলতে বাধছে কারণ, কমলকুমারের পরবর্তী ও অন্যান্য উপন্যাসগুলির মতো 'শবরীমঙ্গল' এ কাব্যধর্মীতা বেশ কম। কাব্যময় গদ্যভাষার যে বিশেষ কমলকুমারীয় রীতি তা ততটা শক্তিশালী ও নিরীক্ষণপ্রবণ হয়ে ওঠেনি তখন। যেমন করে 'রামচরিতমানস' সতীনাথের কলমে একটা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এর জন্ম দিয়েছিল, সেরকমই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মতোই 'শবরীমঙ্গল' নামক বিশেষ আখ্যানের সৃষ্টি করেছেন কমলকুমার। এ উপন্যাসের বীজরূপে লেখক মঙ্গলকাব্যের মতোই লোকায়ত জীবন জিজ্ঞাসা ও ধর্ম জিজ্ঞাসাকে গ্রহণ করেছেন। কালকেতু-ফুল্লরার 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর আখেটিক খণ্ড যেন এখানে রোমনি-মাধালির আদিবাসী জীবনচর্যায় ধরা রয়েছে। কাহিনির আদ্যন্ত মাধালির কথা থাকলেও ঝুমুরওয়ালী রোমনির প্রসঙ্গ আখ্যানে খুব বেশি নেই। এখন দেখার উপন্যাসের নাম যে 'শবরীমঙ্গল' রেখেছেন লেখক তা কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে। দয়াময়ীর সংযোজনা ও পরিমার্জনের কথা মাথায় রেখেও উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে লেখকের ভাবনা আমরা ব্যক্ত করতেই পারি কারণ, উপন্যাসের নামকরণ লেখকের স্বকৃত।

শবরদের ইতিবৃত্ত তেমন করে বলার প্রয়োজন না থাকলেও আমরা ভুলি কি করে চর্যার সেই বহুপঠিত পদ 'উষ্ণা উষ্ণা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী'[২]। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন যে চর্যাগানগুলি সেখানে শবর-শবরীর প্রেম ও সাধন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। শবরপাদের ২৮ ও ৫০ নং চর্যাগান দুটি শবর-শবরীর জীবনাচরণ ও প্রেমলীলার অভ্যন্তরে মহাসুখ সন্ধানের পদ্ধতি ও প্রশান্তিকে ব্যক্ত করে। 'শবর' জনজাতিটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি। পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শবর অন্যতম। এদের একটি সুপ্রাচীন ও বিরাট সংস্কৃতি আছে। মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার সুবিশাল এলাকা জুড়ে এদের বসতি বহু পূর্ব থেকেই সুচিহ্নিত। মহাকাব্য রামায়ণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শবর' নামক ব্রাত্য জাতিগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে, যাদের জাতিগত বৃত্তি হল শিকার ও বনজ সম্পদ আহরণ করা।

'শবরীমঙ্গল' উপন্যাসের নামে বিশেষত শবরদের কথা বলা হলেও মূল কাহিনিতে সে জাতির নাম দু-চারবার উচ্চারিত হয়েছে। মূল চরিত্র মাধালিকে বলা

হয়েছে কিস্কু (সাঁওতালদের পদবি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়) অর্থাৎ সাঁওতাল- 'সে ছোটজাত সাঁওতাল উপরন্তু ক্রিশ্চন'[৩]। আবার মুণ্ডাদের জাতীয় উৎসবে মাধালির অংশগ্রহণ দেখে অনুমান করি সে মুণ্ডা। 'শবর' শব্দটির আলঙ্কারিক প্রয়োগ এখানে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের নামটি পাঠেই পাঠকের মন খুঁজতে থাকবে কোনো শবরকে, আর কিছুদূর এগোলেই পেয়ে যাবেন তাকে যে রৈবতী গ্রামের বলিষ্ঠ আদিবাসী ক্রিস্টান মাধালি কিস্কু, ঘুংরী কিস্কুর ছেলে। সে ই গল্পের নায়ক। সে কলিয়ারির হাজরেবাবু বৃন্দাবন চাটুজ্জ্যে ও আদিবাসী লুংডির অবৈধ মেয়ে ঝুমুরওয়ালী রোমনির প্রতি প্রণয়াসক্ত। রোমনির শরীরও মাধালির লোভে লালায়িত হয়ে উঠত। উভয়ের প্রতি উভয়ের দেহ সম্ভোগের উন্মাদনা গল্পে খুব স্পষ্ট তবে মাধালির কথায় ও আচরণে তা বেশি করে ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রদত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও স্বাজাত্যবোধ জাগরূক ছিল মাধালির মনে। অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যেও নিজ কৌম জীবন ও আদিম সংস্কৃতিকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি সে। শেষাবধি সে শবর সাঁওতাল। এই বুনো পুরুষটির শবরী সঙ্গিনীটির প্রতি আকাঙ্ক্ষা কোনো সময়ের জন্য ভোলার নয়। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে বলে ঘরছাড়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু শবরীর প্রতি প্রতীক্ষায় উপন্যাসের শেষেও দেখি সে আতান্তরে পড়ে আছে। যে মাধালি কিস্কু একসময় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল 'আমি তাকে ডাকব তাকে দেখবই' বলে, সেই মাধালিরই উপলব্ধি লেখক নিশ্চিতরূপে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

> সে জানত তার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে এই মেয়েটিই পারে এবং এই জোরেই সে হয়ত আলোর পথে যেতে পারত ... এখন সে অনেক অস্থির। মাধালির ভেতরের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রক্তটা আবার কিসের উষ্ণতায় কম্প্রমান হয়ে উঠল, সে এক দৃষ্টে রোমনিকে দেখেছিল। রোমনির ডাগর চোখে আজ মাধালি তার আপনকার ছায়াটা স্পষ্ট সে দেখেছিল, যে ছায়ায় ... সাগরের গভীরতা ... চিরকাল নীল হয়ে থাকে, যে ছায়ায় ... আকাশ নেমে আসে ... মাটিকে দেয় আরো সবুজতা![৪]

এ কোন ধর্মপন্থা যেখানে প্রণয়ীকে পাওয়ার মধ্যে সবকিছু পাওয়া যাবে বলে ভাবা হয়! মাধালির ঈশ্বরানুসন্ধানের উষ্মা রোমনির সৌন্দর্যের কাছে শীতল বলে বোধ হয়। এখানে যত উষ্ণতা যত কাতরতা সব প্রেমের আকাঙ্ক্ষার অপ্রাপ্তির প্রতি। উদ্ধৃত

রচনাংশে দেখতে পাবো 'এই মেয়েটিই পারে' ও 'তার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে' বলার ফলে স্পষ্ট করা হয়েছে মাধালির প্রেমধর্মের মধ্যেই বাহিত হবে তার আধ্যাত্মধর্ম। তার ঈশ্বর আরাধনার সঙ্গে গোষ্ঠীর বাকি মানুষগুলির ঈশ্বর সাধনার বিশেষ তফাত এখানেই যে মাধালির ধর্মচেতনা কোনো মানুষের প্রতি কামে প্রেমে মমতায় মানবধর্মে উত্তীর্ণ হতে চায়। দিবারাত্রি বিনিদ্র নয়নে ঘুরে বেরিয়ে যখন প্রভুর দেখা মিলল না তখন সে স্থিত হল রোমনিতে অর্থাৎ রমণী বা নারীতে। উপন্যাসে রোমনি নামটি √রম্ (যৌনক্রীড়া বা আসক্তি) ধাতু জাত রমণ শব্দ থেকে এসেছে। রমণীর গ্রাম্য কথ্যরূপ রোমনি; যে পুরুষ মাধালির সন্তোষ বিধায়িত্রী। মাধালির জীবনে রমণী তাই রোমনি হয়েই এসেছে। তার অভীষ্ট ও প্রাণশক্তির নিয়ন্তা রোমনি, যে তার সহধর্ম পালনকারী হিসাবে হয়ে উঠবে শবরী।

কমলকুমার এমন একজন লেখক যার প্রায় সমস্ত লেখাতেই ব্যক্ত'র চেয়ে অব্যক্তই বেশি। তাঁর এ লেখাতেও সেই লক্ষণই বিদ্যমান যেখানে ধরার ইঙ্গিতটুকু আছে, কিন্তু অধরাই প্রতিষ্ঠিত। নয়ত শবরী দিয়ে নামকরণ তিনি করবেন কেন, যেখানে মুখ্য চরিত্রে কোনো শবরীকে পাওয়া যায় না! মাধালির মতো আসলে তাঁরও উদ্দিষ্ট হল 'শবরী'। তাই রোমনি হল কাঙ্ক্ষিত ও কল্পিত শবরী। তাকে কেন্দ্রে রেখেই মাধালির জীবনমুখী গল্পরচনা করেছেন লেখক। বৃন্দা বামুনের ঔরসজাত রোমনি ধীরে ধীরে যে কখন শবর মাধালির শবরী হয়ে উঠল তা টের পাওয়া গেল গল্পের শেষে। আর তাই শবরীকে ঘিরে উপন্যাসের নামকরণটিও অশেষ ব্যঞ্জনা পায়। এবার দেখার বিষয় শবরীকথায় 'মঙ্গল' শব্দটি জুড়ে দেবার অর্থ কী। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুরাণের দেব-দেবীর লৌকিক রূপই প্রতিষ্ঠিত। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর বা অন্যান্য লোকদেবতার পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্যকীর্তন করতে গিয়ে এক-একটি বিশেষ বিশেষ জাতির সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটিতে রয়েছে ভারতের আদিম অধিবাসী কিরাত বা শবর জাতির কথা। তাদের জীবন-যাপন, খাদ্যাভাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, কাম-প্রেম সবকিছুই উঠে এসেছে কাহিনিতে। শবরদের লোকজীবনের প্রেক্ষাপটেই মাধালির বিশেষ জীবনানুভূতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল' এর দেবী অভয়া হলেন জীবধাত্রী, অরণ্যানীর অধিদেবতা। অরণ্য ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবকূলের মঙ্গলকারিণী। তার পূর্বে আমরা পেয়েছি অ-পৌরাণিক ঐতিহ্যের দেবী মনসা বা বিষহরি কে। মনসা বা চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপন পাঞ্চালী বা

ব্রতগীতের অষ্টমদিনের “অষ্টমঙ্গলা” গানের দ্বারা লোকধর্মানুষ্ঠানের সমাপ্তি হত। ‘মঙ্গল’ কথাটি মেয়েলি শুভ অনুষ্ঠান ও মেয়েলি আচারে গীত মঙ্গলগান হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও এখানে মঙ্গলের সঙ্গে গীতের বা গেয় আখ্যায়িকার সম্বন্ধ খুঁজলে চলবে না। মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে সেকালের সমাজের প্রতিচ্ছবি ও রূপকথার সংমিশ্রণ ঘটেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন মঙ্গলকাব্য কাব্য নয়, সেখানে সমাজই প্রাধান্যলাভ করেছে। কাব্য তো তা বটেই তবে সমাজের প্রাধান্য একবাক্যে স্বীকার করে নেবার। উক্ত সমালোচক মঙ্গলকাব্যের কবিদের কবিত্বশক্তি অপেক্ষা তৎকালীন দেশ ও সমাজ পরিচয় প্রদানের ক্ষমতাকে বড়ো করে দেখেছেন। আমাদের আলোচ্য গদ্য আখ্যানেও সাঁওতাল শবর মাধালির জনপরিচয় ও বিশ শতকের কোম্পানীর শাসনের সময়কালে ধর্মান্তরিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। মাধালি চরিত্রের ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোষ্ঠীগত বিশেষ আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসেরও বয়ান রেখেছেন লেখক। যেমন ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এ দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যগান, ‘মনসামঙ্গল’ এ দেবী মনসার মাহাত্ম্যবর্ণন ও পূজা প্রচার মূল প্রতিপাদ্য তেমনি ‘শবরীমঙ্গল’ এ শবরীর অনুসন্ধান, তার মাহাত্ম্য ও মাধালির জীবনে তার সর্বোচ্চ স্থানটি নির্মিত হয়েছে। মাধালিকে আলোর পথে নিয়ে গিয়ে জীবনের সমস্ত অমঙ্গল ও অন্ধকার নাশ করবে এই শবরী। তাই শবর মাধালির জীবনের মঙ্গলগান রচনা করে এরূপ নামকরণ করলেন কমলকুমার। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে মঙ্গলকাব্যে ধর্মাধর্মের কথা মুখ্য বা আধেয়, এর আধার হল সমাজ ও লোকায়ত জীবন। কিন্তু ‘শবরীমঙ্গল’-এ আধ্যাত্মধর্মের বাড়বাড়ন্ত নেই। এ উপন্যাস সম্পর্কে কামরুজ্জামানের একটি মন্তব্য এখানে স্মরণীয়- ‘ধর্মের কাছে একেবারে পাকাপোক্ত করে নিজেকে বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা লেখক রাখেননি’[৫]।

এবার ‘শবরীমঙ্গল’ উপন্যাস সম্পর্কে কিছু ভাবনা মেলে ধরতে চেষ্টা করব। প্রথমেই বলি বাংলা সাহিত্যে ‘সাবলটার্ন স্টাডিস’ এর চর্চার চূড়ান্ত সময়টির অনেক আগেই (১৯৫৫-র মধ্যে) কমলকুমার এ উপন্যাস লিখেছেন। মার্কসবাদী ধারা অনুসরণ করে নিম্নবর্গচর্চার কাজটি না করে থাকলেও তাঁর এ রচনাটি কিছুটা ‘তল থেকে দেখা ইতিহাসের’ (হিসট্রি ক্রম বিলো) নামান্তর। এই রচনায় প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত, নিরুপদ্রব জীবন-যাপনে অভ্যস্ত আদিবাসী (aborigins) জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ থেকেই করেছেন ‘নিম্নবর্গের নির্মাণ’। তাই পরবর্তীকালের ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ চর্চায় ‘শবরীমঙ্গল’ একটি পূর্ণ সম্ভাবনার নাম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কথা বাদ দিলেও বিশশতকের পঞ্চাশের দশকে দু-একজন কথাকার যেমন রমাপদ চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ীরা আদিবাসী জীবন ও নিম্নবর্গ নিয়ে লেখালেখি করছেন। তবে তখন নিম্নবর্গ চর্চা বা এই নামটিও বহুল চর্চিত ছিল না। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর থেকেই নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষেরা বাংলা সাহিত্যে চরিত্র হিসাবে অনুপ্রবেশ করতে থাকল।

অতিসাধারণ, অতিব্রাত্য, অল্প অন্নে জীবিত, বাইবেলের দর্শনে লালিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রহীন একদল মানুষের ভিতর থেকে বেশি আলো ফেলে লেখক কমলকুমার চিনিয়েছেন মাধালিকে। এক নারীর উদ্দেশ্যেই সে নিজের সমষ্টিজীবন থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে এসেছে; গুটি কেটে মুক্ত হওয়া রঙিন প্রজাপতির মতোই। উপন্যাসের শেষেও দেখি সে তার কৌমের সঙ্গে মিলতে পারে না কিছুতে, নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে নিজে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে কাল কাটায়। মাধালির নিম্নবর্গীর চেতনা অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নীত হয়। ভারতীয় জাতি ও বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিতে সনাতন কাল থেকেই আদিম অধিবাসীদের অত্যন্ত খাটো করে দেখা হোত। অসভ্য, বর্বর, বুনো, জংলি প্রভৃতি নামে তাদের ডাকা হয় আজকের দিনেও। অদ্বৈত ও মাধালির কথোপকথনে সেই জাতিগত ও বর্ণগত প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাই। এর সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে মাধালির পৌরুষে ভয়ভীত হয়ে তাকে তেলিয়ে চলতে চেষ্টা করাটায় একটা পরিবর্তনের আভাস পেলাম আমরা। এখানে জাতিগত তথাকথিত উচ্চতা বা নীচতার পরিচয়টুকু সর্বস্ব যে নয় তা বুঝতে পারি। আবার সুবাইয়ের কথাতেও এই জাতপাতের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে তবে মাধালিকে অবশ্য সে অন্যচোখে দেখে তাই তাকে খাতিরও করে। মাধালিদের সামাজিক উত্তরণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাও ধর্মের হাত ধরে। আর্থিক উত্তরণের চেষ্টা নেই, তার গোষ্ঠীর কেউ কেউ বড়োজোর কয়লা খনিতে কাজ নিতে চেয়েছে, এর বেশি কিছু না। কোম্পানীর দালাল সুবাইয়ের প্রসঙ্গে খুব পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে উঠতি মুনাফারাজ ব্যবসায়ীদের দাপটে নিম্নবর্গের বিশেষত আদিবাসী উপজাতির শোচনীয় অবস্থার কথা। অভাব অনটন যাদের নিত্যসঙ্গী তারা নিজ সংস্কৃতি উৎসব আনন্দে মাতোয়ারা হবে কীভাবে। আর তাই তাদের ধর্ম-ধর্ম, ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল হবার মতো স্বেচ্ছাকৃত বিলাসিতা মানায় না। পেটে ভাত না পড়লে সবকিছুই অন্ধকার ঠেকে, অনন্ত জীবন রহস্য তখন বোধগম্য হয় না। মাকড়ীর মতো সেটা কেউ কেউ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। মধ্যযুগীয় ঈশ্বর চেতনা ক্ষয়ে আসছে তাদের।

কমলকুমারের এ উপন্যাস লেখার একটি বাস্তব সত্য দিক হল রিখিয়ায় খুব কাছ থেকে দেখা আদিবাসী জীবন। 'শবরীমঙ্গল' এর কিছু স্থাননাম, নদী পাহাড় বাস্তবিক অস্তিত্বময়, আর কিছু কাল্পনিক। যাইহোক আমরা দেখতে পাবো এ উপন্যাসে আদিবাসীদের অরণ্যের প্রতি নির্ভরশীলতা কমে এসেছে। তারা নিজস্ব সংস্কৃতিকে পূর্বজদের মতো ধরে রাখতে পারছে না। তারা জহর থানের চেয়ে গীর্জাথানের উপর আস্থাশীল। 'জহরথান' হল আদিবাসীদের দেবস্থান। হিন্দুদের মন্দির, ইসলামদের মসজিদের মতোই তা আদিবাসীদের নিকট অতি পবিত্রস্থান। অরণ্য ও অরণ্যের সম্পদের উপর যখন সমস্ত অধিকার তাদের উঠে গেছে, তখন বনে স্থাপিত দেব-দেবীর পূণ্যবাসভূমিও তাদের লাগালের বাইরে যেতে থাকল। কারণ ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'ভারতীয় অরণ্য আইন' (Indian Forest Act) এর প্রণয়ন করে আদিবাসী উপজাতিদের চিরাচরিত অরণ্য নির্ভরতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ভারতের বিভিন্ন অংশে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অধিকার ও সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সরকার, ব্যবসাদার, ঠিকাদার দখল করে বন আর আদিম জনগোষ্ঠী আশ্রয় নেয় খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে। ফলে তাদের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ উপন্যাসে কোম্পানীর বিদ্বেষপূর্ণ উল্লেখে আদিবাসীদের প্রতি অবিচারের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে বারবার। চরম খাদ্যাভাবের বর্ণনা পাই কয়েকটি স্থানে- মাধালি একবার বলছে, 'আমাদের খাবার নাই কিছু নাই ... আমার ভিতরে কুকুর সেন্দাইছে- কার্তিকের কুকুর মত-'[৬] আর এক জায়গায় কথকের বয়ান- 'এই শ্রাবণ ভাদ্র তারা ভাত খায়, এরপর যদি চাট্টি শুধু ভাত মেলে কখনও টক আমলকি, কখন পিয়াশাল কখন ডুমুর কখন কিছু কিছু এইত ভাগ্য।'[৭]

কোম্পানী খ্রিস্টান মিশনারিদের আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছিল। নিজে স্বাধীনভাবে বাঁচা ও নিজ মর্জির মালিক হয়ে জীবন কাটানোর প্রয়াস মাধালি পেয়ে থাকবে বাইবেলের উদারনৈতিক মন্ত্রে। সে তাই নিজের গোষ্ঠীর ভিতর নিজেকে জেনেছে, সাধারণ থেকে বিশেষ হয়ে উঠেছে। একদিকে ঈশ্বরের দর্শনলাভের ইচ্ছা, অন্যদিকে রোমনির প্রতি সুতীব্র টান, এই দুইয়ের বিক্রিয়া মাধালির মধ্যে এক টেনশন ঘনীভূত করেছিল যা তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে যায়। রোমনিকে পিছনে ফেলে রেখে কুসুঁডিহি-হুইটিলা-পাঁহুড়ি পেরিয়ে রৈবতী যতই সে এগিয়েছে ততই তার প্রতি কামে-প্রেমে আরও শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছে। আবার রোমনিকে মুগ্ধ করতে গিয়েও পিছু হটে প্রমাদের মতো 'আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই' বলে ছুটে

গেছে। অবশেষে সে ঠেকে গেছে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন কামনার কাছে। এখানটায় লেখক কামুক কুকুরের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকবার। তখন ভগবান মনে করতে গেলেই 'খারাপ কথা'ই মনে জেগেছে- 'আমার শালা মেঘ ডাকলে কাম হয়, আমার শালা ব্যাঙে পোকা ধরলে হয়, ভাবলাম শালা আমিও কোথাও পোকার মত ভয় পেলে হয়, আমি মাগী চাই এ কেনে বল ...।'[৮] এভাবেই নিম্নবর্গের মুখে জীবন্ত কাঁচা সংলাপ দিয়েছেন কমলকুমার আরও অনেক জায়গায়।

হিন্দু বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শবরদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' এ। 'শবরীমঙ্গল' এ এই দুই সংস্কৃতিকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন লেখক সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ অদ্বৈত মিশ্র ও নিম্নবর্গের সাধক পুরুষ মাধালির আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ অদ্বৈত মিশ্র যে রোমনির অভিভাবক সে নিজের জাত্যাভিমানে আদিবাসী মাধালিকে 'ছোট জাত' বলে ঘৃণা করেছে; অথচ সে নিজে একজন গলিত কুষ্ঠরোগী। কিন্তু মাধালির তার প্রতি ঘৃণাজনিত ভীতি উবে গেছে একসময়। মাধালি এই জায়গায় মহামানবের ইমেজকে ছুঁয়েছে। এ যেন পুরুষোত্তম চৈতন্যর কুষ্ঠরোগী বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন দেওয়া। অদ্বৈত মিশ্রকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তার শরীরে হাত বোলাতে থাকে। "ভয় ত্রাস থেকে অপরিসীম বেদনা তার মধ্যে ভেঙে পড়েছিল, অনেক দিন প্রতীক্ষা মানা দেহ যেন আর একটি দেহকে পেল, সে যে কিভাবে তার আনন্দকে উপভোগ করবে তা ভাববার সময়ই পেলে না। নিজের দেহের উষ্ণতা সে বুঝতে পারলে, এই উষ্ণতায় তার আহার নিদ্রা আর কামনা আরাম সমস্তই এক হয়েছিল। ... জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রমণীর সৌন্দর্য্য এত আনন্দ দিতে পারে না।"[৯] এই অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের মানবপ্রেমের মহিমার ব্যঞ্জনা নিহিত থাকতে পারে, কারণ কমলকুমার রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত একজন।

Tribal Language-এর বিভিন্ন শব্দ ও সংলাপে কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ বাক্যই ব্যবহার করেছেন লেখক, এতে কাহিনির বিশ্বস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের মুখের ভাষাও অনেক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোকজ শব্দগুলি হল- পারকোম (চৌকি বিশেষ), পেকা (ছাতা বা মাথার ছাউনি) সেন্দাইল (প্রবেশ করল), বেহুড়লে (অমানুষ), জিমবিবি (একপ্রকার জাল), আনসঙ্গরা (অমঙ্গল)। এছাড়াও বিভিন্ন শব্দের কথ্যরূপ তাদের কথায় উঠে আসছে সেগুলি হল- বুরখা (বর্ষা), তুড়সী (তুলসী), ক্রেস্তান (খ্রিস্টান), আলা (আলো), চারমান (চেয়ারম্যান), লাচনী (নাচনী),

হরকার (সরকার), লুৎতন/লৈতুন(নতুন), কপাড় (কপাল), মোতুরা (মথুরা), লষ্ট (নষ্ট), ন্যাজ (লেজ), ধম্ম (ধর্ম), বিয়া (বিয়ে), ছেলা (ছেলে) ইত্যাদি। বিভিন্ন অপ্রচলিত শব্দের দ্বৈতরূপ খুঁজে পাবো আমরা, যেমন- 'যাদুক যাদুক জিনিস পাবে বৈকি', 'দেহমন ইলিবিলি করে', 'পাগলের মত এটিলা সেটিলা করেছে'। কিছু সম্পূর্ণ বাক্য রয়েছে যেগুলি অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডারি অথবা খারওয়ারি যেকোনো উপগোষ্ঠীরই হতে পারে। এধরনের বাক্যগুলি হল-

১. মার বেয়াদো বেয়ান পে (উপন্যাস সমগ্র, ৪৮৬)

২. মার মাদ পা আদপে (উপন্যাস সমগ্র, ৪৯৮)

৩. হেড়ং কোটা ভুরু বুড়াহি ইক (উপন্যাস সমগ্র, ৫১৫)

উপমা ব্যবহারে দেখতে পাই অত্যন্ত বিচক্ষণতা। পশু-পাখি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তুচ্ছ বস্তুর সঙ্গে সাবলটার্ন চরিত্রগুলির তুলনা টেনেছেন তাদেরই ভাবনা অনুযায়ী। এমন কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক-

১. ভাতের মতই মনটা তার নরম।

২. মাধালি যেমন অন্যমনস্ক, স্থিরদৃষ্টি, জলের কিনারে সাদা বক যেমন হলদে ঠোঁট স্থির করে রাখে।

৩. সম্মুখেই দশাসই সাল কাঠের তৈরি লোকটা।

৪. হাঁইসাদো উড়ন্ত কাপড়ের মত একটি নদী।

৫. গরুর গাড়ীর চাকায় যেমন কাদা লেগে থাকে তেমনি অবসন্নতা তার গায়ে লেগেছিল।

৬. মেরুদণ্ডের হাড় ঘৃতকুমারীর পাতার মতই বেঁকে উঠে গেছে।

৭. লুহানী সবে বাচ্ছা দেওয়া পাখীর মত ফুলে উঠেছিল।

৮. পায়রা-পা রঙের জিবটি বার করে শিম ফুলের মত ঠোঁটটি বুলায়।

৯. মহিষের শিঙের মত কঠিন।

১০. গাছের ডালের মত ফাটা ফাটা শরীর বেঁকে গেছে জীবনটা বয়ে বয়ে-

১১. ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তার গায়ের শিরা গরু খাওয়া ঘাসের মতই তীক্ষ্ম হয়ে উঠল--

কোথাও কোথাও এই উপমা দ্বারা কবিতার বুননটি টের পাই আমরা, যেমন-

১. পাখির বাসার মতই ভীরু দুটি চোখ বা

২. জোনাকির আলোর মত টাকা-ভোর উষ্ণতা একবার এখানে একবার সেখানে, দেহের সর্বত্রে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

এই উপমা দুটি আমাদের জীবনানন্দকে স্মরণ করায়। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' ও আরও বিখ্যাত কয়েকটি কাব্য পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশ পাচ্ছে। উপমা বিচারে অনুকরণ না হয়ে অনুসরণও ঘটতে পারে কারণ উপমা দুটি জীবনানন্দের অত্যন্ত মৌলিক সৃষ্টি। কমলকুমার গদ্যে কাব্যরস ফুটিয়ে তুললেও অনেক স্থানে আদিম উপজাতিদের মুখে আকাঁড়া গ্রাম্য শব্দ ও ইতর শব্দ বসিয়েছেন। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই কমবেশি চোখে পড়বে এ ধরনের শব্দ। তবে 'শবরীমঙ্গল' এ ব্রাত্যজনের মুখে মুখে অনেক অমার্জিত স্ল্যাং তিনি বসিয়ে দিয়েছেন।

অসংস্কৃত অনগ্রসর বলা হলেও আদিবাসীদের একটা প্রাচীন সংস্কৃতি রয়েছে। 'শবরীমঙ্গল'-এ তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। এখানে আদিবাসীরা তাদের জাতিগত বৃত্তিকেই গ্রহণ করেছে যেমন পাখি ও পশু শিকার, বনে মধু সংগ্রহ করা। কৃষিকাজের সঙ্গে তেমন যুক্ত নয় তাই তারা ভাত খেতে পায় না সারাবছর। যেটুকু খাবারই সংগ্রহ করে তা পোড়া, সিদ্ধ, বাসি খেয়েও দিন কাটায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ট্রাইবদের চেয়ে শবরেরা আবার বেশি ভাবভোলা ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকে। নীহাররঞ্জন এদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও বলেছেন। মাধালি চরিত্র সম্পর্কে একথা যথার্থই খাটে। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও দেবস্থানে মুরগি উৎসর্গ করা ও অন্যান্য মানত প্রথা তারা বহন করে চলেছে। যেহেতু তারা ভগবান যীশুকে মানে তাই সিং বোঙা বা সূর্যদেবতা তাদের প্রধান দেবতা নয়। পাথরের নুড়ি বা অন্য কোনো উপাদানকে ঈশ্বরত্বের প্রতীক রূপে চিহ্নিত করে পুজো করা এদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এইসব ধর্মীয় প্রতীককে 'টোটেম' বলা হয়। এই টোটেমের সঙ্গে আবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানা হয় যাদের বলে 'ট্যাবু'। গোত্রভেদে ট্যাবু ও টোটেমগুলি আলাদা হয়ে থাকে। মাধালির গোত্র কিস্কু যাদের টোটেম হিসাবে কাঠবেড়ালি ও শঙ্খচিলের উল্লেখ আছে আলোচ্য উপন্যাসে। শিকারীদের লোকবিশ্বাস হিসাবে বলা হয়েছে শুষ্ক শাল ফুল কানে দিয়ে শিকারে বেরুলে ভালো শিকার মেলে। খ্রিস্টান ধর্মের আশ্রয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যান্য Evil Spirits গুলির উপর বিশ্বাস উঠে গেছে ধীরে ধীরে, তবে ডাইনির মতো Evil Spirits-এরও উল্লেখ আছে উপন্যাসে।

আদিবাসীরা প্রশাসন বলতে নিজস্ব গ্রাম সংগঠনে বিশ্বাসী। যেকোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিচারশালা গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম সংগঠনের প্রধানের নির্দেশেই বসে। মাধালিদের সমাজে বিবাহ প্রথার উল্লেখ না থাকলেও স্যাঙা বিয়ের প্রসঙ্গ আছে। সংসারের প্রতি উদাসীন মাধালির জীবিকা বলতেও কিছু নেই। তাই তার স্বামী

পরিত্যক্তা বোন লুহানী স্যাঙা বিয়ে করে মাধালির পেট চালাতে চায়। এ ধরনের বিবাহে কন্যাপণ অনেক কম লাগে। যেকোনো বিবাহের প্রস্তাব ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে আসে; এটাই তাদের সমাজের নিয়ম। স্যাঙা বিয়ে ছাড়াও মাধালিদের একটি উৎসবের উল্লেখ রয়েছে আখ্যানে। আদিঙে দেবতার পার্বণে মাধালিরা ফুলে ফুলে নিজেদের ঘর সাজায়, শাল ফুল পরে নাচ গান করে, পরের দিন মাছ ভাত আদিঙে কে উৎসর্গ করে নিজেরা খায়। মাধালি এ পরবে সামিল হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনো কিছুতে তার স্বস্তি মেলে না। এমনকি গীর্জায় গিয়েও মনের অন্ধকার ঘোচে না, বরং এক শবরী এসে তাকে রোমনির কথা মনে করিয়ে বুকে ঢেউ তুলে যায়। প্রভু আমেন নয় তার গন্তব্য হয়ে ওঠে কুসুঁডিহির রোমনি-

> মাধালির কোলে সেই দুরন্ত জঙ্গল, সেই ব্যাঙ সেই শালিক, সেই ভ্রমর এমনকি কুমারী নদীর টিলার সেই কাপড় প্রত্যেকটা মানুষের মত বলছে কসুঁ ডিহি চল সেইখানে যে মেয়ের নিঃশ্বাসে চৈত্রমাস।[১০]

প্রেমেই সে বাঁচবে, রোমনিকে পেলেই ঈশ্বরকে পাওয়া হবে। তাই ‘শবরীমঙ্গল’ কোনো ধর্মগ্রন্থ নয় এক চূড়ান্ত প্রেমমূলক আখ্যান হয়ে থেকে যায়। এখানে মানুষই শ্রেষ্ঠ তার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে, ভালো-মন্দে সবকিছুতে সে-ই দ্রষ্টব্য। ধর্ম যদি থেকে থাকে, তা হল মানবধর্ম।

তথ্যসূত্র :

১. মজুমদার, দয়াময়ী, (সম্পা.) মাজী, প্রশান্ত. ‘কমলকুমার ১০০’. কলকাতা : প্রতিভাস, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৮৭.

২. সেন, সুকুমার. ‘চর্যাগীতি-পদাবলী’. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬, পৃ. ৬৬.

৩. মজুমদার, কমলকুমার. উপন্যাস সমগ্র . কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৬০.

৪. তদেব, পৃ. ৫২৫.

৫. জাহাঙ্গীর, কামরুজ্জামান . ‘কমলনামা’ . ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯৪.

৬. মজুমদার, কমলকুমার. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭.

৭. তদেব, পৃ. ৪৯৫.

৮. তদেব, পৃ. ৫২৪.

৯. ঐ

১০. মজুমদার, কমলকুমার. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মজুমদার, কমলকুমার. উপন্যাস সমগ্র. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. জানুয়ারি ২০০২.

২. জাহাঙ্গীর, কামরুজ্জামান. 'কমলনামা'. ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড. ফেব্রুয়ারি ২০১৫.

৩. জিবরান, শোয়াইব. 'কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল'. ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৯.

৪. দেবসেন, সুবোধ. 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ'. কলকাতা : পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০.

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব). কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬৬.

৬. বাস্কে পাবলিকেশন, ধীরেন্দ্রনাথ. 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' (প্রথম খণ্ড). কলকাতা : পাবলিকেশন, মে ১৯৮৭.

৭. (সম্পা.) ভদ্র, গৌতম. 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'. কলকাতা : প্রতিভাস. ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮.

৮. (সং ও সম্পা.) মাজী, প্রশান্ত. 'কমলকুমার ১০০'. কলকাতা : প্রতিভাস, ডিসেম্বর ২০১৭.

৯. রায়, নীহাররঞ্জন. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব). কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. ১৩৫৬.

১০. সেন, সুকুমার. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড). কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০.

১১. Guha, Ranajit. 'Subaltern Studies II'. Delhi : Oxford University Press. 1983.

১২. Risley, H.H. 'The Tribes and Castes of Bengal' (vol. I.). Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1892.

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গতিশীলতা: অধিকারী সম্প্রদায়

বিমল চন্দ্র বর্মন
সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
নগর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: *ভারত তথা বঙ্গের ইতিহাসচর্চায় বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার জায়গাটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। কারণ জাতি ও তার স্তর বিন্যাসের নিরিখে সমাজ ব্যখ্যার প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। সেকারনে ভারত তথা বঙ্গের মৌলিকত্ব (Fundamental) জাতি ব্যবস্থার একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। ফলত আমরা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতি প্রসঙ্গটি সামনে রেখে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব কিভাবে জাতি প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও ঐক্যের সহবস্থান ঘটেছে।*

সূচক শব্দ: *রাজবংশী, অধিকারী, প্রতিরোধ, স্বাধীনতা, ঐক্য*

উত্তরবঙ্গ, বঙ্গের নিরিখে কিছুটা স্বতন্ত্র। যেমন ভৌগোলিক পরিবেশ এবং নৃতাত্বিকগত পরিচয় এই স্বতন্ত্রতাকে প্রকট করে। এই দ্বিবিবিধতা ‘অন্যের’ দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘আদিম সংস্কৃতি’র (Primitive culture) অংশ করে ভাবার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। আদিমতার প্রশ্নটি বন জঙ্গলের পরিবেশে যেমন অনার্য্য সমাজ অবস্থান করে এই রকমভাবে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলি তার জায়গার কথা উল্লেখ করে থাকে। তার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের একটা পরিবেশগত সাদৃশ বর্তমানকালেও লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে উপনিবেশিক শাসনের সুবিধর্বাতে ব্রিটিশ আধিকারিকরা[১] এবং পরবর্তীতে যেসকল বাঙালি[২] লেখকরা জাতি বিষয়টি তাদের লেখনির প্রধান উপজীব্য করেছেন তাদের রচনাতে রাজবংশী প্রশ্নটি অনার্য্য সংস্কৃতির অনুরূপ বলে মনে করেন। অপরদিকে রাজবংশীদের নিয়ে একটা নিজস্ব ব্যখ্যা রয়েছে রাজবংশী বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকদের ওদের অবস্থান নিয়ে। এই যুগপদ অবস্থানের নিরিখে রাজবংশী প্রশ্নটি আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে নিয়ে এসে দেখাতে চাইছি জাতি প্রশ্নের প্রতিরোধ, স্বাধীনতা এবং ঐক্যের ধারণাকে।

বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের অবস্থানকে ক্রমোচ্চবিন্যাসে প্রকট করে। বর্ণ ব্যবস্থার এই বিন্যাসগত স্তরভেদকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। মানুষের গুনগত দক্ষতা এবং জন্মগত অধিকারের জায়গা থেকে। জন্মগত অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ তথা সার্বজনিন আর্দশের পদ্ধতিগত ব্যখ্যা মূলতঃ ভাল মন্দ বা শুদ্ধ অশুদ্ধ'র পরিমিতিতে সীমিত। এক্ষেত্রে জন্মগত প্রশ্নটি জাতি ব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এই শুদ্ধ অশুদ্ধতা বিচার একপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক যা প্রকাশ করে অপরিবর্তনীয় রূপে।

অপরদিকে বর্ণ ব্যবস্থায় উক্ত ক্রমোচ্চবিন্যাস ও তার কাঠামোকে ব্যক্তি বা সমষ্টির গুনগত বৈশিষ্ট্যের সূচক হিসাবে বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ লক্ষ করে থাকি। কর্মদক্ষতা এই বিভাজনের প্রধান মানদন্ড হলেও আর্য্য ও অনার্য্যের পারস্পরিক সহযোগীতা উৎপাদন পদ্ধতি এবং নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ব করার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিক এবং তার ক্ষমতা পরিবর্তন করলেও জাতি সত্তার জায়গাটি অনুরূপ থেকে যায় বলে Hitesranjan sanyal মনে করেন।[৩] এক্ষেত্রে জাতি তার রক্ষণশীল মানুষিক চিন্তার বদল না করলেও একটা স্বাধীনতার জায়গাকে উদ্মুক্ত করে। উৎপাদনের সহজতর কৌশল আয়ত্ব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান উভয় উভয়কে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। এই অবাদসংযোগ সত্বেও জাতি তার নিজস্ব আদবকায়দা পরিত্যাগ না করে অপরকে নিজের মধ্যে যুক্ত করার যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন তা স্ব স্ব জাতির মৌলিকত্বের প্রকাশ বলা যায়।

সে জন্য বর্ণ চার প্রকার হলেও জাতির সংখ্যা ততোধিক। আধুনিক পরিসংখানে দেখা যায় ভারতে ৩০০০ এর উপর[৪] এবং উপনিবেশিক বাংলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা প্রায় ৪৮টি।[৫] জাতি অবস্থানের অবনমন বা উন্নয়ন নির্ভর করত প্রযুক্তিগত বিদ্যায় ব্যক্তি বিশেষের পারদর্শিতা ও তার লব্দজ্ঞান অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবহারিক করে তোলার মধ্য দিয়ে। তবে আর্য্য সংস্কৃতি সঙ্গে অনার্যদের মান্যতা সমান লয়ে না হয়ে বরং কিছুটা গ্রহন বা সামান্য বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হতে থাকে বলে শ্রীনির্মলকুমার বসু মনে করেন।[৬] জাতির অবস্থান নির্ণয়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিগত ইতিহাস সামনে রেখে আমরা রাজবংশী প্রশ্নটি উত্থাপন করছি।

দুই

উত্তরবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক সীমানা মূলত ধরা হয়ে থাকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ

দিনাজপুর এই জেলারগুলির পরিসীমাকে কেন্দ্র করে। পৌরাণিক পরিভাষায় অতীত বাংলার পরিসীমা নির্ধারিত হয়েছিল অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, সুক্ষ্ম, এই বিভাগগুলি নিয়ে। মহাভারতে হরিবংশে এই বিভাগগুলি জনপদের নামে পরিচিতি পেয়েছিল। বলা হয়ে থাকে মুনিবরের ঔরসে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এরা অঙ্গ, বঙ্গ, সুক্ষ্মক, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক নামে পরিচিতি পেয়েছিল। 'পুণ্ড্র' গঠিত হয়েছিল বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর, ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি নিয়ে।[৭] অর্থাৎ পুণ্ড্র উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বাংলার রাজধানী হিসাবে পুণ্ড্রবর্ধনকে চিহ্নিত করেছেন।[৮] পুণ্ড্রবর্ধন নগরীটি অবস্থান করেছিল করতোয়া নদীর তীরে। মহাভারতের যুগে করতোয়া (সদানীরা) পবিত্র নদী যা উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদী বলে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গের আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী হল তিস্তা। অর্থাৎ এই তিস্তা-করতোয়ার পশ্চিম পাড় থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ বা কামতাপুর এর শাসন পরিচালিত হয়েছিল। করতোয়ার পশ্চিমে এবং কোশী নদীর পূর্বপাড়ের অঞ্চলগুলিতে পুণ্ড্রবর্ধনের শাসন কায়েম ছিল বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে ভারতে আর্য্যদের আবির্ভাবের প্রাক-কালে যে সকল জন ভারতে প্রবেশ করেছিল তাঁরা আদিম অধিবাসী বলে বিবেচিত। এই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম নেগ্রিটো (Race) এবং এর পরবর্তিতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষজন গ্রাম ভিত্তিক সমাজের সূচনা করে থাকেন বলে অনেকে মনে করেন।[৯] গৌড়-পুণ্ড্রের আদিম স্তরে আদি-অস্ট্রলীয়দের অস্তিত্ব ছিল বলে নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।[১০] বলা হয়ে থাকে অস্ট্রিকদের পরবর্তীতে দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশ করে। অস্ট্রিকরা কৃষি সমাজের পত্তন করে আর দ্রাবিড়ভাষীরা নগর রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। প্রাচীন বাংলার রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন ও পুণ্ড্র নগরী নির্মাণে দ্রাবিড়দের অবদান বলে মনে করা হয়।[১১] জাতিগতভাবে পুণ্ড্রবাসীদের 'দস্যু' হিসাবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখান হয়েছে। আবার মনু সংহিতায় পুণ্ড্র ও কিরাতদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসাবে প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ স্পষ্ট।[১২] কিরাত বলতে সম্ভবত প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। পাহাড়ের প্রান্ত দেশের অধিবাসীদের সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী 'কিরাত' বলে অভিহিত করেছেন।[১৩] সেই অর্থে দেখা যাছে দ্রাবিড়দের 'দাস' বা 'দস্যু', অস্ট্রিকদের 'নিষাদ' আর মঙ্গোলীয়দের 'কিরাত' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ অনার্য্য জগতের সাথে

ব্রাহ্মণ্য ধারনার একটা পারস্পরিক সম্পর্ক শ্লথ লয়ে উত্তরবঙ্গে বিকিশিত হওয়ার আভাস ফুটে ওঠে।

সেই সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের এক অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি উপেন্দ্র নাথ বর্মণ ১৯৪১ সালে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' রচনা করেন। তিনি রাজবংশীদের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে মূলত পৌরাণিক গ্রন্থ ও তার সঙ্গে ব্রিটিশ আধিকারিকদের লেখনির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুণ্ড্রবাসীদের ক্ষত্রিয়চিত গুণ ও কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন রাজবংশীরা পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে মনু যেভাবে পুণ্ড্রবাসীদের উল্লেখ করেছেন তার অনুরূপ ব্যখ্যা করেছেন বর্মণ বাবু। তিনি পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়ের ছয়টি গুণ ও স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- দাতা, বলবান, হিতকারী, শান্তমন, দেবসেবী ও কৃষিকর্মপজীবি। লিখেছেন 'যাহারা রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন, রাজবংশী জাতির এই ছয়টি গুণ পরিস্ফুট'।[১৪] দাতা, বলবান, হিতকারী, শান্তমন এই গুণগুলিকে তিনি ভাবের প্রকাশ বলে মনে করেন। শেষোক্ত লক্ষণ দুটির ব্যখ্যাতে তিনি ধর্মীয় বিষয়টি উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কৃষিকর্মকে 'আপদধর্ম' হিসাবে তুলে ধরার মধ্যে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের। আর্য্য সংস্কৃতিতে কৃষিকাজকে অবহেলার জায়গা বলে সর্বদাই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সেই নিরিখে ক্ষত্রিয় জীবন থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে রাজবংশীরা কৃষিকাজকে পেশা হিসাবে বেচে নিয়েছেন। দেবসেবা রাজবংশীদের প্রত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক বিষয় এমনটাই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী দেবতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন--- (ক) গ্রাম্য দেবতা, (খ) পারিবারিক দেবতা। গ্রামে যৌথতায় গ্রাম্য দেবতার পূজার রীতি বোধ হয় বেশ পুরানো যার রেয়াজ পরম্পরায় বর্তমান সমাজে লক্ষ করা যায়। এই দেবতার গুলির অনেকাংশই অনার্য্য দেবতা এবং মুসলিম ধর্মের রেয়াজ রয়েছে।[১৫]

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ রাজবংশীর পরিবারিক দেবতার চিহ্ন হিসাবে বাস্তুদেবতা ও তুলসীর স্থানকে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন 'উক্ত তুলসীমঞ্চে প্রতিদিন ইস্টদেবতা স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে সকলেই করিয়া থাকে'।[১৬] প্রত্যেক রাজবংশী পরিবারে তুলসীমঞ্চ এবং সেখানে যাবতীয় পুজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকার অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন ডঃ গিরিজাশংকর রায়।[১৭] বর্তমান তুলসীমঞ্চে পাশে ছোট্ট একটি মাটির ঢিবি লক্ষ করা যায় যাকে সত্যপীরের ঢিবি বলা হয়ে থাকে।[১৮] এমনকি এই তুলসীমঞ্চে একটি দন্ডয়মান বাঁশের চূড়ায় লাল ও সাদা রঙের পতাকা

উড্ডয়ন হতে দেখা যায়। এই পতাকাটি রাম ভক্ত হনুমান এর প্রতীক ধরা হয়।[১৯] পৌরাণিক কল্পকাহিনীর বাস্তবায়ন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে উক্ত অঞ্চলে সমাজ গঠনে তার প্রভাবকে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে সব তথ্যের সূত্র ধরে আমরা ইতিহাস রচনা করে থাকি তার প্রাচীনতম সংকলন রয়েছে ধর্মে। রণজিৎ গুহ মনে করেন প্রভু ও অধীনতার সনাতন সম্পর্কের সব বিশিষ্ট মুহূর্ত ধর্মে গ্রথিত রয়েছে কর্তৃত্ব, সহযোগীতা আর প্রতিরোধের নিয়মে। এমন নিয়মের মূলে আছে কিছু ক্ষমতার বিধান, ইতিহাসে তার উচ্চারণ স্পষ্ট।[২০] পৌরাণিক ভাষ্যের ক্রমোচ্চতার বিষয়টি বর্তমান সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার ঘটনা আমাদের পরম্পরার হয়ে ওঠার অভিপ্রায়। কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজ যে সমস্ত দেবদেবীর কল্পনা করেছেন তা বিশেষত চাষবাসকে ঘিরে অথবা শিবকে কেন্দ্র করে।[২১] অর্থাৎ তার রেয়াজ বর্তমানে যেমন স্পষ্ট তেমনি আর্য্য ও অনার্যের সংমিশ্রন ও তার স্বীকৃতি রাজবংশী সমাজকে পুষ্ট করেছে তা বলা যায়।

উপেন্দ্র নাথ বর্মণ পতিত পৌণ্ড্রদের সঙ্গে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন। মহাপদ্মনন্দ দ্বিতীয় পরশুরাম নামে পরিচিত। তার সময়ে পৌণ্ড্রবাসীরা দিনাজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা উক্ত অঞ্চল ছেড়ে রত্নপীঠে আশ্রয় নিতে থাকে। আধুনিক কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলা রত্নপীঠের অন্তর্গত[২২]। পৌণ্ড্রদের এই অভিপ্রায়নকে ‘পালিয়া’ বা ‘পালে যাওয়া’ বা ‘পালিয়ে যাওয়া’ এই নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তারই নিদর্শন দেখা যায় নৃতাত্ত্বিক রিজলীর ‘Tribes and Caste of Bengal’ এ। কোচ, রাজবংশী ও পালিয়াদের তিনি এক বংশভূত বলে মনে করেন এবং এদের দ্রাবিড় জাতি উল্লেখ করে মঙ্গোলীয়দের প্রভাব লক্ষ করেছেন।[২৩] পালিয়ে যাওয়া থেকে নতুন জাতির পরিচিতিলব্দ উপাধি যেমন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কথাটি ব্যপ্ত হয়।

সেই অর্থে উপেন বাবু রাজবংশী ও পৌণ্ড্রবাসীকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। অর্থাৎ রাজবংশীদের নিজস্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করার পর ক্ষত্রিয়ত্বের কিছুটা পূর্ব অভ্যাস সংকোচিত হলেও একেবারে তাঁরা পরিত্যাগ করেননি এমনটাই আভাস লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্যচিত অভ্যাস রত্নপীঠে পুনারাম্ভ করার উদ্যোগ একপ্রকার বর্ণবাদি সমাজের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। ব্রাহ্মণের শূন্যস্থান তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা নির্মানের দিকে নিয়ে যায়।এই নব নির্মিত প্রস্তুতি উপস্থাপন করে এক নতুন জাতি পরিচিতিকে। রাজবংশীদের থেকে উদ্ভূত উক্ত পরিচিতি ‘অধিকারী’[২৪] যা ‘দেশী ব্রাহ্মণ’ বলেই সমাজে স্বীকৃতি পেল। অর্থাৎ রাজবংশীদেরই একটি অংশ ‘অধিকারী’ উপাধিতে ভূষিত হলেন।

যদিও সাধারন দেবার্চ্চনা ছাড়া বিশেষ পুজার্চ্চনা করতে তাদের দেখা যায় না; বিশেষত দূর্গা পুজা ও সরস্বতী পুজায়।[২৫] উপেন্দ্র নাথ বলেছেন বেদমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করতে তারা সাহস দেখাতো না। সেই জন্য যজ্ঞক্রিয়া যে সমস্ত অনুষ্ঠানে একান্ত প্রয়োজন, সেই সমস্ত ক্রিয়া অচলিত হয়ে গিয়েছিল।[২৬] এই যুক্তিতে তিনি রাজবংশীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর যদি রাজবংশী অধিকারীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় একটি নতুন জাতি বা ব্রাহ্মণ জাতির উদ্ভবের সম্ভবনা প্রকট করে রাজবংশীরা। ব্রাহ্মণের অভাবহেতু 'অধিকারী' ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার মধ্যে সমাজের স্বীকৃতি ও তার প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্ত। সমাজের অনুমোদন বিষয়টি উপেন্দ্র নাথ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 'সমাজের মধ্যে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি সকলকে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণের করণীয় কার্যে অধিকারী করিয়া তাহাদের 'অধিকারী' এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল'।[২৭] সমগোত্রীয় সমাজের কাউকে আকস্মিক ভাবে নতুন উপাধিতে ভূষিত করা এবং সেই স্থানে তাকে বহাল রাখার জন্য আব্যশিক ছিল ব্রাহ্মণের ন্যায় সন্মান প্রদর্শন করা। এই নতুন আচরণ একটা সময় মনে হয় অধিকারীকে চাষি জীবন থেকে রূপান্তরন ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ করে তোলে। পূজার্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণের কার্যক্রম আত্তীকরণ করার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের পরিবর্তন যা 'অধিকারী'র জীবন চর্যায় প্রতিফলিত। অধিকারীর এই অভ্যাস আয়ত্ব করার মধ্যে সাধারন রাজবংশীদের থেকে তার আলাদা হয়ে যাওয়া কোন ব্যতিক্রম ঘটনা নয়। এতাবৎ গবেষণায় দেখা গেছে রাজবংশীদের পেশাগত জায়গাটি মূলত কৃষিকাজ ও চাষবাসকে ঘিরেই আবর্তিত। ফলত চাষির সঙ্গে পুরোহিতের জীবন যে এক ঘরনায় আবর্তিত হয়নি কোথাও; তা সহজে অনুমিত। একে আমরা বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমোচ্চবিন্যাস ও তার কাঠামো বলতে পারি। একই সঙ্গে জাতির স্বাধীনতার প্রশ্নটি যুক্ত। জাতি ব্যবস্থায় অধিকারীর অবস্থান দেখা যায় দুটি স্তরে বিভক্ত হতে। চক্রধারী এবং পত্রধারী, পাত্ধারী বা কানতুলসী। এই দুই অধিকারীর অবস্থান অনেকটা ক্রমোচ্চবিন্যাসে বিভাজিত। প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং কতৃত্বের প্রশ্নে চক্রধারীর অবস্থান পত্রধারীর উর্দ্ধে বলে মনে হয়। গিরিজাশংকর রায় বলেছেন চক্রধারী নামক অধিকারীদের পুজা করার অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক এবং তাঁরা শিষ্য গ্রহনে সক্ষম। অপরদিকে পত্রধারীরা এক পুরুষ পুজা করার অধিকারী।[২৮] স্থান ভেদে এদের নামের বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন কোচবিহার-জলপাইগুড়িতে চক্রধারী ও পত্রধারীর পরিচিতি অন্য জেলাগুলোতে গোঁসাই বা শুধু অধিকারী নামে ব্যপ্ত। চক্রধারীদের উপাধি

বংশানুক্রমিকভাবে অধিকারী হলেও পত্রধারীরা পারিবারিক উপাধি যেমন রায় বর্মণ গ্রহন করে থাকেন[২৯] উত্তরাধিকার সূত্রে চক্রধারীরা অধিকারী পদে আসীন কিন্তু পত্রধারীদের সেই ক্ষমতা অর্জন করা একপ্রকার অবস্থার স্তরায়নের পরিচায়ক। পত্রধারীর এই রূপান্তর বর্ণ ব্যবস্থার গুণগত ধারনার বহিঃপ্রকাশ।

এই বিভাজন পরবর্তীতে বোধ হয় নিয়ে এসেছিল খাওয়া পরা ও বিয়েসাধিতে কঠোরতা। সাধারণ রাজবংশীরা অধিকারীর ঘরে আত্বীয় করার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতে থাকেন। আজও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোনা যায় ‘ঠ্যাং তোলার ঘরত সাগাই না করি’। ‘ঠ্যাং তোলা’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হতে পারে শৌখিনতা বা অহংকারী। ব্রাহ্মণের পেশাটিকে রাজবংশীরা দেখে থাকেন শৌখিন হিসাবে। শারীরিক শ্রমের জায়গাটি পুরোহিত সমাজে অনুপস্থিতি থাকায় কৃষিজীবি রাজবংশী সমাজ অনেকটা ব্যঙ্গাত্বক করে প্রকট করেছেন। পারিবারিক গল্পগুজবে শুনতে পাওয়া যেত ‘কিসসানের গামলা কাম হবে সামলা’ (একজন কিষাণ বা দিনমজুর যত বেশি খেতে পারবে সে তত বেশি কাজ সামাল দিতে পারবে।) আর যদি বাড়ির মালিকের পছন্দমত কিষাণ খেতে না পায় তাহলে বলা হত ‘বাপোই তুই তো খাবারে না পাইস কাম করবু কি’? এর অর্থ হচ্ছে বেশি করে না খেলে শক্ত বা ভারী কাজ করবে কি করে? বেশী করে খেতে না পারার অর্থ করা হয় বেশি কাজ করতে পারবে না অর্থাৎ সে কাজ করতে অক্ষম। শারীরিক পরিশ্রম করতে না পারার কারনে বোধ হয় সাধারণ রাজবংশীরা ‘অধিকারী’ ঘরের মেয়েদের বাড়ির বউ করে আনতে চাইত না। বলা হয়ে থাকে ‘উমারল্যার ছাওয়াপোয়ার ফুটানি বেশি’ (অধিকারি বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিলাসিতা বেশি)। কৃষিকাজ আসলে শ্রমসাধ্য এবং ফসল তোলার মরশুমে তাদের হাতে কিছু পয়সা আসে যা দিয়ে সারা বছরের খাবার সঞ্চয় করতে হয়। সেই সামান্য পয়সা দিয়ে বিলাসিতা করার উপায় তাদের থাকে না। অন্য দিকে বিলাসিতা করার লোক যদি ঘরে আসে এবং তার উপর কাজ কর্ম না করে তবে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে এমনটা ভাবা হয়ে থাকে। চাষবাসের সাথে যৌথ শ্রমের বিশেষত নারী ও পুরুষের একক সহযোগীতার জায়গাটিও আমরা দেখতে পাই ‘হালুয়া ভাইরে[৩০]’ নামক কবিতাটিতে।

ও তমরা নাঙ্গল ধর জোড়ে
মোর হালুয়া ভাইরে
পাটা নেলান, মাকই নেলান
আর নেলান ধান,

ওরে পাটা ভাদই কাটিয়ে তমরা ঘরে.....টাকা আনরে।
হাল বহেন, মই জুরেন
আর বান্ধেন আলি,
ওরে মাইয়ায় ছাওয়ায় বিচন তুলিয়া যান....
কাদবাড়ী রে।............

চাষের কাজে স্বামী স্ত্রী শুধু নয় তাদের সন্তানরাও যুক্ত থাকেন। পরিবারে তাই ফুটানি (অহংকার) করার কিছু নেই। অধিকারী ঘরে আত্মীয় করার প্রশ্নটি কৃষিজীবী রাজবংশীদের কাছে তাই সেইভাবে প্রতিভাত হয় নি। অন্যথার বলা হয়ে থাকে 'যতই করুক উমাল্লাক আটে না, উমরা পর খাওয়া' (অধিকারী পরজীবী, ওঁদের ঘরে সারাক্ষণ অভাব লেগে থাকে।) অর্থাৎ শ্রম না করে অন্যের শ্রম ভোগ করার অভিপ্রায় এতে লক্ষণীয়। যা সমাজ খুব একটা ভালোভাবে নেয় নি। তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করে থাকি এদের সাংস্কৃতিক জীবনে। এই ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘরের বাইরে ঘটলেও তা পারিবারিক করে তোলায় তাদের আপত্তি লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'অধিকারী' নামক জাতিটি অবশ্যই রাজবংশীদের মধ্যে অগ্রসর শ্রেণী। পূজার্চ্চনার নিয়মাবলী মেনে চলার মত জ্ঞান না থাকলে সর্ব সাধারণের সম্মতি আদায় সম্ভব নাও হতে পারত। এমন কি একই অনুষ্ঠানে অধিকারী ও আসামী ব্রাহ্মণদের পূজা করার রীতি লক্ষ দেখা যায়। কেউ কারো বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাটাই শ্রেয় মনে করে। যাইহোক, অধিকারীর প্রতি এই সম্মতি ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত করার প্রয়াস। চতুর্বর্ণের ধারনায় শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণের অবস্থান ও তার সাথে অধিকারীর অবস্থান হয়তো অনুরূপ হয়ে না উঠলেও রাজবংশী সমাজে অধিকারীর সন্মান ব্রাহ্মণের তুলনায় খুব একটা কম নয়। এই কারনে অধিকারীর পরিবারে আত্মীয় করার কথা ভাবতে চাইত না। সমাজে প্রচলিত আছে যে, গুরুকে সেবা করা যায় কিন্তু গুরুর প্রনাম নেওয়া সমাজের অকল্যান। অধিকারীর মেয়ে তো অধিকারীই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। তবে অপরদিকে অধিকারীর ঘরে সাধারণ রাজবংশীদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তা লক্ষ করা যায়। অধিকারী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া অনেকটা সন্মানের বলে মনে হয়। কারন তা নাহলে এবেলায় বিষয়টি সরল কেন? উচ্চবংশের ধারণাটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং সমগোত্রীয় ভাবনাটি ফুটে ওঠে। এমনও হতে পারে মেয়ের বিয়ে বিষয়টি অর্থ সাপেক্ষ হওয়ার দরুন যে কোন পাত্রে দান করা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এমন শোনা যায় একসময় কন্যা

পণ সমাজে প্রচলিত ছিল[৩১] অধিকারী ঘরে কন্যার বিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অধিক পণ পাওয়ার সংযোগ থাকতে পারে। কারন 'ঠ্যাং তোলা' কথাটির মধ্যে অনেকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জায়গাটিকে প্রকাশ করে। সেই অর্থে অধিকারী পূজার্চ্চনা করে আর্থিক ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল এমনি আভাষ সাধারণ রাজবংশী পরিভাষায় ফুটে ওঠে। বর্তমানে রাজবংশী ও অধিকারীর মধ্যে এই কঠোরতা হ্রাস পেলেও তার অবশেষ বিনষ্ট হয় নি। পারিবারিক জীবনের প্রচলিত কথা ও তার আলোচনার নিরিখে অধিকারী অবস্থান উল্লেখ করা হল।[৩২] এই কাঠামোটি বর্ণ ধারনাকে প্রকট করে। যদি মহাভারতের যুগে 'অধিকারী'র উৎপত্তি হয়ে থাকে উপরিউক্ত অর্থে, তাহলে মৌর্য যুগে বা তার পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদি চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটে থাকবে। Norottam Kundu 'Caste and Class in pre-Muslim Bengal' এ দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলার জাতি চর্চা বিষয়টি উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক। এই প্রভাবকে যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি তাহলে উত্তরবঙ্গ - বিশেষত দিনাজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা যা পুণ্ড্রবর্ধন থেকে - বর্ণের ধারণাটি বঙ্গের অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা প্রকট করে। কারন মৌর্য আমলে মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী লিপিতে পৌণ্ড্রবর্ধনকে উত্তরবঙ্গের প্রধান নগর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৩] তিনি লিখেছেন 'In all centuries from the period of the Guptas to that of the Senas main abodes of Brahmins were in the extreme northern districts (except Darjeeling) of North Bengal, as the largest number of Copper plates has been discovered from these regions. All these plates are records of lands granted in favour of orthodox Brahmins.[৩৪] উক্ত বয়ানের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে অধিকারীদের অবস্থান সমাজে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেছিল বলে মনে হয় এবং সমাজে তাদের অবস্থান পরম্পরা ধরে আজকের দিনেও প্রচলিত ভাবনার মধ্যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। সম্প্রীতি যদিও পূজার্চ্চনার তুলনায় অনান্য পেশায় অধিকারীদের নিযুক্ত হওয়ার প্রবনতা রাজবংশী ও অধিকারীদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতাকে সহজ করে।

তথ্যসূত্র:

১. W.W. Hunter, *A statistical account of Bengal*, trubner & CO., London, vol x, 1876.

২. Sunity Kumar Chaterji, *Kirata Jona Kriti, Asiatic Society*, Kolkata, 1951; নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালি হিন্দু বর্ণভেদ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫২।

৩. Hitesranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, papyrus, Kolkata, 1959.

৪. Ibid, p.17; শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৩৯।

৫. Rup Kumar Barman, Partition of India and its impact on Scheduled Caste in Bengal, Abhijit publication, New Delhi, 2012, pp. 66-67.

৬. শ্রীনির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৬।

৭. শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ, '*গৌড় কাহিনী*', ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১-২।

৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, '*বাংলাদেশের ইতিহাস*', প্রথম খণ্ড, দিব্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৪।

৯. সুকুমার রায়, *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস*, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৬-১৭; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, পৃ. ৪৫।

১০. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১১. সুকুমার দাস, *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০।

১২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর হিন্দু জাতিভেদ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

১৩. Sunity Kumar chatterji, *Kirata Jana Krity*, The Asiatic Society, Kolkata, 1951.

১৪. শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস*, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১, পৃ. ৩৯।

১৫. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ*, দেজ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

১৬. শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

১৭. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, প্রাগুক্ত*, পৃ. XXXVI.

১৮. আমার রাজবংশী সমাজে ও পরিবারে বড় হয়ে ওঠার প্রত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা

১৯. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, প্রাগুক্ত*, পৃ. XXXVII.

২০. রণজিৎ গুহ, একটি অসুরের কাহিনী, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ) *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৭।

২১. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, প্রাগুক্ত*, পৃ. XXIV.

২২. শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

২৩. অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাদেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৪।

২৪. শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

২৫. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, প্রাগুক্ত*, পৃ. XXVII.

২৬ শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

২৭. *তদেব পৃ.৩১।*

২৮. ডঃ গিরিজাশংকর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২।

২৯. *তদেব*, পৃ. ২।

৩০. হরিমোহন রায়, *বেকার (কবিতার বই)*, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জলপাইগুড়ি, ২০০০, পৃ. ২৭।

৩১. ধনঞ্জয় রায়, *উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন*, নর্থ ইস্ট পাবলিকেশন, মালদহ, ১৯৮৯, পৃ. ৮।

৩২. রাজবংশী পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

৩৩. Norottam Kundu, Caste and Class in pre- Muslim Bengal, a doctoral thesis, University of London, 1963, p. 13.

৩৪. Ibid, p. 82.

আধুনিক প্রহসনের গতিপ্রকৃতি ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ – চিপিটকচর্বণম্

কুন্দন রায়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : *'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক। প্রাচীন বা পূর্ববর্তী তুলনায় আধুনিক বা নবীন।পূর্বকালের তারুণ্য চঞ্চল আধুনিকতা একালে ললিতচর্ম ও পলিতকেশ। আমার এককালের ঝকঝকে আধুনিকতা ভবিষ্যতে হবে অন্তঃসারশূন্য বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি। নতুন আধুনিকতা যার যৌবন দ্যুতিতে মুগ্ধ হবে ভাবীকালের গোষ্ঠী। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য তাদেরই যাত্রাপথে আধুনিকতার যুগ অতিক্রম করে উত্তরাধুনিকতার যুগে প্রবেশ করেছে। তবে এই নিয়ে অনেক মতপার্থক্য আছে। প্রত্যেক সাহিত্যের একটি নিজস্ব গতি আছে - তাতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।অনুরূপসংস্কৃতসাহিত্যও যদিও সাধারণ মানুষ বেদ উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মেঘদুতম্ ইত্যাদি কে সংস্কৃতসাহিত্য বলে জানে।তাঁরা আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্য শুনলেই ভ্রূকুঞ্চনাদি অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিকতার শব্দটি সোনার পাথরবাটির মতো শুনতে লাগে। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক ও বিশাল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য লেখা হচ্ছে। বর্তমান সংস্কৃতিপ্রেমী বিদ্বানরা তাদের সারস্বত সাধনার দ্বারা আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।*

আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভাবের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন-'পাঁজি মিলিয়ে মর্ডানের সীমানা নির্নয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা'।ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে কবিগণ যে বিপুল সংস্কৃতসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা সংখ্যার আধিক্যে এবং গুনের প্রকর্ষে অতীতের যে কোন শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে পারে।

কাব্য ও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতসাহিত্যের অপেক্ষা রাখে। আধুনিক কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতসাহিত্যের অবদান কম নয়। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ঊনবিংশ বিংশ শতকের একজন আদর্শ নাট্যকার, কাব্যকার এবং লেখক। তার প্রতিটির রচনার মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার স্পর্শ, রয়েছে বিস্তৃত উপদেশ বাণী, যা কালের গতিতে আজও সজীব হয়ে রয়েছে। তাঁর রচিত 'চিপিটকচর্বণম্' একটি প্রহসন

শ্রেণীর রূপক। এই প্রহসন রচনার মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের এক মেলবন্ধন দেখিয়েছেন, সেগুলো যেন কালের দর্পণ হয়ে উঠেছে।প্রহসনধর্মী নিছক হাসরচনার মধ্য দিয়ে সমাজকে ইনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন বিভিন্নভাবে।

সূচকশব্দ : *শ্রীজীব, প্রহসন, আধুনিকতা, চিপিটকচর্বণ, সমাজ, মনুষত্ব ইত্যাদি।*

মূল আলোচনা

‘আধুনিকতা’ শব্দটি আপেক্ষিক। ‘আধুনিকতা’ শব্দটি অধুনা শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। ‘অধুনা ভব’ এই বিগ্রহ বাক্যে ‘অধুনা’ শব্দের উত্তর ‘ঠঞ্’ প্রত্যয় যোগে আধুনিক শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ‘অধুনা’ শব্দের প্রয়োগ ‘সাম্প্রতম্’, ‘অদ্যতনম্’, ‘অর্বাচীনম্’ ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘Modern’।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম নজরে আসে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনসর্বস্ব' নামে প্রহসনটি। সমাজ সমস্যা সমালোচনায় অবদান থেকেও প্রহসনটির মূলত সংস্কৃত উপকরণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল সেইদিন।

তবে আধুনিকতার জাদুস্পর্শে বাংলাসাহিত্য নতুন করে পথ চলতে শুরু করে। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রোক্ত প্রহসনের বদলে বাংলায় মধুকবি 'কমেডি অফ ম্যানার্স' কে স্থান দেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি প্রহসনগুলিতে Comedy, Satire এর উপস্থিতি থাকলেও শৃঙ্গাররসের প্রভুত্বে, অশ্লীলতা, ক্লাসিকাল ও নিয়ম-নীতির দৃঢ় বাঁধনে তেমনভাবে পাখনা বিস্তার করতে পারেনি। এদিকে সংস্কৃত সাহিত্যেঅন্যতম ব্যতিক্রমি প্রহসন স্রষ্টা-রা হলেন- মহালিঙ্গ, সিদ্ধেশ্বর, রাধাবল্লব, শ্রীজীবইত্যাদি।

মধুকবির পথ ধরে বাংলা নাটক ও প্রহসনে নব জোয়ার আসে। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'(১৮৬০) এধারার এক নতুন পথের পথিক। পাশ্চাত্য রীতি ও রসকে বাংলার রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন। কৌলিন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক প্রশ্নগুলোকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে কুঠারাঘাত করেছেন বিকৃত সমাজের বুকে।

চরিত্র, সংলাপ, ভাষা ও আঙ্গিক সব ক্ষেত্রেই তিনি পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সজীব করে তুলেছেন। তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ জুড়ে বাংলা প্রহসনের রমরমা চলেছে।

এসময় আরো একবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বাংলা প্রহসনের উদ্ভব কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনের ছাঁচ মূর্তি থেকে। রামনারায়নের পূর্বেও অনেকে সংস্কৃত

প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করে পেট ও মন উভয়ই ভরিয়েছে। যেমন-'কৌতুকরত্নাকর'> কবিতার্কিক, ১৭০০
'হাস্যার্ণব'>জগদীশ,১৮২২
'কৌতুকসর্বস্ব',১৮২২।

অনৈতিকতা, অনাচার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষনশীলতার মতো বিষয়গুলি স্তম্ভ আকারে স্থাপিত হয়ে আছে এই সংস্কৃত প্রহসনগুলোতেও। তাই বিষয় ভাবনা ও ভঙ্গিগত দিক দিয়ে সংস্কৃত প্রহসন বাংলা প্রহসনের পথ প্রশস্ত করেছে বলা যায়।

ক্রমে দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক'(১৮৭২) মাইকেল পরবর্তী জনপ্রিয় প্রহসন। বৃদ্ধরাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এর বিকৃত কামনাকে তিনি ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। পাশাপাশি কৌতুক রসের সঙ্গে রাসমণি ও গৌরমনির দুঃখ কাহিনী সহৃদয় পাঠকের মন আপ্লুত করেছে।
'জামাইবারিক' প্রহসনে তিনি ব্যক্তিত্বহীন কর্মহীন ঘরজামাইদের এবং বিবাহিত কন্যাদের মিথ্যা গৌরবকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

পরবর্তী প্রহসন : বাংলা সাহিত্যের এ ধারার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রহসন-

- অমৃতলালবসু- 'চোরের উপর বাটপারি' (১৮৭৬)
  - 'ডিস্মিস' (১৮৮৩)
  - 'চাটুজ্জে-বাডুজ্যে' (১৮৮৪)
- রবীন্দ্রনাথঠাকুর -'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)
  - 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭)
- D.L.-Roy - - 'বিরহ' (১৮৯৭)
- ক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনোদ - 'ভূতের বেগার' (১৯০৮)

সংস্কৃত সাহিত্য জগতেও এরকমবহু প্রহসনের পাওয়া যায়। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য – 'বেষ্টন ব্যযোগ', হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ - i) 'জানকী বিক্রম'(১৮৯৪) ii) 'কংসবধ' (১৮৯১), শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'বিবাহবিড়ম্বনম্', 'চিপিটকচর্বণম্,'ভট্টসংকট ইত্যাদি।
সংস্কৃত প্রহসন প্রাচীনরীতি ও ধীরগতি নিয়ে আটকে থাকেনি। বিংশ শতকে তাই আমরা কয়েকটি উচ্চ মানের সংস্কৃত প্রহসন পাই, যেমন-অযোধ্যাকান্ড, কৌণ্ডন্য (মহালিঙ্গশাস্ত্রী)। এছাড়াও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রহসন গুলি ছিলো উচ্চমানের ব্যাঙ্গাত্মক রূপক, একে satire ও বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় শ্রীজীব পথিকৃৎ। এইযে Satire রচনা, এক্ষেত্রে শ্রীজীবই পথিকৃৎ। এর পরেও অনেকে লিখেছে, যেমন-

বাংলার সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ওরফে বুড়োদা, মধ্যপ্রদেশের রাধাবল্লব ত্রিপাঠী, ধীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখরা।

নদী তার প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন স্থানে বাঁক নেই। অনুরূপভাবে সভ্যতার বিবর্তন এবং সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের প্রকৃতিও পরিবর্তন হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সংস্কৃতসাহিত্যেও এই রকম নানা বৈচিত্র এনেছে তা লৌকিকসাহিত্যেই হোক বা বৈদিকসাহিত্যেই। বিশেষ কোন সাহিত্য যখনই কোন পুরাতন গতিপথ পরিবর্তন করে নতুন পথে যাত্রা করে তখনই তা আধুনিক সাহিত্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কালিদাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদেরকে পুরাতন এবং নিজেকে নবীন হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন- **পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।** কাব্যের জীবনী শক্তি রূপপরিবর্তনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিদ্ধগৌতম বংশে আচার্য পঞ্চানন তর্করত্নের সুযোগ্য পুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ(ভট্টাচার্য্য) সংস্কৃত সাহিত্যজগতের এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপল্লী কিংবা ভাটপাড়া জনপদে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন[১]। পিতা পঞ্চানন তর্করত্ন বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ এবং সম্পাদনার জন্য সমগ্র দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যকালে শ্রীজীব পিতার চতুষ্পাটিতে সুপদ্ম ব্যাকরণের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে কলকাতায় আসেন[২]। তারপরে পিতার আগ্রহে বারাণসীতে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাসন্যায়রত্নের নিকট প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের অধ্যয়ন করে সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ধীরে ধীরে তিনি ন্যায়তীর্থ, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরনতীর্থ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় ষাট বছরের সাহিত্যজীবনেশ্রীজীব নানা ধরনের অনেক সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করে গেছেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা হিন্দি ইংরেজি ভাষাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি শেষ করেন মহাভারতের নীলকন্ঠ 'ভারতভাবদ্বীপ' টীকার হিন্দি অনুবাদের মতো দুরূহ শ্রমসাধ্য সম্পাদনা। শ্রীজীবের সারস্বত সাধনা কাল ছিল দীর্ঘ ষাট বছর। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। শ্রীজীবকৃত শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, স্তোত্রকাব্য, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, প্রশস্তিগাঁথা প্রভৃতি বহু রচনা রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য জগতে। শ্রীজীবের রচনাশৈলী ছিল অননুকরণীয়।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ও ষাটের দশকে তার শতবার্ষিকম্, গিরিধরসংবর্ধনম্, চিপিটকচর্বণম্, বিধিবিপর্যাসম্, রাগবিরাগম্, মহাকবিকালিদাসম্,

পুরুষপুঙ্গবম্, বিবাহবিড়ম্বনম্ শ্রীশংকরাচার্যবৈভবম, সাম্যসাগরকল্লোলম্ প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি নাটক বিভিন্ন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছে।

শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হিটলার, মুসোলিনি ও স্তালিন প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনেও নানা নাটক ও প্রহসন চিত্রিত করেছেন। তাঁর জন্যে যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন। যেমন স্তালিনের চরিত্রের জন্য তিনি ই. ইয়ারোশ্লাভস্কি বিরচিত 'Landmarks in the life of Stalin' বইটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এর পাশাপাশি এসব চরিত্রের তিনি লোভ, হিংসা, ধর্ম, ক্রোধ, জাতি প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলোকেও তিনি একটা রূপদেওয়ার চেষ্টাও করেছেন এবং তা চিত্রিত করেছেন। বর্তমান জগতের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তার অপপ্রয়োগ লক্ষ লক্ষ মানুষের নানা ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে যন্ত্র-বিজ্ঞান কে নিয়ন্ত্রণ না করলে সেটা একদিন পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবে- ' শতবর্ষান্তরে পৃথ্বী নূনং ধ্বস্তা ভবিষ্যতি'। 'চৌরচাতুরীয়ম্'নাটকে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজে ছোটখাটো চোরের শাস্তি পায়, কিন্তু বড় বড় চোরেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'ক্ষুতক্ষেমীয়ম্' নাটকে তিনি জীবের প্রেমের বার্তা দিতে চেয়েছেন।

শ্রীজীবের নাটক ও প্রহসনগুলোতে দেখা যায় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার যেন এক মেলবন্ধন ঘটেছে, সেইগুলো যেন কালের দর্পণ হয়ে উঠেছে।তিনি রচনাশৈলীতে নান্দী, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য ইত্যাদি প্রাচীন নাট্যতাত্ত্বিক ধারা অনুসরণ করেও আধুনিক নবসূর্যের দীপ্তি উপহার দিয়ে গেছেন।শ্রীজীব তার একশ বছরের জীবনে তিনি অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। স্বাধীনতা কালে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সাথে কারাগারে ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীজীবই প্রথম নাটকে ইংরেজিতে কূটনীতির সরাসরি প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন সময়ের সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা, মূল্যবোধের পরিবর্তন, নৈতিক অবক্ষয়, সভ্যতার সংকট, ধর্মীয় আগ্রাসন প্রভৃতি নিয়েনবসংস্কৃতসাহিত্যে পসরাসাজিয়েছেন। তাঁর সময়ে তিনি বাংলারপ্রচলিত বাগধারাকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে সংস্কৃতে রূপান্তর করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো –‘ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না’- 'বিকীর্ণেষু অন্নেষু কাকানামভাবো না ভবিষ্যতি'।‘গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো’–‘গঙ্গাজলেন গঙ্গাপূজনম্’।‘সব শালাকে জানা আছে’- ‘সর্বান্ শালান্ জানামি’। ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’ - 'চৌরে পলায়িতে (কিং

তে) বর্দ্ধতেতরাং বুদ্ধিঃ'। 'অন্ধের কি বা দিন কি বা রাত'- 'নেত্রহীনস্য (মে) যথা দিবা তথা রাত্রিঃ'।

মহাভারতের 'বিরাটপর্ব' অবলম্বনে রচিত বীর রস প্রধান 'পাণ্ডব বিক্রমম্'মহাকাব্যটিতিনি প্রায় দেড় হাজার শ্লোকে ও আঠারোটি স্বর্গে রচনা করেন। এই একটিমাত্র রচনায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যজগতে একটি স্থায়ী সিংহাসনের দাবি রাখেন।মহাভারতের পান্ডবদের গতানুগতিক চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় তার নাট্যে ও প্রহসনে প্রয়োজনে দিয়ে গেছেন, যেমন পাণ্ডব বিক্রম এখানে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে একই মানব জীবনের সবথেকে দুঃখের অবস্থা থেকে সবথেকে গৌরবের শিখরে আরোহন করা যায়। দ্বিতীয়তঃ সততার জয়, ধর্মের জয়।

> সৎ পথে থেকে সাহসের সঙ্গে বিপদের মোকাবিলা করো, জয় তোমার অবশ্যম্ভাবী। সততার জয় ধর্মের জয় 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'।[৩]

এই কথাটি বিভিন্ন রচনায় ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। তাঁর মতে সত্য, শিব ও সুন্দরের সহাবস্থান-এ জগত।তাছাড়াও 'সারস্বতশতকম্' ও 'ঋতুচক্রচঙ্ক্রমণম্' নামে দুটি গীতিকাব্য এবং রবীন্দ্র প্রশস্তি প্রভৃতি কয়েকটি প্রশস্তি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রচনাশৈলী ছিল অননুকরণীয়।

শ্রীজীবের সারস্বতশতকে দেখি কতগুলো শ্লোক একইসাথে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় কাব্য হয়ে উঠেছে। মানবমন সদাই বৈচিত্র চাই। উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাই বাংলায় একটি চতুষ্পদী কবিতা এবং সংস্কৃতের সুললিত বসন্ততিলক ছন্দে গ্রথিত কাব্য। কোনরকম অনুস্বার বিসর্গ ছাড়ায় বাংলা সংস্কৃত ছন্দ অব্যাহত রেখে সংস্কৃত বাংলায় এরকম শ্লোক নির্মান প্রায় অসম্ভব। যদিও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট তৎসম শব্দের ব্যবহার, তবুও দুটি ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার গঠন রীতিনীতি বাক্য বিন্যাস তো একেবারেই আলাদা। একটা উদাহরণ এর মাধ্যমে আরও পরিষ্কার করেদেখি-

শুভ্রোজ্জ্বলে শতদলে তব পাদপদ্ম
শোভাধরে মধুরিমা ভুবন প্রকাশে
ঊষা যথা কিশলয়ে তব দেবীসদ্যো
ভাসে চ'খে শশীকলা বিকলা সকাশে।[৪]

শুভ্রোজ্জল শতদল তোমার পাদপদ্মে শোভা ধারণ করছে, তোমার মধুরিমা ভগবানকে প্রকাশ করছে, তোমার কাছে শশীকলা বিকল হয়ে চোখে শোভা পাচ্ছে।

নাটক প্রকরণ ভান বিয়োগ প্রহসন নিয়ে শ্রীজীবের রূপকের সংখ্যা প্রায় উনত্রিশেরও বেশি। তবে প্রহসন গুলির মধ্যে আমরা বেশিরভাগই আধুনিকতার সাথে পাশ্চাত্যের Comedy, Satire আর ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত এক অনাস্বাদিত অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করি। সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্যে যেসব প্রহসনগুলি আমরা দেখতে পাই তাতে বেশিরভাগই স্থূল হাস্যরস যা অবশ্যই শৃঙ্গাররস আশ্রিত। কিন্তু আধুনিক অর্থাৎ বিংশ শতকে প্রহসনগুলির মধ্যে আমার লক্ষ্য করি তা অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের।শ্রীজীবের ভাষায়-

> 'The advice was unquestionably sound, only the ancient forms of these plays to be received minus their erotically comic flovour'।

শ্রীজীবের প্রহসনে হাস্যরস শৃঙ্গারাশ্রিত তো নয়, আর অশ্লীলতা তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীজীবের প্রত্যেকটি প্রহসনে একটা বার্তা রয়েছে। বার্তা এসেছে কখনো হাস্যরস বা হাসরসধ্বনির মাধ্যমে,কখনও বা Wit, Satire, Humours ইত্যাদির মাধ্যমে,সেগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে প্রহসনগুলিতে।

‘ভট্টসংকট’ প্রহসনে শ্রীজীব দেখিয়েছেন যোগ্য পরায়ণ ব্রাহ্মণ ভট্ট এবং তাঁর পত্নী কামিনীর মধ্যে কলহ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। নাট্যকারেরবক্তব্য ‘যদি শান্তি চাও তাহলে কারোর অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না,’যে যার নিজের কর্তব্য পালন পালন করো, তাহলেই দেশে শান্তি আসবে, অন্যথা নিপীড়িত শ্রেণী বেশিদিন অত্যাচার সহ্য করবে না। তারা জেগে উঠবে- ‘সন্তি স্ত্রিয়ঃ স্বামিমনোঽনুকূলা লসন্তু ধর্মা বিধিবোধমূলাঃ’।

ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব শ্রীজীবকেব্যাথা দিয়েছিল। ছাত্ররাই যখন দেশের নাগরিক হয় তারা কিন্তু সেই আত্মকেন্দ্রিকতা, সেই স্বার্থপরতাকে জয় করতে পারে না। শ্রীজীব আরো দেখিয়েছেন দারিদ্র বা অর্থাভাব দীন মানুষকে হীনত্বেরদিকে ঠেলে।'দরিদ্রদুর্দৈবম্' নামক প্রহসনে তিনি দেখিয়েছেন নায়ক বক্রেশ্বর দরিদ্র, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষালব্ধ অল্প চাল দিয়ে তারা সংসার চালায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঘটনাচক্রে তাদের সুদিন তাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। তিনি এই প্রহসনের মাধ্যমে সমাজের চেহারাটা নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। শ্রীজীব ব্যথিত হয়েছেন। মানুষের এই আত্মসর্বস্বতা, আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে ব্যাথা দিয়েছে। তবুও তিনি আশা একেবারে

থেমেথাকেনী, প্রার্থনা করেছেন মানুষ যেন তাদের হীনতা স্বার্থসর্বস্বতা দূর করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে-

'খলতা খলতা সমাখিলং

নরচিত্তং পরিহায় খেলতু।

প্রতিবেশসুখাভিলষিতা

লসতাল্লোকমনঃসু সন্ততম্।'[৫]

চিপিটকচর্বণম্

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের অসাধারণ এক প্রহসন শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য 'চিপিটকচর্বণম্'। এখানে কৃপণ ব্যক্তির হাস্যকর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কৃপণ কপালী অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি। তার বিচারবিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে তান্ত্রিক তার ধন অপহরণ করল।এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা কাগজে প্রায়ই দেখি ভন্ড সাধুর কথা অথবা সত্যজিৎ রায়ের 'জয়বাবা ফেলুনাথ' মছলীবাবার কথা মনে পড়ে অর্থাৎ কিছু কিছু সাধুবাবা সাধারণ মানুষের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে তাদের সাথে প্রবঞ্চনা করে। শ্রীজীব এইসব তথাকথিত সাধুবাবাদের থেকে মানুষকে সাবধান থাকতে এই নাটকে বলতে চেয়েছেন। যদিও এই প্রহসনেযে তান্ত্রিকের উল্লেখ রয়েছে, সে এই নাটকের নায়ক কৃপণ কপালীর কাছ থেকে সোনা নিয়ে নেয় নি, বরং তার কৃপণতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রহসনের শেষে আমরা দেখি যখনকপালীর কৃপণতা পরিবারের সকলে অতিষ্ঠ, তখন প্রতিবেশীর সহায়তায় কৃপণ কপালের কাছ থেকে কিছু তাদের পরিবারকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য তান্ত্রিকে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল।তান্ত্রিক লোভেরমাধ্যমে কৃপণকপালীর কাছ থেকে দশভরি সোনার দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরতদেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে শেষে কপালীর পত্নীরঙ্গিনীর হাতে এই সোনা ফেরত আসে।

তান্ত্রিকের চাতুর্যে রঙ্গিনী সোনা ফেরত পেয়ে কৃতার্থ হয়। আরো লোভ দেখিয়েছিল যে যদি এই তিনগুণ সোনা ফেরত পেতে চাও তাহলে পরিবারের সকলকে চিপিটক চর্বণ ব্রত পালন করতে হবে। চিপিটক শব্দের অর্থ কি চিড়ে, আর চর্বণ শব্দের অর্থ চেবানো। এই ব্রত পালন করলে সমস্ত ফললাভ হবে। কৃপণ কপালীতাতে রাজি হয়ে যায়। এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ এর মাধ্যমে শেষে সেই সোনাও ফেরত পাই। শেষে পরিবারের সকলেই চিপিটকচর্বণে রাজি হাওয়ার ফলে তার পরিবারের সকলের মধ্যে সম্মানস্য সৃষ্টি হয়। দর্শকেরাও অনাবিল হাস্যরসে সিঞ্জিত হয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করে। প্রহসনটিতে সমস্ত পরিবার চিপিটক চর্বণ ব্রতে রত হয়।

অর্থাৎ চিপিটকচর্বণ এখানে প্রহসনের সমস্ত ঘটনার অন্তিম পরিনাম। সাধারণত নায়ক-নায়িকা কিংবা ইতিবৃত্ত অনুসারে রূপকের নামকরণ করতে হবে বলে শাস্ত্রে নির্দেশরয়েছে। এখানে প্রহসনের নায়ক নিন্দিত।নিন্দিত চরিত্র অনুসরণ করে নামকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। নায়িকারও এই প্রহসনের কার্যকরী ভূমিকা নেই। যেহেতু সম্পূর্ণ ঘটনাটির ফলসিদ্ধি চিপিটকচর্বণের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, তাই এই নাটকের নামকরণও নাট্যকার সেই অনুসারে কার্যকরী করেছেন।

চিপিটকচর্বণ একটি প্রহসন। দশ প্রকার রূপকের মধ্যে প্রহসন অন্যতম। তবে নাট্যকার নিজেরই সন্দেহ হয়েছিলো যে এটিকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রসম্মত কোন রূপক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা। তাই প্রহসনের শুরুতেই সুত্রধার বিদূষককে বলেছিলেন-

> "বয়স্য !সম্যগ্ বিচারযসি যদিদং রূপকং প্রযোক্তুমিষ্যতে। তন্ন প্রকরণং, ন নাটকং, ন ভাণঃ, ন ব্যাযোগঃ, নাপি প্রহসনাদিকম্। অতো দশলক্ষণবিলক্ষণমেব।"[৬]

অর্থাৎ যদি এটি রূপক হিসাবে প্রযুক্ত হয়, তাহলে তা প্রকরণ নয়, নাটক নয়,ভাণও নয়, ব্যাযোগও নয়, আর নয় প্রহসনও। এখানে রূপকের দশটা লক্ষণই বিরাজিত।

তবে বিভিন্ন বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা বলা যায় এটা একটি প্রহসনেরই অন্তর্গত। কারণ এখানে হাস্যরসই এর প্রধান রস। এখানে কবিকল্পিত নির্ণীত চরিত্র নিয়ে এই কাহিনীর নির্মাণ। বিভিন্ন বিপ্র,চেট,বিট প্রমুখ পাত্রসমূহ নিজেদের ব্যবহার এবং বার্তালাপের মাধ্যমে হাস্যরসের সঞ্চার করে। আর প্রহসনটিতে তান্ত্রিকের চরিত্রটি পাষণ্ডের। কারণ সে প্রবঞ্চনা বৃত্তির মাধ্যমে নিজের কাজ হাসিল করে।
তাই এটিকে প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

সাহিত্য বিশেষ করে নাটক হল সমাজের দর্পণ। শ্রীজীব সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধেরযে ভাঙ্গন তা দেখিয়েছেন, শ্রীজীব দেখিয়েছেন মানুষের জীবন যাপনের ধরন ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, মানুষ ধীরে ধীরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পরছে, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাকে তার মমত্ববোধ, ভালোবাসা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রহসনেই তিনি দেখিয়েছেন কপালী ছিলেন কৃপণ চরিত্রের। চপল এবং উপহাসাস্পদ চরিত্র রূপে তাদের চিত্রিত করেছেন।আর রঙ্গিনী বর্তমান প্রহসনের নায়ক কপালীর পত্নী। কিন্তু তাকে নায়িকা বলে প্রতিপাদন করা মুশকিল। আসলে তার

চরিত্রটি শুরু থেকেই কপালীর সঙ্গে প্রহসনের ফলসিদ্ধির জন্য প্রয়াসরত।আর শুরুতে যে তান্ত্রিকের চরিত্রটি আমরা দেখতে পাই সেই শুরু থেকে প্রবঞ্চক বলে মনে হলেও সে আসলে প্রবঞ্চক নয়। পরে আমরা দেখতে পাই যেসে পরোপকারী, ব্যবহারকুশল, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, বাকপটু, সহনশীল, কর্মকাণ্ডে কুশল, আর নির্লোভ। প্রতিবেশীদের সহায়তায় কপালীর কাছ থেকে সোনা ফেরত নিয়ে পুনরায় তাঁর পত্নী রঙ্গিনীকে ফিরিয়ে দেয়। সুন্দরভাবেই প্রহসনের ফলসাধনের সহায়ক রুপে নাট্যকার তান্ত্রিকের চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

সমাজে যেমনটি দেখা যায় তার বর্ণনায় হল কাব্য। রাধাবল্লব ত্রিপাঠী বলেছেন- 'লোকানুকীর্তনং কাব্যম্'। নিছক হাস্যরসাত্মক কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে পন্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ চিপিটকচর্বণেও সমাজের মূল্যবোধের কিছু নগ্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমাজে অকর্মণ্য বাকপটু পুরুষদের চরিত্র প্রহসনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।প্রহসনের শুরুতেই বিদূষক নিজেকে পুরুষসিংহ বলে পরিচয় দিয়ে যেভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে সে আসলে তাঁর পত্নীকে জোর দেখাতে চাইছে, তাতে এই ধরনের মেরুদণ্ডহীন বাকপটু পুরুষদের চরিত্রটি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন নাট্যকার।

শ্রীজীবেরই 'ক্ষুতক্ষেমীয়ম্' নামক প্রহসনে দেখা যায় সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কি প্রকট? এই বৈষম্য তিনি প্রহসনের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন ধনীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত দরিদ্রকে তার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। এইভাবে ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত দারিদ্রের রূপটি তিনি দেখিয়েছেন। শ্রীজীব শেষে জানিয়েছেন দরিদ্রের সেবা করো, মানুষকে ভালোবাসো, জীবেপ্রেমই মানুষের মুখ্য ধর্ম। মানুষের মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে, অন্যথায় মরণই শ্রেয়ঃ।

প্রহসনে প্রতিফলিত সমাজে শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন ব্রতের কথাও পরিলক্ষিত হয়। কোজাগরীর চিপিটকচর্বণ, নষ্টচন্দ্রদর্শন পরিহার প্রভৃতি সমাজে পালিত হতো বলে দেখা যায়। উনবিংশ শতকের শেষদশকে জাত নাট্যকার একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। তিনি তাঁর লেখালেখি করেছেন বিংশ শতকের উত্তরার্ধে।তবে সেই সময়ই পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতি সমাজের একটা অজ্ঞতা প্রসারিত হয়েছিল। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন বাহ্যিক আক্রমণের ফলে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথার প্রচার হয়েছিল। বর্তমান আধুনিক সমাজে সেই সব প্রথার লেশমাত্র প্রতিফলন দর্শিত হয়। এই প্রহসনের দেখা যায় মহিলাদের উপর মারধর তথা সমাজের নারী ও নিম্নবর্ণের

প্রতি অত্যাচারও অনেক পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীজীব লেখনীর জাদুপর্শে সেগুলি চিত্রিত করে গেছেন।

শ্রীজীবেরযেমন'চৌরচাতুরীয়ম্' প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে চুরিবিদ্যায় পারদর্শী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঘট্টঙ্কর নামে এক চোর সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে বেড়ায়।বিভিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে পুলিশের চোখেও ধুলো দেয়, কিন্তু শাস্তি পায় না সে। এই প্রহসনে প্রতিটি পদে Satire পরিলক্ষিত হয়। শ্রীজীব ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে দেখিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা সামান্য বেতনভোগী, তাদের এরকম রমরমা অবস্থা, বিশাল অভ্যুদয় কি চুরি ছাড়া সম্ভব?

"বীরাঃ কূটরাজনীতিনাম্না পরধনগ্রাসং, বাণিজীকা বাণিজ্যব্যাজেন বিপুললাভং লুব্ধাঃ ক্রীড়াচ্ছলেন সমাহূয় কিং ন প্রকাশচৌর্যমেবাচরন্তি।"[৭]

তিনি জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে কে চোর নয়? প্রত্যেকেই চোর। কিন্তু শাস্তি পায় কজন? তিনি এই প্রহসনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়ের কথা বলেছেন। তাদের চৈতন্যোদয় হোক এই আশা করেছেন।

চিপিটকচর্বণ প্রহসনে সমাজের কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্রকে নাট্যকার সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। সুদৃঢ়ভাবে শাস্ত্রাদির অনুধাবন করলে জানা যাবে যথাযথভাবে শাস্ত্রাদির আড়ালে যে ভন্ডামি সমাজে প্রচলিত তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এই বার্তাটি প্রহসনে সম্পূর্ণভাবে কবি দিতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. কমলাকান্তমুখোপাধ্যায়, ভট্টপল্লীরমনীষী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০২, পৃষ্টসংখ্যা-১

২. তদেব, পৃষ্ট সংখ্যা-৪৭-৬১

৩. পাণ্ডববিক্রমম্, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বিরচিত মহাকাব্য, কলকাতা, ১৯৮৫, শ্লোক সংখ্যা -১৮

৪. ঋতাচট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এর সারস্বত সাধনা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪১১, কলিকাতা,

৫. ঋতা চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ সেন(সম্পাদক), শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্, সংস্কৃত বুক ডিপো,২০১৮, কলকাতা, পৃষ্টসংখ্যা-২৮।

৬. তদেব, পৃষ্টসংখ্যা-৪২।

৭. তদেব, পৃষ্টসংখ্যা-৪১।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ড.শিপ্রা রায়, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সংস্কৃত বুক ডিপো, আগস্ট ২০১৭, কলকাতা।

২. রাকেশ দাস ও জয়দেব দিন্দা(সম্পাদক), চিপিটকচর্বণম্, বি.এন.পাবলিকেশন, .২০১৯, কলকাতা।

৩. ঋতা চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ সেন(সম্পাদক), শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটকচর্বণম্, সংস্কৃত বুক ডিপো,২০১৮, কলকাতা।

৪. মৈত্রী কুমারী, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য(হিন্দি), গ্রন্থভারতী প্রকাশন,২০১৯, দিল্লি।

৫. ঋতা চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য,(১৯১০-২০২১) ছোটগল্প ও নাটক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০১৯, কলকাতা।

৬. ড. মঞ্জুলতা শর্মা, আধুনিক সংস্কৃত কাব্য কি পরিক্রমা(হিন্দি), রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১১, দিল্লি।

৭. ঋতাচট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এর সারস্বত সাধনা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪১১, কলিকাতা।

৮. রাধাবল্লব ত্রিপাঠী, সংস্কৃত সাহিত্য বীসবীংশতাব্দী, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৯, নিউ দিল্লি।

৯. অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কাব্যচর্চায় বাঙালী সেকাল ও একাল, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,২০১৩, কলিকাতা।

১০. নারায়ন দাস, সংস্কৃত সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গস্যাবদানম্(সংস্কৃত), কথাভারতী, ২০০৮, কলকাতা।

ডোম: বাংলার এক প্রান্তিক দলিত সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস

প্রসেনজিৎ নস্কর
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সৌম্যদীপ খাণ্ডা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসক্ষেপ: *জাতপাত বা বর্ণপ্রথা ভারতের অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তথাকথিত প্রান্তিক সম্প্রদায়ভূক্ত দলিতদের দলিত হিসাবে চিহ্নিত 'ডোম'রাও এর ব্যতিক্রম নয়। অতিরিক্ত নোংরা হিসেবে চিহ্নিত এই সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুদের কাছে বরাবরই ঘৃণার পাত্র। তবে ডোমদের এই সামাজিক বৈষম্যতা শুধুমাত্র সামাজিক ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সূচকগুলিও ডোমদের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। একদিকে আধুনিক পাশাদারিত্বের যুগে ডোমদের প্রথাগত কর্মগুলি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি সর্বক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের (সামাজিক উন্নতির) দিশা দেখাতে পারেনি। বীপরিত দিক থেকে দেখলে বলা যায় সামাজিক সম্মান অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক অবস্থার তোয়াক্কা করেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে 'দলিতদের দলিত' ডোমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সমানুপাতিক কিংবা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কগুলি খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে দলিত সম্প্রদায় বা জাতির ইতিহাসকে তুলেধরা হয়েছে, যারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় স্তরের বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে ভারতে স্বীকৃত, তা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ কিছু অংশ সমাজে বঞ্চিত ও অবহেলিত। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হল, এই বিশেষ অংশকে তুলে ধরা, যারা প্রান্তিক এবং অস্পৃশ্য বর্ণ বা জাতির মধ্যে অবস্থান করে। এই প্রেক্ষাপটে ডোম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *প্রান্তিক, জাতি, ডোম, বাজুনে ডোম, মগহিয়ার, চণ্ডাল, ডোমনী।*

'মার্জিনালাইজ' ইংরেজি শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়।[১] যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ হল প্রান্তিক। 'প্রান্তিক' কথাটির অর্থ সাধারণ ভাবে বোঝানো হয় সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা গোষ্ঠীগুলিকে। 'প্রান্তিক' শব্দটির বিবর্তনের

মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে প্রান্তিকতা। বর্তমানে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রতর্ক রয়েছে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠী অকস্মাৎ প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয় না, সামাজিক বৈষম্যের অবস্থানে ধীরে ধীরে প্রান্তিকতায় পরিবর্তিত হতে থাকে। একাধারে 'প্রান্তিক' মানুষদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ভেসে উঠে। প্রান্তিক গোষ্ঠীরা মূলত একই প্রজাতি, গোষ্ঠী, জাতপাতের সাথে যুক্ত নয়। এই 'প্রান্তিক' গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অবস্থান রয়েছে, যাদের সাথে সমাজের যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ অবস্থায় রয়েছে আবার এমন বলা যেতে পারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। প্রান্তিকতার রূপ প্রতিফলিত হয় ব্যাক্তির ভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জনঘনত্ব, অক্ষম[২] ব্যাক্তি ভেদে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যদি সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের সাথে তাঁদের সংস্কৃতি বা শিক্ষা আদান প্রদান না করতে পারে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয় তবে সমাজে সেই জাতি তার সংস্কৃতির গুরুত্ব ধীরে ধীরে হারাতে থাকে। ক্রমশ সেই জাতি প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়।

বর্ণ, জাতি, জাতপাত এবং জাতি হিংসার (Caste Violence) বিতর্ক একুশ শতকের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। নিম্নবর্ণ থেকে নিম্নবর্গ, সাবল্টার্ন ঘরনা (Subaltern School/Studies) থেকে 'দলিত প্রতর্ক' (Dalit Discourse), রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, ধর্মচর্চা থেকে নির্বাচন-রাজনীতি চর্চা- সব কিছুতেই জাতির অস্তিত্ব (Exitance of Caste) সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'জাতি চর্চাকে' (Caste Studies) প্রানবন্ত করে তুলেছে।[৩]

উনিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে বাংলা তথা ভারতে বর্ণ বা জাতির ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল ঔপনিবেশিক পন্ডিতবর্গের হাত ধরে। এ প্রসঙ্গে বুকানন হ্যামিলটন-এর 'Eastern India', জেমস টেইলার-এর 'A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca' (১৮৪০), এইচ ব্যাভারলির 'Report of the Census of Bengal' (১৮৭২), ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের 'Annals of Rural Bengal' (১৮৬৮), ড. জেমস ওয়াইজের 'Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal' (১৮৮৩), এইচ. এইচ. রিসলির 'The Tribe and Castes of Bengal' (১৮৯১) এই সকল ঔপনিবেশিক পন্ডিতবর্গ ছাড়াও জাতি চর্চার ক্ষেত্রে আরোও অনেকে এবিষয়ে চর্চা করেছেন।[৪]

ঔপনিবেশিক পন্ডিতবর্গের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের বিবরণে বর্ণ বা জাতি চর্চার বিষয়টি ওঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে, যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের 'Hindu Caste and Sects' (১৮৯৬), শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেটকারের 'The History of Caste of India' (১৯০৯), জি. এস. ঘুরেও-এর 'Caste and Race in India' (১৯৩২), এ. আর. দেশাই 'Social Background of Indian Nationalism (১৯৪৮), ইরাবতী কার্ভে 'Hindu Society: An Interpretation' (১৯৬১), এম. এন. শ্রীনিবাস-এর 'Social Chang in Modern India' (১৯৬৬), নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের 'Origin and Growth of Caste in India' (১৯৩১), নির্মল কুমার বসুর 'The Hindu Method of Tribal Absorption' (1941), হিতেশ রঞ্জন সান্যালের 'Social Mobility in Bengal' (1985), শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Caste Protest and Identity in Colonial Bengal: The Namasudras of Bengal 1872-1947' (1997), স্বরাজ বসুর 'Dynamics of Caste Movement 1910-1947 (2002), রূপ কুমার বর্মন 'Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal' (2012), পৌলমী চট্টোপাধ্যায়ের 'The Pod (Paundra Kshatriya) of West Bengal- From Social Mobility to Nativism (2008), বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষকদের বিবরণীতে জাতি চর্চার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।[৫]

ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি চর্চার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। একই ভাবে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ডোম জাতি চর্চার বিষয়টিও চর্চিত হতে থাকে। G. R. Clarke 'The outcastes, being a brief account of the Maghaya Dom's' (১৯০৩),[৬] George Weston Briggs-এর 'The Dom's and their near Relations' (১৯৫৩),[৭] Harish Chandra Das-এর 'The Economic life of the Doms of Barbaria' (১৯৬৩)[৮], Gail Omvedt-এর 'Dalits and Democratic Revolution' (১৯৯৪)[৯], K. S. Singh, People of India: The Scheduled Castes. Vol. II (১৯৯৮),[১০] Eleanor Zellioit 'From untouchables to Dalits: Essays on the Ambedkar Movement' (২০০১),[১১] D P Singh, Socio-Demographic Condition of One of the Most Marginalised Caste in Northern India' (২০১৬)[১২] এই সকল ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের

আলোচনায় ডোম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়গুলি ইতিহাসচর্চায় গুরুত্ব লাভ করেছে।

বর্ণভেদ প্রথা অনুযায়ী ডোমেরা হল সবচেয়ে 'নিচু জাত'-এর একটি। 'দলিতদের দলিত' তারা। যুগ যুগ ধরে তারা মনুষ্যজাতির মধ্যে 'অভিশপ্ত' হয়ে বেঁচে আছে। যদিও সামাজিকভাবে নাপিত, ধোপা, জেলেরাও দক্ষিণ এশিয়ায় দলিত; কিন্তু ডোমেরা তাদের কাছেও অস্পৃশ্য। অনেক স্থানেই এখনও কোন ডোমের ছেলেকে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে নিয়ে যাওয়া হলে নাপিত 'অস্পৃশ্য' জাত বলে চুল কাটতে গড়িমসি করে। ধোপারাও তাদের কাপড়-চোপড় রাখে না, 'অচ্ছুত' বলে।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায় হিসেবে ডোমদের চিহ্নিত করা হয়। ডোম বা ডোংরা বাংলা, বিহার এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এক দ্রাবিড়ীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এদের অনেকে চণ্ডালও বলে থাকে।[১৩] ড. ক্যালওয়েল ডোম, চণ্ডাল, পারিয়া এবং অন্যান্য হীন উপজাতিদের প্রাচীনতর অ-সংস্কৃততর এবং কৃষ্ণতর দ্রাবিড়ীয়দের অবশেষ প্রায় এক সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৪] এরা দ্রাবিড়দের আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে পর্বত এবং জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং কুমায়ুন অঞ্চলে দাসবৃত্তি গ্রহণ করে। ডালটন ডোমদের জীবনের অভ্যাসের সাথে ঘাসিদের মিল খুঁজে পেয়েছেন।[১৫] ডোমদের ডোম্বরা, ডোমারা ও ডোম্বারা নামেও ডাকা হয়।

হিমালয় উপত্যাকা অঞ্চলে যে সমস্ত ডোমরা থাকে তারা নিজেদের উচ্চস্তরের ডোম বলে ঘোষণা করে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে এই সম্প্রদায়ের বাস দেখা যায়। বাংলাদেশের ডোম জাতির প্রায় অধিকাংশই বিহার ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত বলে মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদাহ ও পুরুলিয়া জেলায় এদের বাস দেখা যায়। বাংলার ডোমেরা মন্ডল, কালন্দী, খাঁ, সাঁতরা ও মিদ্যা পদবীধারী তপশিলি জাতি ভুক্ত কাশ্যপ্য গোত্রের হয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের ডোমরা বাগদি জাতির লেট শ্রেণির পুরুষ ও চণ্ডালিনীর পুত্র কালুবীরকে তাদের আদি পুরুষ বলে মনে করেন। এই কালু বীরের চার পুত্র প্রানবীর, মনবীর, বানবীর ও শানবীর থেকেই চার শ্রেণির ডোম- অঙ্কুরিয়া (আকুড়ে), বিশডেলিয়া (বিশডোলা), বাজুনিয়া (বাজুনে), মগহিয়ার (শাজুনে) উৎপত্তি।[১৬]

সারণি-১ ১৮৭২-১৯৫১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে বাংলার ডোমদের মোট জনসংখ্যা ও সংখ্যাধিক্যে তিনটি জেলাসহ মালদহ। একই ভাবে ১৮৯১

সালের আদমশুমারির প্রতিদেনটিতে ডোম ও কাওরা সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা একত্রে গণনা করা হয়েছিল।

জেলা	**১৮৭২**	**১৮৮১**	**১৮৯১**	**১৯০১**	**১৯১১**	**১৯২১**	**১৯৩১**	**১৯৪১**	**১৯৫১**
মোট জনসংখ্যা	১,৪৬,২৭৭	১,৪২,৮২২	২,৩৭,০৬৬	১,৫৩,৭৭০	১,৪৭,৭৫৮	১,৩১,২১৯	১,২৮,৫৯৩	১,০৫,৩১৬	১,১০,৩৪৮
বর্ধমান	৫২,৩২৭	৩৮,৮৫৬	৩৯,৬৮৯	৩৯,৯৪৩	৩৯,৯৯৬	৩৫,৫৬৩	৩৪,৯১০	২৯,৬১৮	৩১,৯৪৯
বীরভূম	৩৪,৮৯৭	৩৫,২৩৮	৩৬,১৫৯	৮০,৬৬৬	৩৮,৭৭৯	৩৫,০৮৬	৩৬,২৭৮	৩২,২৩২	৩০,৬৮৪
মুর্শিদাবাদ	১০,৮৯০	৭,৫৭৭	৬৮০০	৭৬৮০	৬৮৩৩	৫৪৮৭	৫৫৮৪	৪২৯৮	২২৩১
মালদহ	১২২৭	১২২৮	১৯২৪	১১৬১	১১৩২	১০৯১	৯২৩	৫০৪	৭৬৮

সূত্র: H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-I*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1891, p. 251; A. Mitra, *The Tribes and Caste of West Bengal*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1953, p. 99.

সারণি-২ ১৯৬১-২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ডোম জনসংখ্যার সামগ্রিক তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	**আদমশুমারি বছর**	**মোট ডোম জনসংখ্যা**	**মোট পুরুষের সংখ্যা**	**মোট নারীর সংখ্যা**
১.	১৯৬১	১,৫১,৮১৮	৭৯,৮২৯	৭১,৯৮৯
২.	১৯৭১	১,৭৪,৩৬৭	৯০,৪২১	৮৩,৯৪৬
৩.	১৯৮১	২,৩১,৫৩৫	১,২০,০৯৬	১,১১,৪৩৯
৪.	১৯৯১	২,৮৩,৬৯১	১,৪৬,৭০৪	১,৩৬,৯৮৭
৫.	২০০১	৩,১৬,৩৩৭	১,৬১,৪৭৩	১,৫৪,৮৬৪
৬.	২০১১	৩,৫২,০৮৩	১,৭৮,৭২৬	১,৭৩,৩৫৭

সূত্র: J. Datta Gupta, Census of India Vol-XIV, West Bengal and Sikkim, Part-v-A (i), Tables on Scheduled Caste, Calcutta: Bengal Secretariat

Press, 1963, p. Xiv; Bhaskar Ghose, *Census of India, 1971, Series-22, West Bengal, Part-II-C (i) Social and Culture Tables*, Calcutta: GOVERNMENT OF WEST BENGAL PUBLICATIONS, 1973, p.69; Government of India- Special Table for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Census of India, 1981, 1991, 2001, 2011.

ডোমরা বিভিন্ন প্রথাগত জীবিকার সাথে যুক্ত যেমন--- শাজুনে বা ছাঁচি ডোমেরা ছাঁচ অর্থাৎ বাঁশ চেরাই করে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন--- ঝুড়ি, কুলো, টোকা, ডালা, ঝাঁকা, চুবড়ি, চাঙারী, পাখা, খাঁচা, লাটাই প্রভৃতি তৈরী করে। বাজুনে ডোমরা ঢাক, ঢোল, সানাই, নহবৎ ইত্যাদি বাজানোর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কোনও শুভ অনুষ্ঠান যেমন--- পূজা-পার্বণ, বিবাহ অনুষ্ঠানে এদের ডাক আসে বাজানোর জন্য। যজমানি প্রথার মতোই ডোমদের বেশ কিছু গ্রাম নির্দিষ্ট থাকে যেখানকার যাবতীয় অনুষ্ঠানে ডোমরা যজমানদের কাছ থেকে ডাক পায়। তাছাড়া দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজার মতো অধিক জনপ্রিয় পূজোগুলিতে এদের শহর থেকেও ডাক আসে। এছাড়াও শ্মশানে শবদেহ পুড়ানোর কাজে, ধাঙর বা মেথর হিসাবে সাফাইয়ের কাজেও ডোমদের নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। ডোমরা মনে করে, ব্রিটিশ সরকার অনেকটা জোরপূর্বক ডোমদের মেথরের কাজে নিয়োগ করে। ১৮৭১ সালে আদমশুমারি রিপোর্টে ঝাড়ুদার শ্রেণির লোক হিসেবে ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম, হেলা, বাঁশফোঁড়, হাঁড়ি, লালবেগী ও রাউতদের 'মেথর' নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক সূত্র বলছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য--- ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও অযোধ্যা থেকে এসব দলিত শ্রেণির লোকদের নিয়ে এসে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োগ করা হয়। সরকার তাদের জন্য বিনা টাকায় মদও সরবরাহ করত, যাতে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে নোংরা সরানোর কাজটি সহজে করতে পারে। কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ডোমেরা মাঝিমল্লার কাজ করত। নবাবী আমলে ডোমদের ভারতের পাটনা থেকে আনা হয় জল্লাদের কাজ ও মৃতদেহ সৎকারের জন্য। তখন থেকে ব্রিটিশ সরকারের আমল পর্যন্ত প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে জল্লাদ ছিল। তাদের কাজ ছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা। জল্লাদ তার আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় এই কাজটি করত। হিন্দু ধর্ম মতে, হিন্দুদের মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়ার সময় ডোমদের থাকতে হয়, তাহলে সৎকার শুদ্ধ হবে। এ জন্যই প্রতিটি শ্মশানঘাটে ডোমদের উপস্থিতি বেশি। অন্যদিকে হিন্দুদের কোন জমায়েতে একজন ডোম থাকলেও সবাই অপবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু

তাদের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শত শত ডোম উপস্থিত থাকলেও অপবিত্র হয় না। হাসপাতালে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার কাজেও ডোমদের দেখা যায়। ডোমেরা ফাঁসুড়ে বা জল্লাদ হিসাবেও কাজ করে থাকেন, বিহারের মগহিয়া ডোমেরা ভবঘুরে ছিল। বাংলা ও বিহারে তারা একসময় সহকাfj 'ফাঁসুড়ে' হিসেবে কাজ করত।[১৭] বর্তমানে আধুনিক জীবনে অতীত জাতিগত জীবিকা বৃত্তির অবসানের ফলে বিকল্প বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডোমরা কাজের সুযোগ তৈরী করার চেষ্টা করছে যেমন--- অনেকে রাজমিস্ত্রী ও ঠাট মিস্ত্রী হিসেবে কাজ করছে। ঠাটমিস্ত্রীরা সাধারণত বাড়ির ঠাট অর্থাৎ উপরের কাঠামো তৈরি করে ছাউনি দেওয়ার কাজ করে থাকেন।

ডোম রমণী অর্থাৎ ডোমনীরা বাঁশের জিনিসপত্র তৈরীর পাশাপাশি কৃষি শ্রমিক (কামিন) হিসাবেও কাজ করে থাকেন। ডোম রমনীরা নিজেদের মধ্যে বিয়েতে বাজনা বাজায় ও গান গায় যদিও অন্যের বিয়েতে বাজনা বাজানোর কাজে ডোমনীদের দেখা যায় না। ডোম রমনীদের দাই-এর কাজেও নিযুক্ত থাকতে আমরা দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় ডোমনীদের মধ্যে ঝাঁচুন (এক ধরণের ঝাড়ু বা ঝাটা যা খেজুর গাছের পাতা বা পালুই দিয়ে তৈরি) তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

পেশা অনুযায়ী সামাজিক সম্মান নির্ধারণের প্রয়াস হিন্দু সমাজে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তবে বর্তমানের যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক নিশ্চয়তা অনেক ক্ষেত্রেই পেশাগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে। এতদিন যাবৎ পেশা তুলে বিশেষণ প্রয়োগ (বা গালি) দেওয়া যে রীতি উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল আজ যুগের হুজুগে তাকে গলঃধকরনে বাধ্য হতে হচ্ছে। যার বড় উদাহরণ আমরা অতিসম্প্রতি দেখতে পেয়েছি যেখানে এনআরএস (NRS) হাসপাতালে ৬টি ডোমের অস্থায়ী পদের জন্য প্রায় ৮০০০ আবেদন জমা পড়েছে। যার মধ্যে অনেকেই জাতিগত ভাবে উচ্চবর্ণের এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্নাতকত্তোর পাট শেষ করা আবেদনকারীও রয়েছেন।[১৮] এর থেকে বোঝা যায় জাতিগত জীবিকা কেবলমাত্র সামাজিক বৈষম্যের কানাগলিতেই আবদ্ধ। এর ফলে ডোমেদের নিজেদের অতীত পেশাগত বৃত্তিগুলিতে কাজের নিশ্চয়তা কমেছে এবং তাদের উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামিল হতে হচ্ছে। যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দুর্বল করছে। যদিও এই পরিস্থিতি যে ডোমেদের সামাজিক সম্মান, মর্যাদার ও পতিপত্তি বাড়াচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ, শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক অগ্রসরতাও সবক্ষেত্রে

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মজ্জাগত প্রথাকে এখনো দূর করতে পারেনি। ডোমেদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়। নিচে দুজনের উদাহরণ তুলে ধরা হলো---

> উদাহরণ-১ "ব্রাহ্মন, গোয়ালা ও অন্যান্য উচ্চবর্গীয়রা আমাদেরকে তো দূরে থাক এমনকি আমাদের ছায়াও স্পর্শ করতে চায় না। কোন শুভকর্ম শুরু করার আগে আমাদের মুখদর্শন থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করেন।[১৯]
>
> উদাহরণ-২ "উচ্চবর্গীয় পরিবারের মেয়েরা আমাদের পরিবারের মেয়েদের স্পর্শ করতে চাই না। এমনকি স্নান করার পর স্নানের ঘাট আমাদের পরিষ্কার করে দিতে হয়।[২০]

সামাজিক বৈষম্যের এই চিত্র বাংলা উপন্যাসেও ফুটে উঠেছে। হরিশংকর জলদাস 'জলপুত্র' উপন্যাসে লিখেছেন--- 'বিয়ে শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। ..... অবশেষে গৃহকর্তা ..... চেঁচিয়ে বললেন, 'অ প্রদীপ, ঢুইল্যা অলত আইজো নো খাঁ পাআন্‌লার। হিতারারে খাইতে দাওনা।[২১]

আধঘন্টা পরে বাজনাদারদের খেতে দেওয়া হল উঠানের এক কোণে; আস্তাকুঁড়ের পাশে একটি বাঁশ পেতে দেওয়া হয়েছে, কলাপাতায় আবার খাবার দেওয়া হয়েছে, ভাতের উপর ডাল ঘণ্ট ও একটুকরো করে মাছ। অতিথিদের নানা লোভনীয় খাবারের পরিবেশন করলেও ঢুইল্যাদের ভাগ্যে তা জোটেনি। এরা এ সমাজে অস্পৃশ্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে এরা অপরিহার্য বটে কিন্তু বর্ণবাদিতার নিরিখে এরা অচ্ছুত, নিম্নবর্গীয়। দূর থেকে কর্তা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন অ প্রদীপ ঢুইল্যা অলেরে কও, খাওনর পরে আঁইডা আর কলাপাতা যে এন খালপাড়ত পেলাই দি অইয়্যা। হিতারার আঁইডা কেউ ছুইত না।[২২]

ডোমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে, একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে আজও ডোমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে বৈষম্যের স্বীকার। প্রথাগত জীবিকালাভের ক্ষেত্রে বড় প্রোতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। তবে একথাও ঠিক যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সবক্ষেত্রে ডোমদের উন্নতির সূচক হিসাবে কাজ করে না। উচ্চবিত্তদের নিম্নবিত্তিয় জীবিকা এবং নিম্নবিত্তিয়দের অতীত ঐতিহ্যগত জীবিকাবৃত্তির ফল সর্বদা সমানুপাতিক নয়। এ যেন সমযাত্রায় পৃথক ফলের মত।

তথ্যসূত্র :

১. Stanko Pelc, 'Marginality and Marginalization' in R. Chand et al. (eds.), *Societies, Social Inequalities and Marginalization, Perspectives on Geographical Marginality*, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017, pp. 13-16.

২. W Labow, *The social stratification of English in new work city*, Washington: De, Center for Applied Linguistics, 1966, P. 25.

৩. রূপ কুমার বর্মন, *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান*, কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯, পৃ. ২২।

৪. *তদেব*, পৃ. পৃ. ২২-২৫।)

৫. *তদেব*, পৃ. পৃ. ২৫-৩৩।)

৬. G. R. Clarke, *The Outcasts, Being a Brief History of the Maghaya Doms*, Thacker: Spink & Co, 1903.

৭. W. G. Briggs, *The Doms and their near relations*, Mysore: The Wesley Press and Publication House, 1953.

৮. Harish Chandra Das, The Economic life of the Doms of Barbaria, Orissa Historical Journal, 1963,

৯. Gail Omvedt, Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India, New Delhi: Sage Publication, 1994.

১০. K. S. Singh, People of India: The Scheduled Castes. Vol. II, New Delhi: Oxford University Press; 2nd rev. ed edition, 13 November 1998.

১১. Z. Eleanor, From untouchables to Dalits: Essays on the Ambedkar Movement, New Delhi: Manohar, 3rd edition 2001 (1992).

১২. D P Singh, Socio-Demographic Condition of One of the Most Marginalised Caste in Northern India, *Demography India* Vol. 45, Issue: 1&2. 2016, pp.117-130.

১৩. H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-I*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1891, p. 240.

১৪. Caldwell Robert, A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages, London: Trubner & Co., Ludgate Hill, 1875, p. 546.

১৫. E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1872, p. 326.

১৬. নগেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, কলকাতা: ইউ. সি. বসু এণ্ড কোম্পানি, ১৩০৩, পৃ. ৪৪১, ।

১৭. H. Braverly, *Report in the Census of Bengal, 1872*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1883, p. 168.

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই, ২০২১, পৃ. ১।

১৯. বিকাশ কালন্দী (৬০), সাক্ষাৎকার, চুনাপাড়া, ঝাড়গ্রাম, ২০২১।

২০. শিউলী মিদ্যা (৭০), সাক্ষাৎকার, চুনাপাড়া, ঝাড়গ্রাম, ২০২১।

২১. হরিশংকর জলদাস, *জলপুত্র*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ১১৫।

২২. *তদেব*।

ঊষা গাঙ্গুলি : অনালোকিত অধ্যায়ের অবলোকন

রিয়া মুখার্জ্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
আসানসোল

সারসংক্ষেপ : *থিয়েটারের প্রেক্ষিত বিশাল। বিচিত্র তার রঙ্গরস। যুগের নিয়মে, নতুন শতাব্দীতে, তার ভাষা, কাঠামো যেরূপ পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যুগান্তরের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তও ধরা পড়েছে। ঠিক এই যুগান্তরের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বাংলায় হিন্দি থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তোলেন অন্যতম কান্ডারি ঊষা গাঙ্গুলি। থিয়েটারকে তিনি মনে করতেন একটি হাতিয়ার। আর এই হাতিয়ারকে কেন্দ্র করেই তিনি নেমে পড়েন থিয়েটারের জগতে। মানুষকে জাগ্রত ও সচেতন করতে যে ধরণের নাটকগুলি মানুষকে ভাবাবে, ধাক্কা দেবে, প্রশ্ন জাগাবে এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে একত্রিত করবে ঠিক সেই বিষয়গুলিকে তিনি থিয়েটারে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি এক স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন ভাষার নাটককে তিনি একত্রিত করেছিলেন তাঁর 'থিয়েটারের ভাষা'- তে। নাট্যপ্রেমী মানুষদের একসূত্রে বাঁধতে তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব দল 'রঙ্গকর্মী'। তিনি সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ঘরানার থিয়েটারের সৃষ্টি করেন।*

সূচক শব্দ : *জীবনসংগ্রাম, থিয়েটার, ভাষা, নাট্যদল, দর্শক।*

মূল আলোচনা:

স্বাধীনতার ঠিক অন্ধকার যখন কাটছে সেই ঊষালগ্নে জন্ম নিলেন উত্তরপ্রদেশের যোধপুরে আজকের সবার পরিচিত নাট্যকর্মী ঊষা গাঙ্গুলি (১৯৪৫)। তাঁর এই নামকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায়, নাট্যভিনেত্রী, নাট্যনির্দেশক, না কি নাট্য প্রযোজক, কোন পরিচয়ে? প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভার উচ্চশৃঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। অতুল তিওয়ারি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন-

"...Usha is not just a playwright. she has many facets to her personality. she is an actor, a director, an activist" (১)

কোনোকিছু নতুনভাবে সৃষ্টির জন্যে যেমন বিস্ফোরণের প্রয়োজন আছে ঠিক সেরকম ঊষা গাঙ্গুলি-র পরিচালিত প্রতিটি নাটক কোন বিস্ফোরণের তুলনায় কম নয়। মূলত একজন হিন্দিভাষী হয়েও বাংলা সাহিত্য এবং হিন্দি সাহিত্যের, বাংলা থিয়েটারের

সঙ্গে হিন্দি থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দুই রেখাকে এক রেখায় মিলিত করতে এবং আবিস্কার করতে তিনিই বোধহয় পেরেছিলেন।

ঊষা গাঙ্গুলি পূর্ববর্তী সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দি থিয়েটারের আরেকজন সুপরিচিত নাম শ্যামানন্দ জ্বালান (১৯৩৪-২০১০)। তিনি বাংলা থিয়েটারের নাট্যগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী সকলের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দি থিয়েটার গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু কলকাতার বুকে এই হিন্দি ভাষার থিয়েটারকে তিনি সেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এই থিয়েটার সম্পূর্ণ রুপে হিন্দি থিয়েটার, হিন্দি দর্শকদের থিয়েটার রূপেই পরিচিত হয়েছিল। কারণ বাংলা থিয়েটারগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়েই একই নাটক বাংলা থিয়েটার এবং পাশাপাশি শ্যামানন্দ জ্বালানের 'অনামিকা'-এই হিন্দি থিয়েটারে অভিনীত হত। ঊষা গাঙ্গুলি একজন অন্যতম যিনি আলাদা আলাদা ভাষাভাষীর দর্শকের কথা কখনও ভাবেন নি। তিনি ভাবতেন নাটকের দর্শকের কথা, নাট্যপ্রেমী মানুষের কথা, কোনো ভাষাভাষী দর্শকের কথা নয়। তিনি "রঙ্গকর্মী"-র মত একটি দল প্রতিষ্ঠা করে হিন্দি-বাংলা সমস্ত দর্শককে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন এবং নতুন এক অভিনব ঘরানার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন-

"I had never really thought that I would be doing theatre because I was a Bharatnatyam dancer then..."(২)

তিনি ভাবতে পারেননি কোনোদিন থিয়েটার করার কথা। ব্যাঙ্ককর্মী পিতার কর্মসূত্রে ১৯৬০ সালে কলকাতায় আসেন এবং সেই সূত্রেই উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু হয় এবং থিয়েটারের প্রতি ভালোলাগাও শুরু হয়। উনিশ শতক থেকে আজ একুশ শতকেও মেয়েদের গতি-প্রকৃতি সমাজ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের থিয়েটার করাকে সমাজ ভালো চোখে দেখত না সেইসময়কালে, কিন্তু সকল বিপত্তিকে কাটিয়ে উঠতে তিনি পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন যেহেতু একজন ভারতনাট্যম নৃত্য পরিবেশক তাই অনেক নাট্যদলের তরফ থেকে ডাক আসে অভিনেত্রীর জন্যে। ১৯৭০ সালে কলেজে পড়ানোর পাশাপাশি সঙ্গীত কলামন্দির দলের হয়ে বদ্রীপ্রসাদ তিওয়ারির নির্দেশনায় 'মিট্টি কি গাড়ী বাচি কটকম' নাটকে নর্তকী বসন্তসেনা চরিত্রে প্রথম অভিনয়ে পা রাখেন –

"... I had just started teaching and at that time everyone was in search of Vasantasena , the dancer.. i did my first play called 'MITTI

KI GADI BACHI KATAKAM' with an institution called sangeet kalamandir."(৩)

বাংলার নাট্যব্যাক্তিত্বদের ভালোবাসার সান্নিধ্যে এবং তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি চেয়েছিলেন স্বতন্ত্র কিছু করতে আর সেজন্যে তিনি ভেবেছিলেন–

"এখনকার শহরতলিতে তো প্রচুর প্রবাসী হিন্দিভাষী মানুষ আছেন, ছাত্ররা আছেন, শ্রমিকেরা আছেন, হাওড়ায়, মেটিয়াবুরুজে-বিশাল সংখ্যক মানুষ আছেন। তাঁদের কাছে পৌঁছানো দরকার..."(৪)

ব্যবসায়িক থিয়েটার থেকে তিনি দূরে থাকতে চেয়েছিলেন সবসময়। নাটককে তিনি ভালোবাসতেন বলে নাটক নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন সবসময়। নাটকের মানকে কখনোও ব্যবসায়িক থিয়েটার করে লোকরঞ্জনের জন্য নামাতে রাজী হন নি। এই কারণে নিজের নাট্যদল তৈরি করেন 'রঙ্গকর্মী' (১৯৭৬) যা এমনই এক নাট্য সংগঠন যাঁরা কাজের সূত্রে আজ সকলের অগ্রভাগে-

"আজকের দিনে, রঙ্গকর্মী, ভারতের বৃহত্তম নাট্যদলগুলির মধ্যে অন্যতম।"(৫)

বিশ শতকের সত্তর দশকে অনেক হিন্দি নাট্য পরিচালকেরা আসেন কলকাতায়, যেমন– নটবরজী, রাজেন্দ্র শর্মা, প্রতিভা আগরওয়াল, বদ্রী তিওয়ারী, শ্যামানন্দ জ্বালান, শরদ শেঠ, এনাদের পাশাপাশি এই দশকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আরো একটি নাম তিনি হলেন ঊষা গাঙ্গুলি। ঊষা গাঙ্গুলির অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং আগ্রহ থেকে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় 'রঙ্গকর্মী' কে গড়ে তোলেন, তাঁর রঙ্গকর্মী পর্বকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে-

প্রথম পর্বে (১৯৭৬-১৯৮০) তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, বেশ কয়েকজন পরিচালকের অধীনে অভিনয় করেন। বহু জ্ঞানী মানুষদের সান্নিধ্যে নিজের দলকে একটু একটু করে গড়ে তোলেন। কারণ এই সময়কালে নির্দিষ্ট ভাবে কোন একজন নির্দেশক ছিলেন না, তিনি জানান-

"In the first phase there was no director. I was not trained. I was just trained as a dancer so we were inviting people from outside..."(৬)

এই সময়পর্বে তৃপ্তি মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম কে রায়না, বিভাস চক্রবর্তীর মতো ব্যাক্তিত্বেরা নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তৃপ্তি মিত্র, ইবসনের 'ডলস হাউস' এর

রুপান্তর করেন 'গুড়িয়াঘর' এবং নির্দেশনা দেন। এই নাটকে প্রধান চরিত্র মুনিয়াতে অভিনয় করেন ঊষা গাঙ্গুলি। তিনি তৃপ্তি মিত্রের সম্বন্ধে জানান-

"Her production in Bengali was called putulkhela. But she is so honest. So like a child. She said in Bengali that 'whatever has been done , has been done. i wont do more than that' and I stunned. Such an honest person. she said 'I will repeat the same thing'. But eventually the style and every thing about was so different, including the whole design of her direction."(৭)

সেই সময় শ্রীকান্ত মণ্ডলের নির্দেশনায় "আন্ধের নগরী" (১৯৭৭) আত্মানন্দের নির্দেশনায় "বেচারা ভগবান" (১৯৭৭) এম কে রায়নার নির্দেশনায় "মাদার" ইত্যাদি নাটক অভিনয় হয়।

'রঙ্গকর্মী'-র দ্বিতীয় পর্বে (১৯৮০-২০০০) সংগঠকের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন নিজে ঊষা গাঙ্গুলি, পাশাপাশি অভিনয়, পরিচালনা এবং সাথে সাথে নানাবিধ নেপথ্য নাট্যকর্মের সমন্বয় বুঝে নেন এই সময়কালে। এই সময়কালে অভিনয়কে ছাপিয়ে যায় তাঁর পরিচালকের ভূমিকা। মঞ্চ, পোষাক, আলো, সঙ্গীতের ব্যবহারের সঙ্গে তীক্ষ্ণ সংযমী মানসের পরিচয় দেন তিনি। এই সময়কালে একটা নতুন পর্যায় শুরু হয় বলা যেতে পারে। ১৯৮৪ সালে মনু ভাণ্ডারীর উপন্যাস অবলম্বনে 'মহাভোজ' নাটক দিয়ে শুরু হয় তাঁর প্রথম নির্দেশনা। তিনি তাঁর নির্দেশনা সম্পর্কে জানান-

"দলের প্রথম পর্যায়ে যাঁরা আমাদের নির্দেশনা দিতেন আমি খুব খুঁটিয়ে তাঁদের নির্দেশনা দেওয়ার পদ্ধতি দেখতাম। আমি অবশ্য নিজের মতো করে একটা পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছি পরে, ওইসব নির্দেশকের প্রভাব আমার পড়েনি। আমি বই পড়ে নির্দেশনা দেওয়া শিখিনি। অন্যদের দেখেও খুব একটা প্রভাবিত হইনি কখনো। "(৮)

কিন্তু একজন মহিলা নির্দেশক যখন পুরুষ নির্দেশককে ছাপিয়ে যায় এবং সাফল্য অর্জন করে তখন তাঁকে নিয়ে চর্চা হতে থাকে, নানারকম কথা উঠতে থাকে। কিন্তু ঊষা গাঙ্গুলি এসব কোনো কথাকে তোয়াক্কা করেননি। 'মহাভোজ' নাটকটির পরপর ছিয়াশিটি শো করেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে। এরপর একের পর এক নাটক যেমন রত্নাকর মাতকরীর লোককথাকে কেন্দ্র করে 'লোককথা'(১৯৮৮), মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে 'রুদালী', মুক্তি গল্পকে কেন্দ্র করে বাংলায় 'মুক্তি'-র নাট্যরূপ দেন। আর নাট্যরূপান্তর করার ক্ষেত্রে তিনি বলেন–

"What I did was I started using the stories of the plays that were written and many changes. It all started with Rudali".(৯)

"রঙ্গকর্মী"-র তৃতীয় পর্বে এসে (২০০০-২০২০) আমরা এক নতুন ঊষা-কে দেখতে পাই যিনি একাধারে অভিনয়, নির্দেশনা ও নাট্য সংগঠন এই ত্রিবিধ কাজে যুক্ত ছিলেন। এই সময়কালে তিনি তাঁর থিয়েটার 'রঙ্গকর্মী' কে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। অভিনয়, নির্দেশনা, পরিচালনা এসবের পাশাপাশি তিনি নাটক ও লিখেছেন-

"I have also written an original play called KHOJ. "(১০)

'খোঁজ' নামক তাঁর এই মৌলিক নাটকটির গল্প দ্বৈতসত্তাকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও তিনি 'অন্তরযাত্রা' নামে আরেকটি মৌলিক নাটক লেখেন। এই নাটক সম্পর্কে তিনি বলেন–

"This play is a journey.It is about how an indivisual slowly and steadily progress...It's not for feminism but I will fight for the rights of women. I will keep on doing it...ANTARYATRA was some what like that."(১১)

পুরুষের শক্তির থেকে নারী শক্তি যে কখনোই কম নয়, বরং তাঁর দৃঢ়তা অনেক বেশি এই কথায় বারবার প্রমান করতে চেয়েছিলেন তিনি। পুরুষের পাশে নারী যে কোন অংশেই কম নয় সেই কারণে মেয়েদের প্রতিবাদ, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে বারবার তুলে এনেছেন তাঁর নাটগুলিতে। আর এই কথা বোঝাতে মেয়েদেরকে আশার আলো জাগাতে, প্রতিবাদের ভাষা শেখাতে পথ নাটকের পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করেও 'বেটি আয়ি', 'মাতাদিন', 'মাইয়াত', 'তামাশা' এই ছোট নাটকগুলি করেছেন। সমকালীন ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রেক্ষিত বারবার উঠে এসেছে তাঁর থিয়েটারে, তিনি সমকালীন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নাটক লিখলেও তা হয়ে থাকবে সর্বকালের। সেরকম তাঁর একটি নাটক 'হাম মুখতারা'।

ঊষা গাঙ্গুলির নাটকের প্রযোজনাগুলির নেপথ্যে কোথাও না কোথাও এক হিন্দি চলচ্চিত্রের চিন্তা চেতনা কাজ করত। তাঁর মননে ছিল বাংলা গ্রুপ থিয়েটার, চেতনায় ছিল সমন্তরাল হিন্দি চলচ্চিত্র আর চিন্তনে রাখতেন তিনি আন্তর্জাতিক সমাজনীতিকে। তিনি শুধুমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল রঙ্গকর্মীকে নিয়ে ভাবেননি, স্বপ্ন দেখেছিলেন নাট্যমঞ্চের , মহীয়সী নারী বিনোদিনী দেবী যিনি থিয়েটারকে ভালোবেসে তাঁর সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং অপমানিত হয়েছিলেন তাঁর কথা ভেবে, এবং আর এক

অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী র কথা ভেবে **"বিনোদিনী-কেয়া"** নাট্যমঞ্চ তৈরি করেন। এই দুই মহীয়সী মহিলা অভিনেত্রীদের নামে নামকরণ করেন।

ঊষা গাঙ্গুলি তাঁর মৃত্যুর পরও (২৩ এপ্রিল,২০২০) অচর্চিত হয়েই রয়ে গেছেন। সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের কথা অনুযায়ী বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন –

" নিজেই একটা স্কুল, জীবন্ত অভিনয়ের স্কুল। " (১২)

কারণ তিনি চলে যাওয়ার পর আজও তাঁকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ সংখ্যা বের হয়নি। তিনি একা একজন অবাঙালী মহিলা হয়েও সত্তরের দশকের মতো এক উত্তালজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে একা একা লড়াই করেছেন, নিজের দল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো থিয়েটার ঘরানা, বা থিয়েটার পরিবার থেকে তিনি উঠে আসেননি। নিজ প্রচেষ্টায় বাংলা এবং হিন্দি থিয়েটারের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। সম্পূর্ণ এক ভিন্নস্বাদের ভিন্ন ঘরানার থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোটা ভারতবর্ষ গর্বের সঙ্গে তাঁর অভিনয় সত্তাকে মান্যতা দিয়েছেন, এমনকি বাইরের দেশেও তাঁর নাম জাজ্বল্যমান। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি সেইভাবে আজও কিন্তু চর্চিত নন। তিনি বাংলা থিয়েটারকে যেভাবে ভালবেসেছিলেন কিন্তু সেই বাংলা কি তাঁকে তাঁর সেই মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পেরেছে বলে মনে হয়? নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি এক আলোর প্রতীক। তাঁর নির্দেশনায় বারবার আমরা নতুন প্রজন্মকে উঠে আসতে দেখেছি, আজও তিনি সকলকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁকে স্মরণ করে তাঁর দল রঙ্গকর্মী নতুন নতুন প্রযোজনা করে চলেছে এবং আগামীদিনেও নতুন প্রজন্মের কাছে এক নতুন ঊষার দীপ্তিময় আলোর সঞ্চার করবে। তাঁর কাজের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন সকলের হৃদয়ে, এই কথা পরক্ষে তিনি যেন নিজেই বলেছেন-

"এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা-
আমি বাঁচব-আমি বাঁচলুম"। (১৩)

তথ্যসূত্র:

১. https://www.mumbaitheatreguide.com "prithivi theatre festival 2006- A meet the play wrights sessions", conversation between Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. ১।

২. তদেব, পৃ. ১।

৩. তদেব,পৃ. ১-২।
৪. তীর্থঙ্কর চন্দ (সম্পাদিত), 'নান্দীপট', নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা, পৃ. ১।
৫. তদেব, পৃ. ১২১।
৬. https://www.mumbaitheatreguide.com "prithivi theatre festival 2006- A meet the play wrights sessions", conversation between Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. ২।
৭. তদেব, পৃ. ৩।
৮. তীর্থঙ্কর চন্দ (সম্পাদিত), 'নান্দীপট' নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা, পৃ. ১২১।
৯. https://www.mumbaitheatreguide.com "prithivi theatre festival 2006- A meet the play wrights sessions", conversation between Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. ৪।
১০. তদেব, পৃ. ৪।
১১. তদেব, পৃ. ৫।
১২. সঞ্জীব রায় (সম্পাদিত), 'কথাকৃতি ৩ এগারো ১৩", ২০১৯, স্মারক নাট্যপত্র বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ১৩৩।
১৩. রমন মহেশ্বরী (সম্পাদিত), 'গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা', ২০০২, ২৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩৫৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. কবিতা চক্রবর্তী, 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী', এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা।
২. জয়তী ঘোষ, 'বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রী সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা।
৩. দর্শন চৌধুরী, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা।

৪. ড. দিলীপ কুমার মিত্র, ‘ আধুনিক ভারতীয় নাটক’, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা।

পত্রিকা:

১. তীর্থঙ্কর চন্দ (সম্পাদিত), ‘নান্দীপট’, নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা।

২. ব্রাত্য বসু (সম্পাদিত), ‘ ব্রাত্যজন নাট্যপত্র’, জুন ২০১৫, সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা।

৩. রমন মহেশ্বরী (সম্পাদিত), ‘গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা’, ২০০২, ২৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, কলকাতা।

৪. রথীন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), নাট্যচিন্তা- নারীর অধিকার ও নির্যাতন, নভেম্বর ২০১১ এপ্রিল ২০১২, বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১-৬, কলকাতা।

৫. সঞ্জীব রায় (সম্পাদিত), ‘কথাকৃতি ৩ এগারো ১৩’’, ২০১৯, স্মারক নাট্যপত্র বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা।

৬. সত্য ভাদুড়ী (সম্পাদিত), ‘স্যাস’, ২০২০, ৩৩ সংখ্যা, কলকাতা।

কার্তিক লাহিড়ীর জীবন ও সাহিত্য : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

জয়দেব গরাই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : *বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক আছেন যাঁদের লেখার সঙ্গে আমরা নানা কারণে বিশেষ পরিচিত নই। কার্তিক লাহিড়ী (১৯৩২-২০১৮) এমনই একজন। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় নিছক গল্পের বর্ণনা তিনি করে চলেন না, গল্প আছে ঠিকই কিন্তু সেটিই প্রধান নয়। বরং তিনি যেন এক একটি সংরূপের নানা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতেই ভালোবাসেন। আর তার প্রয়োগ কৌশলেই তাঁর সৃষ্টি নিজস্ব এক ঘরানা গড়ে তোলে। তিনি তার চরিত্রের মধ্যে কখনো ব্যবহার করেন অতীতচারিতা আত্মকথন কখনও বা জটিল মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বুনন। তাঁর প্রায় দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যজীবনে সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, যুদ্ধ, মন্বন্তর থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলন, মধ্যবিত্ত্ব জীবনের নানা সমস্যা, বেকার সমস্যা, ফ্ল্যাট কালচার প্রভৃতি। তাঁর বিষয় গ্রহণের পরিধি অনেক, চোখে যা দেখেছেন তাই বাস্তবসম্মত করে পরিবেশন করেছেন। তবে, তিনি তাঁর লেখার প্রকরণগত দিকটিকে নিয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। বলা যেতে পারে এটি তাঁর লেখার প্রধান স্তম্ভ। আমরা তাঁর 'সৌভিক এবং শৌভিক', 'দশরথ নামে একজন', 'যদি', 'স্বেচ্ছামৃত্যু', প্রভৃতি উপন্যাসগুলি এবং 'উটপাখি', 'কাঁচামাংস', 'ভিক্ষা' প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রীতির প্রয়োগ কৌশলের দক্ষতাটি কেমন। বাংলা সাহিত্যে কার্তিক লাহিড়ীর রচনাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে অথচ তিনি এখনও অনালোচিত। আঙ্গিক নিয়ে তার যে এই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এক্ষেত্রে সেটা কী কোনো প্রভাব ফেলছে? নাকি তাঁর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আছে কোন কারণ? নাকি অন্যকিছু?*

সূচকশব্দ : *সাহিত্য জীবন, কথাসাহিত্য, আঙ্গিক, ভাষাশৈলী, মনস্তত্ত্ব, দেশকাল, বেকার সমস্যা।*

বাংলা সাহিত্যে কার্তিক লাহিড়ী (১৯৩২-২০১৮) প্রায় এক অপরিচিত নাম। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ক্লাস সিক্স অবধি পড়াশোনা করে তিনি চলে আসেন বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা শহরে। পাবনা থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪৯ সালে আই.এস.সি এবং ১৯৫১ সালে বি.এস.সি পাশ করেন। পাশ করার পরেই আবার বিহারে ফিরে এসে ১৯৫২ সালে ছাপরা শহরে রাজেন্দ্র কলেজে রসায়ন বিভাগে ডেমনস্ট্রেটর, তারপর জলপাইগুড়ি ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে (১৯৫২-১৯৬২) কাজ করেন। এই সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে বাংলায় এম.এ পাশ করেন এবং পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সুকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি' বিষয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ত্রিপুরার আগরতলা মহারাজ বীর বিক্রম কলেজে অধ্যাপক রুপে যোগদান করেন এবং সেখানেই ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন। এইসময় পর্বেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগরতলা কেন্দ্রে এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অতিথি অধ্যাপক রূপে বৃত ছিলেন।

ওপরের এতগুলো কথা বলার কারণ মূলত এই যে, তাঁর পড়াশোনা এবং কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের যাত্রাপথটিকেও চিনে নেওয়া, যা তাঁর লেখালেখির প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্যকে গড়ে তুলবে। যদিও আমরা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কম কথা জানাতে পেরেছি। কার্তিক লাহিড়ী তাঁর জীবন পথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, চিন - ভারত যুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান ও পতন, যুক্তফ্রন্ট থেকে বামফ্রন্টের ক্ষমতা অর্জন, সত্তর দশকের রক্তাক্ত নকশাল আন্দোলন, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, আবার সম্প্রতি বামফ্রন্ট থেকে বর্তমান সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ও জীবন-অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক কার্তিক লাহিড়ী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতটিকে তৈরি করতে সাহায্য করেছে। নিজের বিচার, বুদ্ধি, মনন, পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে গড়ে তুলেছেন এক স্বতন্ত্র সাহিত্যলোক, ব্যতিক্রমী কথনবিশ্ব।

(২)

তাঁর লেখালেখির তালিকা দীর্ঘ। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, ও অনুবাদক। তিনি ৩৫ টি উপন্যাস, ২০০টির বেশি ছোটোগল্প, ১৬ টি নাটক, ৭টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ২ টি অনুবাদ এবং একটি ইংরেজি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি' এবং 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস' বই দুটি বাংলা

উপন্যাসের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজন।তাঁর **১৬** টি নাটকের মধ্যে ৯ টি নাটক 'বহুরূপী' এবং বাকিগুলো 'নান্দীমুখ', 'গন্ধর্ব', 'প্রসেনিয়াম'এর মত স্বনামধন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বটুর জীবনে পিস্তল ও রিভলবার', নাটকটি কলাকুশলীর দ্বারা শিশির মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এছাড়াও গিরিশ মঞ্চ, অ্যাকাডেমিক হল প্রভৃতি নানা জায়গায় অভিনীত হয়েছে।

তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় ('পরিচয়', 'প্রসেনিয়াম', 'গোমতী' প্রভৃতি) প্রায় ষাট বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে লিখে গেছেন। তবে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। **১৯৫৮** সালে (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) 'পিলসুজ' গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ ঘটে (তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প ১৯৪৮/৪৯ সালে দৈনিক কিশোরে প্রকাশিত 'বন্দী' নামের একটি গল্প)। এরপর তিনি আজীবন এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতিত্বের দায়িত্বও পালন করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর 'অন্ধকূপ' উপন্যাসটির জন্য বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার পাওয়ার কথা উঠলেও তিনি ২০০৬ সালে 'শৌভিক এবং সৌভিক' উপন্যাসটির জন্য উক্ত পুরস্কারটি পান। কিন্তু তিনি কখনোই পুরস্কার বা বিপুল জনপ্রিয়তার আশায় লেখেন না। লেখার জন্যই লেখেন এবং সেটি তিনি ধর্মের মত পালন করেছেন।

যাঁর পরিচয় দানের এমন সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে অথচ তাঁকে আমরা আমাদের লেখার প্রথমেই বাংলা সাহিত্যে এক অপরিচিত নাম বলে উল্লেখ করেছি এবং একথা সত্য যে বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি এখনো অপরিচিতও। তাঁর এই অপরিচিতির কারণ হিসেবে আমরা দু-একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি।

এক. তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ কোন নামি প্রকাশনী থেকে বের হয়নি। তিনি চাইলেই হয়তো সে কাজ করতে পারতেন কিন্তু তিনি কখনোই কারোর দ্বারস্থ হন নি। তাঁর লেখালেখি এমন সব ছোট ছোট প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে, যেগুলো আজ অনেক উঠেই গেছে। বেশিরভাগ গ্রন্থেরই দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়নি।

দুই. বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ পাঠক আগ্রহী সুখপাঠ্য রচনায়, আর কার্তিক লাহিড়ী লেখেন সুক্ষ্মপাঠ্য রচনা। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য বলেছেন-

"কার্তিক লাহিড়ী এই জাতের ঔপন্যাসিক। বাস্তব সত্যের চেয়ে উপন্যাসের সত্যের প্রতিই তাঁর আগ্রহ" ।**১**

তিন. আঙ্গিক বা বিষয় নির্বাচনটিকেও কী অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে? কার্তিক লাহিড়ী কখনোই বইয়ের কাটতির কথা মনে করে লেখার বিষয় নির্বাচন করেননি। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে অন্যান্য লেখক যে বিষয়গুলি গ্রহণ করতে ভয় পান, কার্তিক লাহিড়ী সেই বিষয়গুলিকেই আপন করে সাজিয়ে নেন নিজের আঙ্গিকে। বাজার চলতি অর্থকরি লেখা তিনি অনায়াসেই লিখতে পারতেন কিন্তু সে পথ তিনি গ্রহণ করেননি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে লেখার কাজটিকে তিনি ধর্মের (বলাবাহুল্য, এখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না) মতো পালন করেছেন। গতানুগতিক প্রচলিত লেখকদের দলে তাঁকে ধরলে হবে না। তাঁর ঘরানা আলাদা এবং সেটি তাঁর নিজস্ব। তাঁর গল্পের বিষয় সাধারণ তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু সাজানোর পদ্ধতিটি আলাদা। তিনি যেন অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে যান। পাঠক খুব স্বস্তিতে তাঁর বিষয় আস্বাদন করতে পারেন না। কার্তিক লাহিড়ী নিজেই বলেছেন -

> "তাঁদের কাছে নিছক গল্প এবং গল্প বলাই হচ্ছে উপন্যাসের চরম ও পরম লক্ষ্য, তাই আজও পাঠকের কাছে উপন্যাস কাব্য ও নাটকের তুলনায় হেলাফেলার বস্তু, আজও উপন্যাস পাঠকের কাছে নিদ্রাকর্ষণের মহৌষধ রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকৃত শিল্প নিদ্রাহরণকারী, তার মর্মোদ্ধারের এর জন্য প্রয়োজন অভিনিবেশ।" ২

এটা একদমই সত্যি যে, কার্তিক লাহিড়ীর লেখা আস্বাদন করতে গেলে আমাদের বুদ্ধির দরজায় বারবার যাতায়াত করতে হয়, আর প্রয়োজন হয় বিশেষরূপে অভিনিবেশের। কেননা তিনি গল্পের উপর বিশেষ জোর দেননা, তার প্রায় কোন লেখাতেই আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত গল্প নেই। তাঁর লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুবই উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন বিশিষ্ট সমালোচক শ্রাবণী পাল -

> "নিতান্তই আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত নিটোল গল্প তিনি লেখেননি, পাত্র-পাত্রির হৃদয়বৃত্তান্ত তাঁর উপজীব্য নয় শুধু, বাস্তব প্রেক্ষাপটকে অগ্রাহ্য না করেও চরিত্রের অতীতচারিতা আত্মকথন স্বপ্ন ও বাস্তবতায় মেশানো এক অধিবাস্তব আবহ নির্মাণ, প্রায়শ যতিহীন প্রবাহ কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাসকে বিধিবদ্ধ উপন্যাস সীমার বাইরে নিয়ে গেছে।"৩

চার. তিনি দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে ছিলেন। সমালোচক শ্রাবণী পাল বলেছেন - "সেইসূত্রেই কি কলকাতার অ্যাভারেজ বাঙালি পাঠকের কাছে অনুপস্থিত? "৪

পরের অধ্যায়ে আমরা কার্তিক লাহিড়ীর দু-একটি টেক্সটকে সামনে রেখে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োগ নিয়ে দু-এক কথা বলার চেষ্টা করব।

(৩)

কার্তিক লাহিড়ী বলেছেন-

"শিল্পীর বিজয় সম্ভব এবং কেবলমাত্র সম্ভব বাস্তব জ্ঞান ও বোধের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতায়।"৫

এই বাস্তব জ্ঞানের গভীরতা তাঁর লেখালেখিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। তার প্রথম উপন্যাস 'দশরথ নামে একজন' ১৯৮২ সালে সারস্বত লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। ভাষা, রীতি ও বিষয় সব দিক থেকেই উপন্যাসটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। কার্তিক লাহিড়ীর অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মতোই এই উপন্যাসটিরও আয়তন খুবই কম। ছেষট্টি পাতার উপন্যাস। উপন্যাসটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত। দশরথ ছোটবেলায় বিহার ছেড়ে চলে এসেছিল। পাঁচ ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সে এখন যুগেন্দ্রনগরে বসবাস করে। এতদিন সে প্রায়ই জন্মভূমির কথা ভুলেই ছিল কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সি জনৈক বাবুটি (যাদের বাড়িতে দশরথ দুধ দেয়) বিহারের কথা জানতে চাইলে দশরথ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জন্মভূমিকে দেখার বাসনা তার চরম হয়ে ওঠে। বিহারের পথঘাট বিভিন্ন মানুষদের নানা কর্মের ক্ষীণ চিত্র তাকে যেন টানতে থাকে। সেখানে যাবার জন্য সে টাকা সঞ্চয় করে কিন্তু সেটিও তার নষ্ট হয়ে যায়। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকারের মধ্যেই সে বলতে থাকে, তার জন্য সোনার রথ এসেছে সে দেশে যাবে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দশরথ হয়তো স্বপ্নের আরেক দেশে গেল কিন্তু দেশে যাবার স্বপ্নটি অজান্তেই বুনে দিয়ে গেল তার ছেলের মধ্যে, তার ছেলেরও এখন সেখানে যেতে ইচ্ছে করে।

কার্তিক লাহিড়ী তাঁর এই প্রথম উপন্যাস থেকেই প্রকরণগত দিক নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তা করেছেন। উপন্যাসটিতে ভাষা ব্যবহারের দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসটিতে ছোট ছোট বাক্য বাঁদিক ঘেষে কবিতার মতো করে লেখা এবং সংলাপধর্মী। দশরথের মুখের ভাষাটিও ভিন্ন, সে যদিও সাধু ভাষায় কথা বলেছে তবুও লেখক হিন্দির সঙ্গে মিশ্রিত করে এক অভিনব ভাষা নির্মাণ করেছেন, আর এটা

জরুরিও ছিল কেননা দশরথ ছোটবেলাটি কাটিয়েছে বিহারেই। আবার তার ভাষাটি বাংলা বাক্যের পদক্রম মেনে হচ্ছেনা যেন। যেমন-

১. 'আমি বলি কথা সঙ্গে অনেক লোকের তাই পারিনা রাখিতে ভিতরে মনের' (পৃ. ১১)

২. 'দুই কি একদিন ভিতরে কি হপ্তা আমি যাইব কাছে আপনার দিতে রুপেয়া, কৃপয়া রাখিয়া দিন।'৬ (পৃ.৪৫)

কার্তিক লাহিড়ীর ভাষা প্রয়োগ কৌশল আলোচনা প্রসঙ্গে নীলিমা চক্রবর্তী বলেছেন -

> "একই লেখক প্রবন্ধ ছেড়ে যখন কথাসাহিত্য রচনা করেন তখন তাঁর ভাষা অন্য একটি রূপ পরিগ্রহণ করে। কথাসাহিত্যের প্রয়োজন অনুসারে ভাষা তার নিজস্ব পথ রচনা করতে করতে এগিয়ে চলে। ওপন্যাসিক কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাস এবং ছোটোগল্প ভাষাশৈলীর প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করেছে।" ৭

এই উপন্যাসটিতে প্রায় পরিচ্ছেদেই কোডের মধ্যে বিন্দু চিহ্ন (......) দিয়ে শূণ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন।৮ প্রথম পরিচ্ছেদেই আঠারো বার তবে ক্রমানুসারে বাবুটির সঙ্গে যতই কথাবার্তা বেড়েছে ততই এই শূন্য সংলাপ কমে এসেছে। পরে দু-একটি পরিচ্ছেদে আবার বেড়েওছে, তবে সেটি অন্য কারণে। উপন্যাসটি নিয়ে ওপরের এই ক্ষুদ্র আলোচনাতে আমরা বুঝতেই পারছি কার্তিক লাহিড়ীর প্রথম উপন্যাসটিই নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর 'যদি' উপন্যাসটি ১৪১১ সালে শারদ 'স্যন্দন' এ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির গঠন লক্ষ্য করার মতো। আকাশ হারিয়ে গেলে, তার বাবা অচ্যুতবাবু সেই করণীয় বিষয়ে ভাবতে থাকেন এবং কোন সূত্র পাবার আশায় বাড়িতে নানা নথিপত্র খুঁজতে খুঁজতে আকাশেরই আত্মজীবনীমূলক লেখার একগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। সেখানে আকাশ দিবাকরের বয়ানে নিজের কথা লিখে রেখেছে। আকাশ ভাবে -

"... এই মামুলী গল্প লোকে কেন পড়বে?

পড়তে পারে যদি মামুলি ছাঁচটা ভাঙ্গা যায়, গল্পের। আদলটা দুমড়ে-মুচড়ে যদি পাল্টে ফেলা যায়।" ৯

আবার আকাশ ভাবে-

"যেটুকু লেখা হয়েছে তার মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়? গল্পটা তাহলে মামুলি থাকবে না আর, পেয়ে যাবে নতুন মাত্রা।" ১০

এরপরেই গল্পের মধ্যে যদি ঢুকে পড়ায় গল্পের সম্ভাবনা নানা পথে চালিত হয়। আকাশের এই আত্মজীবনীর সাধারণ গল্পটি দশ রকম ভাবে উপস্থাপিত হয়। যেমন-

১. প্রকাশবাবু যদি ডাক্তার না হতেন?

২. দিবাকর যদি রুগ্ন না হত?

৩. দিবাকর যদি ছেলে না হত?

৪. মা যদি আগলে আগলে না রাখতেন?

৫. টাকু যদি না থাকত?

প্রভৃতি দশটি সম্ভাবনা উপন্যাসের গতিকে নানাভাবে চালিত করেছে। বিষয় এবং উপস্থাপনের দিকে থেকে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের দাবি রাখে। এইরকম ভাবেই কার্তিক লাহিড়ীর অন্যান্য উপন্যাসগুলি যেমন 'যুবক'(১৯৯০), 'শণি'(১৯৯২), 'কলকাতা সমুদ্র' (১৯৯৩), 'হাওয়ার রাত'(২০০৬) প্রভৃতি নানা কারণে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

কার্তিক লাহিড়ীর ছোটোগল্পগুলির মধ্যেও বিষয়বৈচিত্র্য অসামান্য। সমাজের নানা সমস্যার কথা তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে। সাংসারিক চিত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে লেখা 'জন্ম', 'জ্বালা', 'উজালা', 'জাগার রাত' প্রভৃতি গল্প। তিনি তাঁর গল্পে সমাজের সবচেয়ে যে ভয়ংকর সমস্যার কথা চিত্রিত করেছেন তা হল বেকারত্ব। 'উটপাখি' গল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা দেখি একজন চাকুরিজীবী ও একজন বেকার বন্ধুর মধ্যে পারস্পরিক মানসিক সংযোগ কিভাবে গড়ে ওঠেন। 'কাঁচামাংস' গল্পে দেখি পরমেশ বারবার ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি পেতে ব্যর্থ। বাড়িতে অভাব-অনটনের মধ্যেই হঠাৎ একটি চাকরির ইন্টারভিউতে সফল হয়। যে শহরে সে ইন্টারভিউ দিতে যায় সেখানের একটা হোটেলে থাকার সময় সেই শহরেরই একদল ছেলে পরমেশের রুমে ঢুকে পড়ে। তারা জানায় তারাও উচ্চডিগ্রিধারী অথচ বেকার। পরমেশ অন্য শহর থেকে তাদের ভাত মারার জন্য কেন এসেছে? এরপর তারা পরমেশকে উলঙ্গ করে শুরু করে মার, ধর্ষণ। গল্পটির মর্মান্তিক জায়গাটি হল হাসপাতালে জ্ঞান পাবার পর লজ্জিত অপমানিত বেকার পরমেশের মনে হয় -

"এত কাণ্ডের পর চাকরির অফারটা কি শেষমেশ আমি পাবো?" ১১

'ভিক্ষা' (১৯৯৬) ছোটোগল্পটি এবং 'স্বেচ্ছামৃত্যু' (আত্মহত্যার সময় নামে প্রকাশিত হয় প্রান্তিক শারদ সংখ্যায়, পরে উপন্যাসটি 'স্বেচ্ছামৃত্যু' নামে 'প্রতিভাস' থেকে 'দশটি উপন্যাস' সংকলনে স্থান পায়) উপন্যাসের বিষয় এক। 'ভিক্ষা' গল্পটিতে বেকার নিমাই তার বাবাকে এক শিশি ঘুমের বড়ি এনে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়ে যায়, মৃত্যুর জন্য। কেননা তার বাবার মৃত্যু হলে সে চাকরিটা পাবে। 'স্বেচ্ছামৃত্যু' উপন্যাসেও দেখি বাদল টিউশন পড়ায়। সে বারবার চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি পায়নি, শেষে সেও মরিয়া হয়ে এক শিশি ঘুমের ওষুধ এনে বাবাকে দিয়ে মৃত্যুর জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেয়। কেননা বাদলও বন্ধু সমরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জেনেছে যে, রিটায়ার করার আগেই মৃত্যু হলে বাবার চাকরি পাওয়া যায়। এরপর উপন্যাসটি বাদলের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। উপন্যাসের শেষে বাদলের বাবা তার না মরার কারণ হিসেবে বাদলের কাছে যা বলে তা মর্মান্তিক শোনায়-

> "আমি আত্মহত্যা করলাম আর আত্মহত্যাকারীর কেউ চাকরি পেতে পারেনা, নিয়ম না থাকলে তো আমার মরাটাই বৃথা হবে, তুমি চাকরি না পেলে..." ১২

বাদলের বাবার এই সংলাপ 'ভিক্ষা' গল্পের নিমাইয়ের বাবার যেন প্রতিধ্বনি। নিমাইয়ের বাবা জানায়-

> "তুমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলে বড়িগুলো মুখে পুরতে গিয়ে খটকা লাগল, এটা তো হবে আত্মহত্যা, আত্মহত্যায় মৃত্যু হলে কি বাবার জায়গায় ছেলে চাকরি পায়? নিয়ম জানিনা তাই ভাবছি নিয়মটা জেনেনি না কেন..."১৩

এই সমস্যাটির সঙ্গে আজ আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। আর কার্তিক লাহিড়ী আট-নয়ের দশক থেকেই এই বিষয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং লেখালেখিও করেছেন বিস্তর। ক্রমবর্ধমান সমস্যাটি শুধু যে চিহ্নিত করেছেন তাই নয়, নির্মম সমাজের বুকে কষাঘাতও করেছেন, উপরের উদাহরণগুলিই তার প্রমাণ। তার অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যেও কখনো যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকমার্কেট, ফ্ল্যাটকালচার প্রভৃতি নানা বিষয় উঠে এসেছে। এই কম পরিসরে সেইসব দিকগুলি নিয়ে বেশি কথা বলার অবকাশ আমাদের নেই। তবে তাঁর ছোটোগল্পগুলি যে বাংলা সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষুদ্র আলোচনাতেই তা বুঝতে পারছি।

(৪)

কার্তিক লাহিড়ী বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত, অনালোচিত সে বিষয়ে আমরা পূর্বেই বলেছি এবং কেন তিনি অপরিচিত সে বিষয়ে কিছু কারণের দিকে আলোকপাত করার চেষ্টাও করেছি। আমাদের আলোচনায় অন্তত এইটুকু বুঝতে পারছি যে বাংলা সাহিত্যে কার্তিক লাহিড়ী গুরুত্বহীন নন বরং তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন প্রবণতার দিককে সূচিত করতে পারে। বিশেষ কিছু পত্র-পত্রিকা ছাড়া তাঁর লেখালেখি নিয়ে প্রায় আলোচনায় হয়নি। কার্তিক লাহিড়ীর কোন লেখায় কোন স্তরেই পাঠ্যপুস্তকের তলিকায় নেই। কিন্তু সমালোচকমহলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও তাঁর লেখালেখিকে তুলে ধরা দরকার। 'এবং এই সময়' পত্রিকার সম্পাদক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কথা দিয়েই আমাদের লেখাটি শেষ করতে চাই-

> "বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক-অধ্যাপক-সমালোচকগণ ওঁর উপন্যাস-ছোটোগল্প পাঠক্রমে এনে চর্চা শুরু করুন, বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতা বাড়ুক।"১৪

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, 'শৌভিক বনাম সৌভিক', প্রবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), 'সংকেত', জানুয়ারি - মার্চ ২০১০, ২৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রতাপপুর(হুগলী), পৃ. ৫০।

২. কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', প্রতিভাস, অক্টোবর ২০১০, কলকাতা, পৃ .১১।

৩. শ্রাবণী পাল, 'কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাস ভাবনা', বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), 'পরিচয়', মার্চ - জুন ২০১৮, ৮৬ বর্ষ ৩ য় সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ১৬।

৪. তদেব, পৃ. ১৫।

৫. কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', প্রতিভাস, অক্টোবর ২০১০, কলকাতা, পৃ. ২৫।

৬. আমি এই উদাহরণ দুটি 'এবং এই সময়' পত্রিকায় লিখিত 'দশরথ নামে একজন: নব নিরীক্ষা' প্রবন্ধ থেকে নিয়েছি।

৭. নীলিমা চক্রবর্তী, 'কার্তিক লাহিড়ীর ভাষা প্রয়োগ কৌশল', অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'এবং এই সময়', ১৪১৯, অষ্টাবিংশ বর্ষ ৯৭ তম গ্রীষ্ম সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৪০।

৮. লিপিকা সাহা 'এবং এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দশরথ নামে একজন: নব নিরীক্ষা' প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

৯. কার্তিক লাহিড়ী, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৩২৩।

১০. তদেব, পৃ. ৩২৪।

১১. কার্তিক লাহিড়ী, 'গল্পসমগ্র-১', অক্ষর পাবলিকেশনস, জানুয়ারি ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ১৮৬।

১২. কার্তিক লাহিড়ী, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৫৫।

১৩. কার্তিক লাহিড়ী, 'গল্পসমগ্র-১', অক্ষর পাবলিকেশনস, জানুয়ারি ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ৪৭৯।

১৪. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা অংশ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'এবং এই সময়', ১৪১৯, অষ্টাবিংশ বর্ষ ৯৭ তম গ্রীষ্ম সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. গ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অলোক রায়, ''সাহিত্য একনজরে', কারুকথা, ২০১২, কলকাতা।

২. অলোক রায় (সম্পাদিত), 'সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, মার্চ ২০১৫, কলকাতা।

৩. অলোক রায়, 'ছোটোগল্পে স্বদেশ সজন', অক্ষর প্রকাশনী, মে ২০১০, কলকাতা।

৪. কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', প্রতিভাস, অক্টোবর ২০১০, কলকাতা।

৫. কার্তিক লাহিড়ী, 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি', প্রতিভাস, জানুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা।

৬. বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০২০, কলকাতা।

৭. বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪, কলকাতা।

৮. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ‘ ন্যারেটলজি : ছোটোগল্প : ছোটোদের গল্প’, কোরক, জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা।

পত্রিকা :

১. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ‘এবং এই সময়’, ১৪১৯, অষ্টাবিংশ বর্ষ ৯৭ তম গ্রীষ্ম সংখ্যা, কলকাতা।

২. প্রবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ‘সংকেত’, জানুয়ারি - মার্চ ২০১০, ২৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রতাপপুর (হুগলী)।

৩. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ‘পরিচয়’, মার্চ - জুন ২০১৮, ৮৬ বর্ষ ৩ য় সংখ্যা, কলকাতা।

কোচ রাজবংশী সমাজের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ নজর কাটা

কৃষ্ণ কান্ত রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়
ধুবরী, আসাম

সারসংক্ষেপ (Abstract) : *বিভিন্ন স্তর-উপস্তরের বহুধা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সভ্যতায় এল কৃষি স্তর। বলা যায় কৃষি আবিষ্কার মানুষের জীবন চর্যার মধ্যে এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশেষ করে ধর্মবিশ্বাস, দেব-ভাবনা, সামাজিক বিধি, রীতি, সংস্কার, বিশ্বাসগুলি আরোপিত হয়। এই বিবর্তন ধারারই বহমান স্বাক্ষর কোচ রাজবংশী নজর কাটা। যেখানে জাদুবিদ্যা ও সংস্কার বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যা কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।*

সূচক শব্দ (Key Word) : *নজর কাটা, ভোতা, লাউয়ের বস, মাটির হাড়ি, ছেপুয়ান, হাউ, ছপর কাটা, বরমা, ভসস, ঝাড়ফুঁক, লোকমন্ত্র।*

মূল আলোচনা (DISCUSSION)

কোচ রাজবংশী সংস্কৃতি ক্রমশ পরিবর্তন হয়ে চলছে। তবে পরিবর্তনতার মধ্যেও এখনও সবকিছু যে হারিয়ে গেছে এমন বলা যায় না। এখনও প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সংস্কৃতির নানা পরিসর। তাই দেখা যায় গ্রামীন মানুষেরা পরম স্নেহে আগলে রেখে লালন পালন করে চলেছে লোকায়নের নানা মাত্রা। বিশ্বায়ন ও মিশ্র সংস্কৃতির ঘুর্নাবর্তে কোচ রাজবংশী সমাজের সস্কৃতি হোচট খাচ্ছে অনবরত । নিজস্ব পরিসরে আবদ্ধ থাকতে পারছে না। তবে থাকাটাও সম্ভব নয়। কেননা যুগ ও সময়ের চাহিদা ঢুকে যায় লোকায়নের অন্দরমহলে। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। প্রতিনিয়ত নানা ঘাত প্রতিঘাত চলছে, তবে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে আসে নিজস্ব নিয়মে।

কোচ রাজবংশী সমাজ কৃষির সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। কৃষি উৎপাদিত ফসলই তাদের জীবনের ধারক বাহক। কাজেই কৃষি উৎপাদিত ফসল কিসে ভালো হবে তার প্রতি সবসময় সজাগ থাকেন । একারনেই নানা রকম পুজা-পার্বণ , বিশ্বাস ও সংস্কার পালন করে। ভুমি পুজা, গরু পুজা, গচিপুনা, ভোগ, গারাম পুজার মতো বিভিন্ন ধরনের পূজা করেন। হার ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসল কারো কু-নজরে বা কোনো

অনিষ্টকারী প্রানী নষ্ট করতে না পারে সে কারনে শস্য খেতের মাঝখানে ভোতা বা নজরকাটা গাড়েন । তাদের বিশ্বাস পরিশমের ফসল যেন কার লোভ লালসায় নষ্ট না হয়। নজরকাটা জমির ফসলের পাহাড়াদার। এই নজরকাটাকে নিয়েই নানা রকম বিশ্বাস আচার সংস্কার গড়ে উঠেছে যা আজ বিলুপ্তপ্রায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় "নজর' শব্দটির বিভিন্ন প্রতিশব্দ (দৃষ্টি, মনযোগ, লক্ষ্য ইত্যাদি) অভিধানে থাকলেও লোকসমাজে এই শব্দতি বিষেশ তাৎপর্যপুর্ণ। সাধারন্যে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, অনেক ব্যক্তি, অপদেবতা ইত্যাদি দৃষ্টি অমঙ্গলজনক। এই দৃষ্টি কোন শিশু, ব্যক্তি, পরিবার প্রভৃতির উপর পতিত হলে অনিষ্ট অনিবার্য। অনিষ্টকারী, অমঙ্গল এই কু-দৃষ্টির নজর লাগা, নজর নামে পরিচিত। বস্তুত পক্ষে এই নজর একপ্রকার লোকবিশ্বাস যার মূল আদিম জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ধারনার মধ্যে প্রথিত।"[১]

নজরকাটা সৃষ্টির নেপথ্যে আছে মানুষের কল্প ভাবনা । দেখা যায় ইশ্বর, দেব-দেবী বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে কোন আস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না। তখনই জড়বাদী উপাসনায় নিয়ে এলেন রাক্ষস মুখধারী নজর কাটাকে । কেননা বিকট বা অসুর মুর্তির অনুরূপ ক্ষেত্রে ফসলে থাকলে সব বিপদ – আপদ কেটে যাবে। এরই প্রতিরূপ দেখা যায় যে কোন ফলন্ত গাছে কিছুনা কিছু পুরনো জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে গাছের ফসলে নজর না গিয়ে ঝোলানো জিনিসে যায়। ছোটো ছেলেমেয়েদের কপালে কালো টিপ, পায়ে কালো সুতা পড়ানো হয় এই বিশ্বাসে।

সাধারনত শীতকালীন ফসলের মধ্যে নজর কাটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। বিশেষ করে পটল, বেগুন, লংকা, মাসকালাই, তামাক ক্ষেতেই নজরকাটা রাখার রীতি দেখা যায়। তবে অনেক সময় ধানের জমিতেও এই রীতি দেখা যায়। বিভিন্ন ফসলের বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন । কেননা এই ফসলের মধ্যেই নজর কাটার বিশেষ ভুমিকা বিদ্যমান।

পটল চাষ :-

দুর্গা পূজার দশমি তিথিতে 'হালযাত্রা' অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হলেই শুরু হয় জমিতে হাল-চাষ । পটল চাষের জমিতে চার চাষ ও মৈ দিতেই হবে। সমতল জমির ৮ থেকে ১০ হাত দূরে দূরে মাটি সামান্য উঁচু করে চার পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্য তিন চারটে পটলের লতি পুতে গোবর মেশানো মাটি দেওয়া হয়। দশ-পনরোদিন পর দেখা যাবে সে স্থান থেকে চারা গাছ বেড়িয়েছে। এমন সময় সমস্ত জমিতে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। কেননা এই খড়ের উপর পটলের ফুল ও ফল ধরবে ও ডালো থাকবে। খড় না দিলে মাটির স্পর্শে

যেমন ফুল নষ্ট হয়ে যাবে, তেমনি ফলও পচে যাবে। খড়ের উপরেই পটলের চাষ হয় বলে একে মাটিয়া পটল বলে। আবার দেখা যায় পটলের গাছের উপর বাঁশের জাংলা পেতে রাখার পর পটল গাছের সঙ্গে একটি বাঁশের অংশ জড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে করে পটল গাছ বাঁশের অংশকে জড়িয়ে জাংলায় উঠতে পারে। জাংলার উৎপন্ন পটলকে বলা হয় জাঙ্গিয়া পটল।

বেগুন চাষ :-

বেগুনের চারা গাছ জমিতে লাগানোর পূর্বে চারাগাছ তৈরী করতে হয়। যেকোন উঁচু খোলা স্থানের মাটি ভালোমতো গোবর সার দিয়ে মিহি করে তৈরী করা হয় । তৈরী হলে বেগুনের বীজ চিটিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে সমান করে খড় বা কলাপাতার উপরে দেয়। দেখা যাবে কয়েকদিন পর বেগুনের বীজ থেকে ছোটো চারাগাছ গজিয়ে উঠেছে । তৎখানাত উপরে রাখা খড় বা কলা পাতা সরিয়ে দেওয়া হয়। সদ্য চারাগাছ হওয়া-বাতাস পেয়ে ক্রমশ বড় হয়ে উঠে। মোটামুটি চার পাচ ইঞ্চি লম্বা হলেই চাষের যোগ্য জমিতে এক থেকে দুই হাত ফাঁকে চারা রোপন করা হয়। এভাবেই বেগুন গাছ বড়ো হয়ে ফুল ও ফল ধরে।

রাজবংশী ভাষায় বেগুনের নানারকম নাম পাওয়া যায়—

ক) লম্বা বাইগন — আকারে মাঝারি ধরনের।
খ) সইলতা বাইগন — চিকন দেখতে সলতের মত, ভাজা খুবই স্বাদযুক্ত।
গ) ঢোপা বাইগন — গোল ও মোটা।
ঘ) ঢ্যাপা বাইগন — আকারে মোটা ও লম্বা।
ঙ) আকাশী বাইগন — আকারে মোটা ও নীল ।
চ) ধওলা বাইগন — আকারে মাঝারি ও রং সাদা।

লঙ্কা চাষ :-

সাধারণত আশ্বিন কার্তিক লঙ্কা চাষের সময়। লঙ্কা বীজ প্রথমে একখণ্ড জমিতে ভালোরকম তৈরী করে গোবর সার মিশিয়ে বীজ ফেলানো হয়। বীজ ফেলানোর পর পরেই খড় বা কলাপাতা দিয়ে ঢাকা হয়। কদিন পর বীজ থেকে ছোট চারাগাছ বেড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খড় বা কলাপাতা আলাদা জায়গায় রাখে। জল, আলো, বাতাস পেয়ে চারা গাছ বড়ো হয়ে ওঠে। এর পর পর উপযুক্ত জমিতে সারিবদ্ধ ভাবে গাছ লাগানো হয়। ক্রমশ বড়ো হলে ফুল ও ফল ধরে।

রাজবংশী ভাষায় লংকার নানারকম নাম----

ক) বিন্দি মরিচ — খুব ছোট ও সাদা, ঝাল খুব বেশি।

খ) কাজলি মরিচ — কালো ও মোটা।

গ) আকাশী মরিচ — লম্বা ও নীল রঙের হয়।

ঘ) নুনিয়া মরিচ — মোটা ও রং সবুজ ।

ঙ) টেপরাই মরিচ — গোল, অত্যাধিক ঝাল।

চ) কাঙরা মরিচ — দেখতে অনেকটা আপেলের মত অত্যাধিক ঝাল।

ছ) ঢোপা মরিচ — হাল্কা, সবুজ ও মোটা।

তামাক চাষ :-

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় প্রাচীন কাল থেকে কোচবিহারব জেলা ও সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার প্রচুর পরিমানে তামাক চাষ হত। তামাক চাষ সাধারণত শীতকালীন ফসল । তামাকের জমিতে লাগানোর পূর্বে বাড়ির কাছাকাছি সামান্য উচু স্থানে মাটি ও গোবর মিশিয়ে ভালোমত তৈরী করে নিয়ে সেই স্থানে তামাকের বীজ দেওয়া হয়। বীজ থেকে ক্রমশ চারা গাছ বড়ো হতে থাকে। চারা গাছ লাগানোর পূর্বে চাষের জমি ভালমতো চাষ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ—

মুলার ভুওই ধুলা

তাঙ্কুর ভুই তুলা।

অর্থাৎ মুলা চাষ যোগ্য জমি কর্ষণ করে ধুলার মত করতে হয়, তাহলে মুলা ভালো হয়। ঠিক তেমনি তামাক চাষ করতে গেলে জমিটিকে অতি যত্নকরে তুলার মত নরম করতে হবে, তবেই ভালো তামাক পাতা পাওয়া যাবে। এই তুলা যোগ্য জমিতে তামাকের চারা রোপনের পূর্বে গচি পুনা পর্বটি পালন করতে হয়। পর্বটিতে পুজার উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন— তামাকের চারা, কলা পাতা, ডাটা সহ বড় আকৃতির মান কচুর পাত, কাচাগুয়া, পান, চুন, সিদুর, কাজল, মাটির প্রদীপ, ধুপ, ধুনা,প্রভৃতি। ঐদিন প্রতিবেশী কৃষকদের আমন্ত্রন জানিয়ে পর্বটি শুরু হয়। জমির মাঝখানে বা যেকোন কোনে মানকচুর পাতা ডাটা সমেত পুতে নীচে বেদী তৈরী করে পুজার্চনা শুরু করে। বেদীতে কলার পাতে পান, চুন, কাচা গুয়া রাখেন। গৃহকর্তা মানকচুর ডাটাটিতে সিদুরের পাঁচ বা সাত ফোটা ও কাজলের ফোটা দেবেন। ধুপ-ধুনা জ্বালিয়ে চারা রোপন করার সময় গৃহকর্তা প্রণাম করে অধিক ফসল ও ভালো হওয়ার জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করে— “ডালে ডালে থুইস মা। তোর হাতত তামান সপে দিনু। কিষ্যিখান রক্ষা করিস।” এই দেবী আসলে ধরিত্রী বা মাতৃ দেবী। তিনি সব । পুজা শেষে উপস্থিত

সকলকে গুয়া, পান, চুন মুখে দিয়ে চিবতে চিবতে ডপডপে লাল রঙ্গের প্রথম পিকটি মানকচুর পাতার উপর ফেলবেন। এইভাবে মানকচুর পাতা লাল টকটকে শুকনো তামাক পাতার রং ধারণ করবে। তাদের বিশ্বাস— বিরাট আকৃতির মানকচুর পাতা অর্থে উৎপাদিত তামাক পাতা মানকচু পাতার মত আকৃতি ও পিকের বাদামী রঙের মত তামাক পাতা হবে । প্রতিটি তামাকে চাষের জমিতে নজর কাটা বা ভুতি স্থাপন করা হয়। তামাক পাতার কচি ডাটি গুলি ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়। ক্রমশ পাতা পুরু হলে ডাটি সহ কেটে ক্ষেতেই শুকাতে হয়। পাতা শুকিয়ে গেলে ৮-১০ টি পাতা বাঁশের তেমাল দিয়ে ডাটিতে বেঁধে ঘরে এনে নরম হলে পর পর গুচিয়ে রাখে।

তামাকের বিভিন্ন নাম—

১। মতিহার (Matihar):-

ক) তাঙ্গুয়া (Taongua) — সরু ও হাল্কা পাতা ।

খ) কবিয়া (Kobia) — বড়ো ও সরু পাতা ।

গ) বিলাতি (Bilati) — মধ্যমানের পাতা।

২) দেশি তামাক :-

ক) হামুক (Hamuk) — বড় পাতা যুক্ত।

খ) তামাকু (Tamaku বা Tanku)— ভাড়ি ছোট পাতা যুক্ত।

কোচ রাজবংশী সমাজে স্থানুযায়ী নজরকাটার বিভিন্ন নাম :-

নজরকাটা সংস্কৃতি কোচ রাজবংশী সমাজের সম্পদ । বিকট মূর্ত্তির অবয়ব তাদের কাছে শ্রেয়। একারণে মাশান দেবতাকে তারা পরম স্নেহে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। আসলে জীবন-জীবিকার তাগিদে সুন্দর ও অসুন্দর গ্রহন করে অনায়েসে। জাদুবিশ্বাস অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ভাবে প্রতিপালন করে। নজরকাটার নানারকম নামকরণ পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তার 'দি রাজবংশী অফ নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন—

"A scare crow is called ATSABHUA (আচাভুয়া) and BHUTI (ভুতি) in Rajpur Nozorkata in Jalpaiguri and Tarai."[২]

জেলার নামের তালিকা :-

জেলার নাম	নাম
জলপাইগুড়ি	নজরকাটা
কোচবিহার	ভোতা, নজর কাটা
দার্জিলিং	হাউ, ভুতি, নজরকাটা

মালদা	ভুতিয়া
উত্তর দিনাজপুর	ডুগুচখা, ভুতি
কোকরাঝার	ভোতা
ধুবুরী	ঝোটা
দরং জেলা	ছোঁ

নজরকাটা–ভোতা শব্দের অর্থগত দিক :-

'নজরকাটা' স্থান ভেদে নানারকম নামে পরিচিত। আবার 'নজরকাটা বা ভোতা' অর্থগত দিকও নানা মাত্রার। তাই কোথাও ভোতা অর্থে ভুত আবার কোথাও বা পাহাড়াদার।

ভোতা :— ভোতা শব্দের অর্থ ভুত।

নজরকাটা :— যার দ্বারা কুনজর বা খারাপ দৃষ্টি বিনষ্ট হয়।

হাউ :— 'হাউ' শব্দ রাজবংশী ভাষায় বাঘ অর্থে প্রচলিত। সোনারায়ের গানে 'হাউ' অর্থে বাঘ বলা হয়েছে । আবার শিশুদের ভয় দেখাতে ছড়া কেটে বলা হয়— "না কান্দিস না কান্দিস মাই হাউ আসিবে"। কাজেই হাউ অর্থে ভয়ার্ত কিছু যা দেখে মানুষ চমকে ওঠে।

ভুতি :- ভুতি অর্থে ভুত।

ভুতিয়া :- ভুতিয়া অর্থে ভুত।

ছেপুয়ান :- দাড়োয়ান বা পাহাড়াদার।

ডুগুচখা :- 'ডুগু' শব্দের অর্থ মাটির হাড়ি, (মাটির ছোট হাড়িকে ডোগা বলা হয়) চখা অর্থে চোখ।

কাকতাড়ুয়া :- কাককে যে তাড়ায়।

ছোঁ :- ছোঁ অর্থ দেখা। তার প্রতি যাতে আকর্ষণ তৈরী হয়।

ঝোটা :-

নজরকাটা বা ভোতা তৈরীর উপকরণ :-

ভোতা ভুত হোক আর বড়ো চোখ সবেই হোক না কেন তার একটি আকৃতি আছে। আকৃতির রূপ তার বৈশিষ্ট্য । ভোতা তৈরি হয় নানারকম উপকরণ দিয়ে। যেমন—বাঁশ, দড়ি, পাঠকাঠি, খড়, লাউয়ের বস, মাটির হাড়ি, চুন, খড়িমাটি, ছেড়া জামা, গামছা, বাঁশের তৈরী ধনুক, কাটের দা, বাঁশের তৈরি ভাঙা ডেলি, হাড়ির কালো কালি, চাউ গাছের ডাল, শুকনো লংকা, ময়না গাছের কাটা ইত্যাদি।

নজরকাটা বা ভোতা নির্মাণ পদ্ধতি :-

পাঁচ-সাত ফুট লম্বা বাঁশের অংশ পরিস্কার করে তার মাথার অংশে তিন-চার ফুট লম্বা বাঁশের টুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় যা দেখতে অনেকটা '+' আকৃতির মত হয়। পুরনো মাটির হাড়ি বা লাউয়ের বসের মধ্যে কাজল লেপে তার উপর চুন বা খড়ি মাটি দিয়ে বড়ো চোখ , দাঁত আঁকেন যা দেখতে অনেকতা অশুর বা দানব প্রকৃতির । তৈরী করা মাথাটি বাঁশের মাথায় বসিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীর খড় দিয়ে সাজিয়ে ছেড়া জামা, পেন্ট গামছা পড়িয়ে ক্ষেতের ফসলের মাঝখানে গাড়ে। অনেকে ভোতার দুই হাতে মৃত গরুর মাথা, হাড় ঝুলিয়ে দেয়। তবে স্থান ভেদে ভোতার মাথা নির্মানের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

নজরকাটা বা ভোতা স্থাপন :-

ক্ষেতের ফসলের ভোতা স্থাপনের সময় কাল সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির কর্তা একটি পাত্রে বাতাসা, কলা, ধুপ, মাটির প্রদীপ সঙ্গে নিয়ে ফসলের মাঝখান যান। তৈরী করা ভোতা ফসলের মাঝখানে মাটিতে গর্ত করে ভোতা স্থাপন করেন। আবার অনেকে তৈরী করা ভোতা গাড়া বাঁশ দণ্ডে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেন এবং এক নিঃশ্বাসে তিনবার মন্ত্র বলতে থাকেন—

"জাগিসরে জাগিস
যেই কামের কাম
সেই কামতে নাগিস"।[৩]

স্থাপিত ভোতার নীচে কলাপাতায় বাতাসা, কলা প্রসাদ হিসাবে দিয়ে ধুপ-ধুনা জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাভাবে পুজা করে। কালী পুজার সন্ধ্যাবেলা ভোতা স্থাপনের কারণ হিসাবে বলা যায়। কোচ রাজবংশীরা ঐ দিনটিকে যাত্রার দিন হিসাবেও মনে করেন । ঘোর আমাবস্যা ও সংক্রান্তির দিন ভোতা স্থাপন করলে ভোতা জাগ্রত থাকবে। তাছাড়া ভোতা অর্থে ভুত। অন্য অপদেবতার সঙ্গে এক সখ্য ভাব রচিত হয় যা অপদেবতা ভোতার মধ্যে ভর করে। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় ভোতা দেখে ছোট বাচ্চারা চমকে উঠে, ভয় পেলে জ্বর হয় এবং ভুত ধরেছে বলে বলা হয়। ওঝা ডেকে এনে ঝাড়ফুক করে দিলেই তবেই সুস্থ হয়। শুধু ছোটরাই নয় বড়োরাও ভয় পায়। একারণে যে কোনো গর্ভবতী নারী, অসুচ ব্যক্তিদের ভোতার কাছে যাওয়া নিষেধ। ভোতা দেখে ভয় পেলে প্রেতাত্মা ব্যক্তির উপর ভর করে নানা রকম ক্ষতি করে।

নজর কাটা ভোতাকেন্দ্রিক প্রবাদ :-

১। খেড়ের ভোতাটা (অকাজের- যার দ্বারা কোন কাজ হয় না)

২। নাগলে ছপর কাটা নিনাগলে ফকির৪ : (ভোতার আর্শীবাদে যদি ফসল ভালো হয় তাহলে ঘরের অভাব থাকবে না । আর কোন কারণে যদি ভোতার অভিশাপ পরে তাহলে ফকির করে দিবে। একারনে ভোতা স্থাপন কালে তাকে অতিশ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করতে হয়)

৩। মরুচবাড়ীর ভোতা অকামের কথা :- (হিষ্ট পিষ্ট চেহারার মানুষ কিন্তু কোন কাজ করতে পারে না । শুধু মাত্র দেখান ধারী)

৪। নজরকাটার মত খাড়া হয়া না থাকিস কাম কর :- (স্থির ভাবে থাকে, কাজের জন্য সচলতা প্রয়োজন । স্থির বা চুপচাপ থাকলে কোনো কাজেই হয় না)

৫। কাকতাড়ুয়ার মুখ :- (কৎসিত, কার মুখমণ্ডল খারাপ হলে এমন বলা হয়)

নজর কাটা বা ভোতাকেন্দ্রিক লোকাচার ও সংস্কার :-

১। শস্যক্ষেতে ভোতা অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। না হলে মানুষের কুনজরে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাবে এই বিশ্বাস এখনও চলে আসছে কৃষিজীবি সমাজে।

২। ক্ষেতের ফসল কোন কারণে যদি নষ্ট হতে থাকে তাহলে মৃত গরুর মাথা লাঠির উপর রেখে ক্ষেতের মাঝখানে স্থাপন করে। বিশ্বাস এটি স্থাপন করলে ক্ষেতের ফসলের পতন রোধ হবে এবং ফসল আবার ক্ষেতে ভরে যাবে।

৩। কোন কারনে যদি জমিতে ফসল বা আবাদ করা যাচ্ছে না। যদিও করা হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তখন ওঝা বা গুনিন এসে মন্ত্র পাঠ করে ঝাড়ফুক করলে আশু সমাধাণ ঘটে। এমন সময় গুনিন মৃত কুকুরের মাথায় পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা দিয়ে তার মধ্যে লজ্জাবতী গাছের শিকড়, পেঁপে গাছের শিকড়, তিতকরলার পাতা একত্রে জমির আলের মধ্যে পুতে দেয় এবং এক নিঃশ্বাসে নীচের মন্ত্রটি পাঠ করে—

“বরমা আসলে বিসন খায়
যা ছ্যা জড়ি বটি
সব ভসস হয়া যা।”

তাদের বিশ্বাস যে অনেকে শত্রুতা করে জমিতে নানামতন জড়িবটি পুতে রেখে ক্ষেতের ফসল উৎপাদনে বাধা দেয়। একারনে ফসল ভালো হয় না, যদিও বা হয় তা

অঙ্কুরে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই মন্ত্র পাঠ করলে জমিতে থাকা সব অনিষ্ট জড়িবটি নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। ভোতা শনিবার, মঙ্গলবার আমাবস্যা-পুর্ণিমার দিনেই স্থাপন করার বিশ্বাস আছে । এই দিনগুলি চোখা বা চড়া হয়। ভোতাও যাতে চোখা বা চড়া হয় সমস্ত অপ-আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে।

৫। ইঁদুর ও অন্যান্য জীবজন্তু ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। এই ভোতা নজর কাটার উপর প্যাঁচা বসে ইঁদুর ও অন্যান্য প্রানীকে মেরে ফেলে ফসল রক্ষা করে।

৬। ক্ষেতের ফসলে ভোতার ছবি থাকলে রাতে চোর চুরি করতে পারে না। চোরও ভয় করে যদি ভুত ভরকারী নজর কাটা যদি থাকে ধরে তাহলে তার ঘোর বিপদ ঘটবে।

কোচ রাজবংশী সমাজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করে সোনার ফসল। এই ফসলেই তাদের বেঁচে থাকার রসদ। কাজেই জমির ফসলের প্রতি আলাদা সমত্ববোধ থাকে। এই ফসলই যদি কারো কু-নজরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে ভাবনা চিন্তায় অকুল সাগরে বিদ্যমান। কাজেই তাদের মনন ও চিন্তনে এমন একজন বিকটমুর্তির কল্পনা যে ঝড়-বৃষ্টি, খড়া, শীত মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফসল রক্ষা করবে। নজর কাটাকে এক অশরীরী আত্মা হিসাবে গ্রহন করে যার মধ্যে রয়েছে জাদুক্রিয়া। একসময় নজর কাটা গ্রাম থেকে গ্রামে ক্ষেতের ফসলে দেখা যেত, কিন্তু বর্তমানে তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কোথাও হয়ত ঐতিহ্যকে ঠিক রাখতে কিছু একটা দিয়ে রাখে। অথচ এই নজর কাটাকে কেন্দ্র করে লোকপ্রবাদ, লোকমন্ত্র, লোকবিশ্বাস, লোককথা মানুষের মুখে মুখে গাঁথা ছিল। বিশ্বায়নের ডামাডোলে ঐতিহ্যের নজর কাটা আজ লুপ্ত। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের দায়িত্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা।

তথ্যসুত্র :

১. চক্রবর্তী, বরুন কুমার : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির কোষ', পুনমুদ্রণ, ২০০৫, পৃ- ২৫২

২. Sanyal, Charu Chandra : 'The Rajbanshi Of North Bengal', Assiatic Society page- 55

৩. সাহা, সমিত কুমার : 'উত্তরবঙ্গের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি', ২০০৬, পৃ- ৯৬

৪. সাহা, সমিত কুমার : প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৬

তথ্যদাতা :

লক্ষন বর্মন (৪৭), খইলসালী, কোকরাঝার, তাং- ১০/০৫/২০১৬

রঘুনাথ চৌধুরী (৫৬), ফুটকীবাড়ী, ধুবুরী, তাং- ২০/০৪/২০১৬

বিজয় রায় (৫১), সোনাময়ী, ধুবুরী, তাং- ১৫/০৭/২০১৭

কমলেশ সরকার (৬০), কদমতলা, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, তাং -২০/০৭/২০১৮

বিলেশ্বর রায় (৫৮), প্রমোদনগর , জেলা – আলিপুরদুয়ার, তাং – ১৮/০৭/২০১৬

নগেন্দ্র নাথ রায় (৬৫), শিবমন্দির, দার্জিলিং, তাং-২৫/০৭/২০১৬

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ : *পঞ্চাশের মন্বন্তর কেন্দ্রিক উপন্যাসের জগতে তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর মূলত রাঢ় দেশের রূপকার হলেও এই উপন্যাসে আঞ্চলিকতার কোনো নাম-গন্ধ নেই। এই উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের চলিত বাংলার হাতে খড়ি। একদিকে সাহিত্য জীবন ও অন্যদিকে বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় তুলে ধরার জন্য 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি তারাশঙ্করের রচনাবলীতে একটি ঐতিহাসিক দলিল। কানাই ও নীলার প্রেমসম্পর্কের মাঝে মন্বন্তরকে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। তবু মন্বন্তরের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে পারিবারিক জীবন সমস্যা। তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে লেখক তুলে ধরলেও সতর্কতার সঙ্গে বাদ দিয়েছেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে। এই উপন্যাস মূলত নায়ক প্রধান। কানাইয়ের চোখে ধরা পড়েছে মন্বন্তরের ফলে মানুষের নগ্নতা। সেই নগ্নতার ছবি কানাই পরিবারে প্রথম দেখেছিলো। এরপর তা ব্যপ্ত হয়েছে সমাজে। কানাই দেখেছে চোরাবাজারের ব্যবসা করে সমাজের কতিপয় মানুষ একদিকে যেমন ধনী হচ্ছে, তেমনি খাদ্যাভাবে মানুষ বেশ্যাবৃত্তি করতেও বাধ্য হচ্ছে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের এই মন্বন্তরের ফলে সমাজে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছিলো, লেখক তা তুলে ধরেছেন। খাদ্যাভাবে পরিবার জীবন কীভাবে ভেঙে যাচ্ছিলো, তা তারাশঙ্কর দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। মন্বন্তর কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় লেখকরা দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন। মন্বন্তরের সমস্যাকে দুইভাবে উপস্থাপন করেছেন সাহিত্যিকেরা। মূল আলোচনায় আমরা তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।*

বীজ শব্দ : *মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কালোবাজার।*

মূল আলোচনা :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রধানত রাঢ়ের রূপকার বলেই অধিক পরিচিত। কল্লোলের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তিনি অন্যান্য লেখকদের মতো নাগরিক লেখক

নন। তিনি তার রচনায় রাঢ় বাংলার গ্রামের জীবনকে তুলে ধরেছেন। তবে এক্ষেত্রে তার 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি ব্যতিক্রমী রচনা। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কলকাতা শহরকে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে এই উপন্যাসেই প্রথম তারাশঙ্কর চলিত গদ্য ভাষার ব্যবহার করেছেন।[১] এই উপন্যাসের পূর্বেই তিনি 'গণদেবতা' উপন্যাস লিখেছেন। আর এই উপন্যাসের পরেই লিখেছেন 'কবি' উপন্যাস। অর্থাৎ দুটি আঞ্চলিক উপন্যাসের মাঝে রচনা করেছেন একটি শহরকেন্দ্রিক উপন্যাস। লেখকদের সমাজের প্রতি যে একটি দায়বদ্ধতা থাকে, সেই দায়বদ্ধতা থেকেই যেন 'মন্বন্তর' উপন্যাসটির সূচনা।

ভারতবর্ষে বহুবার মন্বন্তর দেখা দিয়েছে। এরমধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রায় সকলেরই জানা। এছাড়াও যে মন্বন্তর ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো, তা হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সংঘটিত এই মন্বন্তর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে অধিক পরিচিত। এই মন্বন্তরে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। গবেষক অভিজিৎ রায়ের ভাষায় --- **"সরকারী মতে পঞ্চাশের মন্বন্তর জনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বহু তথ্যানুসন্ধানের পর সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বাঙলাদেশে ঐ মন্বন্তরেই প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।"**[২] তবে গবেষকেরা এই মন্বন্তরকে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মন্বন্তর বলে উল্লেখ করেছেন। মেদেনীপুর ও দক্ষিণ বাংলায় ঝড় বৃষ্টি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানের আক্রমণ প্রভৃতিকে দায়ী করা হলেও, এটিই মন্বন্তরের মূল কারণ ছিলো না। এরজন্য দায়ী ছিলো সরকারের ভ্রান্ত নীতি। সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতিকে সরাসরি দায়ী করেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[৩] সেনা বাহিনীর জন্য চাল মজুত করা, বিদেশে চাল রপ্তানি, পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ, মজুতদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া প্রভৃতি কারণে মন্বন্তর সৃষ্টি হয়েছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯৪৩ খ্রিঃ কেবলমাত্র বাংলাদেশেই মন্বন্তর দেখা দিয়েছিলো। এই মন্বন্তর সারা দেশে দেখা দেয়নি। ফলে সরকার চাইলেই এই মন্বন্তরকে আটকানোর জন্য অন্য প্রদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী আনতে পারতো। কিন্তু সে সময় সরকারের কাছে মানুষের অনাহার ও মৃত্যুর চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিলো যুদ্ধ। যার ফলশ্রুতি হলো এই মন্বন্তর।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে সুখময় চক্রবর্তী এবং দেবপ্রসাদ সেনের পরিবারের মাধ্যমে তারাশঙ্কর মূলত পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে গীতার পরিবার, গুণদার পরিবার, বি.বি.মুখার্জির পরিবার এবং

‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার সম্পাদক বিজয়ের কথা। সুখময় চক্রবর্তী মারা গেলেও তার ৯০ বছরের স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। তাদের তিন ছেলে সংসারে বড় কর্তা, মেজো কর্তা এবং ছোটো কর্তা নামে পরিচিত। বড় কর্তার ছেলের দুই সন্তান—কানাই ও উমা। কানাই হলো এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র। সে এম.এস.সি পাশ করা শিক্ষিত ছেলে। কলকাতার বুকে তার পূর্বপুরুষদের সুনাম আজও বর্তমান। একসময় তার পূর্বপুরুষ সুখময় চক্রবর্তী পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর বস্তি নির্মাণ করে রাজত্ব নির্মাণ করেছিলো। দশ কাঠা জমির ওপর নির্মাণ করেছিল দুই তলা বাড়ি। তবে সুখময় চক্রবর্তীর কষ্টার্জিত সম্পত্তিকে বিলাসিতায় নষ্ট করতে থাকে তার সন্তানরা অর্থাৎ কানাইয়ের ঠাকুরদারা। এইভাবে সুখময় চক্রবর্তীর সম্পত্তি ফুরিয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে তার বংশধরেরা অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিও করে। সুখময় চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মেজকর্তা জীবিত। তাই সম্পত্তির জন্য মায়ের মৃত্যু কামনা করে। আবার মেজকর্তার একমাত্র ছেলে মণিলাল তার বাবার মৃত্যু কামনা করে। এই বংশে একমাত্র কানাই ছিল অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। সংসার চালানোর জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে টিউশন করতে হতো। সংসারের প্রয়োজনে মায়ের কথায় অনেক সময়ই তাকে অগ্রিম বেতন চেয়ে নিতে হতো। এসবের পাশেও কানাইয়ের আরেকটি পরিচয় ছিলো, সেটি হলো রাজনৈতিক পরিচয়। কানাই রাজনৈতিক দলের সুবক্তা ছিলো। এই রাজনৈতিক দল করবার সময়ই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো দেবপ্রসাদ সেনের কন্যা নীলার সঙ্গে। নীলা ও তার ভাই নেপীও সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। কানাই নীলাকে ‘কমরেড’ বলে সম্বোধন করতো। মনে মনে উভয়ের একটি প্রেমের সম্পর্কও ছিলো। কিন্তু তা কখনোই তারা প্রকাশ করেনি।

মায়ের অনুরোধে একদিন ছাত্র অশোকের বাড়ি থেকে অগ্রিম টাকা আনতে গেলে ছাত্রের বাবা বি.বি. মুখার্জি কানাইকে চালের ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে বলে। কারণ চালের ব্যবসায় দ্রুত ধনী হওয়া সম্ভব। এরপর কানাইকে বি.বি. মুখার্জি খামবন্দী অগ্রিম একশো টাকা দেয়। টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে জানতে পারে যে তার ছাত্র অশোক আগে এসেই তার বাড়িতে অগ্রিম একশো টাকা পাবার কথা শুনিয়ে গেছে। এই ঘটনার পরই কানাইয়ের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে তার পরিবারের অবস্থা। অভাবের সংসারে এই টাকা পাবার কথা ছড়িয়ে পড়তেই কানাইয়ের সমবয়সী কাকিমা তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে চায়। মেজ গিন্নি তার কাছে দশ টাকা চায়। মেজকর্তার পৌত্রী যূথী কানাইয়ের অবর্তমানে তার ঘরে ঢুকে তার পকেট থেকে টাকা

চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যায়। অন্যদিকে সংসারে অভাব থাকলেও তার মা বাবাকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেয়। এরফলে কানাইয়ের মনে বিতৃষ্ণা জন্মে সংসারের প্রতি। এসময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কানাই। রাস্তায় বেরিয়ে সে দেখতে পারে গীতাকে। এক প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে সে ফিরছিলো। প্রৌঢ়া ঘটকী ছিলো বলে সকলে জানতো। কিন্তু সেই মহিলা গীতাকে দেহব্যবসায় নিয়ে গিয়েছিলো। আর এতে সম্মতি ছিল গীতার মা ও বাবার। খাদ্যাভাবের দিনে বাড়ির মেয়েদেরও বেশ্যাবৃত্তিতে নামতে হয়েছিলো এবং অনেকক্ষেত্রে মায়েরা তাদের কন্যাকে এই বৃত্তিতে ঠেলে দিয়েছিলো, তা ঐতিহাসিক সত্য। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় এমনই একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো— **"মা হইয়া মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে দিয়াছে, এই খবর যশোহর, দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। নেত্রকোণা, ফরিদপুর, বাঁকুড়া, মেদেনীপুর জেলার গ্রাম হইতে অনেক মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে।"**[৪]

সেদিন রাতেই গীতাকে নিয়ে কানাই বিজয়ের বাড়িতে চলে আসে। কানাই ঠিক করে কোনোদিন সে বাড়িতে ফিরবে না। পরিবারের লোকের ব্যভিচারকে কানাই পূর্বপুরুষদের পাপ বলে মনে করে। এসময় বি.বি.মুখার্জির কথা মতো চালের ব্যবসায় যোগদান করে কানাই। এসময়ই কানাই জানতে পারে চালের মজুতদারি ব্যবসার কথা, বাগান বাড়ির কথা। কীভাবে লোককে ঠকিয়ে সহজেই ধনী হওয়া যায়, কানাই অতিদ্রুত তা জানতে পারে। বি.বি.মুখার্জির ছেলে অমল একদিন কানাইকে বিজয়ের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতে এলে অমলকে দেখে গীতা চিনে ফেলে। কানাইকে গীতা জানায় অমলই তাকে ধর্ষণ করেছিলো। এরপর অতিঘৃণায় কানাই সেই ব্যবসার কাজ ছেড়ে দেয় এবং বিজয়ের পরামর্শে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রাত্রিকালীন সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগ দেয়। এসময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কথা— **"একটি গ্রামের একশো পঞ্চাশজন অধিবাসীর মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে আছে। অন্য একটি গ্রামে একশো ছত্রিশজনের মধ্যে বেঁচে আছে চারজন; একশো বত্রিশজন মারা গেছে। শতকরা পঞ্চাশজন লোক পানীয় জলের অভাবে বাসভূমি ছেড়ে চ'লে গেছে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বাস করছে।"**[৫]

এসময় গীতাকে নিয়ে কানাইয়ের গৃহত্যাগের ঘটনা সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সকলেই মনে করে কানাই গীতাকে বিয়ে করেছে। এই ঘটনায় গীতার পরিবার ও কানাইয়ের পরিবার কানাইকে দোষী সাব্যস্ত করে। এমন পরিস্থিতিতে

'সংঘর্ষ' নাটকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নীলা, নেপী ও কানাইয়ের দেখা হয়। দুজন সাহেবের সঙ্গে নীলা নাটক দেখতে এসেছিলো বলে নীলার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় কানাই। এজন্য সেদিন নেপীর সঙ্গে সে ভালো মতো কথাও বলেনি। সেদিন অনুষ্ঠানের বাইরে গীতার ভাই হীরেন ছুড়ি চালায় কানাইয়ের ওপর। কারণ সে জানতো যে পরিবারের সম্মতি ছাড়াই গীতাকে কানাই বিয়ে করেছে। এই ঘটনার দিনই দেবপ্রসাদ সাহেবদের সঙ্গে নীলাকে দেখে আহত হয়। নেপীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে দেবপ্রসাদ কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। সেইসঙ্গে চুপিসারে সাহেবদের সঙ্গে নীলার ঘনিষ্ঠতা দেখে ফেটে পড়ে সে। বাবার সঙ্গে বিবাদ করে নীলা বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। তার সহচর হয় নেপী। তারা দুজনেই বিজয়ের ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এসময় কলকাতায় দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়েছিলো। চারিদিকে দেখা যায় নিরন্ন মানুষের দল, রেশনের লাইনে মানুষের হাহাকার, জিনিসপত্রের অভাব প্রভৃতি--- **"কানাই বুঝতে পারলে পল্লীগ্রামের নিরন্ন মানুষের দল অন্নের আশায় বোমার আতঙ্ক মাথায় করেও মহানগরীতে এসেছে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে। মেদেনীপুর, দক্ষিণ-বঙ্গ এসব স্থানের অন্নাভাবের কথা, যারা দেশের সামান্য সংবাদও রাখে তাদের অবিদিত নাই। সমস্ত বাংলার অবস্থাই ক্রমশ শোচনীয় হ'য়ে আসছে।"**[৬]

গীতাকে স্বাবলম্বী করে তোলাই ছিলো কানাইয়ের উদ্দেশ্য। বিজয় বহুবার কানাইকে বলেছিলো গীতাকে বিয়ে করবার জন্য। কিন্তু কানাই তা প্রত্যাখ্যান করে। কানাই ও বিজয়ের উদ্যোগে গীতা নার্সিং-এ ভর্তি হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে গীতার গর্ভবতী হওয়ার কথা জানতেই নীলা কানাইয়ের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরে গীতা প্রকৃত সত্য তুলে ধরলে নীলার ভ্রম ভাঙে। তবে বিজয় ও কানাইয়ের প্রচেষ্টায় গীতার জীবন রক্ষা পেলেও গীতার পরিবার মন্বন্তরের করাল গ্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। বাবার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে হীরেন বাড়ি ছেড়েছিলো। ঘটকীর কথামতো বিধবার বেশ নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমেছিলো গীতার মা সরোজিনী।

সংবাদপত্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গুণদা বাবু পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার পরিবারেও মন্বন্তরের প্রভাব পড়ে। গুণদা বিজয়ের বন্ধু এবং একদা তার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী হওয়ার দরুণ বিজয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করে গুণদার পরিবারকে। কিন্তু গুণদার কাছে সম্মান একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে রেশনের দোকানে লাইন দিতে রাজি নয়। একদিকে সন্তানের অসুস্থতা, অন্যদিকে টাকা থাকা সত্ত্বেও রেশনে না যাবার জন্য খাদ্যসঙ্কটে পড়ে গুণদার

পরিবার। এসময় ওষুধের দোকানেও মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়। যার ফলে মারা যায় গুণদার ছেলে--- **“দোকানে ওষুধ থাকতে পাঁচ টাকার ওষুধের দাম পঁচিশ টাকা চেয়ে ওষুধ দেয়নি দোকানদার, --- বুড়ো হয়ে সেই কথা বলব ওই ছোট খোকার ছেলেদের, তার ছেলেদের, তাই যেতে পারলাম না তোর সঙ্গে।”**[৭] মূল্যবৃদ্ধি, খুচরোর অভাব[৮], ডাকাতি, লুঠের পাশাপাশি সেসময় কলকাতায় দেখা দিয়েছিলো বেকারত্ব। নীলার দাদার মতো বহু লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছিলো। ফলে শহরের বহু বাসিন্দা শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলো।

এসময় জাপানি বোমারু বিমানের হামলায় কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। উপন্যাসে বহুবার উঠে এসেছে চট্টগ্রাম, ফেণী প্রভৃতি অঞ্চলে জাপানীদের আক্রমণের কথা। এরফলে রাতের বেলা কলকাতায় ব্ল্যাকআউট থাকতো। আর জাপানিরা আক্রমণ করলেই চারিদিকে সাইরেন বেজে উঠতো। একদিন এই সাইরেনের ভয়ে নীলার বৌদি তার দেড় বছরের ছোটো মেয়ের মুখে স্তন দিয়ে চেপে ধরে রেখেছিলো। সেই অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে মারা যায় মেয়েটি। এরপর দেবপ্রসাদের পুরো পরিবার গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। আর দেবপ্রসাদ ছোট নাতনির মৃত্যু এবং মেয়ের ব্যভিচারিতায় আহত হয়ে সন্ন্যাস জীবন নেওয়া পছন্দ করে। গীতা, গুণদা, নীলার পরিবারের পাশাপাশি কানাইয়ের পরিবারও বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরে আক্রান্ত হয়েছিলো। কানাইয়ের বাড়িতেই জাপানের নিক্ষেপিত বোমা পড়েছিলো। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পুরো পরিবার। মারা গিয়েছিলো কানাইয়ের মা, মেজকর্তার বৃদ্ধা মা সহ অনেকে।

উপন্যাসে নিজের বংশের রক্তের প্রতি সন্দেহবশত কানাইয়ের রক্ত পরীক্ষায় আগ্রহ, পাঠকের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঠেকে। রক্ত পরীক্ষায় রোগ নির্ধারণ সম্ভব, কিন্তু চারিত্রিক ত্রুটি কী করে রক্ত পরীক্ষায় ধরা সম্ভব, তা সন্দেহের অবকাশ রাখে। উপন্যাসে ভিখারিদের ভিক্ষা সংগ্রহ, ডাস্টবিনে খাদ্য সংগ্রহ, ‘ম্যায় ভূখা হুঁ’ বলে ক্ষুধার্ত মানুষের অসহায় চিৎকার[৯], ধনী-গরিবের বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়কে ঔপন্যাসিক ছুঁয়ে গেছেন মাত্র। বিস্তারিত আলোচনায় আনেননি। মন্বন্তর ক্লিষ্ট কোনো পরিবার উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি। মন্বন্তরকে ব্যাপকভাবে আলোচনায় আনেননি তারাশঙ্কর। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, উপন্যাসে **“আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপন্যাসের কাঁচামাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্পসৌন্দর্য নহে।”**[১০] উপন্যাসের শেষে গান্ধীজির অনশনের কথা উঠে এসেছে। সেই অনশনের প্রতি প্রায় সকল চরিত্রের শ্রদ্ধা লক্ষণীয়।

তবে উপন্যাসে গান্ধীজির প্রসঙ্গ না-এলেও কোনো অসুবিধা হতোনা। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আদর্শ চরিত্র হলো বিজয়। বিজয়ের কথাতেই কানাই ও নীলা মন্বন্তরের কাজে লাগতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। উপন্যাসের একদম শেষ পর্যায়ে যে মন্বন্তরের সূচনার আভাস তারাশঙ্কর দিয়েছেন, সেই মন্বন্তরকে কাটিয়ে উঠে নতুন সূর্য, নতুন যুগ আনার আশা নিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসের নাম 'মন্বন্তর' হলেও এখানে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র উঠে আসেনি। মন্বন্তরের ভয়াবহতার পূর্বেই উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে কানাই ও নীলার প্রেম। উপকাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে অমল ও গীতার কাহিনি। তবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রাক-মুহূর্তে কলকাতা শহরে যে প্রভাব পড়েছিলো, সেসব ঘটনাকে তারাশঙ্কর ছুঁয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় আনেননি। মন্বন্তরের যে বিষ সমাজে ছড়িয়েছিলো, তার অবক্ষয় কানাই পরিবারেই প্রথম দেখেছিলো। এরপর সমাজে তার প্রতিফলন দেখেছে সে। পরিবার থেকে সমাজ এই সুদীর্ঘ পথেই কানাই দেখেছে মন্বন্তরকে। ব্যক্তিজীবনের মধ্য দিয়ে মন্বন্তরকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন। নিপীড়িত গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনকে তিনি আনেননি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য দ্বিধা বিভক্ত। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকেরা মন্বন্তরের জন্য ইংরেজদের দায়ী করেননি। তারা দায়ী করেছেন কালোবাজারি ও মজুতদারীকে। আবার সুবোধ ঘোষের মতো ঔপন্যাসিক 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে দায়ী করেছেন ইংরেজদের ভুল সিদ্ধান্তকে। এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্বন্তরের কারণ সন্ধানে গভীরে যাননি। তিনি জাপানের আক্রমণ এবং মেদেনীপুরের ঝড় বৃষ্টিকে বড় করে দেখিয়েছেন এবং কালোবাজারি ও মজুতদারদেরই দায়ী করেছেন। যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে গান্ধিজির প্রতি নমনীয়তা ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এছাড়া কানাই ও নীলার রাজনৈতিক মতাদর্শ যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলো, তা অনুমান করা যায়। উপন্যাসটি মন্বন্তরের ভয়াবহতার পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। মন্বন্তর কেন্দ্রিক উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে শিল্পর চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব সত্য। মানুষ যেখানে অনাহারে মারা যাচ্ছে, সেখানে সাহিত্যিকরা মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেননি। ফলে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রধান হয়ে ওঠায় এই জাতীয় উপন্যাস সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠেনি। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'ও এর ব্যতিক্রম নয়।[১১] আলোচ্য উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরলেও সতর্কতার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের শিরোনাম 'মন্বন্তর' হলেও এখানে মন্বন্তর বড় হয়ে ওঠেনি। বড় হয়ে উঠেছে পারিবারিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। একদিকে রাজনৈতিক আদর্শ, অন্যদিকে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব— এই দুইয়ের প্রভাবে ম্লান হয়ে গেছে অনাহারী মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা। এখানেই উপন্যাসটির ব্যর্থতা। তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনে বিষয়গত দিক থেকে অবশ্যই এই উপন্যাসটি একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

তথ্যপঞ্জি :

১) **"এর পূর্বে বরাবরই আমি পূর্বচলিত সাধু ভাষাতেই লিখে এসেছি; মন্বন্তর লিখেছি চলতি ভাষায়। এর অর্থ এ নয় যে আমি বর্তমান উপলব্ধিতে চলতি ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছি। তবে বিষয়বস্তুর বাহন হিসাবে এ ক্ষেত্রে এই ভাষাকেই গ্রহণ করেছি। এ হিসাবে চলতি ভাষায় মন্বন্তর আমার প্রথম রচনা।"**, মন্বন্তর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট- ২০১০, পৃ: ০৬

২) মন্বন্তর : পটভূমি, বাস্তবরূপ ও পরিণতি, অভিজিৎ রায়, সম্পাদক- সুব্রত রায়চৌধুরী, তথ্যসূত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-১৪০৩, পৃষ্ঠা- ১৬

৩) **"একদিকে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অন্যদিকে গবর্নরের হস্তক্ষেপ ও বাধাদানই ইহার জন্য প্রধানত দায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ অপসারণ নীতি, প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি এবং ভারত সরকার ও তাঁহাদের পক্ষ হইতে চাউল-ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে।",** বাংলার সঙ্কট, পঞ্চাশের মন্বন্তর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৌষ- ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩১

৪) খাদ্য সংকটের ভয়াবহ পরিণতি : বাংলার নারী সমাজ ধ্বংসের মুখে, জনযুদ্ধ, উপোসি বাংলা সাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সংকলন ও সম্পাদনা- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সেরিবান, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃষ্ঠা- ২৪৬

৫) মন্বন্তর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট- ২০১০, পৃঃ- ৯৪

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩২

৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৫

৮) **"সমগ্রদেশে রোজগারের অভাব হয়েছে। পয়সা তো একেবারেই নেই। দোকানে ভাঙানী মেলে না। ট্রামে না, বাসে না। খুচরোর অভাবে গরীবের জিনিস কেনা বন্ধ**

হয়েছে। গোটা টাকার জিনিস না নিলে খুচরোর অভাবে জিনিস কেনা হবে না!", তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৪

৯) **"অন্ধকারের মধ্যে মানুষকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু সকরুণ ক্ষুধার্ত চীৎকার; সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, মনে হয় চীৎকার উঠছে বুঝি মাটি থেকে। মহানগরী যেন চীৎকার করছে—ম্যায় ভূখা হুঁ! – ম্যায় ভূখা হুঁ!",** তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৪

১০) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, সপ্তম সংস্করণ- ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩০৫

১১) **"মন্বন্তর', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' শিল্পসৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ, কারণ তারাশঙ্করের মনোযোগ তাতে আছে, অন্তরের যোগ নেই",** কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল- ২০১০, পৃষ্ঠা- ২০

উনিশ শতকের চর্চিত বঙ্গনাট্যাভিনেত্রী অচর্চিত দর্শন

মৌ চক্রবর্তী
লেখক, গবেষক

সারসংক্ষেপ : *চর্চা বিষয়টি এমন যা মানবজীবনের প্রেক্ষিতেই আলোচিত হয়ে থাকে। একুশ শতকের সাংস্কৃতিক ভূমিজ ক্ষেত্রটি চর্চা দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এবং চর্চা মানে ইংরেজি শব্দের পরিভাষায় প্র্যাকটিস। এ নিয়ে একটি আলোচনা কেবলমাত্র নাট্যচর্চা-কলাক্ষেত্রের নিরিখেই আলোচ্যের হবে এই প্রবন্ধে। যেক্ষেত্রে থিয়েটারি চর্চার সূত্রে অভিনেত্রীদের যোগদান বিষয়টি আলোচিত হবে দুই দিক থেকে। এক, চর্চিত। দুই, অচর্চিত। নাট্যচর্চার দীর্ঘতর ইতিহাস, বঙ্গপ্রদেশের নাট্য বিবর্তনের ধারায় আলোচিত হয়ে থাকে অভিনেত্রীদের যোগদান ও সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেই। নিন্দুক, সমালোচক সমাজের দিক থেকে একঘরে হয়ে থাকা মেয়েরা, চর্চা থেকে চর্চিত হয়ে উঠলেন সমাজের মুখ্যে। উনিশ শতকের বঙ্গচর্চার মূল লক্ষ্যে ছিল, নারীমুক্তিকেন্দ্রিক সমাজ আন্দোলন। চর্চার বিষয় ছিল নারীমুক্তি। চর্চিত বিষয় ছিল জাতিকাদের মঞ্চনাটকে অংশগ্রহণ। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চর্চিত মঞ্চনাটক, রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা থেকে চর্চা শুরু হলেও, তা চর্চিত হয়ে ওঠে এক বিশেষ শ্রেণির মাধ্যমে। একদিকে, নবাগতাদের অভ্যুত্থান, উৎকৃষ্টরূপে নাট্যচর্চার অংশ হয়ে ওঠা। বঙ্গজীবনের চর্চিত ইতিহাসে নাট্যশিল্পের আলোচনা হয়ে থাকে, অচর্চিত থেকে যায় নাট্যাভিনেত্রীদের মূল্যায়ন।*

সূচক শব্দ: *উনিশ শতক, অভিনেত্রী, নটী, নাট্যচর্চা, সংস্কৃতি, নাট্যব্যক্তিত্ব।*

১

চর্চিত বঙ্গনাট্যাভিনেত্রী ভূমিকা

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের এক বিশেষ দিক হল চর্চা। নাট্যে মেতে ওঠা বঙ্গজাতির রঙ্গমঞ্চ অভিনয়–চর্চা ঘিরে যে বিশেষত্ব তা হল, মঞ্চে অভিনেত্রী নেওয়া। উনিশ শতকের ছাপা শব্দের ভাষায়, 'স্ত্রী চরিত্রে স্ত্রী' দিয়ে অভিনয়ের চর্চিত রূপ একদিকে। অন্যদিকে, নাট্যকর্মের দ্বারা একটি বিশেষ ধারার সূচনা ঘটে, যা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। বাংলা নাট্যকলার বঙ্গীয় নাট্যশালার দ্রুত, পরিবর্তিত সমন্বয় ধরে রাখতে, বাংলা নাট্যশালার প্রতিনিধিদের যে অভিনেত্রীদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, সেকথা অনুল্লেখিত এবং অচর্চিত। এবং, বাংলা নাট্যধারার পর্যায়ে যে নাট্যকার, পরিচালক,

ম্যানেজার এবং অভিনেতাদের সম্মিলিত প্রয়াস ঘটে, তাতে অভিনেত্রীদের উল্লেখ ঘটেও থাকে। এবং, নাট্যচর্চার বিশেষরূপ তাঁদের গুণগত দিক থেকে বিচার করার পরিবর্তে, দেখা যায় তাঁদের জন্ম – পরিচয় এবং জীবন বৃত্তান্তের সামাজিক চর্চায়।

নাট্যশালার ইতিহাসে ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে অভিনেত্রীদের সংযোজন ঘটে। তাঁদের নিয়ে প্রথম পরিবেশিত হয় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। বেঙ্গল থিয়েটার – এর খোলার চাল মঞ্চে মেয়েদের দিয়ে অভিনয়ের সূচনা ঘটে। এক্ষেত্রে বিশেষ সূত্রটি তুলে ধরার কারণ হল নাট্যচর্চা। এবং তা চলমান হয় নাট্যশালার ইতিহাসে। এবং এর সংখ্যাভিত্তিক প্রযোজনা ঘটে পেশাদার রঙ্গালয় পর্বে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, এক, বঙ্গাভিনেত্রীদের মঞ্চনাটকের যোগদানটির গুণগত শৈলী থেকে প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে চর্চিত সংস্কৃতির বিশ্লেষণ। দুই, বাংলার যাত্রাপালা, কীর্তন এবং হাফ আখড়াই শিল্পের অনুষঙ্গে থাকা শিল্পীদের নিয়েই প্রথমদিকে নাট্যাভিনেত্রীদের অচর্চিত-ক্ষেত্র থেকে যে পরিশীলিত অভিনয় ধারার সূচনার, সেই গুণগত দিকটি উপাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা। তিন, নাট্যাভিনেত্রীদের উদাহরণগুলি তুলে ধরা। এবং, তাঁদের সার্বিক ভূমিকা শুধুমাত্র পেশাদার রঙ্গালয়েই যে শেষ হয় না, তা তুলে ধরা পত্র-পত্রিকার ছাপা খবরের অনুষঙ্গে।

সর্বজনবিদিত উদ্দিষ্ট তথ্যের মধ্যে থেকে যে তত্ত্বগত দিক বিচারের তা হল, নাট্যাভিনেত্রীদের গুণগত পরিমাপ। যেখানে প্রারম্ভেই উদাহরণহীন এক শিল্পের জন্যে নিজেরাই নিজেদের প্রাণিত করে থাকেন। মঞ্চনাটকের স্থান কলকাতায় শুরু থেকে ছিল গান, নাচের আসর এবং থিয়েটারের আঁতুড়ঘর। যেখানে নাট্যাভিনেত্রী হতে আসা এক বিশেষ শ্রেণি থেকে চর্চিত হয়ে সমাজের মুখ্যে। যথা, প্রকাশিত সংবাদপত্রের ভাষায় চর্চিত নাটকের অভিনেত্রীদের তথা নটীদের নিয়ে লেখা মুখ রোচক খবর ছাপা হয়ে থাকে। উদাহরণ - এক, মাইকেল এদেশের রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বা সাম অফ দ্যা প্রসটিটিউট আর ট্রায়িং টু রিসিভড এডুকেশন ইত্যাদি।[i]

দুই, মন্দ মেয়েদের থিয়েটারি চর্চা থেকে পেশাদার রঙ্গালয়ের উৎপত্তি ঘটছে। যেখানে বেঙ্গল থিয়েটার, বিডন স্ট্রিটের সেই পুরনো ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, মোট ছয়টা প্রেক্ষাগৃহের জন্যে নাট্যকারের সংখ্যা হয়ে যায় ১৩০জন। নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য মিলে ১০০টি নাটকের উল্লেখ মেলে। এবং, তিন, সেই নাটকগুলিতে অভিনয়ের জন্যে অভিনেত্রীদের নাম হল, জগত্তারিণী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী, শ্যামাসুন্দরী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী,

রাজকুমারী, বিনোদিনী, লক্ষ্মীমণি, কুসুমকুমারী (প্রহ্লাদ), বনবিহারিণী, নারায়ণী, গঙ্গামণি। মোট ১৫ জন। এরই সঙ্গে নতুন থিয়েটার তৈরি হয়। বীণা থিয়েটার, আরজ নাট্যসমাজ, নিউ ন্যাশনাল, ইন্ড্িয়ান, সিটি, ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস এবং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার। এর সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় এমারেল্ড। বিডন স্ট্রিট, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, মেছুয়া বাজার, আপার চিৎপুর রোড, লিনডসে স্ট্রিট পর্যন্ত নাট্যশালার ঠিকানা বিস্তৃত হয়ে থাকে। এই ঠিকানাগুলো সবই কলকাতার। এবং, এগুলো রসদ যোগায় এই প্রবন্ধের উদেশ্যটি সফল করতে। নাট্যচর্চার শুরু বাংলায় আগে হলেও, এর বিশেষত্ব ঘটে অভিনেত্রী নেওয়া হলে, ১৮৭৩ সালের বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের সূত্রে।[ii] এ পর্যায়ে চর্চার নাটকের অনুষঙ্গে চর্চিত হতে শুরু করেন বঙ্গনটীরা। তাঁরা উনিশ শতকের পত্রপত্রিকার মুখ্য লক্ষ্যে এবং জ্ঞাপনের ভাষায় নাটকের সংবাদের সঙ্গে স্থান করে নেন। সম্মানে ও অসম্মানের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে বঙ্গনটীদের অভিনয়-জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনটিও। চার, উক্ত সূত্রের বিশেষ অনুষঙ্গরূপে উনিশ শতকের সাতের দশকে আগত শিল্পীদের নিয়ে যে আলোচনাই হয়ে থাকে, তার মূল লক্ষ্যে যেন ঐ মন্দ স্ত্রীলোক, বারবণিতা ইত্যাদি শব্দগুলোও ঘুরপাক খায় চর্চিত নাট্যশিল্প । হলেও, এর বিশেষত্ব হল এই যে, উৎস থেকেই প্রাদেশিক ধারার শিল্পচর্চা থেকে জন্মানুষঙ্গে যে নাচ, গানের শিক্ষালাভ করেছিলেন শিল্পজাতিকারা, সেকথাটি বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়। প্রচারে ছাপা অক্ষরে মেলে যে, গিরিশ, নগেন্দ্র সব তাবৎ অভিনেতা- পরিচালকরা মাটি হয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ, নিম্নগামী হচ্ছেন এই শিল্পী-জাতিকাদের সংস্পর্শে। উক্ত শিল্প-জাতিকাদের সমাজকথিত পরিচয় অভিনেত্রী হিসেবে প্রকাশিত হয় না। বরং, বঙ্গনটীদের উদ্ধৃত করা হয় বারবনিতা, বেশ্যা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে। যথা, বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় হওয়ার বিষয়ে 'উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও সমকালীন' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মিতালি টিকাদার –এর প্রবন্ধের আশ্রয় নেওয়া যায়। 'সুলভ সমাচার' ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩ সালে সংবাদ লেখে যে, এক, অভিনয় শুরুর আগে সাবধান বাণী। দুই, সিমলার কতগুলি ভদ্র সন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়ে খোলা থিয়েটারে ... মেয়েমানুষ আনিয়া , টাকা হইবে লোভে, কতগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন। এক্ষেত্রে, লক্ষ্যণীয় যে, ফের অনুষঙ্গ চর্চা, থেকে চর্চিত হয়ে যায় অভিনেত্রীদের সামাজিক পরিকাঠামোগত পরিচয়টি। যেক্ষেত্রে, নটী বিনোদিনীর মতন তৎকালীন 'স্টার' অভিনেত্রীর নামে থিয়েটার হল না হওয়ার কারণ দর্শায় নাট্যসমাজের প্রধানতম ব্যক্তি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

২

চর্চিত থিয়েটারের সঙ্গে মন্দ স্ত্রীলোক

চর্চিত থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্প-জাতিকাদের পরিচয় হিসেবে লেখা হয়ে থাকে যে, ' মন্দ স্ত্রীলোক'। এবং, তাহাতে শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইবে। কিন্তু 'দেশের পক্ষে' একপ্রকার 'অনিষ্টের হেতু' ইত্যাদি সূচিত হয়ে থাকে।[iii] উদ্দিষ্ট নাট্যাভিনেত্রীদের প্রসঙ্গে বঙ্গসমাজের এহেন মতামতের কারণ হল, তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান। যেখানে শিল্প তথা নাচ, গান, বাজনার চর্চা পারিবারিকভাবে জাতিকাদের চর্চিত হয়ে থাকে। এহেন অনুষঙ্গেই যাত্রাপালা, কীর্তন, গানের আসর থেকে শিল্পী-জাতিকাদের নেওয়া স্থির করে। এবং, তাঁদের নিয়ে ছড়া লেখা হয় যে, ' নাচিতে নাচিতে যথা নর্তকীর দল', 'সুভঙ্গিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন', 'দপাদপ ধপাধপ নাচের প্রতাপে', 'থর থর করি রঙ্গমঞ্চ ওঠে কেঁপে' ইত্যাদি। উক্ত পঙক্তিগুলো ছাপা হয় 'মজলিস' পত্রিকা ৯ ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা সালে।[iv] এক্ষেত্রে উল্লেখের যে, একটি জাতি হঠাৎ করেই নাট্যচর্চায় ইচ্ছুক হয়ে ওঠে না। বঙ্গদেশের দেশজ শিল্পকলা হিসেবে ছিল প্রাচীন উপাদান যাত্রাপালা, তরজা, হাফ আখরাই, কবিগান, কীর্তন প্রভৃতি লোক-চর্চিত শিল্পকলা। যা উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয়, যা এক জাতির সাংস্কৃতিক দিকটি উন্মোচিত করে থাকে। আলোচ্যের নটী-দের অন্তর্ভুক্তি ঘটার একটি পূর্ব-অধ্যায়ও মেলে সন-তারিখের হিসেবে। অর্থাৎ, আলোচ্য সাল-তারিখ ১৮৭৩, ১৬ আগস্টের আগেও বাংলায় থিয়েটার তথা নাট্যশালার প্রচলন ছিল। বাংলায় লেবেদফের প্রয়াস, এবং পরবর্তীতে ইংরেজদের নিজ আমোদের জন্যে থিয়েটার হল বানানো থেকে এদেশের রঙ্গালয়ের আধুনিকতার সূত্র। ১৭৫০ সালের কলকাতায় এমন কয়েকটি থিয়েটার হল বিদেশিদের রঙ্গালয় ভাবনার সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিবানদের পরিচয় ঘটে। যাত্রাপালা থেকে স্ত্রী-শিল্পী নিয়ে এসে থিয়েটারে যোগদান করানো এবং তাঁদের সাফল্যের কথা বাংলা নাটকের ইতিহাসে অনাদরের সঙ্গে অচর্চিত। বহুলাংশে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানও জোটে না। গবেষক নাটকের গবেষণায় ব্রতী উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লেখেন 'তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী'দের নিয়ে একটি বইয়ের আকারে। দেবনারায়ণ গুপ্ত লেখেন দুই খণ্ডে 'বাংলার নট- নটী' শীর্ষক গ্রন্থ। 'অবিদ্যাপাড়ার অভিনেত্রী' লেখেন গবেষক ও আলোচক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং, এঁদের উত্তরসূরি হিসেবে অমিত মৈত্র 'রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী' বইয়ের আকারে সমগ্রতা দিয়ে থাকেন। উক্ত গ্রন্থগুলো নাট্য-গবেষক তথা দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধানের নিরিখে বঙ্গ নাট্যাভিনেত্রীদের স্বপক্ষের সম্মান-দলিল স্বরূপ। যেখানে

চর্চিত নাট্যশিল্পে মাতৃকুলোত্থিতাদের নিজ উদ্যমে কিছু শেখা বা হয়ে ওঠার জন্যে নাট্যচর্চা, যা বিশেষ সংস্কৃতির রূপকার হয়েও অচর্চিত থেকে যায়। তাঁদের পক্ষেই সাক্ষ্য দেন নাট্য–গবেষক, অধ্যাপক, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক বিশ্লেষক কুন্তল মুখোপাধ্যায়।[v]

চর্চা, শব্দের আভিধানিক অর্থে বোধগম্য হয় যে, যা প্রতিদিন ব্যবহারিক এবং উত্তরোত্তর চর্চায় যা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। নাট্যশালার চর্চিত ইতিহাসে প্রাথমিক উপাদান হয়ে থাকা নটী-কূল বিবিধভাবেই সমাজে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। এক, তাঁদের পিতৃ-পরিচয়হীন সমাজের মধ্যেকার জীবনের দিকটি তুলে ধরে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি এই সাক্ষ্যই দেয়। এক্ষেত্রে যা অনুল্লেখ্য বা অচর্চিত, তা হল যে, সমাজ- সংস্কারের সন্ধিক্ষণের নাটক উনিশ শতকে নাটক, সমাজের থেকে উপাদান গ্রহণ করে চালিত হচ্ছিল। বিশেষত, সংস্কারের সন্ধিক্ষণে নারীমুক্তির জন্যে, নারীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের নাটক লেখা হয়ে থাকে। এবং সমাজের তাবৎ শিক্ষা – আন্দোলনকারী ও সমাজ – সংস্কারকদের নাট্যশালায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ চলে। এবং, একুশ শতকের ব্যাপ্ত সময়ের নিরিখে - নাটক সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নারীবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক অনুষঙ্গে জারিত। আধুনিক থিয়েটারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, এক দেশের নাটকের দ্বারা, সেই দেশের সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ বোধগম্য হয়ে থাকে। অবিভক্ত বাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। বঙ্গজনপদে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির নিরিখে মঞ্চ নাট্যাভিনয়ের নব্যরীতি চালু হয়ে থাকে। এবং তৎকালীন সময়ে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় নাটকের দ্বারা সমাজ-সংসৃত কুসংস্কার মোচনে নাট্যমঞ্চের ব্যবহারিক উপাদান হিসেবে নটীদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। এবং, বাংলাসমাজের সাধারণ কুলীন বংশ-পরিচয় জাতিকাদের সেসময়েই শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে থাকে। ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর রচিত নাটকের অভিনয় ঘটে। এবং, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে জাতিকাদের অভিনয়ের সূচনা হয়। জাতিকাদের এমন অসম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাধারণ সমাজের কন্যাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্নাতক হয়ে ওঠা, ১৮৮১ সালে।

ঘটনার মধ্যেকার চর্চিত বিষয়টি হল – মেয়েদের হয়ে ওঠা। তা সে মন্দ স্ত্রীলোক হোক, বা ভদ্রজনকন্যা। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এই দুই জাতিকাদেরই সমাজের দিক থেকে চর্চিত বিষয় হয়ে ওঠা। এবং, মঞ্চসংলগ্ন জাতিকাদের চর্চিত হয়ে থাকা ঘটে জীবিকার কারণে। এবং, তাঁদের যে গুণের স্ফুরণ ঘটেছে, তার চেয়েও বেশি

আন্দোলিত হয় সমাজে কেচ্ছা-কাহিনি। এরফলে, নিন্দিতা-মঞ্চকন্যাদের একদিকে চর্চিত হয়ে ওঠা। অন্যদিকে, অচর্চিত থেকে যাওয়া দুইই ঘটে। একদিকে, নাট্যাভিনেত্রীদের ভূমিকা বঙ্গনাট্য ইতিহাসে যোগদানের সময় থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। যেখানে নাটকের কুশীলব হিসেবে তাঁদের গ্রাহ্য হওয়ার অনেকটাই নির্ভর করে ছাপা-প্রতিবেদনের উপর। একথা, উল্লেখের যে, ছাপাখানার ব্যয়বহনকারী ব্যক্তি যে এঁদের উপর সদয় ছিলেন না, বা এঁদের কর্মকাণ্ড হিসেবে বুঝতেন যে, এঁরা সমাজের বহিরাংশের সেই উপাদান, যারা জীবিত থেকেও মৃত। কারণ, লৌকিক সমাজের নিয়মানুসারে কন্যা, স্ত্রীলোক প্রভৃতিশ্রেণির স্থান যে গৃহের অভ্যন্তরের। এবং, কুলীন প্রথা মেনে চলায় অতিবাহিত। সেক্ষেত্রে সতী হওয়া, জীবন্ত চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া, নারীশিক্ষার বিপরীতে সমাজের বৃহৎ অংশের অংশগ্রহণ, নাট্যাভিনেত্রীদের স্বপক্ষে থাকবে না – একথা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং, উনিশ শতকের পত্রপত্রিকায় চর্চিত নাট্য-নটীদের লৌকিক নিন্দাভাজন ভূমিকাটিই প্রকৃষ্ট হয়ে ওঠে। একুশ শতকের সময়কালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শেষ ইতিহাস থেকে তাঁদের গুরুত্ব, চর্চিত হতে থাকে। যা একদা চর্চার জন্যে তাঁদের সমাজ-দেশ-কাল নিন্দিত করেছিল। দুই, সমাজ নামক মাধ্যমের সূত্রে নারীশিক্ষার সুযোগপ্রাপ্তাদের অবগুণ্ঠিত জীবন, বহুবিবাহের শিকার হওয়া, মর্যাদাহীন আবাল্যের অকাল বৈধব্যের সঙ্গে নটীদের জীবনের সমাজ অচর্চিত থেকে যায়। এক্ষেত্রে, মন্দ স্ত্রীলোক এবং গৃহস্থ কন্যা – উভয়ের ক্ষেত্রেই যা অনালোচিত থাকে তা হল, নটীদের অভিনয় করানো হয়ে থাকে কুসংস্কারের নাটকের সংলাপগুলো। যেখানে বিখ্যাত সংলাপ হয়ে রয়েছে যে, মেয়েমানুষে লেখাপড়া শিখে কি করবে, সেকি চাকরি করে টাকা আনবে? ইত্যাদি বাক্য বিন্যাসের মধ্যে যে সমাজের ছবি ধরা পড়ে, তা কি মন্দ, সমাজনিন্দিত জাতিকাদের চেয়ে গুণগতমানে উৎকৃষ্ট।

অতঃপর, মন্দ স্ত্রীলোক দ্বারা যে শ্রাদ্ধের সূচনা ঘটেছিল, তার মধ্যে মান্য সাহিত্যিকদের উপন্যাসগুলির রূপান্তর ছিল। যথা, বঙ্কিমচন্দ্র। নটী-দের এমত পারদর্শিতার কথা প্রকাশিত হয়, নাটকের শো দিয়েই। নটী–রা নাচ ও গান জানেন, যা অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজন। এবং উক্ত কুশলতার সঙ্গে তাঁরা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হওয়া একাধিক নাটকের কঠিন শব্দবন্ধের সংলাপও সাবলীলভাবে উচ্চারণ করায় পারঙ্গম। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মনোরমা চরিত্রটির আসাধারণ অভিনয়ের কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। নটী-দের এমন সাফল্যের উদাহরণ। এগুলি প্রতিবেদনের চেয়েও বেশি মুখ্য হয়ে ওঠে প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে ছড়া কাটা। ' সখের

নারী , স্ত্রী- পুরুষে অ্যাক্ট করি', ইত্যাদিও চর্চিত হয়ে চলে। আবার, নারীশিক্ষার বিরোধীতা করে লেখার সূত্রে উল্লেখের যে, তখন মাস মাইনেতে চাকরি পেয়েছিলেন নটী-রা। মাইনে ছিল তিন-চার টাকা। এবং, পরে তা বেড়ে যায়। উল্লেখের যে, এই যে মাইনে, রোজগারের সূচনা, তার সঙ্গে সাধারণ রক্ষণশীল সমাজের যোগ ঘটে না। নটী-দের মাইনে, রোজগার স্বীকৃতি হলেও, এর চর্চিত ক্ষেত্র থাকে সীমাবদ্ধ। বরং, মঞ্চে যোগদানের প্রথমদিকেই নটী সুকুমারী দত্তের লেখা নাটকের নামকরণ ও মালিকানা নিয়ে সমাজ কুৎসিত ব্যঙ্গ-চর্চিত হয়। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন নাহলেও, অচর্চিত থাকলেও কতগুলি বিশ্লেষণ উঠে আসে। এক, অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিতা সমাজ-লাঞ্ছিতা বঞ্চিত জাতিকাদের শিক্ষা নিয়ে যে তর্ক হয়ে থাকে, তা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সমূহ তথ্যের ভিত্তিতে মেলে যে, কীর্তন- গায়িকা এবং মুজরো-খ্যাতিমান শিল্পী গোলাপসুন্দরীকেই 'বেঙ্গল থিয়েটার' –এর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় তদ্বির করে নিয়ে আসেন নাটকে যুক্ত হওয়ার জন্যে। এবং, তথানুসারে এও জ্ঞাত হওয়া যে, সেসময়ে গোলাপসুন্দরী ছিলেন নামী শিল্পী, তাঁর কদর ছিল বোদ্ধা-শ্রোতামহলে। ফলে, একথা অনুমেয় যে, শিল্পী-জাতিকাদের গুরুত্ব বিবেচনা করেই নাট্যশালায় নিয়ে আসেন সেকালের থিয়েটারপ্রেমী শিক্ষিতজন। ফলে, এ প্রশ্ন তর্কাতীত যে, পারঙ্গম নামী শিল্পীকে ব্যবহার করেই নাট্যশালার অভিনেত্রী-পর্বের সূচনা হয়ে থাকে। এবং, ঐ নির্ধারিত শিল্পীকে প্রশিক্ষিত করা হয়।

দুই, ঠিক যেমন এলোকেশী নামক আরেক যাত্রাপালার শিল্পীকেও এভাবেই বাছাই করে নিয়ে সেছিলেন সেকালের থিয়েটারপ্রেমী কর্তাব্যক্তিরা। প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'-তে যোগ দেন জগত্তারিণী এবং শ্যামাসুন্দরী নামের আরও দুই অভিনেত্রী। উল্লেখ্য যে, তাঁদের মঞ্চাভিনয়ের তারিখ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, তাঁদের গুণগত মানের অভিনয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। প্রথমদিকের আগত অভিনেত্রী-জাতিকাদের প্রথম শো ফ্লপ করেছিল। কারণ,সমাজের বাবুরা অর্থাৎ থিয়েটার দেখতে আসা বাবুরা কুলমানহীন জাতিকাদের মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের যে, তাঁদের মতন নামী শিল্পীদের নাচ, গান দেখতে যেতে, তাঁদের সঙ্গ-প্রার্থী হতে, সেকালের বঙ্কিম-রচিত বাবুকূলের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু, মঞ্চে তাঁদের দেখতেই আপত্তি ঘটে। এর এক-দুটো নজির উল্লেখের। একটি ছাপা প্রতিবেদনের সূত্র মেলে প্রাবন্ধিক মিতালি টিকাদারের প্রবন্ধ 'উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও সমকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকা'তে। তিনি আলোচনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ৩৩৯ সংখ্যা, পৌষ ১৭৯৭

শক থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 'নাট্যালয় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার ইহা একটি বহুল অর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্যয় তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য হইতেছে।'[vi] এর বিবরণ থেকে যে তথ্যাদি মেলে তার নিরিখে সমাজের প্রতিচ্ছবি মেলে।

তিন, বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার যে, এক জাতিকা একা, নিজ দ্বারা অসম্মানিত হতে পারেন না। তিনি যে অসম্মানিত স্ত্রীলোকের তকমাটি পাচ্ছেন, তাও সমাজপ্রসূত বিশেষত জনৈক পুরুষ দ্বারা হওয়া অসম্মান। যা তাঁকে বা তাঁদের বিশেষ অসম্মানিত তালিকায় লিপিবদ্ধ করে। এবং এক জাতিকার অসম্মানের ফলে সমাজের যে রুগ্ন, দীর্ণ, কুরুচিকর দিকটি প্রকাশিত হয়, তা বিশেষত্বের দাবি রাখে না। অপেক্ষাকৃত ভাবে উনিশ শতকের সমাজ দ্বারা সাধারণ গ্রিহি-প্রদানশিন শ্রেণির কন্যাদেরও অপমান ঘটে। সমাজে কোন এক শ্রেণি এমনিতে জন্ম নেয় না। জাতিকাদের সমাজ-লাঞ্ছিত হয়েই নাট্যকার অমৃতলাল বসু-র কথানুসারে নির্ণীত ঐ শ্রেণির স্ত্রীলোকের উদ্ভব ঘটে থাকে। যাঁদের জীবনের অন্যান্য পরিসর সামগ্রিকভাবে অচর্চিত থেকে যায়। উক্ত জাতিকাদের উনিশ শতকের সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা দ্বারা সমাজের আক্রমণের যে প্রয়াস, তাতে এও নির্ণয় করার যে, জাতিকাদের উত্তরণ সমাজের কাম্য নয়। এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আরেকটি উদাহরণ 'অভিনয়' পত্রিকার শ্রাবণ, ১২৯৫ থেকে উদ্ধৃত করেছেন মিতালি টিকাদার। উদাহরণটি এরকম যে, বারাঙ্গনা অভিনেত্রীদের দ্বারা সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি পতিব্রতার চরিত্রের অভিনয় দেখে সমাজের আক্রমণের ভাষা হয়ে যায় আরও রুগ্ন। যেখানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রতিবেদনে, কুচরিত্রা স্ত্রীলোক বলে অভিনেত্রীদের উল্লেখ করা হয়। এবং, গালি দেওয়া হয় নাট্য-পরিচালনের যুক্ত ব্যক্তিদেরও। অপরদিকে, নটীদের সাফল্যের অচর্চিত দিকটি দেখা যায় , এক, টিকিট বিক্রি হয়ে হল ভর্তি, হাউসফুল শো। ফলে ব্যবসা বৃদ্ধি হয়। দুই, নাট্যশালার আয়ু বাড়ে ঐ নটীদের অভিনয় গুণেই। সেই নাট্যশালার দর্শক হিসেবে সমাজের উপস্থিতি ঘটে, যা অচর্চিত। যা নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে যে, নটীদের সম্মান তাঁদের অভিনেত্রী হিসেবে প্রকাশ থেকেও বাধ্যানুবর্তিকার জীবনটিও থেকে যায়। সমাজের বাবুদের দল, অভিনেত্রী- নটীদের থিয়েটারের প্রতি নিবেদিত প্রাণ- এই আবেগের ঠিক বিপরীতে। বাবুদের কাছে বাঁধা মেয়েমানুষের তকমা ছেড়ে নটী – দের যে লড়াই, তার জন্যেই তাঁদের সার্বিক উত্তরণ ঘটে।

অপরদিকে, সমাজের থেকে সুযোগ পেয়ে সুকুমারী দত্ত যেমন নাটক লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তেমনই থিয়েটারের দল চালাতেন। এবং, তা থেকে রোজগার হত। নইলে, কিভাবে তিনি দল চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন বিশেষত মহামারীর সময়ে। সুকুমারী বা গোলাপসুন্দরীর পাশাপাশি অপর এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম উল্লেখের, তিনি হলেন তিনকড়ি দাসী। যিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঝি চরিত্রে বিখ্যাত হন, লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিচার করা যায়। এবং, তাঁর সঞ্চিত অর্থের থেকে তিনি তাঁর বাবুর- ছেলেকেও অর্থদান করেছিলেন, যা অচর্চিত। এবং, তিনকড়ি দাসীর বাড়ি তিনি যে নিজের সমাজের মেয়েদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, সেটিও অনালোচিত। চার, এরকমই ভূমিকা ঘটে বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও। তিনিও নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্যে নিজেকে বন্দক রেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নাট্যশালার তৈরির অর্থ সংগ্রহ করেন তাঁর সঙ্গত জীবনের প্রেক্ষিতেই। এমন শিল্পী তথা নটী বিনোদিনীকেও শেষে নাট্যশালার সংস্রব ত্যাগ করতে হয়। কারণ, সমাজ, সমাজের অর্থ- প্রতিপত্তিসম্পন্ন নাট্যশালার কালিমালিপ্ত বঞ্চনার ইতিহাস একাধারে চর্চিত হয়, এবং অচর্চিত থাকে বিনোদিনীর মতন শিল্পীর সঙ্গে প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার।

৩

সাধারণ সমাজে অচর্চিত নটী

একদিকে সফল নাট্যভিনয়ের শিরোপা। অন্যদিকে, তাঁদের জুড়েই প্রতিবেদন যে, এরাই যুবককূলের নষ্ট হওয়ার কারণ। এবং, এর সঙ্গে অচর্চিত থেকে যায় যে, স্ত্রী – পুরুষের অ্যাক্টো করা নটীদের নিজ সমাজের জাতিকাদের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ দিয়ে নাটকের করে তোলার প্রয়াস-কথা। তিনকড়ি দাসীর অভিনয় টান, মায়েদের পেশাগ্রহণ না করা। বারাঙ্গনা জীবনের ফ্রেম থেকে বেরোতে চাওয়া, সুশীলাবালার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক সভায় ভাষণ দেওয়া – তাঁদের অন্দরের চর্চিত শিল্পের সাফল্যের রূপকার। সেখানে, সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীর দ্বারা আদৃত নাহলেও, মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে তোলে। কারণ, সমাজে তখনও বিধবাবিবাহের জন্যে বিদ্যাসাগরমশাইকে বরপণ দিতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে, আর্থিক সহযোগিতার প্রক্রিয়ার বাইরে থেকেও, সমাজের শিক্ষার বিষয় হয়ে ওঠা অপেক্ষাকৃত কম চর্চিত থেকে উত্তরণ ঘটাবে।

তবে, এরসঙ্গেও উল্লেখের যে একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে নাট্যকার অভিনেতা নির্দেশক চন্দন সেন –এর আন্তর্জালিক সাক্ষাৎকারে উঠে আসে ফের উনিশ শতকের

অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ। তিনি জানিয়েছেন যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গে বঙ্গনটীদের বাদ দিয়ে কোন আলোচনাই পুরনাঙ্গ রূপ পেতে পারে না। তাঁর কথায়, 'ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন অভিনেত্রীরা'। এবং, আলোচনায় তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ রাখেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটকের দর্শক হয়ে এসেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি এক নাট্যাভিনেত্রীর অভিনয় দেখে জানিয়েছিলেন যে, সাধারণ রঙ্গালয়ে কি এখন শিক্ষিত অভিনেত্রীরা এসেছেন। পরে, তাঁকে জানানো হয় যে, না, অভিনেত্রী সেই আগের মতনই রয়েছেন। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দ্বারা এমন উচ্চারণ, সংলাপ এবং নাট্যকলার রূপকার হয়েছেন তিনি বা তাঁরা।[vii] উল্লেখের যে, নটী – হতে আসাদের কাছে এই অভিনয় বিষয়টা ছিল সমাজের মুক্তির স্বাদ। যেখানে, নারীমুক্তির জন্যে স্ত্রী-শিক্ষার সংগঠিত বৃত্তে ঠাঁই না পাওয়া নটী, অভিনেত্রী বা পারদর্শী শিল্পীদের উত্তরণ বিশ্লেষণ আরেকটি গবেষণার পাথেয় জোগায়।

নাট্যকলার এক ধারা হল চর্চা, চর্চিত হতে থাকা, বা রাখা। মঞ্চজাতিকাদের যে পরীক্ষামূলকভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল, তা নাট্যচর্চায় বিশেষ যে হয়ে উঠতে পারে, এর বিন্দুমাত্র আভাস সাধারণ শিক্ষিত নাট্যচর্চা করিয়েদের ছিল না। অন্যদিকে, এও উল্লেখের যে, যে নটীদের জন্যে একসময় বাংলা পত্রিকাগুলো লিখেছিল যে, মাইকেল কিভাবে দেশে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে গিরিশ থেকে শিশির, সবাই মাটি হয়ে গেলেন। তা যে মাটি হয়নি , বা হচ্ছিল না, তার প্রমাণ উনিশের বাংলায় একাধিক নাট্যকারের জন্ম।[viii] উনিশ শতকে সেসময়ের নাট্যকারদের সংখ্যা ছিল ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত ১৫ জন, ১৮৮৩ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ২৬ জন। এবং ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত ৪৭ জন। এবং উনিশ শতকের নারীশিক্ষার পরিকাঠামোর কেন্দ্রে ছিল পাঠক্রমে অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে মাত্র ঘরগেরস্থালির কাজ চালানোর মতন শিক্ষার ব্যবস্থা। সেদিক থেকে স্ব-শিক্ষিতা নটীদের মঞ্চাভিনেত্রী নামক পেশার উৎস। মঞ্চনাটকের প্রতিফলিত ছড়া নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ -- মঞ্চের মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। অথচ, উনিশ শতকের সমাজ এই মঞ্চনাটককে আশ্রয় করেই নিজ-সমাজের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। যেখানে নটী, থেটারের মেয়ে, ভদ্রজন সমাজের পঠন-পাঠনে, গত দশক থেকে যে গবেষণার সূত্রপাত , সেখানে তাঁদের ইতর – জাতিকা গোত্র থেকে যে সম্মানসূচক আপনি সম্বোধন প্রাপ্তি, তাও মন্দমেয়েদের চর্চিত স্বাধিকার এক প্রক্রিয়া।[ix] যেখানে নিরানব্বই জন মঞ্চাভিনেত্রীদের তথা নটীদের নাম চর্চিত হয়ে থাকে।

এবং, অচর্চিত সেই সমাজকথিত মন্দ স্ত্রীলোক-দের অনির্বাপিত শিল্পের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে বাংলা মঞ্চনাটকের পূর্বভাগ। যেখানে তাঁদের পরিচয় অভিনেত্রী হয়ে ওঠার পাশাপাশি কবি, গায়িকা, নাট্যকার এবং প্রথিতযশা লেখিকা সমতুল্যে। এঁদের অনর্গল চর্চিত শিল্পধারায় অচর্চিত কিছু দিক প্রবন্ধে পুনঃ আলোচনায় আনা গেল। মূলত একটি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁদের প্রতিভা বিশ্লেষিত এবং আলোচিত হল। উত্তরকালের গবেষণার জন্যে উনিশ শতকের চর্চিত বঙ্গনাট্যাভিনেত্রী অচর্চিত দর্শন হিসেবে এটি পাথেয়।

তথ্যসূত্র :

---

[i] মিস্ত্রী জয়ন্ত (সম্পাদিত); সাময়িক পত্রপত্রিকা উনিশ বিশ শতক; প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫; একুশ শতক কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯ ; পৃষ্ঠা ১৫

[ii] মৈত্র, অমিত; রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী; প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫; আনন্দ, কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮– ৮১- ৭৭৫৬- ৩৭৬-৪ ; পৃষ্ঠা – ভূমিকা, ৯ , ৪৭, ২৯৪ - ২৯৫

[iii] মিস্ত্রী, জয়ন্ত(সম্পাদিত); শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও সমকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকা; সাময়িক পত্র উনিশ – বিশ শতক, একুশ শতক; প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫; কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃষ্ঠা ১৫, ১২৫-২৭

[iv] ঐ

[v] আন্তর্জালিক সাক্ষাৎকার কুন্তল মুখোপাধ্যায়; সময় দুপুর দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত; তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর,২০২০; কলকাতা

[vi] মিস্ত্রী, জয়ন্ত(সম্পাদিত); শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও সমকালীন সাম্যিক পত্রপত্রিকা; সাময়িক পত্র উনিশ – বিশ শতক, একুশ শতক; প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫; কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃষ্ঠা ১৫, ১২৫-২৭

[vii] আন্তর্জালিক সাক্ষাৎকার চন্দন সেন ; সময় সকাল ১১ টা থেকে ১২টা পর্যন্ত; তারিখ ১০ আগস্ট,২০২১; কলকাতা

viii মিস্ত্রী, জয়ন্ত(সম্পাদিত); শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও সমকালীন সাম্যিক পত্রপত্রিকা; সাময়িক পত্র উনিশ – বিশ শতক, একুশ শতক; প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫; কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃষ্ঠা ১৫, ১২৫-২৭

ix চক্রবর্তী মৌ; মঞ্চনাটকে নটী – অভিনেত্রী পরম্পরা নারীসত্তার সূচনা একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ; রায় সঞ্জীব (সম্পাদিত); নাট্যাঙ্গনে নারী; কথাকৃতি স্মারক নাট্যপত্র ২০২১; কলকাতা; প্রথম প্রকাশ ৮ মার্চ ২০২১; পৃষ্ঠা ২৪

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মিস্ত্রী জয়ন্ত (সম্পাদিত); সাময়িক পত্র উনিশ বিশ শতক; প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫; একুশ শতক কলকাতা; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯

২. গুপ্ত, দেবনারায়ণ; বাংলার নট – নটী (১ম খণ্ড); সাহিত্যলোক; পুনর্মুদ্রণ ১৪ এপ্রিল ২০১৬; আইএসবিএন- ৮১-৮৬৯৪৬-৫৮-৬

৩. গুপ্ত, দেবনারায়ণ; বাংলার নট – নটী (২য় খণ্ড); সাহিত্যলোক; আগস্ট ১৯৯০

৪. চক্রবর্তী সুমিত কুমার; স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ; প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২

৫. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র; আচার্য নির্মাল্য (সম্পাদক); আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, বিনোদিনী দাসী; পুনর্মুদ্রণ ১৪২২, বাংলা সন, সুবর্ণরেখা

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন; অবিদ্যাপাড়ার অভিনেত্রী; প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১৩, জুন ২০০৬; ফটিকজল প্রকাশনী

৭. বাগল যোগেশচন্দ্র; বাংলার স্ত্রী শিক্ষা; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; কলিকাতা ১৩৫৭

৮. সেন, শোভা; ওঁরা আমরা এরা; প্রথম সংস্করণ ২০০০; থীমা; আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৮৬০১৭-৬৪-৭

৯. বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ; তিনকড়ি বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী; দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪; অক্ষর প্রকাশনী

১০. শাস্ত্রী, শিবনাথ; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯; প্রকাশক এস কে লাহিড়ী অ্যানড কোং; কলেজ স্ট্রিট

১১. সেন শোভা, রায়চৌধুরী শৌভিক(সম্পাদিত), নাটক সমগ্র, উৎপল দত্ত; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; কলকাতা; আইএসবিএন ৮১-৭২৯৩-১৮৭-৫

১২. মৈত্র অমিত, রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী; প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ; জানুয়ারি ২০০৪ অক্টোবর ২০১৫; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ; আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৭৭৫৬-৩৭৬-৪

প্রবাসী ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ

নিতাই গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সারসংক্ষেপ : *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে 'প্রবাসী' পত্রিকার ভূমিকা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্তির বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও জাতীয়তাবাদে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 'প্রবাসী'র পাতায় পাতায় পরিবেশিত হয়েছিল। এখানে ব্রিটিশের বিভিন্ন অত্যাচার, অনাচার, শোষণের যে কঠোর সমালোচনা হয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা বিস্তৃত বিবরণ 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়। স্বাধীনচেতা ও দেশভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন প্রচেষ্টা বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশন করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ব্রিটিশের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। তাতেও তিনি পিছপা না হয়ে নিরপেক্ষ ও সত্য এবং দেশাত্মবোধক সংবাদ পরিবেশন করে দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা, বন্দীদের উপর অত্যাচার, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে 'প্রবাসী'র সমালোচনা সব সময়েই মানুষকে সচেতন করেছে। মূলতঃ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষকটি সম্পাদক বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতকের সূচনায় 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্ম হওয়ার কারণে এবং সম্পাদকের রাজনীতি বিষয়ে ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকার জন্য 'প্রবাসী' পত্রিকাকে জনগণের রাজনীতি সচেতন করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে 'প্রবাসী' পত্রিকা কি ভূমিকা নিয়েছিল তা এই পত্রিকায় বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।*

সূচক শব্দ : *স্বাধীনতা, বিবিধ প্রসঙ্গ, বঙ্গ-ভঙ্গ, অবৈতনিক, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, শিরোভূষণ, বিপ্লবী, নাইটহুড, সত্যাগ্রহী, অর্ডিন্যান্স, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গোলটেবিল, পিকেটিং, গণপরিষদ, হোয়াইট পেপার, সন্ত্রাসবাদ।*

সমকালীন রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বিভিন্ন সংখ্যায় নিয়মিত ভাবে আলোচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কেমন ছিল সে যুগের বাংলা যে যুগে 'প্রবাসী' জন্ম নিয়েছিল ? বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণে 'প্রবাসী'র আবির্ভাব। কাল পরিবর্তনের সাক্ষী ইতিহাস। বিংশ শতকের প্রথমে যে সুবিশাল ঘটনা

তরঙ্গাবলীতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষ তার বিবরণ আছে ইতিহাসের যে কোনোও প্রামাণ্য পুস্তকে। কিন্তু 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান-এক অর্থে ইতিহাস। বলা যায় দৈনন্দিন চলমান ঘটনা প্রবাহের দিনলিপি। 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' খুললে সমসাময়িক যুগের পরিচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল নিয়ন্ত্রণ হলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পূর্বাভাষ পূব আকাশে উষা-উদয়ের রক্তিম আভা ছড়াচ্ছিল। খুব শীঘ্র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের কূট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 'স্বদেশী আন্দোলন' বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো বাংলার মাটিতে ভেঙে পড়ল।[১] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অংশ নিলেন, গাইলেন- 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্যহোক, পুণ্যহোক হে ভাগবান।' অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন 'ভারতমাতা', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শোনালেন 'বঙ্গলক্ষ্মী'র ব্রতকথা'। রাখী-বন্ধনে, শঙ্খ বাদনে, উদ্দীপ্ত ভাষণে বাংলা যেন নবরূপ ধারণ করল। যথার্থই 'আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ হতে বাহির হলে জননী'। ইংরেজ শাসনের বঞ্চনা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশবাসী যেমন গর্জে উঠেছিল, তেমনি রাজনৈতিক পরাধীনতার থেকে মুক্তির জন্য আকুল হয়েছিল। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে 'প্রবাসী' জানাল অকুন্ঠ সমর্থন ওজস্বিনী ভাষায়, কবিতার পর কবিতায়, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে, গল্পের পর গল্পে এবং অবশ্যই 'বিবিধ প্রসঙ্গে'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তুঙ্গে, 'প্রবাসী' পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হাত মিলিয়ে ছিল ১৯২০ -২১ খ্রিস্টাব্দ-এর অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ এর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দায়, চল্লিশের দশকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায়, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থনে। 'প্রবাসী'র সব রকমের সহযোগিতা ছিল গান্ধী ও গান্ধী নীতির সঙ্গে। কংগ্রেসের স্বরূপ ও মর্যাদা এবং গান্ধীজীর উক্তি থাকত 'প্রবাসী'র পাতায় পাতায়। 'প্রবাসী' অকুন্ঠ চিত্তে ''ভারত সভা ও অসহযোগিতা প্রচেষ্টা'' শীর্ষকে বলেছে ''গান্ধীজীর অসহযোগিতা প্রচেষ্টা বা নীতিকে আমরা ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসঙ্গত এবং জাতীয় আত্মসম্মানের পরিচায়ক মনে করি।''[২] তুলনায় চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসু ম্লান। কিন্তু বহির্জগতের রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না 'প্রবাসী'। চিন-জাপান যুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা সহজ ভাষায় তুলে দিত পাঠকদের হাতে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর নীতি অনুসরণ করেছে 'প্রবাসী'তে। একথা বলার কারণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৩ই আশ্বিন মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মন্তব্য করেন, 'বর্তমান মহাসংকটের সময়

'প্রবাসী' পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ঋষি প্রতীম সেই প্রবীণ কাণ্ডারীর অভাব প্রতি মুহূর্তে আমরা অনুভব করিতেছি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টায় আমরা বিরত হইব না'।

'প্রবাসী' ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক ও অভিন্ন। একজনকে বাদ দিয়ে অন্য বিষয় আলোচনা করা অসম্ভব। তাই এই গবেষণার প্রায় সর্বত্রই বারে বারে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা উঠে এসেছে। সুতরাং 'প্রবাসী'তে যে বিংশ শতকের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারার প্রতিফলন ঘটেছিল সে বিষয়ে তাঁর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঝোঁক এর প্রধান কারণ। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর মনে স্বদেশ প্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। যা পরবর্তীকালে তাঁর পত্রিকায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় কবি রঙ্গলালের কবিতা 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'? ইত্যাদি পাঠে রাজনৈতিক ও স্বদেশ প্রেমের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। এই সময় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী রমেশচন্দ্র দত্ত এর তেজস্বী ও আত্মমর্যাদা এই দুই গুণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৈশোর থেকেই রমেশচন্দ্র দত্তের এই দুটি গুণের অনুশীলনে তৎপর হন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাস দুইটি পাঠ করেই সেই সময় থেকেই তিনি স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হন। পরবর্তীকালে 'প্রবাসী'তে নীরবে তা অনুশীলিত হতে থাকে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম কলকাতায় আসেন তখন এখানে নব-জাতীয়তার আলোড়ন শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্বদিকের ট্রাম লাইনের অপর পারে সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন একটি গ্যালারিযুক্ত আলাদ ঘর ছিল। যেখানে আনন্দ মোহন বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের' সাধারণ অধিবেশন বসত। এখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ প্রেম উদ্দীপক যুগান্তকারী বক্তৃতা করতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর এই রূপ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা গুলি থেকে নতুন করে স্বদেশ প্রেমের পাঠ নিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন : ''আমরা যখন কলকাতায় পড়তে আসি তখন ''স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন'' নামক একটি সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভ্যদের নেতা ছিলেন। এই সভার অধিবেশন হিন্দু স্কুলের একটি ঘরে হতে দেখেছি। সেই কক্ষে গ্যালারী ছিল। কত যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দেশ সেবায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।'[৩] যেখান থেকে স্বদেশ প্রেমের আহ্বান আসত, যেখানেই সমাজ হিতকর কাজের সন্ধান পেতেন, সেখানেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হতেন। দেশভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসের দর্শক রূপে উপস্থিত

ছিলেন।

স্বদেশের রাষ্ট্রীয় প্রগতির দিকেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শে তিনিও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ব্রাডল প্রস্তাবিত ভারত শাসন ব্যবস্থার সংস্কার কল্পে যে খসড়া ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়, তার সমর্থনে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজ জন্মভূমি বাঁকুড়া শহরে একটি সাধারণ সভা আয়োজন করে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বিলাতের পার্লামেন্টে ৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের কোনো কোনো অধিবেশনে এই সময় থেকেই সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেসেও যোগ দেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের আদর্শে নিষ্ঠাবান। তাই এলাহাবাদে গিয়েও অল্পদিনের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে রত হন। এই প্রদেশে কংগ্রেস কমিটির তিনি একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিখিল ভারতীয় নেতাদের কাছে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ রূপে পরিচিত ছিলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ লাহোর কংগ্রেসের পর তিনি এডুকেশন্যাল কমিটির উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কাশী কংগ্রেসে শিক্ষা-সংস্কার ও সরকারি শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে একটি ব্যাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। তিনি উক্ত প্রস্তাবের প্রাথমিক শিক্ষার অংশ সম্বন্ধে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সর্বদা জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন যে, জনসাধারণের শিক্ষার উপরেই আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পরবর্তী দশকে গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রস্তাবিত অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন।

এই সময় চিন্তাশীল ও কর্মীশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনা এবং 'প্রবাসী'র সম্পাদনা ও পরিচালনায় কঠোর পরিশ্রম ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলক সভা-সমিতি এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য কমবেশি পরিশ্রম করতেন। এর মধ্যে নতুন সংযোগ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সরকারি সিদ্ধান্ত। স্বদেশ ভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এতদিন নীরবে কাজ করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকেও একবার এলাহাবাদের কার্যকলাপ ব্যতীত কখনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক

আন্দোলনে তিনি যোগ দেননি। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভারত মায়ের ডাকে গৃহের মধ্যে থেকে একেবারে জন সাধারণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন : "....বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় এবং মহানুভব আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে যখন বরিশালের প্রসিদ্ধ কনফারেন্স হয়, তখন আমি এলাহাবাদে। এই জন্য এই সমুদয় ব্যাপার সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই।"[৪]

প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রস্তাব সরকার কর্তৃক ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হওয়ার পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে লেখেন: 'পৌষ মাসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়াই বাঙলা দেশে প্রবলতম আন্দোলন হইয়াছে।... বাস্তবিক কি কারণে লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ভগবানই জানেন; কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় ইহা ইংরেজের ভেদ মন্ত্র মূলক। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের তিনটি জাতিকে এখন ইংরাজ সন্দেহের চোখে দেখেন, - মারাঠা, বাঙালি ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিকে লর্ড কার্জন দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন।... আসামের ৩০ লক্ষ বাঙালি ছাড়া আর সব বাঙালি এক প্রদেশের। অতএব তাহাদিগকে বিভক্ত করা উচিত। এই ভাবিয়া বোধ করি লাট সাহেব এই কীর্ত্তি করিতে চাহিতেছেন।"[৫] সাংবাদিকদের শ্যেন দৃষ্টি সরকারি প্রস্তাবের মতলব ফাঁস করে দিতে যে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা পরম্পরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে জুলাই ভারত সরকার সিমলা থেকে বঙ্গভঙ্গের ঘোষনা করলে বাংলাদেশে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এর বার্তা ভারতের অন্যত্র পৌঁছাতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। এলাহাবাদেও বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা যায় তা 'প্রবাসী'র চোখে ধরা পড়েছে। বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট দিনে কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দেব ও বাঙালি ছাত্ররা শোক প্রকাশের জন্য খালি পায়ে কলেজে যায়। এলাহাবাদে তখন প্রবল উত্তেজনা, ক্ষোভ ও শোক। শহরের মহল্লায় মহল্লায় সাধারণ সভায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতে লাগল। প্রায় প্রত্যেকটি সভাতেই সভাপতি হতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই সকল সভায় স্বদেশী ব্রত গ্রহণের জন্য শ্রোতাদের উদ্বোধিত করতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহুপূর্ব থেকেই নিজে ও পরিবারে স্বদেশজাত জামাকাপড় ও জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন। সাধারণের কাছে তিনি স্বদেশীয় প্রতীক রূপে পরিগণিত হতেন। কিন্তু তৎকালীন বিলাতী কাপড় পোড়ান, কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজে, তিনি সায় দিতেন না। স্বদেশীর মূল আদর্শ সামনে রেখে চরকা-তাঁতের প্রচলন, কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কলকারখানা স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে বলতেন এবং লেখনী পরিচালনা করতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'প্রবাসী' পত্রিকাকে স্বদেশী ভাব ও ভাবনা প্রচারের বাহন করে তোলেন।

কৈশোরের স্মৃতি মন্থন করে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী এ সময়ের 'প্রবাসী'র কথা লিখেছেন : "হেনকালে সহসা ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রথম বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হল। এর পরে 'প্রবাসী' আর শুধু সাহিত্য-সমাজ-শিল্প কলার ভাবনা নিয়ে ব্যাপৃত রইল না। 'প্রবাসী' যেন দেশের বেদনা-ভাবনা, অপমান-লাঞ্ছনার গ্লানির কথা নিয়ে আকুল হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজ চিন্তা, চিত্র-শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় রাজনীতিকে সমান করে - এক করে নিলেন 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে - 'প্রবাসী'র বিখ্যাত লেখকদের নানা রচনায় ও প্রবন্ধে। দেশকে যেন এই চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে 'প্রবাসী' চালনা করতে লাগল"।[৬]

এই সময় বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখকবৃন্দ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্বদেশের মর্মবানী নানা রচনায় পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। রচনার বিষয় বস্তু ছিল বঙ্গ বিভাগের উদ্দেশ্য ও ব্রিটিশ কূটনীতি, স্বদেশী ও বয়কটের মূলকথা, জাতীয় শিক্ষা, দেশীয় চরকা ও তাঁতের প্রচার, স্বরাজ্য তথা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্ম নিয়ন্ত্রণ, সরকারী ভেদনীতি ও মুসলমান সমাজ, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-সমাজ সংস্কার, চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য ও এর ফলে সুরাটের 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রভৃতি। এই সমস্ত লেখার লেখকদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুহ, যোগেশ চন্দ্র রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে।

কিন্তু এসবের মধ্যে কেবলমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশব্রতী নিবন্ধ ছিল না। কারণ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'টি সম্পাদকের নিজস্ব কলম ছিল। ফলে আলাদা ভাবে তিনি কিছু লিখতেন না। এখানে তিনি নিজেই মতামত প্রকাশ করতেন। তিনি মনে করতেন যে সব কাজে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়, স্বদেশবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বোধ দৃঢ় হতে পারে তা স্বদেশব্রতীর মধ্যে অঙ্গীভূত। এই জন্যই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অভিনব আবিষ্কার বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের কথা উল্লেখ করে "স্বদেশী প্রসঙ্গ" শীর্ষকে লিখলেন : "**কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্বপ্রথম স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব ? চুড়ি ভাঙা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ানো নয়, এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নয়, সর্ব প্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদের সাড়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি; কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদের সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরেজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা**

কমিয়া আসিবে। যাহাতে আমাদের কোনও স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা।"[৭]

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে 'প্রবাসী'র সপ্তমবর্ষ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) থেকে নবযুগের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দ থেকে 'প্রবাসী'র শিরোভূষণ ছিল টেনিসনের এই কবিতাংশ -

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."

কিন্তু 'প্রবাসী' ১৩১৪ বঙ্গাব্দ আষাঢ় সংখ্যা থেকে ইংরেজি বর্জিত হয়ে শিরোভূষণ হল -

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

কোথায় যেন একটি স্বদেশী সুর ধ্বনিত হল। স্বদেশপ্রেমী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যা কিছু ভারতের কল্যাণকর বলে মনে করেছেন সে সমস্ত বিষয় পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছেন 'প্রবাসী'র মাধ্যমে এবং অকল্যাণকর বুঝলে তার নিন্দা ও সমালোচনা করতে ছাড়েননি 'প্রবাসী'তে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিভেদকে তিনি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। চরমপন্থীরা পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতি, নরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চান। তবে ভারতবর্ষ সেদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে যেদিন চরমপন্থী-নরমপন্থী নির্বিশেষে সকলেই এতে উৎফুল্ল হবে এবং শুভফলও দলমত নির্বিশেষে ভোগ করতে পারবে। উপরন্তু তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করেন যে, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র নবজাগ্রত এক জাতীয়তাবোধকে যখন টুঁটি চেপে মারতে উদ্যত তখন সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলা দরকার এবং এই সময় কংগ্রেসে এই রকম ভেদাভেদ জাতীয় প্রগতির পক্ষে বিপদজ্জনক। তিনি আরও বলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে মতবৈষম্য ঘটলেও এমন বহু সংগঠন মূলক সাধারণ হিতকর্ম আছে যেখানে চরমপন্ত্রী ও নরমপন্থী উভয়েই একযোগে কাজ করতে পারে। এর ফলে পরস্পরের মধ্যেকার অবিশ্বাস দূর হবে এবং জাতি সম্মিলিত কার্যের ফলে বহুদূর এগিয়ে যাবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে রাজনৈতিক দলাদলির কুফল সম্বন্ধে স্বদেশবাসীদের সতর্ক করেছেন। অনৈক্যে কেবল প্রগতি ব্যাহত হয় না, এর জন্য যারা আমাদের নিয়ত শাসন করতে উদ্যত সেই ব্রিটিশ শাসন অধিকতর বল পাবে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লঘু পাপে গুরুদণ্ড, সংবাদপত্র নিরোধ আইন, সভাসমিতি বন্ধ আইন,

অস্ত্র আইন প্রভৃতি নানা আইনের বেড়াজালে দেশবাসী আবদ্ধ হতে থাকে। শাসক জাতির এসব ছলা-কলা নিপুন ভাবে অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে 'প্রবাসী'তে দেখানো হতে থাকে। নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন দল ও মতের উর্দ্ধে থেকে জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। তিনি পুলিশের নজর এড়াতে পারেননি। গোয়েন্দা বিভাগ বেশ কিছুদিন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। নির্ভীক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত সদ্য জাগ্রত জাতীয়তার পরিপোষক সমস্ত বিষয়ই 'প্রবাসী'তে পরিব্যক্ত ও পরিবেশন করতে থাকেন। এজন্যই তাঁকে এলাহাবাদ ছাড়তে হয়েছে।

তখন বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ কেবল শুরু হয়েছিল। ঐ সময় বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত আলিপুর মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করে কম সাহসিকতার পরিচয় দেননি। অন্যদিকে নিতান্ত সন্দেহবশে বাংলার নয়জন শ্রেষ্ঠ কর্মী ও নেতা যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিন বিহারী দাস প্রমুখ বিনা বিচারে নির্বাসিত হলে তাঁদের সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করে জাতির মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিবারের দায়-দায়িত্ব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজেরই দায়দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেন। এ সময়ে এই পরিবারের হেপাজতে রক্ষিত রাজনারায়ন বসুর আত্মচরিত ছাপিয়ে দিয়ে আর্থিক সাশ্রয় করে দেন। 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এর কঠোর প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা হয়।

তিলক-বেসান্ত প্রবর্তিত 'হোমরুল' (স্ব-শাসন) প্রচেষ্টারও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐকান্তিক সমর্থক ছিলেন। ভারতবাসী যে স্ব-শাসনের উপযুক্ত তা তিনি তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ গুলিতে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করে স্বদেশবাসীদের এবং শাসক জাতিকেও বুঝিয়ে দিতে থাকেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সময় (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে নিজের এবং অন্যের লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলি গ্রথিত করে 'Towards Home Rule' নামক পুস্তক তিন খণ্ডে পর পর প্রকাশ করেন। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ সভ্য ও তথাকথিত অসভ্য মানুষের মধ্যে কি রকম স্ব-শাসন প্রচলিত ছিল, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ সমূহে এখনও তা কিভাবে বিদ্যমান-উক্ত গ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায়ে তা নানা দৃষ্টান্ত সহকারে দেখানো হয়েছে।

স্বাজাত্যবোধ ও মানবতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে মূর্ত হয়ে দেখা যায়। এজন্য স্বদেশীয়দের মধ্যে যেসব অসাম্য, কলুষ, ক্লেদ ও ভেদবুদ্ধি বর্তমান তা নিবারনের জন্য তিনি 'প্রবাসী'তে লেখনী পরিচালনা করেন। জাতিকে সুস্থ, সংহত, শক্তিমান করতে হলে এই সবের অবসান একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মানবতা

বিরোধী কার্যকলাপ দেখলে তিনি তার তীব্র নিন্দা করতে ছাড়েননি। নিগ্রোদের লিঞ্চিঙ্গ (খুঁটিতে বেঁধে অগ্নিদাহ) করার মর্মান্তিক ঘটনাগুলির উল্লেখ করে সুসভ্য মার্কিনীদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা উপস্থাপন করতেন। উন্নত ব্রিটিশ জাতি তাদের নারীদের ভোটাধিকারদানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, নারীদের সভা শোভাযাত্রা বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশি জুলুমবাদের চূড়ান্ত স্বীকার হতে হয় এবং মহিলা নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। রক্ষণশীল ব্রিটিশদের প্রগতি বিরোধী কার্যকলাপের দিকে পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ, আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। 'প্রবাসী' শুধু এর সমর্থন করেনি, এ বিষয়ে একপ্রস্ত সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করে, যা লেখেন কৃষ্ণলাল মোহন লাল ঝাভেরি।

ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রগতিশীল ও ভারত হিতৈষী বলে পরিচিত ছিল। এই দলের অন্যতম নেতা মি. র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ যখন তৎকালীন কংগ্রেসের কর্মকর্তারা মি. ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি মনোনয়ন করেন তখন 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন যে, 'ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিবিধ সমস্যা এদেশীয়দের দ্বারা যেমন ভাবে ব্যক্ত হতে পারে তেমন ভিন্ন দেশীয়দের দ্বারা সম্ভব নয়। এ কারণে দেশীয় কোনো নেতারই সভাপতি হওয়া প্রয়োজন।'[৮] ঠিক এই কারণেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মিসেস এনি বেসান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ দানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি সত্ত্বেও প্রতিবাদ করেন। ঐকান্তিক স্বাজাত্য বোধের জন্যই তিনি আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন করেন। পাঞ্জাবের অনাচার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট হুড' উপাধি বর্জনের সংকল্প করলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট হুড' বর্জন করে বড়লাটকে এর সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন তা 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপানো হয়। 'প্রবাসী' পাঞ্জাবে ব্রিটিশের কুকীর্তি সম্বন্ধে মাসের পর মাস তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিখে বিশ্ববাসীর গোচরে আনতে থাকে।

'প্রবাসী' কেবলমাত্র সাহিত্য পত্রিকা ছিল না, জাতির সর্বাধিক উন্নতিকল্পে যাবতীয় প্রচেষ্টার বিষয়ই এখানে রীতিমত স্থান পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ভারতবর্ষের অসহায় অবস্থা মনীষীদের কাছে সম্যকরূপে প্রকটিত হয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ দ্বারাই আমরা পুনরায় আত্মনির্ভর ও শক্তিমান হয়ে উঠতে পারব, এই ভাবনা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেস গৃহীত হয়। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব রচিত হয়েছিল। কিন্তু এর মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় অবিলম্বে ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সর্বদা ভারতবর্ষের স্বাধিকার লাভের জন্য লেখনী ধারণ করে আসছেন। এবারে এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যকে তিনি 'প্রবাসী'তে স্বাগত জানালেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সর্বদা হিংসার উপরে অহিংসারই স্থান দিয়ে এসেছেন। যা 'প্রবাসী'তে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নেতিবাচক দিকগুলির সবটাই তিনি সমর্থন করতে পারেননি। গঠনমূলক বিষয় যেমন চরকা ও খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর সমর্থন 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একাধিক বার প্রকাশিত হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর' ইত্যাদি 'চরকার গান' কবিতাটি 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হলে তা কিশোর মনকে ও উদ্বেলিত করেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র মাধ্যমে আমাদের এই কথাগুলি স্মরণ করে দেন - ''সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখ্ম, সর্ব্বম পরবশং দুঃখম''। এবং ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়...'' কবিতাংশটি।

কিন্তু এই সময় কতক গুলি বিষয় সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন আশা ভরসা জাগরিত করে যার দ্বারা নবোত্থিত বিশাল জনশক্তির অদূর ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ ঘটে। যেমন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ। যুক্তিবাদী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী এবং অসহযোগ আদর্শের সমর্থক হলেও এর প্রতিবাদ করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার মিলন' (আশ্বিন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) ও সত্যের আহ্বান' (কার্ত্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) এবং 'সমস্যা ও সমাধান' (অগ্রহায়ন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধগুলিতে জাতীয় আন্দোলনের অবাস্তব ও অযথার্থ বিষয়গুলির তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের পথে যে বাধা আছে, তা তুলে ধরে সমাধানের ও উপায় নির্দেশ করেন শেষ দুটি প্রবন্ধে।

কংগ্রেস থেকে সৃষ্ট স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপকেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সম্পাদক রূপে নজর রাখেন। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে করা হলেও তা যে অচিরে জাতীয় ঐক্যের মূলেই আঘাত করবে এবং ক্রমে বহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তা 'প্রবাসী'তে স্পষ্ট করে লেখা হয় এবং এর বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ করা হয়। এজন্য 'প্রবাসী'র সম্পাদককে অনেক সময় ব্রিটিশের রোষানলে পড়তে হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উচ্চমানের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, শিল্প বিষয়ক জীবনী গ্রন্থাদি 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করে একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ভারতবন্ধু ড: জ্যাবেজ টি. স্যান্ডারল্যান্ড কর্তৃক 'India in Bondege : Her Right to Freedom' নামক পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ ২১শে ডিসেম্বর। প্রবাসী প্রেসে ছাপা হলেও সজনীকান্ত দাস-এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। গ্রন্থটিতে লেখক ভারতবাসীর স্বারাজ সাধনা, স্বাধীনতা লাভে তার যোগ্যতা, পরাধীন

অবস্থায় ভারতের, ব্রিটেনের ও জগতের অমঙ্গল প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য নির্ভর ও যুক্তি নিষ্ঠ আলোচনা করেন। কিন্তু সরকার রাজদ্রোহাত্মক বিবেচনা করে বইটির প্রচার বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হন। এই সময়ে ৩১শে জানুয়ারি, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'Home Department Political, Bombay Castle' এ বিষয়টি নিয়ে গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল এর কাছে জানতে চান। এ সময়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন, চার্লস টেগার্ট। রাজদ্রোহের অপরাধে ২৫শে মে, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি পান।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ হঠাৎ ২৪শে মে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' অফিস ও সম্পাদকের বাড়ি খানাতল্লাশি করে। তল্লাশির সময় পুলিশ ৪৪টি ইন্ডিয়া ইন বণ্ডেজ বই, ৩৫০টি অবাঁধাই বই, ১০১টি বইয়ের কভার ও আরও অন্যান্য অনেক কিছু বাজেয়াপ্ত করেন। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে রাজদ্রোহের অপরাধে ৬ই জুন ধৃত হন এবং জামিনে মুক্তি পান। ১২ই আগস্ট মামলার শুনানি হয় ও ৬ পৃষ্ঠার একটি রায় ঘোষণা হয়। এই রায়ে সজনীকান্ত দাস ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয় এবং অনাদায়ে ৩ মাস জেলের সাজা ঘোষণা হয়। হাইকোর্টে আপীলের আবেদন না মঞ্জুর হওয়ায় এইখানেই তাঁকে নিরস্ত হতে হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট বুধবার 'The Calcutta Gazette. Extraordinary-তে তা প্রকাশিত হয়।[৯] খানা তল্লাশির সংবাদে মহাত্মা গান্ধী গভর্নমেন্টের কঠোর নিন্দা করেন। তিনি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে লেখেন; 'কোন ভারতবাসী যত বড়ই হোক না কেন, তাহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়াতে হবে - পাছে যে তার অবস্থার কথা ভুলিয়া যায়। গভর্নমেন্টের 'রক্ত নখর' দেখাইবার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।"[১০]

'প্রবাসী'র সম্পাদক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেন। এই অধিবেশন সর্বপ্রথম Complete Independence বা পূর্ণ স্বাধীনতার উপর প্রথম এক ব্যাপক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরই শুরু হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ব্যাপী আইন অমান্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতিবেদন 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাতায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রায় ৪৫টি বিষয় যথাযথ ভাবে মন্তব্য সহ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলি হল - লবন সত্যাগ্রহ, সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভারত রক্ষা আইনের প্রতিবাদে ছাত্র মিছিল, স্বাধীনতা দিবস পালন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, হলওয়েল মনুমেন্ট হিংসা ও অহিংসা সংগ্রাম প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়গুলি 'প্রবাসী' পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কেবল মাত্র প্রকাশ করেনি, বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ ও ন্যায় সংগত মন্তব্য করেছে। কখনো কখনো কেবলমাত্র ঘটনাটি মন্তব্যহীন ভাবে বিবৃত করা হয়েছে। দেশী ও

বিদেশী সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত ঘটনাকে রেফারেন্স হিসাবে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সত্যাগ্রহীদের লাঞ্ছনা ও প্রহারের ঘটনায় 'প্রবাসী' কেবলমাত্র নিরুৎবিগ্ন থাকেনি। এর যথেষ্ট নিন্দা ও প্রতিবাদও করা হয়েছে। শিল্পী নন্দলাল বসু অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধীর 'দন্ডীযাত্রা' শীর্ষক রঙীন চিত্রটি 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় ক্রমাগত বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্র নারী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং পুরুষের মত তাঁরাও লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ, কারাবরণ সবই স্বেচ্ছায় বরণ করেন। প্রতিমাসে 'প্রবাসী' দেশকর্মী সত্যাগ্রহী নারীদের, বাঙালি ও অবাঙালি নির্বিশেষে চিত্র প্রকাশ করে নারী-পুরুষ উভয়কেই দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে কিভাবে পরিবেশিত হত এবং কি মন্তব্য করা হয়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি দেশব্যাপী জাতীয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় এবং জনগণ স্বাধীনতার সংকল্পবানীর শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে ডান্ডি অভিযান শুরু করেন। ৬ই এপ্রিল সমুদ্র তীরে লবন আইন ভঙ্গ করেন।[১১] মে মাসে লবন গোলা দখল অভিযানে সরোজিনী নাইডু নেতৃত্ব দেন। 'প্রবাসী' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'গুজরাট ও মেদিনীপুর' শীর্ষক শিরোনামে গুজরাটের চাষীদের খাজনা বয়কট সত্যাগ্রহের সংবাদ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনুরূপ সত্যাগ্রহ মেদিনীপুরে হলে ও তা দৈনিক কাগজে প্রকাশিত না হওয়ায় 'প্রবাসী' পত্রিকা ক্ষোভ প্রকাশ করে।[১২] 'প্রবাসী' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাঙালির রাখীবন্ধন দিন পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় সরকার কর্তৃক 'পিকেটিং' সম্বন্ধীয় অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের বিষয়টি সমালোচনা করে শ্রীযুক্তা লুকমানীর মামলার আপীলে বোম্বাই হাইকোর্টের রায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ রায়ে বলা হয়েছে যে, "কেবল নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ পিকেটিং কোন অপরাধ নয়। ক্রেতা-বিক্রেতাকে ত্যক্ত বিরক্ত করলে, তাদের কাজে বাধা দান করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে'।[১৩] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট অভিযোগ করেন সত্যাগ্রহে নারীদের পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয়। এই অভিযোগের উত্তরে 'প্রবাসী' পত্রিকা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সত্যাগ্রহে নারীদের স্থান' শীর্ষকে বলেছে যে, 'মহাত্মা গান্ধী প্রথম নারীদিগকে এই বিপদসঙ্কুল অভিযানে যোগ দিতে দেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই স্বাধীনতা আহ্বানে স্বেচ্ছায় এতে যোগ দিয়েছেন। পাশ্চাত্য কেবলমাত্র নারীর সম্মান করতে জানে এ-ধারণা ভ্রান্ত"।[১৪] ভারতীয় সমাজেও নারীর সম্মানজনক স্থান

আছে বলে 'প্রবাসী' পত্রিকা মন্তব্য করেছে। 'প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পৌষ সংখ্যায় 'মিছিল সভা সমিতি ও পুলিশ কমিশনার' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে ''কলিকাতার বড় বাজারের রাস্তায় পাঁচজন মহিলা 'ঝান্ডা উঁচু রহে হামারা' এই হিন্দী গান করে বেআইনি মিছিল করেন - এই অভিযোগে তাঁদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল প্রধান বিচারপতি স্যার জন র‍্যাঙ্কিন এবং বিচারপতি এস.সি.মল্লিক তাঁদের বেকসুর খালাস করে দিয়ে রায়ে বলেন যে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলিকাতায় সব মিছিল সভা সমিতি বন্ধ করার ক্ষমতা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নেই। আইন সঙ্গত বিষয়ে আমান্য করলেই আইন অমান্য হয় না। এর সঙ্গে সর্বসাধারণের অসুবিধা ও শান্তিরক্ষা বিঘ্ন হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।''[১৫] 'প্রবাসী' পত্রিকা এ বিষয়ে মন্তব্য করে যে-''হাইকোর্টের এই রায় থেকে প্রমাণিত হয় যে পুলিশ কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেটর ও বাংলা গভর্নমেন্ট আইন জানে না, অথচ এরাই হলেন আইনের রক্ষক এবং শান্তি শৃঙ্খলার মা-বাপ''।[১৬] 'প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ চৈত্র সংখ্যায় লবন আইন সম্বন্ধে সরকার রাজস্বের বর্তমান দুর্দ্দশার অজুহাতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন করেনি বলে মন্তব্য করে।[১৭]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফতারের পর বড়লাটকে লেখা তাঁর পত্রটি 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এই পত্রের বিষয় ছিল 'মদের দোকানে পিকেটিং ও সত্যাগ্রহ অহিংসা সম্পর্কে'।[১৮] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে মধ্যরাত্রে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে সরকার যে সতর্কতা গ্রহণ করে, সে সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার মন্তব্য হল, 'এজন্য সরকারকে তারিফ করা যায়, কিন্তু গান্ধীজী চোর নন, বা তাঁর গ্রেপ্তারকে কেউ কি বাধা দান করত। একজন অহিংসব্রতী ব্যক্তিকে ধরার জন্য এত আয়োজন সরকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আসে না। মহাত্মাজীর নিদ্রার ব্যাঘাত প্রয়োজন ছিল না। এতে মনে হয়, মানুষের চারিত্রিক শক্তি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের মনেও আশংকার উদ্রেক করে।''[১৯] মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার সহধর্মিনীর জন্য কোন উপদেশ বা আদেশ আছে কিনা, উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি বীরাঙ্গনা, তাঁর জন্য বাণীর কি প্রয়োজন? গান্ধিজীর আত্মচরিতে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কস্তুরবা বাঈয়ের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, গান্ধীজী যখন কারারুদ্ধ হন তখন তাঁর স্ত্রী জালালপুরে দেশ সেবিকা নারীদের সঙ্গে বাস করছিলেন, এ সংবাদে তিনি অবিচলিত চিত্তে মন্তব্য করেন, 'ওঃ, তাতে কি আসে যায়? আমি একটুও বিস্মিত হই নাই'। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে বলেন যে এর জন্য দেশের স্বাধীনতা অর্জনের কাজ ব্যহত হবে না। আইনজীবিদের এখন আদালত ত্যাগ করা

উচিত। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, ভারতবর্ষে অন্য ধাতুতে গড়া সরকারকে তার কাজে যথোচিত জবাব দিতে হবে। খদ্দর পরিধান, চরকায় সুতো কাটা ও মদ্যপান নির্মূল তিনটি কাজ এখন করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধীর কারারোধের ফলাফল 'প্রবাসী' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে, ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিবৃত হয়েছে যে, 'সাধারণ মানুষ অমর নহে, কিন্তু অসাধারণ মানুষেরা মৃত্যুর পরেও নিজকীর্তি ও গুনে প্রভাবিত করে। গান্ধীজীর মানবপ্রেম ও অহিংস নীতিতে অবদান রয়েছে। কিন্তু সরকার মনে করেন যে গান্ধীজীকে বন্দী করলেই দেশে শান্তি ও সন্তোষ বিরাজ করবে, তা ভ্রান্ত ধারণা। কারারুদ্ধ গান্ধীজীর কোন চিত্ত বিকার নেই।'[২০] 'প্রবাসী' পত্রিকা একথা বলে মন্তব্য করেছে - 'আমরাও দুঃখিত, চিন্তিত, উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই। তাহা যদি হইতাম, তাহা হইলে গভর্নমেন্টের কাজের প্রতিবাদ করিতাম, কারণ প্রতিবাদ নিস্ফল এবং অক্ষমের ছদ্মবেশী ক্রন্দনমাত্র।'[২১] 'প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে বড়লাটকে মহাত্মা গান্ধী 'পুলিশের অত্যাচারের বাছা বাছা ছয়টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে চিঠি লিখেছে এবং এ ঘটনাগুলির তদন্ত প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন।'[২২] 'প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ চৈত্র, সংখ্যায় 'লর্ড আরউইনের প্রশংসা' শীর্ষকে লর্ড আরউইন কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর ভূয়সী প্রশংসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'মানুষ খুব সদাশয় না হইলে বিপক্ষের অকপট প্রশংসা মুক্ত কণ্ঠে করিতে পারে না। অতএব এই প্রশংসা হইতে মহাত্মা গান্ধীর হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রমাণিত হইতেছে।'[২৩]

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য লন্ডনে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই তিনটি গোলটেবিল বৈঠক তেমন কার্যকরী হয়নি। 'প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ সংখ্যায় লণ্ডনে যে ইঙ্গ-ভারতীয় কনফারেন্স হয় তার বর্ণনা করা হয়েছে। বড়লাটের এক বক্তৃতায় তার কিছু বর্ণিত হলেও ঐ বক্তৃতায় কোথাও তিনি উক্ত কনফারেন্সকে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বলেননি। 'প্রবাসী' পত্রিকা বড়লাটের এই সত্যবাদিতাকে প্রশংসা করে বলেছে যে, 'আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত নেতা এই বক্তৃতার পরেও এই কনফারেন্সকে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বলে চলেছেন।'[২৪]

'প্রবাসী' ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'গোল টেবিল' বৈঠক সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার বক্তব্য - 'ভারতবর্ষের জন্য যাঁহারা পূর্ণ স্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহিত সমানে সমানে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী আছেন। যাঁহারা নামতঃ না হইলেও, কার্যতঃ পূর্ণ স্বরাজ চান, তাঁহারাও গোলটেবিল বৈঠক চান। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজের অনুগ্রহে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই, ভিক্ষালব্ধ তন্ডুলের মত, উৎকর্ষপকর্ষ

বিচার না করিয়া, গ্রহনীয় মনে করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় টেবিলটা গোল না হইলেও চলিবে, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে টেবিলের চারিপাশে উপবেশনের পরিবর্তে কৃতজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতেও রাজী হইবেন।'[২৫] গোল টেবিলের উদ্দেশ্য ডোমিনিয়ান স্টেটাস বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা। বড়লাট বক্তৃতার ভাবটা এরূপ যে কংগ্রেস ইচ্ছা করলে এই কনফারেন্স যোগ দিতে পারেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় উক্ত কনফারেন্স সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছে যে 'এতে দাবী আদায়ের সামর্থ্য নিয়ে যাওয়া উচিত, ভিক্ষা পাত্র হাতে করে গিয়ে নয়।'[২৬] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক সংখ্যায় 'গোলটেবিল বৈঠক' শীর্ষকে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল।[২৭] প্রবাসী'র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের প্রাককালে 'বোম্বাই পুলিশ কমিশনের ধমকানি এবং দমন নীতির প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছে এবং লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল আশা ব্যঞ্জক হবে না বলেছে।'[২৮] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস নেতারা যাতে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে অবাধে সম্মিলিত ভাবে আলোচনা করতে পারেন, সেজন্য বড়লাট কর্তৃক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের জেলমুক্তি সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় মন্তব্য করেছে যে 'দমন ও নিগ্রহ নীতির অনুসরণ বন্ধ না করলে অন্ততঃ স্থগিত না রাখলে কেমন করে সন্ধির শর্ত আলোচিত হতে পারে?'[২৯]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অন্য যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়েছে তার কতকগুলি আলোচনা করা হল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের বর্তমান অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে নিউ ইয়র্ক সংবাদপত্র সমিতিকে যে মন্তব্য করেছিলেন তা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'অহিংস ভারতীয় সংগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষকে তার ইংরেজী ভাষ্যটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০] 'প্রবাসী' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ আষাঢ় সংখ্যায় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশকে পরিহাস বলে মন্তব্য করে উক্ত কমিশনের রিপোর্টের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছিল। কয়েকটি শীর্ষকে তা প্রকাশিত হয়েছিল। ''সাইমন রিপোর্টের প্রথম ভাগ'' শীর্ষকে ভারতের স্ব-শাসন ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন সমস্যার কথা বলে বিবৃত হয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্রমবিকাশ' 'দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় আপত্তি', 'গ্রামের অবস্থা' অন্যান্য কতিপয় বিষয় সমূহ যথা হিন্দু-মুসলিম মিলন, স্বভাব সিদ্ধনেতা, নারীদের অবস্থা, মহিলাদের প্রভাব, মুসলিমদের দাবী, হিন্দু-মুসলিম কনস্টেবলদের ব্যবহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পুলিশ বাক্যবানের লক্ষ্য আচরণ, রাজনৈতিক উদ্বোধন প্রভৃতি। সাইমন কমিশন রিপোর্টের শেষে বিবৃত করেছে যে ''ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমান পদবীর সাম্যের দাবী করে। ৭২ বছর পূর্বে মহারানী ভিক্টোরিয়ার

সাম্যের প্রতিশ্রুতির ফলে ভারতীয়দের এ দাবী নহে। এটা মানুষের জন্মগত অধিকার।"[৩১] এছাড়া ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাকে ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'[৩২] 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এসব ঘটনা দেশের যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইংরেজ সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর উপ আইন প্রয়োগ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। 'ভারতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করতে চেষ্টা করেছিল, তার সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছে।'[৩৩] 'প্রবাসী' পত্রিকা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ন সংখ্যায় সরকার কর্তৃক যখন তখন গ্রেপ্তারের সমালোচনা করেছে। 'প্রবাসী'তে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ১৩৩৭বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় 'দমন নীতির ফল' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'গভর্নমেন্ট দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে জনপ্রাণীহীন মরুভূমির শান্তি এবং শশ্মান ও গোরস্থানেও শান্তি বিরাজের মতন প্রচেষ্টা নিয়েছেন।'[৩৪] এখানে সরকার কর্তৃক জারি করা দুটি অর্ডিন্যান্সের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি অর্ডিন্যান্স হল যথাক্রমে আসামীর অসাক্ষাতে বিচার হবে, লাহোর ষড়যন্ত্র বিচারের জন্য এমত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিদেশী কাপড় ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং বেআইনী ও দন্ডনীয় করা হয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, 'প্রবাসী' পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা পালন করা উচিত তা ভালভাবে ও সীমিত অবস্থার মধ্যে পালন করেছিল যা সাংবাদিকতার জগতে প্রনিধানযোগ্য। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কিছু কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা হয়ত উপেক্ষিত বা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কিংবদন্তী সাংবাদিক ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ মেধা, নিষ্ঠা ও সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে যে ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তা ভারতীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. Sarkar, Sumit - 'Preface' in The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-8, New Edition, Permanent Black, Delhi , 2010, p. xxiii

২. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯৯

৩. দেবী, শান্তা - ভারত মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা,

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬
৪. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, ভূমিকা
৫. প্রবাসী, পৌষ ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮৮
৬. প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী : 'প্রবাসে প্রবাসী', পৃ. ১৬
৭. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮২
৮. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২০
৯. State Archives, Govt. of West Bengal - 1929, file no. - 108 (1-27) / 29, Subject - Enquiry by the Govt. of Bombay Reg. The Book "India in Bondege" and The question of its prosecution. Govt. of Bengal, Political Department, Political Branch.
১০. ইয়ং ইন্ডিয়া, ইংরেজীর তাৎপর্য - আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ৪৭৩
১১. প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৬
১২. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৬
১৩. প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪১-৪২
১৪. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৭
১৫. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪০
১৬. তদেব
১৭. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৮৫
১৮. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩১৩
১৯. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৩
২০. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩১১
২১. তদেব
২২. প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩৮
২৩. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৮৫
২৪. প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৬
২৫. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ , ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯০-৯১
২৬. তদেব
২৭. প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৫-৩৮
২৮. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ , ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯০-৯১
২৯. প্রবাসী, ফাল্গুন , ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩৭
৩০. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪১

৩১. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩১-৪৭
৩২. প্রবাসী, আষাঢ় , ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪১
৩৩. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৯
৩৪. প্রবাসী, আষাঢ় , ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৫
৩৫. http://crossasia-repository.ub.uni_heidelberg.de/1009/
৩৬. https.www.zhuberlin.de/transcience/vol.4issue/2013
৩৭. http://en.banglapedia.org/index.php?title=prabasi accessed on 25.06.2015
৩৮. https ://en.n.wikipedia.org
৩৯. West Bengal Public Net dispace.
৪০. www.calunive.ac.in

হিতোপদেশের আলোকে আধুনিককালে চর্চিত সামাজিক চিত্র

অরিন্দম মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ হল গল্পসাহিত্য। গল্পসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিশিক্ষা দান। সেই জন্যই বিভিন্ন নৈতিক বিষয়ে আমাদেরকে সম্যকরূপে অবগত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের পর 'হিতোপাদেশে'র মতো গল্পগ্রন্থের অবতারণা। পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা বিরচিত এই গ্রন্থটিতে নীতিশিক্ষাবিষয়ক কথাই বেশি উল্লিখিত হতে দেখা যায়, তথাপি আমাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নানাবিধ উপদেশাবলী এই গল্পগ্রন্থটির মাধ্যমে লাভ করা যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষের বহুবিধ সমস্যাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। আর সেই সমস্যার সমাধানও আমাদের আলোচিত এই হিতোপদেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। চরিত্রগুলির বেশিরভাগই পশুপাখির জগৎ থেকে গৃহীত হলেও তাদের চাল-চলন সবই মানবোচিত, এছাড়াও ব্যাধ, বণিক্, রাজপুত্র, পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নাপিত, স্ত্রীলোক প্রভৃতি মনুষ্যচরিত্রগুলিও বিভিন্ন গল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই হিতোপাদেশের বিভিন্ন গল্পের মধ্যে নীতিশিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে যেমন প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে ঠিক তেমনি বর্তমান সময়ের বহুলচর্চিত বিভিন্ন সামাজিক চিত্র, যেমন - সাধারণ মনুষ্যজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি, লোভ-লালসা, ভণ্ডামি, সংহতি, উদারতা, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয় এই গল্পগ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে।*

সূচকশব্দ : *গল্পসাহিত্য, হিতোপদেশ, নীতিশিক্ষা, উপদেশ, আধুনিককাল, চর্চিত, সমাজ, পশুপাখি, জীবজন্তু, পরিবেশ।*

মূল আলোচনা :

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অভিধা হল কথা। খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই সংস্কৃত কথাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। যদিও বৈদিক সংহিতায়

পশুপাখির গল্প পাওয়া যায় না, তবে ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকে দেবতা ও মানুষের সম্পর্কে অল্পকিছু গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইঁদুর, কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর গল্পের সন্ধান মেলে। আবার মহাভারতেও পশু-পাখি সম্পর্কিত একাধিক আখ্যান উপলব্ধ হয়। বৌদ্ধজাতকের গল্পগুলিও ছিল অতি প্রাচীন, তবে জাতকের কাহিনী ধর্মীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চমশতকে গ্রীক সাহিত্যের জনপ্রিয় গল্পগুলি 'ঈশপের গল্প' এরূপ নাম দিয়ে সংকলিত হয়েছিল। তবে যাই হোক সেই সময়ে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ কথাসাহিত্যের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষিত হয়েছিল। তার মধ্যে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলি সাধারণ স্তরে লোকপ্রিয় কথা রূপে মানুষের মুখে মুখে প্রচারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করতে থাকে এবং কালক্রমে সেইসব গল্পের সঙ্গে জনপ্রিয় লোককথার সংমিশ্রণে তা নতুন আঙ্গিকে নতুন ভাবে কথাসাহিত্যের বা গল্পসাহিত্যের রূপ লাভ করে।

পরবর্তীকালে গল্পসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, সেখানে যেমন মানুষের নানান চরিত্র নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে, ঠিক তেমনি খরগোশ, শিয়ালের মতো বিভিন্ন পশুপাখিকে নিয়েও গল্প লেখা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিশিক্ষা দান। এই নীতিশিক্ষামূলক বিষয়গুলি কেবল ছোটদের মাধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই জন্য বিভিন্ন নৈতিক বিষয়ে আমাদেরকে সম্যকরূপে অবগত করার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের পর 'হিতোপাদেশে'র মতো গল্পগ্রন্থের অবতারণা। আর তাছাড়াও এই 'হিতোপদেশ'-গ্রন্থ পাঠের দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধ বাক্যপ্রয়োগের কুশলতা জন্মায়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে –

'শ্রুতো হিতোপদেশোঽয়ং পাটবং সংস্কৃতোক্তিষু।
বাচাং সর্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ॥'[১]

'হিতোপদেশ' নামক সংস্কৃত গল্পগ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি – এই চারটি অধ্যায় সম্বলিত গল্পগ্রন্থটিতে মোট ৪৩টি গল্পের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রায় ২৫টি গল্পই পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছিল, যদিও সেকথা গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করেছেন যে পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য রচনা থেকে এগুলি সংগৃহীত – 'পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে'। যাইহোক এই গ্রন্থটিতে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পগুলির

বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটেছে। হিতোপদেশ যেমন কথাসংগ্রহ, ঠিক তেমনি তাকে নীতিবাক্য সংগ্রহও বলা যায় – 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'। যদিও হিতোপদেশ রচনার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে রাজা ধবলচন্দ্রের পুত্রদের নীতিশিক্ষা দানের কথাই বেশি উল্লিখিত হতে দেখা যায়, তথাপি আমাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নানাবিধ উপদেশাবলী এই গল্পগ্রন্থটির মাধ্যমে লাভ করা যায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনেও নানা পরিবর্তন আসে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত লক্ষ্য করলে, আমরা বিভিন্ন নীতিকথা বা প্রেম মূলক কাহিনীর পাশাপাশি হিংসা ও বিদ্বেষমূলক বিভিন্ন কাহিনীরও সন্ধান পাই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষের বহুবিধ সমস্যাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। আর সেই সমস্যার সমাধানও আমাদের আলোচিত এই হিতোপদেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। চরিত্রগুলির বেশিরভাগই পশুপাখির জগৎ থেকে গৃহীত হলেও তাদের চাল-চলন সবই মানবোচিত। এছাড়া ব্যাধ, বণিক্, রাজপুত্র, পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নাপিত, স্ত্রীলোক প্রভৃতি মনুষ্যচরিত্রগুলি যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমন সাধারণ মনুষ্যজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি, লোভ, ভণ্ডামি, সংহতি, উদারতা, ত্যাগ, সারল্য প্রভৃতি বিষয়ও উপলব্ধ হয়।

কঠোর জীবনসংগ্রামে পদে পদে সমূহ বিপদের শঙ্কা মাথায় নিয়ে চলার কথাও একাধিক গল্পে পাই। যেমন - কাকদম্পতির সাধের সংসারে হানা দিয়ে একটি সাপ বারবার শিশুদের খেয়ে ফেলতো। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কাক জনৈক স্নানরত রাজপুত্রের অলঙ্কার গাছের কোটরে এনে রাখে এবং ঐ অলঙ্কারের সন্ধান করতে করতে কর্মচারীরা এসে গাছের কোটর খুঁজতে গিয়ে সাপকে মেরে ফেলে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চমৎকার দৃষ্টান্ত। তবে এই পথে খাল কেটে কুমির আনার মতো ভ্রান্তির আশঙ্কাও থেকে যায়। সাপের অত্যাচারে সন্তান হারানোর দুঃখে বকেরা সাপের গর্ত থেকে নেউলের গর্ত পর্যন্ত মাছ ছড়িয়ে নেউলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নেউল সাপটাকে মারল বটে, কিন্তু তারপর বকের ছানাদের আওয়াজ শুনে সেখানে হানা দিতে এল। এক শত্রুর বদলে আর এক শত্রু শোষণ কায়েম করল। অন্যদিকে বাসভূমি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় পরিত্রাণের উপায় সন্ধানে মাছের দল স্বভাব শত্রু হলেও আপাতবিশ্বাসী বকের কাছে গেলে নিরাপদ দেশান্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বকটি এক একটি মাছকে ধরে গোপন আস্তানায় খেয়ে নিতে থাকে। অবশেষে কাঁকড়ার

যখন পালা এল, তখন দূর থেকে মাছের স্তূপীকৃত কাঁটা দেখতে পেয়ে সে বকের গলায় মরণকামড় বসিয়ে শয়তানির প্রতিশোধ নেয়। বেঁচে থাকার লড়াই এখানে তীব্র, সামান্য ভুলের মাশুল দিতে হয় প্রাণের মূল্যে, ঠিক যেন আমাদের বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি। কারও উপর ভরসা করা যায় না। কারণ আমরা জানি যথার্থ বন্ধু নির্বাচন করা খুব কঠিন ব্যাপার, কারণ যথার্থ বন্ধু বলতে বোঝায় যে আপদে বিপদে সর্বদা আমাদের সঙ্গ দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু।[২]

আবার দেখা যায় বাস্তব জ্ঞানশূন্য এক জন সংক্রান্তির দিন ছাতুভর্তি একটি পাত্র পেয়ে এক ব্রাহ্মণ-কুমারের চালায় দুপুরে বিশ্রাম নিতে নিতে স্বপ্ন দেখছিল – দশ কপর্দকে পাত্রটি বিক্রি করে ব্যবসায় নেমে সে তা থেকে লক্ষ টাকা কামাবে, অনেকগুলি বিয়ে করবে, সবচেয়ে যে সুন্দরী হবে তাকে বেশি প্রশ্রয় দেবে এবং তা নিয়ে অন্যরা ঝগড়া করতে এলে সে তাদেরকে লাঠি পেটা করবে। এই ভেবে হাতের লাঠিখানা ছুঁড়ে সে কুমোরের মাটির জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করে দেয়। বাস্তব সম্পর্কশূন্য হয়ে কল্পনা-বিলাসের দিবাস্বপ্নের এমন ফল স্বাভাবিক। এইরূপ বাস্তব সম্মত জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত কারার মতো এমন অসাধারণ গ্রন্থখানি আমাদের সমাজে আজও অচর্চিত বিষয়। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের জন্য সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত হিতোপদেশের মতো এই সকল অচর্চিত গ্রন্থের চর্চা আরও প্রচুর পরিমাণে হওয়া প্রয়োজন।

আবার মাংসলোভে হরিণের সঙ্গে গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব করার সময় শেয়ালের যুক্তিও প্রায় একরকম। অজ্ঞাতকুলশীল হলেই অবিশ্বাস করতে নেই। হরিণের প্রাণের বন্ধু কাকও একদিন তার কাছে অজ্ঞাতকুলশীল ছিল, অথচ পরিচয়ের পর তাদের বন্ধুত্ব দিন দিন বেড়েছে। আপন পর ভেদ করা উচিত নয়, তার থেকে বরং উদারতা কাম্য। এই রকম সব গালভরা কথায় ভুলিয়ে একদিন কৌশলে হরিণকে একটি ফসলের জমিতে অবৈধভাবে খাদ্যসংগ্রহের বিপদসঙ্কুল কাজে প্ররোচনা দিয়ে ধূর্ত শেয়াল কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। চাষীর জালে আটকে হরিণ সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানালে তার উত্তরস্বরূপ ধূর্ত শেয়াল বলেছিল – রবিবারদিন সে নাকি আমিষ ছোঁয় না, সুতরাং পরের দিন পর্যন্ত তাকে আপেক্ষা করতে হবে। এই ভাবে শেয়ালের ধূর্ততার গল্পের মাধ্যমে আমাদের ধূর্তব্যক্তির থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন গ্রন্থকার। আর না হলে ধূর্তব্যক্তির সংস্পর্শে থাকলে আমাদের কিরূপ পরিণতি হয় তা কেবল হিতোপদেশেই নয়, আমাদের বার্তমান সমাজেও তা সর্বদা পরিলক্ষিত হয়।

শত্রুমিত্র চিনবার বিভ্রান্তি ঘটলে যে মারাত্মক ফল হতে পারে, তার নানা দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি গল্পে। ব্রাহ্মণের পোষা নেউল ভয়ঙ্কর একটি সাপকে কামড়ে মেরে ফেলে রক্তাক্ত মুখে হাজির হলে লোকটির কেমন যেন ধারণা হয় যে তার শিশুপুত্রই নেউলের কামড়ের শিকার হয়েছে। ক্রুদ্ধ, অবিবেচক গৃহকর্তা লাঠি দিয়ে নেউলটাকে মেরে ফেলার পর সবিষাদে আবিষ্কার করে যে বিচার বিভ্রমে সে মিত্রকেই হত্যা করে বসে আছে। এরূপ আমাদের বর্তমান কুটিল পরিবেশে বিভ্রান্তি ঘটাবার উপকরণ কিছু কম নয়, সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। আবার আস্ত ছাগলকে বারবার কুকুর বলতে থাকার পরিণামে বামুনঠাকুর অপপ্রচারের বিভ্রান্তিতে পড়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে কুকুরভ্রমে ছাগলটাকে ফেলে দিয়ে ধূর্তদের উদরপূর্তির নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায়। ঠকা তার ভবিতব্য। প্রবঞ্চনার এমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা করার যোগ্য পাকা মাথা সমাজপরিবেশে সেদিন যেমন ছিল, আর বর্তমান সময়ে যে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, তা তো বলার আপেক্ষা রাখে না।

তাছাড়াও সবক্ষেত্রে এক নৈতিকতার মানদাণ্ড যে নির্ধারক নয়, তা মানুষের গল্পগুলতে বেশ প্রকটভাবে দেখা যায়। বেশ কয়েকটি গল্পে লক্ষ্য করা যায়, অন্য পুরুষের সঙ্গে বণিক্-পত্নী, গোপপত্নী প্রভৃতির ভ্রষ্টাচার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিন্দার বিষয় হয়নি। আধুনিককালের ন্যায় প্রাচীনকালেও উক্তবিষয়গুলি যথেষ্ট চর্চার বিষয় ছিল।

বর্তমান সময়ের বহুল চর্চিত বিষয় হল 'ধন'। যার ধন অর্থাৎ টাকা আছে তারই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সব থাকে, আর যার টাকা নেই তার কেউ নেই। টাকা থাকলে মূর্খব্যক্তিও পণ্ডিত বলে বিবেচিত হয় – এই বিষয়টি এই সময়ের বহুল চর্চিত বিষয় হলেও, এই রীতি সূদুর অতীতে সেই খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকেও প্রচলিত ছিল। যার প্রমান স্বরূপ হিতোপদেশে উল্লিখিত হয়েছে –

'যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ॥'[৩]

সেখানে আরও বলা হয়েছে – 'নির্ধনকে তার নিজের স্ত্রী পর্যন্ত ছেড়ে যায়।'[৪] হিতোপদেশের বিগ্রহে বলা হয়েছে – মানুষ তো মানুষের দাস হয় না, হয় টাকার দাস।

'ন নরস্য নরো দাসো দাসস্তু অর্থস্য ভূপতে।'[৫]

এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন যুগের সংস্কৃত শাস্ত্রের অচর্চিত বা আংশিকচর্চিত এই সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সমাজে সবথেকে বেশি। কারণ সংস্কৃত

শাস্ত্রের অচর্চিত বিষয়গুলি তথ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ, সেগুলিকে আধুনিক সমাজে যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে চর্চার আঙ্গিনায় নিয়ে আসা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

তাছাড়াও আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করি লোভের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিপথে চালিত হতে, তাই অবশ্যই লোভ ত্যাগ করা উচিত। কারণ লোভ থেকে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, আর লোভ থেকে কাম, আবার লোভ থেকে মোহ এবং লোভ থেকেই তার নাশ হয়।[৬]

এই রূপ লোভের বশবর্তী হয়ে – রাজ্যলোভে আকৃষ্ট কর্পূরতিলক হস্তী, ধূর্ত শিয়ালের দর্শিত পথ ধরে ছুটতে ছুটতে পাঁকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অবস্থা আমরা জানি। তাই ধূর্তজনের সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। তাই শাস্ত্রে প্রবাদ আছে – সৎসঙ্গে স্বর্গ লাভ, আর অসৎসঙ্গে নরক লাভ। এপ্রসঙ্গে হিতোপদেশে বলা হয়েছে –

‘যদি সৎসঙ্গনিরতো ভবিষ্যসি ভবিষ্যসি।
তথাঽসজ্জনগষ্ঠীষু পতিষ্যসি পতিষ্যসি।।’[৭]

তবে শঠতা ও চূড়ান্ত ভণ্ডামির নীতিহীন প্রকাশ বেশ জটিল একটি সমাজ-আর্বতের পরিচয় বহন করছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। হীন সবার্থসিদ্ধির জন্য এক ঝুড়ি মিথ্যা বলতে বাধছে না, যেখানে সেখানে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে, মানুষকে বোকা বানানোর জন্য নিজের সততা ও ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে আত্মশ্লাঘা প্রচারের শেষ নেই এবং সুযোগ বুঝে বিশ্বাসভঙ্গ, অপরাধকর্মে প্ররোচনা, তুচ্ছ অজুহাত তুলে সঙ্গীর বিপদের সময় দূরে থাকা, নির্মম রসিকতা, এমনকি কদর্য বিদ্রূপবর্ষণের নিষ্ঠুরতা প্রকাশেও কুণ্ঠা নেই আমাদের সমাজে। এরূপে গল্পের সবজায়গাতে যে, সত্যের জয় আর অসত্যের যেমন পরাজয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, তা নয়। হরিণকে বিপদে ফেলতে গিয়ে যে শেয়ালটির চাষীর লাঠিতে প্রাণ গেল, তার না হয় শাস্তি হয়েছে দেখা গেল, কিন্তু সরলমতি বপুষ্মান্ হাতিকে রাজা করার লোভ দেখিয়ে যে দুর্বুদ্ধি শেয়াল তাকে পাঁকে নামাল, তার চাতুরী পুরস্কৃত হল বললেই চলে।[৮] আসলে, ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধিই বড় কথা, নৈতিকতার বশে কেউ ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থটাই যেন এখানে বিচার্য।

বর্তমান সমাজে আমরা লক্ষ্যকরি কেউ কেউ তার নিশ্চিত বস্তুকে ত্যাগ করে অনিশ্চিত বস্তুর পিছনে ধাবিত হয়, যার ফলে তার অনিশ্চিত বস্তুর লাভ তো হয় না, আর অপর দিকে নিশ্চিত বস্তুটিকেও লাভ করতে পারে না। সেই জন্য সর্বদা ভাবনা চিন্তা করে কাজ করা উচিত। এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি।।'[৯]

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকযাত্রা নির্বাহের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ ও লোকচরিত্র বিচারের ইতি ঘটেনি এই গল্পগ্রন্থে। রাজবাড়ির কিশোরদের মুখ চেয়ে লিখতে বসে একেবারে সাক্ষাৎ রাজনৈতিক বিতর্কের আঙিনায় হাজির হয়েছেন গ্রন্থকার। বেশ কতকগুলো গল্প রাজার সঙ্গে মন্ত্রীদের বা মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর আলোচনা নিয়ে লেখা যেখানে মূল বিষয় রাজ্যশাসন, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। অধিকার-অনধিকারের প্রশাসনিক দক্ষতা দেখানোর জন্যই নীলোৎপাটি বানরের আত্মঘাতী কাজ এবং কুকুর ও গর্দভের বিতর্ক উপস্থিত করা হয়েছে। গাছের গুঁড়ি চেরাই করতে গিয়ে এক ছুতোর মিস্ত্রি দুইখন্ড কাঠের মাঝখানে একটি যে কীলক গুঁজে রেখেছিল, অনধিকারচর্চা করতে গিয়ে একটি বানর গায়ের জোরে সেটিকে তুলে ফেলার ফলে কাঠের প্রবল চাপে পড়ে নিজে প্রাণ হারায় — এই হল এক পর্যায়ের বাহাদুরি। বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে নিজের প্রাণটাই বিসর্জন দিতে হলো। আবার অন্য গল্পে দেখেছি, প্রভুর বাড়ি রাত্রিবেলা চোর ঢুকছে দেখে পালিত গাধা ও কুকুর কর্তব্য নির্ণয় করতে মেতেছে। গাধা সরল বিশ্বাসে প্রভুকে তৎক্ষনাৎ জাগানোর জন্য কুকুরকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কুকুর তার নিয়োগ ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং যেহেতু সবদিক সুরক্ষিত হয়ে আসছে দেখে প্রভু ইদানীং কুকুরের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন, সুতরাং মজা দেখানোর জন্য সে চুপচাপ থাকতে চায়। গাধার যুক্তি হল, বিপদের সময় প্রভুর উপর জুলুম করা অন্যায়। কুকুরের বক্তব্য, শুধু ঠেকায় পড়লে যে প্রভু কর্মচারীকে খাতির করে, আর অন্য সময় তার অনাদর করে, সে প্রভু নির্দয়। প্রভুভক্তির তাগিদে গাধা অধিকার লঙ্ঘন করে চেঁচামেচি করে প্রভুকে জাগালো বটে, কিন্তু তার কাজের মূল্য কেউ বুঝল না, বরং ঘুম ভাঙানোর অপরাধে লাঠির আঘাতে তাকে প্রাণ দিতে হল। আনুগত্যই যথেষ্ট নয়, নিজ অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করা হবে, এ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রাজপুত্রদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দরকার, তাই সেকথা ভেবেই গ্রন্থকার এরূপ গল্পের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে সচেতন করেছেন।

আবার রাজচরিত্র প্রসঙ্গে কটূক্তি করে বলা হয়েছে কাছাকাছি ঘুরঘুর করে এমন সব অপদার্থ বিদ্যাহীন লোকেদের রাজারা প্রশ্রয় দেয়।[১০] মন্ত্রী ও কর্মচারীদের হাতের পুতুল হওয়া রাজার পক্ষে কাজের কথা নয়। নিশ্চেষ্ট থাকাও তার মানায় না। সচিব

হোক আর রাজপুত্র হোক, রাজাজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ সাংঘাতিক। রাজার প্রিয়জন, বাটপার রাজকর্মচারী, শত্রু এবং রাজার নিজের লোক প্রজাদের নিরাপত্তার পক্ষে সমান অর্থাৎ তা বিভীষিকা স্বরূপ।[১১] বিষাক্ত খাবার, নড়বড়ে দাঁত, আর খারাপ স্বভাবের মন্ত্রীর সমূলে বিনাশ করা উচিত। একজন মন্ত্রী বেশি গুরুত্ব পেলে শেষপর্যন্ত রাজত্বলোভে রাজদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।[১২] নতুন লোকেদের বেশি গুরুত্ব দিলে অন্তর্ঘাতের আশঙ্খা থেকে যায়। কারও অপরাধ সম্বন্ধে নিজে নিঃসংশয় হয়ে তবে দণ্ডদান কর্তব্য।[১৩] সাধুসন্তদের মতো সবাইকে ক্ষমা করা যে রাজধর্ম নয়, তা হিতোপদেশে উক্ত হয়েছে।[১৪] প্রয়োজনে পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, বন্ধু হত্যা করতেও রাজার পিছপা হতে নেই। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে –

‘পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা সুহৃৎ।
প্রাণচ্ছেদকরা রাজ্ঞা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।।’[১৫]

এই ভাবে বিভিন্ন কাহিনী উপস্থাপনের মাধ্যমে রাজার বা মন্ত্রীর কর্তব্য বিষয়েও পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা আমাদের সম্যক্ ধারণা প্রাদান করেছেন।

হিতোপদেশের বিভিন্ন চরিত্রগুলি গল্পের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা দেখে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। আর বিশেষ বিশেষ নীতিকথামূলক উপদেশাবলীগুলি যেন ইদুঁর, হরিণ, কাক প্রভৃতির মুখ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান জীবনে চলার পথে আশা, দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি, লোভ-মোহ প্রভৃতির সম্মুখীন হলে মানুষ কোন পথ বেছে নেবে তার একটি দিক্ দর্শন আমরা এই গ্রন্থ থেকে লাভ করতে পারি। আর তাছাড়া ধর্মের প্রশংসা, গুরুজনের নির্দেশ মান্য করার প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়, মানুষের উপকারের সুফল, বিশ্বাসঘাতকের স্বভাব, দানের প্রশংসা, পতিব্রতা নারীর লক্ষণ, সত্যের জয়, বিদ্বানের গুরুত্ব প্রভৃতি কি নেই এই গ্রন্থে অর্থাৎ ভালো-মন্দ সকল বিষয়ের উদাহরণ সহ উপদেশাত্মক বর্ণনা সুন্দরভাবে, সুললিত ভাষায় গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পগ্রন্থে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কী বিশাল এবং বিচিত্র এই উপমহাদেশের ভাণ্ডার। এমন কোন দিক নেই, যা আলোচিত হয়নি। আনেক ক্ষেত্রই তা ভাবমুখে এবং অভাবমুখে দু’ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে, যার ফলে সকলের মনের মণিকোটায় খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে। প্রসঙ্গত, দু-একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে, যেমন – ‘বীরবরকথা’ অংশে বীরবর যখন নিজের কর্তব্য সম্পাদনের সময় কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে কোনো এক

রমণীর করুণ বিলাপের কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখে যে রাজা ও রাজ্যের কল্যাণে বীরবরের নিজ পুত্র শক্তিধরের আত্মত্যাগ এবং পিতার প্রতি তার উক্তি যে, ‘আমি ধন্য, প্রভুর (রাজার) রাজ্যরক্ষায় আমার জীবন সার্থক হবে। এরূপ কার্যে এ দেহের ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারন, প্রাজ্ঞব্যক্তি ধন ও জীবন পরের জন্য বিসর্জন দেন। বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎকার্যে জীবন উৎসর্গ করাই শ্রেয়’। অর্থাৎ -

‘ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেত্।
সন্নিমিত্তং বরং ত্যাগো বিনাশো নিয়তে সতি।।’

এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে এই গ্রন্থের সারগর্ভ উপাখ্যানগুলির মধ্যে সর্বত্রই অমূল্য নীতি, উপদেশ ছড়িয়ে রয়েছে, যা কেবল ছোটদের জন্যই নয় আমাদের সমাজের সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্য সর্বদা শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয়। বর্তমানে এই সামাজিক অবক্ষয়ের সময়ে মহামারী বা মারামারি-হানাহানির মতো সকল সমস্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিতোপদেশের কল্যাণকর বাণী তথা উপদেশাত্মক নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়, কারণ আমরা গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করেছি শাস্ত্রবাক্য না মানার পরিণাম। তাই উক্ত শাস্ত্রবাক্য মানলে বড়ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। আর তাছাড়া উক্ত গল্পগুলির থেকে বোঝা গেল যে, কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ভালো করে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, অর্থাৎ কোন কাজ করার আগে ভাবতে হবে। অতএব আমাদের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে ভালো রাখার জন্য এবং আরো সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে সমাজকে গড়ে তোলার জন্য হিতোপদেশের ‘হিত’ অর্থাৎ মঙ্গলময় উপদেশাবলী সকলের মেনে চলা উচিত।

তথ্যসূত্র :

১. হিতোপদেশ – ১/২

২. ‘উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।’ (মিত্রলাভ – ৭৪)

৩. মিত্রলাভ – ১২৭

৪. হিতোপদেশ - ২/৯৩

৫. তদেব - ৩/৭৮

৬. ‘লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি, লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ, লোভঃ পাপস্য কারণম্ ।।’ (মিত্রলাভ – ২৭)

৭. মিত্রলাভ – ২০৪
৮. তদেব
৯. তদেব – ২১২
১০. হিতোপদেশ - ২/৫৮
১১. তদেব - ২/১০৯
১২. তদেব - ২/১২৮
১৩. তদেব - ২/১৩৭
১৪. তদেব - ২/১৮০
১৫. তদেব - ২/১৭৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *সাহিত্যে ছোটগল্প*। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা): ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৫ (বঙ্গাব্দ)।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পা.)। *মিত্রলাভ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

শর্মা, নারায়ণ। *হিতোপদেশ*। সম্পা. এম. আর. কালে। দিল্লী: মোতিলাল বণারসী দাস, ২০০৪।

শর্মা, নারায়ণ। *হিতোপদেশ*। সম্পা. বালশাস্ত্রী। বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১২।

অশ্বঘোষের মহাকাব্যে চর্চিত প্রকৃতি ও পরিবেশ চিন্তন

জয়শ্রী দে

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ,

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সারসংক্ষেপ : *প্রকৃতির বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য ও অনুকূল পরিবেশ প্রকৃতিপ্রেমিক প্রতিটি কবি ও সাহিত্যিকের মনে ভাবের উন্মেষ ঘটায়। আর সেই ভাব থেকেই জন্ম নেয় অসংখ্য কাব্য, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতি সারস্বত রচনার। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে রামায়ণোত্তর ধ্রুপদী যুগের সূচনাপর্বে অতিপ্রসিদ্ধ, কবি, নাট্যকার, বৌদ্ধধর্মাচার্য্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের চিরস্মরণীয় সর্বাধিক খ্যাতিমান আচার্য হলেন মহাকবি অশ্বঘোষ। তিনি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা যেখানে তিনি নানা আঙ্গিকে অর্থাৎ কাব্যিকভাবে অথবা উপমা দিয়ে পরিবেশ তথা প্রকৃতিকে ব্যক্ত করে স্বকীয় রচনার দ্বারা নিজেকে একনিষ্ঠ প্রকৃতি-পরিবেশ প্রেমী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকৃতির চিরন্তন রূপ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত অশ্বঘোষের কাব্যকর্মে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মহাকবি অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘বুদ্ধচরিত’ ও ‘সৌন্দরনন্দ’ নামক দুটি মহাকাব্য, ‘শারিপুত্রপ্রকরণ’ নামক প্রকরণ নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব কৃতি। ‘মহাযানশ্রদ্ধোতপাদশাস্ত্র’, ‘বজ্রসূচি’, ‘সূত্রালঙ্কার’, ‘গণ্ডীস্তোত্রগাথা’ ও ‘ত্রিদন্ডমালা’ নামক রচনাগুলিও তাঁর নামে প্রচলিত হলেও তিনি এগুলির যথার্থ রচয়িতা কিনা সেবিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দিহান। আমি যেহেতু মহাকবির মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করছি, সেহেতু মহাকবির ‘বুদ্ধচরিত’ ও ‘সৌন্দরনন্দ’ – এই দুটি মহাকাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি তথা পরিবেশবিষয়ক ভাবনা আমার আলোচ্য বিষয়।*

সূচকশব্দ : *প্রকৃতি, পরিবেশ, মহাকাব্য অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, আশ্রম, বৃক্ষ, পশুপাখী।*

মূল আলোচনা :

প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক অতিনিবিড়। বিভিন্ন কবি, সাহিত্যক, নাট্যকারেরা তাদের সাহিত্যের মূল রসদ জুগিয়েছেন এই প্রকৃতি তথা পরিবেশ থেকেই। সাহিত্যের একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে এই প্রকৃতি ও পরিবেশ। যেকোনো দেশে যেকোনো সাহিত্যের

প্রধান উপজীব্য বিষয় হল প্রকৃতি ও পরিবেশ। আবহমান সংস্কৃত সাহিত্যও প্রকৃতি নির্ভর। তাই প্রকৃতির বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য ও অনুকূল পরিবেশ প্রকৃতিপ্রেমিক প্রতিটি কবি ও সাহিত্যিকের মনে ভাবের উন্মেষ ঘটায়। আর সেই ভাব থেকেই জন্ম নেয় অসংখ্য কাব্য, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতি সারস্বত রচনার।

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে রামায়ণোত্তর ধ্রুপদী যুগের সূচনাপর্বে অতিপ্রসিদ্ধ, কবি, নাট্যকার, বৌদ্ধধর্মাচার্য্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের চিরস্মরণীয় সর্বাধিক খ্যাতিমান আচার্য হলেন মহাকবি অশ্বঘোষ। তিনি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য জ্ঞাত না হলেও জানা যায়, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। আচার্য্য, মহাকবি, ভিক্ষু, ভদন্ত, মহাতার্কিক প্রভৃতি নানা বিশেষণে আখ্যায়িত অশ্বঘোষ সঙ্গীতকার, পণ্ডিত, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও উৎসাহী বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসেবেও অত্যধিক খ্যাতিমান ছিলেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা যেখানে তিনি নানা আঙ্গিকে অর্থাৎ কাব্যিকভাবে অথবা উপমা দিয়ে পরিবেশ তথা প্রকৃতিকে ব্যক্ত করে স্বকীয় রচনার দ্বারা নিজেকে একনিষ্ঠ প্রকৃতি-পরিবেশপ্রেমী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকৃতির চিরন্তন রূপ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত অশ্বঘোষের কাব্যকর্মে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মহাকবি অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' নামক দুটি মহাকাব্য, 'শারিপুত্তপ্রকরণ' নামক প্রকরণ নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব কৃতি। 'মহাযানশ্রদ্ধোতপাদশাস্ত্র', 'বজ্রসূচি', 'সূত্রালঙ্কার', 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' ও 'ত্রিদন্ডমালা' নামক রচনাগুলিও তাঁর নামে প্রচলিত হলেও তিনি এগুলির যথার্থ রচয়িতা কিনা সেবিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দিহান। আমি যেহেতু মহাকবির মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করছি, সেহেতু মহাকবির 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' – এই দুটি মহাকাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি তথা পরিবেশবিষয়ক ভাবনা আমার আলোচ্য বিষয়।

বুদ্ধচরিত :

বুদ্ধের জীবনাবলম্বনে রচিত অষ্টাবিংশতি সর্গবিশিষ্ট 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যটি মহাকবি অশ্বঘোষের একটি মহান শিল্পকর্ম। মূল মহাকাব্যটি অষ্টাবিংশতি সর্গবিশিষ্ট হলেও প্রথম সর্গ থেকে চতুর্দশ সর্গ (১-১৪) পর্যন্ত মহাকবি অশ্বঘোষের মূল রচনা, অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ পঞ্চদশ সর্গ থেকে অষ্টাবিংশতি সর্গ (১৫-২৮) পর্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ নেপালী পণ্ডিত

অমৃতানন্দ কর্তৃক রচিত ও সংযোজিত বলে ধরা হয়। তবে অশ্বঘোষ প্রদত্ত চতুর্দশ সর্গবিশিষ্ট এই মহাকাব্যটি অত্যন্ত কুশলতার সহিত রচিত হয়েছে। যেখানে মূল আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পাশাপাশি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য ও পরিবেশ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

বুদ্ধচরিতের 'ভগবত্‌প্রসূতি' নামক প্রথম সর্গে বর্ণিত হয়েছে ভগবান্ বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা। শাক্যদের মধ্যে সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনে তৎপর, ইক্ষাকুবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন ও রত্নসারযুক্তা মায়াদেবীর পুত্র হলেন ভগবান্ বুদ্ধ। এই পরম পুরুষ মূলত প্রজা কল্যাণের নিমিত্তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাঁর জন্মসময়েও তাঁর জননীর কোনো রকম প্রসবযন্ত্রণা বা রোগব্যাধি ছিল না। পুষ্য নক্ষত্রে ব্রত-পরিশুদ্ধা মায়াদেবীর অর্থাৎ তাঁর জননীর পার্শ্বদেশ থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

'ততঃ প্রসন্নশ্চ বভূব পুষান্তস্যাশ্চ দেব্যা ব্রতসংস্কৃতায়াঃ।
পার্শ্বাৎ সুতো লোকহিতায় জজ্ঞে নির্বেদনং চৈব নিরাময়ং চ।।'[১]

বনস্থলীতে স্বভাবতই নিবিড়, শান্ত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যাকীর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। তাই রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী মায়াদেবী ভগবান্ বুদ্ধের জন্মের প্রকৃত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন রমণীয় লুম্বিনী বনকে। মায়াদেবী স্বেচ্ছায় লুম্বিনী নামক বনে যেতে উদ্যোগী হলেন - 'সা লুম্বিনীনাম্নি বনে মনোজ্ঞে ধ্যানপ্রদে দেববনাদনূ্যনে।' সূর্যের মতো দীপ্তিবিশিষ্ট ভগবান্ বুদ্ধ নিজের সমুজ্জ্বল গাত্রদীপ্তির দ্বারা দশদিক আলো করেছিল ও স্বর্ণের মতো অসামান্য রূপগৌরবের দ্বারা ত্রিভুবনকে আলোকিত করেছিল –

'স হি স্বগাত্রপ্রভয়োজ্জ্বলন্ত্যা দীপপ্রভাং ভাস্করবন্মুমোষ ।
মহার্হজম্বূনদচারুবর্ণো বিদ্যোতয়ামাস দিশশ্চ সর্বাঃ।।'[২]

অর্থাৎ দেখা যায় যে, বিচিত্র পরিবেশ ও প্রকৃতির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত এই কপিলাবস্তু-নগরীর বর্ণনায় মহাকবি বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত।

পরিবেশের আনুকুল্যতা

ভগবান্ বুদ্ধের জন্মলগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মস্তকে ঝরে পড়েছিল আকাশ থেক পতিত শুভ্র চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল ও উষ্ণ দুই প্রকার বারিধারা। তাঁর শয্যা হিসেবে ছিল স্বর্ণ-পালঙ্ক। সেই স্বর্ণ-পালঙ্কের পায়াগুলি বৈদুর্যমণিতে আকীর্ণ। এমনকি দেবতারাও অর্থাৎ যক্ষরাজেরাও স্বর্ণ-কমল হাতে নিয়ে মর্ত্যে অবতরণ করলেন ভগবান্ বুদ্ধকে দেখার জন্য।

'শ্রীমদ্বিতানে কনকোজ্জ্বলাঙ্গে বৈডূর্যপাদে শয়নে শয়ানম্ ।

যদ্গৌরবাৎ কাঞ্চনপদ্মহস্তা যক্ষাধিপাঃ সংপরিবার্য তস্থূঃ।।'[৩]

সেই বনস্থলীতে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘহীন আকাশ থেকে নীলপদ্মযুক্ত ও চন্দনযুক্ত বৃষ্টি হতে থাকল – 'সচন্দনা চোৎপলপদ্মগর্ভা পপাত বৃষ্টির্গগনাদনভ্রাৎ।'[৪] স্পর্শসুখকর মনোজ্ঞ অনুকূল বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল, সূর্য অধিকতর দীপ্ত হয়েছিল, শান্ত শিখাযুক্ত অগ্নি ইন্ধন ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল -

'বাতা ববুঃ স্পর্শসুখা মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ ।
সূর্যঃ স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্জ্বাল সৌম্যার্চিরনীরিতোঽগ্নিঃ।।'[৫]

বাসস্থানের উত্তর-পূর্ব দিকে খনন কার্য ছাড়াই স্বয়ং শুভ্র জলবিশিষ্ট কূপের সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে অন্তঃপুরবাসীগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তীর্থস্নান মনে করে স্নাদাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন -

'প্রাগুত্তরে চাবসথপ্রদেশে কূপঃ স্বয়ং প্রাদুরভূৎসিতাম্বুঃ।
অন্তপুরাণ্যাগতবিস্ময়ানি যস্মিন্ ক্রিয়াস্তীর্থ ইব প্রচক্রুঃ।।'[৬]

বুদ্ধের দর্শনের জন্য সমাগত ধর্মপিপাসু মানুষ ও দেবতাদের দ্বারা বনস্থলী পরিপূর্ণ হয়েছিল, এমনকি দেবতা ও মানুষদের মতো পুষ্পরাশিও কৌতূহলবশত ভগবান্ বুদ্ধকে দেখার আশায় অসময়েই বৃক্ষে বৃক্ষে সমুৎপন্ন হয়েছিল-

'ধর্মার্থিভিভূতগণৈশ্চ দিব্যৈস্তদ্দর্শনার্থং বনমাপুপূরে।
কৌতূহলেনৈব চ পাদপেভ্যঃ পুষ্পাণ্যকালেঽপি নিপাতিতানি।।'[৭]

সেই সময় অশান্ত, অনিষ্টকর প্রাণীরা স্বজাতি ও অন্যের পীড়া সৃষ্টি না করে পরস্পর মিলিত হয়ে হিংসাবর্জিতভাবে অবস্থান করেছিল এবং জগতে মানুষের যা কিছু রোগব্যাধি ছিল সেগুলি বিনা চেষ্টাতেই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। পশুপাখিরাও মধুর কলরবকরতে থাকল, নদীগুলি নিঃশব্দে অর্থাৎ শান্ত ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, দিক্মন্ডল প্রসন্ন হল, মেঘমুক্ত ও নির্মল পরিবেশে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল।

'কলংপ্রণেদুঃ মৃগপক্ষিশ্চ শান্তাম্বুবাহাঃ সরিতো বভূবঃ।
দিশঃ প্রসেদুর্বিমলে নিরভ্রে বিহায়সি দুন্দুভয়ো নিনেদুঃ।।'[৮]

সৌন্দরনন্দ

অষ্টাদশসর্গবিশিষ্ট মহাকবি অশ্বঘোষের দ্বিতীয় রচনা হল 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্য। মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের অপর এক নিদর্শন হল এই মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় হল - বুদ্ধ কর্তৃক বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকে (সুন্দরকে) সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করানো। কপিলাবস্তু নগরীর মনোরম বর্ণনা,

রাজার বর্ণনা, তথাগতের বর্ণনা, নন্দের অনুপম সুন্দরী ভার্যার প্রার্থনা, নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, ভার্যা বিলাপ, নন্দের বিলাপ, স্ত্রীবিঘাত, নন্দের অপবাদ,স্বর্গ দর্শন, নন্দের ধ্যান ও ইন্দ্রিয়বিজয়, আর্যসত্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি এই মহাকাব্যের মূল আলোচ্য বিষয়।

আশ্রমের প্রকৃতি ও পরিবেশ

সৌন্দরনন্দের প্রথম সর্গে মহর্ষি গৌতম কপিলের আশ্রমের প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর ছায়া পরিলক্ষিত হয়। সেই আশ্রম ছিল তপস্বীদের তপস্যার আশ্রয়স্থল। যেখানে সুন্দর লতাকুঞ্জ ও তৃনভূমির দ্বারা আশ্রমের শোভা বর্ধিত হত। তপস্বীদের নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে উত্থিত ধূম সর্বদা মেঘের মতো শোভা বর্ধন করত। স্নিগ্ধ ও বিস্তৃর্ণ ভূমিভাগ কেসর পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় মনে হত যেন অঙ্গরাগে চিত্রিত। এই আশ্রমনির্মল, পবিত্র, সুন্দর কমলপুষ্পে শোভিত হওয়ায় তীর্থস্বরূপ বলে মনে হত। আশ্রমের চারপাশে প্রচুর ফুল, ফল ও বনরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ, যা আশ্রমের শোভা বর্ধন করে। নিবার ধান, ফলে সন্তুষ্ট, শান্ত নিরভিলাষ তপস্বীদের দ্বারা সমৃদ্ধ এই আশ্রম। যজ্ঞীয় অগ্নিতে আহুতির ধ্বনি, ময়ূরের কেকা রব, তীর্থ স্নান প্রভৃতির শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যেত না। আশ্রমে হিংস্র পশুরাও শান্তভাবে বিরাজ করতো। যজ্ঞীয় বেদির উপর হরিণদের নিঃস্তব্ধে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যেতো। যা মহাকবির মহাকাব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সুতরাং বলা যেতে পারে, আশ্রমের পরিবেশ ও চারপাশের প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত, স্নিগ্ধ, নিবিড়ভাবে বিরাজ করতো, যা আশ্রমের পরিবেশের পক্ষে অনুকূল ছিল।

কপিলাবস্তু-নগরীর পরিবেশ

ভগবান্ বুদ্ধের বসবাসের উপযুক্ত স্থান ছিল কপিলাবস্তু নগরী। সেই নগরী মহর্ষি কপিলের আশ্রমের সন্নিকটেই অবস্থিত। ঋষি কপিলের নির্দেশানুসারেই এই নগরীর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। তাই এই নগরীর নাম কপিলাবস্তু। ঋষি কপিলের আশ্রমের পার্শ্ববর্তী স্থানে এই নগর নির্মিত হয়েছিল।

‘কপিলস্য চ তস্যর্ষেস্তস্মিন্নাশ্রমবাস্তুনি।
যস্মাত্তেত তৎপুরং চক্রুঃ তস্মাৎ কপিলাবস্তু তৎ।।’[৯]

এই নগরীর পরিখা ছিল নদীর মতো প্রশস্ত, প্রধান পথ ছিল সরল ও বিশাল, নগরীর প্রাচীর ছিল পর্বতের মতো উচ্চ, যেন সুবিশাল গিরিপথ।[১০] প্রাসাদের উপরতলের সামনে ছিল প্রশস্ত বারান্দা, ও সুবিভক্ত বিপণি সমন্বিত। নগরীর চারিপাশে স্থানে স্থানে সরোবর ছিল। এই সরোবরের জল ছিল অতীব পবিত্র। এই নগরীর চারপাশ মনোরম

রাজপথ ও উপবনে সমৃদ্ধ। এছাড়াও সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামশালাও নির্মিত ছিল। নগরের হস্তি, অশ্ব, রথ পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও নগরের কোথাও কোনো অংশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টিহতে দেখা যায় না।

অর্থাৎ কপিলাবস্তু নগরীর প্রকৃতির শান্ত, সুশৃঙ্খল, শব্দ-কোলাহলবর্জিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশের আভাস পাওয়া যায় মহাকবির রচনায়।

পরিবেশ ও আনুকুল্যতা

অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবের জন্মের সময়ে পরিবেশের আনুকূল্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন — আকাশ থেকে শুরু হল পুষ্পবর্ষণ।[১১] সূর্য্য আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান হল এবং বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল – 'দিদীপেঽভ্যধিকং সূর্যঃ শিবশ্চ পবনো ববৌ।'[১২] ঋতুচক্রের আবর্তন এবং চন্দ্রে ক্ষয় কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে — ঋতু চলে যায়। তা আবার ফিরে আসে। চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার তার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নদীর জলধারা বা মানুষের যৌবন একবার চলে গেলে ফিরে আসে না।

'ঋতুর্ব্যতীতঃ পরিবর্ততে পুনঃ ক্ষয়ং প্রয়াতঃ পুনরেতি চন্দ্রমাঃ।
গতং গতং নৈব তু স্নগ্নির্বর্ততে জলং নদীনাং চ নৃণাং চ যৌবনম্।।'[১৩]

পরিবেশের উপাদান হল পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম। এদের সম্বন্ধে ভাবনাও সৌন্দরনন্দে পাওয়া যায় — 'তরলতা যেমন জলের ধর্ম, কঠিনতা যেমন পৃথিবীর গুণ, চলমানতা যেমন বায়ুর বৈশিষ্ট্য, অবিরাম উত্তাপ যেমন অগ্নির ধর্ম — তেমনি দেহ ও মনের ধর্ম দুঃখভোগ।

'অপাং দ্রবতবং কঠিনতবমূর্ব্যা বায়োশ্চ লতবং ধ্রুবমৌষ্ণ্যহ্যমগ্নেঃ।
যথা সবভাবো হি তথা সবভাবো দুঃখং শরীরস্য চ চেতসশ্চ।'[১৪]

এইভাবে প্রকৃতির এবং পরিবেশের বহু ঘটনার কথা সৌন্দরনন্দের মাধ্যমে মহাকবি অশ্বঘোষ ফুটিয়ে তুলেছেন।

বুদ্ধের জন্মের পর থেকে পরিবেশে পশুপাখিদের রক্ষা বিষয়ে সচেতনতা অবশ্যই বেড়েছিল, কারণ বুদ্ধ ছিলেন প্রাণীদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ এবং অহিংসার পূজারী। তারই প্রভাবে যারা প্রাণিবধ করে জীবিকা নির্বাহ করত, তারাও কোন জীবিত প্রানীকে ক্ষুদ্র হলেও আঘাত করত না। আর যারা অভিজাত, বহুগুন সম্পন্ন, দয়াযুক্ত তাদের তো কোন কথাই নেই। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধচরিতে উক্ত হয়েছে –

'ন জিহিংস সূক্ষনমপি জন্তুমপি পরবধোপজীবনঃ।
কিংবত বিপুলগুণঃ কুলজঃ সদয়ঃ সদা কিমু মুনেরুপাসয়া।।'[১৫]

বুদ্ধের এই মৈত্রী ও অহিংসার বাণী পরিবেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবশ্যই সহায়ক। এই বানী সৌন্দরনন্দে বহু স্থানে ধ্বনিত হয়েছে। নন্দের প্রতি উপদেশে বলা হয়েছে — ‘সকল প্রাণীর প্রতি তুমি মৈত্রী ও করুণার বৃত্তি অনুশীলন করবে।’ একইভাবে বলা হয়েছে – হিংসাক্লিষ্টচিত্তে মৈত্রীচিন্তার অনুশীলন করার কথা। নিজের উপর আঘাতের প্রয়োগ হলে কি হয় সে কথা চিন্তা করে। দবেশাত্মক চিত্তকে প্রশমিত করার জন্য মৈত্রীর প্রয়োজন – ‘ব্যাপাদদোষক্ষুভিতে তু চিত্তে সেব্যা স্বপক্ষোপনয়েন মৈত্রী।’[১৬] নন্দও বুদ্ধের মৈত্রীর কথা বলেছেন – তথাগত সকল জীবের প্রতি যে অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা বিস্ময়ের, কারণ অতিশয়িত মৈত্রীতে উদ্বুদ্ধ তার মন। তাই বলা হয়েছে - ‘অহোহি সত্ত্বেষবতিমৈত্রচেতসস্তথাগতস্যানুজিঘৃক্ষুতা পরা।’[১৭]

এই ভাবে সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণীর মাধ্যমে পশু প্রভৃতিদের রক্ষার প্রচেষ্টা দেখা যায়। পরবর্তীকালে পশুপাখীদের রক্ষার বিষয়ে যে ভাবনা তারই পূর্বাভাস মেলে অশ্বঘোষের রচনায়। অতএব পরিবেশ রক্ষায় বুদ্ধচরিতের মতো সৌন্দরনন্দেরও অবদান স্বীকরণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. বুদ্ধচরিত, প্রথম সর্গ - ৯
২. তদেব - ১৩
৩. তদেব - ১৭
৪. তদেব - ২১
৫. তদেব - ২২
৬. তদেব - ২৩
৭. তদেব - ২৪
৮. তদেব – ২৬
৯. সৌন্দরনন্দ - ১/৫৭
১০. ‘সরিদবিস্তীর্ণপরিঘং স্পষ্টাঞ্চি তমহাপথম্।
শৈলকল্পমহাবপ্রং গিরিব্রজমিবাপরম্।।’ (সৌন্দরনন্দ, ১/৪২)
১১. সৌন্দরনন্দ - ২/৫৩
১২. তদেব - ২/৫৪
১৩. তদেব – ৯/২৮

১৪. তদেব – ১৬/১০

১৫. তদেব - ৩/৩০

১৬. তদেব - ১৬/৬২

১৭. তদেব - ১৮/৪৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

অশ্বঘোষ। *বুদ্ধচরিতম্*। সম্পা. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮।

অশ্বঘোষ। *সৌন্দরনন্দম্*। সম্পা. জগদীশচন্দ্র মিশ্র। বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০২।

দাস, দেবকুমার। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: সদেশ, ২০১৬।

বসু, প্রসুন ও বসু, রত্না (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

নিমসাহিত্য ও দুটি অ-চর্চিত নিমগল্প

কৈলাশপতি সাহা
সহকারী অধ্যাপক
রামানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : *সাহিত্যের প্রবহমানতায় বাঁক বদলের ইতিহাস নতুন নয়। সাহিত্য যখন গতানুগতিকতাকে বহন করে এনে গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসায় তখনই শুরু হয় প্রথা ভাঙার খেলা। দেশে দেশে কালে কালে এমনটাই ঘটে আসছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর ছয়ের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে একদল তরুণের সাধ হয়েছিল সাহিত্যের অভিমুখ বদলে দেওয়ার। হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন এর ধারায় সত্তর দশকের শুরুতে সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামোয় প্রবল আঘাত হানে নিমসাহিত্য আন্দোলন। কলকাতা থেকে অনেকটাই দূরে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছিল সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়।*

সূচক শব্দ : *নিমসাহিত্য, আন্দোলন, বিরোধীতা, দুজন গল্পকার, দুটি নিমগল্প, ভবিষ্যত।*

মূল আলোচনা:

নিমসাহিত্য কোনো তথাকথিত সাহিত্য বা নাদুসাহিত্য নয়। নিমসাহিত্য একটা জীবন্ত মনুষের শরীরের জীবনযাপনের, তার মানসিক অবস্থানের, শরীরের বিচিত্র এবং নানা অনুভূতির, শরীরজাত প্রলাপ, বাণীরূপ, গর্জন, হুঙ্কার, হাসি, কান্না, যন্ত্রনার একটি উলঙ্গ উচ্চারণ। নিমসাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত ভারতের দুর্গাপুর শহরের ইস্পাত কারখানার মধ্যে। বিমান চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বণিক, অজয় নন্দী মজুমদার, নৃসিংহ রায়, সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ এই ছয় জন তরুণ নিমসাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকেছেন। ইস্পাত কারখানার এই ছয়জন কর্মী শক্ত হাতে সামলাতেন এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রদানবের রাজ্যপাঠ। ফার্নেসের মাত্রাছাড়া উত্তাপ, বীভৎস রোলিং মিল, অ্যাসিড ট্যাঙ্কের পুকুর, নাছোড় নাইটসিফট ডিউটি, ধোয়া-ধুলো-গ্যাস আর অসম্ভব মৃত্যুভয় তাদের মধ্যে তৈরি করেছিল জীবন সম্পর্কে বীতরাগ। কারখানার নিয়মের প্রতি ক্ষোভ, জীবনের প্রতি বিদ্বেষ থেকেই উঠে এসেছে বিদ্রোহ, সাহিত্যিক প্রতিবাদ— না সাহিত্য, অল্প সাহিত্য, তিক্তবিরক্ত সাহিত্য বা নিমসাহিত্য।

সম্পূর্ণ নতুন কিছু করার উৎসাহে এই ছয় জন কর্মী নানান জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময় মিলিত হয়েছেন। কেবল প্রথাগত সাহিত্যের প্রতি নয়, প্রচলিত তথা গতানুগতিক জীবন-যাপনের প্রতি তাঁদের ছিল অনীহা। হরেক রকমের উদ্ভট ও আশ্চর্য রকমের কাণ্ড-কারখানা ঘটতে থাকল নিম জেনারেশনকে ঘিরে। নিম সাহিত্যিক বিমান চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"প্রথাগত সাহিত্যের ড্রয়িংরুম তছনছ করে, ভাষাকে রোলে রোলে চিড়েচ্যাপ্টা করে, খেলো ধোঁয়াটে অন্যের যাপন- নামতাকে সুর করে বলার বদলে, নিজেদের আর্তনাদকে নিজেদের মূল্যবোধের ওপর গেঁথে তুলতে, আনতে চাই এক নতুন পরাভাষা, নতুন পরাবয়ন, নিজস্ব পরাজগৎ। যা হবে—না সাহিত্য অল্প সাহিত্য তিক্ত-বিরক্ত সাহিত্য নিমসাহিত্য।"[১] কোনো সাজানো গোছানো সাহিত্যের আড্ডা পছন্দ ছিল না তাঁদের। কারখানার পরিত্যক্ত শেডের নীচে, উল্টে থাকা ওয়াগেনের ভিতরে, প্রত্যন্ত গ্রামের খোলা মাঠে, নদীতে বাঁধা নৌকায় বসে চলত আড্ডা। আর ছিল রবীন্দ্র গুহের ঘরে ৮ ফুট বাই ৫ ফুটের একটি বাতিল কক্ষ। সেখানেই পড়া হত নতুন নতুন সাহিত্য, সেখান থেকেই গড়ে উঠত প্রতিবাদ। 'নিমসাহিত্য' নামটির পিছনে যে যুক্তি আছে সেই প্রসঙ্গে 'নিমসাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"অতপর আমাদের শব্দ হবে নিম, বর্ণ হবে নিম, গন্ধ হবে নিম ফুলের, নিমের মধু হবে ভাষা, ঘামে নিমের নির্যাস, দেহের ছালে নিমের কারিকুরি, তিক্ত কথায় নিম ঔষধি। অর্থাৎ বৈপরিত্য। সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবদান পুনরাবৃত্তির পথ থেকে সরে আসা।"[২]

নিমসাহিত্যের একটি ক্যাপশানে বলে হয়েছে—'জীবনের কোনো ধর্ম নেই- কার্যকারণের কোনো ব্যাখ্যা নেই।' চারপাশ জুড়ে এই বিশাল সিসটেমেটিক চলমানতার বিরুদ্ধে নেটিভ নিম লেখকরা ছিলেন অসম শক্তি। ফলে ওই আপ্তবাক্যটি দিয়ে এই পারিপার্শ্বিকতার সিস্টেমকে আঘাত করতে তারা আর কিছু না পেরে ভেন্টিলেশন হিসেবে নিম লেখাকেই হাতিয়ার করেছিলেন। নিম সাহিত্যিক বিমান চট্টোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বক্তব্য—"মরজগতের মানুষের যাবতীয় মনন-প্রক্রিয়ার মস্ত উচ্চারণ নিমসাহিত্যের আওতাভুক্ত। সেই মনন প্রক্রিয়ার উচ্চারণ হতে পারে কখনও স্যুরোরিয়ালিস্টিক, কখনও ফ্যান্টাসি, কখনও স্বপ্নচারণা, কখনও ইমেজিস্ট, কখনও ম্যাজিক রিয়ালিটি, কখনও শবদেহজাত আত্মার খুব কাছাকাছি। অর্থাৎ পরলোকযাপনের অনুভূতি। অথবা আসতে পারে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের নানা উচ্চারণ। এমন কি ১০৬° জ্বরের ডিলিরিয়াম কখনও মানুষের অবচেতনের উচ্চারণে উঠে এসে এক শৃঙ্খলাহীন 'না সাহিত্যে'র রূপ

নিতে পারে। কি আসবে আর কি আসবে না—নিমলেখক নিজেই তা জ্ঞানত অবহিত নন। নিম লেখক শুধুই উপভোগ করেন উচ্চারণের চরম স্বাধীনতা।”[৩] তবে নিমসাহিত্যিকদের কাছে এই স্বাধীনতার অর্থ স্বৈরাচারিতা নয়। কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বগুলিকে আয়ত্ত করে নিমসাহিত্যের জন্ম হয়েছে এমনটা নয়। যাপনের যন্ত্রণা, জীবনকে নতুন করে বিবেচনা করার তাগিদে প্রথাগত সাহিত্যের বাঁধা ধরা নিয়মকে নস্যাৎ করে দিয়ে লেখা হয়েছে নিমসাহিত্য।

নিমসাহিত্য আন্দোলনের কোনো স্বঘোষিত ম্যানিফেস্টো ছিল না। আন্দোলনকারীরা তাঁদের চিন্তা চেতনা শ্লোগানের আকারে ‘নিম সাহিত্য’ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ডার লাইনের নীচে মোটা হরফে ছেপেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিম সাহিত্যিক বিমান চট্টোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—“নীতিগত কারণেই আমরা কোনও ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করিনি কখনও। ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে কিছু বললে আবার সেই গণ্ডির মধ্যে ফেঁসে যাওয়া। চূরান্ত স্বাধীন উচ্চারণে বাধা আসবে।”[৪] তবে শ্লোগানগুলিতে নিমসাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। কয়েকটি শ্লোগান ছিল এই রকম—

১) লেখক হওয়ার বাসনা জাগা মাত্র আত্মহত্যা করুন।

২) জীবন মানেই প্রধানত জীবনের সমস্ত পুঁজ রক্ত থুতু ও লালা।

৩) এক হাতে নিজের হৃদপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে অন্য হাতে কলম ধরুন।

৪) ব্যারেলের উপর থেকে প্রজাপতিটা উড়িয়ে দিন।

৫) সাহিত্যের অতীত এখন মৃত। এখন আমাদের নিয়ে সাহিত্য আমাদের দ্বারা সাহিত্য।

৬) সাহিত্য অভিজ্ঞতার ফল নয়, অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য।

৭) কালীমার্কা ফিনাইলে সাহিত্যের দুর্গন্ধ দূর হয় না। বোধের মূলে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রয়োগ করুন।

৮) সাহিত্যে গোপনতা বা চতুরতা বলে কিছু নেই। মূত্রথলী টনটন করলে আমরা দেয়াল বা ঝোপের আড়াল খুঁজি না।

‘নিম-সাহিত্য’ পত্রিকার নানা সংখ্যায় ছড়িয়ে থাকা এমনই অনেক শ্লোগানে ধরা ছিল নিম জেনারেশনের লক্ষ্য। শ্লোগানগুলি কারও একার রচনা নয়। নিমসাহিত্যের আড্ডা এই শ্লোগানগুলির উৎস। পত্রিকার পাতায় শ্লোগানগুলি ছেপে নিজেদের আন্দোলনকে আরও স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন পাঠকের মনে।

নিম সাহিত্যিক বিমান চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'নিম সাহিত্য' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং নিম জেনারেশনের নাভিমূল।[৫] 'নিম সাহিত্য' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা বাদে প্রতিটি সংখ্যাতেই নিমগল্প লিখেছেন বিমান চট্টোপাধ্যায়। ইস্পাত কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা, বিচিত্র মানুষের সঙ্গলাভ, জীবনের প্রতি অনীহা তাঁর গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছে। জীবনের ব্যক্ত-অব্যক্ত যাবতীয় উচ্চারণকে বিমান ধরে ফেলতে চেয়েছেন নিমগল্পে। সাহিত্যের সাজানো শব্দশৃঙ্খল ভেঙে দিতে চেয়েছেন চরম স্বাধীনতা উপভোগের বাসনায়। সাহিত্যের বাসর থেকে কোনও শব্দকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন নি। তিনি চাননি সাহিত্যিকদের গড়ে তোলা সাহিত্যিক পরিকাঠামোর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে। সাহিত্য লিখে পাঠকের মন ভরানোর কোনও দায়িত্ব তিনি নিতে চাননি বলে, কখনও আর কোনও দায় স্বীকার করেন নি। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করতে গিয়ে শুধু সাহিত্য জীবনে নয়, ব্যক্তিজীবনেও নানা আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন তিনি। তবে কোনও আক্রমনই তাঁকে টলাতে পারেনি নিম সাহিত্যের আদর্শ থেকে।

'নিম সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বিমান চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'প্রথম সমীকরণ'। কতগুলি ঘটনা, কিছু উত্তেজনা যুক্তিপরম্পরাহীন কিছু প্রলাপ গল্পটির দেহ নির্মাণ করেছে। মাঝে মাঝে টেনশন তৈরি করে কাহিনির একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত লেখক রেখে দিয়েছেন এই গল্পে। 'নিম সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত শ্লোগানকে মান্যতা দিয়ে লেখক হয়ে ওঠার কোনও চেষ্টা করেন নি বিমান আলোচ্য গল্পে। গল্পটির শুরুতেই রয়েছে একটি গাণিতিক সমীকরণ। গল্পের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন গাণিতিক শব্দ—জ্যামিতিক অক্ষর। যেমন—

'X^2 + হৃদয় শূন্যতা বা শিশুর ওয়েটিং রুম
Y^2 - স্বয়ং এবং অন্যান্য
= মধ্যাহ্ন স্মৃতি'

এভাবে অঙ্কের সঙ্গে জীবনকে মেলানোর চেষ্টা রয়েছে সমগ্র গল্প জুড়ে। গল্পটি পাঠ করার পর পাঠকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এমন হয়—গণিত নিয়ে এ কোন পাগলামি করেছেন বিমান। তবে একটু ভিন্ন পথে ভাবলে বোঝা যায় সময়ের সযত্ন রচিত অন্ধকারে আমাদের চেতনা যদি দিশা হারায়, তবে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষই পাগল হয়ে যেতে পারে যে কোনও সময়। বুদ্ধিমান অথচ অনুভূতিপ্রবণ মানুষের জীবনের অঙ্কই যদি এলোমেলো হয়ে যায়, তবে তার ভাবনার ভাষার প্রকাশ তো এমনতর হবেই। গল্পের নির্মাণ আমাদের জানিয়ে দেয় এই গল্পে যে মানুষটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

সে গণিতে তুখোড়। অঙ্কের সমীকরণ যে ভাবে নির্ভুল সমাধানে পৌঁছে দেয়, জীবনের সমীকরণ প্রত্যেকবার মানুষকে নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। গণিতের সঙ্গে জীবনকে গুলিয়ে ফেললে তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে বিপর্যয়। সেই বিপর্যয় এবং বিপর্যয়জনিত ভারসাম্যহীনতা আলোচ্য গল্পে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অনুভূতি প্রকাশের প্রচলিত ভাষাকে সরিয়ে বিমান নিজের ভাষা তৈরি করেছেন আলোচ্য গল্প। পারম্পর্যহীন, আপাত অর্থশূন্য, ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গল্পকার যেন সমকালীন সময়ের অস্থিরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের শরীরে। অবচেতনের উচ্চারণ গল্পটি বেশিরভাগ জায়গা জুড়েই কায়া নির্মাণ করেছে। একটি সুস্পষ্ট উদ্বেগ, অনিবার্য বিপর্যয় এবং উন্মত্ত মানসিকতার প্রকাশ ঘটাতে লেখক প্রথানুগ আঙ্গিক ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখেও ভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্য বিন্যাস ব্যবহার করে বিমান আলোচ্য গল্পে নিজস্ব ভাষা বৈচিত্র্য স্থাপন করেছেন। বিবিধ শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগে যে প্রতিবেশ নির্মিত হয়েছে তাতে গল্পকার যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে, তেমনি পাঠকের বোধগম্যতার বিষয়টিকেও অনেকাংশে ছুঁতে পেরেছেন 'প্রথম সমীকরণ' গল্পে।

'নিম সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম ইস্যু 'দেশ' পত্রিকায় রিভিউ করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সনাতন পাঠক ছদ্মনামে এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন—'বা! চমৎকার!'[৬] অর্থাৎ আন্তরিকতা ও আবেগে ছিল মুগ্ধতার প্রকাশ।

নিম জেনারেশনের 'স্বয়ংক্রিয় ফুসফুস' বলে পরিচিত আর এক প্রথাবিরোধী নিম গল্পকার হলেন মৃণাল বণিক। তাঁর জন্ম পূর্ববঙ্গে। পিতার কর্মসূত্রে তিন বছর বয়সে তিনি চলে আসেন এপার বাংলায়। এরপর বাকিটা সময় কেটেছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। যদিও কবি হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত, তথাপি নিম সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত থেকেছেন গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। নিম সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি বামপন্থী 'স্বগত' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।[৭] ফলে অনেক সময় তাঁর সাহিত্যকে বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা চলেছে। তিনি সবসময় চেয়েছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটি লড়াই জারি রাখতে। চেষ্টা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের মত করে লিখতে। তবে 'স্বগত' পত্রিকার মার্কসবাদের ধরন তিনি রপ্ত করতে চাননি বা মার্কসবাদের ধরা বাঁধা ছাঁচে তিনি নিজেকে জড়াতে চাননি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যা কিছু প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত তাকে ভাঙতে হবে, গড়তে হবে নিজের

মত করে। কাহিনির বৃত্তাকার গণ্ডিতে গল্পের বিষয়কে বাঁধতে তিনি অস্বীকার করেছেন। লেখক হিসেবে তিনি যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করতে চাইলেন, পাঠকের কাছেও তিনি খুলে দিতে চাইলেন গল্পে ইন্‌ভলব হওয়ার দরজা। এই প্রসঙ্গে মৃণালের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল—"আমরা লেখাটাকে সব সময়ই মজা মনে করেছি। আমরা সিরিয়াস সাহিত্যের বিরোধিতা করেছি। লেখাটাকে আমরা এন্‌জয় করেছি। জীবনের রাগ ক্ষোভ থেকে বেরোতে বেছে নিয়েছিল সৃষ্টির পথ। সে পথকেও নিজের মত করে বানিয়ে তুলতে চেয়েছি। সাহিত্যের লাভ ক্ষতির হিসেব আমরা করিনি। লাভ ক্ষতি নিয়ে ভাবিওনি। লেখার মধ্যে অ্যান্টি-এসট্যাবলিসমেন্ট আনতে চেয়েছি।"[৮]

'নিম সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প মৃণাল বণিকের 'মানুষমর্কটমচ্ছব'। এ গল্পের নায়ক পাঠকের পরিচিত জন। মৃণাল তাঁর ব্যক্তিজীবনে যে সময় ও সমাজের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থেকেছেন, সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর প্রথম গল্পের নায়ক। স্বাধীন ভারতবর্ষ তখন ঔপনিবেশিক শোষণে রিক্ত। সেই দেশের অবহেলিত এক প্রান্তে তখন সেজে উঠেছে স্টিলপ্ল্যান্ট, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। দেশের উন্নয়নের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের ঘর হারানোর আর্তনাদ। মানুষের মূল্যবোধ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সময়ের অমোঘ চিতায়। ছয়ের দশকের খাদ্য আন্দোলনের জেরে অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবাংলা। নকশাল আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে। দুর্গাপুরে ঘটে গেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এমনই উত্তাল পরিস্থিতিতে মৃণাল গল্প লিখেছেন একটির পর একটি করে। 'মানুষমর্কটমচ্ছব' গল্পে ধরা পড়েছে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে তীব্র বেকারত্ব জনিত মানসিক অবনমনের চিত্র।

'মানুষমর্কটমচ্ছব' গল্পে নামহীন নায়কের সমস্যা এবং আচরণ সম্পর্কিত শ্রেণিপরিচয় গুরুত্ব পেয়েছে। একজন বেকার যুবকের কাছে আর্থিক দীনতা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বড় বেশি স্বাভাবিক ছিল। মাত্র দু টাকা পাওয়ার আশায় নায়ক যখন এক মহানগরের দীর্ঘ পাঁচমেশালি পথ ধরে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, তখন একটি উপার্জনক্ষম বাঁদরওয়ালা এবং বাঁদরটি তার ভাগ্যকে পরিহাস করেছে। জীবনের প্রতি চরম বীতস্পৃহ আলোচনা গল্পের নায়কের মনে জন্ম দিয়েছে অদ্ভুত প্রত্যাখ্যান প্রবণতা। ঠিক যেমন ব্যক্তিজীবনে কারখানায় কাজ করার কদর্য অভিজ্ঞতা মৃণাল বণিক সমেত গুটিকয় নিম সাহিত্যিকের মনে জন্ম দিয়েছিল গভীর বীতরাগ, সেখান থেকেই তাঁরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন এবং আঘাত করেছিলেন প্রচলিত সাহিত্যের গোড়ায়।

'মানুষমর্কটমচ্ছব' গল্পটি প্রতীকধর্মী। গল্পকার মৃণাল নামহীন নায়কের অসহায় এবং উদ্ভট আচরণের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন এ গল্পে। সময়ের যাবতীয় ক্ষয় এবং সেই সূত্রে মানসিকতার সমূহ ক্ষতিকে তিনি ধরে ফেলেছেন এক যন্ত্রণাদীর্ণ গদ্যে। শিশুকাল থেকে মৃণাল বণিক শিল্পাঞ্চলে থেকেছেন এবং শিল্পায়ন দেখেছেন নিবিড়ভাবে। দেখেছেন রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিনতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে সভ্যতার করাল দাপটে। মৃনাল মূলত কবি, তাই তাঁর গল্পের শরীর জুড়ে রয়েছে কবিতার কোমলতা। গদ্য ও পদ্যের কোনও সীমারেখা তিনি মানেন নি, ফলে গদ্যের মধ্যে পদ্যের ব্যবহার হয়েছে সঙ্গত কারণে। প্রথাগত এবং প্রতিষ্ঠিত ভাষারীতিকে এড়িয়ে গিয়ে মৃণাল তৈরি করেছেন নিজস্ব গদ্য। আর সেই গদ্যেই তিনি ধরেছেন সমকালকে। নির্মাণ ও সৃজনে তাঁর গল্প ভিন্ন মেজাজের। মৃণাল তাঁর গল্প এবং নিম সাহিত্যকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন উত্তর আধুনিক ভাবনার সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন—"১৯৬৭ সালে জ্যাক দেরিদা, তাঁর রচনার মাধ্যমে এক বিনির্মাণের রূপটি তুলে ধরেন। উত্তর আধুনিক লেখক ও শিল্পীদের কাছে এই জগৎ ও জীবনের সব কিছুই মিথ্যা বা মায়ার মতো—এমনকী শব্দের অর্থ কথাটিও অর্থহীন।[৯] বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর গল্প- উপন্যাস পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না। তবে শৃঙ্খলাহীন আপাতঅর্থশূন্য উদ্ভট যে সমস্ত কাহিনি তিনি নির্মাণ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে একটি দুসাহসিক পদক্ষেপ।

বিমান চট্টোপাধ্যায় এবং মৃণাল বণিকের মত সকল নিম সাহিত্যিকেরা ভাষার সৌন্দর্যায়নে বিশ্বাসী ছিলেন না। ভাষাকে অলংকার প্রয়োগে সুন্দর করে তোলার বিরোধী ছিলেন তাঁরা। নিম সাহিত্যিকদের কথা বলতে গিয়ে সুধাংশু সেন লিখেছেন—" নিম রচনা অন্তর্গতভাবে Romantic Fallacy নয়। আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা যে অর্থে শিল্পগুণ, সে ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সারল্য এসে যায় ভাষার আদান প্রদানে অর্থাৎ Straight forward communication-এ—নিম লেখকদের লক্ষ্য ছিল সে দিকেই, এ বিষয়ে তারা একদেশদর্শী হতে চায়নি। তাই মিশ্র বর্ণসংকর গদ্য লক্ষ্য করা যায় গল্প/উপন্যাস/ফিচার/নিবন্ধ রচনায়। পদ্য সিম্বল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু নিম গদ্যে এসে গেছে অজস্র উদ্ভট চতুর, সহজসুন্দর এবং antinomical সিম্বলিক শব্দ গ্রন্থনা। ফলত লক্ষণীয় বাক্যবন্ধে a language within a language। সহজীয়া পাঠকদের চোখে পুরো লেন্স পরানো ছিল উদ্দেশ্য।"[১০]

অস্বীকার করার উপায় নেই নিমসাহিত্য অন্দোলন বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছিল। এই নতুনত্ব বিষয়ের সঙ্গে তাঁদের প্রকাশে। নিম সাহিত্যিকরা শরীর আর মনের অন্দর থেকে তুলে এনেছিলেন নিম শব্দ। যে শব্দ কখনও কিম্ভুত-অদ্ভুত-অচ্ছুৎ, কখনও বা গন্ধবাহী-পৃথুল-যাদুকরী। ইতর শব্দ, কৃত্রিম শব্দ, ব্যঙ্গ শব্দ এমনকি মেশিনের অদ্ভুত শব্দগুলিকে বাদ দেওয়া হয়নি নিম সাহিত্যে। এর পাশাপাশি অন্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে নির্দ্বিধায়। নিম সাহিত্য ধরে ফেলতে চেয়েছে ব্যক্তিমনের চেতন-অচেতনের সমূহ শাব্দিকতা ও নিঃশব্দের অন্তর্বয়নকে। ফলে তাঁদের সৃষ্টি অনেক সময় অর্থহীন মনে হয়েছে। আবার এই আপাত অর্থহীনতার আড়ালে সযত্নে সঞ্চিত থেকেছে নিম সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।

নিমসাহিত্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আসাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'পাঁক ঘেঁটে পাতালে', কলকাতা থেকে 'স্বতোৎসার' পত্রিকা। অর্থাৎ নিমসাহিত্য প্রকাশের পর তার ধারা ও আন্দোলনের ছায়া অন্য অনেক পত্রিকার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। সেই সময়ের অনেক খ্যাতনামা পত্রিকা নিমসাহিত্যের রিভিউ ছেপেছিল। এইভাবে নিমসাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তিন বছর চালু থাকার পর 'নিম সাহিত্য' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার প্রভাব মেনে ও অনুসরণ করে 'নিম সাহিত্য' আন্দোলনের রেশ রয়ে গেছে পরবর্তী প্রজন্মে।

তথ্যসূত্র :

১. বিমান চট্টোপাধ্যায়, নিমসাহিত্য কী ও কেন? বাংলা সাহিত্য আন্দোলন, সম্পাদনা অধ্যাপক ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি, ড. দেবাশিস মজুমদার, ইসক্রা, জুন, ২০১৪, পৃ-৮৩
২. সুধাংশু সেন, হাড় ও পাথরের প্রত্নতত্ত্ব—বিষয় নিমভাবনা, বোধ, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ-১৫
৩. বাংলা সাহিত্য আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৫
৪. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নিমসাহিত্য, গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ- ৪০৫
৫. নিম সাহিত্য পত্রিকার অষ্টম সংকলনের তৃতীয় পৃষ্ঠায় নিম জেনারেশনের নাভিমূল এবং স্বয়ংক্রিয় ফুসফুস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যথাক্রমে বিমান চট্টোপাধ্যায় এবং মৃণাল বণিককে। নিমসাহিত্য, প্রাগুক্ত পৃ- ৩৪২
৬. সৌম্যব্রত বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'নিমসাহিত্য' প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১১
৭. স্বগত ছিল দুর্গাপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী বামপন্থী পত্রিকা, নিমসাহিত্য, পৃ- ৩৩৬
৮. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যা সম্পাদিত, নিমসাহিত্য, পৃ- ৪৩০
৯. মৃণাল বণিক, আমাদের দিনগুলি, বোধ, ২০০৩, নিমসাহিত্য, পৃ- ৪২৬
১০. সুধাংশু সেন। হাড় ও পাথরের প্রত্নতত্ত্ব—বিষয় নিমভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫

বিলুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত' : এক অনালোচিত সাহিত্যধারা

সন্ধ্যা মন্ডল
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনধারায় বিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্য-ধারাতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হলো। প্রবীণ লেখক ও কথাকারের পাশাপাশি নবীন রচনাকারগণ উঠে এলেন। সমকালের এই চাহিদাই 'অমৃত'-র মতো এক সাপ্তাহিকের জন্ম দেয়। মূলত সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে এটির আবির্ভাব ঘটলেও, সেই সময়ের শিল্প-সংস্কৃতিকেও পত্রিকাটি উপেক্ষা করেনি। এই বিস্মৃতকালে অধুনা বিলুপ্ত সাহিত্য সাপ্তাহিক 'অমৃত'-কে নিয়ে তাই নতুন করে গবেষণা ও অনুসন্ধানের আবশ্যিকতা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

১৯৬১ সালের ১২ মে (২৯ বৈশাখ, ১৩৬৮)। শুক্রবার। রবীন্দ্রজন্মের শতবর্ষপূর্তির দিনে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত' আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাপ্তিকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র কুড়ি বছর। সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। এই সীমিত সময়েই পত্রিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছে। স্বমহিমায় চিরন্তন। অথচ সাহিত্যের আসরে আজ বিলুপ্তপ্রায়।

সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'অমৃত' সমসময়ে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৩৩ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা সাময়িকপত্রের জগতে বিপুল পরিবর্তন আনে। তারই সমান্তরালে 'অমৃত' সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করলে সাহিত্যক্ষেত্রে এক নবপথের সূচনা হয়। বিংশ শতকের ষাটের দশক এই দুই সাপ্তাহিকী 'দেশ' ও 'অমৃত'-কে কেন্দ্র করে এক সমৃদ্ধময় ক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'অমৃত' পত্রিকার প্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে গেলেও সাহিত্যধারায় রেখে যায় ঐশ্বর্যের বিশাল ভান্ডার।

জাতির এক মহাসংকটকালে 'অমৃত' পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটে। ১৯৫৭ সালে 'পূর্বাশা'-র (প্রধানত মাসিক পত্রিকা) গৌরবময় যুগের অবসান ঘটলে যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সাহিত্যকর্মী ও সাহিত্যিকের সংখ্যা তখন কম ছিল না। সাহিত্য পাঠকের সংখ্যাও অজস্র। বাজারে প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকাগুলিই একমাত্র সাহিত্যরসপিপাসুদের দাবী মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কলকাতায় বাগবাজারের

আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তরে'র অফিসকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকের বিপুল ভার হয়তো 'দেশ' পত্রিকার পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। জ্ঞান ও চেতনার উন্মেষে তাই 'অমৃত'-র মতো একটি সাময়িক পত্রের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে সাপ্তাহিক 'অমৃত' প্রকাশের পর থেকেই একটি স্বতন্ত্র ধারা গঠিত হয়। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'দেশ'-এর সাথে সমান্তরালভাবে যুগান্তর গোষ্ঠীর 'অমৃত'-র আবির্ভাব ঘটল। সমকালীন যুগ চাহিদা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে এই সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

'অমৃত'-এর প্রতিটি সংখ্যার মূল্য ছিল ৪০ নঃ পঃ। পত্রিকার চাঁদার ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে শহর কলকাতা এবং মফঃস্বলের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কলকাতায় বার্ষিক ২০ টাকা, ষান্মাসিক ১০ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ৫ টাকা। মফঃস্বলে বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ৫.৫০ পয়সা।

'অমৃত' পত্রিকার মুদ্রণ বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা হল— *অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।* সাধারণত এই তথ্যটি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় লক্ষিত।

পত্রিকাটির বেশকিছু নিয়মাবলী ছিল। প্রতিটি সংখ্যায় সূচিপত্রের সাথেই তা সংশ্লিষ্ট থাকত। লেখকদের প্রতি নিয়মটি ছিল এইরকম — *১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়। ২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না। ৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।* এজেন্টদের প্রতি নির্দেশাবলি হল — *এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অনান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।* গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও ছিল নানা নিয়ম। *১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ২। ভি-পিতে*

পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

'অমৃত' পত্রিকার বিজ্ঞাপন অংশগুলিও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। সমস্ত পত্রিকার বিভিন্ন অংশে বিচিত্রভাবে বিজ্ঞাপিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশিতব্য গ্রন্থ বা বিভিন্ন লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির কথাই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও বাজারে দ্রব্যের প্রচারের জন্যও ব্যবসায়ীরা অনেকসময় পত্রিকার মাধ্যমটি বেছে নেয়। 'অমৃত'-এও এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সংখ্যা কম নয়।

বাংলা কাব্য এবং সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং কর্মকে সামনে রেখে এই সাহিত্য পত্রিকাটি বিরাট রূপ নেয়। ১৯৬১ সালের ১২ মে সংখ্যায় (প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ লিখেছেন— "জীবনের অমৃত হইতেছে সাহিত্য এবং সম্ভবতঃ তার চেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। মহাকবির জন্মশতবার্ষিকীর শুভ অনুষ্ঠান কেবল এই দেশে নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী তার আয়োজন। বাঙ্গালা কাব্যে ও সাহিত্যের এত বড় দিগ্বিজয় যাত্রার অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে ছিলেন? তাঁর কাব্যে ও সংগীতে, তাঁর সাহিত্যে ও শিল্পে এবং তাঁর চিন্তায় ও কর্মে অমৃতলোকের বাণী প্রতিধ্বনিত। সাংসারিক বিষজ্বালার মধ্যে তিনি আমাদের জন্য অমৃত বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং এই অমৃতেন স্বাদ যিনি পাইয়াছেন, তিনিও ধন্য। অমৃতলোকের সেই মহাকবির জন্মশতবার্ষিকীর পবিত্র অনুষ্ঠানে আমরাও আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যিক চেষ্টাকে একত্র করিলাম। এই সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত' নাম ধারণ করিয়া রবীন্দ্র-শতাব্দীর পুণ্য বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে— উদ্দেশ্য জীবনের অমৃতরসের সন্ধান ও পরিবেশন।" এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা গেছে 'অমৃত'-এর প্রতি পদক্ষেপে।

সাহিত্যিকরা হলেন যুগের সারথি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য তাই কেবল লোকরঞ্জন এবং মনোরঞ্জনই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য জীবন গঠন। তাই পত্রিকাটি সূচনা সংখ্যা থেকেই সমকালের সমস্ত সাহিত্যাচার্য, প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য ও শিল্পকর্মীকে নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল। 'অমৃত' পত্রিকার প্রথম সূচিটি অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, সমকালের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে কতখানি উল্লেখের দাবী রেখেছিল। পত্রিকার সূচনা সম্পাদকীয়টিই ছিল রবীন্দ্র-অনুষঙ্গে নিবদ্ধ। এছাড়াও অনান্য রচনাগুলি হল, *গীতার ভূমিকা —রাজশেখর বসু। রবীন্দ্রনাথের চিঠি। রবীন্দ্রনাথ —হুমায়ুন কবির। হাফিজ ও রবীন্দ্রনাথ —কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ —অন্নদাশঙ্কর রায়। রবীন্দ্রনাথ — বিমলচন্দ্র সিংহ। হে আদিত্য বৈতালিক —মনীশ ঘটক। কহেন কবি কালিদাস —*

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। জারিজুরি —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। উঃ ভুঃ ফুঃ —কাজল সেন। বিবাগী ভ্রমর —প্রবোধকুমার সান্যাল। নব কলেবরে বাইবেল —অনিন্দ্য রায়। সমকালীন সাহিত্য —অভয়ঙ্কর। একালের ধাঁধা। পার্থ প্রতিম —মনোজ বসু। বিজ্ঞানের কথা —অয়স্কান্ত। প্রেক্ষাগৃহ —শ্রীনান্দীকার। খেলাধূলা —শ্রীদর্শক। সাহিত্যের আসর। রঙ বেরঙ। ঘটনাপ্রবাহ। দেশে বিদেশে। অমৃত খাওয়ার গল্প —পশুপতি ভট্টাচার্য। প্রদর্শনী। ধাঁধার উত্তর।

সূচনাকাল থেকেই ‘অমৃত’-এর প্রতিটি সংখ্যা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের এক বিরাট সম্ভার নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। পত্রিকার সমকালীন সাহিত্যের আলোচনা বিভাগটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সেখানে স্থান পায় বিজ্ঞানের কথা। সমসময়ের নাট্যজগতের বিরাট প্রেক্ষাপটগুলিও আলোকিত করা হয়েছে। অতএব সাহিত্যরসের সম্পূর্ণ রূপটিই এই পত্রিকায় ফুটে উঠত। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় উঠে আসে ‘অমৃত’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলিও। প্রতিটি শারদীয়া, নববর্ষ সংখ্যাগুলির জন্য পাঠক অপেক্ষা করে থাকত। এছাড়াও বাংলাদেশ সংখ্যা, ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যাগুলিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অমিতাভ চৌধুরী ‘অমৃত’ পত্রিকার প্রথমদিকে সম্পাদকীয় অংশটি লিখতেন। মাঝে তিনি বিদেশে যাত্রা করেন। ফলে সেই দায়িত্ব এসে পড়ে প্রখ্যাত ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। এবং তার মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদকীয় রচনা করেন সুসাহিত্যিক মণীন্দ্র রায়। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় ‘অমৃত’-এর সম্পাদকীয় রচনাগুলি খুবই সমৃদ্ধময়।

যেকোনো সাময়িকপত্রের সম্পাদকীয় অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমকালের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপট এই অংশে চিত্রিত হয়। সেইসাথে সংখ্যাটির মূল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখাও এখানে বর্ণিত হয়। ‘অমৃত’ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর দিন প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রতিটি বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির সম্পাদকীয়গুলি প্রধানত রবীন্দ্র-অনুসঙ্গই হয়ে উঠত। অনান্য সংখ্যার রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। যেমন কখনও উঠে এসেছে ভারত-পাকিস্তানের চিরায়িত দ্বন্দ্বের কথা। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা। ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আবার ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতির কথাও ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়। এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিতের মধ্যে দেশের

শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিবর্তন, বেকার সমস্যা ইত্যাদি। এইভাবে ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলি সমকালের একটি সামাজিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত পেতে পারে।

‘অমৃত’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রভাবনাকে কেন্দ্র করে নানা রচনা প্রকাশ পেয়েছে। এবং পত্রিকার অন্তিম সময় পর্যন্ত এই ধারাটি বহমান ছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত ‘অমৃত’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের রচনাগুলি রবীন্দ্রগবেষণার ক্ষেত্রে এক বিপুল সংযোজন। রবীন্দ্রকেন্দ্রিক সমস্ত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করলে বিচিত্র বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রকবিতা-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক বিষয়ক প্রবন্ধে যেমন ভাগ করা যায়। রবীন্দ্রচিত্রকলা, সঙ্গীতের বিষয়ক রচনাগুলিও উল্লেখের দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের সাথে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের নানা প্রসঙ্গ ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পদ।

‘অমৃত’ পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লেখেন বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ। তারমধ্যে বহু রচনাই আজ কালের বিচারে চিরজীবী হয়ে আছে। যেমন বুদ্ধদেব বসু-র ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’। এটি রবীন্দ্রগবেষণায় অমূল্য একটি গ্রন্থ। সুকুমার সেনের রবীন্দ্রকবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক বিষয়ক আলোচনাগুলি অন্য মাত্রা দিয়েছে। এছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী’, শশীভূষণ দাশগুপ্ত-এর ‘গান্ধীজির চরকা ও রবীন্দ্রনাথ’, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও ৭ই পৌষ’, প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর ‘পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ’, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক ও শেকসপীয়র’, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ’ ইত্যাদি রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ‘অমৃত’-এর রবীন্দ্রবিষয়ক রচনাকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। পত্রিকায় রবীন্দ্রকবিতা নিয়ে আলোচনা করেন সুকুমার সেন, ক্ষিতিশ রায়, আদিত্য ওহদেদার, সুধীরচন্দ্র কর, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রকথাসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের রচয়িতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক রায়, উজ্জ্বল মজুমদার, চিরশ্রী বিশী চৌধুরী প্রমুখ। অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রচিত্রকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ‘অমৃত’ পত্রিকার ভূমিকাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে, বীরেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরী প্রমুখ সংগীতশিল্পীর পাশাপাশি বহু সাহিত্যিকগণের লেখাও প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন অজিতকুমার ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে একথা অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে 'অমৃত' পত্রিকার এই বিরাট ক্ষেত্রটি সমকালের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ধারাকে উজ্জীবিত করবে।

'অমৃত' পত্রিকা প্রকাশকালের পরবর্তী সালটিই (১৯৬২ সাল) হল বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষের মহাক্ষণ। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই মহামহিম পুরুষটি সর্বত্র আলোচ্য হয়ে ওঠেন। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাগুলিও তাই তাঁকে কেন্দ্র করে নানা রচনা প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে আমাদের আলোচিত পত্রিকাটিতেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বামীজিকে নিয়ে সেখানে বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণরা তাঁদের ভাবনাকে একত্রিত করেন। 'অমৃত' পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় রচনাগুলি হল অমিয় দত্তের 'বাংলার নবজাগৃতি: বিবেকানন্দ', জওহরলাল নেহেরু-র 'স্বামী বিবেকানন্দ', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-এর 'বিবেকবাণী ও কবিতা–স্বামী বিবেকানন্দ', বনবিহারী মোদকের 'নেতাজীর দৃষ্টিতে স্বামীজী', তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য-এর 'বিবেকানন্দের আরেকগুরু বিতর্কিত হেস্টি'।

এছাড়াও এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ একই পঙক্তিতে প্রায়শই লক্ষ্য করা গেছে। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ', নরেন্দ্র দেবের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' প্রভৃতি। অতএব বলা যায় 'অমৃত' পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের আলোচনার পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যা একেবারেই উপেক্ষা করা যাবে না।

যেকোনো সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় কথাসাহিত্যের ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'অমৃত'-কে কেন্দ্র করে একদল প্রবীণ ও নবীন ঔপন্যাসিক ও গল্পকারগণ সমবেত হয়েছিলেন। অনেক অসামান্য উপন্যাসের প্রকাশ ঘটেছে 'অমৃত'-র পাতায় পাতায়। যেমন 'কহেন কবি কালিদাস' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বিবাগী ভ্রমর' (প্রবোধকুমার সান্যাল), 'সূর্য কাঁদলে সোনা' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'গোলাপ কেন কালো' (বুদ্ধদেব বসু), 'কীর্তিহাটের কড়চা' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'কখনো দিন কখনো রাত' ও 'দিনান্তের রঙ' (আশাপূর্ণা দেবী); 'পৌষ ফাগুনের পালা', 'আমি কান পেতে রই', 'আদি আছে অন্ত নেই' ও 'পূর্বপুরুষ' (গজেন্দ্রকুমার মিত্র), 'মসিরেখা' (জরাসন্ধ), 'মেঘের উপর প্রাসাদ' ও 'আলোকপর্ণা' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'পূর্ণাবতার' (প্রমথনাথ বিশী), 'নূরিয়া' (লীলা মজুমদার), 'অগ্নিতুষার' (প্রতিভা বসু) ইত্যাদি।

বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে 'অমৃত'-কে কেন্দ্র করে একদল নবীন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে কালজয়ী। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ট্রিলজি—'অলৌকিক জলযান', 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' ও 'ঈশ্বরের বাগান' পত্রিকার এক অনন্য সম্পদ। এছাড়াও বুদ্ধদেব গুহ-র 'কোয়েলের কাছে', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'প্রথম প্রবাস' ও 'চবুতবা'/ নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব', 'ডিপ্লোম্যাট', 'তোমাকে', 'পিকাডিলি সার্কাস', 'গোধূলিয়া'/ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিশোধ', 'আধুনিক', 'তাঞ্জাম' ও 'ফেরারী ফিরে এলো'/ প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়া পাতার নৌকা'/ / অদ্রীশ বর্ধন-এর 'হীরামনের হাহাকার', 'চাণক্য চাকলাদারের কীর্তিকথা', 'শার্লক হোমস ক্লাব' ও 'ব্লু ফিল্ম'/ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অদ্য শেষ রজনী'/ শৈবাল মিত্রের 'তরণী পাহাড়ে বসন্ত'/ অমর মিত্র–এর 'পাহাড়ের মতো মানুষ', এইরকম বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাস প্রকাশ পায়। এক দীর্ঘসময় ধরে সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এ একইসাথে প্রকাশিত হয়েছে তিনজন এমনকি চারজন ঔপন্যাসিকেরও বিখ্যাত ধারাবাহিকগুলি। এই ধারাবাহিক উপন্যাস এবং অজস্র সুলিখিত ছোটোগল্পগুলি কথাসাহিত্যের তৎকালীন সাহিত্যযাত্রাকে একটি উচ্চতর অগ্রগতির ধারায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'অমৃত' পত্রিকায় একেবারেই স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধধারা প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। পত্রিকার সূচি অনুসরণ করলেই তা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি সংখ্যার বেশিরভাগ অংশটিই বিচিত্র ভাবনার প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের সুচিন্তিত রচনাগুলি এই সাময়িকীকে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যায়। সূচনাকাল থেকেই লিখেছেন রাজশেখর বসু, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ।

পত্রিকার প্রবন্ধগুলি ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়ভিত্তিক। মনীষীগণদের নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথ্যমূলক। এছাড়াও রয়েছে সংগীতভাবনা নিয়ে বহু রচনা। লোকজীবন, পৌরাণিক বিষয়, নাটক-যাত্রা-চলচ্চিত্র-থিয়েটারের এক বিরাট ক্ষেত্র। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'অমৃত'-এ ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি হল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যেমন দীর্ঘ সময় ধরে সুশান্তকুমার মিত্র লিখেছেন বাংলার প্রধান গ্রন্থাগারগুলির বিস্তৃত ইতিহাস, 'আমরা গড়ে তুলি' শীর্ষনামে। প্রণব রায় রচিত দীর্ঘ ধারাবাহিক 'পুরাতত্ত্বের সন্ধানে'। অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত ধারাবাহিক রচনা 'বাংলার রেনেসাঁস' 'অমৃত'-এর পাতায় একটি

উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরকম অজস্র উদাহরণের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল স্বনামধন্য সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি পর্বে প্রকাশিত দীর্ঘ ঐতিহাসিক দলিল 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'। 'অমৃত'-এর পাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাবনা ছিল সম্পূর্ণত ভিন্ন রুচির। সেখানে যেন এক দীর্ঘ ইতিহাসের রূপান্তরণ ঘটেছে, যার মূল্যবিচার বর্তমান সময়ে অতীব প্রাসঙ্গিক।

'অমৃত' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় কবিতার জন্য একটি পৃথক স্থান নিদিষ্ট থাকত। তিনটি বা দুটি করে কবিতা প্রকাশিত হয়। 'অমৃত' পত্রিকার প্রথমার্ধে অগ্রজ কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশ দাস, রাম বসু, তারাপদ রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, এদের কবিতা সাময়িকপত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। একইভাবে 'দেশ' পত্রিকার সাথে সাথে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রভৃত কবিরাও 'অমৃত'-এ লিখেছেন। আবার মণীন্দ্র রায়, আনন্দ বাগচী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-র মতো কবিদেরও 'অমৃত'-এর পাতায় ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।

'অমৃত' পত্রিকার প্রকাশকাল ১৯৬১ সাল। সমাপ্তকাল ১৯৮০। সাহিত্যের ধারায় খুবই সীমিতবর্ষ। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রেক্ষাপটে যুগচাহিদা অতীব আবশ্যক। এবং সেই ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করেন সুসাহিত্যিকগণ। আরও ভূমিকা থেকে যায় অন্তরালে থাকা প্রকাশনের বিরাট কাঠামো। 'অমৃত' পত্রিকার উদ্ভব ও বহমানতার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রই প্রস্তুত ছিল। এবং পথচলাটিও ছিল মসৃণ।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই একটি উচ্চমান নির্ধারিত হয়ে যায়। উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটক-চলচ্চিত্র ইত্যাদি অংশগুলি ছিল অতি উচ্চমানের। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল সর্বত্র। শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও। 'দেশ' পত্রিকার সাথে সাথে 'অমৃত'-এর জন্যও পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত। সাহিত্যসচেতন সমাজজীবন সেদিন দুটি পত্রিকাকেই একইসাথে গ্রহণ করতে পেরেছিল। 'অমৃত'-র সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ এই দুরূহ ভারটি অতি সুনিপুণভাবে বহন করেছেন। কিন্তু কালের নিয়মেও ব্যতিক্রম ঘটে। 'অমৃত'-এর উজ্জ্বলময় দিনেরও অবসান ঘটে। আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালির জনজীবনে প্রযুক্তিগত বিনোদনের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হ্রাস পায় জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহাও। যার পরোক্ষ ফল অর্পিত হয় 'অমৃত' পত্রিকার উপর। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এক বিরাট মহীরুহের। কিন্তু পাঠকমহল এই সেদিনের 'অমৃত'

পত্রিকাকে ভুলে গেছে। বহু কালজয়ী রচনার ভিত্তিভূমি আজ অন্তরালে। যা বিপুল বিস্ময়ের!

সহায়ক গ্রন্থ :

১. 'অমৃত' পত্রিকা: ১ম বর্ষ–১৯ বর্ষ, সাপ্তাহিক শারদীয়া ও অনান্য বিশেষ সংখ্যা।
সম্পাদক – তুষারকান্তি ঘোষ
আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা–৩

২. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫

৩. বংশী মান্না, 'ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস', সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫

৪. অমর দত্ত, 'অমৃতবাজার পত্রিকা ও অনান্য', প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০১৩

৫. কমল চৌধুরী (সম্পাঃ), 'অমৃত গল্পসম্ভার', পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১৮

৬. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫

৭. স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত, 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপনি, ২০০০

৮. সত্যপ্রিয় ঘোষ, 'পূর্বাশা সংকলন' (১), পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০১

৯. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা' (১), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩

১০. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা' (২), আনন্দ, কলকাতা, ২০০১

১১. সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৩

১২. সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৪

১৩. সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী কবিতা সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৪

১৪. প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'একটি আলোকপ্রবাহ, উনিশ থেকে একুশ শতক' (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার স্মারকগ্রন্থ), ২০০৯

১৫. তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), 'বিলুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা' (কোরক), ১৪১৩

১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাময়িক-পত্র’ (অখন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

১৭. স্বপন বসু, ‘সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ’, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০০

১৮. দিলীপ মজুমদার (সম্পাঃ), ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য’, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১০

১৯. শ্রীলা বসু, ‘পরিচয় পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ’, ঊষা প্রকাশনী, কলকাতা

২০. প্রণতি মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: মাসিক বসুমতি’, কলকাতা

২১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

লোকায়তিক চেতনায় অচর্চিত চার্বাক

সুকন্যা সরকার

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, কান্দি রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: *অন্তর্জগতের ন্যায় বহির্জগতও রহস্যমণ্ডিত। জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন আমরা রহস্যের প্রতি জাগরূক হয়ে যাই। এই জাগরূকতার বিশ্লেষণই হল 'দর্শন'। 'দর্শন' শব্দ 'দৃশ্' ধাতুর করণার্থক ল্যুট্ প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্' অর্থাৎ যার দ্বারা দেখা যায় তাই দর্শন। মানজীবনের সন্নগে সম্বন্ধিত সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই হল দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয়দর্শন মূলতঃ আস্তিক ও নাস্তিকভেদে দ্বিবিধ। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, এবং বেদান্ত ভেদে আস্তিকদর্শন ষড়বিধ অপরপক্ষে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন ভেদে ত্রিবিধ। আলোচ্য গবেষণাপত্রে নাস্তিক্য চিন্তাধারার অন্যতম চার্বাকদর্শন সম্প্রদায়ের লোকায়তিক চেতনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে যা নিন্দুকদের কাছে অচর্চিতই রয়ে গেছে।*

মূল শব্দ: *চার্বাক, লোকায়ত, চার্বাকের লোকায়তিক ভাবনা।*

মূল আলোচনা:

ভারতীয় চিন্তাভাবনায় অন্ধবিশ্বাস যখন বদ্ধমূলজ্ঞানে পর্যবসিত, অন্ধকুসংস্কারে মানুষের মন আচ্ছন্ন, ধর্মান্ধতা মানুষের মধ্যে জাতপাতের বিভেদ সৃষ্টিতে রত তখনই এ'সবের প্রতিবাদস্বরূপ চার্বাক দর্শনের আবির্ভাব। দর্শন চিন্তার মূলধন হল চিন্তার স্বাধীনতা। ভারতীয় চিন্তাধারায় এই বৈশিষ্ট্যটি প্রথম চার্বাক দর্শনেই লক্ষ্য করা যায়। চার্বাক দর্শনের কথিত যে রূপ তাতে ভোগবাদ মূল বিষয় বর্তমান থাকলেও সাধারণ মানুষ এককথায় খেটে খাওয়া মানুষ যাদের সংখ্যা সমাজে আধিক্য যারা সমাজের মূল স্রোত ও মূল স্তম্ভ তাদের চিন্তাভাবনাই এই দর্শনে স্থান পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট মূল্য ও মর্যাদা দেওয়ায় ও সাধারণ মানুষকে "মানুষ" রূপে গণ্য করায় এই দর্শন লোকপ্রিয় বা লোকায়ত দর্শন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের দেশে লোকায়তর প্রভাব যে বিশাল ও গভীর ছিল সে বিষয়ে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রথমত লোকায়ত নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - সাধারণের মধ্যে পরিব্যপ্ত, সেই অর্থে নাম লোকায়ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক

কাওয়েল এই অর্থেই লোকায়ত নামটিকে গ্রহণ করেছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য নিজেও জানতেন যে, 'লোকেষু আয়ত' অর্থেই এর নাম লোকায়ত। কিন্তু নামটির এ তাৎপর্য্যকে তিনি হেয়ত্বসূচক অর্থেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষ অর্থ ও কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই পরলোক অস্বীকার করে চার্বাক মতের অনুগমন করে – এই কারনেই চার্বাক মতের নাম লোকায়ত। গুণরত্ন ও শংকরাচার্যের রচনাতেও জনসাধারণের মধ্যে লোকায়ত মতের ব্যাপক ও বিশাল প্রভাবকে এই রকমই অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা দেখা যায়। গুণরত্ন বলেন, "সাধারণ লোক নির্বিচার বলেই এমত গ্রহণ করে থাকে।" শংকরাচার্য ও বলেছেন, "এমত প্রাকৃতজনের মত।"

লোকায়তের প্রতি এধরনের অবজ্ঞাসূচক অর্থ যে নেহাতই অলীক সে বিষয়ে অনেক প্রমান[১] পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, ভারতীয় ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে অস্বীকার না করলে মানতে হবে বৃহস্পতি প্রোক্ত নীতি ও লোকায়ত মত স্বতন্ত্র নয়। অতএব লোকায়ত বলতে যাই বোঝাক না কেন তাকে প্রাকৃতজনের নির্বিচার ভোগপ্রিয়তার পরিনাম মনে করবার কোনো কারণ নেই।

লোকায়ত বলতে বোঝায় জনসাধারণের দর্শন । আবার লোকায়ত হল- ইহলোক সংক্রান্ত দর্শন যারা পরলোক মানে না, আত্মা মানে না, ধর্ম মানে না, মোক্ষ মানে না তাদেরই বলে 'লোকায়তিক'। তাঁরা মনে করে ক্ষিতি, অপ্ , তেজ ও মরুৎ দিয়ে গঠিত এই মূর্ত পৃথিবীটাই একমাত্র সত্য, আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। এই মতবাদ অনুসারে লোকায়ত হল দেহাত্মবাদ, বস্তুবাদ । ইংরাজী পরিভাষায় Metarealism.

লোকায়তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হরিভদ্র[২] বলেছেন, "লোক বলতে সেটুকু বোঝায় যা ইন্দ্রিয়গোচর"। টীকাকার মণিভদ্র আরও স্পষ্টকরে বলেছেন, "লোক মানে নিছক পদার্থসমূহ"। প্রত্যক্ষে যেটুকু ধরা পড়ে লোকায়তিতরা শুধুমাত্র সেটুকু সত্যি বলে স্বীকার করেন। লোকই একমাত্র সত্য। কিন্তু কেন ? যেটুকু প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় সেটুকু ছাড়া আর কিছুকে ওরা সত্য বলতে চাননি কেন? এর উত্তরে মণিভদ্র দুটি অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছেন – একটি হল, ধর্মের প্রবঞ্চনা এড়ানোর জন্য। অনুমান, আগম ইত্যাদি জ্ঞানের তথাকথিত অন্যান্য উৎসের দোহাই দিয়ে ধর্মছদ্মধূর্তের দল সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে মোহের সঞ্চার করবে। এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণকে স্বীকার করা নিরাপদ

নয়। আর দ্বিতীয়টি হল, লোকায়তিকরা বলতেন অপ্রত্যক্ষকে যদি সত্যের সম্ভাবনা দিতে হয় তাহলে দরিদ্রের পক্ষে তার দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয় দাসের পক্ষে দাসত্বের কথা ভুলে যাওয়া। কেননা যে দরিদ্র তারপক্ষে তার দারিদ্র্যটুকুই প্রত্যক্ষ, যে দাস তার কাছে দাসত্বটুকুই প্রত্যক্ষ। কিন্তু যদি অপ্রত্যক্ষকেও অস্তিত্বের সম্ভাবনা দিতে হয় তাহলে দরিদ্রের পক্ষেও স্বর্ণরাশির মালিক হয়েছি এমন কথা কল্পনা কর নিজের দুঃস্থ অবস্থাকে অবহেলায় দলন করতে পারে, দাস মনে করতে পারে সে আর দাস নয়, স্বামী।

'বার্হস্পত্যসূত্রম্', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ইত্যাদি অনুসারে লোকায়ত মতে, বার্তাই একমাত্র বিদ্যা । বার্তা মানে কি? অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেছেন, বার্তা মানে হল কৃষি, পশুপালন আর বানিজ্য। লোকায়তিকদের কাছে বার্তা বা চাষবাসের চেয়ে বড়োবিদ্যা আর কিছুই ছিলনা। আর তার জন্যই তাঁদের চেতনায় এই মূর্ত পৃথিবী সবচেয়ে বড়ো সত্যি। লোকায়ত = লোক + আয়ত। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, আ + যৎ + অ = আয়ত। "আ" উপসর্গের অর্থ সম্যক্‌ভাবে, "যৎ" ধাতুর অর্থ চেষ্টাকরা অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে চেষ্টা করা । মণিয়র উইলিয়াম বলেছেন, লোক কথাটির সঙ্গে Lucus (লাতিন শব্দ) এবং Laucus (লিথুনিয়ান শব্দ) এর তুলনা করা যায়। লিথুনিয়ান শব্দের অর্থ "চাষের জমি" আর লাতিন শব্দটির মানে "চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করার জায়গা"। সংস্কৃততেও লোকশব্দের আদি ও অকৃত্রিম অর্থের সঙ্গে যে চাষের জমির সম্পর্ক ছিলনা এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেননা মণিয়র উইলিয়ামও বলেছেন শুরুতে লোক শব্দের আগে "উ" থাকলে উলোক = উরুলোক হয়। যার অর্থ জমি, মাঠ ইত্যাদি। অর্থাৎ লোকায়ত হল কৃষকদের কথা। ওরা কাজ করে। ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়। তাই ওদের চেতনার নাম লোকায়ত ।

ভারতীয় অন্যান্যদর্শনসম্প্রদায় যখন নির্বিচারে বেদের প্রামান্য স্বীকার করেছে তখন একমাত্র চার্বাকদর্শনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিচার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে দার্শনিকমতবাদ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছে। চার্বাক কোনোশাস্ত্রকে, লোকপ্রসিদ্ধ কোনো জ্ঞানকে, নির্দ্ধিধায় ও নির্বিচারে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেনি। চার্বাকদর্শন প্রচলিত সব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক নজীরবিহীন প্রতিবাদ। এই দর্শনে প্রথমেই আসে প্রত্যক্ষগোচর এই চরাচর, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষই সকল প্রমানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ- "প্রত্যক্ষস্য সর্বপ্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাৎ"।[৩]প্রত্যক্ষের ওপরেই বাকি প্রমাণগুলি নির্ভরশীল। তাই কঠোর কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করে ভাবের

জগতে বিচরণ নিতান্তই মূর্খামির নামান্তর। চার্বাক সংশয়বাদী, জড়বাদী, দৃষ্টিবাদী, ভূতচতুষ্টয়বাদী, ভূতচৈতন্যবাদী, স্বভাববাদী এবং সুখবাদী। চার্বাক মতে, বর্ণভেদ নেই, পাপ-পূণ্য নাই, কর্মফল নাই, স্বর্গ-নরক নাই, পরলোক নাই, জন্মান্তর নাই, ধর্মাধর্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, প্রত্যক্ষের বাইরে কিছুই নাই। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পরিমণ্ডলে এমন ঘোষণা নজিরবিহীন।

দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছে এবং তা লোকান্তরে কর্মফল ভোগ করবে- এমন আশা আকাশকুসুমের মতোই অলীক। তাই লোকায়তের উপদেশ-

"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধৈঃ।
দৃষ্টিরেব সদোপায়ৈর্ভোগান্ অনুভবেদ্ ভুবি।।"

অর্থাৎ উপযুক্ত প্রয়াসে কৃষিকাজ, পশুপালন ও বাণিজ্য ও রাজনীতির সাহায্যে ঐহিক সুখভোগের ব্যবস্থা করাই হল জীবনের লক্ষ্য।

নিছক দেবতার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ ও ইন্দ্রিয়সংযম কখনই সংসারী মানুষের লক্ষ্য হতে পারে নয়া। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়-

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।
লভিব মুক্তির স্বাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বাররুদ্ধ করি যোগসন সে নহে আমার।।

এ যেন চার্বাক ভাবনারই প্রতিফলন।

চার্বাকমত আপাতমধুর। 'চারু বাক্ যার'- এই বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে চার্বাক শব্দটি নিষ্পন্ন, যার অর্থ হল মিষ্টবাক্য। ইহলোক সর্বস্ব চার্বাকবাদী মিষ্টিকথার যাদুতে সকলের মন জয় করতেন বলে তাঁদের চার্বাক বলা হত। এই দর্শন সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট প্রবর্তক ও প্রবর্তনকাল সঠিক জানা নয়া গেলেও বৃহস্পতির অনুগামী বলা হয়েছে এই দর্শনসম্প্রদায়কে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা চার্বাকমত উপস্থাপন করে প্রতিপক্ষরূপে সেই মতকে খণ্ডন করেছেন। চার্বাকদর্শনের মূল 'বার্হস্পত্যসূত্র' এবং 'চার্বাকষষ্টি' হলেও বিবিধ গ্রন্থে চার্বাকমত উল্লিখিত রয়েছে।

সাধারণ মানুষের কথা এই দর্শনে ঘোষিত। তাই তো একে লোকায়ত বলা হয়। চার্বাকগণ বলেন, তপশ্চর্যাদি ক্লেশ স্বীকার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে যেহেতু নিষ্কৃতি নেই সেহেতু যতদিন জীবন ততদিন সুখান্বেষণে সচেষ্ট হওয়াই সমীচীন। অর্থশাস্ত্র ও কামশাত্রের অনুসরণকারী চার্বাকসম্প্রদায়ের মতে, অর্থ ও কামই হল পুরুষার্থ। আজীবন সুখকামই হল লোকায়তকথা। সুখের ঈপ্সা যেহেতু মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি তাই সকলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ চায় তার সুখ যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তাই

ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতৃপ্তিতে উৎপন্ন হয়। এটাই চার্বাকের কাছে পুরুষার্থ। তাই চার্বাক বলেন-

"অঙ্গনালিঙ্গনা-জন্যসুখমেব পুমর্থতা।
কণ্টকাদিব্যথাজন্যং দুঃখং নিরয় উচ্যতে।।"[৪]

বস্তুতঃ দুঃখময় এই জগত থেকে দুঃখকে উৎখাত করতে চাওয়াটা মূর্খামি। কিন্তু এই দুঃখসাগরে সুখের ভেলা নিয়ে পাড়ি দেওয়াটাই যেন লোকায়তের কথা। কাম্যবস্তুলাভের পথ কখনই সুগম হয় নয়া। আর দুঃখ আছে বলেই তো সুখের এতো মহিমা। দুঃখ বাস্তব কিন্তু এর জন্য সুখ ত্যাগ করা মূর্খতা। পদ্মফুলে কাঁটা আছে বলে কেউ পদ্মফুল তোলা থেকে বিরত থাকে নয়া। সুখই জীবনের পরম কল্যাণ। অতীত, অতীতই আর ভবিষ্যত অনিশ্চিত তাই বর্তমানের সুখকে আকণ্ঠ পান করে নিতে হবে। চার্বাকগণ তাই বলেন,-"জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করাটাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।"[৫] তাই যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচার চেষ্টা কর।(Eat drink and be memory for tomorrow we may die)।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[৬]

অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, ঋণ করেও ঘি খাবে, ভস্মীভূত দেহ কিভাবে ফিরে আসবে? মৃত্যুর পর দেহ একবার ভস্মীভূত হয়ে গেলে তার আর এই দেহে পুনরাবর্তন সম্ভব নয়। জীবন একটাই এবং তা চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় নয়া। চার্বাকের অভিপ্রায় হল- বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষকে যাঁরা পরজন্মের সুখভোগের কথা শুনিয়ে বর্তমানের জীবনের চাওয়া-পাওয়া থেকে বিরত রাখতে চান নেহাতই তাঁরা ভণ্ড এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর দল।

চার্বাক হল সাধরণ লোকের বা জনসাধারণের দর্শন। পূর্বপক্ষী হিসাবে চার্বাক যথেষ্ট সার্থক কারণ সামাজিক বৈষম্য দূর করে উদারীকরণের দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই লোকায়ত দর্শন। আমাদের জড়বুদ্ধিকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় নবভাবনায় উদ্দীপিত করেছে। নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে মানুষকে, ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরুদ্ধে হয়েছে খড়গহস্ত। বস্তুতপক্ষে, চার্বাকদর্শনের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের তীব্রবিরোধীতা থেকেই ভারতীয় অপরাপর দর্শনসম্প্রদায়ের বিকাশ, বৃদ্ধি, প্রসার ঘটেছে এবং তাদের যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করেছে।

লোকায়ত সম্প্রদায়কে সুদীর্ঘকাল থেকে বিদ্রুপ ও উপহাসের পাত্র হতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শন যে এই সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী তা অস্বীকার করা যায় না। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব একথাই প্রমান করে যে, প্রাচীন ভারতের দর্শন চিন্তা ছিল বহুমুখী এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে তখন প্রভূত স্বাধীনতা ছিল। লোকায়ত দর্শনের পুঁথিপত্রগুলো বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও আজও লোকায়তিক চেতনা বেঁচে রয়েছে। হরপ্রসাদশাস্ত্রীর মতে, দেশের পিছিয়েপড়া অঞ্চলগুলোতে ওই ছোটো জাতের মানুষের মনে যে চেতনা আজও সত্যি বেঁচে রয়েছে তা আসলে লোকায়তিক চেতনাই। যার অস্তিত্ব কালের ঘূর্ণায়মানগতিতেও বর্তমান।

তথ্যসূত্র:

১. দ্রোপদী বলেছেন, “পূর্বে পিতা একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন, তিনি এই বৃহস্পতি প্রোক্ত নীতি তাহার নিকট কহিয়া ছিলেন ও ভ্রাতৃগনকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন ।”– মহাভারত, বনপর্ব।

২. “এতাবানেবলোকোহয়ং যাবনিন্দ্রিয়গোচরঃ”– ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ।

৩. চার্বাকদর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা-৩২

৪. সর্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাকপক্ষ

৫. চার্বাকদর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা-১৫০

৬. চার্বাকষষ্টি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. চার্বাক দর্শন – অমিত ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

২. চার্বাক দর্শন – দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পুরগামী প্রকাশনী

৩. ভারতীয় দর্শন – দেবব্রত সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৪. ভারতীয় দর্শন – সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

৫. ভারতীয় ষড়্দর্শনশাস্ত্র – চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার

৬. ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা – হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বাস বুকস্টল

৭. লোকায়ত – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পিপলস্ পাবলিশিং হাউস

৮. সর্বদর্শন সংগ্রহ – শ্রীমৎসায়ণ মাধবাচার্য্য, ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিউট

৯. A critical survey of Indian Philosophy – Chandradhar Sharma, Motilal Banarsidass publishers private limited.

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা হাস্যকৌতুকে নারীর উপর নিপীড়ন এবং তাঁর প্রভাব : অখন্ড বঙ্গীয় সমাজ

সুজন মোদক
প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক, এম. এ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *বর্তমান আধুনিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া অর্থ্যাৎ ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের মত অত্যন্ত প্রাচীন এবং সাংস্কৃতিবান দেশে যেখানে ধর্ম,বর্ণ,জাতি,নারী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে সেই ধর্ম,বর্ণ,জাতি,নারী বিদ্বেষের এক নতুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই সোশ্যাল মিডিয়া। বেশ কিছু ব্যক্তি বা চ্যানেলের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এবং জনপ্রিয় হওয়ার জন্য বা অর্থ উপার্জনের জন্য হাস্যকৌতুকের নামে এমন এমন দৃশ্যর উপস্থাপনা করছে যা সরাসরি নারী বিদ্বেষ স্বত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যাকে "ই-সামাজিক বিপর্যয়" বলেও বর্ণনা করা যায়। এই প্রবন্ধে এমনই বেশ কিছু হাস্যকৌতুকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা বেআইনি এবং বিকৃতমনস্ক। আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো প্রভাব নেই বলে মনে হলেও মনোবিঙ্গানী,দার্শনিকদের মতে তা অত্যন্ত ভয়ংকর প্রভাব ফেলে সমাজে। এছাড়াও প্রবন্ধে রঙ্গরসিকতা,হাস্যকৌতুকের জাতীয় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি,অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সহ বিদ্বেষমূলক বর্জিত হাস্যকৌতুক এবং সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।*

মূলশব্দ: *লিঙ্গবৈষম্য, সোশ্যাল মিডিয়া, নারী, হাস্যকৌতুক।*

ভূমিকা:

অখন্ড বাংলা অর্থ্যাৎ বর্তমান বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে হাস্যরসের কথা উঠলেই মনে পড়ে শিবরাম চক্রবর্তীর কথা। হাস্যরস ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর ভাষাঙ্গানের জোরে সেই হাস্যরস ফুটে উঠতো তাঁর লেখাতেও। তবে সে হাস্যরসের আড়ালে থাকত ঘুণ ধরা সমাজ ব্যবস্থার আসল রুপ,বিপ্লব এবং সাধারন মানুষদের কথা। ছোটো থেকে বড় সকল পাঠককুলের কাছেই ছিল সমান আদরণীয়। বিভিন্নরকমের হাস্যরসের সাথে জড়িত বিষয়াবলী এবং যা কিছু হাসির উদ্রেক ঘটায় তা নিয়ে বিভিন্ন মনোবিঙ্গানী গবেষণা করেছেন। তারা এ বিষয়ে একমত

যে হাস্যরসের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ হল মূল বিষয় থেকে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা বিপরীত এবং তা মনকে অবাক করে দেয়। হাসি(Laughter)-র গবেষনায় হবসকে সাধারনত অগ্রণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি হাসি বা হাস্যরসকে "Sudden Glory"(হঠাৎ গৌরব) বলে উল্লেখ করেছেন।(১) আধুনিক গবেষকগণ হাস্যরস ও হাসির উৎস,উভয়ের প্রতি ও মনবৃত্তির উন্নয়ন এবং মানসিক অভিব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

'হাসি' আমাদের জীবনের এক অঙ্গ। একজন ব্যক্তি হাসির উদ্রেক ঘটাতে পারে তাঁর শারীরিক ভঙ্গিমার মাধ্যমে আবার তাঁর বলার মাধ্যমেও। তবে সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষার চয়ন। এই অভিনয়কে কৌতুকাভিনয় বলা হয়ে থাকে। এই কৌতুকাভিনয়েও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যথা-রাজনৈতিক ব্যঙ্গধর্মী,রোমান্টিক কমেডি,স্ক্রুবল কমেডি,ব্লাক কমেডি,অশ্লীল হাস্যরস,যৌন হাস্যরস ইত্যাদি। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে,'দ্য ডেইলি শো' তে জন স্টুয়ার্ট কমিক ফ্রেম ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে তাঁর অপরিণত হাস্যরস দিয়ে রাজনৈতিক যুক্তিতর্কে হস্তক্ষেপ করেন। কৌতুক এর প্রাচীনত্বর উৎস অনুসন্ধানে জানা যায় কৌতুকাভিনয়ের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথেন্স শহরে এবং সেখানেই বিকাশ লাভ করেছিল। তবে পরবর্তীতে অ্যারিস্টোফেনের মৃত্য এবং পার্শীয়ান যুদ্ধের কারনে হ্রাস পেয়েছিল।(২) আমরা বিখ্যাত হাস্যরসের সৃষ্টিকার চার্লি চ্যাপলিনের কথা জানি।এছাড়াও বেশ কিছু শাসক ও হাস্যরসকার যুগলের কথা জানি। যথা হারুন-উল-রসিদ ওবুহলুল, গাজনির মুহাম্মদ ও তালহক, বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও তেনালি রাম, নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও নাপিত গোপাল ভাঁড়।(৩) গোপাল ছিলেন খুব বুদ্ধিমান এবং তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল খুব প্রখর। তিনি হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে রাজাকে সর্বদা খুশি রাখতেন। আবার হাসিকে অসুস্থতার নিরামক হিসাবেও ধরা হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যেসব মানুষ বেশি হাসে তারা কম,রোগে আক্রান্ত হয়। হাসির উপকারিতাও অনেক। হাসির শারীরতত্ত্ব নিয়ে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট ডা: মো.ফাইজুস সাজ্জাদ জানাচ্ছেন-স্যাটারডে রিভিউ ম্যাগাজিনের সম্পাদক নরমান ক্যাজিন্স ১৯৬০ সালের দিকে আক্রান্ত হলেন মেরুদন্ডের ব্যাথায়।ডাক্তাররা সারাতে পারছিলেন না। হতাশ না হয়ে নিজের প্রেসক্রিপশন নিজেই লিখলেন কাজিন্স। না,একগাদা ঔষুধের নাম লেখেননি। লিখেছেন প্রতিদিন একঘন্টা

করে হাসির সিনেমা এবং হাসির বই পড়তে হবে।কয়েক মাসের মধ্যে হাসতে হাসতেই সুস্থ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।(৪)

বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের পপুলার কালচারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হাস্যকৌতুক। যা খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্পষ্ট বিষয়,সময় কাটানোর এক মনোরঞ্জনমূলক মাধ্যম। কিন্তু হাস্যকৌতুকরা নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মানবতাহীন,মনুষত্যহীন,সাম্যতাহীন বিষয়বস্তু চয়ন এবং উপস্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করে না। এবিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট্য আইন না থাকায়,হাস্যকৌতুকের সুপ্রভাবের চাইতে কুপ্রভাবই বেশি পড়ছে সমাজে। একটা সময় হাস্যকৌতুকের অন্যতম বিষয় ছিল মাথামোটা পাঞ্জাবীদের প্রতি বাঙালীদের উন্নাসিক মানসিকতার প্রতিফলন অথবা অপরিস্কার,খৈনি খাওয়া বিহারিদের প্রতি উন্নাসিক বাঙালির অবঙ্গা। এই ঘৃণামূলক প্রভাব কতখানি ? তা বোঝা যায় আজও বাংলাদেশ ও পশ্চামবঙ্গের বাঙালিদের চোখে বিহারিদের পরিচয় খৈনি খোর,গুটকা খোরবহিসাবে। এই বিদ্বেষ যে কতটা ভয়ংকর তা বোধগমন হয় সর্দারজিকে নিয়ে কৌতুক থেকে,যা ভারতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যায়। আবার কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়েও কৌতুক রচিত হয়েছে। অবাক করার বিষয় হল এই,যে হাস্যকৌতুকের দ্বারা সকলেই আনন্দ নিয়ে থাকে অথচ সেই হাস্যকৌতুকের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিদ্বেষ,বৈষম্য,অবহেলা,নিপীড়ন সর্বোপরি লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ। যা হতে পারে এক গোষ্ঠীর প্রতি অন্য গোষ্ঠীর,এক জাতির প্রতি অন্য জাতির,এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের,এক লিঙ্গর প্রতি অন্য লিঙ্গর। এপ্রসঙ্গে আফরোজা সোমা "দেশ রুপান্তর" পত্রিকায় 'নারীবিদ্বেষী কৌতুক:লঘুরসের গুরুভার' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-"কৌতুক বা হাস্যরসের ভেতর দিয়ে শ্রেণি-বিদ্বেষ,বর্ণ-বিদ্বেষ,জাতি-বিদ্বেষ ও লিঙ্গ-বিদ্বেষের বিষ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। রঙ্গ-তামাশার ভেতর দিয়ে কখনো-কখনো বিশেষ শ্রেণি,বর্ণ,গোত্র এবং লিঙ্গের মানুষকে হেয় ও খেলো করে দেখানোটাকে অতি স্বাভাবিক হিসাবে তুলে ধরা হয়। ফলে কৌতুকের ভেতর দিয়ে বৈষম্য ও বিদ্বেষ এক প্রকারের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায় বলেই মনে করা হয়"।(৫)

'বিদ্বেষ'শব্দটি দূর করার জন্য এ জগৎে অনেকদিন ধরেই সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্ণ বিদ্বেষ বর্তমানে অনেকটাই দূর করা গিয়েছে তবে সম্পুর্ন নয়। কিন্তু নারী বিদ্বেষ বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ এখনও সমাজে রয়েছে ভীষণভাবে। তবে সমাজে চাকুরী,অধিকার,সাম্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন করে সুরাহার

ব্যবস্থা হলেও হাস্যকৌতুকের মত স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকগুলি রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন না থাকায় অখন্ড বঙ্গীয় সমাজে আজ যেন নারী বিদ্বেষ,লিঙ্গ বৈষম্য অলিখিত আইনসম্মত। যার প্রভাব সমাজে মারাত্মক,বিশেষ করে অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে। উক্ত প্রবন্ধটির উৎস এপ্রসঙ্গেই।

হাস্যকৌতুক প্রকাশ পায় বই,ছবি,ছড়া,ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে। এই প্রবন্ধে ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশিত হাস্যকৌতুক এবং সমাজে তাঁর প্রভাব - আলোচ্য বিষয়বস্তু। মূলত সোশ্যাল মিডিয়া/সামাজিক মাধ্যম এ প্রকাশিত ভিডিওর উপর ভিত্তি করেই প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া অর্থ্যাৎ বর্তমান যুগের অত্যন্ত এক জনপ্রিয় প্লাটফর্ম। যার মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সাথে খুব সহজেই তথ্য আদান-প্রদান,যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। মূলত এগুলি কম্পিউটার/ল্যাপটপ বা মোবাইল ভিত্তিক। তবে তার জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয়। কয়েকটি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম/সোশ্যাল মিডিয়া হল ফেসবুক,ইউটিউব,ইনস্টাগ্রাম,টুইটার ইত্যাদি। এই ধরনের সামাজিক মাধ্যম গুলির ভালো-খারাপ,উভয় দিকই রয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১) সমাজে হাস্যকৌতুকের প্রয়োজনীয়তা বোঝা।

২) কথায় কথায় নারীদের উপর শারীরিক অত্যাচারের ভিডিও ও সমাজে তাঁর প্রভাব অনুধাবন করা।

৩) বিদ্বেষমূলক বর্জিত হাস্যকৌতুকের পথের পরামর্শ দান।

৪) বিদ্বেষমূলক হাস্যকৌতুক বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার ক্ষেত্রে পরামর্শ দান।

আলোচনা:

এই প্রবন্ধটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন হাস্যকৌতুক ভিডিও-র উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার যে জনপ্রিয়তা তাঁর পরিপেক্ষিতে এইধরনের ভিডিও গুলির প্রভাব লক্ষণীয়। যা আরও ভালো করে বোঝা যায় ভিডিও গুলি কতজন দেখেছে? কতজন কমেন্ট করেছে? কি কমেন্ট করেছে? কতজন শেয়ার করেছে?-এর উপর ভিত্তি করে। সাধারণ মানুষের ধারনা যে,এগুলি আবার সমাজে কি প্রভাব ফেলতে পারে? সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকেই বা এর কী গুরুত্ব রয়েছে? বরঞ্চ যে করছে তার টাকা আয় হচ্ছে। তাছাড়া দেখি ভালো লাগে,মজা লাগে,লাইক,কমেন্ট,শেয়ার করি ব্যাস এইটুকুই। কিন্তু মনোবিঙ্গানী,ঐতিহাসিকরা ভিন্ন

কথা বলছে। মনোবিঙ্গানীদের মত,যেকোনো কিছু সেটা যতই ভুল হোক,খারাপ হোক,বেআইনী হোক,অপরাধমূলক কাজ হোক সেটা যখন অহরহ করতে দেখব এবং করলে কিছুই হচ্ছে না তখন কিন্তু একটা সময়ে এসে সেটাকেই কিন্তু সঠিক বলেই আমাদের মনে ধারনা জন্মাবে। এইরকম কিছু বেআইনী,অপরাধমূলক কাজ সহ অন্যান্য কিছু শারীরিক অঙ্গিভঙ্গি,ভাষার বৈশিষ্ট্য দ্বারা রঙ্গতামাশার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। আবার বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'বাঙালীর গোপাল ভাঁড়:একটি লোকচরিত্রের নির্মাণের সন্ধানে' শীর্ষক এক বক্তৃতানুষ্ঠানে ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র বলেন- গোপাল ভাঁড়ের সূত্রে রঙ্গরসিকতার সামাজিক পরিসরটিও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। যুগে যুগে সৃষ্ট বীরবল,মোল্লা নাসিরুদ্দীনের মতো ভাঁড় জাতীয় চরিত্রকে সমকালীন ঐতিহাসিক বাতাবরনে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার নানা পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত হবে। এছাড়াও তিনি বলেন- গোপাল ভাঁড়ের চরিত্রের নামে প্রচলিত গালগল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজের হাস্যকৌতুক - অসংগতি-কল্পনাশক্তির রসময় প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণচন্দ্রর রাজসভায় গোপাল ভাঁড়ের উপস্থিতি শরীরী অবয়বের হোক কিংবা কল্পিত হোক; সে যেন হয়ে ওঠে জাগ্রত বিবেক,বিদ্যমান অন্যায়-অবিচারকে রঙ্গব্যঙ্গ ও যুক্তির বাণে কোনঠাসা করে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন।(৬)

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হাস্যকৌতুক গুলির একটি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। সেইদিক থেকে দেখলে দেখা যায়- আর পাঁচটা পেশার মত এই কৌতুকাভিনয়ও একটি পেশা। এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের এটিই একমাত্র জীবন-জীবিকা। এক-একটা গ্রুপে অভিনয়-ই করে সর্বনিম্ন চার জন থেকে অসংখ্য জন। তবে আমরা জানি অভিনয় জগৎে ক্যামেরার সামনে যতজন থাকে ক্যামেরার পিছনে থাকে তার দ্বিগুন। এই রকম ভিডিও-অভিনয় করে কিছু জন এতটাই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে যে তারা বাংলা সিনেমা জগৎের নায়কদের সমান জনপ্রিয়। কিন্তু এই অর্থ উপার্জনের জন্য তারা কেমন চিত্রনাট্যর ভিডিও তৈরী করছে সেদিকে কোনো ঙ্গান থাকছে না। হাস্যকৌতুক গুলিতে নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। যার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাদের পুরুষতন্ত্র মনোভাব ফুটে উঠছে অন্যদিকে পরোক্ষভাবে পুরুষবাদীদের বিদ্বেষমনোভাবাপন্ন উল্লাসতা ফুটে উঠেছে। আবার যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। এমন এমন সব কারনে নারীদের নিপীড়ন করা হচ্ছে যেন নারী হল ভোগ্যবস্তু;পুরুষরা তাদের যেমনভাবে খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারে।

যা আধুনিক সভ্য সমাজে এক ঘোরতর অপরাধ। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের নেশায় এবং এব্যাপারে নির্দিষ্ট্য আইন না থাকার সুযোগে তারা জনগণের কাছে বিশেষ করে অল্পবয়সীদের কাছে নারী নিপীড়ন হচ্ছে পুরুষের এক অঘোষিত অধিকার তা তুলে ধরছে হাস্যকৌতুকের নামে। যা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে অখন্ড বঙ্গীয় সমাজের লজ্জা বলেই বিবেচিত হয়।

নিম্নে বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া অর্থ্যাৎ ফেসবুক,ইউটিউব এ প্রকাশিত হাস্যকৌতুক ভিডিও দেখব,যেখানে হাস্যকৌতুকের পিছনে এক ভয়াবহ,অপরাধমূলক দৃশ্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অখন্ড বঙ্গীয় সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে।

(ক)ইউটিউব চ্যানেল 'AZMIR MUSIC' থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত হাস্যকৌতুককার হারুন কিসিঞ্জার এর একটি কৌতুক হল 'বউ পিটানি'।(৭) শিরোনামেই স্পষ্টত পুরুষতন্ত্রর ছাপ রয়েছে। দেখানো হচ্ছে মুখ্য অভিনেতা হারুন কিসিঞ্জার তাঁর বউকে নিদারুন ভাবে পেটাচ্ছে সম্পুর্ন নিজের ভুলেই। তারপর গ্রামের সকলেই জানে তিনি তার বউকে পেটায় কিন্তু গ্রামবাসীরা সেটা নিয়ে তাকে রসিকতা করায় হারুন কিসিঞ্জার পুনরায় বাড়ি ফিরে বউকে পেটাচ্ছে। সেই নিজেরই ভুলে।এমন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন বউকে পেটানো তাঁর জন্মগত অধিকার। দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে ভিডিওটি দেখেছে ১৬,২৮৮,২৪৫ জন মানুষ এবং ভিডিওটি পছন্দ করেছেন ৪৪ হাজার মানুষ,অপছন্দ করেছেন ১৩ হাজার জন।

(খ) ইউটিউবে চ্যানেল Times Media তে প্রকাশিত হাস্যকৌতুক "বউ কে পেটানোর সহজ কৌশল"।(৮) সেখানে দেখানো হয়েছে রান্নায় একটু লবন বেশি হয়েছে বলে স্বামী তার স্ত্রীকে মারছে। এই ঘটনা বাস্তবেও দেখা যায়,যা রোধ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন আজীবন চেষ্টারত। সেখানে কিছু টাকার জন্য এমন এক শিরোনাম ব্যবহার করছে যেখানে স্পষ্টতই নারীবিদ্বেষী তথা সমাজবিদ্বেষী মনোভাব কাজ করছে তা বলাই যায়। ভিডিওটি দেখেছেন ৫,০৩৯,৯২০ জন এবং পছন্দ করেছেন ২৯০০ জন ও অপছন্দ করেছেন ১৮০০ জন মানুষ।

(গ) ইউটিউবে চ্যানেল nil akash multimedia তে প্রকাশিত একটি হাস্যকৌতুক হল "বউ পিটানো মেম্বার"।(৯) কৌতুকে দেখানো হয়েছে পাড়ার কোনো পরিবারের সমস্যা হলে মেম্বার তথা বউ পেটানো মেম্বার এর কাছে নালিশ করে। তিনি এসে দোষ,বিচার না করে মহিলাদের মারে। এছাড়াও তাঁর নিজের বউ শাড়ি না পড়াই তাকেও মারে। কৌতুকটির সর্বশেষে কিছু কথা বলা হয়,যা মারাত্মক-"যে বউ আপনার

নিজের কথা শোনেনা জামাইয়ের কথা শোনেনা সেই বউয়ের দিবেন কেলানি আর যদি বউয়ের আশ্রয় দেন তাহলে নিজেই মোড়া খাবেন...."। ভিডিওটি দেখেছেন ১৭৬২৭৫৫ জন এবং পছন্দ করেছে ১০০০০ জন ও অপছন্দ করছে ১৯০০ জন মানুষ। কৌতুকটির সর্বশেষে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা ভয়াবহ এবং "ই- সামাজিক বিপর্যয়"-র সমান। কথা গুলির মধ্যে দিয়ে স্পষ্টতই পুরুষদেরকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে,বউকে নিজের মত চলতে বলবেন না চললে মারবেন। যেন নারী হচ্ছে কোনো জড় বস্তু,নিজের ইচ্ছে মত যখন খুশি সরানো যায়। হিংস্র নারীবিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন নাটক যা রীতিমত অপরাধের সমান।

(ঘ) ইউটিউবে চ্যানেল shoshi enter10 এ প্রকাশিত হাস্যকৌতুক "নৌকার বেতাল মাঝি"।(১০) দেখানো হয়েছে,মাঝি তাঁর নৌকা পারাপার করতে গিয়ে একসময় নৌকা ডুবে গিয়েছিল। সেই কথা মাঝির স্ত্রী,মাঝিকে বলায় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে মারে। আবার নৌকার বৈঠা-র অবস্থা খুব খারাপ ছিল অর্থ্যাৎ পাতলা এবং দুর্বল। তখন মাঝীর স্ত্রী মাঝিকে বলে,তুমিও যেমন তোমার বৈঠাও তেমন। এইকথা বলাতেই মাঝি তার স্ত্রীকে বেদড়ক মারে। ইতিমধ্যেই একজন স্বামী-স্ত্রী নদী পাড় হবে কিন্তু মাঝি না থাকায় মাঝিকে ডেকে আনে। পাড়ে এসে মহিলাটি বৈঠা নিয়ে বলাই তার স্বামী,স্ত্রীকে মারে এবং তারপর মাঝিটিও সেই মহিলাকে মারধোর করে। তখন স্ত্রী মহিলাটির স্বামী বলে ঠিক হয়েছে ঠিক হয়েছে। ভিডিওটি দেখেছেন ২২৬৬৯৪৯ জন এবং পছন্দ করেছে ১১০০০ ও অপছন্দ করেছে ২২০০ জন মানুষ। এখানে বোঝা যাচ্ছে পুরুষই শ্রেষ্ঠ। তার যতই দুর্বল দিক থাক সেটা বলা যাবে না,বললেই পেটানি। সেক্ষেত্রে যতই নিজের স্ত্রী হোক না কেন তাও রেহাই নে। আসলে সে তো একজন নারী। পুরুষবাদ ভাবনা এক্ষেত্রে কাজ করছে।

(ঙ) ইউটিউবে চ্যানেল IRAN MUSIC এ প্রকাশিত হাস্যকৌতুক "কীভাবে বউ মারে দেখুন"।(১১) এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য এটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় কৌতুকার মজিবর রহমান পরিচালিত। দেখানো হচ্ছে,মজিবর ও তাঁর স্ত্রী শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় মজিবর তার স্ত্রীকে বলছে,তোমার সাথে আমি যে গন্ডগোল করি সেটা যদি বলো তাহলে তোমায় বাড়ি গিয়ে এমন মার মারবো বুঝতে পারবা। আবার মজিবরের শ্বশুর তার স্ত্রীকে বলছে এইরকম মেয়েছেলেকে ঘন্টায় ঘন্টায় ঔষুধ না দিলে হয়না। এখানে ঔষব বলতে মারা কে বোঝানো হচ্ছে। তারপরই নানা অজুহাতে ছাতা দিয়ে ভীষন মারধর করে। এরপর আবারো সামান্য অজুহাতে বেদড়ক মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওটি

দেখেছেন ৫৬৩৩০৮ জন এবং পছন্দ করেছে ২৬০০ জন ও অপছন্দ করেছে ৩৮৯ জন মানুষ।

(চ) ফেসবুক প্রকাশিত একটি হাস্যকৌতুক 'আমি বউকে মারব বা গাঙ্গে ভাসিয়ে দেব তাতে তোর কি' শিরোনামে(১২) দেখানো হচ্ছে মুখ্য নায়ক চ্যাতা কাশেম বলছেন-বাজারে ঝাঁকে ঝাঁকে রুইমাছ,আনতে গিয়েও আনলাম না। তখন তাঁর স্ত্রী বলছেন তাহলে আনলেন না মা অনেকদিন ধরেই মাছ খাওয়ার কথা বলছিল রান্না করে দিতাম। তখন কাশেম বলছে মা খেতো আর তুই দেখতিস। নিজের লোভ তুই কেন মায়ের উপর চাপিয়ে দিলি। বলতে বলতে কাশেম -সকালে যে মারলাম মনে নেয় এটি বলে আবারও মার শুরু করে দেয় তার স্ত্রীকে। তখন চ্যাতা কাশেমের মা এসে আটকানোয় তখন সে বলে, আমি বউকে মারব বা কেটে গাঙ্গে ভাসিয়ে দেব তাতে তোর কি? শেষের কথাটির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হচ্ছে অন্যদিকে যেহেতু আমরা অনেকেই সবসময় সিনেমা,নাটক এ দেখানো চরিত্রকে অনুকরন করতে চায় সেইদিক থেকে উক্ত কথাটির দ্বারা সমাজকে এক ভয়াবহ বার্তা প্রদান করছে।

(ছ) 'বউ মারা দিবস'।(১৩) হ্যাঁ এইরকমই নামকরন করা হয়েছে এক হাস্যকৌতুকের,যার নামকরনটিই অসামাজিক। ইউটিউব চ্যানেল [টুন টুনি] Tun Tuni Entertainment এ প্রকাশিত হাস্যকৌতুকে দেখানো হচ্ছে কেউ একজন ফোন এ আরেকজনকে বলছে আমাদের এখানে বউ মারা দিবস পালন হচ্ছে, তোমাদের ওখানে কি হচ্ছে? অন্তত ২-১ টা কিল তো মারো। এরপর অন্য এক বাড়িতে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বলছে আরে শালি আজ যদি আমি বউ মারা দিবস পালন না করি তাহলে এই বাংলাদেশের নাগরিকের খাতায় আমার নাম থাকবো? তারপর গান করতে করতে বেদড়ক মারতে লাগল তার স্ত্রীকে। আবার সে বলছে এইবার থেকে শুরু হয়েছে বউ মারা দিবস,দিয়ে আবারও মার শুরু করে দিল। অন্য এক বাড়িতে একজন পুরুষ তার বউকে মারতে পারছে না তখন অন্য একজন পুরুষ এসে সেই মহিলাকে মারছে। একজন সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে আজ বউ মারা দিবস। সেটা শুনে একজন বলছে বাড়ি গিয়েই তাহলে বউ মারা শুরু করব। যে বলে বেড়াচ্ছে সে এবার বাড়ি গিয়ে তার বউকে মারছে। পাশের কয়েকজন এসে বলছে আমি এতবার মেরেছি তখন সেও মারতে শুরু করে। আবার ভিডিও করে ফেসবুকে দেওয়ার কথা বলছে,লাইভ হচ্ছে বউ মারার এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলছে সকলে বউ মারুন। এরপর সবাই মিলে অন্য

একজনের বাড়িতে গিয়ে সকলে অন্যের বউকে মারছে। এইভাবে বউ মারা দিবস পালনের কথা বলা হচ্ছে। ভিডিওটি দেখেছে ১৪৪৭৭৭৪ জন এবং পছন্দ করেছে ৯২০০ জন ও অপছন্দ করেছে ১৭০০ জন মানুষ।

এই ধরনের বিদ্বেষমূলক হাস্যকৌতুক অসংখ্য দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এগুলি ইউটিউব এ প্রকাশিত হলেও বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের হাস্যকৌতুকগুলি হল-লাউ দিয়ে বউ পিটানি,বউ মারার প্রতিযোগিতা,বউ পিটানি ২,ডিজিট্যাল ভাদাইমার বউ পিটানি,আসল পুরুষ,বউ গুতাইয়া ঠিক রাখি,বউ পিটানোর ওস্তাদ,আদর্শ গ্রাম,বউ মারার জন্য ভাড়া করা কামলা,বেচাল নারী,বউ মারার চেয়ারম্যান প্রভৃতি।

তাহলে কি এদের ভিডিও বন্ধ করে দিতে হবে?একদমই নয়। কারন তাদের জীবন-জীবিকায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই,যতক্ষন না তারা হাস্যকৌতুকের নামে কাউকে মানসিক আঘাত,তাচ্ছিল্য,হেয়,ছোটো করছে। তবে এরা যে শুধুমাত্র এইধরনের ভিডিও করে তা কিন্তু নই। তাদেরও অনেক হাস্যকৌতুকে তারা সামাজিক বার্তা দিয়েছে হাসির মাধ্যমে। যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি আমাদের কি করা উচিত?আর কি করা উচিত নয়?

বিদ্বেষমূলক বর্জিত হাস্যকৌতুকের পথের পরামর্শ:

১) কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের চরিত্র তৈরী করতে হবে।

২) গল্প লেখার ক্ষেত্রে আরও সংযত,সামাজিক হতে হবে এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী, সংস্কৃতি বিদ্বেষীহীন মনোভাব দেখাতে হবে।

৩) হাস্যকৌতুক গুলির শেষে হাস্যকৌতুক এবং বাস্তবের মধ্যে তফাৎ সহ সামাজিক বার্তা দিতে হবে।

৪) চাটুকারীতা এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না।

৫) যথাযথ শিরোনাম দিতে হবে।

৬) অভিনয়ের উপর জোর দিতে হবে।

সরকারের ভূমিকা:

১) সোশ্যাল মিডিয়ায় কি ভিডিও আপলোড হচ্ছে তা যেভাবেই হোক সরকারের নজরে রাখতে হবে।

২) শিরোনাম এর ব্যাপারে সিনেমার মত নিয়মের বেড়াজাল তৈরী করতে হবে।

৩)শাস্তিযোগ্য আইন তৈরী করতে হবে।

৪) কোনো অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক অপরাধের মত এব্যাপারেও তৎক্ষণাৎ প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে।

৫) চ্যানেল তৈরী করতে,সেই ব্যক্তির নথি সহ চ্যানেল সংক্রান্ত তথ্য সরকারকে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

উপসংহার:

সামাজিক মাধ্যম যে শুধুমাত্র হাস্যকৌতুকের প্লাটফর্ম তা কিন্তু নয়,পাশাপাশি ঘুন ধরা সমাজ,সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,যোগাযোগ স্থাপন,গণঐক্য,সামাজিক বার্তা ইত্যাদিরও প্লাটফর্ম। হাস্যকৌতুক সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইন না থাকলেও কেউ যদি সরকারের দুর্নীতি রঙ্গতামাশার মধ্য দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, অথচ অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। যাইহোক,এই হাস্যকৌতুক গুলির মাধ্যমে যেহেতু হাসির উদ্রেক ঘটে আর হাসির উপকারীতা ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে হাস্যকৌতুকের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে তবে শর্তসাপেক্ষ। শুধুমাত্র নারী নিপীড়ন নয় লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান সমাজে এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত কিছু হাস্যকৌতুকগুলিতে কী ধরনের বিকৃত মানসিকতা ফুটে উঠেছে এবং সমাজে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে,বেশিরভাগ মানুষই এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অথচ সেভাবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না,কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া। এর পরিসর উর্দ্ধমুখী হওয়ায় সকলের এবিষয়টিতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানসিকতার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রক্ষিতে যেহেতু হাস্যকৌতুকগুলির গুরুত্ব রয়েছে তাই সর্বোপরি তুলনামূলক অ-চর্চিত এই বিষয়টিকে জনগন এবং সরকারের গুরুত্বসহকারে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. Heyd,David;"*The Place of Laughter in Hobbes's Theory of Emotions*"; Journal of the History of Ideas; Vol.43; No.2;1982; University of Pennsylvania Press;pp.286-287

২. Cornford, Francis Macdonald; The Origin of Attic Comedy; Cambridge At The University Press; 1934; pp.1-4

৩. Edited BY Khanna, Meenakshi; Cultural History of Medieval India; Social 'Science Press;New Delhi;2007;p.35

৪. কালের কণ্ঠ পত্রিকা, 'শরীর ও মন হাসলে ভালো থাকে' শিরোনাম থেকে;ই.; <https://www.kalerkantho.com/print-edition/dolchhut/2018/05/06/632751>;Date:23.07.2021

৫. দেশ রুপান্তর পত্রিকা, 'নারীবিদ্বেষী কৌতুক: লঘুরসের গুরুভার' শিরোনাম থেকে;ই.;<https://www.google.com/amp/s/www.deshrupantor.com/amp/editorial-news/2020/02/18/199683>;Date:22.07.2021

৬. প্রথম আলো পত্রিকা, 'গোপাল ভাঁড় জাগ্রত বিবেক' শিরোনাম থেকে;ই.; <https://www.prothomalo.com/amp/story/entertainment/%E2%80%98%E0%A6%97%E0%A7%87%E0A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E2%80%99>;Date:23.07.2021

৭. ইউটিউব;<httos://youtu.be/NsEUVLgKqlo>;Date:20.07.2021

৮. ইউটিউব;<httos://youtu.be/be/ZtHnqz0JOs>;Date:20.07.21

৯. ইউটিউব;<https://youtu.be/krgUu0YKjgo>;Date:20.07.21

১০. ইউটিউব;<https://youtu.be/CydGkWdCicy>; Date:19.07.2021

১১. ইউটিউব;<https://youtu.be/bvx5YarQy8E>;Date:21.07.2021

১২. ফেসবুক;<httos://www.facebook.com/108741847199092/posts/311017153638226/?app=fbl>;Date:23.07.2021

১৩. ইউটিউব;<https://youtu.be/be-XGrEPZ_Fls>;Date:23.07.2021

উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণসাহিত্য: ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে ভ্রমণসাহিত্যে বিবর্তন

মুকেশ হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে অনেকাংশেই ব্রাত্য বা অ-চর্চিত। প্রথম সারির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলি লক্ষ করলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভ্রমণ সাহিত্যও যে সাহিত্য সংরূপের একটি রূপ তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে বোঝা দুষ্কর। তবে ভ্রমণ সাহিত্য ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির মনে অপ্রাপ্তি ভ্রমণ ইচ্ছার বিমূর্ত সংরূপ হয়ে আছে। আলোচ্য এই প্রবন্ধটিতে আমি উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। যেখানে উঠে এসেছে সেই সময়ের ভ্রমণ সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, রচনাশৈলী এবং ভ্রমণ যাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। ডায়েরির মতো করে লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে ভ্রমণ সাহিত্য হয়ে ওঠার যে পথ পরিক্রমা তা উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য এই বিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আছে। একাধিক (বিজয়রাম সেন, যদুনাথ সর্বাধিকারী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মাইতি, নিগূঢ়ানন্দ, স্বামী রামানন্দ ভারতী, জলধর সেন, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব) ভ্রমণ সাহিত্যিকের ভ্রমণ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে।*

সূচক শব্দ : *উনিশ শতক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভ্রমণ সাহিত্য-সাহিত্যিক, বিবর্তন।*

মূল প্রবন্ধ: ধারাবাহিকতার ইতিহাস তখনই উঠে আসে যখন তার একটি নির্দিষ্ট ধারা থাকে এবং সেই ধারাটি প্রতিযোগিতা বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমুখে যাত্রা করে। এমনই এক যাত্রা বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য আঠারো শতকে শুরু করে এবং সেই যাত্রা ধারাবাহিকভাবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে শৈল্পিক পথে শ্রেষ্ঠত্বের মসনদের দিকে ধাবিত হতে থাকে। তবে ভ্রমণ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিককালের নতুন সংরূপ হলেও প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কথার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বিভিন্নভাবে, বলা ভালো তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কথা বা ভ্রমণ সাহিত্যের বীজ বপন হতে শুরু করে। আসলে ভ্রমণ হল মানুষের মনের সহজাত

প্রবৃত্তি বা পথিক বৃত্তি।এই পথিক সত্তার অভিজ্ঞতা সৃষ্টিশীল মানুষের লেখনীতে খুব সহজেই ধরা পড়ে কখনও পরোক্ষভাবে বা আবার কখনও প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ ভ্রমণ সাহিত্যরূপে। এই ভ্রমণ কথার পরোক্ষ প্রভাব বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সুবৃহৎ সাহিত্য ভান্ডারেও লক্ষ করা যায়। যেমন চর্যাপদের পদে ভ্রমণের জন্য নৌকা যাত্রার উল্লেখ রয়েছে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য'—এর "নৌকাখন্ড"—এ নদীমাতৃক বাংলার নদী পারাপারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা বা নৌ শক্তির যে বর্ণনা পাই সেই বর্ণনায় ভ্রমণ কথার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে ভ্রমণ কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়– নীলাচল ভ্রমণ, বৃন্দাবন ভ্রমণ, মথুরা গমন ইত্যাদি। তবে বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কথার এই যে পথ চলা বা পথ পরিক্রমা প্রাচীনকাল থেকে শুরু হলেও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির সৃষ্টিতে ভ্রমণ সাহিত্যের সূচনা হয় উনিশ শতক থেকে।

আঠারো শতক থেকে বাংলা ভ্রমণ কাহিনির উদ্ভব হলেও মূলত উনিশ শতক থেকে ভ্রমণ কাহিনির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তবে প্রথম বাংলা ভ্রমণ কাহিনিকার হিসেবে যাঁর নামটি প্রথমে উঠে আসে তিনি হলেন প্রাক্ উনিশ শতকের লেখক বিজয়রাম সেন। তাঁর রচিত ভ্রমণ কাহিনিটি হল— 'তীর্থমঙ্গল'। এই গ্রন্থটি প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা কবিতায় লেখা, ভ্রমণকাব্যও বলা যেতে পারে, আঠারো শতকের শেষের দিকে গ্রন্থটি লেখা। মধ্যযুগ মঙ্গলকাব্যময়, এই মঙ্গলকাব্যময়তা আঠারো শতকের শেষেও লক্ষ করা যায়— বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' ভ্রমণ গ্রন্থটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গ্রন্থটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এটি মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে লেখা একটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা, যাত্রাপথের হুবহু বর্ণনায়। তিনি যাত্রাপথে দু—চোখ ভরে যা দেখেছেন এবং তাঁর চোখের সামনে যা যা ঘটেছে তার সুন্দর বর্ণনা তিনি শব্দচিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বিজয়রাম গ্রাম ও শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর তাঁর নৌকা যখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাটনা শহরে এসে পৌঁছাল তখন তিনি তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থে সেই শহরের বর্ণনা করলেন, শুধু পাটনা শহরের নয়, পাটনার বাইরেও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা করলেন এবং সমস্ত শহর ঘুরে দেখতে তাঁর কত কর দিতে হয়েছে এবং সেই করের টাকা কোথায় যায়, কী হয়, কে পায় তারও তথ্য লেখক তুলে ধরেছেন –

"ছাব্বিশ স্থানে কড়ি লাগে আইসে দিতে দিতে।।
এসব জগাতের টাকা পায় মাধব রাম।
দশ হাজার খেতি তার নাহি ধূমধাম"।[১]

যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫-১৮৭১) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লেখক। তিনি ১২৫৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের তীর্থযাত্রার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনিটির উপাদান। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটির নাম হল— 'তীর্থভ্রমণ'। এই গ্রন্থটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশ করেন। যদুনাথ সর্বাধিকারী তাঁর এই তীর্থযাত্রা পায়ে হেঁটেই করেন, লক্ষণীয় তখনও ভারতে রেলপথের সূচনা হয়নি। পদব্রজেই তিনি গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-দেবপ্রয়াগ-রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ভ্রমণ করে বাড়ি ফিরে আসেন। সেই সমস্ত তীর্থস্থানে থেকে সাধারণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং অতি সরল ভাষায় তাঁর সেই দেখাকে ভ্রমণ গ্রন্থে লিখে গেছেন। তিনি কবে কোথায় কোন তীর্থ দর্শন করেছেন বা কবে কোথায় গিয়েছেন সেই তথ্য গ্রন্থে পরস্পর ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা আছে যা ডায়ারির লক্ষণও বটে। যেমন, ১৮ই ফাল্গুন কাশীপুর থেকে কোতলপুর যাত্রা, ৩১ই চৈত্র দুলাইপুর থেকে বারাণসী রওনা, ২৬ শে ফাল্গুন হরিশ্চন্দ্রের স্থাপিত শিবমন্দির দর্শন, ২৯শে ফাল্গুন পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়ে পার্শ্বনাথ স্বামীর দিগম্বর প্রস্তরমূর্তি দর্শন, ৮ই চৈত্র ফল্গুনদীতে শ্রাদ্ধ করে পিন্ডদান। আসলে যদুনাথ সর্বাধিকারীর গ্রন্থটি ভ্রমণ সাহিত্য অপেক্ষা ভ্রমণ পথ নির্দেশিকার লক্ষণই বেশি। তিনি যেমন বিভিন্ন তীর্থদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন সন তারিখ উল্লেখ করে সেই সঙ্গে সেই সমস্ত দর্শনীয় স্থানের বা বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনাও করেছেন। তিনি বারাণসীতে পৌঁছে আপ্লুত কণ্ঠে আবেগময়ী ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

> *"গঙ্গার পূর্বপারে কাশীপুরী দেখিতে কিবা শোভা হয় তাহা বর্ণণের বাহির। সুবর্ণময় যে কাশীপুরের বর্ণনা আছে তাহার সংশয় কি? অতি মনোরম স্থান। দক্ষিনে অসি, উত্তরে বরুণা। ইহার মধ্যস্থলে কাশী"।*[২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) উনিশ শতকের নবচেতনার একজন পথ প্রদর্শক। তাঁর সেই নবচেতনার আলোর ছটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বা সাহিত্য কর্মে পড়েছে। তাঁর লেখা 'আত্মজীবনী'তেও সেই নবচেতনা লক্ষ করা যায়।

তিনি প্রত্যক্ষ বা সরাসরি কোনও ভ্রমণ গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর লেখা আত্মজীবনীতে ভ্রমণ কাহিনির কথা উঠে এসেছে এবং বলা ভালো তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ভ্রমণ গ্রন্থে ভ্রমণ রসের আস্বাদও পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন মনেপ্রাণে পথিক বা ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাঁর কথাতেই তা পরিষ্কার— তিনি ভ্রমণের জন্য একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন—

> *"সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেউ জানিতেও পারিবে না; জলে স্থলে তাহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব,— এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।"*[৩]

তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে বিভিন্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন — কাশী, বর্ধমান, বর্মা, উড়িষ্যা, অমৃতসর, সিমল এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং পাঠকের কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। সেই অভিজ্ঞতা লেখককে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধির জগতে নিয়ে গেছেন এবং তাঁর ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি এক গভীর মুগ্ধতা লক্ষ করা যায় এবং এই মুগ্ধতা যথাযথ ও উচ্ছ্বাসহীন। সমতলভূমির মতো সহজ ও সরল এবং ঝর্ণার মতো স্বচ্ছ ও চমৎকার—

> *"কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিভিন্ন প্রকারের তৃণ—লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ; স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্পলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান হইল।"*[৪]

আসলে তাঁর 'আত্মজীবনীর সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে ভ্রমণ কাহিনি এবং তাঁর ভ্রমণ কাহিনিগুলি ভ্রমণ রসে পরিপূর্ণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী(১৮৪৭-১৯১৯) উনিশ শতকের একজন প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি সাধারণের মাঝে ব্রাহ্মসমাজের নেতা হলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি সুপন্ডিত,

সুলেখক, শিক্ষাবিদ। তিনি নানান মূল্যবান গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি একখানি 'আত্মচরিত'ও রচনা করেন এবং সেই 'আত্মচরিত' গ্রন্থে তাঁর দু—একখানি ভ্রমণ কাহিনির কথা বা ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। যেমন— 'আনাড়ি অশ্বারোহির দার্জিলিং যাত্রা ও খার্সিরাঙে নির্জন বাস' বা 'ইংলন্ডের ডায়েরী'(১৮৮৮) ও 'বিদেশ ভ্রমণের দিনলিপি' রচনাগুলিতে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি ১৮৮০ সালের বৈশাখ মাসে দার্জিলিঙে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য যান এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা ভ্রমণাকারে উপরিউক্ত রচনাটিতে লেখেন। তখনও শিলিগুড়ি দার্জিলিঙে ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি তবে রেলপাতা হয়েছিল। যার ফলে তাঁকে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়েছিল এবং এই ঘোড়ায় চড়া প্রসঙ্গে লেখক তাঁর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বলেছেন —

> *"যেই প্রিয়বাবুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা, অমনি আমার ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িল। আমি কখনো ঘোড়া চড়ি নাই, সুতরাং এরূপ অবস্থাতে কখনো পড়ি নাই। আমি দু পা দিয়া ঘোড়ার পিঠ চাপিয়া ধরিয়া, দুই হাত দিয়া তাহার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম।"*[৫]

এইরূপ বিচিত্র কৌতুকময় ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণও করেছেন, ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের শক্তি কোথায় সেই দিকটি তুলে ধরেছেন —

> *"তাহাদের জাতীয় চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহা এই। প্রথম, তাহাদের জাতীয় চরিত্রে যেমন একদিকে স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন শক্তি আছে, তেমনি অপরদিকে সাধুভক্তি ও বাধ্যতা আছে। এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য।"*[৬]

স্বামী রামানন্দ ভারতী উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৮ সালে কৈলাস মানস সরোবর ভ্রমণ করেন এবং এই কৈলাস ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কাহিনি তিনি রচনা করেন, যা 'হিমারণ্য' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থটি গ্রন্থ আকারে মুদ্রিত হয় ১৯৭৮ সালে তবে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস সংখ্যায় সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী রামানন্দ ভারতী পায়ে হেঁটেই সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি ডায়েরির মতো করে লিখে

গেছেন যদুনাথ সর্বাধিকারীর দেখানো পথে। তিনি কৈলাস যাত্রার শুরুতে তপোবন গ্রামের প্রতি মুগ্ধ হয়ে এক গিরিগুহায় বিশ্রাম নেই ও রাত্রিযাপন করেন। সেই কথা তিনি তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থে সাবলীলভাবে গুরুগম্ভীর ভাষায় তুলে ধরেছেন —

> *"ঘন সন্নিবিষ্ট দেবদারু ও চীর প্রভৃতি বৃক্ষের মোহন গাম্ভীর্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া একটি গিরিগুহার দিকে টানিয়া লইল। অদ্য আমরা এই গুহাতেই বিশ্রাম করিলাম।"*[৭]

এই গুহার নিচে বেগবতী স্রোতস্বতী নদীর পূর্বতীরে 'দোনাগিরি' পর্বতের এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন লেখক —

> *"দোনাগিরির উচ্চশৃঙ্গ নাই; দেখিলে বোধ হয়, কে যেন শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাবধি দোনাগিরিতে নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। রাত্রিতে ইহার উপর সহস্র সহস্র উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় আলোকরাজি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দিবসে তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।"*[৮]

জলধর সেন(১৮৬০—১৯৩৯) উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন ভ্রমণ কাহিনি লেখক। তাঁর শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ গ্রন্থটি হল — 'হিমালয়'। 'হিমালয়' বা 'হিমাদ্রি'(১৩০৮) ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার আগে তাঁর একাধিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতামূলক রচনা 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন — 'টপকেশ্বর', 'গুচ্ছপাণি', 'সহস্রধার' ইত্যাদি যা পরবর্তীকালে 'প্রবাসচিত্র'(১৮৯৯) নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর 'হিমালয়' গ্রন্থটিই বিশেষ আলোচিত ও প্রশংসিত। সহজ সরল ভাষায় লেখক তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন এবং এই রূপ ভ্রমণ রসে স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর হয়েছে। জলধর সেনের 'হিমালয়' ভ্রমণ কাহিনিতে একাধিক ছোট বড় অসংখ্য চরিত্র এসেছে এবং লেখক তাদের মুখোমুখি হয়েছেন, কথাও বলেছেন। অনেক চরিত্র তাঁকে মুগ্ধও করেছে। দেবপ্রয়াগে যাওয়ার সময় লেখক সঙ্গী হিসেবে পায় একজন বাঙালি সন্ন্যাসীকে। যাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন —

> *"ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরাজী জানেন না, কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। প্রথমে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন; তারপর এঁর মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে। কলিকাতায় থাকতেই তিনমাসের জন্যে মৌনব্রত অবলম্বন করেন।"*[৯]

লেখক যে শুধু পথে পরিচয় হওয়া চরিত্রেরই বর্ণনা দিয়েছেন তা কিন্তু নয়, পথের ধারের গ্রামগুলোকে দেখেছেন এবং সেখানকার ছবি এঁকেছেন তাঁর কাহিনিতে —

> *"কান্তি চটির সম্মুখেই একখানা ছোট গ্রাম। সেই গ্রামে সেদিন একটা বিবাহ। ঢোল বাজছিল; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল কাপড় চোপড় পরে, হাত ধরাধরি করে নেচে বেড়াচ্ছিল। মুখ ভাবশূন্য এবং চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। সন্ধ্যার সময় দূরের এক গ্রাম থেকে বর আসবে। দেখলুম মেয়ে মহলের ভারি উৎসাহ লেগে গেছে; তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে নানারকম আয়োজন করছে।"*[১০]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক ভ্রমণ সাহিত্যিক হিসেবে যাঁর নামটি উঠে আসে তিনি হলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার সুবাদে অফিসের কাজের সূত্রে তাঁকে পালামৌ যেতে হয় এবং কিছুদিন সেখানে থাকেন। পরবর্তীকালে তারই স্মৃতিচারণ করে 'পালামৌ' নামে একখানি রমনীয় ভ্রমণ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ছ'টি কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহজ সরল হাস্যরসিক প্রসন্নচিত্তের মানুষ আর তাঁর এই সাবলীল ব্যক্তিত্বের ছাপ 'পালামৌ' গ্রন্থে উপস্থিত। এই ভ্রমণ কাহিনিতে তিনি প্রচলিত ভ্রমণ কাহিনির পথ ত্যাগ করে গল্পের আকারে কোল-সাওতালের আদিম সমাজের একটি জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের কাছে। লেখক পালামৌ যাওয়া স্থির করলে সেই স্থানটির ম্যাপ দেখে তার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করেন এবং কীভাবে যাবেন সেখানে সেই কথায় প্রথম জানান —

> *"হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ইংল্যান্ড ট্রানজিট কোম্পানীর ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল।"*[১১]

লেখকের দৃষ্টি আসলে গল্প লেখকের দৃষ্টি। তাঁর সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ পরিহাস ও হিউমারের রসে মন্ডিত হয়ে কৌতুকময় সরস চিত্রে ফুটে উঠেছে। আবার সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনারীতি গীতিকবির মতোই। 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনিতে তিনি যেন কোথাও কোথাও

কবিই হয়ে উঠেছেন। পালামৌতে মহুয়া গাছে ছড়াছড়ি, বলা যায় এই মহুয়া গাছই তাঁর কবি মনকে কেড়ে নেয় —

> *"মৌয়ার শেফালিকার মতো ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাঝি, মৌমাছি ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের কোলাহলে বন পূরিয়া যায়। বোধ হয় দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না।"*[১২]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে ভাব ও কল্পনার আতিশয্যে কবি আবার চরিত্র চিত্রনে ঔপন্যাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১—১৯৪১) বিশ্বভ্রমণ এবং বলা ভালো সেই সূত্র থেকেই তাঁর ভ্রমণ সাহিত্য, যা বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেলেন। তিনি ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ৩০ টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং প্রতিটি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্পকলা ও মানুষের জীবনযাত্রাকে তুলে এনেছেন তাঁর লেখনীতে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছেন, যশ খ্যাতি প্রশংসা পেয়েছেন কিন্তু কখনোই তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে ভ্রমণ সাহিত্যে তুলে ধরেননি। আমরা তার ফলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু এই বঞ্চনা তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যকে শিল্পের আঙিনায় নিয়ে গেছে এবং আনন্দ ও বিস্ময় রস যার ফলে অক্ষুণ্ণ থেকেছে। যে কয়টি গ্রন্থ রবি ঠাকুরের ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে সেগুলি হল— 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী', 'জাপন যাত্রী', 'যাত্রী'— 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী' ও 'জাভা যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্য', 'পথের সঞ্চয়'। তাঁর সৃষ্টি একদিকে যেমন উনিশ শতকের ভ্রমণ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অন্যদিকে বিশ শতকের ভ্রমণ সাহিত্যের দ্বার প্রশস্ত করেছে। তিনি একাধিকবার বিদেশ যাত্রা করেছেন এবং সেই সব অভিজ্ঞতার নান্দনিক বিবরণ তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও শুধু ভাবুক বা কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তাঁর ছিল প্রকৃত পর্যটকের একজোড়া চোখ। সেই পর্যটকের চোখ দিয়ে দেখেছেন এবং মন দিয়ে তার বর্ণনা করেছেন —

> *"পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারিদিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে শুয়ে পড়লাম।... যে ঘরে থাকতেম সেটা অতি অন্ধকার ছোট; পাছে সমুদ্রের জল ভেতরে আসে তাই চারিদিকের জানালা সম্পূর্ণ বন্ধ।"*[১৩]

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ যাত্রা বা ভ্রমণ সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়েই ইউরোপ। যার ফলে তিনি ইউরোপকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং ইউরোপীয় যন্ত্র সভ্যতার ভয়াবহতা লক্ষ করে জাপানিদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেছেন। তবে ইউরোপ সম্বন্ধে লেখক যে শুধু তার ভয়াবহ রূপটাই দেখেছেন তা কিন্তু নয়। ইউরোপ কোথায় বড়, তার মূল শক্তি কোথায় সেটি দেখতেও তিনি ভুল করেননি— যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। যার ফলে ইউরোপ বিশ্বজয় করেছে। এখানে মূলত উনিশ শতকে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটিকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি উল্লেখিত ভ্রমণ সাহিত্যিকদের ভ্রমণ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে।এছাড়া আরও ভ্রমণ সাহিত্যিক বা ভ্রমণ গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে উনিশ শতকের ইতিহাসে। সংখ্যার বিচারে তা কম নয়। কিন্তু শব্দে বাধা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের ভ্রমণ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবে তাঁদের ভ্রমণ গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

ঈশ্বর গুপ্ত(১৮১২—১৮৫৯) উনিশ শতকের একজন বাঙালি কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। তিনি মূলত ব্যাঙ্গাত্মক রচনার জন্য বিশেষ পরিচিত। তবে এর পাশাপাশি তিনি তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' এই শিরোনামে একটি ভ্রমণ গ্রন্থও প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়(১৮২৪—১৯০৯) বিলেত থেকে ফিরে আসার পর সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে তিনি ভাষারূপ দিলেন তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যে। তিনি লন্ডন শহরকে কেন্দ্র করে একাধিক ভ্রমণ গ্রন্থ রচনা করলেন— 'ডোভার পেরিয়ে', 'রঙিন লন্ডন', 'রাতের লন্ডন'।

চিত্তরঞ্জন মাইতি(১৮২৫—১৯১৩)-র ভ্রমণ গ্রন্থে মূলত কাশ্মীর, কুমায়ন, হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— 'চলার পথে

দিনলিপি' (১ম—২য়), 'কন্যাকাশ্মীর', 'কলাভূমি কলিঙ্গ', 'শৈলপুরী কুমায়ন', 'দূরের বাঁশি', 'ত্রিসমুদ্রের আহ্বান' প্রভৃতি।

নিগূঢ়ানন্দ(১৮৩৫—১৯১৩) —র ভ্রমণ কাহিনির বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিক্রমার বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর রচিত ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে', 'জন্মান্তর', 'সাধুসন্তের দেশে', খুঁজে ফিরি কুন্তলিনী'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩) চাকরিসূত্রে বোম্বাই যান। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। আর এই ভ্রমণকালীন নানান অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেন 'আমার বাল্যকাল ও আমার বোম্বাই প্রবাস' ভ্রমণ গ্রন্থে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) একজন উচ্চপদস্থ পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারীর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি 'বাঙালীর ইউরোপ দর্শন' নামে একটি ভ্রমণ গ্রন্থও রচনা করেন ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে রসদ করে।

দুর্গাচরণ রায় (১৮৪৭-১৮৯৭)—এর 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' ভ্রমণ গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহজ সরল ভাষায় হাস্য ও ব্যঙ্গরসের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি বর্ণিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৩) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির পাশাপাশি একটি ভ্রমণ গ্রন্থও রচনা করেন ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে— 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ'।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিত হলেও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ রচনাও আছে সেটি হল— 'প্রবাসের পত্র'।

রমেশচন্দ্র দত্ত(১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা তথা ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব— সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সিভিলিয়ান। তিনি কর্মসূত্রে ইউরোপ যান এবং সেই সময়েই তিনি 'ইউরোপে তিন বৎসর' নামে একটি ভ্রমণ গ্রন্থ রচনা করেন।

শরৎচন্দ্র দাস(১৮৪৯-১৯১৭) তাঁর তিব্বত যাত্রার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি তথ্যবহুল ভ্রমণ গ্রন্থ সৃষ্টি করেন — 'তিব্বত ভ্রমণ অভিযান'।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গিরিন্দ্রনাথ বসু(১৮৫৩-১৯৩৩) বঙ্গবাসী স্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠাতাও। তাঁর বিশেষ দুটি ভ্রমণ গ্রন্থ হল— 'ইউরোপ ভ্রমণ' ও 'বিলাতের পত্র'।

নগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৫৭-১৯৩৩) এর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— 'দেশ-দেশান্তরে'। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের কথা এখানে উঠে এসেছে।

এছাড়াও এই সময়ে(উনিশ শতক) 'পুরুষ লেখকদের' পাশাপাশি মহিলা লেখকদেরও লেখা বেশ কিছু ভ্রমণ গ্রন্থ রয়েছে— কৃষ্ণভাবিনী দাসীর 'ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা', রাজকুমারী দেবীর 'ইংল্যান্ডে বঙ্গবধূ', প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত্ত', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দার্জিলিং এর চিঠি', গাজীপুরের চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাক্ পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর।

বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সার্থকতার রূপ সৃজিত হয়। উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিবর্তন লক্ষ করা যায় ভ্রমণ সাহিত্যের ভাষায়, শব্দচয়নে, বর্ণনার সৃজনশীলতায়, দেশকালপাত্র চিত্রণে, উপলব্ধির পার্থক্যে-সময়ের সঙ্গে বা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। ভাষা হোক বা মানুষ, সাহিত্য হোক বা সমাজ। যার পরিবর্তন অনিবার্য। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যও সেই অনিবার্য নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যও সময়ের সঙ্গে, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে পরিবর্তন বা বিবর্তন করেছে। যার ফলে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে ভ্রমণ সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। উনিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের যে বিবর্তনের ধারা যেখানে মুকুল থেকে ফল হওয়ার বিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই মুকুল যদি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব হয় তাহলে ফল হল বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের ধারক ও বাহক। আর এই ফলকে পরবর্তী প্রজন্মের ভ্রমণ সাহিত্যিকেরা সমৃদ্ধ করেছেন।

উৎস নির্দেশ :

১. ‘তীর্থমঙ্গল’, বিজয়রাম সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪

২. 'তীর্থভ্রমণ', যদুনাথ সর্বাধিকারী, R.C. Mittra, at the Visvakosha — press, Calcutta, পৃ. ৪১

৩. 'শ্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', শ্রীসতীশচন্দ্রচক্রবর্ত্তী কর্তৃক সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পৃ. ১০৯

৪. 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর', ড. বনানী চক্রবর্ত্তী, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা মাঘ ১৪২১/জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৮৯

৫. 'আত্মচরিত', শিবনাথ শাস্ত্রী, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ. ১৭৮

৬. তদেব, পৃ. ২৩৯

৭. 'হিমারণ্য', সাহিত্য, ১২ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫

৮. তদেব, পৃ. ৭

৯. 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর', ড. বনানী চক্রবর্ত্তী, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা মাঘ ১৪২১/ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১০৬

১০. তদেব

১১. 'পালামৌ', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক – শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় /শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৫৮, পৃ. ১ ১৪২১/ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৬৭

১২. তদেব, পৃ. ৪৬

১৩. 'য়ুরোপ–প্রবাসীর পত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৩, ১৮০৮ শক, পৃ. ১

গ্রন্থঋণ :

১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রূপ – রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কলকাতা, রত্নাবলী, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪২২, আগস্ট ২০১৫

২. ড. বনানী চক্রবর্ত্তী, 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর', কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা মাঘ ১৪২১/ জানুয়ারি ২০১৩

৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৯, বইমেলা ২০১৩,

৪. ড. নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৪, অগ্রহায়ণ ১৪২১

৫. বিজয়রাম সেন, 'তীর্থমঙ্গল', নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

৬. যদুনাথ সর্বাধিকারী, 'তীর্থভ্রমণ', Calcutta, R. C. Mittra, at the Visvakosha – press

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র ১৩৯৩, ১৮০৮ শক

৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', কলকাতা, সিগনেট প্রেস, আশ্বিন ১৩৫৯

৯. 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৭

১০. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পালামৌ', সম্পাদক — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীসজনীকান্ত

পত্র—পত্রিকা :

১. পদক্ষেপ, ক্রোড়পত্র : পুরোনো ভ্রমণকাহিনী, সম্পাদক: জ্যোতির্ময় দাশ অসীমকুমার বসু, বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৪২, বইমেলা সংকলন, জানুয়ারি ২০১২

২. 'হিমারণ্য', সাহিত্য, ১২ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মধ্যবিত্ত জীবন-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প

জয়দেব সিংহ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে রমাপদ চৌধুরী একজন বিশিষ্ট লেখক, পাঠক ও সুসাহিত্যিক। সদ্য গড়ে ওঠা রেলশহর খড়গপুর উপনগরীতে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হলেও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হঠাৎ পাঠক থেকে লেখক হয়ে ওঠেন। বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে ছোটগল্প 'উদয়াস্ত' রচনা করেন। ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই সাহিত্যিক হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। ছোটগল্পগুলি যেন তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। শুধু ছোটগল্প নয় প্রতিনিয়ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফলে তাঁর হাতে রচিত হয়েছে 'প্রথম প্রহর', 'বনপলাশির পদাবলী', 'খারিজ' প্রভৃতি উপন্যাস। মধ্যবিত্ত মানসিকতা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়। কলকাতা শহরের ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকা মধ্যবিত্ত জীবনই যেন তাঁর মূল সৃজনভূমি। তিনি দেখেছেন মধ্যবিত্ত জীবনে কীভাবে আছড়ে পড়ছে অনিঃশেষ জটিলতা এবং তা থেকে বেড়োনোর জন্য প্রাণের আর্তি। মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্পগুলি কোন স্বপ্নের জগৎ কিংবা কল্পনার জগৎ-এর বাসিন্দা নয়। নগর কলকাতার কিংবা ছোটখাটো শহরের পরিচিত মানুষজন যারা নানা জটিলতায় ভোগে, মধ্যবিত্ত সুলভ চিন্তা রয়েছে যাদের, আড়ম্বরে যারা আচ্ছন্ন, নিয়ত যন্ত্রণায় যারা আলোড়িত রমাপদ চৌধুরী সেই সব মানুষদের চিরে চিরে দেখিয়েছেন তাঁর ছোটগল্প গুলিতে।*

সূচক শব্দ : *রমাপদ চৌধুরী, মধ্যবিত্ত জীবন-সংস্কৃতি, পরিবর্তন, সময়, পরিসর।*

মূল আলোচনা :

ইউরোপীয় রেনেসাঁ উত্তর যুগে পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির জয়যাত্রা শুরু। ইউরোপের আধুনিক শিল্প-রাজনীতি সংস্কৃতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে মধ্যবিত্ত জীবনযাপন। ইউরোপের মতো এদেশেও পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা ব্রিটিশদের হাত ধরে। কিন্তু বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাস ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় পৃথক। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ড ও

ইউরোপের অন্যান্য দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটলেও বাংলায় কিন্তু এই একই কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেনি। ইংরেজ শাসনের বহু পূর্বে বাংলায় জমিদার নামে এক শ্রেণি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নবাবের কাছারিতে জমা দিত। জমিদাররা উত্তরাধিকার সূত্রে এই খাজনা আদায় করে থাকতেন। কৃষকদের জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার না থাকা সত্ত্বেও জমিদাররা রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন। পরে বাংলা দেশে জমিতে সৃষ্টি হতে লাগল মধ্যস্বত্ব-তালুকদারী, পত্তনিদারী, দূর-পত্তনিদারী প্রভৃতি নানা স্তরের উপস্বত্ব। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে কৃষকদের জমিতে যে মধ্যস্বত্ব স্বীকৃত হয় সেই, "ভূমিস্বত্বের উপস্বত্ব আশ্রয় করেই বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে (১৮৩৫) সরকারী চাকরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।"[১] অর্থাৎ উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে নবজাগরনে বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর এই নবজাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষের মতে-

> "উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে সামাজিক নবজাগরণ ও কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন হয় তা মধ্যবিত্তের সৃষ্টি এবং প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের মধ্যে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই এই পথে অগ্রণী হন। এই সামাজিক নবজাগরণে বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দান নানাদিক থেকে স্মরণীয়।"[২]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই মধ্যবিত্ত জীবন-সংস্কৃতির আঁচ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে। তার কারণ লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত। যদিও কেউ কেউ সাময়িকভাবে এই জীবন থেকে অন্য জীবনকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলা ছোটগল্পের জগতে যে কজন গল্পকার শক্তিশালী কলম নিয়ে এসেছিলেন, রমাপদ চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত মানুষের সীমাবদ্ধতাকে সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন-

> "আসলে মধ্যবিত্ত হল সমাজের মধ্যবৃত্ত। বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো ওপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়।"[৩]

রমাপদ চৌধুরীকে একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল- মধ্যবিত্ত মানুষ, মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়েই আপনার নাড়াচাড়া- আপনি এই সীমাকে বেছে নিলেন কেন? মধ্যবিত্ত সমাজ এই পটভূমি ছেড়ে অন্য বিস্তৃত পটভূমিকায় যাচ্ছেন না কেন?

উত্তরে তিনি বলেন, সাহিত্য নানারকম হতে পারে। কেউ ভূগোল পড়ান, কেউ ইতিহাস লেখেন, কেউ বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষদের নিয়ে লেখেন- কখনো গ্রাম, কখনো শহর আবার কখনো অরণ্য, কিন্তু আসলে কে লিখছেন? লিখছেন তো একজন মধ্যবিত্ত মানুষ। আমিই তো প্রথম প্রহর লিখেছি একটি রেল কুঠির পরিবেশ নিয়ে, বনপলাশির পদাবলী লিখেছি স্বাধীনতার পরবর্তীকালের পরিবর্তনশীল গ্রাম জীবন নিয়ে, ইতিহাসের নামে রোমান্স লিখেছি লালবাঈ, একটা কাল্পনিক দ্বীপ নিয়ে দ্বীপের নাম টিয়া রঙ, ভুবনেশ্বরের একটি হোটেল নিয়ে এই পৃথিবী পান্থ নিবাস, ষাটের দশকের যুবক যুবতীদের হঠাৎ বিস্ফোরণ নিয়ে এখনই- বৈচিত্র্যের তো শেষ ছিল না।...আসলে আমাদের সমাজটাই মধ্যবিত্তেরই সমাজ।[৪] বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে রমাপদ চৌধুরীই একমাত্র লেখক যিনি সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চলমান ছবিটিকে সময়ের পটভূমিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্ত জীবন সতত পরিবর্তনশীল জীবন ও এই জীবন-ভাবনাটিকে তিনি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমরা তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্পে এই মধ্যবিত্ত জীবন সংস্কৃতিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের প্রথম আলোচ্য রমাপদ চৌধুরীর গল্পসমগ্র বইয়ের প্রথম গল্প 'উদয়াস্ত' (কার্তিক ১৩৫০, যুগান্তর সাময়িকী)। গল্পে সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সাদামাটা ছবি ফুটে উঠেছে। চল্লিশের দশকের এ-গল্পের গল্পহীন সারল্য চমকে দিয়েছিল বহু গল্প পাঠককে। আর এই গল্প সম্পর্কে মতি নন্দী মন্তব্য করেছেন: "এই বয়সে এমন গল্প লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।"[৫] রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত জীবনের চিরপরিচিত জগতের মধ্যে থেকেও এক অজানা এবং না দেখা ভুবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। জীবনের গভীর গহনে ডুব দিতে পারলে তবেই এরূপ নিটোল গল্প লেখা সম্ভব। এক অখ্যাত স্টেশন মাস্টার বিষ্ণুরামের জীবনের কর্মক্লান্ত, আনন্দ সুখহীন জীবনের গল্প 'উদয়াস্ত'। তার জীবন রুটিনে বাঁধা। মনে মনে তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল বুনলেও 'আপ আর ডাউন' ট্রেন দুখানা মনে করিয়ে দেয় তার একঘেয়েমি জীবন- "বিষ্ণুরামের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। এই জীবনের স্বপ্নই কি সে গড়েছিল বিশ বছর আগে!...বিষ্ণুরামের জীবনে আছে শুধু অপেক্ষা- সূর্যোদয় মনে

পড়িয়ে দেয় সন্ধ্যার কথা, আর সন্ধ্যা-রাত্রির।"[৬] আপাতদৃষ্টিতে বিষ্ণুরামের জীবনে কোন সমস্যা নেই। স্ত্রী সাবিত্রী সহ তার ছেলে মেয়ে সহ তার সুখের সংসার। কিন্তু স্টেশন মাস্টার বিষ্ণুরাম তার এই একঘেয়েমি জীবনে চাই একটু বৈচিত্র্য। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে বৈচিত্র্য কোথায়? তিন সন্তানের মা সাবিত্রীর সঙ্গে বিষ্ণুরাম মাঝে মাঝে যৌবনের উন্মাদনার স্বাদ পেতে চাই কিন্তু তার প্রতি সাবিত্রীর আর কোনও আকর্ষণ নেই। তার চোখে সে এখন বয়স্ক। ফলে বিষ্ণুরামের উপলব্ধি- "তার বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, সত্যিই তো সে এখন বৃদ্ধ। দোষ আর কারও নয়, দোষ তার বয়সের।...বিষ্ণুরামের যৌবনের কথা মনে পড়ে। সাবিত্রীর একটা চিঠির উত্তর তার আজও মনে আছে। সাবিত্রী লিখেছিল, 'চিঠির শেষে তুমি যা চেয়েছ, তা কি চিঠিতে দেওয়া যায়, একদিন এখানে এসে নিয়ে যেয়ো।' বিষ্ণুরাম ভাবে সেই জীবন আর এই জীবন-কত পার্থক্য।"[৭] তাই গল্পের শেষে বিষ্ণুরাম তার জীবনকে উপলব্ধি করে- "এ সংসারে থাকা অপেক্ষা তার স্টেশন-ঘর অনেক ভাল-টরে টক্কা-টরে টক্কা- টরে টরে। সেখানে আনন্দ না থাকতে পারে অশান্তি তো নেই।"[৮] মধ্যবিত্ত জীবন-সংস্কৃতির গল্প 'উদয়াস্ত' নামকরণ এখানেই সার্থক। এদের জীবনের উদয় থেকে অস্ত সমস্ত জুড়েই রয়েছে বিষাদ।

'বসবার ঘর' গল্পটি স্বাধীনতার ঠিক দু'দশক পরে লেখা। চল্লিশের গল্পকারদের লেখায় মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে মধ্যবিত্তের মাথাব্যথার কথা আমাদের অনুভূতিতে দাগ কেটেছে। স্ট্যাটাস সচেতন নাগরিক মধ্যবিত্ত প্রথমত মাথা গোঁজার বাসস্থান সংস্থানের পর তার 'বসবার ঘর'এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। যেমনটি ঘটেছে এই গল্পের কথক ও তার স্ত্রী রেখার ক্ষেত্রে। সমস্যাটা হয় তখন, যখন সুখের সঙ্গে ইচ্ছেটা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে-

"মনে হয় যাদের বেশ একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো বসবার ঘর আছে তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই।...এত ইচ্ছে হয়, এই একঘেয়েমি ছেড়ে মাঝে-মাঝে এর-ওর বাড়ি বেড়াতে যাই, ইচ্ছে হয় তারা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসুক, দু দন্ড বসে গল্প করি, কিন্তু- না, আমাদের কোনও বসবার ঘর নেই। নেই বলেই দিনে দিনে মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, দূরে সরে আসছি নিজেরা, একা হয়ে যাচ্ছি।"[৯]

আর এই বসবার ঘর না থাকাটা তাদের এতটাই সংকোচের খাঁচায় আবদ্ধ করে ফেলে যে নিজেদের হীনমন্যতার কারণে তারা ভাবতেও পারে না আত্মীয়-পরিজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা। কেননা তাদের বাড়ি বেড়াতে গেলে পাল্টা সৌজন্যে

তাদেরও বাড়ি আসতে বলতে হয়। কথকের নিজের উপর রাগ হয়, রাগ হয় সমস্ত বাড়িটার ওপর। যৌথ পরিবার ছেড়ে একটা ছোট্ট সুন্দর স্বার্থপরতার ফ্ল্যাটে পালাতে ইচ্ছে করে। এরপর গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে কথক ও তার স্ত্রী বন্ধু অমলের বাড়ি যাওয়া, মান্ধাতা আমলের জীর্ণ বাড়িতেই ছোটবেলার গল্পে মশগুল হয়ে যাওয়া এবং নিজের ঘরের সঙ্গে তাদের ঘরের প্রতি তুলনায় এতটুকু হীনমন্যতা হয় না তাদের কারণ ওদেরও যে বসবার ঘর নেই। গল্পে মধ্যবিত্তের এই মানসিক সংকট অর্থনৈতিক জীবন-সংস্কৃতির সংকটেরই ফল।

রমাপদ চৌধুরী 'আলমারিটা' গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতরের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটি শুরুই হচ্ছে এই স্বগতোক্তিতে, 'চাই না, চাই না, আমি তোমাদের কাছে হিরো হতে চাই না।' এই গল্পে মধ্যবিত্তরা আবার অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। ভদ্র হোক বা না হোক ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকতে ভালোবাসে। আবার কখনো কখনো এই ভদ্রতায় তাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়-

"বারান্দার এক পাশে রাখা আলমারিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই যে। ভদ্রলোক হবার ভোগান্তি। ওঁর তো সব বিষয়ে এটা করতে লজ্জা, ওটা করতে লজ্জা।"[১০]

কথকের ছোট মামার রেখে যাওয়া শ্রীছাঁদহীন প্রকান্ড বিশাল আলমারিটা নিজের শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে ঘরের মধ্যে জায়গা দিতে বাধ্য হয়। আর এই আলমারিটাকে কেন্দ্র করেই তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় স্ত্রী-শ্যালিকার ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। কিন্তু একটা সময় পরিস্থিতির প্রত্যাঘাতে ভেঙে পরে ভদ্রতা-অভদ্রতার সৌজন্যবোধ। কথকের শুধুই মনে হয় আলমারিটা ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। তিনি খুব ভয়ে থাকেন কোনদিন ছোটমামা এসে পড়েন, ঘর থেকে বারান্দায় স্থান হয়েছে বলে খুঁত ধরেন-

> "আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আমারও অবশ্য মনের ভেতরটা কেমন খিচখিচ করে উঠল। আগে ঘরের মধ্যেই ছিল, এখন বারান্দায়। এই তো ছোট্ট একফালি বারান্দা, তার আধখানা জুড়ে আছে আলমারিটা। তাও সবসময় কেমন একটা সংকোচ হয়, সব সময় ভয়-ভয়। কবে ছোট মামা এসে পড়ে। আর আত্মীয়স্বজনদের তো বিশ্বাস নেই, খুঁত ধরতে পারলে কেউ ছাড়ে না।"[১১]

আসলে বাসস্থান সংকোচ নাগরিক মধ্যবিত্তের কাছে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কথকের মনে হয় আলমারিটা ব্যবহার করতে পারছি না অথচ ঘরের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। আসলকথা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে চিরচেনা পরিবেশ। আর এই ভদ্র-অভদ্রতার মুখোশের আড়ালে মানিয়ে নিতে না পারলে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে। আর এখানেই এই গল্পে ভদ্রলোকের এক নতুন সংজ্ঞা নির্মিত হলো। একালের উপযুক্ত হতে গিয়ে কাঠের আলমারিটার সাথে সাথে সে এতদিনের সযত্নে লালিত মূল্যবোধকেও বিসর্জন দিয়ে দিল। মধ্যবিত্তের এই বদলে যাওয়ার গল্প হল 'আলমারিটা' গল্পটি।

'ফ্রিজ' গল্পটি মধ্যবিত্ত জগতের অস্তিত্বের ভাঙনের এক প্রতিরূপ। মধ্যবিত্ত জগতের বস্তু, পণ্য মানবিক সম্পর্ক ও বোধগুলিকে কিভাবে খেয়ে নিচ্ছে তার ছবি ধরা পড়েছে গল্পে। পাঁচ বছরের ছেলে ফ্রিজ কেনার আবদার করলে 'আমি' চমকে ওঠে, স্ত্রী নীলিমা চমক ওঠে। ফ্রিজ শব্দটি তাদের ধাক্কা দেয়, আবার ভালোও লাগে। মধ্যবিত্ত স্বল্প আয়ের মধ্যেও কিছু পয়সা জমিয়ে কিনে ফেলে সৌখিন আসবাবপত্র। এই সৌখিনতা যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন লোক দেখানো। কেননা পাড়ায় থাকতে হলে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। তাইতো কথক তক্তপোশ বাদ দিয়ে ইংলিশ খাট কিনতে বাধ্য হয়-

> "জানো, মিঠুরা না কি সুন্দর এক জোড়া ইংলিশ খাট কিনেছে। খাট তো কাঠেরই হয়, তার আবার ইংলিশ আর বেঙ্গলি আছে নাকি। হয় হয়তো। শুধু হয় বললেই তো হবে না, তক্তপোশ বিদেয় দিয়ে আনতেও হয়েছে। বাঃ, এ পাড়ায় থাকতে হলে...সেই যে বলে না।"[১২]

কুটকুটের মিঠু পিসিদের সঙ্গে কথকের পরিবারের ভোগ্যপণ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। দরকার না থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ফ্রিজ কিনতে বাধ্য। স্পষ্টতই বোঝা যায় ফ্রিজ যতটা না জৈবিক প্রয়োজন তার চাইতে বেশি প্রয়োজন স্ট্যাটাস বজায় রাখা।

'ডাইনিং টেব্‌ল' গল্পে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের নানান চাহিদা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা গল্পে ফুটে উঠেছে। স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও পিসতুতো বোন বীণার মেয়ে বুড়িকে নিয়ে কথকের ছোট্ট সংসার। আর এই ছোট্ট সংসারে প্রবেশ করে ডাইনিং টেব্‌ল। কেনার পূর্বে যা ছিল অপরিহার্য কেনার পর দু'কামরার ফ্ল্যাটে তা হয়ে ওঠে বোঝা। নিজেদের এই আভিজাত্য দেখানোর জন্য অতুলবাবুদের খাইয়ে মাসের শেষে পরে টানাটানি। মধ্যবিত্তের কাছে যা ছিল স্বপ্ন আর সৌখিনতা তা একসময়

বোঝা ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্তের চাহিদার সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতির বৈষম্য এই গল্পে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

'ড্রেসিং টেব্‌ল' গল্পে গল্পকার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিবিড় ছবি এঁকেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা বেলার ছোটবেলা থেকে সখ একটা ড্রেসিং টেব্‌লের অধিকারী হওয়ার। বিয়ের সময় দরিদ্র পিতার কাছে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল চেয়েও পায় না। তাইতো আলোচ্য গল্পে তার প্রত্যাশা প্রকাশিত হয়েছে-

> "আমার কতদিনের ইচ্ছে অমনি গদিমোড়া টুলে বসে আয়নার সামনে সাজব, টিপ, লিপস্টিক, স্নো, ক্রীম সব টুকিটাকি সাজানো থাকবে সেখানে, ঘরময় খুঁজে বেড়াতে হবে না। আর বেশ আরামে চুলে চিরুনি দেব, চুল বাঁধব...চুলের জন্যে আমার কিন্তু বেশ গর্ব ছিল।"[১৩]

তার মনের এই প্রত্যাশা দারিদ্র্যতার কারণে স্বামীর কাছে প্রকাশ করে না। টানাটানির সংসারে কিছু সঞ্চিত অর্থ দিয়ে স্বামীকে ড্রেসিং টেব্‌ল কেনার কথা বললে জুটে তীব্র বিদ্রুপ-'যা চেহারা হয়েছে, আর ড্রেসিং টেব্‌ল কেনে না।' কারণ ততদিনে মেয়েটির সৌন্দর্য, রূপ-যৌবন অন্তর্হিত, ড্রেসিং টেব্‌লের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আর এইখানেই গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির চিরন্তন বিরোধ ফুটে ওঠে।

'শেষ বৃষ্টি' গল্পটিও মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প। যে কিনা আশায় বুক বাঁধার মধ্যে দিয়ে জীবনভার বহন করে চলে। মা মারা যাবার পর একটা ছোট্ট চাকরি জুটিয়েছিল জয়ন্তী। স্বল্প বেতনের চাকরি হলেও জয়ন্তীর স্বপ্ন আকাশছোঁয়া। তাই সে অফিসের সহকর্মী কেরানি অতীশের প্রেম প্রত্যাখান করে। এখন আঠাশ বছরের যৌবনের ভাটায় আর কোনও সম্বন্ধ আসে না। ঠিক এইরকম একটা সময় জয়ন্তীর জামাইবাবু একটা সম্বন্ধ আনে। জয়ন্তীর মনে নতুন করে রঙের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু জয়ন্তীর ভাগ্যটাই খারাপ। যেদিন পাত্র দেখতে আসার কথা সেদিন বাধ সাধলো বৃষ্টি। আশায় আশায় শেষপর্যন্ত জয়ন্তী বাড়ি ফিরে আসে। এইভাবে জয়ন্তীর সম্ভাবনাময় সুন্দর স্বপ্নকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় বিকেলের এই বৃষ্টি। এইভাবে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী তার গল্পের আধারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অসহায়তা,

বিত্তহীনতা, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, পণ্যলোভাতুর, মূল্যবোধহীন মুখের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্প গুলিতে। যা তাঁর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচায়ক।

সূত্র নির্দেশ :

১. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা-দ্বিতীয় খন্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৯, পৃ.২২

২. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০২০, পৃ. ৮-৯

৩. রমাপদ চৌধুরী-গদ্যসংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১১

৪. সুদীপ্তচন্দ্র চৌধুরী, 'মানুষ ও লেখক রমাপদ চৌধুরী', রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, সম্পাদক: উত্তম পুরকাইত, রমাপদ চৌধুরী : বৈচিত্র্য ও অনুসন্ধান, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৯

৫. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'প্রসঙ্গকথা', পৃ. ৮৭২

৬. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'উদয়াস্ত', পৃ. ১

৭. তদেব, পৃ. ৪-৫

৮. তদেব, পৃ. ৫

৯. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'বসবার ঘর', পৃ. ৫৪৬

১০. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'আলমারি', পৃ. ৫৫১

১১. তদেব

১২. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'ফ্রিজ', পৃ. ৫৭১

১৩. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'ড্রেসিং টেব্‌ল', পৃ. ৫৯৭

অচর্চিত মানকুমারী বসু ও তাঁর সমকালীন ধারা

পীযুষ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

মানকুমারী বসুর প্রথম রচনা 'প্রিয় প্রসঙ্গ' র প্রকাশকাল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এরপর থেকে ধারাবাহিক ক্রমে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। মানকুমারী বসুর সমসাময়িক সময়ে আরও অনেক মহিলা কবি সাহিত্যচর্চা করেছেন। এনারা সকলেই মূলত গীতিকবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া মহাকাব্য রচনার কথাও জানা যায়। তবে মূলত গীতিকবিতা ও ক্ষুদ্রকাব্য এবং একটু বড় কাহিনি সম্বলিত কবিতা বা খণ্ডকাব্য রচনার প্রবণতাই অধিক লক্ষ করা যায়।[১] মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের সময় পেরিয়ে গীতিকবিতাই এই সময়কে প্রভাবিত করেছে। সুকুমার সেন জানিয়েছেন-

> "আলোচ্য সময়ে কবিতা-রচনা চলিয়াছিল ত্রিধারায়-(১) মধুসূদনের অনুকরণে ও অনুসরণে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যে, (২) ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে ব্যঙ্গ কবিতায়, এবং (৩) নূতন উদ্ভাবিত গীতিকাব্যে।"[২]

এখানে মূলত তিন নম্বর ধারাটি মানকুমারী বসু বা সমসাময়িক মহিলা কবিদের প্রভাবিত করেছে। তবে তাঁরা খণ্ডকাব্যও চর্চা করেছেন। এই সময়কালে গীতিকবিতা রচনায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব অনুভব করা যায়, যদিও সেই প্রভাব মহিলা কবিদের থেকে সমকালীন পুরুষ কবিদের মধ্যে অধিক লক্ষ করা যায়। বলাইবাহুল্য মানকুমারী বসু বা সমসাময়িক মহিলা কবিরা পূর্ববর্তী কোনো কবিকে অনুসরণ করলেও তাঁরা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে তুলতে পেরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মহিলা কবিদের কবিতার বিশেষত্ব ও ভাব সমসাময়িক অন্যান্য পুরুষ কবি বা সমকালীন সাহিত্যের ভাবের থেকে আলাদা। এই কারণেই তাঁরা বিশেষিত হন 'মহিলা' কবি হিসেবে।সমালোচকরা বলেছেন এই সময়ে মহিলাদের লেখার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে। সামাজিক প্রতিকূলতা ছাড়াও ছিল মানসিক ও শিক্ষার প্রতিকূলতা। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী বলেছেন-

> " 'পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাপি আমাদিগের ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গকামিনী আমরা কেহই বিদ্যাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই যে সামান্য রচনা করিয়া আপনাদের সমীপবর্তিনী হই।' "[৩]

তাঁরা শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে রয়েছেন তেমনি মানসিক ভাবেও অনেকটা পিছিয়ে আছেন। অলোক রায় বলেছেন-'...উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গনারীর সামাজিক অবস্থান সাহিত্যচর্চার অনুকূল ছিল না।'[৪] এই সকল কিছু অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে একটা বিশেষ ভাবধারা গড়ে তুলতে পেরেছেন।

মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায়(১৮৬৪-১৯৩৩)।সমালোচকগণ মানকুমারী বসু এবং উপরে উল্লিখিত এই সময়ের মহিলা কবিদের কাব্যপ্রতিভার সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ কিছু ভাবের উল্লেখ করেছেন যেমন স্নেহ, শোক বা বিষাদ, পতীপ্রেম, ঈশ্বরচেতনা ও প্রকৃতিপ্রেম প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "গত শতকের মহিলা রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোকবিধুর সান্ধ্য উপত্যকা হইতে।"[৫]

এই বক্তব্যের সত্যতা থাকলেও এই সময়ের সকল মহিলা কবিদের সম্পর্কে সাধারণ কোনো ধারণা করে নেওয়া ঠিক হবে না। কিছু ক্ষেত্রে হয়ত তাঁদের কবিতায় একই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু তারপরেও এই সময়ের প্রত্যেক মহিলা কবির কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। ঠাকুর পরিবারে জন্ম নেওয়ার সুবাদে স্বর্ণকুমারী দেবী পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করেছেন। এছাড়াও আমরা জানি ঠাকুর পরিবারে সাহিত্যচর্চা ও একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তার মধ্যে তিনি আবার গান রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ও গান'এ (১৮৯৫) সংগীতের সংখ্যাই অধিক। আর কবিতাগুলিতে কবির বিভিন্ন ভাবনা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে প্রকৃতিচেতনা, বাৎসল্য রস, পুরাণ প্রসঙ্গ, আক্ষেপ, বঙ্গ রমণীর মহত্ত্ব প্রভৃতি একাধিক ভাব তাঁর কবিতাকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে। কিন্তু এসবের মধ্যে প্রকৃতির রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির রহস্য তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। তাঁর ভাবনার বৈচিত্র্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ একাধিক কবিতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এই ধরণের কবিতার মধ্যে 'অপরাহ্নে', 'সন্ধ্যা', 'সন্ধ্যার স্মৃতি', 'বাল্যসখী', 'বর্ষায়', 'শারদ-জ্যোৎস্নায়', 'বসন্ত জ্যোৎস্নায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলিতে প্রকৃতির নির্দিষ্ট রূপের বস্তুগত

বর্ণনা কবি দেননি, কবির অনুভূতির দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উঠে এসেছে। যেমন ‘অপরাহ্নে’ কবিতায় কবি কল্পনার দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য রচনা করেছেন-

“এ কি অপরূপ ঘটা!
পূরবে চাঁদের আলো পশ্চিমে অরুণচ্ছটা;
রঙের তুফান ওঠে,
পদ্মা, কুলু কুলু ছোটে,
বিকালে উষার লালে রঞ্জিত বটের জটা।”[৬]

স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতায় অনুভূতির গভীরতাই মূল কথা।পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে যে কবিতাগুলিতে, সেখানেও কোনো বিষয় বর্ণনা নেই, শুধু পুরাণের বিষয় বা ভাবকে আত্মস্থ করে কবির মনের কল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। ‘ “চুপ চুপ” ’ কবিতায় কচের প্রতি দেবযানীর আকুতিকে কবি ভাষা দিয়েছেন এইভাবে-

“প্রভু হে, নীরব যদি করিলে রসনা,
এক ভিক্ষা মাগি, নাথ পূর্ণ কর তাহা—
দাও বর, অভিশাপ, দাও আজ্ঞা দাও,
এ হৃদয় রসনাও স্তব্ধ হয়ে যাক;”[৭]

ভাবের গভীরতায় তাঁর কবিতাগুলি কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। তাঁর কোনো কবিতাতেই বিষয়ের ভার নেই, আছে ভাবের গভীরতা।তাঁর ‘গাথা’ বলে একটি খণ্ডকাব্য বা আখ্যানকাব্য পাওয়া যায় ১৮৮০ সালে প্রকাশিত। সেখানে মূলত কাহিনিমূলক কিছু দীর্ঘ কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন-‘প্রত্যেকটি কাহিনি বিয়োগান্ত।’[৮] স্বামীকে স্মরণ করে দুঃখ ও প্রেম এখানে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুকরণ রয়েছে বলে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন।

প্রসন্নময়ী দেবীও এই সময়কালেই আবির্ভূত হয়েছেন। প্রসন্নময়ী দেবী পারিবারিক শিক্ষা লাভ করেছেন বলে জানা যায় এবং তাঁর পরিবারে সকল মেয়েদের মধ্যেই শিক্ষার প্রচলন ছিল। তাঁর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু সংসার জীবন তাঁকে বেশিদিন করতে হয়নি। বিবাহের দুই বছর পর তাঁর স্বামী উন্মাদ হয়ে গেলে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ হল- ‘বনলতা’(১৮৮০), ‘নীহারিকা (১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৮৪, ১৮৯৬)। এছাড়াও অল্প বয়সে রচিত তাঁর ‘আধ-আধ-ভাষিণী’ (১৮৭০) নামে একটি কবিতাপুস্তক আছে। সেখানে কিছু কবিতায়

প্রকৃতির অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়।এছাড়াও তিনি কিছু হাসির কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। কিন্তু এগুলি তাঁর কবিতার গৌণ সুর। শোক বা বেদনা, তৎকালীন সামাজিক অনাচার ও নারীর দুরাবস্থার চিত্র প্রসন্নময়ী দেবীর কবিতার মূল সুর হয়ে উঠেছে। 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থের দুটি ভাগ জুড়ে বেশিরভাগ কবিতায় কবির মনের বিষাদ ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন-' 'নীহারিকা' প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় ভাগের কবিতাগুলির মধ্যেই কবির হৃদয় বেদনা প্রকাশিত, একটা বিষাদ-রাগিণীর করুণ সুর প্রবাহিত।'[৯] সমাজের প্রতিও প্রসন্নময়ী দেবীর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষিত হয়েছে।এর পাশাপাশি তাঁর কবিতায় রয়েছে একটা বিষাদের সুর। তবে তাঁর কবিতায় অনুভূতির প্রাধান্য কম। বিষাদমূলক কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রাধান্য পেলেও সামাজিক সমস্যা বা নারীর দুরাবস্থার কথা বলতে গিয়ে তাঁর এই কবিতাগুলি অনেক বেশি বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসুর সমসাময়িক একজন উল্লেখযোগ্য কবি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাড়ির বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী একাধিক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাহার (১৮৭২)। এখানে প্রকৃতির চিত্র ও নারীর জীবন কথন বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী কাব্য 'ভারতকুসুম' (১৮৮২), এখানে বিভিন্ন ভাব সম্বলিত একাধিক গীতিকবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের বিচিত্র অনুভূতি কবিতায় ধরা পড়েছে।এছাড়াও প্রাচীন জীবন, সমাজ ও কাহিনি তাঁর একাধিক কবিতায় বর্ণিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে এই ভাবটি মুখ্য হয়ে রয়েছে। কবি এখানে কিছুটা অতীতচারি হয়েছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটেই তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। যেমন- 'সাগর-পারে', 'নিশীথে বংশীধ্বনি', 'পতি-ভক্তি', 'তপোবন' প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন সমাজ, মূল্যবোধ ও প্রাচীন কাহিনিমূলক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। 'তপোবন' কবিতায় কবি অতীতের দিনগুলি স্মরণ করেছেন-

"শাখি-শাখে বসি বিহগ বিজনে
বিভুর মহিমা কীর্তন করে,
তান, লয়, রাগে পূরিয়া কাননে
ললিত-মধুর মধুর স্বরে।"[১০]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর স্বামীর মৃত্যু শোকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন। বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন, 'একালের কাব্যবৈশিষ্ট্যের একটা

সাধারণ সুর ছিল সম্ভবত, বিষাদ।'[১১] একালের সাধারণ সুর হলেও উক্ত ভাবকে কাব্যগুণে উন্নীত করার ব্যাপারে সকলের স্বতন্ত্র ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রসন্নময়ী দেবীর কাব্যেও বিষাদের সুর আছে, কিন্তু তা কাব্যে খুব ক্ষীণ এবং পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায় বিষাদের সুর থাকলেও তা তাঁর ব্যক্তিগত শোকে সীমাবদ্ধ থাকেনি।'আবাহন' কবিতায় কবির শোক ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

"শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!
এ নিদাঘ-মরু-হৃদে, তুমি সহকার হয়ে
বস; এ পথিক প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে!"[১২]

কবির ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথা থাকলেও এখানে বিশ্বলোকের কথা ধ্বনিত হয়েছে।একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন-' সাধারণ শোকোচ্ছ্বাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।'[১৩]'শিখা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থে কবি বাস্তবমুখী। এখানেও অবশ্য কবি জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সৌন্দর্যকে চিত্রায়িত করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাই কবিতায় তিনি শব্দ দিয়ে ভাবকে চিত্রায়িত করেছেন। এটাও তাঁর কবিতার একটা বিশেষ রীতি।কিন্তু শেষের দিকে তাঁর কবিতায় আর রূপ প্রাধান্য পাচ্ছে না। তাই কবি বলেছেন 'তোমরা নিন্দ না তারে,/সে মম হৃদয়-মণি!'[১৪]কবি বুঝতে পেরেছেন রূপ ছেড়ে সৌন্দর্যের(বস্তু/ব্যক্তি) ভাবের সঙ্গে আত্মস্থ হতে হবে। এই সময়কালে কবি উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। তারও প্রকাশ লক্ষ করা যায় কিছু কবিতায়। 'ঈশ্বরী পাটনী' কবিতাটি এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭) কাব্যগ্রন্থেও কবির একটি বিশেষ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সমুদ্রের বিচিত্র রূপ তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন-' সমুদ্রের বিচিত্র মহিমাময় রূপ কবিচিত্তে যে তরঙ্গ-অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তারই অনুপম আলেখ্য—'সিন্ধুগাথা'।'[১৫]

কামিনী রায়, মানকুমারী বসুর পরে জন্মালেও তাঁরা সমসাময়িক কবি। কামিনী রায় সমসাময়িক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে পরিচিত।'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উক্ত কাব্যগ্রন্থে 'আশাবাদ'এর সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই আশার সঞ্চার ঘটিয়ে কবি জীবনকে বৃহৎ পটভূমিতে দেখতে চেয়েছেন এবং

জীবনের মহৎ ভাবনাগুলির জয়গান গেয়েছেন।এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, ‘কামিনী রায়ের কবিতার মূল সুর আশা, বিশ্বাস ও আশ্বাস।’[১৬]‘গুঞ্জন’ (১৩১১) কাব্যগ্রন্থেও মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। কামিনী রায়ের কবিতায় আরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলি হল স্বদেশপ্রেম, নারী ভাবনা ও প্রকৃতিপ্রেম। কবি মাতৃভূমির আরাধনা করে বলেছেন, ‘মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।’[১৭]নারী প্রসঙ্গেও কামিনী রায়ের একাধিক কবিতা রয়েছে। নারীর সামাজিক দুরাবস্থার কথা ভেবে নারীর মূল্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন ‘মুগ্ধ প্রণয়’(আলো ও ছায়া), ‘নারী নিগ্রহ’ (দীপ ও ধূপ), ‘নারীর দাবি’(দীপ ও ধূপ), ‘নারী জাগরণ’(দীপ ও ধূপ) প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে।

আধুনিক সমালোচকদের অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের কাব্যের ভাবকে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ কিছু ভাব সময়ের প্রভাবে প্রত্যেক মহিলা কবির কাব্যে প্রতিফলিত হলেও, প্রত্যেকের কাব্যে কিছু ভিন্নতাও রয়েছে। মানকুমারী বসু ও তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের কাব্যে শোক বা বিষাদ একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়া বাকী প্রত্যেকেই অসংখ্য শোকমূলক কবিতা লিখেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসু শোকভাবনায় পুরো গ্রন্থ রচনা করেছেন। মানকুমারী বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলিতেও অসংখ্য শোকমূলক কবিতা পাওয়া যায়। প্রত্যেকের কাব্যে শোক ব্যক্তিগত মননের পরিসর ছাড়িয়ে কাব্যরূপ লাভ করেছে। মানকুমারী বসুর কাব্যে শোক তাঁর স্বামী, সন্তানের মধ্যে আঁটকে থেকেছে।মানকুমারী বসুর কাব্যে ঈশ্বর বিশ্বাস, দেবতাদের প্রতি ভক্তি, তাঁদের জয়গান একটা বিশেষভাব হয়ে উঠেছে বা অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা তেমন দেখা যায়নি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বরং প্রথাগত দেববাদকে অস্বীকার করে সার্বিক ধর্মে আস্থা রেখেছেন।মানকুমারী বসু বিষয়ভিত্তিক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে এই ধরণের তন্ময় কবিতা মানুকুমারী বসুর অন্যতম কাব্যকৃতি। মানকুমারী বসুর কবিপ্রতিভায় আরও একটি কৃতিত্ব রয়েছে এবং তা হল শিশুপাঠ্য কবিতা রচনা। মানকুমারী বসুর সমসাময়িক কেউ কেউ এই ধারায় দু-একটি কবিতা লিখলেও এটা তাঁদের কাব্যের মুল সুর হয়ে উঠতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সফলও নন।

মানকুমারী বসুর সমসাময়িক স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং কামিনী রায় এঁদের প্রত্যেকের কবিতা প্রধানত মন্ময়ধর্মী। মানকুমারী বসুর

কবিতা মূলত তন্ময়ধর্মী। মানকুমারী বসু নৈতিক শিক্ষার পাঠ লাভ করার কারণে তাঁর মধ্যে একটা সামাজিক দায় তৈরি হয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকেই তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠেছে। মানকুমারী বসু অনেকবেশি বস্তুবাদী কবি, বিষয়ভিত্তিক ও পুনর্নির্মাণধর্মী কবিতায় তাঁর সাফল্য থেকে একথা প্রমাণিত। এছাড়াও তাঁর কবিতায় একটা নৈতিকতার পাঠ অনুভব করা যায়। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা কবিদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, কিন্তু মানকুমারী বসুর কবিতার মতো এত তীব্র বা প্রখর নয়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাবের একটা ধারাবাহিক পরম্পরা লক্ষগোচর হয়। মানকুমারী বসুর কোনো কাব্যগ্রন্থে নির্দিষ্ট কোনো ভাবের প্রাধান্য ঘটেনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাবের কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে বিষয় বা ভাবের বৈচিত্র মানকুমারী বসুর কাব্যে অনেক বেশি। কাব্য বৈশিষ্ট্যের এত ব্যাপ্তি অন্য কোনো মহিলা কবির কাব্যে নেই। তাই বলা যায় মানকুমারী বসু এবং তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের কাব্যে সাধারণভাবে একই সুর ধ্বনিত হলেও বৈসাদৃশ্য কিছু কম নয়।

তথ্যসূত্র:

১. বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'কাব্য কবিতার সমন্বয়', ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা-৪০৪।

২. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৪।

৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,'বঙ্গের মহিলা কবি', ভূমিকা অংশ , অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬।

৪. দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।

৫. দ্রষ্টব্য: অলোক রায়, 'উনিশ শতকে নবজাগরণঃ স্বরূপ সন্ধান', 'আধুনিক গীতিকবিতার উন্মেষ ও বিকাশ', অক্ষর প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫২৯।

৬. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'অপরাহ্নে' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫৭।

৭. দ্রষ্টব্য: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ' "চুপ চুপ" ' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৮।

৮. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,'বঙ্গের মহিলা কবি','স্বর্ণকুমারী দেবী', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৫৩।

৯. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,'বঙ্গের মহিলা কবি', 'প্রসন্নময়ী দেবী', অলোক রায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৪।

১০. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'তপোবন' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৫২।

১১. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা অংশ বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৭।

১২. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আবাহন' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-৬১।

১৩. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,'বঙ্গের মহিলা কবি', 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৭০।

১৫. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সখির প্রতি ডেসডিমানো' বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২৬।

১৫. দ্রষ্টব্য: 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা অংশ, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১০।

১৬. দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', 'কামিনী রায়', অলোক রায়(সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯৪।

১৭. দ্রষ্টব্য: 'কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মা আমার',বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-২৩।

ঊনিশ শতকের গদ্য সাহিত্য-চর্চার ধারায় আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতিকথার সাহিত্যরস

দেবাশিস ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

সারাংশ : *‘এবং প্রান্তিক’ এর ২০২১ সেপ্টেম্বর বিশেষ সংখ্যা (অ) চর্চিত বিষয়। এক্ষেত্রে আমি আগ্রহ পেলাম লিখতে “ঊনিশ শতকের গদ্য সাহিত্য চর্চার ধারায় আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতিকথার সাহিত্যরস। আমার এই নিবন্ধটি বহুল চর্চিত বা চর্চাহীনের দলে তা পাঠকের দরবারেই ভার রাখলাম বিচারের। পাঠকই ভালো বুঝবেন বলে আশা রাখি। আমার এই নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতিকথা রচনা করেছেন গৃহবধূ রাসসুন্দরী দাসী – ‘আমার জীবন’ (১৮৩৮) সেখান থেকে শুরু করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর উল্লেখ্য মহিলা আত্মজীবনীকার স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী পর্যন্ত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।*

সূচক শব্দ: *আত্মজীবনী, আত্মস্মৃতিকথা, সাহিত্যরস, সৃজনী প্রতিভা, সর্বসাধারণ, সাহিত্যধর্ম, মানদন্ডে উত্তীর্ণ, নব-উপলব্ধি, পাঠকের, হৃদয়-স্পর্শ।*

আত্মচরিতকারদের ‘আত্মজীবনী’ তথা ‘আত্মস্মৃতিকথা’র সাহিত্যরস অনুসন্ধানের পূর্বে সাহিত্যের ধর্ম, সাহিত্যরস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সাহিত্যতত্ত্ববিচার ও সাহিত্য মীমাংসায় অবতীর্ণ হন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তার ফসল- সাহিত্যের ‘বিচারক’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ (১৩১০ বঙ্গাব্দে) বলেছেন- অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ’[১] এবং জগতের উপর মনের কারখানা এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা সেই উপরতলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।’[২]

জগেতর উপর মনের কারখানা অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে কবি-সাহিত্যিক তাঁর মনের মধ্যে গ্রহণ করেন তা সৃজনী প্রতিভার দ্বারা স্বীয়মনের জারক রসে জারিত করে নতুন জগত সৃষ্টি করেন যা তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পায়। তাই, সাহিত্য প্রকৃতির অনুকরণ নয়। সাহিত্য ও প্রকৃতির পারস্পারিক সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ এভাবে বুঝিয়েছেন, “মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়, সাহিত্য সেই মানসিক

জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।"[৩] সাহিত্য যা গড়ে তোলে তা সকলকে আনন্দ দেয়।

অর্থাৎ নব-সাহিত্যিক যে মানসরস দ্বারা প্রাকৃতিক বিষয়কে জারিত করে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করছেন সেই 'রস'টিই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই মনরস বা জারক রসের থেকেই উদ্‌গত হয় নব সৃষ্টি যার জন্যে প্রয়োজন হয় সৃজনীশক্তি বা উৎকৃষ্ট প্রতিভা। 'নিজত্ব' / 'আমিত্ব' এবং মানবত্ম / সর্বসাধারণত্বের সম্পর্কটিকে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন যে, এদের মাঝখানে রয়েছে কল্পনার কাচের শার্সির (আয়নার) স্বচ্ছ ব্যবধান। 'আবার সাহিত্যের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্য স্রষ্টা যে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' হৃদয়-জগতের প্রকাশ ব্যাকুলতাকে নবরূপে প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে বলেছেন – "হৃদয়ের জগত আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল।"[৪]

সাহিত্যের বিচার করবার সময় দুটো জিনিস দেখতে হয়। প্রথম বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হয়েছে কতটা। এই-সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় বলেছেন –

'ধরণীর বুকে ধরণীয় গায় / সাগরের জলে অরণ্যের ছায়
আর একটুখানি নবীন আভায়, রঙীন করিয়া দিব,

অন্যত্র তিনি বলেছেন -_

'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।'

আবার 'সাহিত্যের সামগ্রী', (১২৩১ ব) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, - "সে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ের সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থণা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।[৫] "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধে তিনি বলেন - "ভাব সেইরূপ মানুষ ও সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।"[৬] অর্থাৎ ভাবকে নিজের করে সকলের করে তোলার মধ্যে সাহিত্য ও ললিত কলার সার্থকতা।

এইবার আমরা আত্মচরিত/ আত্মস্মৃতি সাহিত্যর এই রূপের সঙ্গে কথা-সাহিত্যের সম্পর্কটি ও তার অন্যান্য ধারার সম্পর্কটি একটু দেখে নেবো।

"আত্মচরিত সাহিত্য যেন এক বিচিত্র চিত্রের চরিত্রশালা। জগত ও জীবনের বৈচিত্র্যময় অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা, সমাজ ও পরিবারের অনেক উত্থানপতন জনিত হাসিকান্নার কাহিনী, বিচিত্র মানস গঠন ও ব্যক্তি জীবনের হতাশা বেদনা, আশা আকাঙ্খা কালের তরঙ্গোচ্ছাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ উপলব্ধির আলোকে আত্মচরিতকার যখন নিজের নিভৃত জীবন বিবৃত করতে বলেন যুগপৎ লেখক ও পাঠক মনে জন্ম নেয় অপূর্ব এক রসালোক। এদিক থেকে আত্মচরিতের সাহিত্য কথা সাহিত্যের নিকটবর্তী। নাটকীয় গুণও তার মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়।"[৭] আবার আত্মচরিতের মধ্যে ছোটগল্পের প্রাণধর্ম তীক্ষ্ণ ও রসাল বর্ণনের প্রাচুর্য থাকে কোথাও কোথাও। তবে ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের সঙ্গে আত্মচরিত সাহিত্যের মিল বা সাদৃশ্য বেশি। কালানুক্রমিক বর্ণনা বা ঘটনার পরম্পরা আত্মচরিত/ আত্মস্মৃতিতে রক্ষিত না হলেও সাহিত্য রস আস্বাদনে কোথাও বাধা সৃষ্টি হয় না বরং আত্মচরিত সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে উপন্যাসের পক্ষে যেটা সম্ভব নয়। আবার আমাদের জীবনটাই যেহেতু নাট্যমঞ্চের বিভিন্ন চরিত্র তাই নাটকের ক্রিয়া ও গতি আত্মচরিত সাহিত্যে বিদ্যমান।

নিজ জীবন তথা বিশ্বজীবনের আনন্দ ব্যথা চেতনায় দ্যোতিত হয়ে গীতিকবিতা কাব্যের মতই আত্মচরিতে প্রত্যক্ষ হয়।

প্রবন্ধের সীমানার নিরিখে আত্মচরিতকে দেখলে personal essay-র প্রাণধর্ম বস্তুগৌণ আত্মনিষ্ঠ তন্ময়তা (Subjectivity) খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ডায়েরির মধ্যে লেখক দৈনন্দিনকার অভিজ্ঞতা, ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ব্যক্তিগত কথা কাহিনির বিবৃতি ডায়েরি, চিঠিপত্র জাতীয় রচনায় আত্মচরিতকার যেগুলি লিখে রেখে যান পরবর্তী কালে সেগুলি খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গবেষকদের দিশারী হয়ে ওঠে। সমকালের নানা ঘটনা জীবনীকারের অনেক জটিল গ্রন্থিই মোচন করতে সহজ করে তোলে। এবং সাহিত্যগুণের বিচারেও এগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতি রচনা গ্রন্থগুলি সাহিত্যধর্মের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা এখানে সেটাই বিশ্লেষণ করা আমার আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাসসুন্দরী দাসী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতি কথামূলক গ্রন্থ রচনা করেন জনৈকা গৃহবধূ রাসসুন্দরী দাসী। তাঁর 'আমার জীবন' (১৮৩৮) গ্রন্থটিই 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থ হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে যে সাহিত্যিক অবদান তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

তাঁর গ্রন্থের দুটি ভাগ। প্রতিটি ভাগ আবার কতগুলি "রচনা'র সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি 'রচনা'ই একটি করে স্বরচিত শ্লোক দ্বারা সূচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যানুরাগী মনের পরিচয় পাওয়া হয়। তাঁর কবিতার একটি উদাহরণঃ-

দেখতে এলে ভবের মেলা, দেখি সব মেলামেলা
মনোহারী দোকান মেলা।
নানা রত্নের অলঙ্কারে, রাখিয়াছে থরে থরে
সাজাইয়া রং মহলা।
আয়নাচিরুন মতির মালা দোকান করেছে আলা,
তাই দেখে ভুললো নয়ন ভোলা।
সাধ ছিল বেঁধে ভেলা, পার হব জেলে হেলা,
থাকিল তাহা মাথায় তোলা।
থাকতে পিতা কৃপা সিন্ধু, কিনুতে এলাম রসসিন্ধু,
ঐ দোকানে তোলা তোলা।
রাস সুন্দরীর ভাগ্য গুণে, মন ভুলেছে ঐ দোকানে
ধুন খুঁজিতে গেল বেলা।...[৮]

এর মধ্যে তক্তিরসের আবেগময়তা থাকলেও সাহিত্যগুণ কাব্যরস বঞ্চিত নয়, রাসসুন্দরীর জগৎ, জীবন সংসার সহজ ও মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে যা সর্বজনগ্রাহ্য অকপট ও অনাড়ম্বর বিশ্লেষণে গাঠককে মুগ্ধ করে। ভাষার এমন সহজ, সরল সাবলীলতা স্বীয় প্রতিভার পরিচয়।

গ্রামবাংলার নিয়ম অনুযায়ী অল্পবয়সেই কন্যাসন্তানের বিবাহ হয়ে যায়। বেশিদিন কল্যাসন্তানকে তাদের বাবা-মা আপনার স্নেহবিজড়িত নীড়ে রাখতে পারেন না। বালিকার খেলাঘরে হটাৎই সামাজিক-অভিঘাত এসে পরে, সে উৎকণ্ঠিত হয়, তাকে পিতা-মাতার কোল থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরিচিত জায়গায় নির্বাসিত হতে হবে।

বারো বৎসর বয়সে রাসসুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়। বালিকা বয়সে বিবাহ সম্পর্কে ভীতি তাঁর কথায় ধরা পড়েছে- ‘ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল, আমি একেবারে অবাক হইয়া থাকিলাম। পরে আমি বাটীতে গিয়া মাকে বলিলাম, মা! আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে? মা বলিলেন, ষাট! তোমাকে কাহাকে দিব, এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে, কোথা শুনিলে, তোমাকে কেমন, করিয়াই বা দিব। এই বলিয়া আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে গেলেন। আমি দেখিলাম, মা কাঁদিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, তখন আমি নিশ্চয়ই জানিলাম, আমাকে একজনকে দিবেন। তখন আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি হইল, আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন।”[৯]

বালিকা যেমন মায়ের স্নেহ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না, তেমনি মাতৃহৃদয়ও কন্যাকে নিজ কাছ ছাড়া করতে চান না। কিন্তু সমাজের নিয়মে তিনিও নিরুপায়। কন্যার কাছে এই নিদারুণ কথা অকপটে ব্যক্ত করতে পারার মত মাতৃহৃদয় পাষন্ড নয়, তাই তাঁকে ধরতে হয় ছলনার আশ্রয়। কন্যা-মাতার পারস্পরিক স্লেহ-মায়া-মমতা এবং সেই নিগুঢ় সম্পর্কের বাঁধন আলগা হওয়ার যন্ত্রণা সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় তাঁর যে মানসিক প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেছেন তা আটপৌঢ়ে ভাষা হলেও ব্যঞ্জনাদীপ্ত ইঙ্গিত বহন করে। - “যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।”[১০]

বলা বাহুল্য যে, স্বীয়সংস্কার ও প্রত্যক্ষ লোক অভিজ্ঞতা বলেই তিনি তাঁর একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র শৈলী (Style) গড়ে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় চিত্রময়তা, ইঙ্গিতধর্মিতা ও রসজ্ঞান পাঠককে অভিভূত করে। কৌতুক রসোজ্জ্বল বর্ণনা যা সাহিত্যের গুণ তাতে তাঁরে লেখনী ছিল বেশ অনায়াস সাধ্য।

সেকালের অন্তঃপুরবাসিনীদের কিছু মজ্জাগত সংস্কার ছিল, একালের পরিভাষায় যা কুসংস্কার, রাসসূন্দরী বিষয়টিকে লঘু পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, “ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর

চড়াইয়া বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ দেখ। ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে একবার দেখ। আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা।[১১]

রাসসুন্দরী দেবীর গ্রন্থ পরিচয় সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মূল্যায়ণঃ-

এই জীবনীখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা যিনি নিজের কথা সরলভাবে কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যান। "আমার জীবন"পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা, এই চিত্রের মত যথাযথ অকপট মহিলা চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এমন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।"[১২]

কালানুক্রমিকভাবে নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" (১৯০৮ -১৯১৩) আত্মচরিত সাহিত্যের ধারায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম পরিচয় কবি হলেও গদ্য রচনায় তিনি যে নিপুণ গদ্য-শিল্পী ছিলেন তা তাঁর 'আমার জীবন' আত্মচরিত থেকেই বোঝা যায়। বিশুদ্ধ সাধুভাষা প্রয়োগের মধ্যেও লঘু ও গুরু উভয় বিষয়ই নির্মল হাস্যরস ও পরিহাস কুশলতা অর্জন করতে পেরে তিনি তাঁর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। চরিত্র চিত্রণেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ও চমকপ্রদ চরিত্র সমাবেশে স্থান বিশেষের বর্ণনা একান্তই কথা সাহিত্যের লক্ষণাকান্ত হয়েছে। তাঁর স্মতিকথায় নিজেকে নিয়ে তিনি যেমন অনাবিল হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন তার একটি দৃষ্টান্ত-

> "পরীক্ষার ফিশ দাখিল হইল। ছাগল চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, - বালক অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চিৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল - বালকের "নমিলেশন রোল"পহুঁছিল। ছাগল তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাঠে নিক্ষিপ্ত হইল, বালক কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষা গৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান। তারতম্যের মধ্যে এই ছাগল তখনই

> মরে, সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। বালক যাবজ্জীবনের জন্য আধমরা হইয়া থাকে, তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় মাত্র।[১৩] নবীনচন্দ সেনের সাহিত্য 'আমার জীবন'এর মূল্যায়ণ সম্পর্কে বিদগ্ধ সাহিত্য কলা রসিক প্রমথ চৌধুরি বলেছেন - "এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবন চরিত হলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের নায়ক।"[১৪]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'আমার জীবন'এর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "প্রধানত: কবি রূপেই বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রর প্রতিভা, কিন্তু গদ্য রচনায়ও যে তিনি অপটু ছিলেন না, তাহার প্রমাণ পাঁচভাগে সমাপ্ত তাঁহার আত্মজীবনী "আমার জীবন", স্থানে স্থানে একান্ত ব্যক্তিগত কথার আতিশয্য সত্বেও ইহা বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।"

বিনোদিনী দাসী

বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ইতিহাসে বিনোদিনীর সাহিত্যকৃতি স্বতন্ত্রভাবে উজ্জ্বল। এক বঞ্চিতা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা পতিতা নারীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে উত্তরণ বিনোদিনী দাসীর "আমার কথা" (১৯১২) এর উপজীব্য বিষয়। প্রবাদ প্রতিম নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি এই আত্মস্মৃতিকথা লেখেন। আঙ্গিকে কৌশলেও তিনি এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্দেশে চৈতন্যলীলায় অভিনয় - তাঁর জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। তিনি নিজেকে অভাগা বলেই জানতেন। তাই তাঁর মনে বড়ই আশংকা হত যে কেমন করে অকুল পাথারে কুল পাবেন। মনে মনে সর্বদাই তিনি গৌরহরিকে স্মরণ করতেন। ভাগ্যাবিড়ম্বিত দেব চরিত্রে অভিনয় করতে তাঁর মধ্যে সংকোচ ভয়-ভীতি সাফল্য – অসাফল্য নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু অভিনয়ের সময় তাঁর অন্যরূপ অভিজ্ঞতা হল - তিনি মনে মনে বুঝতে পারলেন যে ভগবান তাঁকে কৃপা করছেন। কেননা সেই বাল্যলীলায়র সময় "রাধা সই আর নাটক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী"বলে গান করার সময় যেন একটা আলোক তাঁর হৃদয়কে পূর্ন করে তুলতে লাগল। সেই সময় তাঁর চক্ষু বহির্দৃষ্টি থেকে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পেতেম না। তিনি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম

যেন দেখতে পেতেন। এইরূপে তাঁর মনের হীণমন্যতা, উৎকণ্ঠা, সংকোচ, ভয়, আবার অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও অভিনয়কালে দেবচরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার যে প্রাণবন্ত বর্ণনা তিনি প্রদান করেছেন তাতে সাহিত্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

চরিত্র বিচারে বা ঘটনা বিশ্লেষণে বা কোন কাহিনি বর্ণনায় রসাস্বাদনের মৌল শর্তগুলি তিনি পূরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ”নাটকের স্বয়ং কুন্দ চরিত্রকে রূপায়িত করতে গিয়ে একটি অনুভববেদ্য সাহিত্য রসাশ্রিত বর্ণনা দিয়েছেন-
“আমাদের মতন চঞ্চল স্বভাব স্ত্রীলাকদের মধ্যে সেই ভীরু স্বভাবা শান্ত, শিষ্ট, এতটুকু হৃদয় মধ্যে অসীম ভালবাসা - লুকাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত হইয়া পরগৃহে প্রতিপালিতা হইয়া তাহার উপর দুষ্মতি বশত:ই হউক, আর অদৃষ্ট দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে, রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে, ধনে মানে উচ্চ সেই দাতাকে দান করিয়া অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত সেই বেদনাভরা বুকখানিকে, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়দাতাকে আত্মসমর্পণ করিয়া সশঙ্কিত মৃগশিশুর ন্যায় দিন কাটান।”[১৫] (আমার জীবন, পৃ. ৫১) এই বর্ণনার মধ্যে কুন্দনন্দিনী ও বিনোদিনী একাকার হয়ে গেছেন। কারণ উদ্ধৃত প্রত্যেকটি উক্তিই তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার মতই সত্য ঘটনা। তাঁর বর্ণনার উচ্ছ্বাস কখনো বক্তব্যের মূল সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে দেয় নি। সহজ সরল ভাষা শব্দ নির্বাচন ও তার প্রয়োগ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শক্তিকেই প্রস্ফুটিত করে।

যুগচেতনা ও জীবনবোধ তাঁর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া এবং ‘স্টার’ থিয়েটারের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ তাঁর জীবনবোধকে মহিমান্বিত করেছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক সফল অভিনেত্রী হিসাবে তিনি যেমন আজ কিংবদন্তী, তেমনি তাঁর আত্মস্মৃতি কথাও এক বিশিষ্ট রূপে আত্মচরিত সাহিত্যের ধারায় জায়গা করে নিয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত (১৯১৮)

বহুমুখী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগকারী সাধারণ বাহ্মসমাজে অন্যতম স্তম্ভ ও সমাজ সংস্কারক পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (১৯১৮) বাংলা সমাজ সাহিত্যের আঙ্গিনায় অনবদ্য। তাঁর স্মৃতিচিত্র বিচিত্র রসাস্বাদনের দুর্লভ উপাদেয় গ্রন্থ্। বাল্যকালে – পশু-পাখির প্রতি প্রেম, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ থেকে স্বনামধন্য দেশী-বিদেশী মান্যজনের স্মৃতিচারণা, পল্লীচিত্র ও নগরচিত্রের দক্ষতা, সাধারণ ব্রহ্মসমাজের স্তম্ভ

হয়েও হিন্দুদের পৌত্তলিক সর্বস্ব মতবাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত না হওয়া, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংগ্রাম এসবই তাঁর আত্মকথায় সজীব হয়ে উঠেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতি-কথা 'আত্মচরিত' লেখকের বর্ণনাগুণে ও সাহিত্যরস সৃজনে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'শৈশবের এক বিশেষ ঘটনা যা তাঁর স্মৃতিতে আমাদের অনুভূতি সঞ্চার করেছে, এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন – "প্রপিতামহদেবের ধর্মভাবও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি জপ-তপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমত প্রায় একঘন্টা কাল দেবদেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত; তৎপর প্রায় আধঘন্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধ ঘন্টাকাল মাটিতে মাথা ঠুকিতাম ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁর কপালের উপরে একটা আবের মত মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কান পাতিয়া কোন কোন দিন শুনিতেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি তিনি বলিতেন, "মা! মা! হারুর সুমতি করে দাও।" তাহা আমার বাবার জন্য প্রার্থনা। সর্ব্বশেষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়ে নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত "বাবা"। বাবা আমি তখন দিগম্বর মূর্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন। এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাতে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়শট্টি দিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে।

'দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।"[১৬]

আলোচ্য অংশে প্রপিতামহের সঙ্গে বালকের মধুর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রপিতামহ দীর্ঘদিন ধরে পূজা পাঠ, পিতৃপুরুষের তর্পণ করতেন। তাঁর দীর্ঘক্ষণ ধরে মাটিতে মাথা ঠুকে ইষ্টদেবতার চরণে প্রার্থনা। অবশেষে পরিবারের মঙ্গল কামনা, বিশেষ করে শিবনাথের পিতার জন্য এবং শিবনাথের মা খেলা থেকে ধরে আনতেন বালক শিবনাথকে, দিগম্বরমূর্তি বালক ও প্রপিতামহের হাতে তালি দিয়ে-

'দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।"

বলে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবারের সদস্য-গুলির মধ্যে মধুর সম্পর্ক যেমন উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তেমনি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নাট্যরসও ঘনীভূত হয়েছে। শুধু তাই নয় বালকদের মন সেই নৃত্যের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য বোঝে নি, প্রপিতামহের সঙ্গে নৃত্যে তাঁর শিশুমনে খেলার আনন্দই সঞ্চারিত হয়েছে। এইরূপে সমগ্র দৃশ্যটি সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ হয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। শৈশবে বিবাহের স্মৃতিও তাঁর বর্ণনায় মাধুর্য লাভ করেছে।

বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় প্রসন্নময়ীর সঙ্গে। বিয়ের দিনের বর্ণনাও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কনের বাড়িতে গ্রামের সমবয়স্ক বালকেরা যখন তাকে ঘিরে নানা ভাবে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন তখন 'আমি অল্পক্ষণের মধ্যে বয়োচিত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম; এবং আমাকে তাহারা ঠকান দূরে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। 'তাঁর বাল্যকালের বিবাহের স্মৃতি এইরূপে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আবার বিবাহ করে যখন পালকিতে করে ফিরছেন, 'তখন আমার মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল। মেয়েটি ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত-পা ছড়াইতে পারি না, কিন্তু বলিতে পারি না, মহা বিপদ। অবশেষে পরিধি মধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিয়া পাল্কি নামাইল; আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে হইল, মেয়েটি একা বসে আছে, তারও তো খিদে পেয়েছে।তাকে গোটা কয়েক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই, দৌড়, যদি কেহ দেখিতে পায়।'[১৭]

আলোচ্য অংশে বালকের মনস্তত্ব কৌতুকরূপে পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। সদ্যবিবাহিত মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সখ্যতা তখনো গড়ে ওঠে নি, আবার মেয়েটি বাবা-মা'কে ছেড়ে চলে আসছে বলে কাঁদছে, তাকেও কিছু বলাও যায়-না, তিনি মেয়েটির চেয়ে বয়সে বড়, তার এই বোধ তাঁর সহনীয় শক্তিকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্ত বালকের চাপা অস্বস্তিও কাজ করছিল। সেই জন্য পালকী থেকে নেমে যেন রেহাই পেলেন। তার পরেই বালকের লোভ গেল পাকা লিচুর দিকে। বালকসুলভ চপলতায় গাছে উঠে লিচু খেতে লাগলেন। লিচু খাওয়ার আনন্দে বালকের মনে পড়ে গেল তাঁর জীবনের আরো এক আনন্দের মুহুর্ত। কিন্তু সেই আনন্দে জগতের বাসিন্দা তখন অভুক্তা, তাই তাকেও গোটা কতক লিচু দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই সঙ্গে

বালকের সংকোচ, প্রসন্নময়ীর প্রতি তাঁর এই অনুরাগ যদি বড়রা দেখে ফেলে, এবং সকলের কাছে তা হাস্যকর হয়ে উঠে।

প্রমথ চৌধুরী / 'আত্মকথা' (১৯৪৬)

অগ্রজ গুরু প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য অতুলচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য দিয়েই প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র বাংলা সাহিত্যে মননঋদ্ধ মূল্যায়ণ বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি লিখেছেন – "সাহিত্যিকদের আত্মকথা হিসেবেই এ বই-এর আকর্ষণ নয়। এ আত্মকাহিনীতে যে সব ঘটনাও লোকের বর্ণনা আছে তা এমন নিপুণ রেখায় আঁকা, এমন কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল যে নিজগুণেই তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। ...এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোট গল্পের মতই তীক্ষ্ণ ও রসাল।"[১৮] তাঁর সাহিত্য জীবনে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও পড়েছিল স্মৃতিকথায় তার উল্লেখ আছে।

অনবদ্য বাক্ ভঙ্গিমায়, চিত্রকল্পতায়, সার্থক বৈঠকী মেজাজে, বাক্চাতুর্যে প্রমথনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বীরবলের ছদ্মনামের আড়ালে তাঁর সত্তায় ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। বিষয়ের গৌরব, ভাবে গাম্ভীর্য ও চিন্তার প্রসারতায়, সর্বোপরি বিদ্রূপ বাণের তির্যক বর্ষণে। কৌতুকের ছটায় অভিজাত-অনভিজাত শব্দ নির্বাচন ও জীবনরস রসিকতায় সার্থক গদ্যশিল্পী হিসাবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত করে রেখেছে।

Paradox অর্থাৎ আপাত-অসম্ভব শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ও অভিনব প্রয়োগ নৈপুণ্যেই 'বীরবলী ঢঙের' স্বাতন্ত্র্য নিহিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগরের রাজকবি ভারতচন্দ্ররায় গুণাকরের অলংকারবহুল কাব্য-ভাষা ও রচনারীতি ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রমথ চৌধুরীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি অকপট স্বীকার করেছেন – 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।'

প্রমথ চৌধুরী যে মুখ্যতঃ পরিহাস রসিক ছিলেন, তাঁর আত্মকথায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ভূমিকা রূপে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন তা এক নির্মল বিশুদ্ধ কৌতুকরসে উপভোগ্য। আত্ম-কথা হতে তার কিছুটা উদ্ধৃত হলঃ-

'হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে, অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিতা ছিলুম। আমি একটি ছোকরাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি এ নামের অর্থ কি? সে বলে "তুমি রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয় পড়নি?' আমি বলি, 'না'। সে বলে 'একখানি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়, তাহলেই জানতে পারবে যে, ললিতার সঙ্গে তোমার কি মিল আছে। তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সাথে সেই

আমার প্রথম পরিচয়।"[১৯] মার্জিত পরিহাসবোধ পরিবেশনের চমৎকারিত্বে প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা' গল্পের ন্যায় বৈচিত্রময় ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

সজনীকান্ত দাস / আত্মস্মৃতি (১৯৫৪)

তাঁর 'আত্মস্মৃতি' থেকে জানতে পারি তাঁর জীবন ও সাহিত্যে নদী কিভাবে স্থান করে নিয়েছে। সজনীকান্তের সাহিত্য স্থানিক স্মৃতির সঙ্গে নদীর স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পশ্চিম দিনাজপুর অর্থাৎ বালুরঘাটে তাঁর শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকাল কাটে। বাল্য ও যৌবনের প্রবাসকে চিরস্মারণীয় করে রাখতে সাহিত্য জীবন সম্পর্ক তিনি মন্তব্য করেছেন – "কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। জন্মভূমির শীতে শীর্ণ তোয়া এবং বরষার দুকূল-প্লাবী-অজয়, মালদহের কুলুকুলু কলস্রোতা মহানন্দা, বাঁকুড়ার ক্কচিৎ মুমূর্ষু ক্কচিৎ ভীষণ দারকেশ্বর এবং তাহার নিত্যসঙ্গিনী বালুমাত্র রূপা গঙ্গেশ্বরী, পাবনার পারাপার চিহ্নবিহীন সুবিপুলা ভয়ঙ্করী পদ্মা এবং দিনাজপুরের পল্লীবধূর মত শান্ত নিরলঙ্কার ও নিরহংকার কাঞ্চন – ইহাদেরই খর অথবা ক্ষীণ ধারার সিজনে আমার মনের কাব্যরস পিপাসা আবাল্য শুধু মিটে নাই, আমার কাব্য জীবনের সহিত তাহারা ওতপ্রোত হইয়া মিলিয়া গিয়াছে।"[২০]

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে জীবনের নানা স্মৃতিকথাকে সাহিত্যগুনান্বিত করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শৈশবের এক মনোজ্ঞ-স্মৃতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন – "আমরা প্রায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইতাম। যোগিন্দ্রনাথ সরকারেরই সংকলিত একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরনধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলোও নূতন নয় - কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম-গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম -

"দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।

এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পরে ছেলেবেলার গান-
বিষ্টি পরে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।”

এক সঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভির ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসিন্য চারিদিক থমথম করিতেছে। বিরল পথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহপারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচন্ড মধ্যাহ্নের নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।”[২১]

বালক সজনীকান্তের সাহিত্যানুরাগী মন কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে কল্পলোকে পৌঁছে গেল, যেখানে গ্রীষ্মের দুপুরের প্রখর তেজও প্রবেশ করতে পারে না। তিনি যেন কল্পনায় দেখতে পেলেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে চাঁদকে দেখার জন্যই যেন কৌতূহলী মেঘেরা জড়ো হচ্ছে। সন্ধ্যার সাথে সাথে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বাজছে, বৃষ্টি থেমে আসছে, আর বর্ষা প্রকৃতির কল্পনা তাঁর মনে আনন্দ ঘনিয়ে তুলছে। ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।”ছড়ার ছন্দও বালকের মনকে দোলা দেয়। বাস্তবের রূঢতার উপর বালকের সাহিত্যরস পিপাসু মন জয় হয়ে তাঁর শৈশবের এক বিশেষ স্মৃতিকে মধুর রূপে পাঠকের কাছে উগভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সজনীকান্ত যে বালক বয়স থেকে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন তার আরো একটি পরিচয় পাওয়া যায় তবে তা বিবৃতি আকারে তিনি উপস্থাপন করেন নি। বরং বর্ণনার সঙ্গে কল্পনা মিশ্রণে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে-

“গ্রীষ্ম অথবা পূজা কোন এক অবকাশ মালদহে যাপন করিবার জন্য আমাদের প্রায় অপরিচিত বড়দাদা বাঁকুড়া হইতে আসিবেন। অপরিচয়ের দরুণ ভালবাসা ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পর্যায় ছাড়ায় নাই। তিনি সকলের জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। তবে ভয়ে তাঁহার নিকট গেলাম, আমার ভাগ্যে উঠিল – এক খণ্ড ‘সরল কৃত্তিবাস’ – কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ সম্পাদিত, বহু চিত্র সম্বলিত। বইখানি হাতে দিয়া

বড়দাদা বলিলেন, যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, আগামী ছুটিতে একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত পুরস্কার মিলিবে। উৎফুল্ল হইয়া বই লইয়া মাতৃসন্নিধানে গিয়া বসিলাম। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল-

"অমৃত মধুর এই সীতারাম –লীলা।
শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা।"

অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্র সপ্তকান্ড রামায়ণ নিঃশেষে পড়িয়া ফেলিলাম এবং তাহা মর্মের মধ্যে এমনই গাঁথিয়া গেল যে, মাস ছয়েক যাইতে না যাইতেই বইখানি হাতে না লইয়াছি-

"গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় বৈসেন গদাধর।।
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশ হইতে প্রকাশ।
শ্রীরাম, ভরত, আর শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ।।"[২২]

হইতে আরম্ভ করিয়া এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকান্ড" পর্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিলাম। সুতরাং যথাকালে কাশীরাম দাসের মহাভারত উপহার লাভ করিলাম।

রামায়ণের গল্পের প্রতি আকর্ষণ সকল শিশুরই থাকে। রামায়ণ পড়তে পড়তে সেও যেন সেই স্বপ্নালোকে পাড়ি দেয়। নতুন বই উপহার পাওয়ার মধ্যে বালক মনের আনন্দ রয়েছে, নেশায় বইটি সর্বত্র হওয়ায় ছবিগুলোর নেশায় গল্পপাঠের আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়, তার উপর রজনীকান্ত তাঁর বড়দাদা – মহাভারতের বই উপহার দেওয়ায় কথা জানালে উৎসাহও বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। বালকের সরল মনে রাম-সীতার প্রতি ভক্তি রয়েছে। সব মিলিয়ে রামায়ণ তাঁর কণ্ঠস্থ হল এবং মহাভারত প্রাপ্তির আনন্দ বালকের মনে দেখা দিল। শৈশব জীবনের এই স্মৃতি বর্ণনাগুণে পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এই স্মৃতিকথায় সজনীকান্তের কবি সত্তার ক্রমবিকাশের একটা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আভাসিত হয়েছে। আত্মচরিত কথা সাহিত্যে অনুরূপ পরিচয় প্রায় দুর্লভ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : (আত্মচরিত / ১৮১৮)

বাংলা স্বরচিত আত্মচরিত / জীবনচরিত আত্মজীবনীর ধারায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ স্মৃতিকথা। এর মধ্যে তাঁর ভারত ভ্রমণের কথাও উল্লেখিত আছে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, "এই গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় আত্মদর্শনের গভীরতা নিসর্গ-প্রীতির ঐকান্তিকতা ও ঈশ্বর ভক্তির অবিচলতা প্রগাঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। মহর্ষির পত্রাবলীতেও ক্ষণে ক্ষণে কবি পিতার প্রতিভাকে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা চলে।"[২৩] এই আত্মচরিত কথায় তাঁর জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের সময়, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার জীবন থেকে বৈরাগ্য ও ঈশ্বরতৃষ্ণার দার্শনিকতায় রূপান্তরিত হবার ইতিবৃত্ত লিখেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে রয়েছে -

"দিদিমা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালিঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।"[২৪]

দিদিমার সঙ্গে বালক দেবেন্দ্রনাথের স্নেহের সম্পর্ক মধুরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দিদিমার উপর বালকের নির্ভরতা ও কালিঘাটে যাওয়ার আনন্দ-উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দিদিমার সঙ্গে বালকের সখ্যতা, নির্ভরতা সম্পর্কের অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল বলেই দিদিমার তীর্থযাত্রা বালকের বড় বেদনার ও কান্নার কারণ হয়ে উঠেছিল। এইরূপে দিদিমা ও বালক দেবেন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্ক পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সৌন্দর্য দর্শনের সহজাত নেত্র নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতমূলক রচনার একটি বৈশিষ্ট্য যে এর মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারন ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কোন রচনার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তি পুরুষের স্বচ্ছ প্রতিবিম্বন বা আত্মসত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সাহিত্যের একটি দুর্লভ গুণ হিসাবে কীর্তিত হয় এবং সাধারণত এটাই "সাহিত্যের স্টাইল"। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, "বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ একটি পরিণত বিশিষ্ট: স্টাইলের প্রবর্তন করিয়াছেন।"[২৫]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আপনকথা / ১৯৪৬)

'আপনকথা' অবীন্দ্রনাথের আত্মচরিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। নিজের জীবনকথাকে অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার রহস্যময় আঙ্গিকে বিবৃত করেছেন। বিচিত্র-শীরোনামে আপনকথার অধ্যায়গুলি আটভাগে বিভক্ত : 'মনের কথা', 'পদ্মদাসী', 'সাইক্লোন', 'উত্তরের ঘর', 'এ-আমল সে-আমল', 'এ-বাড়ি ও বাড়ি', 'বসতবাড়ী'। তিনি যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তাঁর সহজ মধুর ভাব, রঙ ও রেখায় নিজ জীবনের বিচিত্র চিত্র –চিত্রনে প্রমাণিত হয়েছে। পার্থিব জীবনে ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা 'আপনকথা'য় এমনভাবে পরিবেশিত যে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অবনীন্দ্রনাথের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জগতে অনায়াস প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেছে।

'আপনকথা' যে কেবল নিছকই শিশুর রূপকথাতেই সীমায়িত হয়ে থাকে নি, এর মধ্য দিয়ে পাঠকের অন্তরকে মর্মস্পর্শীভাবে ছুঁয়ে গেছেন:- ''স্মৃতিরসূত্র নদীর ধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় এক সময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে –তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি-ছবিতে, লেখাতে, গল্পে যদি কোন গতিকে তারা পেলোতো বর্তে রইলো সেকাল বর্তমানেও। না হলে, পুরানো ঝুলের মতো হাওয়ায় উড়ে গেলো- একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে।''[২৬]

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয়া কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মহিলাদের থেকে স্বতন্ত্র। কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, পত্রিকা সম্পাদক, সমাজসেবিকা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা সভাপতি এবং প্রথম মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে জগত্তারিনী পুরস্কার পান। তাঁর স্মৃতি কথা 'সেকেলে কথা' থেকে জানতে পারি আধুনিক স্ত্রী শিক্ষা পদ্ধতির মূল-পত্তন তাঁদের কালেই হয়েছিল। সেই সময় এখনকার দিনের মত বি-এ, এম-এ না থাকলেও, বিদূষীর সমাদর যথেষ্ট ছিল। অন্তঃপুরের মেয়েদের লেখাপড়ার নিয়মিত চর্চা যেন একটা প্রতিদিনের অভ্যাস ও নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরানী নিত্য প্রভাতে আসতেন বিদ্যালোক বিতরণের জন্য। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। বাঙলাও যে সবিশেষ ভালো জানতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কথার পারঙ্গমতায় তিনি সকলকে মোহিত করে

দিতেন। এমনকী যারা বিদ্যালাভে অনিচ্ছুক ছিলেন তারাও তার কথা কৌতুহলী মন দিয়ে শুনতেন। তিনি নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দেখা না পেলেও তাঁর কাকিমার কাছ থেকে ঠাকুরানীর প্রভা বর্ণনার যে বিবরণ শুনেছেন তা তাঁর বর্ণনায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

“যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না, প্রভাত পূর্ব্বাদিগন্তের নীচে এ দাঁড়িতে আছেন, তবু প্রকাশ হ’তে পারছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। আহা সারা নিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি। আহা প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গবিহঙ্গীর কলরব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রা-মগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হতে এখন অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ রথে সমাসীন হয়ে উদয় হতে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকূল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনিত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন, ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অনন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণপক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ করলেন, পক্ষী আগত হলে বললেন, ‘হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা করলে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কা’র? অতএব দেবদানব নররাক্ষস সকলের প্রতি-কৃপাবাণ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর; - নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়। পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান করে, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাকলেন – কুক্‌কুহুক! কুক্‌কুহুক! ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে। “যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষিবরকে যে অভিশাপ প্রদান করলেন সেই শাপেই তখনকার পূজা পবিত্র কুক্কুট-পক্ষী – এখন হিন্দুর অস্পৃস্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।”[২৭]

আলোচ্য অংশে কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণ সারারাত মানভঞ্জনে অবশেষে নিশিভোরে ঘুমিয়ে পরেছেন। তাই যামিনী গত হতে-ও ভয় পাচ্ছে, তেমন সূর্য্যদেবও উদয় হতে ভয় পাচ্ছে, পাছে কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সূর্যদেব তার ভয়ের কারণ ব্রহ্মার কাছে জ্ঞাপন করলে, ব্রহ্মা কৃষ্ণপক্ষীকে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করতে

বললেন। এতে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল বটে, কিন্তু তাঁর অভিশাপে সেই কুক্কুটপক্ষী বর্তমানে হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে যামিনী, সূর্য সকলেই সকলের উপরই প্রাণসত্তা আরোপ করে চিত্ররূপে গড়ে তোলা হয়েছে, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নাট্যরস ঘণীভূত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের নানা সংসারও কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে কাল্পনিক গল্পের মেলবন্ধনে বর্ণনা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আবার তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়-

তাঁর মাতুলানীকে রামায়ণ মহাভারত হাতেমতাই সহ সব বই পড়ে শোনান স্বর্ণকুমারী দেবীর একটা বিশেষ কাজ ছিল। বাড়ীতে মালিনী যেদিন বই বিক্রী করতে আসত সেদিন সরগম পড়ে যেত, বটতলার যত কিছু নতুন বই, কাব্য-উপন্যাস-আষাঢ়ে গল্প – ইত্যাদি বইয়ের সম্ভারে সিন্দুক বোঝাই হয়ে যেত। আলমারী ভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদী ইত্যাদি যেমন থাকত, তেমনি অন্তঃপুরের লাইব্রেরীও পুস্তকরাশিতে পরিপূর্ণ থাকত। এইরূপে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বর্ণনার মধ্য থেকে বাল্যকালেই তাঁর সাহিত্যানুরাগী মনটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ইন্দিরা দেবী

ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা' - এই বিশ্বাসী উচ্চারণ - “খাতা"-র ওপরে মেয়েদের নিজস্ব স্বত্ব যে এতদিনে সাব্যস্ত হতে চলেছে - সেই ইঙ্গিতই বহন করে। একটি মেয়ের আত্মপ্রকাশের জন্য জরুরী ছিল একটি নিজস্ব খাতাও। যেখানে সে তার মনের কথাগুলি লিখতে পারবে। তাই নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছিলেন - স্বেচ্ছাবিহারী আনন্দময় লিখন-জগত। ‘আমার খাতা'- স্মৃতি, অতমর্ত্য-ছোয়া স্বপ্ন, অস্থিরভ্রমণ, ধর্মীয় চেতনা, সঙ্গীতের স্নেহমাখা কোলাজ। ইন্দিরার চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত জীবন সময় ‘আমার খাতা'-র অন্যতম উপজীব্য।

শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “আমার সেই বাল্যকালের স্মৃতি এখনও আমার মনকে ব্যথিত ও আনন্দিত করে।”[২৪] শৈশবে তিনি খুবই চিন্তাশীল ছিলেন। প্রকৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগও তাঁর স্মৃতিকথায় উপভোগ হয়ে উঠেছে। গাছের ফুল, চিত্রবিচিত্র প্রজাপতি, পাখীদের তিনি বড়ই ভালোবাসতেন। শৈশবে তারাই ছিলি তাঁর সঙ্গী। তিনি প্রতিদিন বিকালে দাসীর সঙ্গে বাগানে যেতেন এবং প্রতিদিন ফুলগুলি চয়ণ করে গঙ্গার সোপানের উপর বসে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করতেন। “ঊর্দ্ধে

দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, নিম্নে ফলফুলসুশোভিত উদ্যান, সম্মুখে ধীরপ্রবাহিনী গঙ্গা, আমি এই সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া বসিয়া থাকিতাম। পরে একটি একটি করিয়া ফুল গঙ্গাবক্ষে ফেলিতাম। ফুলগুলি নাচিতে নাচিতে যাইত, ভাবিতাম, ফুল কোথায় যাইতেছে, আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটা ভাবে মোহিত হইতাম।"[২৯] গঙ্গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ইন্দিরা দেবীর চোখে অসাধারণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আবার শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ-গঙ্গার পরপার দেখা যায় না, গঙ্গার মধ্যে দুই একটি নৌকা গাছের রাতের শিশির সিক্ত ফুল কামিনী ফুল গাছের উপর বসে থাকা একটি মাছ-রাঙা পাখি – সবকিছু নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতেন।

ইন্দিরা এমন দু-একটি খেলার বিবরণ দিয়েছেন 'আমার খাতা'-য় যা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সম্পর্কিত দিদিমা, ইন্দিরা ও দাদার জ্যোৎস্নারাতে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে জগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়ার খেলাটির আনকোরা সৌন্দর্যে অবাক হতে হয়। বাড়ির বারান্দায় এসে পড়েছে জ্যোৎস্না, কল্পনায় সেই জ্যোৎস্নাহয়ে উঠল – 'পুরীর অপার সমুদ্র। জ্যোৎস্না সমুদ্রে স্নান, ঝিনুক কুড়ানো কিছুই বাদ গেল না। মায়াবী জ্যোৎস্নামাখা কল্পনালোকে ইন্দিরা অনায়াসেই চলে যেতে পারতেন।

"আমাদের বারান্দায় একখানি জগন্নাথের পট টাঙান ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিদিমা বসিতেন, আর আমরা দুই ভাইবোন তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইতাম। আর দিদিমা মুখে মুখে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতেন আর বলিতেন যে ইহারা নিদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের রাখিয়া আমি যাইব আর আমরা অমনি জাগ্রত হইয়া বলিতাম যে আমরা জগন্নাথক্ষেত্রে যাইব। আমরা যখন কিছুতেই থাকিতে চাহিতাম না, তখন দিদিমা বলিতেন, অত দূরে বারবার আস্তে আস্তে যাওয়া-আসা করিতেন আর মুখে গান করিতেন।

"আঠার নালায় পরে যাত্রী,
তারে পার করহে শ্রীহরি,
সারারাত্র হেঁটে মলুম,
পোয়া বাট বই কয় না,
জয় জগন্নাথ দয়া কর
আর তো দুখ সয় না।"[৩০]

ইন্দিরা দেবীর আরো এক শৈশবের স্মৃতি সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"অতি প্রত্যুষে সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিতাম; মালিনী পূজার ফুল দিয়া যাইত; আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিয়া লইয়া পূজায় বসিতাম। তখন আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইত। পূজা শেষ হইলে আমি যাইয়া বাবামহাশয়ের সেবা করিতাম। বাবামহাশয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ শেষ হইলে বাবামহাশয় যখন পাঠে নিযুক্ত হইতেন,তখন আমি যাইয়া মার জলখাবার পান ইত্যাদি দিয়া আসিতাম। মা গৃহকর্মে যাইতেন। আমি আবার বাবামহাশয়ের সেবায়নিযুক্ত হইতাম। আমার সকল কার্য্য শেষ হইলে দিদিমার কাছে যাইতে পারিতাম।"[৩১]

আলোচ্য অংশে ইন্দিরা দেবী শৈশবের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা একটি মুহূর্ত মধুররূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিদিন সকালে স্নান, পুজোর জন্য চন্দন ঘষা, হৃদয় ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ হওয়া, বাবা-মা-দিদিমার তার মধুর সম্পন্ন ও প্রতিদিনের জীবনের চিত্র উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা দেবীর আরও একটি স্মৃতিকথা সাহিতে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ পেয়েছে।

"দিন সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সেদিন গেল, প্রভাত হইল, আমার ভগিনী ছলছল নেত্রে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি নীরবে বক্ষে ধরিলাম। ঝরঝর করিয়া চোখে জল পড়িতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতস্থ হইয়া সুষমাকে বলিলাম – ভাই বাবামহাশয়ের সেবা করো ও মায়ের সাহায্য করিও, আমার অভাব যেন ওঁরা না বোধ করেন। স্ত্রীলোকের যাহার জন্য সৃষ্ট, যেখানে তাহার গতি, আমি সেইখানে চলিলাম; এতদিনে এখানে আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল আজ তাহা শেষ হইল, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।"[৩২]

ইন্দিরা দেবীর শ্বশুর বাড়ি যাবার দৃশ্যটিও সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব জীবনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত পিতা-মাতা বোনের সঙ্গে একপ্রকার বিচ্ছেদ তৈরী হতে চলেছে। আসন্ন বিচ্ছেদ মুহূর্তে দিদি ও বোনের বেদনা সাহিত্যগুনান্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তবে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। তাই পরিবারে সকলের জন্য মঙ্গলচিন্তাও তাঁর আন্তরিকতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

পল্লীবাংলা ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রতি ইন্দরা দেবীর আকর্ষণ ছিল। একজন দাসীর কাছ থেকে তিনি অনেকগুলি ছড়া শিখে নিয়েছিলেন। ভাঁজুর ছড়া তিনি তাঁর স্মৃতি স্মরণ করেছেন-

‘এক কলসি গঙ্গাজল
এক কলসি ঘি।
বৎসর অন্তর আনেন ভাঁজু
নাচব না ত কি।’[৩৩]

এই ছড়াগুলি বাল্যকালে তাঁকে আনন্দ প্রদান করত। তাঁর প্রাণবন্ত বাল্যকালকেও আমরা খুঁজে পাই, তাঁর ভাঁজুর ছড়া স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। যা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করেছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর এক ভ্রমণের স্মৃতির কথা ব্যক্ত করেছেন যা তাঁর জীবনের এক বিশেষ মুহুর্তকে স্পর্শ করে গেছে-

“ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার চারিদিকেই মন্দির, সম্মুখে হরপার্ব্বতীর মন্দির, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলাম লাল বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মহাদেবের মন্দির হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরে গ্রন্থি বন্ধন করা আছে। আমি তাহা দেখিয়া পান্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম – ইহার উদ্দেশ্য কি? পান্ডা বলিল যে, যাত্রীগণ শুভফলাকাঙ্ক্ষায় টাকা খরচ করিয়া এই গ্রন্থি বাঁধিয়া যায়। সেই গ্রন্থি বন্ধন দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার স্বামীর হৃদয়ে যে গ্রন্থি বন্ধন হইয়াছিল তাহা ইহলোক পরলোকের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। প্রেমের পরাকাষ্ঠা হরপাব্বর্তীর যুগল মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে প্রেমের মহাসত্তায় মগ্ন হইয়া গেলাম।”[৩৪]

ঠাকুরবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মহাদেবের মন্দিরের সঙ্গে পার্বতীর মন্দিরের লাল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা দর্শনার্থীরা শুভকামনার আশায় গ্রন্থিবন্ধন করেছে, মানুষের এই বিশ্বাস ভাবাবেগ তাঁর মধ্যেও ভাবাবেগ সঞ্চার করেছে।

এই ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা হরপার্ব্বতীর যুগল মূর্তি স্মরণ করে আপন স্বামীর প্রতি প্রেম-ভক্তির গভীর নিষ্ঠা তাঁর অন্তরে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করেছে। তাঁর এই নব-উপলব্ধি পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে যায়।

সরলা দেবী-

সরলা দেবীর আত্মস্মৃতি কথা “জীবনের ঝরাপাতা" দেশ পত্রিকায় ১৩৫১ সালের ২৪ কার্তিক সংখ্যা থেকে শুরু হয় এবং ১৩৫২ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত চলে। পরে যোগেশ চন্দ্র বাগল-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়।

সরলা দেবীর আত্মস্মৃতিকথা "জীবনের ঝরাপাতা'র প্রারম্ভিক সূচনাই তো সাহিত্যরসে চুবানো ভাবাস্পদ-“ঝরে গেছে, ফুরিয়ে গেছে যা, তাদেরই কতকগুলি

কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড় করে একখানা মালা গাঁথা - এ হল জীবনস্মৃতি, জীবনকাহিনী। ঝরা হলেও মরা হয়নি সে পাতাগুলি। মানবপ্রাণের চিরপ্রাণবন্ত হয়ে আছে। আমার জীবনের দীর্ঘপথে দিকে দিকে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে - প্রভাতে সন্ধ্যায়, সজনে নির্জনে, দুঃখ বহনে, উৎসবে আনন্দে কত ঘটনা ও কত অঘটন ঘটেছে ঝরেছে সরেছে। পর পর যাঁদের সংযোগ মূল্যহীন জীবনের মূল্য, এ জীবনকাহিনীর পর্বে তাঁরাই আছেন ফুটে।”[৩৫]

‘জীবনের ঝরাপাতা’ আত্মস্মৃতিকথাও সাহিত্যরসে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইস্কুলে বালিকা বয়সে ঘুঁটি খেলার আনন্দ লেখিকা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়, “সেই ঘুঁটি খেলার একটা বুলি... এখনও মনে পরে – কি জানি আজকালকার মেয়েরা আর সেই বুলি বলে সেইরপকম ঘুঁটি খেলে কি না-

“ও দোলন দোলন ও দোলনটি
এক তুল দোলের নোটনটি
নোটন ধাম নোটন ধাম নোটন ধামটি”[৩৬]

শিশুমন শব্দের অর্থ খোঁজেও না, ছড়ার ছন্দের ঝংকার তার মনে দোলা দেয় ও আনন্দ রস সঞ্চার করে।

বালিকা বয়সে পাল্কীতে করে স্কুলে যাওয়ার আনন্দও ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর কথায় “জোড়াসাঁকোয় থাকতে ইস্কুলে যেতুম পাল্কীতে চড়ে। ইস্কুলের রাস্তা ছিল জোড়াসাঁকো থেকে চিৎপুর রোডে বেরিয়ে বারাণসি ঘোষ স্ট্রীট থেকে মাণিকতলা স্ট্রীটে পড়া। মাণিকতলা স্ট্রীটের ছোট রাস্তার উপর একটা দোকান ছিল, সেখানে বেহারাদের কাঁধে পাল্কী থামিয়ে “gem” বিস্কুট ও লজঞ্চুস কেনা আমাদের জীবনে প্রথম Shopping রসের অনুভূতি।”[৩৭] বাল্যকালে পাল্কীতে করে যাওয়া ও দোকান থেকে শৈশবের সবচেয়ে লোভনীয় বিস্কুট, লঞ্জেন্স কেনার আনন্দ উপভোগ্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

দিদি হিরণ্ময়ীর কথা বলতে গিয়ে সরলা দেবী লিখেছেন – “দিদি হিরণ্ময়ীর স্মৃতি আমার মনে একটি সুবাসের মত ভরা আছে। যেমন হাসানুহানা গাছের কাছ দিয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা একটা সুবাস বয়ে আসে, যেমন যুঁই, বেল ক্ষেতের হাওয়া ভোরের বেলায় একটি সুবাস স্নিগ্ধতা আনে – ঠিক তেমনি নয়। তাঁর রক্তচর্মের শরীরটি ছেড়ে ভিতরকার স্নেহ-ভক্তি-প্রীতিময়তার সুবাসেই তাঁকে আমার মনে জাগরুক রেখেছে।”

দিদির স্নেহ ভালোবাসাটি যে নিছকই মনের উপর একটি প্রলেপমাত্র নয়, স্নেহ-মায়া-মমতার গাঢ়ত্ব লেখিকার বর্ণনাগুণে-প্রাণস্পর্শ করেছে।

সরলাদেবীর আত্মস্মৃতি কথা মূলক গ্রন্থ- "জীবনের ঝারাপাতা"। তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন - "ঝরে গেছে, ফুরিয়ে গেচ্ছে যা, তাদেরই কতকগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করে একখানা মালা গাঁথা - এ হল আমার জীবনস্মৃতি, জীবনকাহিনী। ঝরা হলেও মরা হয়নি সে সে পাতাগুলি, মানবপ্রাণের সংস্পর্শে চিরপ্রাণবন্ত হয়ে আছে। আমার জীবনের দীর্ঘপথে দিকে দিকে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে -প্রভাতে সন্ধ্যায়, সজনে নির্জনে, দুঃখ বহনে, উৎসবে আনন্দে কত ঘটনা ও কত অঘটন ঘটেছে ঝরেছে সরেছে। পর পর যাঁদের সংযোগে মূল্যহীন জীবনের মূল্য, এ জীবনকাহিনীর পর্বে পর্বে তাঁরাই আছেন ফুটে।"

বালক-বালিকাদের নিজ নিজ পছন্দের স্কুলের নিয়ে দলগঠনের প্রবণতা দেখা যায়। সরলা দেবীও স্মৃতিকথাতে বাল্যকালে এই প্রবণতাই জীবন্ত হয় ফুটে উঠেছে - "বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়মার ছোট মেয়ে ঊষাদিদির সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। জোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের এক একটা group ছিল। আমাদের সাথী ছেলেদের মধ্যে নীতুদাদা, সুধীরদাদা, বলুদাদা ও দাদা একদল এবং মেয়েদের মধ্যে সুত্তীলাদি ও দিদি একদল এবং তার চেয়ে আর একটি ছোট দলে ছিলুম সুপ্রভাদিদি, ঊষাদিদি ও আমি। সুপ্রভাদিদি আসলে সব দলেই ভুক্ত ছিলেন – তাই ঊষাদিদি ও আমি বেশ বন্ধু ছিলুম। ভয়ানক ভালবাসতুম তাঁকে।"[৩৮]

আপন আপন দলভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক নিষ্ঠা ও আপনদলভুক্ত ঊষাদিদির প্রতি বালিকা সরলাদেবীর ভয়ানক ভালবাসা পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাল্যকালে স্কুল জীবনের মধুর দিনগুলিও তাঁর স্মৃতিকথায় সাহিত্যগুনান্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।-"আমি সাড়ে সাত বছরে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি হই সব নীচের ক্লাসে- আর ক্লাসে মধ্যে সব চেয়ে ছোটও আমি। লজ্জাবতী-রাজনারায়ণ বসুর ছোট মেয়ে- আমার চেয়ে বয়সে অন্তত চার বছরের বড়-সেও ঐ ক্লাসে। আমি তার ভারি স্নেহ ও যত্নের একটি পুতুল হলুম। ইস্কুলে বছরের পর বছর ক্লাসের পর ক্লাসে সকলের প্রিয় হতে থাকলুম। ক্রমে এমন হতে লাগল এক এক ব্যাচের পর ব্যাচে এক একটি মেয়ে আমার ঘোরতর প্রেমিকা হতে থাকল। যখন বাড়ির গাড়ি বন্ধ হয়ে আমাদের ইস্কুলের বাসে যাতায়াত হল -"সরলা দিদির" বইখাতা কে তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিজেদের

হাতে ধরে থাকবে এই প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হল। ইস্কুলে টিফিনের ছুটির সময় বা বাসের ক্ষেপের প্রতীক্ষায় যখন বসে থাকতে হত - তখন "সরলা দিদি"কে নিয়ে ঘুঁটি খেলা করা বা তাঁকে ঘিরে ইংরেজি রূপকথা শোনা –এই হল তাদের কাজ।"[৩৯]

সাড়ে সাত বছরের বালিকা সরলা দেবীর স্কুলের সকল বালিকার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ক্লাসের মধ্যে বয়সে সকলের ছোট হওয়ায়, সকলের ভালোবাসাই তিনি পেয়েছিলেন। বিশেষ করে লজ্জাবতীর কাছে তিনি যেন স্নেহের পুতুল হয়ে উঠেছিলেন। স্কুলের পরবর্তী দিনগুলিতেও স্কুলে সকল বালিকার প্রিয় হয়েই ছিলেন। 'সরলা দিদি' হাত থেকে বই খাতার বোঝা কে ধরবে তাই নিয়ে যেমন বালিকাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা শুরু হল, তেমনি 'সরলা দিদি'কে নিয়ে খেলার আনন্দ বা তাঁকে ইংরেজি রূপকথার গল্প শোনানোতেই যেন বালিকারা আনন্দ পেত। এইরূপে তাঁকে কেন্দ্র করে স্কুলের বালিকাদের মধ্যে যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, শৈশবের সেই আনন্দদায়ক স্মৃতি উপভোগ্যরূপে পরিবেশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে,

বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারায় স্মৃতিকথাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলি নিছকই কেবলমাত্র আত্মচরিতকারদের বস্তুনিষ্ঠ দৈনন্দিন জীবন যাপনের ঘটনার বিবরণ ও কর্মজীবনের নীরস রুটিং হয়ে দাঁড়ায়নি। অসামান্য নৈপুণ্যে ভাব-ভাষা-বিষয় ভঙ্গীমায় বাকচাতুর্যে তাঁদের আত্মস্মৃতিকথাগুলি সাহিত্যরসাস্বাদিত হয়ে উঠেছে। আত্মচরিতকারদের সাহিত্য-সঙ্গীত সংস্কৃতি চর্চা ও উক্ত পরিবেশের আবষ্টনের মধ্যে বিরাজ করাও তাঁদের আত্মস্মৃতিকথাগুলিকে সাহিত্যরসপুষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পুরুষ আত্মচরিতকার এবং আত্মচরিতধারায় প্রথম আত্মচরিতকার রাসসুন্দরী দাসী সহ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর উল্লেখ্য কয়েকজনের আত্মস্মৃতিকথাই এখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যত আত্মজীবনী তথা আত্মস্মৃতিকথা লেখা হয়েছে সেগুলি যদি বিশ্লেষশ করা সম্ভবপর হত তাহলে দেখা যেত সেগুলিও সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত হয়েই বাংলা আত্মস্মৃতি কথার ধারায় সুচিহ্নিত স্থান করে নিয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ:

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (খন্ড ৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭, ১৩৯৩ ভাদ্র, পৃঃ ৩৫২

২. তদুক্ত, পৃঃ ৩৫২

৩. তদুক্ত, পৃঃ ৩৫১

৪. তদুক্ত, পৃঃ ৩৪০

৫. তদুক্ত, পৃঃ ৩৪৮

৬. তদুক্ত, পৃঃ ৩৪৭

৭. বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, আশুতোষ রায়, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃঃ ৬৫

৮. আমার জীবন, রাসসুন্দরী দাসী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃঃ ১০৩

৯. তদুক্ত, পৃঃ ২৯

১০. তদুক্ত, পৃঃ ৩১

১১. তদুক্ত, পৃঃ ৫৪

১২. তদুক্ত, পৃঃ ৫

১৩. বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, আশুতোষ রায়, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃঃ ৯০

১৪. তদুক্ত, পৃঃ ৯০

১৫. তদুক্ত, পৃঃ ১০৪

১৬. আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৮

১৭. তদুক্ত, পৃঃ ৪০

১৮. বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, আশুতোষ রায়, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৯, পৃঃ ১৩৬

১৯. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ২য় খন্ড, অধীর দে, উজ্জল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ৭, তৃতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১০, পৃঃ ১০৮

২০. বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, আশুতোষ রায়, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৯, পৃঃ ২৯৩

২১. আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃঃ ৭

২২. তদুক্ত, পৃঃ ৯

২৩. সাহিত্যের রূপরীতি ও তত্ত্ব, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা - ৯, ২য় সংস্করণ ২০১৭, পৃঃ ৬৬৯

২৪. আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যবিহার, কলিকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, পৃঃ ১

২৫. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ২য় খন্ড, অধীর দে, উজ্জল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ৭, তৃতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১০, পৃঃ ১১৩

২৬. বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, আশুতোষ রায়, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা ৯, পৃঃ ২১৬

২৭. আন্দরর ইতিহাস, নারীর জবানবন্দি, অহনা বিশ্বাস ও প্রসূন ঘোষ (যৌথ সম্পাদনা ও সঙ্কলণ), গাঙচিল, কলিকাতা-১১১, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃঃ ১২৭

২৮. আমার খাতা, ইন্দিরা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃঃ২৯

২৯. তদুক্ত, পৃঃ ২৯

৩০. তদুক্ত, পৃঃ ৩২

৩১. তদুক্ত, পৃঃ ৩৭

৩২. তদুক্ত, পৃঃ ৪৮

৩৩. তদুক্ত, পৃঃ ৫০

৩৪. তদুক্ত, পৃঃ ৭১

৩৫. জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবী চৌধুরানী, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা -৭৩, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৬, পৃঃ ১৩

৩৬. তদুক্ত, পৃঃ ৩১

৩৭. তদুক্ত, পৃঃ ৩২

৩৮. তদুক্ত, পৃঃ ২৯

৩৯. তদুক্ত, পৃঃ ৩১

সমতাবিধান

অদিতি সিংহ
স্বাধীন গবেষক, বাংলা বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

"সমাজের জর্জরিত একশ্রেণীর মানুষ,
যাদের স্বীকৃতি কেবল বইয়ের পাতায়।"

"সমতাবিধান" যার অর্থ সমান আধিকার স্থাপন করা। সমানতা সকলের একমাত্র নৈতিক অধিকার। শিশু জন্মানোর পর তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে দেয় সমাজ। সমাজও যে অনেক সময় ভুল প্রমাণিত হয় তার বিচার কে করবে? এখানে আপনি কিংবা আমি বলার কেউ না, প্রাচীন পৌরাণিক কথা মেনেই প্রতিদিনের জীবন চলে।

একটা শিশু জন্মানোর পর তাকে লিঙ্গ নির্ধারণের আওতায় ফেলে দেওয়া হয়। সে পুরুষ না নারী তার বিচার চলে অদৃশ্য আদালতে। চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলায় পড়ানো হয় "লিঙ্গ নির্ধারণ"। ছোট থেকে আমরা জেনে এসেছি লিঙ্গ চার প্রকার, যথা- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ আর ক্লীব লিঙ্গ। নারী-পুরুষের ভেদা-ভেদ করতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আর স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতি বোঝালে উভয়লিঙ্গ এবং স্ত্রী পুরুষ জাতিকে না বুঝেও অচেনা কোন কিছু বোঝালে ক্লীব লিঙ্গ। পৃথিবীর প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মেনে আমরা এগিয়ে চলে যাই। ভিন্ন কবির গল্প-কবিতা পড়ে, শ্রেণির পর শ্রেণি পাঠরত হয়ে শিক্ষা অর্জন করি। তবুও সমাজের দোরগোড়ায় এসে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকি, সমান স্বীকারোক্তির অধীনে।

এই সমাজে চোখে পড়ে এক শ্রেণীর মানুষ, শারীরিক বা মানবিক গঠনে তারা সকলের থেকে ভিন্ন। ছোটবেলায় পড়ে থাকা ক্লীবলিঙ্গ বা তৃতীয় লিঙ্গ এর সঙ্গে তুলনা করে থাকি তাদের।

আসলে তৃতীয় লিঙ্গ হল একটি মতবাদ । যাতে এমন ব্যক্তিদের শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যারা নিজে অথবা সমাজের দ্বারা পুরুষ বা নারী কোনটাই হিসেবে স্বীকৃত নয়। এটি পাশাপাশি কিছু সমাজের একটি সামাজিক শ্রেণীকে বোঝায়, যে সমাজগুলো তিন বা ততোধিক লিঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করেন। *তৃতীয়* পরিভাষাটি সাধারণত 'অন্য' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; কিছু নৃতত্ত্ববিদগণ এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ চতুর্থ এবং 'কিছু' লিঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এর ছোঁয়া পাওয়া যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পাদনায়; হিন্দু দেবতা শিবকে প্রায়ই 'অর্ধনারীশ্বর' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যার দ্বৈত পুরুষ ও মহিলা প্রতিকৃতি আছে। সাধারণত, অর্ধনারীশ্বরের ডান দিক পুরুষ এবং বাম পাশ মহিলা। তৃতীয় লিঙ্গ ধারনাটি ভারতের তিনটি প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় - হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম - এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে বৈদিক সংস্কৃতি তিনটি লিঙ্গকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বেদ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ -৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এর মতে একজন ব্যক্তির প্রকৃতি বা প্রকার অনুযায়ী, তিনটি শ্রেণিতে এক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । তারা কাম সূত্র (চতুর্থ শতাব্দী খ্রিষ্টাব্দ) নামেও পরিচিত এবং অন্যত্র পুমার-প্রকৃতি (পুরুষ প্রকৃতি), স্ত্রী-প্রকৃতি (নারী-প্রকৃতি) এবং তৃতীয় প্রকৃতি নামেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে বলা হয়েছে যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষগুলি প্রাক্তন ভারতে সুপরিচিত এবং পুরুষ দেহবিশিষ্ট বা মহিলা দেহবিশিষ্ট মানুষ। আন্তযৌনাঙ্গ এর অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলি প্রায়ই শৈশব থেকে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

প্রাচীন হিন্দু আইন, বেদ, পুরাণ, ভাষাতত্ত্ব এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি তৃতীয় লিঙ্গ আলোচনা করা হয়। ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ -২০০ খ্রিষ্টাব্দ তিন লিঙ্গের জৈবিক উৎস ব্যাখ্যা করে। ভারতীয় ভাষাবিদ পতঞ্জলির কাজ সংস্কৃত ব্যাকরণ মহাভাষায় (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলেছেন যে সংস্কৃতের তিনটি ব্যাকরণগত লিঙ্গ তিনটি প্রাকৃতিক লিঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাচীনতম তামিল ব্যাকরণ টলকাপ্পিয়াম (তয় শতাব্দী) হেমফ্রেডাইটকে তৃতীয় "নিগূঢ়" লিঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করে পুরুষের নারীর শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের তিনটি পুরুষের মধ্যে একটি; তৃতীয় লিঙ্গ বুধ, শনি এবং (বিশেষ করে) কেতুর সাথে যুক্ত। পুরাণে, তিন ধরনের দেবদেবীর গান ও নাচ উল্লেখ আছে: অপ্সরা (মহিলা), গান্ধার (পুরুষ) এবং কন্নড় (উভয় লিঙ্গ)।

দুটি মহা সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। রামায়ণের কয়েকটি সংস্করণ এই গল্পের একটি অংশে বর্ণিত আছে, রামায়ণের রাম বনভূমিতে নির্বাসনে নেতৃত্ব দেন। সেখানে মাঝ পথে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তার বাড়ি অযোধ্যায় অধিকাংশ লোক তার অনুসরণ করেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন, "পুরুষ ও নারীরা, পিছনে ফিরো", এবং সেই সঙ্গে, যারা 'পুরুষ ও নারী' ছিল না, তারা জানতো না কি করতে হবে তাই তারা সেখানেই থেকে গেল। মহাভারতে শিখণ্ডী বলে একটি তৃতীয় লিঙ্গের চরিত্র বর্তমান। তিনি রাজা দ্রুপদের কন্যা ছিলেন। রাজা দ্রুপদ তাঁকে পুত্রের মত করে বড় করে

তুলেছিলেন যাতে পরবর্তী কালে সে কৌরবদের হারাতে পারে যুদ্ধে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করেছিলেন শিখন্ডী। এমনকি শিখণ্ডিনির সঙ্গে রাজা ধ্রুপদ একজন মহিলার বিবাহ দেন। যদিও পরবর্তীকালে শিখণ্ডী উভলিঙ্গ হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেন। অজ্ঞাতবাসে থাকা কালীন অর্জুনের বৃহন্নলা বেশের কথা তো সকলের জানা।

মেসোপটেমিয়ার পৌরাণিক কাহিনীতে মানবতার প্রাথমিক লিখিত রেকর্ডগুলির মধ্যে এমন ধরনের রেফারেন্স রয়েছে যা পুরুষও নয় এবং নারীও নয়। ভূমধ্য সংস্কৃতিতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে লিখিত প্লেটো'র সিম্পোজিয়ামে অরিস্টোফেনসের সাথে জড়িত পৌরাণিকতা সম্পর্কিত তিনটি লিঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। আরো বিভিন্ন দেশ যেমন মিশর, আমেরিকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বর্তমান সমাজে 'তৃতীয় লিঙ্গের' শ্রেণীর মানুষদের সঠিক সম্মান বা স্বীকৃতি মেলে না। সমাজ তাদের স্বাধীনতার অধিকার পর্যন্ত দেয়। প্রাচীনকালের বর্ণিত পুরান, বেদের কাহিনীগুলিতে তাদের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ ছিল, তবে বর্তমান সমাজ এটা মানতে নারাজ। তাদের ন্যূনতম অধিকারের জন্য অনেকেই এই বিষয়ে আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন ভাষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক এই বিষয়ের উপর নানান বই লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ের ওপর গবেষণা করা যায়। ড. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অধ্যক্ষ। তিনি ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী অধ্যক্ষ। বাংলায় পিএইচডি করেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সনও হন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ রূপান্তর কামী সৃষ্টি হল তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'উপন্যাসের **নসুবালা।** সে বিয়ে করেছিল ,কিন্তু ঘর করতে পারে নি।বৌ তাড়িয়ে দিয়েছিল।করালীর সংসারে নসুবালা তার বউয়ের ননদ হয়ে থাকতে চেয়েছিল।প্রকৃতিতে পুরুষ নসুরামের জীবন হয়ে গেল নারীর সাজসজ্জায়,নারী কোমলতায়-ব্যবহারে নসুবালা।সে চরিত্রে যথার্থ মানবিক।কামারপাড়ার মেয়েরা ভুলে যায় নসুবালারকোন নারী নয়, সে কারও কন্যা নয়। পাগলের কথায় সেই নসুর শরম লাগে এবং বলে ওঠে :"উ মুখপোড়া কোথা থেকে এল লো।" এরকমই বাংলা আধুনিক সাহিত্যে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা "আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত" 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে এই সম্পর্কিত আলোচনা করা আছে। এই বইটি শুধুমাত্র নিছক কোনো রূপকথার বই নয়, সমাজের একটি দিক লেখক তার কলমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন পাঠক বন্ধুদের সম্মুখে।

আমরা কেবলই জেনে এসেছি প্রেম ভালোবাসা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি হয়, সমলিঙ্গের প্রতি যে একটা আকর্ষণবোধ থাকতে পারে এটা মানতে এখনও নারাজ অনেকেই। সমলিঙ্গের মানুষ তাদের ভালোবাসাকে ভালো রাখতে জানে হয়ত ভাল থাকতেও পারে, তবে সেটা কোনদিনও একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজে ভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, সকলের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে... এই মানা আর না মানার মাঝে পিষে যায় এই এক শ্রেণীর মানুষ। যাদের হয়তো সমাজ সঠিক ভাবে গ্রহণ করলে তারা আজ মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারতো। ছোটবেলা থেকে তথাকথিত 'মেয়েলি ছেলেদের' অপমানিত হতে হয়েছে সমাজের কাছে, ভিন্ন নামে তাদেরকে ডাকা হয়েছে। তবে একটা মেয়ে যদি সামান্যতম ছেলেদের মত আচরণ করে তাকে সমাজ আর পাঁচজন সাধারণ সমতুল্য হয়েই চোখে দেখে, হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট নাম প্রচলিত 'টমবয়'। "LGBT" এই শব্দটার অর্থ আমরা প্রায় সকলেই

সমাজের শরীর ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে এক দূঃসাহসিক উপন্যাস হলদে গোলাপ, কাহিনী নির্মাণে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব শারীরিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব তথ্যসহ এইসব নিয়ে আলোচনা করা আছে এই বইটিতে। এক বিশিষ্ট সমালোচকের মতে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রতিটা লেখা আমাদের শেকড় খোঁজার রসদ যোগায়। সমপ্রেম কোন অপরাধ নয়, দুটো মানুষের ভালো থাকার এক সামান্য ইচ্ছা।

"স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ" মল্লিকা সেনগুপ্ত-এর লেখা 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে' - সিমোন দ্য বোভেয়া।

জন্মসূত্রে কেউ স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায় এটুকুই তার প্রকৃত সত্য। সে জানে না তার পরিচয়। কিন্তু সমাজ পদে পদে তাকে টিপ পরিয়ে, চুল বেঁধে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটি ধরিয়ে নানান কুসংস্কারে বন্দি করে সর হলুদ মাখিয়ে সামাজিক ভাবে তাকে মেয়েলি করে তোলে।

'এ মা! তুই তো লেডিস দের মত--'

কোনও ছেলেকে বলা সমাজের এই উক্তিও দাঁড় করিয়ে দেয় এক প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। লেডিস/ মেয়ে হওয়া কী খারাপ?

লিঙ্গের এই কৃত্রিম ধারণা বিভাজন ধারণ করে সমাজ। আচারণে, শিল্পে, সাহিত্যে, গানে, কবিতায়, শিক্ষায়, পোশাক নির্বাচনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজ একটি লিঙ্গ নির্মাণ করতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই যে লিঙ্গ নির্মাণ, স্ত্রী যে স্বামীর অনুগামিনী,

সংসারে রান্না করা, সন্তান পালন করাই তার কাজ, ব্যাতিক্রম একটু হলেও সহানুভূতির আঁচ।

এই যে মানবীবিদ্যা যা প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে জর্জরিত করে এই সমাজ এই বই সেই প্রতিবাদের একটু মাইল ফলক। না এই বই নারীবাদের বই নয়। নারীবাদ ঠিক কী? পুরুষ কে ছোট করে নারীর জয়? নারীর অত্যাচারের একটা বড় প্রতিবাদ? না নারীবাদ হল সমাজের পিতৃতন্ত্রের মর্মমূলে আঘাতের পর আঘাত। এই বইয়ের কোথাও অপমান করা নেই পুরুষজাত কে। পরিষ্কার ভাবে লেখিকা বলে দিয়েছেন - 'সব পুরুষ ধর্ষক নয়, সবাই খারাপ নয় কারোর মধ্যে একটা সহানুভূতিশীল মন আছে'।

এই বইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি অধ্যায়ে ভিন্ন রূপে নারী জীবনের প্রতিটি ধাপ কে দেখানো হয়েছে। কন্যাসন্তান, যুবতী, পুত্রবধূ, মা জীবনের এই প্রতিটি অধ্যায়ে ঠিক কী কী বিষয় উঠে আসে একজন মেয়ের কাছে এই বই তুলে ধরে তা। ঠিক তার পাশেই একজন পুরুষ যে দাদা বাবা বর ছেলে হিসেবে বদলে দিতে থাকে সব সমীকরণ এই বইতে আছে সেটাও। কোথায় কোথায় প্রশ্ন ওঠে তোলা দরকার এই বইতে সে কথাও আছে। আছে সমকামিতা, লেসবিয়ান সম্পর্কের কথাও।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিত্রাঙ্গদা

২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী: "হলদে গোলাপ"

৩. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়: "অন্তহীন অন্তরিন প্রোষিতভর্তৃকা"

৪. ঋতুপর্ণ ঘোষ: "ফাস্ট পার্সন (১, ২ খন্ড)"

৫. মল্লিকা সেনগুপ্ত: "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ"

৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"

Unspeakable Truths: Stories of Gender-Based Violence in Conflict- Zones

Madhumita Basu
Assistant Professor in English
Victoria Institution (College)

ABSTRACT : *This paper attempts to analyze the intersection between women, violence and victimhood through an examination of gender based violence in conflict zones. Historically, women have been subjugated, controlled, disempowered and silenced by patriarchy. Woman's body is often seen as the site of power assertion. During conflicts, women are subjected to systematic rape, which is seen as a method of ethnic cleansing. Dominant historiography continues to remain silent about these atrocities on women. This paper will analyze Pakistani- American writer Sorayya Khan's novel Noor and Yvonne Vera's novel, Stone Virgins. Khan's novel narrates the brutality women were subjected to during the 1971 Bangaladesh War of Liberation and Vera's novel gives the horrifying details of the gruesome treatment of women during Zimbabwean civil war. Both novels unveil the dehumanization of women and explore how wartime rape is used as a political strategy of institutionalized control of women.*

Keywords: *patriarchy, hegemony, gender-based violence, conflict zones, mutilation*

In her work *Theorizing Patriarchy*, Sylvia Walby defines patriarchy in relation to six structures: the mode of production, paid work, state, male violence, sexuality and cultural institutions. In all these structures, she argues that women are considered to be intrinsically inferior to men. She asserts that patriarchy is "a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women".(21) Historically, women have been undermined by male hegemony and the situation is particularly gruesome in conflict zones. Conflict-related sexual violence is a method of warfare to humiliate enemies and undermine their morale, terrorize and control civilians, force communities out of their homes and affect ethnic balance. Violence against women is used as a strategic

weapon against war to destabilize communities. During war/conflicts women and girls are subjected to sexual violence committed by bandits, insurgency groups, military and border guards. The breakdown of law and justice enable men to use violence and women become victims of forced impregnation, mutilation of genitals and intentional disease transmission.

Khan‗s novel, *Noor* narrates the atrocities women were subjected to during the 1971 Bangaladesh War of Liberation. In *Noor*, Ali, the protagonist brings back Sajida to Pakistan from Bangladesh. He thinks that it would atone for the sins he had committed in East Pakistan as a Pakistani soldier. He never reveals Sajida‗s Bengali identity to her. And as a foster father, he does everything to give Sajida a decent life. But the past returns in the persona of Noor, the child born with Down syndrome. Noor has an exceptional quality to paint. Noor's paintings bring back the memories of a traumatic past that Ali had suppressed. The novel unfolds the genocidal rape of women during the war and in the post-war condition through the conquered territory. Ali recalls how the systematic use of rape and other forms of sexual violence were used on women. He reminisces the rape of a woman who was a mother and was raped by the Commander in front of Ali. He recalls the heinous treatment of the woman:

> He'd been overwhelmed by her breasts, round and beautiful, despite the children who suckled from them. One was full of milk for the baby who had been torn from her and the other was hidden behind the coarse cloth of her sari. The commander pushed her to the floor. He pulled and stretched the breast that was large and firm until it sprayed a stream of milk. He laughed, called her a whore and much worse, stopping only to lick drops of her milk which landed on his lips. Then he forced his rifle into her mouth, tore her sari, and sat on top of her. When he was done, he stuffed his belt between her legs letting the oversized buckle catch and tear, laughing at how cleverly he had leashed her. The baby was dead by then, thrown to the side of the room with other corpses. After the man pulled the trigger, what was left of the woman‟s body, milk still leaking from her breasts. (54)

The officer then commanded Ali to repeat the grotesque act. ”I was alone with the girl, my pants still down. I took a few steps toward her. She was ripped and pried open, the implements used to do this, the scissors, pens, a metal ruler, speckled with blood, lying to her side. The nib of the fountain pen was missing.” (54)

The text examines that dissident movements, are inherently patriarchal activities, and rape is one of the most extreme expressions of the patriarchal drive toward masculine domination over the woman. The body of women in this context becomes the territory to conquer. As Susan Brownmiller puts it, ”the body of the raped woman is a ritualistic field of war, a parade field for the band and flags of the winner. The game played over the woman‘s body is a declaration sent from one man to another, an undeniable proof of victory for one side and of defeat and destruction for the other” (Brownmiller, 45). When men‘s honour is defined in relation to women, rape will be perceived as a humiliation of the society in general and sexual violence will turn into a weapon of war.

Women in conflict zones are subjected to various forms of gender injustice. Despite the prevalence of various human rights laws, women in conflict areas remain vulnerable to gender-based violence. Over the years, sexual violence against women has been used as an act of subordination and this takes place globally across geographical and cultural divides. Women have been subjected to various forms of brutalities in conflict regions including the Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, Haiti, Bosnia, Liberia and Syria. The list of sexual crimes civilian populations have experienced is incredibly long and the atrocities can reach unthinkable levels. Women and girls are disproportionately the targets of such atrocities. Due to historical and structural inequalities that exist between men and women there have been different forms of gender discrimination that females are subjected to all over the world. Rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced abortion, enforced sterilization, forced marriage are the most known sexual crimes which, dehumanize women. These acts continue unabated due to insufficient prosecution of sexual violence crimes at the national, regional and international levels. The perpetration of these acts are facilitated by an environment affected by the breakdown

of community and family structures, lack of security, absence of rule of law and prevailing impunity. African women writers, like Chimamanda Ngozi, Chenjerai Hove, Dambudzo Marecheraare, Tsitsi Dangarembga and Yvonne Vera are concerned about the colonial and post-independence forms of oppression. Their texts illustrate the complex mechanisms that sustain brutal practices on women in war.

Due to constant political turmoil, women in Zimbabwe have been victims of sexual violence. Narratives of the survivors of the liberation war consistently showed large percentages of women amongst the victims. Yvonne Vera, a Zimbabwean writer, grew up during the devastating years of the anti-colonial struggle. Her novels address the fissures of decolonization and the gross violation of human rights during armed conflicts. Her texts unravel the horrifying details of how armed groups engage in sexual violence on defenseless women. In her preface to an anthology of contemporary African women‘s writing, entitled *Opening Spaces*, Yvonne Vera argues that literature provides a critical debate for subjects otherwise silenced by dominant socio-political practice. She concentrates on how state forces reportedly perpetrated sexual violence very frequently and highlights the value that literature holds for African women who, ”without power to govern, often have no platform for expressing their disapproval” (Preface 2). Vera states that writing empowers women to articulate their trauma; a ”free space” that is not available to them in spoken discourse: ”The written text is granted its intimacy, its privacy, its creation of the world [...] It retains its autonomy much more than a woman is allowed in the oral situation” (Preface 3). The literary text is, in Vera‘s argument, a transformative process, that enables one to challenge the misogynistic practices enforced by the dominant system: ”Writing,” she asserts, ”offers a moment of intervention” (Preface 3). In the five novels which Vera published during her lifetime, she consistently endeavoured to create “spaces” to articulate the silenced trauma of women.

Vera's novel, *The Stone Virgins* reveals the Zimbabwean state's use of violence to strengthen the one party state objective. The novel unearths the unspeakable violent nationalist discourse and the state's deployment of a military unit and other instruments of coercion. In it Vera narrates

the story of two sisters, Thenjiwe and Nonceba, living in the rural village of Kezi, following the independence of Zimbabwe from Britain in the early 1980s. A soldier murders Thenjiwe and then rapes and mutilates Nonceba. The novel challenges the state's use of a malicious form of hegemonic nationalist political discourse and how women have been victims of such toxic policies.

The novel is set during the violent period of Zimbabwe‘s post-independence history. In the novel, Vera relates the recent history of Zimbabwe to the backdrop of an older history, written on the stones in the cave of Mbelele in the Gulati Hills. The ancient history etched on the rocks is a text that narrates the history of an older act of unspeakable violence against another group of women:

> I placed my hand on the rocks, where antelopes and long-breasted women stand together. Tall women bend like tightened bows beneath a stampede of buffalo while the rest spread their legs outward to the sun. Even now, as I speak, they are there hunting something else beyond the buffalo, something eternal. What is it that they hunt? They move past the lonely herds. Are their arrows raised against time, these keepers of time? [...] The women raise their arms against the light. Perhaps their arms welcome the light falling from the curve of the rock, a light indelible, each stroke carries a thousand years of disbelief [...] Disembodied beings [...] They are the virgins who walk into their own graves before the burial of a king. They die untouched. Their ecstasy is in the afterlife. Is this a suicide or a sacrifice, or both? (*Stone Virgins* 94-95)

In *The Stone Virgins*, the description of Sibaso's monstrous treatment of the Kezi sisters Thenjiwe and Nonceba creates a very terrifying picture in the reader's mind that is abhorrent and appalling in its barbarity and viciousness. Sibaso‘s malicious acts of violence include rape, assault, decapitation, and mutilation. The narrator reveals that Sibaso completely dehumanizes the sisters and hold the bodies of the two women ’up. Frozen ‘(Vera 67), like a frozen picture. Vera gives an unnerving picture of a beheaded young Thenjiwe and thesystematic maiming of Nonceba. These abominable acts reflect the ruthless and

calculated nature of the misogynist attack. Nonceba, in recollecting this frightful experience, says:

> He has sought my face. Held it. His fingers, the gap between my eyes, the length of my brow, the spread of my cheek bones, my chin: my lips, moving or silent. He cut. Smoothly and quickly.It part memorized; my dark blood.My mouth a wound. My mouth severed, torn, pulled apart. A final cut, not slow, skillfully quick, the memory of it is in the blood of my bones. (Vera 59)

The story of the two sisters is based on the *Gukurahundi* atrocities or the 'Matabeleland Disturbances'. In 1980, after decades of guerilla war against colonial rule, Rhodesia earned its independence from Britain. Less than two years thereafter when Mugabe rose to power in the new Zimbabwe, it signaled the beginning of dreadful civil unrest that lasted nearly a half decade more. The 'Gukurahundi 'atrocities took place in the provinces dominated by the ethnic Ndebele minority. These horrendous crimes against women, are symbolic representations of the Mugabe government's barbarity in Matabeleland. In *The Stone Virgins,* Vera unravels the way rape is used to reinforce policies of ethnic cleansing. Vera reveals the gendered hierarchies between perpetrators and victims and shows how armed conflict exacerbates and amplifies everyday sexual violence, grounded in deep-seated gender inequality, backed up with the power of arms.

For centuries, women have been subjected to acts of structural violence like foot-binding, witch-burning, slavery, genocidal rape, ritual mutilation, dogmatic ideologies of childbearing and chastity. Attempts have been made to silence them in the pages of history and deprive them of basic human rights. The history of conflict-related sexual violence is as extensive as the history of warring itself. The violent conflicts in warn zones has made it clear that sexual violence is not a natural by-product of war, but a strategy and tool which might even be used to the level of ethnic cleansing. Violence that women experience during and after armed conflict usually take many forms such as rape, slavery, forced impregnation or miscarriages, kidnapping or trafficking, forced nudity, and disease transmission. These harrowing stories are strangely absent in dominant discourses. Sorayya Khan's *Noor* and Yvonne Vera's *Stone*

Virgins uncover that violence against women in armed conflict is the result of exacerbated gender inequalities that already exist in society. Both novels unfold how women's bodies are targeted for sexual violence as combatants attempt to wreak havoc on the existing social fabric and inscribe a new ideology.

Works Cited :

1. Khan, Sorayya. Noor. New Delhi: Penguin, 2003.
2. Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape New York: Simon and Schuster, 1975.
3. Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford, Blackwell, 1998.
4. Vera, Yvonne. *The Stone Virgins*.Hahare: Weaver, 2002
5. ——————’Preface."Opening Spaces: An Anthology of Contemporary African Women‘s Writing”. Ed. Yvonne Vera. Harare: Baobab Books, 1999.

Peacock in Popular Beliefs with Special Reference to Tribal Medicinal Practices of India

Sayan Debnath
Ph.D. Research Scholar,
Centre for Adivasi Studies and Museum,
Vidyasagar University

Abstract : *The glorious status of peacock as the 'National Bird' of India is a recent development. Peacock played an impressive role in the historical context of India in different periods and the importance of this bird is still felt on. This beautiful bird is also associated with the different religious beliefs prevalent in India i.e., Hinduism, Buddhism, Jainism and Tribal religions. In Indian history, we can see a lot of arguments about the cow and thehorse in the matter of religious controversy and in the identification of the Aryan homeland. But the significance of peacock in India's history has not attracted many scholars and therefore, it is difficult to find scholarly writings on peacock from a historical aspect. The present study aims to review the role of peacock in medicinal treatment. The study will be done in two ways i.e., the usage of peacock for medicinal benefits in ancient India found in several texts and the use of peacock mainly in the tribal societies in the contemporary times. This will help us to understand the position of peacock in India's context. Not only for its charming beauty but also because of the medicinal value of this birdmakesit indispensable to the Indian people.*

Keywords: *Peacock, Medicinal, Flesh, Feathers, Tribe.*

Method

For this study data has been collected from various published research papers of different authors.Ancient India's literary and epigraphical records have been analysed as primary sources. The articles of newspapers have also been examined carefully. The whole paper is based on the historical approach.

Discussion

Peacock is not merely a glamourous bird. It also hasa long-standing relation with tradition and literature of India.This bird has been portrayed in various Brahmanical, Buddhist and Jain classical texts in different

ways. The 'Sabhā Parva' of Mahābhārata comparesan ideal king's responsibilities with the behavior of apeacock as this bird is a great warrior by nature and do not forgive its enemies mainly the snake.The king should also adopt this feature of the peacock to defeat his rivals. From theRāmāyana we get an excellent depiction of the peacock in portraying the natural sceneries. Kālidāsa, the great author of classical Sanskrit brilliantly representsthis bird in his various texts like Ṛtusaṃhāra, Raghuvaṃśa and Meghadūta etc. Not only in the literary context, this bird was also important in the political sphere of Indian history. Kumāragupta (415-455 CE) I of Gupta dynasty glorified this bird in royal coins and later it became the royal symbol of the Guptas replacing the Garuda. The punched marked coins, the coins of the Mitras of Ayodhya, the Hunas and the Yaudheyas represented peacock. The Bhanjas of Orissa, the Kadambas of Karnataka used peacock in their royal emblems.

The most ancient belief associated with the peacock in India's historical context was seen to be foundona funerary earthen pot discovered from the late Harappan Cemetery H at Harappa. Here the peacock was represented as carrying a dead human into its belly to the stars.[1] This picture probably reveals the role of the peacock as a mediator between the heavenly and the material worlds. The 'Adi Parva' of Mahābhārata described the peacock as carrion eater including human flesh.D. D. Kosambiargues that the representation of the peacock in Harappa's cemetery can be supported by the reference of Mahābhārata, as naturally this bird is not a carrion eater but must havea holy connection with the world after death in religious belief.[2] It should be noted that peacock is still now associated with the funeral rites of the Gond tribe of Bastar, Madhya Pradesh. This tribal group places a wooden post engraved with a symbol of the peacock beside a grave.[3]

There were a number of beliefs regarding the peacock and many of it has still survived in mainstream as well as in tribal society. Among these, most of the beliefs are related with the peacock's miracle role in curing health. In this paper, the role of the peacock in the medicinal practices of the tribal society is the matter of argument. Although, in this context the popular beliefs related with peafowls which was reflected in

various texts of ancient times and mainly in medical treatises will be examined. It will help us to understand the beliefs about the healing power of the peacock regarding the health-related issues in India from the past to the present. Before entering the main theme of this study, the concept of folk and tribal medicine should be discussed. Folk medicine is generally based on the speculations, superstitions, magic, spirits, religious beliefs and is principally learned through oral or verbal tradition. Tribal medicine also shares similar elements with the folk medicine. In both of this medicinal practice belief is the central question. Therefore, the term 'faith healing' can be considered for both practices. However,folk medicine may be popular in mainstream society butin the case of tribal medicinal practice, it is predominantly limited with in the tribal society.

Naturally the peacock is a great rival of the snake and there area lot of references about this characteristic of peacock in several ancient texts of India. The Atharva Veda mentions that peahen acts like ananti-dote.[4] The Arthaśāstra of Kauṭilya refers to the fact that if a house has a pet peacock, there will no nuisance of snakes.[5] One of the Buddhist legends also reveal this attribute of the peacock. According to this legend, "once Lord Buddha manifested in the form of a peacock on the earth and during his life as a peacock, he acquired the knowledge of snake bite treatment from the peahens. After that, when Buddha was in Jetavana Vihara, a priest named Svāti got bitten by snake and Aanada, the favorite disciple of Buddha came to him for the advice of treatment. Then Buddha healedSvāti with the knowledge which he gained during his peacock incarnation."[6] The role of the peacock in preventing the harmful effect of the venom of the snake which was reflected in these texts probably derives from the natural instinct of this bird. However, peacock's feathers are also used as a remedy of snake bite in practical life also. There is a popular folk medicinal treatment in Punjab where the people take the smoke of a peacock's feathersin tobacco pipe for the primary remedy of snake bite.[7]

Now a days to achieve immortality through medicinal treatment has become very popular all over the world. For thousands of years the idea of immortality has fascinated humankind. It is very amazing that the usage of the peacock in the achieving immorality was popular among the

ancient Indians. The story of MayūraJātaka contains a fascinating story regarding this. The Jātaka mentions,"During the reign of Brahmadatta of Benares Bodhisattva appeared as a golden coloured peacock and lived in the hilly tracts called Dandaka Hiranya. Once the queen, Khemā dreamed about the golden peacock who delivered religious sermons and then she told the king to bring this magnificent bird to her. Later the king came to know from a Nishada (hunter) that a golden peacock inhabited the hilly tracts of his kingdom and ordered to capture it. However, after several attempts the hunter failed to catch it. Then the king engraved a golden plate near the residence of this peacock and declared that who consumed the flesh of this bird would become immortal. After a continuous effort for a long period a hunter caught this peacock and brought it to the palace of the King, Brahmadatta. Soon after the king wanted to kill the peacock as he knew that the flesh of the golden peacock made a human being immortal."[8]

If the narration of the Mayūra Jātaka is considered merely as a mythical story, then the belief of immortality associated with the peacock's fleshhad a strong practical ground in ancient India and as well as in modern times also. The ancient Indians believed that immortality can be gained by consuming the flesh of a peacock and probably the food habits of the great Mauryan King, Ashoka provides evidence in this context. The Major Rock Edict I (258 B.C.E) of Ashoka mentions the prohibition of killing animals except two peacocks and one deer for the royal kitchenon a daily basis.[9] However, the slaughter of deer was prohibited later. Radhakumud Mookerji states that, "it is not definitely known if the peacock was given up finally as an article of his food."[10] The Pillar Edict V (243 B.C.E) presents two lists of animals and birds which were forbidden to slaughter. The first list referred tosuch names which should not be killed onspecific days and the second list made an announcement of the total prohibitions at all the occasions.[11] Interestingly, the name of peacock was notincluded in these two lists. This suggests that consuming the peacock's meat was widely practiced in the Mauryan kingdom. Wendey Doniger quotes, "Perhaps because the emperor was fond of roasted peacock and venison. Perhaps he was trying to cut down on meat, the way some chain-smokers try to cut down on

cigarettes.''[12] Doniger further explains, "There is no ecological agenda here for the conservation of wildlife, nor can the list be explained by the privileging of certain animals for medicinal purposes."[13] Ashoka actually accepted the fact that people consume flesh but his aim was to reduce unnecessary violence against animals. Moreover, the Mauryas had probably considered the peacock as their totem. R. K. Mookerji opined that the peacock was the dynastic symbol of the Mauryas.[14] The sacred Jain text, Parisistaparvan of Hemachandra reveals the fact that Chandragupta Maurya, the first emperor of the Maurya kingdom was brought up in a peacock-keeper village.[15] The architecture and sculpture of Mauryan period was mostly adorned by the peacock like in the stupas of Sanchi and Bharhut. The ancient punched marked coins which were possibly circulated during the reign of Bindusara contains the figure of the peacock. Therefore, we can say that the Mauryan dynasty was connected with the peacock in many ways. Further, it should be noted that the Mauryas likely had a tribal past.

Now two important questions can be raised regarding the matter of Ashoka's food habit. First,if we take the peacock as the totem of the Mauryas then it is very peculiar as to why Ashoka consumed peacock's flesh. Generally, totem can be consumed only during some special occasions. Belief in 'totem' is a prominent feature of India's religious tradition particularly in the tribal society. A totem is a class of material objects which are regarded as sacred, mythical and a component of celestial bonding in a group of people. The totem can be a tree, animal or any natural object in general and people believe that it is a source of mystical power and usually totem serves as an emblem of a group. Generally, the historians and the anthropologists believe that the system of 'gotra' in Hinduism likely evolved from this totemic system. When the process of acculturation and assimilation were going on in India a number of tribes were absorbed into the Brahmanical or Hindu belief but many symbols of the tribal faith still continued in thenew religious system like the veneration of Linga and Yoni, worship of spirits, custom of totem etc. Some Hindu gotranames till nowbear the feature of totemic belief like Kaśyapa (Tortoise), Śāṇḍilya (Ox), Gautama (Cow), Bharadvāja (Bird) and consumption of these animal is strictly forbidden for the members of

these gotras.[16] Second, Ashoka had embraced Buddhism and had visited numerous holy Buddhist sites in his whole life. The peacock is considered as the vehicle of Amitābha Buddha. Further, the Buddhist philosophy does not favourthe killing of animals. Then the question rises here is that why as a Buddhist, Ashoka consumed the flesh of peacock. In this context a logical assumption can be made.Ashoka likely consumed the flesh of peacock as a medicinal treatment. Charles Allenis of the opinion that Ashoka had a skin disease from his childhood.[17] Romila Thapar also states that the emperor had suffered from disease and his wife, Tishyaraksha helped to cure him.[18] However, regarding the health of Ashoka it is very difficult to confirm what particular disease he suffered from. But the emperor who had declared that one animal is not be fed to another, how could bein favour of killing peacock which had a glorious position in the Mauryan architecture and sculpture, and was also related with Buddhism. Therefore, we may consider that Ashoka took the flesh of peacock for healing of some particular diseases. It should be noted thatthe medical texts of ancient India also prescribe peacock's flesh as a remedy. Further, the popular belief that we have been seen in the narration of the MayūraJātaka that the flesh of peacock makes a human being immortal might be also responsible for the consumption of peacock's flesh by Ashoka. As a king who had set up numerous rock edicts indifferent parts of his kingdom even outside his dominion, and waslikely to become imperishable for many generations to come could have a superstitious belief in peacock's meat. Eminent Buddhist writer, Buddhaghosha also suggested the consuming of peacock's meat. He commented, "the flesh of the peafowl was considered a delicacy in Middle country''.[19] The middle country or the Madhyadesha was a tribal stronghold for a long time.Importantly, this faith still exists among the various tribes of India. The Rebari, the Banjara, the Bawaria and some clans of the Gond tribesmen consumed peacock as they believe it can cure all diseases.

There is no doubt that ancient India made remarkable progress in the field of medical science. Charaka Saṃhitā (book of Ayurveda) and Sushruta Saṃhitā (book of Surgery) are the two most important medical texts of ancient India. These two texts prescribe several regulations to

stay healthy, the process of making medicines, medicinal side effects, method of surgeries and healing, preparation of balanced diet etc. Both of these texts praise the peacock for its medicinal utility. The Bible of Indian Ayurveda, Charaka Saṃhitācites the following qualities of the flesh of peacock, "The flesh of the peacock is exceedingly beneficial for the eye, the ear, intelligence, the digestive fire, the consequences of age, complexion, voice and period of life."[20] Further, to prepare Aphrodisiac juice which is made for increasing of sexual pleasure, it has been prescribed to "cook the flesh of fowl in the meat juice of the peacock; and that of the peacock in the meat juice of the duck or the goose."[21] Moreover, in the treatment of 'Rakta-Pitta'[22] and 'constipation'[23] peacock's flesh is recommended by the Charaka Saṃhitā. For the treatment of asthma and cough, the Saṃhitā recommends, "the legs of the peacock reduced to ashes and mixed with ghee and honey."[24] However, Charaka Saṃhitā warns, "The flesh of the peacock, if taken with castor-oil and roasted on fire made of castor-oil plant, is capable of bringing about death the very day."[25] The Sushruta Saṃhitā also recommends the same.

Sushruta Saṃhitā refers to the various benefits of the flesh and feathers of the peacock. The text prescribes theash of the skin of peacock in the treatment of Slipada or Elephantiasis.[26] Further, in making of a perfect diet Sushruta Saṃhitā mentioned about the meat of the peacock. It enumerates, "A diet consisting of cooked Shashti grain (Tandula) or matured Sali rice, Mudga pulse as well as (the soup of the flesh of) an ena (a kind of black coloured deer), lava (a kind of bird), hare, peacock, tittiri, or dear, andsuch other light food should be given to a patient."[27] To prevent the effect of poison on the human body, this text advisesto take a soup made from the flesh of godha and peacock. In this contextthe Saṃhitā states that, "The flesh of a peacock should be similarly cooked and spiced with sugar."[28] Peacock's feathers also help to heal scorpion-bite. The text recommends, "…the compound made of the feathers of the tale of a cock or peacock, saindhava, oil and clarified butter pasted together and burnt is a speedy destroyer of scorpion-poison."[29] However, Sushruta warns that the meat of the peacock should not be consumed

during fever because of its heaviness as well as to its heat making potency.[30]

Tribal people always maintain a cordial relation with mother nature as they generally inhabited the hilly-forest region and principally depend on nature for their livelihood. They make use of the natural ingredients for various purposes. For medicinal treatment, several plants and animals are used by them. There are several usages of peacock in the tribal societies of the contemporary India. The tribal people use the different body parts of peacock for numerous medicinal purposes. In this context, the use of the peacock in medical treatment in tribal society may be divided into two separate categories i.e. use of various organs of peacock and magical beliefs about healing. In the first category feathers, legs, skin and fleshof the peacock are considered as medicine and the second category deals with the peacock's magical power of healing.

At first the use of the different organs of the peacock in tribal medicine will be analysed. A. Pandeyshows that the usage of peacock in tribal medicine is mainly popular in two ways all over India-peacock's leg is rubbed with water and this mixture is used for the cure of ear infection and rounded spot of feather mixed with jaggery used for the treatment of infertility.[31] The Rabari, a nomadic and camel herder tribe of Rajasthan uses the feathers of peacock in three different ways as medicine. They believe that the feathers mixed with honey can cure asthma, a mixture of coconut oil and ash of feathers provide relief from headache, and to get a male child one should take the feathers with a bowl of cow milk in morning for five days.[32] According to a report of the Times of India in 2011 the nomadic tribes of Rajasthan like Bawaria, Kanjar, Nat, Banjara, Santia believe that the flesh of the peacock provide power and heal ailments.[33] The Chenchu people of the hilly region of Nallamalai range of Andhra Pradesh make use of peacock for curing cold and cough, and vomiting. According to P. Hemalatha and B.V. Subba Reddy for the remedy of cold, "Generally turmeric water, after heating is given to the patient. If it is severe, a powder, prepared by burning and grinding the legs of peacock is given mixed with hot water to the patient."[34] They further states that for the treatment of vomiting "Powder prepared by grinding burnt feathers of peacock is given mixed with

honey."[35] A number of tribes of Tamil Nadu like Irular, Kota, Kattunayakan, Kota, Palliyan, Paniyan, Sholaga, Toda use the flesh and the feathers of peacock for medicinal purposes. Expect the Kanikaran tribal people, all the other tribes of Tamil Nadu consume the flesh of peacock for the treatment of contracted limbs.[36] Moreover, to cure hiccups, they preferto take the peacock's feather ash with the seeds of Piper longum and Cuminum cyminum.[37] Apart from this, the Kattunayakan people also practice a different kind of usage of peacock's feathers. The mixture of charred feathers and coconut oil is applied over the unwanted hair to get rid of it.[38]

Some Indian tribes believe that the peacock bears magical powerswhich can heal an ailment. In this case they do not consume the flesh or the feathers of peacock as food but the feathers are used in charm remedy. However, not only the tribes but also majority of the Indians believe that the feathers of peacock have magical powers. The Mori (derives its name from the peacock or mor) Clan of Bhil tribe consider the peacock as a sacred entity and worship this bird in jungle. The people of this clan believe that one should not set foot on the track of a peacock otherwise he will be a sufferer in near future.[39] Moreover, some clans or septs of the Bhil tribe believe that wind made by the feathers of peacock around the head of a patient heal the sickness caused by demons.[40] The Adiya tribe of Kerala believes in a supreme entity named Jogiyachan. In spite of being blind, deformed and disabled wandering ascetic, he is the source of extreme power. The Adiya people believe that Jogiyachan visits the house of a patient with fan made of feathers of peacock and a pipe in his hand, and cure the sufferer.[41] The Warli, an aboriginal tribe of Western India whoare the inhabits of Thane district of Maharashtra is associated with the peacock in some peculiar ways. The image of Hirvā, the God of this tribal group is tied with the feathers of peacock.[42] However, the peacock is not considered as a totem among any clans of this tribe and they generally consume the flesh of peacock without any hesitation. One of the good spirits named Yesu Gavila is depicted by a long broom, peacock's feathers tied on it, and preserve carefully at house.[43] During the celebration of Diwali, it is taken from one house to

another as the Warlis believe this will drive away the evil spirits which cause sickness and trouble for them.[44]

The usage of peacock's feathers and flesh in medicinal treatment is also popular in the mainstream culture of contemporary India. The Jats of Northern India believe that waving a bunch of peacock's feathers over a sick, frighten the demons of diseases.[45] In southern India most of the people consider that peacock's flesh has medicinal value. The state of Rajasthan is on the high alert as every year several peacocks are poached for flesh and feathers. The feathers of peacock are an essential ingredient in Ayurvedic as well as in other indigenous methods of treatment. Themedical shops of Kerala and Tamil Nadu have sufficient amount of peacock's feathers because of its high demand for the treatment of snake-bite.[46] The flesh and feathers of peacock are widely used in medicinal treatment in South India. Edgar Thurston states, "The fat of the peacock, which moves gracefully and easily, is supposed to cure stiff joints. Peacock's feathers are sold in the bazaar, and the brunt of ashes are used as a cure of vomiting."[47] However, not only in tribal society but majority of the Indians believe that making wind by fan made of peacock's feathers is beneficial for ailments. Apart from these, they keep feathers of peacock in their houses as they believe that it will bring good fortune.

To recapitulate, from the above discussion different usage of flesh and feathers of the peacock in tribal as well as in popular society has been found. At the beginning of this paper, it has been seen that the Maurya King Ashoka was fond of peacock's flesh despite peacock being the dynastical emblem or totem of the Mauryas. Now it is easy to understand that why Ashoka kept the flesh of this bird on his plate daily. The Charaka and Sushruta Saṃhitā describe several medicinal qualities of the peacock and interestingly in some cases of tribal society the utilization of peacock in medicinal treatment is identical with the description of these two medical texts. Because of numerous medicinal benefits the Rāmāyana,the Arthaśāstra and the Raghuvaṃśaalso mention about the upbringing of peacocks.The Indians used to consume the flesh of this magnificent bird for a long time. Probably, after the establishment of the Gupta rule and with the emergence of Brahmanical ideas peacock started to be depicted as the vehicle of Lord Kartiketya and therefore, the

consumption of the flesh of this bird was prohibited. The Manusmriti (XI.136) enumerates, "If he has killed a Hamsa, a Balaka, a Heron, a Peacock, a Monkey, a Falcon, or a Bhasa, he shall give a cow to a Brahmana."[48] Probably for the first time in Indian history,the peacock appeared as a protected bird during the Gupta period as several coins of this period contain the image of the peacock with the Kings and Goddesses. India is a land of diversity and in the context of peacock can find different opinions. We have already seen that some tribes kill peacock for medical purpose. However, there are a number of tribes which consider peacock to be sacred entity like Santhals, Khonds, Maria Gonds, Shabars, Minas etc. They do not kill this bird. However, in contemporary India because of some superstitious beliefs about the miracle of peacock's flesh and feathers in healing has endangered our National Bird. In this case the tribal people are not the problem as they know the sustainable usage of natural ingredients but the non-tribal people of India who have strong superstitions about the peacock's flesh and feathers are responsible for the decreasing number of this bird.

Foot Notes:

1. Asko Parpola, *The Roots of Hinduism*: *The Early Aryans and The Indus Civilization*, (New Delhi: Oxford University Press, 2015), 185-186.
2. D. D. Kosambi,*Myth and Reality: Studies in the Formation of Indian Culture,*(Mumbai: Popular Prakashan, 2005), 75.
3. Asko Parpola, *The Roots of Hinduism*: *The Early Aryans and The Indus Civilization*, 186.
4. T. H. Griffith, trans., *The Hymns of the Atharva Veda*, vol. ii, (Benares: E. J. Lazarus And Co., 1917), 94.
5. Patrick Olivelle, *King, Governance and Law in Ancient India:* Kauṭilya*'s*Arthaśāstra, (New York: Oxford University Press, 2013), 94.
6. Todd T. Lewis, *Popular Buddhist Texts from Nepal: Narratives and Rituals of Newar Buddhism*, (Albany: State University of New York, 2000), 148-149.

7. W. A. Crooke, *Religion and Folklore of Northern India*, vol. 2, (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1968), 45.
8. E. B. Cowell, *The Jataka or Stories of the Buddha's Former Births*, vol. 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 1895), 23-26.
9. E Hultzsch, *Corpus InscriptionumIndicarum: Inscriptions of Asoka*, (Oxford: Clarendon Press, 1925), 27-28.
10. Radhakumud Mookerji, *Asoka*, (London: Macmillan and Co., 1928), 62.
11. E Hultzsch, *Corpus InscriptionumIndicarum: Inscriptions of Asoka*, 151.
12. WendeyDoniger, *The Hindus: An Alternative History*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), 256.
13. Ibid., 257.
14. RadhakumudMookerji, *Asoka*, 106.
15. R. C. C. Fynes, trans., *Hemcandra: The Lives of Jain Elders*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), 156.
16. Narendranath Bhattacharya, *BharatiyaDharmer Itihas*, (History of Indian Religions), (Kolkata: General Printers and Publishers Pvt. Ltd., 2000), 6-7.
17. Charles Allen, *Ashoka: The Search for India's Lost Emperor*, (London: Little Brown Book, 2012), 190, 374-75.
18. Romila Thapar, *Ashoka and the Decline of the Mauryas*, (New Delhi: Oxford University Press, 2014), 67.
19. Richard Morris, ed.,*AnguttaraNikaya*,(London: The Pali Text Society, 1885), 143.
20. AbinashChandroKaviratna, ed.,*Charaka Samhita*, (Calcutta: D. C. Dass and Co., 1890), 341.
21. Ibid., 1077.
22. Ibid., 1156.
23. Ibid., 1391.
24. Ibid., 1534.
25. Ibid., 326.
26. Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, trans., The Sushruta Samhita, vol. II, (Calcutta: Published by the author, 1911), 434.
27. Ibid., 652.

28. Ibid., 683.
29. Ibid., 732.
30. Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, trans., The Sushruta Samhita, vol. III, (Calcutta: S. L. Bhaduri, 1916), 190.
31. A. Pandey, "*Use of Animal as Traditional Medicine in India,"*IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 1, no.3 (2015): 50.
32. Baishali Adak, "Wildlife campaigners warn peacock feathers, legs and fat are being used Rampantly in Indian Medicine, as the national birds go into decline", *Mail Online India*, March 7, 2017, https://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-4291536/Peacock-feathers-legs-fat-used-Indian-medicine.html,(accessed August 24, 2020).
33. Ajay Parmar, "Rajasthan earning notoriety for poaching peacocks", *The Times of India*, May 18, 2011, https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Rajasthan-earning-notoriety-for-poaching-peacocks/articleshow/8404366.cms, (accessed August 24, 2020).
34. P. Hemalatha, B.V. Subba Reddy, "*The Folk Medical Practices Among A Tribe of Andhra Pradesh,"* Bulletin of the Indian Institute of History of Medicine XII, (1981):40.
35. Ibid., 41.
36. A Solavan, R Paulmurugan, V Wilsanand, A J A Ranjith Sing, "*Traditional therapeutic uses of animals among tribal population of Tamil Nadu,"*Indian Journal of Traditional Knowledge 3, no. 2 (2004): 201.
37. Ibid., 201.
38. V. Amuthavalluvan, JeshurathnamDevarapalli, "*Indigenous Knowledge and Health Seeking Behavior Among Kattunayakan: A Tribe in Transition,"* Global Journal of Human Social Science 11, no. 6 (2011): 22.
39. J.G. Frazer, *Totemism and Exogamy: A Treatise on Certain Early Forms of Superstition and Society*,(London: Macmillan and Co., 1935), 220.

40. P. Thankappan Nair, "*Peacock Cult in Asia,*" Asian Folklore Studies 33, no.2 (1974):159.
41. Indu V. Menon, "*Gaddika: Ritual and Reality in the Culture of Adiya Tribe,*" International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 15, (2015): 31.
42. K. J. Save, *The Warlis,* (Bombay: Padma Publication Ltd.,), 55.
43. Ajay Dandekar, ed., *Mythos and Logos of the Warlis: A Tribal Worldview*, (New Delhi: Concept Publishing Company, 1998), 18.
44. Ibid., 18
45. W. A. Crooke, *Religion and Folklore of Northern India*, 250.
46. P. Thankappan Nair, "*Peacock Cult in Asia,*" 109.
47. Edgar Thurston, *Omens and Superstitions of Southern India,* (New York: Nast and Company, 1912), 88.
48. G Buhler, trans., *The Laws of Manu*, (Oxford: Clarendon Press, 1886), 458.

The Muslim Women and the Vernacular Education System in Pre-British Bengal

Runa Shyamal
Ph.D. Research Scholar, Department of History,
Diamond Harbour Women's University, West Bengal.

Abstract : *For the last few decades, the researchers are showing more interest about Indian women. They want to know about the condition of Indian women in the ancient past for making comparisons with the contemporary period. Most of the Indian and non-Indian scholars have done excellent work on the condition of Hindu women during the different historical periods. Over the last few years, a group of historians like Romila Thapar, Sukumari Bhattacharya, Uma Chakravarty inspired by feminist thoughts and ideas have tried to reconstruct the position of Hindu women in the ancient times particularly in the Vedic and the later Vedic age. But unfortunately, scholarly writing about the Indian Muslim women is very limited as most of the Indian historians were interested only in the political activities of the Muslim rulers. Some of them have also tried to portray how the Islamic way of life destroyed the tradition of the so-called Hindu India. Some historians have also shown that how the Islamic invasion in India was responsible for the miserable condition of the Hindu women. However, Sonia Nishat Amin, Maleka Begum, Mahua Sarkar, Muhammad Abdullah al Masum, Anowar Hossain have made important contribution to explore the condition of Muslim women of Bengal mainly in the colonial and the postcolonial period. In this paper an attempt has been made to analyse the position of the Muslim women of Bengal and their participation in the educational sectors during the pre-British era.*

Keywords: *Islam, Women, Education, Bengal, Hindus.*

Discussion

Islam had originated in the Arabian Peninsula and primarily it was propagated in the Central Asian regions like the modern countries of Iraq, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan and many others. Therefore, to study the

impact of Islam in the Indian sub-continent we have to go through the features of Islamic ideas outside India. For a long period, the dignity of Muslim women in the Islamic countries of Central Asia was not satisfactory. However, Islam talks about the equal rights of men and women and the equal right of education without any gender discrimination. It is said that Hazrat Muhammad, the founder of Islam emphasized the importance of education. He said that if one had to gain knowledge, he must to go as far as China.[1] He also said that it is the responsibility of both men and women to get educated. Muhammad believed that good education is the most valuable gift for the children by their parent.[2] Fatima Zohra, the daughter of Prophet and Aiyasha, his dearest wife was some of the celebrated educated women of that time.[3] Further, the first verse of the Holy Quran considers reading and writing as the sources of knowledge.[4] Therefore, the significance of education in the Islamic perspective is very clear.

During the early period of Islam, the women were respected in the Arabian countries. They used to possess land. They also paid tax and played a crucial role in the battlefield. Zubaidah, the wife of Caliph Harun al-Rashid of Baghdad helped her husband to conduct the administration.[5] There are a number of references of women of the Abbasid Caliphate who had played a significant role in politics. Some scholars argue that during the early period of Islam, women had the right to attend in the prayers at the mosques with their partners.[6] The women of Arab had also patronized the establishment of many schools of Islamic theology, science and religious discourse and they even conducted these institutions. Fatema, an eminent female scholar of Baghdad was the head of a monastery around 714 Hijri.[7] The male and female students together acquired education in these institutions.

The seventh century was a very crucial period in the context of Indian history as for the first time India encountered the Islamic way of life. The Sindh expedition by the Arabs paved the way for the introduction of the Islamic culture in the Indian sub-continent. Islamic

ideas were not merely political in nature but it was also a new way of thinking or philosophy which had a long-lasting impact on Indian traditions and still the impact is being felt. Eminent historian Ranabir Chakraborty argues that with the coming of Islam to India new areas of possibility were opened, especially in the area of trade where the contact between Central Asia and India was strengthened.[8] Actually, the striking characteristics of Islam impressed the Indians in the sectors of religion, literature, philosophy, science, arts, architecture and they started a journey towards a new phase of history.

Bengal as well as the eastern region of India came under a rapid process of Islamisation during the 13th century through the conquest of Muhammad bin Bakhtiyar Khalji. Actually, Islam came into Bengal comparatively later than the other regions of India. Islam entered this region both by the land and the sea route. The Turkish invaders came by land to conquer this region and the Arabian merchants came by water ways and both of them introduced to the Bengali society a new way of life. Bengal saw the supremacy of different Muslim groups like Turks, Sayyids, Abyssinians, Afghans and Mughals. The Muslim society of Bengal gradually expanded with the initiatives of the Muslim rulers, the ulamas, the Sufi saints and the religious leaders. However, it was a long process. The Islamic society of Bengal is composite in nature as it comprises the immigrant foreign Muslims and the converted local people.Islam had played a crucial role in shaping the cultural identity of Bengal and the role of the Muslim women is also significant in this perspective. However, the contribution of these women was neglected for a long time in historical studies. Mojlum Khan quoted, ‘they often worked from behind the scenes, and for this reason their efforts have remained unrecorded and unacknowledged.’[9]

The information about the position of the Muslim women of Bengal during the early period of the establishment of the Muslim rule is not sufficient. The Ming Chinese ambassador to Bengal around 1415 C.E. states that the men and women worked in the fields together and they also participated in weaving.[10] The description by Abul Fazal confirms that

during the Mughal period neither veiling nor the seclusion of the women had come into effect in Bengal. Talking about the Bengal in general, Abul Fazal records that 'men and women for the most part go naked wearing only a cloth about the loins.[11] The chief public transactions fall to the lot of the women.' The Portuguese traveller, Duarte Barbosa's account is an important historical source to portray the social status of Muslim women in Bengal. Besides this, his account is helpful to reconstruct the trading and political activities of medieval Bengal. According to Barbosa, 'the women generally observed seclusion and they kept them carefully shut up'.[12] In the words of him, 'everyone has three or four wives or as many as he can maintain and they are well treated by their husband.'[13] However, there are some contradictions in the account of Barbosa as he pointed out that generally the women were under the veil but this was not the social or moral rule in general. He also talks about the actresses and the dancing girls were who used to well-dressed and wore valuable ornaments.[14] There is no doubt that these two types of girls were the medium of entertainment both for the royal and the common people and they did not observe the custom of seclusion because of their profession.

Medieval Bengal had a glorious tradition of Nawabs rule and the Islamic culture flourished under their patronage. The Nawabs of Murshidabad in Bengal were great patrons of education. Nawab Murshid Quli Khan increased the amount of stipend for the learned men and the religious scholars. He himself supervised the standard of the educational institutions of Murshidabad.[15] Nawab Alivardi Khan was also enthusiastic for spreading knowledge. He often made arrangements for scholarly discussion with the noble men in his court. Jayer Hussain Khan, Taki Quli Khan, Mir Muhamad Ali Fazil, Ali Ibrahim were some enlightened men of Alivardi's court.[16]Alivardi had great respect for women especially for the widows. The daughter and women of the family of Shamshir Khan, the rebellious Afghan chief of Darbhanga were well treated by Alivardi Khan.[17]. We have the reference of a number of Hindu

learned women like Rani Bhavani of Natore, the wife of Jasovanta Raya of Nasirpur, a daughter of Rasoraja of Nadia during his times.[18] However, the participation of Muslim women in the educational sector during his rule is still vague. According to Kalikinkar Datta, who has done an excellent research on Alivardi Khan's reign, 'Most probably the education of girls was more a matter of private than public concern.'[19] Therefore, it can be said that probably the Muhammadan women of the upper-class families received education privately.

Nawab Nawajis Mohammad of Murshidabad established a madrasa and a mosque near Motijhil palace.[20] Nawab Siraj ud-Daulah was also interested in religious education. He usually did not have any gender biasness in this perspective. Therefore, he established 'Madina Bhavan' in the middle of the Imambara for imparting religious education both to the boys and girls on the particular day of Muharram and other cultural functions for the pilgrimage.[21] However, there is no clear reference of any madrasa only for women in Bengal like Giyasuddin Khalji of Malwa who had built a madrasa exclusively for the female students.[22] However, Ibn Battuta talks about some madrasas of Bengal where girls got the chance to become educated. During the rule of the Nawabs the Muslim education system was developed with the patronage of the state and other well-off Muslims. There were numerous Maqtabs and Madrashas for the Muslim students during this time.

Maqtabs were exclusively for the Muslim boys whereas girls might be enrolled in madrashas but they usually had to study separately from the male students. A painting of Miftahul Fuzala contains a scene of a madrasa where boys and girls are depicted learning together with their teacher.[23] However, there is not adequate information about the girls in educational institution during the Muslim rule in India as well the Nawabi rule in Bengal. Like the noble women of the Sultanate and the Mughal periods, the women of the Nawab's family of Bengal also played a crucial role in the arena of administration, politics, literature and education. Ghaseti Begum, the oldest daughter of Alivardi Khan conspired to dethrone Siraj ud-Daulah, the last sovereign Muslim ruler of

Bengal. Zinat un-Nisa, the daughter and Nasira Banu the wife of Murshid Quli Khan played important role in politics.[24] Begum Lal Bibi, the wife of the feudal lord, Asaduzzaman Khan of Birbhum also played prominent role in politics.[25] She was popularly known as 'Second Nur Jahan'.[26]

The state also actively promoted the construction of madrasas. Alauddin Husain Shah, the famous Sultan of Hussain Shahi dynasty ordered a madrasa to be built near the Firuzpur mosque of Maldah.[27] According to Abdul Karim, 'the madrasa and maqtabs were generally built by the side of the mosques or mosques were invariably built in the Madrasas'.[28] In almost every Muslim dominated village of Bengal, there were this type of Islamic learning centers. For instance, Asadulla, a Muslim zamindar of the district of Birbhum donated his income for the purpose of education.[29] This type of traditional Muslim learning institutions mainly offered courses of Islamic law and religious science like the Quran, the Hadith, the Tafsir and the Fiqh. Some of these institutions also taught literary and historical works like 'Pandnameh', 'Amednameh', 'Gulistan', 'Joseph and Juleikha', writings of Abul Fazal etc.[30] Arabic and Persian were the two languages which were taught in these institutions. Therefore, it can be said that, the mosques, the madrasas and the maqtabs had played a very important role in the growth of Islamic ideas and culture in Bengal.

Briefly describing, the education system of the Muslim women before the establishment of the British rule in Bengal, was purely private in nature. This system of education is generally known as the zenana type of education. In this system, the older women of the family taught the youngers the Quran, the Hadis and moral values. Sutapa Dutta shows, "Etymologically 'zenana', a Persian word, meant both women (the word for men is 'mardana') and the inner sanctum of a house where women resided.

Haji Muhammad Muhsin, an eminent Muslim philanthropist of Bengal is popularly known today but his half-sister Maryam Khanum or Mannujan Khanum is rarely known. Mannujan's father, Aga Mutahar

was of Persian origin who had settled in the Hugli district and had received a huge land grants from the Mughal emperor Aurangzeb in different parts of Bengal like Jessore, Nadia, Murshidabad.[31] So Mannujan was from an influential upper-class Muslim family and if we look into her educational life then the whole scenario of Muslim women's education will become understandable. Mannujan's father had arranged a private tutor for her education at an early stage. She was taught Arabic, Persian, Quranic verses and traditional Islamic science. She also played the Sitar quite well.[32] However, when his half-brother went to Murshidabad for pursuing higher-education, Mannujan chose to stay at home.[33] Therefore, it should be noted that the Muslim women were allowed to acquire education within the walls of the house but there was no arrangement of higher education for them.

Indigenous vernacular system of education was prominent in Bengal during the Pre-British era both among the Hindus and the Muslims. *tols* were the traditional Hindu learning centers. Nabadwip of Nadia district became a famous center of Sanskrit learning and there were a number of tols imparting education to the Hindus. Raja Krishna Chandra of Nabadwip and Rani Bhavani of Rajshahi gave huge patronage for the maintenance of tols. Like the Hindus, the wealthy Muslims also came forward for the educational development of their own society. The Muslim zamindars established a large number of maqtabs and madrasas for imparting Islamic education. In the year of 1298, a madrasa was established during the reign of Sultan Rukn al-Din Kaykaus at Triveni and another one was built during the reign of Shams al-Din Firuz Shah at the same place in the year 1313.[34] These two examples show that the officers of the Muslim rulers of Bengal were quite enthusiastic in expanding the Islamic educational system.

Besides tols, maqtabs and madrasas there was also another type of educational institution, known as pathasala. Pathasala was secular in nature whereas the three other educational institutions had religious affiliations. The tols were mainly conducted by the Brahmana pandits and the maqtabs and madrasas were mainly conducted by the Islamic

religious preachers. According to the observations by Francis Buchanan Hamilton, usually primary education was given to the Hindu and Muslim students in the pathasala.[35] William Adams noted that Muslim scholars and students were present with the Hindu teachers and students in the same pathasala.[36] In the book 'Jessore Khulnar Itihas', Satish Chandra Mitra states that the Muslims became efficient pathasala teachers by the end of the Pathan era.[37] However, the children from the lower caste families and female students were not allowed to attain education in these learning centers.

In the religious texts of Islam there is no discrimination between men and women with regard to education. However, in practical life women were considered subordinate to men among the Muslims of India as well as the Muslims of Bengal. 'What Bengal thinks today India thinks it tomorrow', a popular proverb of British India was not correct at all in the context of women's liberation. Like the other parts of India, Bengal too had an inglorious history of suppression of women's right. There is no doubt that with the coming of the Brahmanical ideas to Bengal the position of women in the society became inferior to men. Islam had the great opportunity to eradicate the discrimination against women but in spite of preaching universal brotherhood and equality as a part of its religious philosophy, Islam failed to uplift the dignity of women.

Both the Hindus and the Muslims were not interested to educate women. The women of the wealthy families were lucky to get the opportunity to access limited education within the boundaries of the house. Surprisingly, there were many examples of women both from the Hindu and the Muslim community who patronized the establishment of educational institution. But these institutions were mainly for the upper-class families. They did not show any interest in the upliftment of the common women. The Muslim zamindars who eagerly promoted the development of Islamic education were also not concerned about women. In fact, religious taboos and social prejudices were the main factors behind the insouciance to women's education. Amir Khusrau, the eminent poet and scholar of the Sultanate period believed that the veil or

the purdah is the best ornament for women and it should be religiously observed.[38] He categorizes the Sar-aweza or the veil in the list of the 'Shola Singhar' or the sixteen way of ornamentation of the ladies just like the Hindu women.[39] If a renowned scholar like Khusrau held this type of view regarding women then it is very easy to understand the mentality of the majority people and for this, the importance of women's education was neglected for a long period. According to B. Kuppuswamy for more than two thousand years there was practically no education for women in India.[40]

The majority of the Muslims of present-day Bengal were converted from the lower caste Hindus. However, after gaining a new religious and social identity in Islam they willingly followed the discriminatory practices of Hinduism without any hesitation. Jagadish Narayan Sarkar states in his book, 'Islam in Bengal' (Thirteen to Nineteenth Century), that the Muslims of Bengal were influenced by the caste system of the Hindus and they also adopted it in a different form.[41] 'The Rise of Islam and Bengal Frontier 1204-1760' by Richard Eaton discusses the divisions among the Muslims in Bengal Turks, Afghans, Mughals and Pathans formed the Ashraf or the aristocratic class of the Muslim community. The rest of the Muslim community belonged to the Ajlaf or the Atraf class which was mainly formed by the converted lower caste Hindus. The non -Ashraf Muslims were mainly peasants, weavers, tailors, lace-makers, blacksmiths by profession. There were many barriers like the Hindus between these two groups of the Islamic community in Bengal. For instance, intermarriage between these two groups was strictly prohibited during the medieval period.

There was a belief among the Hindus that if a girl is taught to read and write, she will become a widow after her marriage. Therefore, women's education was discouraged in general. The neighboring Muslims also believed this superstition. The majority of the Muslims of Bengal were merely Muslim by their religious identity but in social life they proudly followed the inhuman customs of the neighboring Hindus. For this, they preferred to keep their women under many restrictions.

Actually, Islam was not able to bring any qualitative change in the traditional social structure of the Indian sub-continent. Primarily, the Arab traders were not concerned about the spread of Islam, they were mainly concerned about trading activities. Later, the Turks, Afghans and Mughals came to India with a dream of establishing Islamic rule but they were not interested to interfere in the traditional social structure of India. Therefore, with the expansion of Islamic ideas in India a lot of people embraced Islam but they still followed many stereotyped practices which were not suitable with the Islamic way of life. Actually, most of the Muslim dynasties were immigrants to India and for this, they had taken the policy of non-interference in the customs and traditions of the common people because the rulers were afraid of loosing their political authority over the people. Therefore, with the change of time and with the change of ruling dynasties the social status of women still remained unchanged.

Literally, in a society of absolute male dominance and superiority, education of women was equally neglected by both the Hindus and the Muslims. The zenana system of education for the Muslim women was not satisfactory as it was mainly related to religious studies. However, the Islamic philosophy permits women to become educated but the ulamas and the maulavis, the preachers of Islam, consciously gave false explanations of the religious scriptures to maintain their patriarchal authority. For this, in zenana system of education a woman was mainly taught to be obedient to her husband and the main purpose of this education was to produce ideal women for their male partners. It was probably a portrayal of the Hindu belief which considered a woman to be the responsibility of her father in her childhood, her husband in her youth and her son in her old age[42] and she was expected only to maintain an orderly household. Therefore, the education system for the Muslim women in the pre-British era in India was nothing in comparison to Cairo, Baghdad and Damascus. These were the renowned Islamic learning centers and there were many special institutions for female education. Actually, the Muslim dominated West and Central Asian countries had a

well-established system of women's education but in the Indian context women's education had no particular form and there was no centralized authority for controlling it.

There were two main factors which created a great barrier for women to become educated i.e., Purdah or the veil system and early marriage. The purdah system or the seclusion of women was a great obstacle both for the Hindu and Muslim women. The main purpose of the purdah was to keep women away from public gaze and this humiliating system prevented women from being educated. Besides this, purdah was a dominant symbol of the patriarchal social structure and this was forcefully imposed on women to maintain their chastity. Due to this custom, women were usually not allowed to come out of their house and for this, they had no choice but to accept the private or the zenana system of education. According to Maleka Begum and Sayid Ajijul Haq, 'the tradition of purdah was a big obstacle for the Muslim girls in becoming educated in the madrasa like the boys'.[43] The elderly ladies usually played the role of teachers in this system[44] and they were also forced to observe purdah in their youth.

Early marriage of the girl child was another evil practice prevalent in the history of India. Early marriage of a girl denies her the basic right to health, nutrition, education and it results in exploitation, deprivation and abuse. Before the advent of Islam in India early marriage of the girl child was popularly practiced among the Hindus. There was a general belief in the Indian society that a girl should be married before the age of puberty. Probably, the average age of marriage was nine or ten in general. According to the Manusmriti, a man of twenty-four year, shall marry a maiden of eight year.[45] The Mahabharata considers that a thirty years old man should marry a girl of ten year and a man of twenty-one year should wed a seven years old girl.[46] However, the tradition of early marriage continued during the Muhammadan rule in India. The descriptions of various foreign travellers contain a dismal picture of early marriages in Medieval India. Edward Terry, Johannes De Laet, NiccolaoManucci, Jean De Thevenot and others reported that usually the girls were married at a very early age. Mannuci has talked about a girl of Sindh who gave

birth to a son at the age of nine.[47] According to Thevenot generally the age of marriage was four or five.[48]

By the opinion of Muhammad Abdur Rahim, generally the education of the Muslim girls was restricted to a secondary stage and there was no particular system of education for the girls in madrasa.[49] He also stated that 'co-education was not favoured after the primary stage.'[50] Undoubtedly, education was limited to the women of the upper-class Muslims as it was not possible for the common Muslims to educate their daughters because of high cost. Maleka Begum and Ajijul Haq show that due to severe poverty large numbers of Muslim women of the common families were deprived of education.[51] Like the purdah, education was also regarded to be a luxury by them. Because of a lot of limitations education for the upper-class Muslim girls was also unsatisfactory. It is quite clear that the Muslim women of Bengal did not attain that degree of education like the Muslim women of Cairo, Baghdad, Istanbul, Persia and Spain. Moreover, their education was mainly limited to the Islamic religious discourses. Religious education is needed but education excluding natural science, rationalism, pragmatism was valueless.

Footnotes:

1. S.M. Jaffar, *Education in Muslim India*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 2009), 36.
2. Ibid., 145.
3. Aliya Hasan, "*Socio-Cultural Role of Muslim Women During the Sultanate Period*" PhD thesis., Aligarh Muslim University, Department of Islamic Studies, 2009, 59.
4. Ibid., 59.
5. Anwar Hossain, *Sadhinata Sangrame Banglar Muslim Nari*, (Calcutta: Progotishil Publishers, 2009), 14.
6. Ziya UsSalam, *Women in Masjid: A Quest for Justice*, (New Delhi: Bloomsbury Publishers, 2019), 19.
7. Ibid., 15.

8. Ranabir Chakravarti, *Prachin Bharater Orthonoitik Itihaser Sandhanane*, (Kolkata: Ananda Publishers, 2013), 205.
9. Muhammad Mojlun Khan, *The Muslim Heritage of Bengal: The Ladies, Thoughts and Achievements of Muslim Scholars, Writers and Reformers of Bangladesh and West Bengal*, (Leicestershire: Kube Publishing Ltd., 2013) 62.
10. Richard Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, (California: University of California Press, 1996), 298.
11. H.S. Jarrett, trans., *The Ain I Akbari*, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1891), Vol. II, 122.
12. M.L. Dames, tans., *The Book of Duarte Barbosa*, (London: The Hakluyt Society, 1921), Vol. II, 147-148.
13. Ibid., 148.
14. Ibid., 148.
15. Abdul Karim, Murshid Quli Khan and His Times, (Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1963), 238.
16. Emili Rumi, *"Muslim Education in Murshidabad, a Bengal District during 1704-1947: A Review,"* International Journal of Management and Social Sciences 11, No. 3, (2018): 129.
17. Kalikinkar Datta, *Alivardi and His Times*, (Calcutta: University of Calcutta, 1939), 141, 170.
18. Ibid., 243.
19. Ibid., 243-244.
20. Sushil Chowdhury, *Nababi Amale Murshidabad*, (Calcutta: Ananda Publishers, 2005), 140.
21. Ibid., 140.
22. S.M. Ziauddin Alam, *Muslim Educational Thought in the Middle Ages*, (New Delhi: Atlantic Publishers, 1988), 8.
23. Angbin Yasmin, *"'Middle Class' Women in Mughal India,"* Proceedings of the Indian History Congress 75, (2014): 297.
24. Sushil Chowdhury, *Trade, Politics and Society: The Indian Milieu in the Early Modern Era*, (Abingdon: Routledge, 2017), 246.
25. Atis Dasgupta, *"The Fakir and Sannyasi Rebellion,"* Social Scientist 10, No. 1, (1982): 48.

26. Maleka Begum and Sayyid Ajijul Haque, *Ami Nari: Tinsho Bochorer (18-20 shotok) Bangal iNarir Itihas,*(Dacca: Dacca University Press Ltd., 2001), 13.
27. Ibid., 43.
28. Ibid., 44.
29. Poromesh Acharya, *"Indigenous Vernacular Education in Pre-British Era: Traditions and Problems,"*Economic and Political Weekly 13, No. 48, (1978): 1981.
30. Ibid., 1981.
31. Muhammad Mojlun Khan, *The Muslim Heritage of Bengal: The Ladies, Thoughts and Achievements of Muslim Scholars, Writers and Reformers of Bangladesh and West Bengal,* 67.
32. Ibid., 68.
33. Ibid., 68.
34. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)*, (Dacca: Paramount Press, 1959), 42.
35. Ibid., 1983.
36. J. Long, *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Behar*, (Calcutta: Home Secretariat Press, 1868), 24, 26, 28.
37. Satish Chandra Mitra, *Jessore Khulnar Itihas*, (Calcutta: Chatterjee and Chakraborty Co., 1321), 456.
38. Rukhsana Iftikar and Muhammad Sohail, *"Historical Review of Medieval Feminism in South Asia: Amir Khusrau's Work,"* South Asian Studies 31, No. 2, (2016): 495.
39. Ibid., 495.
40. B. Kuppuswamy, *Social Change in India*, (Delhi: Vikash Publishing, 1975), 246.
41. J.N. Sarkar, *Islam in Bengal (Thirteenth to Nineteenth Century),* (Calcutta: Ratna Prakashan, 1972), 41-43.
42. G. Buhler, trans., *The Laws of Manu*, (Oxford: Clarendon Press, 1886), 328.
43. Maleka Begum, Sayyid Ajijul Haque, *Ami Nari: Tinsho Bochorer (18-20 shotok) Bangali Narir Itihas,* 14.
44. Ibid., 14.

45. G Buhler (trans.), *The Laws of Manu*, 344.
46. Kisari Mohan Ganguli, trans., *The Mahabharata: Anusasana Parva,* (Calcutta: Bharata Press, 1888), 18.
47. William Irvine, trans., *Storia Do Mogor of NiccolaoManucci*, (London: John Murray, 1907), Vol. I, 201.
48. Surendranath Sen, ed., *Indian Travels of Thevenot and Careri*, (New Delhi: The National Archives of India, 1949), 248.
49. Ibid., 68.
50. Ibid., 68.
51. Maleka Begum, Sayyid Ajijul Haque, *Ami Nari: Tinsho Bochorer (18-20 shotok) Bangali Narir Itihas,* 14.

Ancient Indian Drama and Dramaturgy as gleaned from Sanskrit literature

Rajesh Biswas
Assistant Professor in History
East Calcutta Girls' College, Lake Town

ABSTRACT : *The paper aims to illustrate the different stages of the history of Indian drama in ancient period. When we see that the intellectual achievements in Indian thought ranged throughout its literary history from the Vedas, the Upanishads down to the various scriptural, philosophical, scientific, technical and artistic sources, we find immense interest in dramatic exposures. The dramatic presentations of the Indian Sanskrit dramas written by different ancient playwrights of this country testify the popularity of dramatic performances and their spectacular presentations during the early period of Indian society. Though there is controversy about the foreign and Indian origin of the dramas here it has been tried to make a study of dramaturgy and drama along with the origin within arrow line of time.*

Key Words : *Drama, Artistic, Nāṭyaśāstra, Nartakas, Lokadharmi, Sanskrit, Paurāṇikas, Swapnavāsavadattām, Mudrarākshaka, Mṛiccchhakaṭikam, Dasarūpakas, Aṅka*

Ancient Indian Sanskrit literature gives ample evidence to the popularity of drama among the early inhabitants of India. In fact, when we see that the intellectual achievements in Indian thought ranged throughout its literary history from the Vedas, the Upanishads down to the various scriptural, philosophical, scientific, technical and artistic sources, we find immense interest in dramatic exposures. There are two different views among the scholars as to when Indian drama originated. One group of scholars opines that it was with the influence of the Greek[1] dramas that Indian dramas were created. But some others look into the Indian origin of dramatic performances. Be that as it may in this paper we have tried to make a study of the history along with the origin of Indian Sanskrit dramas and dramaturgy from ancient Sanskrit literature.

It is found that every artistic endeavor of a given culture of the ancient period had a religious origin. It was also the same with dramatic performances. It developed out of performances related to some aspects of religion. As time passed on, the religious performances gradually assumed a regular dramatic spectacle and the range of aspects treated were extended beyond the religious subjects. The earliest beginnings of Indian dramatic art may be traced back to the hymns and dialogues of the Vedas which have a certain dramatic character. It is believed that the four constituents of Indian drama – text or plot, music, production or acting and *rasa* (sentiment) were originally taken from the four Vedas – *Rik, Sām, Yadu* and *Atharva* respectively. The ritualistic practices in the celebrated *Asvamedha* sacrifice would show that in the earliest stage of the practice a *Brahmana* and a *Kshatriya* lute-player used to sing poetries composed by themselves in honor of the king and the Hotṛi used to relate a 'revolving legend' in a ten days' cycle all the year round. Scholar like Winternitz[2] pointed out that germs of later literature could be traced out of these recitals. Most interestingly the compositions were all in verses with the purpose of singing or reciting before the audience. Moreover the practice of dramatic performance may be traced in the dialogues between the priests and the queen with her attendants during the sacrifice when the horse was killed.[3]

The First Book[4] and the last book of the *Rāmāyaṇa* speak vividly of the *Aśvamedha* sacrifices of the kings Daśaratha and Rāma respectively. Interestingly it is found that during this festivity the guests were entertained by the performances of music and dance by *Naṭas* and *Nartakas*. The Seventh Book of the *Rāmāyaṇa*[5] while describing Rāma's performance of the *Aśvamedha* on the banks of the *Gomati* River near the *Naimisha* forest states that there were experts in different branches of Sanskrit literature like the *pauranikas* (stalwarts of *Purāṇas*), grammarians, experts in prosody and poetics, dance and music, those quick in understanding even things passing in one's mind, even those well versed in logic, Veda, Vedānta, Jyotisha, polity as well as visual art who participated in the celebration. Interestingly it is found that in the midst of an assemblage of scholars and experts in various aspects of literary art that we find the two sons of Rāma recite the Rāmāyaṇa

composed by Vālmikī during the leisure in between the sacrificial acts (*karmāntara*). Thus it is seen that the system of recitation of ākhyāṇas was very much popular during the period of the Rāmāyaṇa when the sons of Rāma moved round among the guests and their quarters reciting the great epic. In the *Veda* also we find the cyclic *pariplava ākhyāṇa* being narrated. The background of the *Mahābhārata* also is a great *Sattra*. All the *Purāṇas* were, according to their own statement, narrated to the congregations at the long-session of *Sattra*s in the Naimisha forest.

In the description of the *Rājasūya* presented by Vyāsa a few more details and a more graphic portrait of the scholars at the keen debates they carried on during the intermission in the sacrifice are found. The guests staying in the pavilions, not only witnessed dances and music but also were entertained with narrations of stories.[6] That dramatic performances were very popular among the people is attested by the story of Bharata, when he was dejected, being entertained by the performance of comic plays (naṭakaṇi..hā̄syakaṇi)[7] by his friends. Performance of actors formed a part of the celebration of Rāma's consecration[8]. It appears that actors were in the retinue of the kings or princes.[9] Reference to female actors (*śailashī*) is also made.[10]

Before the establishment of proper drama, i.e., drama which consists of every components of dramatic art and stage-craft which come across in the *Nāṭyaśāstra* of Bharatamuni we thus find that there were several dramatic performances through dance and music along with recitation of ancient chronicles. We have seen references to *nāṭaka* (drama) in the *Rā̄māyaṇa* and the *Mahābhārata*. The song and music and dances of the Krishṇa legends further enriched this tradition of drama.

Incidentally we may refer to the excavated stadium at Dholavira, Gujarat, yielding several rooms with masks and beads taken to be used by the artists in the Harappan period.[11] The ancient playhouse excavated at the Khandagiri caves in Odisha belonging to 3rd-2nd century BCE proves the continuity of performances of dramatic activities in ancient India.

The early Buddhist literature gives us some evidence of the existence of such performances. The Pāli *Suttas* dated to the 5th to 3nd century BCE refer to troupes of actors, who performed dramas on a stage along with dancers and singers.

It thus appears that the tradition of acting definitely developed before the *Nāṭyaśāstra,* which gave it a special shape to be followed in the later periods. It is generally held that Bharata's *Nāṭyaśāstra* (2nd century BCE), also known as *Nāṭyaveda* or the fifth *Veda*, is the first documented classical manual which primarily aims at describing the theory and practice of Indian drama and theatre. The topic is covered under the dynamics of *nāṭya* (dramatic art or acting). According to him one who performs *nāṭya* is *naṭa* (actor) and accordingly the form is known as *nāṭaka.* Dealing with the origin of *nāṭyaveda* (science of dramatic performances) Bharata gives a comprehensive account of theatre. He describes three kinds of theatres or playhouses – *vikrishṭa* (oblong), *chaturāśra* (square) and *tryaśra* (triangular), each having three parts – *nepathya* (dressing room), *raṅgapīṭha* (the stage) and *raṅgamaṇḍala* (the auditorium). According to Bharata a theatre with moderate size could accommodate 400 spectators. Some of the stages were two storied, the upper storey being for the representation of action in the celestial sphere and the ground storey for that in the terrestrial sphere.

A great deal of knowledge about dramatic, musical and dance performances along with the social custom of the period may be gathered from the *Nāṭyaśāstra* ascribed to Bharata *muṇi.* This treatise is said to be the most complete work on dramaturgy in ancient India. We find references to acting, dance, music, dramatic construction, architecture, costumes, make-up, props, organization of companies, audiences, competitions, even mythological account of the origin of theatre.[12] Divided into thirty-six chapters the treatise appears to be a large compendium of dramaturgy with all the characteristic features of a successful drama. It appears that Drama or theatrical performances were done under the patronage of royalties and it was directed by a *sūtradhara*[13] or stage manager who could also act in the play. The performers had to go through rigorous training in vocal and physical training.[14] Female performers were encouraged along with male. Interestingly there are evidences of certain sentiments which were suited for female performers only. The *Nāṭyaśāstra* puts great emphasis on acting (*abhinaya)* which consisted of two variety – *lokadharmī* or

realistic and *nātyadharmī* or conventional. The story and its performance should have consisted of *bhāva* (the mood or emotion of the performing artist) and *rasa* the distillation of *bhāva*. This theory of *rasa* as described by Bharatamuṇi happens to have great influence on the visual and performing arts of India throughout the centuries till date.

In order to display the subtlest interplay of emotions he elaborated four kinds of *abhinaya*, namely, *aṅgikābhinaya* (non-verbal expression or acting by the movement of different parts of the body), *vāchikābhinaya* (acting through dialogues), *ahāryābhinaya* (materials needed for the performance like costume, colours stage decoration, etc.) and *sattvikābhinaya* (expression through gestures like presence of tears, mark of horripilation, change of facial colour, trembling of lips, enhancing of nostrils which speak of the deepest emotions of a character).

According to the author a dramatic presentation is designed to impart pleasure (*harsha*) to the people who are unhappy, tired, bereaved and ascetic. The ten major forms of a drama (*Dasarūpakas*) as enumerated by Bharata are as follows.

Nāṭaka, prakarana, samavkara, dima, vyayoga, ihamṛiga, *uśrishṭikanka, prahasana, bhana* and *vithi*. These formed the structure of the dramatic plot revolving around the *nāyakas* (heroes) and *nāyikas* (heroines). Incidentally it may be stated that the plays were to be a comedy in nature.

Basing on the framework of the *Nāṭyaśāstra* we get a number of playwrights in ancient India, who dealt with the social environments of the period of the time frame, on which their plays are written.

One of the earliest Sanskrit drama 'The *Mṛiccchhakatikam*' (the Little Clay Cart) was composed by Sūdraka, dated in the 2nd century BCE. It features the love affairs of a young Chārudatta and a famous courtesan Vasantasena. Full of romance, sex, royal intrigues, comedy mingled with several twists and turns the play attracts people all over the present world.

It may not be out of place to mention here that proper drama seems to have been established by Aśvaghosha[15], the court poet of the Kushāṇa king Kanishka (1st/2nd century C.E.). All of his plays follow the dramatic art as formulated in the *Nāṭyaśāstra.* Interestingly some of his plays

consisted of nine acts. The characters of high ranking person spoke in Sanskrit and used both prose and verses. The *vidusaka* or jester and other lower ranking people, however, used Prākrit. One interesting feature of Aśvaghosha's plays was that the benediction uttered at the close of the play was the Buddha instead of the hero which was an essential feature for a drama as explained in the *Nāṭyaśāstra.* Thus we find some innovation in his plays. Moreover the appearance and conversation of allegorical figures like *buddhi* (wisdom), *kīrti* (fame) and *dhṛiti* (firmness) are also special characteristic of Aśvaghosha's dramas, which are found to have been adopted in later plays.

After Aśvaghosha another playwright Bhāsa (3rd/4th century CE) is considered as one of the great dramatists of India,[16] second only to the famous Kālidāsa. Thirteen of his plays were discovered through manuscripts from an old library in Thiruvantapura in 1913. The themes of all the thirteen plays of Bhāsa are mostly taken from the stories of *Rāmāyaṇa* and *Mahābhārata.* His most famous plays, however, are *Swapnavāsavadattām*, *Pāñcharātra* and *Pratijñā Yaugandharāyaanam.* Interestingly Bhāsa's plays sometimes contain physical violence, which was against the rigid rules of the *Nāṭyaśāstra.* Plays like *Urubhaṅga* and *Karṇabharaṇa* are the only known tragedies in ancient dramas. Bhāsa's plays are still popular in South India in the dramatic performance of *kuṭiyaṭṭam*[17], the only surviving form of Sanskrit drama.

Kālidāsa, the greatest dramatist of the Gupta period, however, followed the principles laid down by Bharata. His plays open with the benedictory stanzas (*nandī* as enumerated by Bharata). The plot was well divided into acts (*aṅka*). The heroes were mostly from the royalty. It is interesting to note that for the educated person Kālidāsa selected Sanskrit as the language and for the general uneducated people Prāķrit. He is known to have written three plays, *Mālavikāgnimitram, Vikramorvasī* and *Abhijñānaśakuntalam.* The last one is commonly known as Sakuntala.

The next important Sanskrit playwright appears to be Bhavabhūti who emerged in the latter half of the classical period. He is credited to have written *Mahāvīracharita*, *Mālatimādhava* and *Uttararāmacharita.* The last one datable to 700 CE is known as the best dramatic play of its time.

To this group belong the three dramas namely, *Priyadarṣīka*, *Nāgananda* and *Ratnavāli*, written by Harshavardhana, the king of Sthānesvara and Kāṇyakubja, who ruled between 606 to 648CE. His scholarship is well known through the writings of his court poet Bāna Bhaṭṭa and the Chinese traveler Hśuan Tsang.

We may mention another Sanskrit play *Mudrārākshaka*, by Viśākhadatta, which contained political intrigues and life, action and sustained interest during the life time of Chandragupta Maurya.[18] The composition, is dated around 800 CE.

The Sanskrit plays were undoubtedly meant to be enacted. Elaborate directions were given as well as rules for seating the audience. The plays commenced with an elaborate ritual. Some twenty pre-play ceremonies (purvaraṅga) of music and dance were performed, nine of them behind the curtain. The sūtrdhara – the director, chief actor or stage manager – clad in immaculate white, entered with his two assistants and offered worship (pūjā) to the theatre's presiding deity to ensure success to the producer and good luck to the actors. After this the Sūtradhara summons the leading actress and opened the play with a prologue which announced the time and place of the play and introduced the playwright. The plays had five to seven aṅkas (acta). An aṅka involves a change in the hero's basic situation as the *itivritta* (plot) develops. It is made up of a series of incidents that are related to the major character.

The basic plot in most Sanskrit plays centered around the hero who struggled fpr the object of his desire. There were five *abasthās* (stages): *ārambha* (beginning), *yātrā* (effort), *pratyāsa* (prospect of success), *niyatāpti* (certainty of success) and *phalāgama* (attainment of the object). The five stages were intimately related to the hero's mental stages and were milestones in his march towards his attainment of the object. These plays dealt with the exploits of the hero, either a royal sage or king, who was always successful in the end. The dominant sentiment was love and heroism. The germ (*bīja*) of the play as well as the prominent point (*bindu*) was always there to relate every Act of the play. The hero either appeared in every *anka* or to be mentioned there.[19] An Act was not to present too many incidents[20] and such subsidiary events which were relevant for the story could be reported in an introductory scene. Even

short explanatory scenes could be put in before an Act (aṅka) to clarify the events occurring in it.[21] "All these, not only helped the ply to produce a unity of impression but also imparted to its plot a rapidity of movement which is essential for any kind of successful dramatic presentation."[22]

There was a strong lyric element and poetry which seems to be the integral part of life, full of meaning and significance. Dance and music played a prominent role in these dramas. It is interesting to mention that in the *Harivaṁśa* (datable to c. 200 CE) we come across an expression *nāṭakam nanrituh* meaning they danced a play. Similarly the *Karpūramañjarī* (dated in the 1000 CE) has an expression *sattakam nachchidavvam* meaning a *Sattaka* is to be danced or acted.

From these descriptions it is clear that Sanskrit drama was very popular in ancient India. Question may arises as to who made drama so popular. Was it for the performers or the strong dialogues written by the playwrights or the sponsoring authority like the royalty? It is quite acceptable that the author was the main instrument in a drama, but it was the performers who enacted the roles of the hero, heroine, etc. Ironically there is nothing written about them, but we find control from the authority as found in the *Arthaśāstra*.

Notes & references:

1. Believed to come into being in the 5th century BCE. Keith, A.B, *The Sanskrit Drama in Its Origin, Development, Theory & Practice*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 1992, pp. 57-68.
2. Winternitz, M., *A History of Indian Literature*: Introduction, Veda, Epics, Puranas and Tantras, Vol. I, Calcutta, University of Calcutta, 1927, p.272.
3. Bhattacharyya, N.N., *Ancient Indian Rituals and Their Social Contents,* Delhi, Manohar Book Service, 1975, p.24.
4. *The Rāmāyaṇa*, I. 13.14; Krishnacharya, T.R. & Venkobacharya, T. K., (eds.), *Valmiki Ramayana,* 2 vols. Kumbhakonam, Hindi Prachar Press, 1929-1930.

5. *The Ramayana*, VII, 91-93; cf. Krishnacharya, T.R. & Venkobacharya, T.K. (eds.), *Valmiki Ramayana,* 2 vols. Kumbhakonam, Hindi Prachar Press, 1929-1930.
6. *kathayantah kathā bahvih*, II.33.49, Gorakhpur edition.
7. *The North-Western Recension of the Ramayana* II, 75, 4.
8. *Ibid*., 8, 14.
9. *Ibid*., 94, 27; On the *Bombay Edition of the Ramayana* VII, 64,3.
10. *The North-Western Recension of the Ramayana, op.cit*., 33,8.
11. Bisht, R.S., Recently Excavated Harappan site Dholavira, *JÑĀNA PRAVĀHA*, Bulletin No.10, 2006 -2007, p. 79-98.
12. Richmond, F., 'India', in Banham, Martin, (ed.), *The Cambridge Guide to Theatre*, Cambridge: Cambridge UP, 1998, p.517.
13. Literally meaning holder of the strings or threads who could work as a puppeteer to make the actors move at his finger tips.
14. Richmond, *op. cit*., p. 518.
15. Goodwin, R.E., *The Play world of Sanskrit Drama,* Introduction, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers 1998, p. xviii.
16. Keith, A,B., *op. cit.,* p. 91ff.
17. *Kutiyattam* was traditionally a part of temple rituals, performed as a kind of visual sacrifice to the deity. It is normally performed in temple theatres that are decorated with exquisite carvings. Conventional in its make-up, costume as well as form, it is an elaborate blend of symbolic gestures, stylized movements and chanted dialogue and verse in Sanskrit, Prakrit and Malayalam.
18. Macdonell, A.A., *A history of Sanskrit Literature, New York, D. Appleton And Company,* 1900, p. 365.

19. Natyasastra, XX, 15, 30; cf. Ghosh, M.M., *The Natyasastra ascribed to Bharata-munu*, Work no. 272, Issue No. 1559, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1951.
20. Ibid., XX. 24.
21. Ibid., XXI. 106-111.
22. Cf. Ghosh, M.M. , *The Natyasastra, A treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics ascribed to Bharatamuni,* Volume I, Calcutta, The Royal Asiatic Society of Bengal, 1950, p. xlv.

The Role of Grandparents on Child Education in Sundarban

Soumen Patra
M.Phil Scholar, Ramakrishna Mission Shiksanamandira
Belur Math, Howrah

Abstract: *Grandparents are a valuable agent of child education. The main aim of this study is to know the role of the grandparents on their grandchildren education in Sundarban. In this paper researcher has been analyzed the influence and presence of grandparents on their children's education within family environment. The researcher has been used survey method for the conducted his study. He has used purposive sampling for the data collection. He has also been used interview schedule and percentage analysis as some important tools for conducted his study. He found that the three important roles of grandparents i.e. caregiver, playmate and historian have strong contribution on the personal life of their grandchildren. On the other hand another three role of grandparents i.e.guider, teacher and role model have a few contribution on the personal life of their grandchildren. He also found that 50 percent children have achieved high and medium academic performance due to well guide by the grandparents.*

Key words: *Grandparent, Grandchildren, Child education, hidden teacher.*

Introduction: The Sundarban is one of the largest mangrove forest in the world. It is located in the Bay of Bengal on the delta of Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers. The Sundarban covers the part of North and South 24 pargana's of West Bengal. Total area of Sundarban is 9630 square km. The Sundarban contain 120 island of which only 54 island are inhabited by about 4.5 million people (2011 census). The literacy rate of the people in the Sundarban region is 25.71% compared to whole west Bengal 76.26% (2011). So, literacy rate of Sundarban is comparatively low than the other regions of West Bengal. For this reason, we see that the many organisations are trying to improve education of Sundarban

region i.e. Sundarban foundation, Sabuj Sangha, Self Organized Learning Environment (SOLE), Kishalay foundation etc.(Mukharjee 2021).

The word grandparents are associated with a lot of love, fun, joy and other memorable feelings. Grandparents not only loves us but they also helps us to walk in the right path and direction in our life journey by their ruling and valuable decision at the right time. So grandparents are an important factor of our life. Grandparents are more helpful agent of our earlier life and specially our earlier education. Grandparents are second teacher of a child just after child's parent. Parents are also highlighted for their child education but grandparents are not highlighted for their grandchild education. So grandparents are hidden teacher of a children in our society. At present they are invaluable member in a family as well as our society. So their presence is invaluable in the life of a child at that digital period.

Jawaharlal Nehru said that every child is like buds in the garden and need carefully nurture them as a tree, because they are future citizens of our country. So we need to special care about child education for development of our society as well as our country. A child play an important role for success of a nation and education play a vital role to the optimum performance of a child. In a word, a society and a nation achieves it's development depend upon child education and their successful performance. For this, Indian government has continued various kinds of schemes for development of child education i.e. Sarva Shiksa Aviyan (SSA) , Mid Day Meal, Right to Act 2009 , Universalisation of Elementary Education (UEE) etc. Unfortunately, these govt. Schemes are not completely active in all part of India. As similarly, this schemes are not completely active in Sundarban due to physical barrier and others reason. So, child education is comparatively low in Sundarban region.

Education of a children depends on school environment as well as home environment. Teacher play a vital role in child education in school environment. Other hand, family members play an important role in their child education at home environment. Parent and grandparent both are important agent of their children education at home enviornment. We know that parents are taken mejor and primary responsibility to their

children education. But we don't know that grandparents are taken as a role of hidden teacher on their grandchildren education.

Emargence of the Problem: Child education is more important for their individual, emotional, cognitive, physical, social and cultural development. Not only, child education helps to build a solid and pure life of a person. Hence, we need to nurture them with more care and responsibility for our future citizen.

Education of children is a vital component in a person life, because it enhances child's behaviour, skills, attitude and personality in their life. We needs educated children to build more professionals, efficiency, scientists, and entrepreneurs of tomorrow to contribute for our economic development. So, we can say that development of a region depend upon child's education. As the same reason, child education is more important for the development of Sundarban region.

We know that teacher, peer and parent are three important agent of child education. These three agent are highlighted every time and ever where like newspaper, television, magazine, article and journal at that time. But grandparents are taken a vital role for their grandchildren education. So, grandparent is another important agent of child education. But they are not highlighted in our society at the present time. For this, present study want to highlight to the contribution of grandparent upon their children education.

Present researcher found several studies about the child education i.e.role of parent in children education, parent involvement in successful education, role of grandparent on personality development of a person, parental involvement in their child's academic achievement, parenting styles, grandparenting styles etc. But he has not been found sufficient studies about the role of grandparents on child education in Sundarban.

Statement of the Problem: The work of the present study is to know the role of Grandparents on their children education in Sundarban Area. Hence, it is stated as**"The Role of Grandparents on Child Education in Sundarban. "**

Literature review:

Boshkova, G., Shastina, E.,& Shatunova, O.(2018) conducted a study titled " The Role of Grandparents in the Child's Personality Formation." They have described a valuable concept of ' family reading'. They have analyzed the child's personality and culture can be improved by the involved of their grandparents. They found that most of the children can be used successfully in the family reading.

Ceka, A.,& Murati, R.(2016) conducted a study on " The Role of Parents in the Education of Children." They analysed the involvement of the parent on their child's education in the family environment. They found that family has enormous responsibility on children's education, habit, culture, moral values, physical development, mental development etc.

Durisik, M.,& Bunijevac, M.(2017) in their article " Parental Involvement as an Important Factor for Successful Education."analyzed that the positive effect of parental involvement on successful education of a child. They have described six factors of parental involvement i.e. parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making and collaboration.

Martinez, A.(2015) in his study " Parental Involvement and it's Affects on Student Academic Achievement" has described about different types of parent involvement in school activities such as parent teacher association, parent teacher conference, open houses, back-to-school nights, volunteering at school etc.

Patel, S.,& Shukul, M. (2015) in their article " Presence of Grandparents in Families: A Blessing for Grand Children " showed that the grandparents and their grandchildren are sharing a special and strong bond especially within join families. They found that interpersonal communication can be strengthened between grandparents and their family members.

Sapungan, G. M.,& Sapungan, R. M. (2014) in their article " Parental Involvement in Child's Education: Importance, Barriers and Benefits " described the importance, barriers and benefits of parental involvement in their child's education. They found that parents

involvement in their children's education offers many opportunities for academic success.

Smith, J. V.(2006) in his article " Praental Involvement in Education Among Low Income Family: A Case Study " showed the parental involvement in low income families at public school in North Pacific region. He found that the development and improvements of paranting involvement has positive impact on the all levels of education.

Objectives:

1. To know the presence of grandparents within their family.
2. To know the role of grandparents on the personal life of their grandchildren.
3. To know the role of grandparents on academic performance of their grandchildren.
4. To know the role of grandparents on co-curriculum activities of their grandchildren.

Methodology:

Research Design: The present study has been conducted by the survey method under the qualitative research.

Population: Population of the present study is all grandparents and their grandchildren of Sundarban region.

Sampling: The present researcher has been used purposive sampling technique for the data collection.

Data collection: The present study is to be depend on two types of data source,one is primary data i.e. field survey in 50 grandparents as well as 50 grandchildren of Sundarban region and another is secondary data i.e. online journals, articles, books, websites and official document which has been collected by the present researcher.

Selection of Tools: The researcher has been used the following tools for the present study - a) An interview schedule for grandparents b) An interview schedule for grandchildren and c) Percentage analysis.

Procedure of Data Collection: Primarily, two individuals interview schedule has been prepared as per the objectives of the present study and given to the experts for correction. After then, corrected interview schedules has been used for data collection from the selected study areas.

Results and Discussion: The researcher has tried to data analysis on the basis of all objective of his study refering from the source of different types of primary data.

Table-1: Presence of the Grandparents within family

SL no	Different types of grandparents	Presence of grandparents	
		Response	Percentage
1	Formal	30	60
2	Remote / Detached	11	22
3	Involved	4	8
4	Advisor	3	6
5	Surrogate	2	4

The above table-1 shows the presence of the different types of grandparents within their family in Sundarban. In the table, we saw that the five different types of grandparents are mentioned. In these types of grandparents, formal grandparents are 60 percent, detached grandparents are 22 percent, involved grandparents are 8 percent, advisor grandparents are 6 percent and surrogate grandparents are 4 percent within their family in Sundarban region.

Table-2: Role of grandparents on the personal life of grandchildren

Sl no	Roles of Grandparents	Personal life of grandchildren			
		Yes		No	
		Response	Percentage	Response	Percentage
1	Historian	35	70	15	30
2	Caregiver	45	90	5	10
3	Guider / Mentor	19	38	31	62
4	Teacher	14	28	34	68
5	Playmate	37	74	13	26
6	Role model	15	30	35	70

The table-2 explore the different types of role of grandparents on the personal life of their grandchildren in Sundarban. From the above table, we can say that 70 percent grandparents are historian, 90 percent

grandparents are caregiver, 38 percent grandparents are guider or mentor, 28 percent grandparents are as a teacher, 74 percent grandparents are playmate and 30 percent grandparents are role model of personal life of their grandchildren. So, we saw that the three important roles of grandparents i.e. caregiver, playmate and historian have strong contribution on the personal life of their grandchildren. On the other hand remaining three role of grandparents i.e.guider, teacher and role model have a few contribution on the personal life of their grandchildren.

Table-3: Role of grandparents on the academic performance of children

SL no	Roles of Grandparents	Academic Performance of children					
		High		Medium		Low	
		No	%	No	%	No	%
1	Historian	-	-	3	6	1	2
2	Caregiver	7	14	2	4	-	-
3	Guider	10	20	16	32	-	-
4	Teacher	1	2	1	2	-	-
5	Playmate	-	-	4	8	1	2
6	Role model	-	-	3	6	1	2
Total		18	36	29	58	3	6

The table-3 shows the role of grandparents on the academic performance of their grandchildren in Sundarban. From the above table we found that, 36 percent children have obtained high academic performance due to three important role of grandparents i.e. guider, caregiver and teacher. On the other hand 6 percent children have achieved low academic performance due to three role of grandparents i.e. historian, playmate and role model. Remaining 58 percent children have achieved medium academic performance due to all six type of role of grandparents. From the above table it is found that more than 50 percent children have achieved high and medium academic performance due to well guide by the grandparents. On the other hand we found that only 4 percent children have got to their grandparents as a well teacher.

Table-4: Role of grandparents on the co-curriculum activities of children

Sl no.	Cocurriculum activities of grandchildren	Role of grandparent		
		Responses	Number	Percentage
1	Cocurriculum activities	Yes	33	66
		No	17	34

The above table-4 shows the role of grandparents on the cocurriculum activities of their grandchildren in Sundarban. From the above table,we can say that the 66 percent grandparents have positive role on the cocurriculum activities of their grandchildren. On the other hand, only 34 percent grandparents have not any kind of role on the cocurriculum activities of their grandchildren.

Major Findings: From the above discussion the researcher has been obtained some important finding. These findings are mentioned below -

1. Only 60 percent grandparents are living with their family. On the other hand 22 percent grandparents are detached from their family members due to several reasons i.e. their son and daughter leave their birthplace for higher studies and services and after settled there, better job opportunities etc.
2. Only 8 percent grandparents are actively involved with their family and 6 percent grandparents are well advisor of any kind of situation of their family.
3. Only 4 percent grandparents are as a surrogate parent of their grandchildren due to several reasons i.e. death of child's parent, child's parent are migrant labour, divorce etc.
4. Different types of role of grandparents are more important for build of personal life of grandchildren. Only 90 percent grandparents are caregiver, 74 percent grandparents are playmate and 70 percent grandparents are historian for well build of the personal life of their grandchildren in Sundarban.
5. On the other hand, another three role of grandparents i.e.guider, teacher and role model have a few contribution on the personal life of their grandchildren in Sundarban.

6. Only 36 percent children have obtained high academic performance due to three important role of grandparents i.e. guider, caregiver and teacher.

7. On the other hand only 6 percent children have achieved low academic performance due to three role of grandparents i.e. historian, playmate and role model.

8. Only 58 percent children have achieved medium academic performance due to all six type of role of grandparents i.e historian, caregiver, guider, teacher, playmate and role model.

9. Moreover 50 percent children have achieved high and medium academic performance due to well guide by the grandparents. On the other hand only 4 percent children have got to their grandparents as a well teacher.

10.Only 66 percent grandparents have positive role on the cocurriculum activities of their grandchildren. On the other hand, 34 percent grandparents have not any kind of role on the cocurriculum activities of their grandchildren.

Conclusion: At last, the following conclusion has been drawn from the analysis of the present study particularly from the data analysis. Grandparents are a vital members of our family and their presence are more important in our daily life. More of the grandparents are living with their jion family in Sundarban. The three important roles of grandparents i.e. caregiver, playmate and historian have strong contribution on the personal life of their grandchildren in Sundaram. Moreover 50 percent children have achieved high and medium academic performance due to well guide by the grandparents. So, we can say that academic performance of children is controlled by the well guider of grandparents in Sundarban region.

References:

1. Banerjee, A. (1998). Environment, Population and Human Settlements of Sundarban(1st Edition),Concept Publishing Company,New Delhi, ISSN : 81-7022-739-9.

2. Boshkova, G., Shastina, E.,& Shatunova, O.(2018).The Role of Grandparents in the Child's Personality Formation, *Journal of Social Studies Education Research, 9*(2), 283-294, www.jsser.org
3. Ceka, A.,& Murati, R. (2016). The Role of Parents in the Education of Children, *Journal of Education and Practice, 7*(5), 61-64, ISSN: 2222-1735, www.iiste.org
4. Durisik, M.,& Bunijevac, M.(2017) Parental Involvement as an Important Factor for Successful Education, *C.E.P.S Journal, 7*(3), 137-153.
5. Martinez, A. (2015). Parental Involvement and it's Affects on Student Academic Achievement, *CSUN Student work* , www.core.ac.uk
6. Mondal, B. K. (2014) Spatial Exploration of the Literacy Intensity of Sundaram, *Original Scientific Paper, 65*(1), 107-120, DOI: 10.2298/IJGI 1501107M, www.ebscohost.com
7. Mukharjee, A. (2021). Improving Education in the Sundarban, The Borgen Project, 266 in pearl st.info @borgenproject.org.
8. Patel, S.,& Shukul, M. (2015) Presence of Grandparents in Families: A Blessing for Grand Children, *Remarking, ll*(V), 36-39, P:ISSN NO: 2394-0344, E: ISSN NO: 2455-0817.
9. Sapungan, G. M.,& Sapungan, R. M. (2014). Parental Involvement in Child's Education: Importance, Barriers and Benefits, *Asian Journal of Management Sciences and Education, 3*(2), 42-48, ISSN: 2186-8441, www.ajmse.leena-luna.co.jp
10. Smith, J. V.(2006). Praental Involvement in Education Among Low Income Family: A Case Study, *The School Community Journal, 16*(1), 43-56, ISSN: 1059-3DBX.
11. Vediyappan, V. (2020). The Sundarbans Society and Culture from Amitav Ghosh's Hungry Tide, *Mukta Shane Journal, IX*(IV), ISSN NO : 2347-3150.

Impact of Covid-19 on Sports and Games

Susanta Sarkar
Associate Professor, Department of Physical Education,
University of Kalyani.

Abstracts: *Corona virus 2019[COVOD19] is a communicable disease that transmitted to one person to another person.COVID19 became a global pandemic. Due to which public life of all over the world has come to a standstill, lockdown has been announced across the country. All kinds of rallies have been postponed. Due to covid situation, the doors of all tournaments, swimming pool, IPL, T20 Cup, National\international games, and sports around the world are close and all in all, the 2020 Tokyo Olympic postponed. It has a negative impact on the world and sports economy. Covid19 pandemic have a very bad effect on professional athletics. It had the greatest impact on their physical, mental, and spiritual health. So, they maintain their physical fitness most importantly in pandemic situation.*

Kyewords: *Communicable Disease, Covid19, Pandemic, Lockdown, Economy.*

Introduction:

Corona virus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2), which was first detected in December 2019 in the city of Wuhan, China. Currently, this pandemic has infected more than 15 million people in nearly 210 countries around the world resulting in nearly 600,000 deaths. The foremost damage of the virus is on human health, conceivably this dramatic change in human lifestyle. The global economic condition was badly affected by the COVID19 pandemic such as sports industry. Already Second Wave has struck India. India has a huge populated country. The first case of COVID-19 in India, which originated from China, was reported on 30 January 2020. As of 23 May 2021, India has the second-highest number of confirmed cases in the world (after the US) with 26.7 million reported cases of COVID-19 infection and the third-highest number of COVID-19 deaths at 307, 231 deaths.

Lockdown, i.e., home confinement as a measure to mitigate disease outbreak but can affect physical and mental well-being, sometimes drastically. This communicable disease the world in 2 has been affecting the world since 20 to middle portion of 2021.WHO recommended that social distancing and man to man should be discouraged to control the transmission. The COVID-19 pandemic has caused the most significant disruption to the worldwide sporting calendar since World War II. Across the world and to varying degrees, sports events have been cancelled, cricket tournaments, all athletic meet, Hocky world championship, football tournament have been cancelled and 2020 Summer Olympics was postponed. 2020 Tokyo Olympic were rescheduled to 2021. Spectators have no games to watch and players no games to play in this pandemic situation.

Therefore, the present article aims to perform an integrative review of the literature relating the impact of COVID19 on sports and games in pandemic situation.

Material and Methods:

We carried out systemic online search from databases with 'COVID19' and 'Coronavirus' as the keywords. The articles were taken mainly from PubMed, PMC, Embase, Cochrane library, Google Scholar, MEDLINE, UpToDate, and Web of Science databases. The publication ranged maximum from a period of 2020 to 2021.

Impact of Covid19 on Cricket:

Covid19 pandemic have negative effect in our lifestyle, sports and game. This pandemic situation also the potential cancellation of the World T20 tournament in India. The cancellation of the IPL will cost the BCCI, the tournament's broadcasters and the franchises at least Rs 3,000 crore. Then there's the television deal with Star Sports with the board potentially having to return Rs 1,500 crore. that is the negative impact on socio economic condition.

On 17 March, the Gaelic Athletic Association (GAA) confirmed the 2020 All-Ireland Senior Football Championship that had been postponed due to covid pandemic.2020 to 2021aprox every sports, game, tournament was cancelled in world that have negative effect on the players mental and physical health and fitness.

Impact of covid19 on football:

Covid19 have positive impact on football industry. This causes many worlds cup champion ship, and tournament has been postponed such as the FIFA U-17 Women's World Cup to be held in India in November 2020, has been indefinitely postponed. Another hand India's remaining World Cup qualifiers have been postponed. Although FIFA has said that new dates will be identified at a more suitable time.

The Indian Super League (ISL) final was held in an empty stadium in Goa on 14th march that is the biggest socio economical loss of football industry. Atlantic University Sport, Canada and Ontario University Athletics (OUA) all announced that fall semester competition would be cancelled for 2020 season, including football. Almost 216 countries around the world the world are suffering from the same problem.

Impact of covid19 0n 2020 Olympic:

WHO announces that covid19 is a pandemic and communicable disease that transmitted to one person to another person. Tokyo government was postponed 2020 summer Olympic for covid pandemic. Olympic games Tokyo 2020 began on Friday, 23th July 2021 to maintain every protocols and end on Sunday, 8th august 2021. It is also reporting that the winter Olympics will be closed until 2022.

Impact of covid19 on athletics and many others games and tournament:

World athletic championship, commonwealth games are held on 2022. But World indoor championships, the Doha Diamond League (in Qatar on April 17), The Asian championships (Tashkent), International Hockey tournament have postponed. The 2020 Arctic Winter Games, summer world university games, 2021 World Masters Games are cancel.

Badminton World Federation tournaments were suspended due to coronavirus concerns. The 20–21 FIS Cross-Country World Cup second rounds will be stopped.

Canada, Ireland, Philippine, United Kingdom, United States, such as every country cancels their every game, tournament, championship and university competition has been postponed until 2021 for pandemic situation.

Impact of covid19 on the business of sports:

Covid19 have a negative impact of sports business. Primarily 3 revenue sources for a live sports event that is (a) broadcasting revenue; (b) advertising and sponsorship revenue; and (c) match day revenue i.e. ticket sales. Some tournament will be held behind closed doors such as in empty stadiums and quiet atmospheres; however, the pandemic brought the sporting world to a standstill. But all sports and games live telecasts are off in this covid situation. It is the biggest loss of sports industry.

Another study conducted by KPMG, the aggregate value of a player in the top 10 European football leagues decreased by 6.6 billion Euros or 17.7%, due to the matches of the 2019-20 season being played behind closed doors after the leagues resumed for covid19.

Many of the sports sponsorships were cut due to the economic downturn of the 2020.

Effect of covid19 on athletic health:

Covid19 pandemic have a very bad effect on professional athletics. It had the greatest impact on their mental health. Some repost said that, Professional athletes are less affected by the COVID than the compared to general people but such an adverse event of the coronavirus pandemic made professional athletes especially vulnerable to mental illness with possible implications for general health. Indeed, research report concluded that athletes are reaching out for mental health support, highlighting pressure of boredom and stress related to social isolation they are forced to endure. Generally, there was a high prevalence of mental health issues and psychosocial challenges among professional athletes during the corona virus pandemic. It has shown that professional athletes are not immune to this and negatively affected. The isolation from their team, reduce activity, lack of coach guidance, lack of social support has caused emotional distress in athletes.

Other study reports that as professional players are affecting their physical, psychological and personal fitness due to lockdown situation. COVID19 pandemic condition peoples are maintain their social distancing and social isolation that causes they developed psychological and mental disorder such as acute stress disorder, exhaustion, detachment from others, insomnia, poor concentration, fear, and anxiety, lack of

physical fitness. Overall, it is suggested that corona virus directly or, with associated conditions like quarantine-induced mental and psychological disorders, can damage or impact the CNS negatively. These effects can be seen above the performance of athletics.

Against this condition, WHO can recommend that 30 m. exercise every day such as dancing, upstairs, running in small spaces, doing yoga, doing stretching exercises etc. Which maintain our physical fitness and helps to alleviate a lot of mental stress.

Conclusion:

All evidence suggests that, COVID-19 has been brought in a wave of challenges for sports sector. While almost every sport, games, tournaments, at list 2020 Tokyo Olympic has been cancelled or postponed. Just as it has affected the physical, mental, and spiritual fitness of athletes, the world economy has plummeted in this pandemic situation. On the other hand, who are managing the online games have benefited a lot. We don't know when the world will return to its own rhythm. We don't know when all the doors will be open for entertainment.

So, at last comparing all the evidence in this study we can conclude that-game, sports and activity are mostly important in our daily life for entertainment. Anything activity can do maintain an athlete fitness such as Zumba dance, Aerobics, walk up down the stairs, yoga, stretching exercise, cardiac exercise, running in short place etc. That keeping every day is good for our body, mind, and sprite during this stress full time. And more physical activity can improve sleep which can also important for good health.

From my personal view I can said that there will be heat in the earth and we have to move on with it. It is to be hoped that once all the dose of vaccine are completed, the world will slowly return to own rhythm and the doors of all games and sports will be opened.

References:

1. Dowlati Y, Herrmann N, Swardfager W, et al. A meta-analysis of cytokines in major depression. Biol Psychiatr. 2010;67(5):446–457. https://doi.org/10.1016/ j.biopsych.2009.09.033

2. "India most infected by Covid-19 among Asian countries, leaves Turkey behind". Hindustan Times. 29 May 2020. Retrieved 30 May 2020.
3. 9. Bhattacharya, Amit (24 May 2021). "India's Covid toll tops 3 lakh, 50,000 deaths in 12 days". The Times of India. Retrieved 24 May 2021.
4. 10. "India's COVID crisis 'beyond heartbreaking': WHO". www.aljazeera.com. Retrieved 26 April 2021
5. 11.Altena E, Baglioni C, Espie CA, Ellis J, Gavriloff D, Holzinger B, Schlarb A, Frase L, Jernelöv S, Riemann D. 2020. Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID-19 outbreak: practical recommendations from a task force of the European CBT-I academy. J Sleep Res. e13052. doi:10.1111/jsr.1305
6. 12.Hamming I, Timens W, Bulthuis ML, Lely AT, Navis G, van Goor H. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. J Pathol. 2004;203:631–7. doi: 10.1002/path.1570.
7. Jain A. COVID-19 and lung pathology. Indian J Pathol Microbiol. 2020;63(2):171-172. doi: 10.4103/IJPM.IJPM_280_20.
8. Zhang H, Zhou P, Wei Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Histopathologic Changes and SARS-CoV-2 Immunostaining in the Lung of a Patient With COVID-19. Ann Intern Med 2020;172;629-632. doi:10.7326/M20-0533.
9. Copin MC, Parmentier E, Duburcq T, Poissy J, Mathieu D. Lille COVID-19 ICU and Anatomopathology Group, Time to consider histologic pattern of lung injury to treat critically ill patients with COVID-19 infection. Intensive Care Med. 2020;46:1124-1126.doi:10.1007/s00134-020-06057-8.
10. Beasley MB, Franks TJ, Galvin JR, Gochuico B, Travis WD. Acute fibrinous and organizing pneumonia: a histological pattern of lung injury and possible variant of diffuse alveolar damage. Arch Pathol Lab Med. 2002;126:1064-1070. doi: 10.1043/0003-9985(2002)1262.0.CO;2.

11. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054–1062. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
12. Vassilakopoulos T, Petrof BJ. Ventilator-induced diaphragmatic dysfunction. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169(3):336–341. https://doi.org/10.1164/ rccm.200304-489CP.
13. McKenzie DC. Respiratory physiology: adaptations to high-level exercise. Br J Sports Med. 2012;46(6):381–384. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090824.
14. 14.Powers SK, Bomkamp M, Ozdemir M, et al. Mechanisms of exercise-induced preconditioning in skeletal muscles. Redox Biol. 2020:101462. https://doi.org/ 10.1016/j.redox.2020.101462.
15. Morton AB, Smuder AJ, Wiggs MP, et al. Increased SOD2 in the diaphragm contributes to exercise-induced protection against ventilator-induced diaphragm dysfunction. Redox Biol. 2019;20:402–413. https://doi.org/10.1016/ j.redox.2018.10.005
16. 16.Smuder AJ, Morton AB, Hall SE, et al. Effects of exercise preconditioning and HSP72 on diaphragm muscle function during mechanical ventilation. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10(4):767–781. https://doi.org/10.1002/jcsm.12427.
17. Sollanek KJ, Burniston JG, Kavazis AN, et al. Global proteome changes in the rat diaphragm induced by endurance exercise training. PloS One. 2017;12(1), e0171007. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171007.
18. Powers SK, Hudson MB, Nelson WB, et al. Mitochondria-targeted antioxidants protect against mechanical ventilation-induced diaphragm weakness. Crit Care Me
19. Mandsager K, Harb S, Cremer P, et al. Association of cardiorespiratory fitness with long-term mortality among adults undergoing exercise treadmill testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6), e183605. https://doi.org/10.1001/ jamanetworkopen.2018.3605
20. Lee IM, Shiroma EJ, Kamada M, et al. Association of step volume and intensity with all-cause mortality in older women. JAMA Int

Med. 2019;179(8):1105. https:// doi.org/10.1001/ jamanetworkopen.2018.3605.

21. Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, et al. Cardiac involvement in a patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020. https://doi.org/ 10.1001/jamacardio.2020.1096. Published online March 27.
22. Yang C, Jin Z.An acute respiratory infection runs into the most common noncommunicable epidemic—COVID-19 and cardiovascular diseases. JAMA Cardiol. 2020. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.0934. Published online March 25.
23. Sribhutorn A, Phrommintikul A, Wongcharoen W, et al. The modification effect of influenza vaccine on prognostic indicators for cardiovascular events after acute coronary syndrome: observations from an influenza vaccination trial. Cardiol Res Pract. 2016;2016:4097471. https://doi.org/10.1155/2016/4097471.

Web References:

24. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666337620300251
25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/
26. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_India
27. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID_pandemic_in_India
28. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0344033821000455?v=s5
29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7885700/
30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/
31. https://books.google.com/books?id=yzw0EAAAQBAJ
32. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666337620300251
33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/#:~:text=In%20the%20acute%20infection%20phase,coronary%20syndrome%20or%20fatal%20arrhythmias.
34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387807/
35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7885700/
36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387807/

37. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0344033821000455?v=s5
38. https://www.ecronicon.com/eccmc/pdf/ECCMC-04-00358.pdf
39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/
40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/
41. https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity#:~:text=Regular%20physical%20activity%20benefits%20both,increase%20susceptibility%20to%20COVID%2D19.
42. https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity.

Need of Changes in Traditional Plans of The Pedagogy of Sanskrit Language in The, Perspective of Globalization

Nivedita Chaudhuri
Assistant Professor in Sanskrit;
Govt. College of Education, (C.T.E.)
Banipur, N. 24 Pgs.

Key words : *Inspiration - steady fall-Pedagogy-child-English-digitalization-photograph-correlation-modern world-quiz- colored chalk-Action research-workshop-worksheet-excursion.*

Abstract : *Sanskrit has not only been the treasure-house of our past knowledge and achievements in the realm of thought and art, but it has also been the principal vehicle of our nation's aspirations and cultural traditions, besides being the source and inspiration of India's modern languages. It has been found that, in some of the states from the 20th century there is a definite fall in the number of schools having provision for teaching Sanskrit, and even in these schools which had such provision, there was a steady fall in the number of students taking Sanskrit. The Sanskrit Commission (1956-57) recommended that Sanskrit Pedagogy should be recognized as a special subject. The growth of modern education in recent years of the middle part of the 21st century has greatly influenced the teaching of Sanskrit emphasizing the child's point of view.*

Firstly, the teaching of Sanskrit should be started through the discussion of the updated significance of Sanskrit in spite of the syllabus. The conversation between the teacher and the pupil during teaching-learning process should be executed not only through regional languages but also through Sanskrit in the preliminary stage. Sanskrit letters should be taught through digitalization so that pupils can realize the modern implication and internet-using of that particular letters. The live photograph or the animated picture should be represented in spite of the still picture which is drawn by hand to explain any topic of Sanskrit language. The prose or poetry or grammar of the Sanskrit language should be explained through the co-relation method with the help of other

school subjects like Geography, life sc. etc. Some modern regional words like Bhugole, Danab etc. should be informed that they are originally Sanskrit words. The evaluation should be done through quiz contest in spite of asking questions. The academic problem of the pupil during learning should be solved through Action Research Programme in spite of threatening. The teacher will arrange an workshop or debate or educational excursion to arouse the interest of the pupil. The smart board should be used to explain the Sanskrit grammar in spite of traditional Black-Board. Colourful worksheets should be distributed among the pupil in spite of monotonous assignment.

KEY WORDS : *Education – backbone – school – teacher – profession – passion-social change – empowerment – globalization – complete process – commitments – planning – handling – engage – individual – relationship – Pathasala – innovations – transition – enjoyment – practical – whole-hearted – zero-IndoEuropean – objectives – science – letters – transcriptions – Grammar – Poetry – animation – Prose – epic – evaluation – designing games – Quiz Contest – examination – examination –worksheet –Action research – Internet.*

INTRODUCTION – R.N. Tagore has aptly said, *"A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame, a teacher can never truly teach unless he is still learning himself."* Education is one of the essential human right recognized in all relevant international agenda and national policies of all the countries. Education is the backbone of a developing country like India. It determines a citizen's progress and the country's development. Education has an enormous role to play in the social, intellectual and political transformation of the world. Parents, communities and government have always expected schools to develop students who would contribute to the society in which they live.

CONCEPT OF TEACHER IN THE PERSPECTIVE OF MODERN INDIA – Swami Vivekananda has been said that, *"Find the teacher, serve him as a child, open your heart to his influence, see in him God manifested."*

Destiny of India is shaped in her classroom and teacher are the real catalyst of desirable social change for building India as a progressive nation. The job of the teacher is, thus, not only an integral

part of educational development but also of the social, economic and cultural systems in which they perform their professional tasks. Now-a-days, teaching is not a passion, it is a profession. Teachers are the largest professional group engaged in human development activity. Teaching, as a profession, reflects a high degree of academic excellence, poses teaching skills and human values.

A teacher has greater duties and responsibilities to perform for the betterment of the society. Education is, indeed, a process of human enlightment and empowerment. It is not a product to be sold and bought in an academic market. In the name of high sounding words like Globalization, Professionalism and Privatization, we are tending to convert educational process into a market process. The aim of education is to help students develop into highly evolved and morally oriented human beings.

Success of the students in general and the institution in particular solely depends on teachers. That's why, Kothari Commission aptly remarked, "The destiny of India is now being shaped in her classrooms." Teaching is an art. It is a complete process. This complex professional task, which is known as 'Human Relation', is carried on in collaboration with the profession, institution, students, family, staff and community for which professional commitments are fundamental. Anybody cannot be good teachers. Only wholehearted committed teachers can do these as commitments have strong relationship with their passions, values and beings.

In the formal setting of schools, teachers are employed in a professional capacity to guide and direct the learning experiences of students. Duties of a teacher involves not only planning, organizing and conducting classes with students as a whole in a classroom, in groups etc. but also handling students, parents, administration and co-workers along own personal life and family. The teaching profession is considered to be such that teachers are required to meet challenges which are becoming more and more global in nature.

CONCEPT OF STUDENTACCORDING TO TEACHER'S POINT OF VIEW – One of the most exhilarating experiences a teacher can have is to lead a class of enthusiastic and engaged students. It is easy to picture;

students are learning forward in their seats, hands waving. Questions and opinions roll out, offering the teacher a clear picture of what students understand and where confusion remains. The materials to be covered structures itself, its sequences and depth detected by how as students can digest the concepts. Students eagerly break into groups and continue animated discussion, showing their comprehension through questions, critical listening and arguing about examples as they apply the material to their own lives. The teacher thoroughly energized, thinking about how the material to be covered next build on that day's class. Thus students' school lives are more enjoyable when they can engage themselves in their classes.

The teacher need to understand that students come from different culture and backgrounds and each student deserves to be respected as an individual and their needs vary from one another. Thus, teachers must establish a positive relationship with their students in order to provide the learning opportunity as well as motivation they needed to be successful in both academic and life lessons. Therefore it is a preparation before they go out into the real world.

TRADITIONAL METHOD IN THE ANCIENT INDIAN EDUCATION SYSTEM –

The methods of teaching had to differ from time to time. The ancient Indian teaching strategy was called as 'Traditional method' or 'Pathasala method'. In the Vedic age, when the writing was unknown, only the reading lessons were followed by 'instruction' (*vidhi*) where the teacher were showing the pupils the acts and actions to be actually performed during the ritual ceremony described in the text, and 'Arthavada'(explanation), where the meaning of the sentence was made clear. Later, in the six systems of philosophy, the teaching became more scientific and critical. For the full understanding of the text, a three-fold explanation was given :-

i) *Pada* (word) – to make the student understand the word grammatical notes were given;

ii) *vakya* (sentence) – to make the meaning of the sentence clear to him;

iii) *Pramana* (argument) as explicity as possible and by relating it to the previous as well as to the following points. Hence one well-versed text was called 'Pada-Vakya-Pramana';

According to Vacaspatimishra, the five steps for the realization of the meaning of a religious truth are ;

i) *Adhyana* - the hearing of words.

ii) *Shaba* – apprehension of the meaning of the above particular words.

iii) *Uha* – reasoning of the leading to generalization.

iv) *Suhritpati* – confirmation by a friend teacher.

v) *Dana* – application of the above confirmed words.

These correspond wholly with those of Dewey. In his book, 'How we Think" he gave the followingsteps :

i) A problem and its location (*Adhyana and Shabda*).

ii) Suggested solutions and the selections of a particular solutions *(Uha and Suhritpati).*

iii) Action / Application *(Dana).*

Another authority gives seven steps similar to those of the Herbertians ;

i) *Shushrusha* (Desire to listen).

ii) *Shravanam* (Act or process of hearing).

iii) *Grahanam* (Acceptence).

iv) *Uhapoha* (Discussion).

v) *Artha-Vijnanam* (Grasping the correct senses).

vi) *Tatwa-vijnanam* (Knowledge of profound truth).

NEED OF CHANGES IN TRADITIONAL PLANS – The traditional methods of teaching which were evolved long ago for traditional society have become out-moded in the present context of technological developments. Educationists are of opinion that without introducing changes and innovations in the present education system, we cannot cope with the challenges of present society. Hence, new innovations have come to the area of education and team-teaching is one of them.

The only consistent factor we can identify is the role of the teacher, whose abilities, skill, knowledge and enthusiasm are crucial in determining the success or otherwise, the children they teach. Teaching, after all, is about engagement, about getting children to listen and switch on. The transition from external guidance (from teacher) through shared guidance (by the student together with the teacher) to internal guidance (by the student alone) enhances the success of student .

The exact role of the teacher. In the present day scenario, blended learning leads to a much more process that involves curiosity and enjoyment.

Traditional method of teaching is one way. As a result, students suffer from the lack of interest due to insufficient interaction. Though multimedia method has wiped this problem quite to extent but not to the desired criteria. Contrast between the traditional and modern method is quite significant. For instance.

i) Practical knowledge should get the priority.

ii) Focus on practice should be encouraged.

iii) Teacher should arm himself / herself with a good sense of humour.

iv) Usage of animation may be proved as a new dimension in this field and can bring the students close thereby.

v) Focus should be given on conception.

vi) Field work and excursions may also be proved as bless.

vii) Idea of secularism should be implemented among the students.

viii) Arranging seminars and debates is also necessary for all-round development.

So, the above strategies bears the capability to bring a sudden change and so it must be introduced in our present education scenario.

The Sanskrit Commission (1957) recommends that the Sanskrit pedagogy should be recognized as a special subject; and the courses should be organized in Teacher Education course for imparting Training to SanskritTeachers.

THEORY OF GLOBALIZATION THROUGH SANSKRIT EDUCATION – It has been said in one of the famous Sanskrit verses that, *"Aya,n nijo.h paro beti ga.nanaa langhucetasaa,m/ udaaracaritaanaantu Vasudhaa eva ku,tumbakam//"*, that means, only narrow-minded people distinguish between 'own' and 'other's'. But the whole world is felt like homely atmosphere to the large-hearted people. So, the above verse had stated the theory of Globalization.

In the 5th/6th century B.C., Aryabhatta had discovered 0 (zero) to count many mathematical calculations which has been spreaded over the whole world after some periods.

It has been also described in the book named *Aryamahasiddhanta* written by Aryabhatta about the 'Globe' or the 'Earth' viz, *"B.rtto bhapa;-njaramadhye kakshaparibes.tito khamadhyogata.h/ M.rjjala;sikhii vaayumaya bhuugola.h sarbato b.rtta.h//"* that means, the circular Earth which is surrounded by the soil, water, air and fair, is satiated below the solar system which solar system is satiated in the midst of the zodiac circle. That means the total earth is in the shape of circle and this theory was discovered firstly in the ancient India through Sanskrit language. *Sa-msk,rta,* Europeanized as 'Sanskrit', or linguistically the 'Old-Indo-Aryan (OIA),' belongs to the Indic group of the Indo-Iranian sub-branch of the Indo-European family of languages. It is, therefore, closely connected with the Indo-Iranian on the one hand and remotely with the Indo-European on the other.

Originally the geographical boundary of Sanskrit was only in the Northern part of India beginning from the far West or North-west to the East; but gradually it had extended its boundary throughout the length and breadth of India side by side with other families, such as, Dravidian, Austric and Sino-Tibetan. Apart from India, Sanskrit had also influenced its neighbouring countries, like China and Tibet in the north, and Sumatra, Java, Borneo etc. in the south-east as well as the western neighbours of India in the past. But now-a-days Sanskrit is being cultivated not only in India, but also almost all parts of the globe as one of the vehicles of the sources of Indo-European culture history, mythology, religion, language and literature.

The term 'Indo-European' is used to denote a hypothetically reconstructed language whose existence has only been hypothetically established without any factual findings of this language in any form in this world; but whose existence can only be hypothetically equated after a careful comparison of some languages, such as, Sanskrit, Avestan, Old Persian, Albanian, Armenian, Lithuanian, Latvian, Old Prussian, Old Church Slavonic, Russian, Greek, Latin, Germanic (gothic), Celtic and Tokharian. All theses languages were inflectional and synthetic at the beginning and their descendants gradually became analytic. These languages are akin to each other in linguistic structure and therefore their phonological, morphological, syntactical and semantic equations are

possible. Their similarities are so strong indeed that scholars have become unanimous in grouping them into one common family named Indo-European as suggested by scholars.

The following example is that : IE – *maateer* > OIA – *maataa* > OP – *maataa* > LITH – *mote* > DORIC –
maateer > LAT. – *mater* > OHG – *muoter.*

NEED OF CHANGES OF TEACHING SANSKRIT LANGUAGE IN THE PERSPECTIVE OF GLOBALIZATION THROUGH TECHNOLOGY

A) OBJECTIVES OF TEACHING SANSKRIT –

Traditionally, the Sanskrit teacher starts the preliminary lesson in the class VII with the discussion of the components of particular school. But, in the 21st century, Sanskrit teacher should start his/her teaching primarily with the discussion of the contemporary objectives and the significance of learning the Sanskrit language in the modern dynamic period.

At first, Sanskrit teacher should discuss the lack of interest & the fear about Sanskrit language due to the causes like 'the rigidity of grammar', 'superstition of Hindu relegion', 'irrelevance' etc. To explain the rigidity of the Sanskrit language, teacher should explain the features of many languages with global point of view. For instance, in English language, it can be said that, 'I am writing by the pen' which is decorated with instrumental case (by the pen) is totally grammatical sentence. But it can also be said that, 'I am writing with the pen' which is not grammatical but idiomatic sentence depends on the contemporary speaking style. But the second sentence also delivers the sense if instrumental case (with the pen). But in English language, both of the two above sentences are right according to the view of the both grammarians and philologists. But in the Sanskrit language, it has to be said or written that, *'Aha,m lekhanyaa likhati'* according to only one particular grammatical structure but cannot be written in another way. Here, the particular word *'lekhanyaa'* delivers the sense of instrumental case 'by the pen'.

In this preliminary stage also, Sanskrit teacher also should represent the glorious era of ancient Indian Mathematics which is the

basement of modern science of the whole world. He/She should discuss about the ancient Indian mathematical terms like *'Barga', 'Ghana',* etc. which are used now-a-days as 'square', 'queue' etc. respectively in the whole world and their modern implications also.

Sanskrit teacher should also discuss the different types of activities related with Sanskrit literature manually or through digital system like the publication of Sanskrit journals, Seminar on Sanskrit literature etc.in India and the whole world and inform about those incidents to his/her students.

B) BASIC LEVEL OF SANSKRIT LANGUAGE : SOUNDS & LETTERS – Sanskrit teaching always starts with ancient Indian sounds and letters in school level which is the basement of the world of Sanskrit literature. Traditionally, Sanskrit teacher just practices to his/her students the Sanskrit letters and sounds through the pronunciation and board-work only. But now-a- days, the changes of this strategy is to be required.

At first, Sanskrit teacher should represent some original Sanskrit manuscript in front of the students to inform the proper symbols of the Sanskrit letters which are actually called as 'Devanagari Scripts'. Simoultenously, he/she should represent some original manuscripts which are written through English, Bengali, Hindi and Urdu scripts to acknowledge the difference among the symbols of the above scripts and the actual writing styles of the above quoted languages. In that case, Sanskrit teacher will show the hard-copy of the particular above manuscripts or soft copy through internet system.

Secondly, Sanskrit teacher will show the students some E-books through internet system which are written on Indological studies through either *Devanagari* or Bengali or English scripts and which are used in the higher education level of not only in India but also the other countries of Asia, Europe etc.

After that, Sanskrit teacher should learn the computer science and the Internet system. Then he/she should practice himself/herself and practice his/her students the Bengali, Hindi, Urdu, German and English transcription system of Sanskrit or *Devanagari* scripts using different types of software through computer system to give the idea of the

global implication of Sanskrit scripts to his/her students.

Sanskrit language is the mother tongue of India. So, in the next stage, through the video-conferencing system, Sanskrit teacher should to make to hear the different types of pronunciation of Sanskrit sounds of the different states of India like Tamilnadu from south-India, Himacal Pradesh from north-India, Gujrat from western India and Assam from eastern India. So, Sanskrit teachershould acquire technology.

C) TEACHING OF SANSKRIT GRAMMAR – i) When Sanskrit teacher teaches to his/her student in class VII, the *lesson* named *Sandhi* which is termed philologically as 'Contraction'; he/she only discuss the rules of different types of contraction and practise students the procedure of the various examples of contraction through only board-work, but, now-a days, in that case, also the change of the plan of the teaching is to be needed.

According to modern methodology, Sanskrit teacher, before starting the lesson named *Sandhi*; he/she should show some animation or movie pictures about *'sandhi'* or 'joining' from different areas like a) contraction between the two religion like Hindu and Muslim, i.e., The picture of Akbar and Birbal from History. b) Production of water through the chemical reaction between two gases named Hydrogen and Oxygen from Chemistry. c) Mathematical calculation like 2+2 = 4. d) National Integration of India. e) Explanation of some particular words like 'Join', 'Contraction', 'Assimilation', 'Conjunction', 'Joint' 'Integration' *'Samhita''Yoga'* etc. from the preliminery concept of Mathematics through digital system.

When Sanskrit teacher will start the above particular lesson, he/she will practise the procedure of Sandhi through animation system by using computer system like;

Deva + Aalaya.h > D + e + v + a + A+a + l + a + y + a + . + h > a + A > aa > D + v + aa + l + a + y + a + .h > Devaalaya.h.

Again, Sanskrit teacher will transform his/her traditional methodology to modern strategy during teaching. In the case of teaching grammar like declension named *Bhubh.rt*, the Sanskrit teacher will show the picture of the mountain range named the Himalaya through PPT which is situated in India and after that he/she will discuss the

meaning of the Sanskrit sentence written below the picture like *"Himalayaa.h naama eka.h Bhubh.rt as ti."* (There is a mountain named Himalaya). After that, he/shewill discuss the inflectional structure of the word like *Bhubh.rt* in the black-board with the different types of coloured chalks or in the smart-board with the different types of coloured marker pen according to deductive-inductive method. After that, the teacher will represent the live picture of Volcano named Mauna Loa which is situated outside India like Hawai Island throughPPT. Then he/she will discuss the meaning of the Sanskrit sentence like *"Mauna Loa iti suptat bhubh.rta.h agnyudgama.h d.r;syate"* (the eruption is seen from the volcano named Mauna Loa). Then he/she will discuss the inflectional structure of theword named *Bhubh.rta.h* in the above way like *Bhubh.rt.*

D) TEACHING OF SANSKRIT POETRY – In the school level, there are various Sanskrit poetries or Sanskrit verses like '*Canakya Sloka*', '*Saraswati Vandana*', '*Vidya Stotram*', '*Gita Stotram*', '*Ganga Stotram*' etc.

In the case of teaching '*Ganga Stotram*', traditionally, Sanskrit teacher just show some pictures of the different movements of the river Ganges and after that, he/she will read loudly and fluently the verses of the poetry and explain grammatically themeaning of the every word of the verses and at last, he/she translates the every verses.

But, according to modern strategy, Sanskrit teacher, at first, in the introductory or pre-active phase, should discuss about thestructure of ice, water, pond, lake, canal, bay, ocean etc. Through the movie pictures of India and abroad using PPT by computer system to give general conception about 'river'.

After that, in the second phase, during explaining the verses of the above poetry, teacher should discuss the social significanceof the river Ganges with the examples of the significance of the various rivers of the whole world like Amazone, Euphratisetc. through the different movie pictures by PPT. For instance, when the teacher will explain in the classroom the specificline of the above poetry, "*Naaha.m jaane taba mahimaana.m*", he/she will represent not only the pictures of the city of Kolkata and Benaras etc. by the side of the river Ganges in India but also the pictures

of the city of London by the side of the river Tames in Europe or the city of Kayro by the side of the river Nile in Africa through the digital system. The teacher will explain through the above pictures that all of the above cities are watered by the particular rivers.

E) TEACHING OF SANSKRIT PROSE – There are various Sanskrit proses discussed in the school level like *'Asmaaka.m Vidyaalaya.h'* which is environment based, *'Swami Vivekananda'* which is biography based, *'Vaanaramakarakathaa'* which is story based, and *'Pitarau'* which is description based etc.

Sanskrit teacher should change also his/her teaching strategy in the case of the teaching Sanskrit prose. Sanskrit teacher should prepare a plan about the teaching of the prose *'Raamaaya.na,m Mahaakaavya,m'* in class VIII.

Traditionally, Sanskrit teacher explains the meaning of every sentence of the above particular prose with grammatical analysis and shows some pictures about the incidents of the particular prose.

But, according to modern methodology, Sanskrit teacher will give in brief the informations about the *Raamacaritamaanasa* which was written in Hindi language and the *Kamba Raamaay.nam* which was written in Tamil language. In that case, teacher should inform that the above particular languages is practiced in India. Not only that, but also the teacher should inform about the book named the *Raamaaya.n Kaakabin* which is the epic of Malayesia also and the book named *Raamkishen* which was the epic of Thailand. In that case, teacher should inform that both of the above countries are satiated abroad India, in the continent named Asia. Again, he/she should also explain the incidents of the kidnaping of the princess *Sita* by *Raava.na* with the comparison of the incident of the kidnapping of queen Helen by the Trojan prince named Paris through the animated or movie picture named 'Ramayana' and 'Helen of Troy' of by using computer system. Sanskrit teacher also should give the information in brief about the different epics from the whole world like the *Illiad* of Greece, *Shaahnaamaa* of Iran etc. with some colorful pictures through internet system.

F) CHANGES IN EVALUATION – In the evaluation period, Traditionally Sanskrit teacher asks some questions about the particular

lesson to assess the cognitive development or let them to write answer of some questions from the particular learnable unit either on the board or in the booklet.

But, now-a-days, the Sanskrit teacher should arrange the excercise about the particular Sanskrit lesson on the shape of designing games either through computer system or in the board-work. For instance, Sanskrit teacher will arrange Crossword Puzzle through the above way;

1 পি	ক	বা	ন্ধ	ব	xxx xx	2 ক্ষু	র	3 প্র
								থ
								মা
								ব
								ধি

Given clues > Side by side; 1. Autumn; 2. Knife; 5. > Up & Down – 3. Till now.

Again, Sanskrit teacher will arrange Quiz contest programme in the classroom situation in spite of asking questions traditionally. Teacher will declare that every row of the benches will be considered as every particular group like A, B, C etc. where the students are sitting. Then the teacher should distrubute some questions about the particular learnable unit and after getting the answer he/she sould consider whether the answer is proper or not according to the question and then he/she will write the particular score marks in the perspective of the performance of the particular group in the board which will be considered as 'Score-board'. Through this procedure not only the teacher will be able to assess the cognitive development of the particular student of the particular group but also, on the other hand, students will get much interest about the particular lesson and they will also escape themselves from fear about Sanskrit language.

G) CHANGES IN EXAMINATION – Traditionally, the Sanskrit teacher will distribute some questions through the board- work or a question-paper or dictation system to execute the periodical examination of Sanskrit language in school level in a stereo typed way.

But, according to modern pedagogy, Sanskrit teacher will distribute the different colorful worksheets decorated with some objective-type and very-short-answer-type questions to different students in the particular classroom to execute the periodical examination in a funny way.

On the other hand, teacher will distribute some questions about the particular learnable unit on the computer screen through internet-system and the student will give the answer of those questions by using individual computer sitting in the smart classroom through internet-procedure.

H) CHANGES IN THE PROBLEM SOLVATION – Traditionally, Sanskrit teacher rebukes, gives the low marks and informs the guardians about low performance of the low-achiever students.

According to the Action Research Procedure, Sanskrit teacher will change the strategy of the rectification and problem- solvation of his/her students.

But, according to the Icon Model, teacher will let them to discuss the students among themselves within their own peer- group about the problem of the realization of a particular learnable unit of Sanskrit language in the school level.

Then he/she distributes a some questionnaire about the possible problems among them and after sometime he/she will collect the questionnaire in which the students has written their opinions in the perspective of the particular questions of the questionnaire.

After that, he/she will read thoroughly, the opinions of the students and will discuss with them about their opinion and after that he/she should change his/her pedagogy for that particular Sanskrit lesson.

CONCLUSION - Through teaching is being considered as a science and a skill and basically as an art. Teacher, who unconsciously designs the growing practice mind of the child entrust to him. This is not a mechanical process. Indeed, it is an intricate, exciting and a very challenging one. With good democratic leadership and appropriate teaching methodologies, the teacher's effectiveness can be enhanced. Challenges in education system have no permanent and fixed answers because of the challengeable nature of human society. The teacher in the 21st century will have a deal with a world different from that of 20th

century in respects of pedagogical and technological advancement.

Teachers are one of the main pillars of sound and progressive society for the development of the learner's behaviors and attitudes. But at present situation, the ethical detoriation is observed in various way. So, to recovery this crisis, to achieve the growth of knowledge and to reach the constitutional goals the above changes need to be viewed so that we can say according to the Upanishad *"Caraibeti"*.

Bibliography:

1. Ali, Mohammad Wazed; 1980; *Chotoder Shaahanaamaa*; (in bengali); Kolkata
2. Bandopadhaya; Srikumar; 1945; *Engraji Sahityer Itihas;* (in Bengali); Kolkata
3. Banerjee, Satya ranjan; 1987; *A Handbook of Sanskrit Philosophy*; Calcutta
4. Bokil, J.P. Parasnis; N.R., 1942; *A New Approach to Sanskrit*. India.
5. Burrow, T; (not dated); *The Sanskrit language*; London.
6. Chatterjee; Suniti Kumar; 1957; *Report of the Sanskrit Commission*; India.
7. Hart, Geogre L; (not dated); *A Rapid Sanskrit Method*, Delhi.
8. Jones, Daniel; 1979; *An Outline of English Phonetics*, New Delhi.

Vikramasila Monastery: Its Historical Background

Samir Chattopadhyay
Assistant professor, Dept. of Education
Jadavpur University

The development of Buddhism in Eastern India witnessed the foundation of various monasteries. These monasteries gradually developed into active centres of learning. This development was fostered by royal patronage since some of the great rulers of Eastern India were either Buddhist themselves or liberal patrons of Buddhism. According to ancient literary sources, these monasteries were visited by scholars notonly from other parts of India but also from outside.

Buddhism was well-established in some parts of Bengal from very early times. It was only in the post-Gupta period that indications of its progress were visible under different ruling dynasties, till the end of the rule of the Pālas and the Candras. In about the middle of the eighth century A.D. (i.e. before the rise of the Buddhist Päla dynasty), Buddhism continued to develop in East and South-East Bengal (VangaSamatata) till the end of the 11th century A.D. Most of the earlier rulers o f South-East Bengal made grants by transferring property to Buddhist monasteries which benefited institutions and not individuals. Later, when the Candas came to power, they made donations to brāhmanaindividuals, like the Palas. During the rule of the Pala kings Dharmapalaand Devapala three monasteries attained exceptional prominence,Nalanda, Somapura and Vikramasila. Although they managed their own affairs according to their institutional usage and rights they received considerable patronage from the rulers and were

Sometimes exercised by royal nominees. Thus the Ghoshrawa stone-slab inscription of the reign of Devapala, refers to devapala appointing a monk named Viradeva as the Governor of the Nalanda University. Similarly, Dipankara was appointed the Chief High Priest of Vikramasila by king Mahipala I and later as the High Priest of the same monastery by king Nayapala. There were links between different monasteries, indicated by the fact that the Head of the Vikramasila monastery also held a similar post at the Nalanda University. Instances of

students, monks and scholars migrating from one monastery to another are available. For example, Dipankara received ordination from AcharyaBodhibhadra of Nalanda and after having studied there for sometime, went to Odantapuri for further studies. He finally became the Head of the Vikramasilavihara. Vairochanaraksita was a learned Tantric scholar who visited different monasteries in search of knowledge. We are told that he stayed for some time at Nalanda andVikramasila and received instruction from PanditaSarana, the Head of the Yogins in the town of Somapura. SakyaSribhadra, a learned monk from Kashmir, came to Magadha in1202 A.D. and visited all the Buddhist centres of learning. When he found that both Odantapuri and Vikramasila had been destroyed by the Muslims, he proceeded to Jagaddala, which was still in existence, where he stayed for three years and found many pupils, prominent among them being Danasila and Vibhuticandra. The learned monk Subhakara Gupta accepted him as his pupil.

Nalanda and Valabhi figure in the accounts of the Chinese pilgrims of the seventh century A.D. However, there were other Buddhist universities that flourished after the heyday of these older universities. We know about them from Tibetan sources- from Taranath's description *in his 'History of Indian Buddhism' (early 18th century) and other minor* historiographical works and from mention of them in the colophons of a number of manuscripts recovered from Tibet. The greatest and most famous of them was Vikramasila.

Vikramasila monastery was one of the important monasteries of ancient India. It was built by a king of the Pāla dynasty and the actual site has not been definitely identified/settled. Alexander Cunningham.

Identified Vikramaśīla with modern Silao, a small village, three miles to the north of Rajgir. According to Tibetan works, the site can be identified with Patharghata, twenty-four miles to the east of Champa near Bhagalpur in Bihar. Some scholars are inclined to identify it with the remains found in the villages Antichak and Oriup (both situated at the foot of the Patharghata hill, Bhagalpur). The site yielded stone and brick ruins, votive stūpas, Buddhist images, carved pillars and other artifacts. A. Banerji-Sastri identified Vikramaśīla with the ruins found in the village Keur, situated three miles south-east of Hulasgunj. There

henoticed a 40-feet high mound and some smaller mounds, all made of brick. He also noticed remains of tanks and brick buildings close to them. The site was extensive and was covered with images belonging to the Pāla period.

The monasteries of Vikramasila were situated on a “bluff hill' on the right bank of the Ganga ‘where the Holy River flows northwards’. It was in its peak period under the patronage of the Buddhist Pala kings of Bengal-a grand and stately establishment with six noble gates, each guarded by a scholar officer of the University who bore the designation of"Gatekeeper Scholar' (Dvara-pandita). The University granted the degree of Pandita, equivalent to Master of Arts.

The fame and prestige of Vikramasila in Tibetan records is due perhaps in a large measure to its association with the great name of DipankaraSrijnana (980-1053 A.D.), a renowned scholar, who, after finishing his education at Odantapuri, became the head of the University of Vikramasila in 1034-38 A.D., migrated to Tibet at the invitation of its king and led a movement for the reform of Buddhism, then the state religion in that country.

King Dharmapala had the Vihara constructed after a good design. It was surrounded by a strong wall. At the centre was erected the Temple adorned with Mahabodhi images. There were also erected within the enclosure fifty-three smaller temples of private character and fifty-four ordinary temples, totaling 108 temples. Then he made provision for teaching by the appointment of 108 teachers and other staff comprising an Acharya for Wood-offering, an Acharya for Ordination, another for Fire-offering, a Superintendent of Works, a guard of pigeons, and a supplier of Temple servants. It is stated that the cost of maintaining each of these 114 members of the staff was equal to that of four men. We further learn that the University came to have six Colleges, each with a staff of the standard strength of 108 teachers, and a Central Hall called

**RK Mookerji, Ancient Indian Education, p.587.*

The House of Science with its six gates opening on the six Colleges and italso stated that the outer wall surrounding the whole Monastery was decorated with artistic work, a portrait in painting of Nagarjunaadorningthe right of the principal entrance and that of Atisa on

the left. On thewalls of the University were also painted portraits of Pandits eminent fortheir learning and character.

We do not know much of the working of this University, its rules and regulations governing the daily life and studies of its resident students, as we know in the case of Nalanda, thanks to the comprehensive account left to us by a foreign filgrim of the eminence of Hsuan Tsang on the basis of his first-hand knowledge as its student for several years, which has been further supplemented by an equally full account of another foreigner, I-tsing, who had even a greater advantage in observing its working as a student for a much longer period. The accounts of these Chinese pilgrims have a further value for the spirit of detachment, criticism, and objectivity in which they are written. Unfortunately, Vikramasila is not as fortunate as Nalanda in the matter of the conservation of its history. But its history is written large in the biography of the great men it has produced, the scholars who were invited by foreign countries, chiefly Tibet, to spread its learning, culture, and religion. From the foreign accounts of some of these scholars, we glean something of the history of their Alma Mater. Indeed, the success of the work of Vikramasila as a seat of learning is amply demonstrated by the quality and quantity of its output, the prodigies of piety and learning it produced, and the profound contributions they made to knowledge and religion by their numerous writings which practically built up the culture and civilization of another country, Tibet. Among the many Tibetan scholars who came and studied in this monastery, mention may be made of Nag-tshoLotsava, who stayed in this monastery for thre years (A.D.1035-38). There was a Tibetan House in this monastery for the residence of Tibetan scholars. Gya-tson was also a resident of the same House. This university specialized in Grammar, Metaphysics (including Logic), Ritual, etc. The most important subject taught here was Tantricism. Unlike Nalanda university, it conferred Diplomas to distinguished scholars, among them mention may be made of Jetari, Ratnavajra of Kashmir, Rahulabhadra, etc. Mention may also be made of Yamari, a very poor pandit of repute and a specialist in Grammar and Logic. He also received the distinguished honour of Vikramasila. These Honours were conferred by the ruling kings, which clearly indicate the

control exercised by the State over a monastic university. It is likely, that the Pala kings had some direct control over the university, whereas this was not the case with Nalanda. This may be due to the fact that the Vikramasila monastery was their own creation. It is interesting to note that to the people of Bengal Vikramasila was a place of great veneration and they went there to offer their worship.

SELECT BIBLIOGRAPHY

1. *Samuel Beal, Travels of Fah-hian and Sung Yun (Tr.), London, 1869.*
2. *Samuel Beal, The Life of HiuenTsiang, London, 1888.*
3. Lama Chimpa and AlakaChattopadhyay, trans., Taranatha's History of le auddhism in India, Simla, 1970.
4. HO Chang-Chun, “Fa-hsien’s Pilgrimage to Buddhist Countries”, Chinese oerature, 1956, No. 3.
5. Sarat Chandra Das, Indian Pandits from the Land of Snow, Calcutta, 1893.
6. S. C. Das, Ed., Pag Sam Jon Zang, of SumpaMkhan-Po Yese Pal Jor.
7 *H.A. Giles, The Travels of Fa-Hsien or Record of Buddhistic Kingdoms The Tr.), Cambridge, 1923.*
8. *kanaiLalHazra, Royal Patronage of Buddhism in Ancient India, Delhi, 1984.*
9. D. D. Kosambi, The Culture and Civilization of Ancient India:An Historical uit Outline, New Delhi, 1970.
10. James Legge, A Record of Buddhistic Kingdoms (being an account of the Chinese monk Fa-hien's Travels), Tr., Oxford, 1886.
11. R.K. Mookerji, Ancient Indian Education, 2nd Ed., Delhi, 1951.
12. PuspaNiyogi, Buddhism in Ancient Bengal, Calcutta, 1980.

13. Ram Chandra Prasad, Archaeology of Champa and Vikramasila, Delhi, 1987.
14. George N. Roerich, The Blue Annals, Delhi, 1976.
15. D. C. Sircar, Ed., Select Inscriptions, Vol. I, Calcutta, 1967.
16. T. Takakusu, A Record of Buddhist Religion, Oxford, 1896.
17. T. Watters, On Yuan Chwang's Travels in India, Ed. T. W. Rhys Davids and S. W. Bushell, 2 Vols., Royal Asiatic Society, London, 1904-5.

An International Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Journal Published Thrice a Year

DOI : 10.5281/zenodo.5517966

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে
www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 650/-